পৃষ্ঠা 1

আল-মদিনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

শরয়ি রাজনীতি
GFIQ5203

মূল পাঠ্যবই

২০০৯ সর্বস্বত্ব আল-মদিনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃক সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা 2

""

পৃষ্ঠা 3

""

পৃষ্ঠা 4

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ: সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি): এর ধারণা, বিধানসমূহ এবং এর প্রামাণিকতার দলীলসমূহ (৭-৪৫)

দ্বিতীয় পাঠ: ইসলামী ব্যবস্থার ধারণা এবং মক্কা ও মদীনায় এর উৎপত্তি (৪৭-৮৮)

তৃতীয় পাঠ: ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা (৮৯-১৪২)

চতুর্থ পাঠ: ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক উৎসসমূহ: যাকাত (১৪৩-১৯৬)

পঞ্চম পাঠ: যাকাতের অবশিষ্ট প্রকারভেদ এবং এর ব্যাপকতা অর্জনে সহায়ক উপাদানসমূহ (১৯৭-২৫০)

ষষ্ঠ পাঠ: জিযিয়া, খারাজ এবং উশর (২৫১-২৮৯)

সপ্তম পাঠ: ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা (২৯১-৩৩৮)

অষ্টম পাঠ: ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ (৩৩৯-৩৮৪)

নবম পাঠ: ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহের ধারাবাহিকতা (৩৮৫-৪২৯)

দশম পাঠ: ইমামত (৪৩১-৪৮১)

একাদশ পাঠ: ইমামতে উজমা (প্রধান নেতৃত্ব)-এর শর্তাবলী (৪৮৩-৫২১)

দ্বাদশ পাঠ: ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ, ইমামের দায়িত্ব ও অধিকার এবং তাঁর শাসনের অবসানের কারণসমূহ (৫২৩-৫৮৭)

ত্রয়োদশ পাঠ: ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনাসমূহ (৫৮৯-৬৩৭)

চতুর্দশ পাঠ: ইসলামে প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি (৬৩৯-৭০৭)

পঞ্চদশ পাঠ: মন্ত্রণালয়, অন্যদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক এবং চুক্তিসমূহ (৭০৯-৮০১)

ষোড়শ পাঠ: বিচার ব্যবস্থা এবং ইসলামী ব্যবস্থায় সত্যতা যাচাই ও প্রমাণের মাধ্যমসমূহ (৮০৩-৮৫৬)

সাধারণ তথ্যসূত্রের তালিকা: (৮৫৭-৮৬০)

পৃষ্ঠা 5

""

পৃষ্ঠা 6

""

পৃষ্ঠা 7

শরয়ি রাজনীতি

প্রথম পাঠ

শরয়ি রাজনীতি: এর ধারণা, বিধানাবলি এবং এর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণাদি

পাঠের আলোচ্য বিষয়সমূহ

প্রথম উপাদান: আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে শরয়ি রাজনীতির সংজ্ঞা, এর ওপর আমল করার শর্তাবলি এবং সাহাবীগণের যুগ থেকে এর দৃষ্টান্তসমূহ। ৯

দ্বিতীয় উপাদান: শরয়ি রাজনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সমূহ। ১৮

তৃতীয় উপাদান: শরয়ি রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতার দলীলসমূহ। ২৪

পৃষ্ঠা 8

""

পৃষ্ঠা 9

প্রথম পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ভাষাগত ও পারিভাষিক অর্থে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর সংজ্ঞা, এর ওপর আমল করার শর্তাবলি এবং সাহাবীদের যুগ থেকে তার উদাহরণসমূহ

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সত্য প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও বিশ্বস্ত রাসুলের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর সকল সাহাবী ও অনুসারীদের ওপর সন্তুষ্ট হোন। অতঃপর—

আমরা আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর পাঠ্যক্রম শুরু করছি:

১. আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর ধারণার বর্ণনা:

ভাষাগত অর্থে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর সংজ্ঞা:

‘আল-মিসবাহুল মুনীর’ গ্রন্থে এসেছে: যায়েদ বিষয়টিকে ‘সাসা’ (পরিচালনা) করেছে, অর্থাৎ সে এটি তদারকি করেছে এবং এর দায়িত্ব পালন করেছে। ইবনুল মানজুর আল-আফরিকী রচিত ‘লিসানুল আরব’ গ্রন্থে এসেছে: ‘আস-সুস’ অর্থ হলো নেতৃত্ব। বলা হয়ে থাকে: ‘সাসুহুম সুসান’ (তারা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে)। যখন কাউকে নেতা বানানো হয়, তখন বলা হয়: ‘সুসুহু’ এবং ‘আসাসুহু’। আমরা বলি: ‘সাসা আল-আমরা সিয়াসাতান’, যার অর্থ হলো—সে বিষয়টির দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা বলি: ‘সাওয়াসাহুল ক্বাওম’, যার অর্থ—তারা তাকে তাদের নেতা বানিয়েছে। আরও বলা হয়: অমুক ব্যক্তি অমুক গোত্রের সন্তানদের বিষয়ের দায়িত্ব নিয়েছে, অর্থাৎ সে তাদের শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। আর ‘সিয়াসাহ’ (শাসন বা পরিচালনা) হলো কোনো বিষয়কে এমনভাবে আঞ্জাম দেওয়া যা তার সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করে।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভাষাগতভাবে ‘সিয়াসাহ’ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর সকল প্রয়োগের মূল অর্থ হলো: কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করা এবং তাতে এমনভাবে কাজ করা যা তার সংশোধন ও কল্যাণ বয়ে আনে। এটিই হলো ভাষাগত অর্থে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর সংজ্ঞা।

পারিভাষিক অর্থে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর সংজ্ঞা:

এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু অভিমত রয়েছে; বলা হয়েছে: জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে শাসকের এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা তিনি সমীচীন মনে করেন, যদিও সেই কাজের স্বপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল—অর্থাৎ কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, ইজমা কিংবা কিয়াস থেকে কোনো বিস্তারিত প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে।

প্রথম শিক্ষক | আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ
কেউ কেউ একে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করেছেন যে: এটি হলো এমন কাজ যার ফলে বাস্তবে মানুষ কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী হয় এবং ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা থেকে অধিক দূরে থাকে, যদিও নবী (সা.) তা প্রবর্তন করেননি এবং এ বিষয়ে কোনো ওহীও নাজিল হয়নি। এই সংজ্ঞাটি ড. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ আল-কাদীর 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ মাসদার লিত-তাকনীন' গ্রন্থে রয়েছে, যা ১৪১০ হিজরী - ১৯৮৯ সালে তানতার দারুল কুতুব আল-জামিইয়াহ আল-হাদিসাহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, পৃষ্ঠা ৩২।

কেউ কেউ আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করেছেন যে: এটি হলো ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান যা সমীচীন মনে করেন, অথবা বিদ্যমান কোনো ফাসাদ দমনের জন্য, কিংবা সম্ভাব্য কোনো ফাসাদ থেকে প্রতিরোধের জন্য অথবা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির সমাধানের লক্ষ্যে তিনি যে সকল আহকাম ও সিদ্ধান্ত জারি করেন। এই সংজ্ঞাটি ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী তাঁর 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ' গ্রন্থে প্রদান করেছেন, ১ম সংস্করণ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৮৯ ঈসায়ী, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, মিসর, পৃষ্ঠা ১৫ এবং পরবর্তী।

আবার কেউ কেউ আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে: এটি হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সেই সকল বিষয় পরিচালনা করা যেগুলোর বিধান সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দলীল (নস) বর্ণিত হয়নি, অথবা যেগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো উম্মতের কল্যাণার্থে তা পরিবর্তন ও পরিমার্জনযোগ্য এবং যা শরীয়তের বিধান ও এর সাধারণ মূলনীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংজ্ঞাটি ড. মাহমুদ আস-সাওয়ীর 'নিযামুদ দাওলাহ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে পাওয়া যায়, ১ম সংস্করণ ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ ঈসায়ী, দারুল হিদায়াহ, মিসর, পৃষ্ঠা ৩৯।

২. সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহর আহকাম অনুযায়ী আমল করার শর্তাবলি:
সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহর বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে আমরা এই সারমর্ম পাই যে: কিতাব (কুরআন) এবং সুন্নাহতে বর্ণিত দলীলসমূহের কোনোটি সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহর আহকামকে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ না করা কোনো ক্ষতি করে না এবং সেগুলোকে সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহর বিশেষণে বিশেষায়িত করতে বাধা দেয় না। তবে যা বাধা দেয় এবং ক্ষতিসাধন করে তা হলো: ওই আহকামগুলো কোনো বিস্তারিত দলীলের (নস) প্রকৃত অর্থে বিরোধী হওয়া; আর সেই বিস্তারিত দলীলগুলো হলো: কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। এই বিস্তারিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি স্থানে সকল মানুষের জন্য একটি সাধারণ শরীয়ত প্রদান করাই উদ্দেশ্য।

সুতরাং যখন শরয়ী রাজনীতি অথবা শরয়ী রাজনীতির বিধিবিধানসমূহ বিস্তারিত নসসমূহের (শরীয়তের দলিল) সাথে এই ধরনের বৈপরীত্য থেকে মুক্ত থাকে এবং শরীয়তের মূল চেতনা ও এর সাধারণ মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তখন তা একটি ইসলামী ব্যবস্থা এবং শরয়ী রাজনীতি হিসেবে গণ্য হয়, যা আমরা গ্রহণ করি এবং যার বিধানসমূহ মেনে চলি। এই কারণেই ইবনে আকীল আল-হাম্বালী বলেন: "রাজনীতি হলো এমন কাজ যার মাধ্যমে মানুষ কল্যাণের অধিকতর নিকটবর্তী হয় এবং ফাসাদ বা অমঙ্গল থেকে অধিকতর দূরে থাকে, যদিও তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তন করেননি কিংবা এ বিষয়ে কোনো ওহী নাজিল হয়নি—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।"

এই কারণে কিছু বিরোধীদের এই দাবিটি একটি বিভ্রান্তি বা ভুল যে: "শরীয়তের (হুবহু) অনুকূল হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই।" এতে ভুল এবং বিভ্রান্তি রয়েছে যদি এর দ্বারা এমন উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, ইসলামী শরীয়ত এমন কোনো আংশিক বিধানকে গণ্য করবে না যার মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধিত হয় বা কোনো অকল্যাণ প্রতিহত হয়, যতক্ষণ না শরীয়ত স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করে এবং কুরআন বা সুন্নাহর নসসমূহ নিশ্চিতভাবে তার ওপর প্রমাণ পেশ করে। এই ধারণাটি অগ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে যদি "শরীয়তের অনুকূল হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই" কথার অর্থ এই হয় যে, সেই আংশিক বিধানসমূহ শরীয়তের মূল চেতনা ও এর সামগ্রিক মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে এবং একই সাথে তা শরীয়তের এমন কোনো বিস্তারিত নসের বিরোধী হবে না যা সাধারণ আইন হিসেবে প্রণীত হয়েছে; তবে "শরীয়তের অনুকূল হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই" কথাটি সঠিক ও সুদৃঢ়। স্বয়ং শরীয়ত একে সমর্থন করে এবং সাহাবীগণ, খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের কর্মপন্থা এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আর এই বিষয়গুলো বা আমি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি তা শেখ আবদুর রহমান তাজ বিরচিত 'আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ ওয়াল ফিকহুল ইসলামী' (শরয়ী রাজনীতি ও ইসলামী আইনশাস্ত্র) গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে, প্রথম সংস্করণ ১৩৭৩ হিজরী - ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, দারুত তালিফ, মিসর, পৃষ্ঠা: ১১।

এই বিষয়ে সারকথা হলো, উম্মাহর প্রয়োজনের নিরিখে কোনো বিধান একটি গ্রহণযোগ্য শরয়ী রাজনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে যদি তাতে দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকে:

প্রথম বিষয়: এটি শরীয়তের মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং এর সামগ্রিক মূলনীতি ও মৌলিক নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়: এটি যেন শরীয়তের কোনো বিস্তারিত দলিলের সাথে প্রকৃত অর্থে সাংঘর্ষিক না হয়। বিস্তারিত দলিল বলতে আমরা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসকে বুঝাচ্ছি। এই বিস্তারিত দলিলগুলোই সকল যুগে এবং সকল অবস্থায় মানুষের জন্য সাধারণ বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর ভিত্তিতে, যদি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াস থেকে এমন কোনো বিস্তারিত দলিল না থাকে যা রাজনীতির কোনো সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু নির্দেশ করে, অথবা যদি কোনো বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়ও কিন্তু তা যদি কেবল বাহ্যিক হয় এবং প্রকৃত না হয়, কিংবা যদি জানা যায় যে উক্ত বিস্তারিত দলিলের উদ্দেশ্য সাধারণ বিধান প্রণয়ন করা ছিল না বরং তা কোনো বিশেষ হিকমতের

কারণে অথবা এমন কোনো বিশেষ কারণের ভিত্তিতে ছিল যা ওই নির্দিষ্ট ঘটনা ব্যতীত অন্য কোথাও বিদ্যমান নেই; তবে এমতাবস্থায় রাজনীতির সেই সিদ্ধান্ত শরীয়তের দলিলসমূহ এবং ইসলামের বিধানসমূহের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে কিছু উদাহরণ:

আমরা যা আলোচনা করেছি তার প্রয়োগ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শরীয়তের পরিপন্থী নয়, বরং এগুলো শারঈ রাজনীতির বিধানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে:

প্রথম বিষয়: আমাদের নেতা আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক কুরআনকে একটি মুসহাফে সংকলিত করা। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উপলব্ধি করেছিলেন যে, কুরআনকে একটি মুসহাফে সংকলিত করার মধ্যেই জনকল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি এটি একারণেই করেছিলেন যে, মানুষের তথা মুসলমানদের কল্যাণ এটিই দাবি করছিল। আর এই জনকল্যাণের বিষয়টি শারঈ রাজনীতির অধ্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় বিষয়: উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক 'দিওয়ান' (দপ্তর) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। দিওয়ান বলতে বর্তমান সময়ের সরকারি দপ্তরসমূহকে বোঝায় যেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।

তাদের বেতন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, যা আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব প্রবর্তন করেছিলেন। এগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল না এবং আমাদের নেতা আবু বকর আস-সিদ্দিকের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সময়েও ছিল না। তবুও তিনি তা প্রবর্তন করেন; কারণ মুসলিমদের জনস্বার্থ ও কল্যাণ তা দাবি করেছিল। আর একে 'আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ' বা শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতির একটি বিধান হিসেবে গণ্য করা হয়। একইভাবে 'খারাজ' আদায়—যা ভূখণ্ডের ওপর ধার্যকৃত একটি কর—এটিও আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব প্রবর্তন করেছিলেন। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় কিংবা আবু বকর আস-সিদ্দিকের সময়ে এটি ছিল না। বরং উমর ইবনুল খাত্তাবই এটি প্রবর্তন করেন; কারণ মুসলিমদের জনস্বার্থ তা দাবি করেছিল এবং এর ওপর কেউ কোনো আপত্তি করেননি। এজন্যই এটি শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় বিষয়: ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআনের পাণ্ডুলিপি বা মুসহাফের সংখ্যা অনেক ছিল; কারণ তখন এটি স্বাভাবিক ছিল যে, প্রত্যেক সাহাবী নিজের কাছে এমন একটি মুসহাফ লিখে রাখতেন যা তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনেছেন। তবে যখন কিরাত বা পাঠপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে শুরু করল, তখন আমাদের নেতা উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি মাত্র মুসহাফ অবশিষ্ট রেখে বাকিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি এটি মুসলিমদের কল্যাণের লক্ষ্যে করেছিলেন, যখন তিনি দেখলেন যে এই একাধিক পাঠরীতির কারণে মুসলিমদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। তাই তিনি এই ফিতনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই তিনি একটি মুসহাফ রেখে বাকি সব বিনষ্ট করেন, আর এটিও ছিল শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতির একটি প্রকার—অর্থাৎ মুসলিমদের জনস্বার্থ রক্ষার খাতিরে।

চতুর্থ বিষয়: উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' বা যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য তাদের সদকার অংশ থেকে বঞ্চিত করা। যদিও কুরআনে তাদের এই অংশের বিষয়টি মহান আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল: "নিশ্চয়ই সদকা হচ্ছে কেবল অভাবগ্রস্ত, অসহায় ও সদকা আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য এবং যাদের অন্তর জয় করা

উদ্দেশ্য তাদের জন্য এবং দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৬০] এই সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও যে সেখানে 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'দের জন্য একটি অংশ রয়েছে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেবল শব্দের বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করেননি এবং তিনি কেবল শব্দের আক্ষরিক অর্থের ওপর স্থির থাকেননি।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

প্রথম পাঠ

তিনি মূল পাঠের নিহিত রহস্য ও এর মূল মর্মবাণী বিবেচনা করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে আয়াতটি 'মুআল্লাফাতু কুলুবিহিম' (যাদের অন্তর জয় করা কাম্য)-দের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছিল, তা সকল অবস্থা ও সময়ের জন্য পালনীয় কোনো সাধারণ শরীয়ত হিসেবে প্রবর্তিত হয়নি। বরং তা ছিল একটি বিশেষ হিকমত বা প্রজ্ঞা এবং এমন একটি সুনির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে যা আর অবশিষ্ট নেই। তিনি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন।" অর্থাৎ: ইসলামকে এই সকল মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের থেকে অভাবমুক্ত করেছেন।

অতঃপর উমর দেখলেন যে, মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের জন্য নির্ধারিত অংশটি আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের প্রয়োজনে আবশ্যক করেছিলেন, যাতে তারা মুসলিমদের সাহায্য ও সমর্থন করে অথবা গোত্রগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে না দেয়। সুতরাং যখন মুসলিমরা শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী হলো এবং সেই কারণটি দূরীভূত হলো যার প্রেক্ষিতে ওই অংশটি প্রদান করা আবশ্যক হয়েছিল; তখন ইমামের জন্য বৈধ হলো যে তিনি মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের সেই অংশটি বন্ধ করে মুসলিমদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ ও উপকারী খাতে তা ব্যয় করবেন।

এই কথাটি শায়খ আব্দুর রহমান তাজের 'ফিস সিয়াসাতিশ শারঈয়াহ' কিতাবে রয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে, মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের অংশটি সমূলে বাতিল হয়ে গেছে; বরং এর বিষয়টি সেই কারণটির থাকা বা না থাকার ওপর আবর্তিত হয়। অর্থাৎ: মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের অংশটি নিরঙ্কুশভাবে রহিত করা হয়নি, বরং এটি সেই কারণের ওপর নির্ভরশীল যার জন্য তা শরীয়তভুক্ত হয়েছিল। এটি প্রবর্তিত হয়েছিল যখন মুসলিমরা দুর্বল ছিল এবং তাদের জন্য এমন এক শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন ছিল যাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়; যাতে তারা মুসলিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং গোত্রগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে না তোলে।

কিন্তু যখন মুসলিমরা শক্তিশালী হওয়ার ফলে এই কারণটি আর বিদ্যমান থাকে না; তখন কারণটি না থাকায় সেই বিধানটিও আর প্রযোজ্য হয় না। কারণ কোনো বিধান তার কারণের (ইল্লত) অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সাথেই আবর্তিত হয়। এমনকি মুসলিমদের জন্য যদি পুনরায় তাদের অন্তর জয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়—যেমনটি ইসলামের সূচনালগ্নে প্রয়োজন ছিল—তবে ইমাম বা শাসকের জন্য এটি সঠিক হবে যে তিনি জনকল্যাণের নিরিখে মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের জন্য ব্যয় করবেন।

ইবনুল আরাবীর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে সদকার আয়াতের তাফসীরে এসেছে, তিনি বলেন: মুআল্লাফাতু কুলুবিহিমদের বিধান অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে—অর্থাৎ: তারা আর গ্রহণ করবে না...

শরয়ী রাজনীতি - প্রথম পাঠ

সদকা বা যাকাতের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অংশ নেই - একদল আলেম একথাই বলেছেন এবং ইমাম মালিক (রা.) এটিই গ্রহণ করেছেন। আবার তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন: তারা অবশিষ্ট আছে; কারণ ইমামের হয়তো ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য মানুষের অন্তর জয় করার প্রয়োজন হতে পারে। আর উমর (রা.) এটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন যখন তিনি ইসলামের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছিলেন। আমার নিকট ইবনুল আরাবীর বক্তব্যটি সঠিক - তিনি বলেছেন: যদি ইসলাম শক্তিশালী হয় তবে তাদের যাকাত থেকে অংশ দেওয়া হবে না। আর যদি তাদের প্রয়োজন পড়ে, তবে তাদের অন্তর জয় করার জন্য অংশ দেওয়া হবে, যেমনটি নবী (সা.) করতেন।

এই বক্তব্যটি ইবনুল আরাবী রচিত 'আহকামুল কুরআন' থেকে উদ্ধৃত, যা বৈরুতের দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩০।

আবার কেউ কেউ বলেন: বর্তমানেও যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন তাদের যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। কারণ কিছু মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে তার পরিবার ও স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কখনো কখনো সে কর্মহীন হয়ে পড়ে; এমতাবস্থায় তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং জাগতিক ফিতনা বা প্রলোভন থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য যাকাতের অর্থ থেকে তাদের প্রদান করা তাদের অধিকার। এই মতটি ড. আব্দুল খালিক আন-নাওয়াবী তার গ্রন্থ 'ইসলামি অর্থব্যবস্থা'-এর প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ, মাকতাবাতুল আনজালো আল-মিসরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৮০-তে ব্যক্ত করেছেন।

পঞ্চম বিষয়: আমাদের নেতা উসমান বিন আফফান (রা.) হারানো উটের ব্যাপারে যা করেছিলেন। তিনি সেগুলোর পরিচয়ের ঘোষণা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন; যদি মালিক তার সন্ধান পায় তবে সে তা গ্রহণ করবে, আর যদি মালিক পাওয়া না যায় তবে সেগুলো বিক্রি করে তার মূল্য সংরক্ষণ করা হবে। অথচ এটি নবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.)-এর সময়ের প্রচলিত আমল অনুযায়ী ছিল না। উসমান (রা.)-এর সময়ের আগে হারানো উটগুলোকে ছেড়ে রাখা হতো, কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করত না, যতক্ষণ না মালিক সেগুলোর সন্ধান পেত। আমাদের নেতা উসমান (রা.) কেবল সেই শব্দের বাহ্যিক অর্থের ওপর সীমাবদ্ধ থাকেননি যা যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট কুড়ানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: ((তুমি এর থলি ও এর বাঁধন চিনে রাখো, তারপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দাও; এরপর যদি তার মালিক আসে তবে তাকে দিয়ে দাও, অন্যথায় তুমি তা তোমার ইচ্ছামতো ব্যবহার করো।))

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

জনৈক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! হারানো বকরি সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? তিনি বললেন: “তা তোমার, অথবা তোমার ভাইয়ের, অথবা নেকড়ের।” অর্থাৎ: তুমি যদি তা গ্রহণ না করো তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে অন্য কেউ তা নিয়ে যাবে অথবা

নেকড়ে তা খেয়ে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেটি গ্রহণ করতে এবং এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর সেই ব্যক্তি বলল: হারানো উট সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? তিনি বললেন: "উটের সাথে তোমার কী কাজ? তার সাথেই তো তার পানির আধার ও পায়ের তলা রয়েছে; সে পানির ঘাটে পৌঁছাবে এবং গাছপালা ভক্ষণ করবে, যতক্ষণ না তার মালিক তাকে খুঁজে পায়।"

হারানো উট সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে, উট ধরা যাবে না এবং কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। বরং সেটিকে তার নিজ স্থানেই ছেড়ে দিতে হবে যেন তার মালিক তার কাছে আসতে পারে। কারণ উটের ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা নেই; তার সাথে পানি পানের ব্যবস্থা ও পায়ের সুরক্ষা রয়েছে এবং সে নিজের খাদ্য নিজেও সংগ্রহ করতে পারে। ফলে উটের ক্ষেত্রে হারানোর ভয় নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এই নীতিই অনুসৃত হতো এবং আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগেও সকলে এর ওপরই আমল করেছেন। কিন্তু আমাদের নেতা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শরয়ী পাঠের বাহ্যিক রূপের ওপর স্থির থাকেননি, বরং বাহ্যিকভাবে তিনি এর বিপরীত আমল করেছেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উটের ক্ষেত্রে যে নিরাপত্তা ছিল, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সেই প্রেক্ষাপট আর অবশিষ্ট ছিল না। বরং উট হারিয়ে যাওয়ার এবং মানুষের লোভাতুর হাত সেদিকে প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। যখন তিনি দেখলেন যে মানুষের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি ও খোদাভীতি হ্রাস পেয়েছে, তখন তিনি উটগুলোকে একত্র করার এবং সেগুলো বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন, যাতে সেগুলোর মূল্য মালিকদের জন্য সংরক্ষিত থাকে অথবা মালিকের খোঁজ না পাওয়া গেলে তা মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

সুতরাং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহ্যিকভাবে এই হাদিসের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি এর মূল মর্মার্থের সাথেই সংলগ্ন ছিলেন এবং এর চেতনাকেই ধারণ করেছিলেন। কারণ যে প্রেক্ষাপটের কারণে উট ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উটের ব্যাপারে কোনো ভয় ছিল না কারণ তখন মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভয় পেত এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে এই ধর্মীয় অনুভূতি ও খোদাভীতি শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের নেতা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে মূল হাদিসে যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছিল তা পরিবর্তিত হয়েছে, তাই তিনি পরিস্থিতির প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই পদক্ষেপ শরীয়তের সাধারণ মূলনীতিসমূহের সাথে কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক নয়।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
প্রথম পাঠ

যা মানুষের ধন-সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এসেছে; কেননা ধন-সম্পদ রক্ষা করা সেই পাঁচটি মৌলিক অপরিহার্য বিষয়ের (মাকাসিদ) অন্তর্ভুক্ত যা সংরক্ষণের জন্য সকল শরীয়ত প্রেরিত হয়েছে। আর সেগুলো হলো: দ্বীন রক্ষা, জীবন রক্ষা, বিবেক রক্ষা, সম্পদ রক্ষা এবং মান-সম্মান রক্ষা।

আমাদের নেতা উসমান ইবন আফফান যখন কোনো নস (মূল পাঠ) বা টেক্সটের বিধান অথবা হাদীসে বর্ণিত কোনো বিধানের বাহ্যিক রূপ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন, তখন তিনি মূলত মুসলিমদের জনকল্যাণের বিষয়টিই বিবেচনা করেছিলেন; আর 'আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ' বা শরীয়তসম্মত রাজনীতির দাবিও মূলত এটাই।

সারসংক্ষেপ: জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো ব্যবস্থা বা বিধানের ক্ষেত্রে এ কথা বলা সঠিক হবে না যে, এটি শরীয়তের পরিপন্থী; শুধুমাত্র কোনো দলীলের সাথে এর আপাত বৈপরীত্য লক্ষ্য করার ভিত্তিতেই এমনটি বলা যাবে না। বরং সেই দলীলসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক, সেগুলোর মূল চেতনা (রূহ) উপলব্ধি করা, শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ (মাকাসিদ) ও বিধান প্রবর্তনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করা এবং বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ বিধান ও অপরিবর্তনীয় সাধারণ বিধানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা জরুরি। কারণ দ্বিতীয় প্রকারের (সাধারণ ও অপরিবর্তনীয় বিধান) বিরোধিতা করাই ক্ষতিকর এবং তা কোনো বিষয়কে ইসলামের শরীয়তের পরিমণ্ডলে 'সিয়াসা' হিসেবে গণ্য করার পথে প্রতিবন্ধক।

এভাবেই উমর (রা.) এবং উসমান (রা.)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, তাঁরা নির্ধারিত নস বা বিধানসমূহ থেকে যা কিছু চয়ন করেছিলেন, তা ছিল মূলত দলীলসমূহ সম্পর্কে তাঁদের গভীর প্রজ্ঞা এবং দলীলের মূল স্পৃহা ও বিধান প্রবর্তনের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনেরই ফসল। আর এই কারণেই সিয়াসা শারঈয়াহর অধ্যায়ে এমন বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার লক্ষ্য হলো প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি স্থানে মুসলিমদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না।

এখানে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো, এই সিয়াসাহ বা রাজনীতিকে ‘শারঈয়াহ’ (শরীয়তসম্মত) বলে বিশেষায়িত করা হয়েছে; কারণ শাসক নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীতে যে ইজতিহাদ বা গবেষণা করেন, তা নিছক প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে নয়, বরং তা শরীয়তসম্মত মূলনীতি ও স্বীকৃত নিয়মনীতির আলোকেই সম্পন্ন হয়।

দ্রষ্টব্য: (ডক্টর আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহাম্মদ আল-ক্বাযী রচিত আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ, পৃষ্ঠা ৩৬৬; এবং শায়খ আব্দুর রহমান তাজ, পৃষ্ঠা ১৮ ও পরবর্তী)।

শরয়ী রাজনীতি

প্রথম পাঠ

ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাভী এই প্রসঙ্গে বলেন: "নিশ্চয়ই শরয়ী রাজনীতি হলো সেই রাজনীতি যা শরীয়তের রাজনীতি, এর বিধানাবলী এবং এর নির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা সকল রাজনীতিকেই শরয়ী বলে গণ্য করি না; কেননা অনেক রাজনীতিই শরীয়তের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদের প্রবর্তকদের কল্পনা ও প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে পরিচালিত হয়।" (ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাভীর 'আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ' গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)।

শরয়ী রাজনীতি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহ

শরয়ী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ মূলত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত:

প্রথমত: শাসিতের সাথে শাসকের সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি; যেমন শাসকের ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ, তার অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করা, প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগসমূহ (আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ) নিয়ে আলোচনা করা।

ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এই বিষয়গুলো মূলত 'শরয়ী রাজনীতি বিজ্ঞান' (ইলমে সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ) বিন্যস্ত করে। এই কারণেই কুরআন ও সুন্নাহর নস বা পাঠসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংগঠনের বিস্তারিত অনেক বিষয়ে অবতীর্ণ হয়নি; বরং কেবল কিছু সাধারণ মূলনীতি ও সাধারণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে উম্মতের জন্য এটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে যাতে তারা এমন একটি কাঠামো বেছে নিতে পারে যা তাদের জনস্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাই শাসিতের সাথে শাসকের সম্পর্কের বিবরণ ইসলামি রাষ্ট্রের জনস্বার্থের অনুগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই জনস্বার্থসমূহ মূলত শরয়ী রাজনীতি বিজ্ঞানই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অনুরূপভাবে শাসকের ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, শাসকের ওপর প্রজাদের অধিকার এবং শাসকের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ—এই সব বিষয়ই শরয়ী রাজনীতি বিজ্ঞান বিন্যস্ত করে। ইসলাম যখন এই বিষয়গুলোকে শরয়ী

রাজনীতি বিজ্ঞানের ওপর ছেড়ে দিয়েছে, তখন তার মাধ্যমে এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, ইসলামি শরীয়ত নমনীয় ও গতিশীল এবং এটি প্রতিটি যুগে বাস্তবায়নের উপযোগী।

শরয়ী রাজনীতি
প্রথম পাঠ

...এবং স্থানের ক্ষেত্রে; সুতরাং আমাদের জন্য ইসলামে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ রয়েছে, তবে যে পদ্ধতিতে তা সম্পন্ন হবে, ইসলাম এ সব কিছুই (মানুষের বিবেচনার ওপর) ছেড়ে দিয়েছে।

অধিকার ও কর্তব্যসমূহ মুসলিমদের কল্যাণ এবং মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত; সেজন্য এটি আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি এই বিষয়গুলোকে (সুনির্দিষ্ট না করে) ছেড়ে দিয়েছেন এবং এতে জনকল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে ইজতিহাদ করার অবকাশ রয়েছে। শাসকের সাথে শাসিতদের সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট এই বিষয়গুলো এবং শাসকের ক্ষমতা নির্ধারণ, তার অধিকার ও কর্তব্য বর্ণনা করা, প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ স্পষ্ট করা, বিভিন্ন বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ এবং এই প্রতিটি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী বর্ণনা করা—ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে যা "ইসলামে শাসন ব্যবস্থা" নামে অভিহিত, এটি তারই অন্তর্ভুক্ত। আর ইসলামে শাসন ব্যবস্থা বর্তমান মানবরচিত ব্যবস্থার "সাংবিধানিক আইন" এর সমতুল্য।

দ্বিতীয়ত: শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী; একেই বলা হয়: "ইসলামে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা"। ইসলামে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যা অন্যদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং যা এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই সম্পর্কের ভিত্তি মূলত পারস্পরিক সম-আচরণের ওপর নির্ভরশীল। আর অন্য দেশগুলোর সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের আচরণের মূল ভিত্তি হলো শান্তি, যুদ্ধ নয়। এবং ইসলামি রাষ্ট্র অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধের আশ্রয় নেয় না, যেমন আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। এই সবকিছুই "ইসলামে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা" নামক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। এটি অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিটি স্পষ্ট করেছে, আর তা হলো—এই সম্পর্ক শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও এটি বর্ণনা করেছে যে, যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলিমদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে; তবে যুদ্ধাবস্থায় মুসলিমরা অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের পদ্ধতি কী হবে এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বর্ণনায় শরয়ী রাজনীতি ভূমিকা রাখে। আর এই সবকিছুই যা নিয়ন্ত্রণ করে...

প্রথম পাঠ: সিয়াসাহ শারইয়্যাহ

সিয়াসাহ শারইয়্যাহর মূলনীতিসমূহ; কেননা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর শাস্ত্রটি মুসলিম উম্মাহর জনকল্যাণ সাধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যেহেতু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, তাই আমাদের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, শত্রুরা আমাদের সাথে কেমন আচরণ করছে। আমাদেরও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা উচিত যেমনটি তারা আমাদের সাথে করে থাকে। এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতার নীতিরই একটি প্রয়োগ। ইসলামের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এই আইনের সমান্তরালে মানব রচিত আইনে একটি আইন রয়েছে যাকে বলা হয়: আন্তর্জাতিক আইন।

সুতরাং মানব রচিত ব্যবস্থাগুলোতে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইনের বিপরীতে আমাদের নিকট রয়েছে ইসলামের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। বরং শরীয়াহর ফকীহগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, চাই তা শান্তিকালীন হোক কিংবা যুদ্ধকালীন। এমনকি সম্ভবত পশ্চিমা ব্যবস্থাগুলো এই বিধানগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে এবং তাদের আন্তর্জাতিক আইনে তা গ্রহণ করেছে।

তৃতীয়ত: কর এবং অর্থ সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; যেমন ট্যাক্স, যাকাত, খারাজ এবং উশর—এই সবকিছুই সিয়াসাহ শারইয়্যাহর শাস্ত্রের মাধ্যমে সুসংগঠিত হয়েছে। একইভাবে রাষ্ট্রের সম্পদ, সাধারণ ব্যয় এবং বায়তুল মালের ব্যবস্থা—এসবই সিয়াসাহ শারইয়্যাহর বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এটি এমন একটি আইনের অন্তর্ভুক্ত যাকে বলা হয়: ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থা। কেননা ইসলামে আর্থিক ব্যবস্থা মূলত সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। কারণ আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি যে, আর্থিক ব্যবস্থা এবং প্রতিটি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করা; আর একারণেই বিষয়টি সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ইলমের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থার বিপরীতে মানব রচিত ব্যবস্থাগুলোতে রয়েছে জন-অর্থায়ন (পাবলিক ফাইন্যান্স) শাস্ত্র। এর অর্থ হলো, প্রাচীন মুসলিম ফকীহগণ এই বিষয়গুলো সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের ফকীহদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। যদি তাদের নিকট জন-অর্থায়ন শাস্ত্র থেকে থাকে, তবে আমরা তাদের বলি: ইসলামি শরীয়াহতে চৌদ্দশ বছরেরও বেশি সময় পূর্বেই ফকীহগণ ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থত: অর্থ আদান-প্রদান এবং এই অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী। এটিই ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ফকিহগণ এটি সুস্পষ্ট করেছেন এবং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা ইসলামী মুদারাবা এবং মুজারাআ ও মুসাকাতসহ বিভিন্ন পন্থায় অর্থ বিনিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা ফকিহগণের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান। ইসলামের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি মানবরচিত ব্যবস্থাসমূহের 'অর্থনীতি' নামক বিষয়ের সমান্তরাল। মানবরচিত ব্যবস্থায় বিদ্যমান অর্থনীতির পূর্বেই ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে; কেননা মুসলিম ফকিহগণ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা ইসলামী মুদারাবা, এর শর্তাবলী এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বিনিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন— ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চমত: বিচার ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি এবং প্রমাণের উপায়সমূহের বর্ণনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী। এই সব কিছুই শরিয়াহসম্মত রাজনীতি শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই বিষয়গুলো সমাজের অবস্থা, বিবর্তন ও বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। এই কারণেই বিচার ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি, বিশেষায়িত ও সাধারণ বিচার ব্যবস্থা, বিচারের প্রকারভেদ এবং স্বীকৃতি (ইকরার), সাক্ষ্য (শাহাদাত) ও নরহত্যার ক্ষেত্রে কাসামাহসহ প্রমাণের বিভিন্ন মাধ্যম এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মাধ্যমগুলো মানুষের অধিকার রক্ষা করে এবং এতে কারো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। মুসলিম ফকিহগণ এই বিচার ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন এবং এর বিন্যাসে শরিয়াহসম্মত রাজনীতি শাস্ত্রের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ইসলামের এই বিচার ব্যবস্থাটি মানবরচিত ব্যবস্থায় 'দেওয়ানি

ও বাণিজ্যিক কার্যবিধি আইন' নামক আইনের সমান্তরাল।

প্রথম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (শারঈ রাজনীতি)

এবং বাণিজ্যিক বিষয়াবলি মানব রচিত আইনে বিদ্যমান রয়েছে; অথচ মুসলিম ফকীহগণ বহু পূর্ব থেকেই এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ বিষয়ে অগ্রসর ছিলেন। ইসলামে এটি অত্যন্ত সুচারুভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বরং এই দেওয়ানি ও বাণিজ্যিক কার্যধারা নিয়ন্ত্রণকারী মানব রচিত আইনসমূহ মুসলমানদের এই পদ্ধতির মাধ্যমেই প্রভাবিত হয়েছে।

বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত এই বিশেষ বিষয়গুলো আমাদের প্রাচীন ফকীহগণ তাঁদের বিভিন্ন মাযহাব ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সাধারণ ফিকহী অধ্যায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করেছেন। তবে আমরা কিছু ফকীহকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে দেখেছি; যেখানে এই বিষয়ে অধিকতর বিশেষায়ন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ফকীহদের মধ্যে আমরা এমন কিছু ব্যক্তিত্বকে পেয়েছি যারা এই বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন অথবা এই বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এ বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করেছেন। এজন্যই বিচার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগীয় বিন্যাস এবং প্রমাণের মাধ্যমসমূহ সম্পর্কে আমরা বিশেষায়িত কিতাবসমূহ পেয়েছি। উদাহরণস্বরূপ: শাফেঈ মাযহাবের ইমাম মাওয়ার্দী রহ.-এর ‘আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ’ কিতাবটি। এই কিতাবে তিনি বিচার বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট অনেক আহকাম বর্ণনা করেছেন অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় কাঠামো স্পষ্ট করেছেন। বরং তিনি এতে ইসলামী রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগও বর্ণনা করেছেন: আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। অনুরূপভাবে তিনি এতে ইসলামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ইসলামী প্রশাসনিক নীতিমালার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সেখানে তিনি উজিরাতের (মন্ত্রণালয়) প্রকারভেদ অর্থাৎ উজিরাতুত তাফবীদ (ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়) ও উজিরাতুত তানফীয (নির্বাহী মন্ত্রণালয়) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—যেমনটি আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত দেখতে পাব।

অনুরূপভাবে আবু ইয়ালা আল-হাম্বলী রহ.-এর ‘আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ’ নামে একটি কিতাব রয়েছে। তিনিও এতে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তদ্রূপ প্রখ্যাত হাম্বলী আলেম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.-এর ‘আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ফী ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইয়্যাহ’ কিতাবটি রয়েছে। তিনি এই শারঈ রাজনীতিতে সেই সাধারণ মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা মুসলিম শাসকদের অনুসরণ করা উচিত; চাই তা জনগণের ওপর শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক কিংবা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে, প্রজ্ঞাপূর্ণ শারঈ রাজনীতি হলো সেটিই যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

ইসলামি রাজনীতি (আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ)

এছাড়াও সিয়াসাতে শারইয়্যাহ বা ইসলামি রাজনীতি বিষয়ে বিশেষভাবে রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে শায়খ আব্দুর রহমান তাজের 'আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ওয়াল ফিকহুল ইসলামি' (ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি ফিকহ) গ্রন্থটি অন্যতম। তিনি এই কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইসলামি রাষ্ট্রে সরকারকে অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'আল-হিসবাহ' নামেও একটি গ্রন্থ রয়েছে। আবার বিচারিক পদ্ধতি ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে রচিত ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহর একটি গ্রন্থ রয়েছে, যেখানে তিনি বিচারিক পদ্ধতিসমূহ, বিচার ব্যবস্থা এবং ইসলামি ফিকহে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমগুলো নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষায়িত গ্রন্থাবলি রয়েছে, যেমন ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ'; 'খারাজ' হলো মূলত ভূমির ওপর ধার্যকৃত কর। একইভাবে ইয়াহইয়া ইবনে আদম আল-কুরাশির 'কিতাবুল খারাজ' এবং আবু উবাইদ বিন সাল্লামের 'আল-আমওয়াল' নামক গ্রন্থগুলোও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত বিষয় সাধারণভাবে সিয়াসাতে শারইয়্যাহ বা ইসলামি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে এবং সিয়াসাতে শারইয়্যাহ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলিকে তুলে ধরে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সারসংক্ষেপে উপনীত হতে পারি যে: সিয়াসাতে শারইয়্যাহর মূল লক্ষ্য হলো দ্বীনি শৃঙ্খলার মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের বিষয়াবলি সুচারুভাবে পরিচালনার পথ খুঁজে বের করা এবং ইনসাফপূর্ণ রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। এটি বিভিন্ন যুগ ও ভূখণ্ডে মানুষের জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ইসলামি শরীয়াহর সাধারণ মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতি রেখে সর্বাবস্থায় সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সক্ষমতা রাখে। এর অর্থ হলো, আমরা সিয়াসাতে শারইয়্যাহ থেকে বিমুখ হতে পারি না। কেননা সিয়াসাতে শারইয়্যাহ মূলত মুসলিম উম্মাহর জীবনের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটায়। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে এবং দলিলের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করে যে, ইসলামি শরীয়াহ প্রগতিশীল এবং মহান আল্লাহ যতদিন এই পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী না হবেন (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত), ততদিন এটি সকল কালে ও সকল স্থানে বাস্তবায়নের উপযোগী।

প্রথম পাঠ

সিয়াসা শরইয়্যাহর গ্রহণযোগ্যতার দলীলসমূহ

শরীয়ত কর্তৃক প্রণীত বিধানসমূহে মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা:

এমন অনেক দিক রয়েছে যা সিয়াসা শরইয়্যাহর গ্রহণযোগ্যতার সাক্ষ্য দেয় অথবা প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের জন্য সিয়াসা শরইয়্যাহকে অবহেলা করা অনুচিত। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বিধানগুলো গ্রহণ করা তাদের জন্য আবশ্যক। এই বিষয়টি শাইখ আব্দুর রহমান তাজ-এর ‘আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ’ কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সিয়াসা শরইয়্যাহর গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশকারী প্রাথমিক দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

প্রথমত: আমরা পূর্ববর্তী আসমানি শরীয়তগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে, সেগুলো বিভিন্ন জাতির কল্যাণ এবং প্রতিটি সময়ের

প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখত। ফলে পরিস্থিতি ও অবস্থার পরিবর্তনের কারণে পূর্ববর্তী কোনো শরীয়তের বিধান পরবর্তী শরীয়তের বিধানে পরিবর্তিত হতো। এর উদাহরণস্বরূপ:

বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবারের দিন কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং পশুর কিছু চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল, যদিও তাদের পূর্ববর্তীদের জন্য তা হালাল ছিল। এরপর আবার তাদের পরবর্তীদের জন্য তা হালাল করে দেওয়া হয়। এর অর্থ হলো—শনিবার কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং পশুর কিছু চর্বি হারাম হওয়া—এই বিষয়গুলো কেবল নির্দিষ্ট একদল মানুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল, অন্যদের ওপর নয়। সম্ভবত এর কারণ ছিল পরিস্থিতি ও অবস্থার পরিবর্তন। আর এটি যদি কোনো কিছু নির্দেশ করে থাকে, তবে তা সিয়াসা শরইয়্যাহর নীতি গ্রহণ করাকেই নির্দেশ করে।

যেন শরীয়তসমূহ স্বয়ং সিয়াসা শরইয়্যাহর মূলনীতি অনুসরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে। আর তা হলো—সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তন হওয়া, যা পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে বিদ্যমান ছিল অথবা সেখানে এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। এর আরেকটি উদাহরণ হলো: মানব ইতিহাসের শুরুর দিকে একজন পুরুষের জন্য তার বোন বা ফুফুকে বিয়ে করা হালাল ছিল। পরবর্তীতে যখন বংশধারা বিস্তৃত হলো এবং মানবজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তা হারাম করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ—প্রথমে একজন পুরুষের জন্য তার বোন বা ফুফুকে বিয়ে করা বৈধ ছিল, কিন্তু তা ছিল একটি নির্দিষ্ট কারণে, যা...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
প্রথম পাঠ

বংশধারা বা মানবজাতির সংখ্যা যখন পর্যাপ্ত ছিল না, তখন কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু যখন মানবজাতি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল এবং মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল, তখন একজন পুরুষের জন্য তার বোন বা ফুফুকে বিবাহ করার বৈধতার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকল না।

অতএব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিধান পরিবর্তিত হয়েছে। আর বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে ইসলামী শরীয়ত—যা সকল শরীয়তের পরিসমাপ্তি—মানুষের অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, যদি পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে কিছু বিধানের রদবদল হয়ে থাকে, তবে ইসলামী শরীয়ত এ ক্ষেত্রে অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ ইসলামী শরীয়ত হলো সর্বশেষ শরীয়ত এবং আল্লাহ তাআলা একে চূড়ান্ত শরীয়ত হিসেবেই নির্ধারণ করেছেন। তাই সমসাময়িক ঘটনাবলি ও নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে একে মানানসই হতে হবে। আমি বলছি: পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের ক্ষেত্রে যদি বিষয়টি এমন হয়ে থাকে, তবে ইসলামী শরীয়ত যা সকল শরীয়তের সমাপ্তি, তাকে অবশ্যই মানুষের অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং নতুন নতুন চাহিদাসমূহ পূরণ করতে হবে। আর এই কাজটি মূলত আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ বিভাগ বা সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞানই আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই: সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞান মূলত এটিই নিশ্চিত করে যে, ইসলামী শরীয়ত সর্বকালে ও সর্বস্থানে প্রয়োগের উপযোগী। কারণ এমন কোনো বিষয় বা ঘটনা নেই যার জন্য সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞান কোনো উপযুক্ত বিধান খুঁজে পায় না।

দ্বিতীয়ত: খোদ ইসলামী শরীয়তের মধ্যেই এটি স্বীকৃত যে, শরীয়ত তার প্রবর্তিত বিধানসমূহে শুরু থেকেই পরিস্থিতির ভিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই কারণেই সাক্ষ্য প্রদানের (শাহাদাত) ক্ষেত্রে এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যা সংবাদ বর্ণনার (রিওয়ায়াত) ক্ষেত্রে করা হয়নি। অর্থাৎ, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ফকীহগণ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, নির্দিষ্ট কিছু শর্তারোপ করেছেন এবং সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা বা 'আদালত' নিশ্চিত করাসহ আরও অনেক শর্ত দিয়েছেন। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে বা সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা

এমন শর্তারোপ করেননি।

সুতরাং ইসলামী শরীয়ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিবেচনা করেছে। তাই এটি সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এমন সব শর্তারোপ করেছে যা বর্ণনার ক্ষেত্রে করেনি। কারণ মানুষের মধ্যে সাধারণত যে প্রতিযোগিতা ও শত্রুতা বিরাজমান থাকে, যা হয়তো তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে...

ইসলামি আইনি নীতি (সিয়াসা শারইয়্যাহ)
প্রথম পাঠ

...তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যায় সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করে, যদিও তা সত্য নয়। এই কারণেই ব্যভিচারের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এমন কঠোর শর্তারোপ করা হয়েছে যা হত্যার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে করা হয়নি।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে ফকিহগণ (আইনবিদগণ) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্যের জন্য অবশ্যই চারজন সাক্ষী থাকতে হবে। অথচ হত্যার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে মাত্র দুইজন সাক্ষীই যথেষ্ট। এর কারণ হলো, শরিয়ত মূলত মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানুষ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে তা বিবেচনা করে। আর এটিই ইসলামি আইনি নীতির (সিয়াসা শারইয়্যাহ) গুরুত্বের সাক্ষ্য দেয়।

তৃতীয়ত: শরিয়ত 'রুখসা' (বিশেষ ছাড়) প্রদানের মাধ্যমে পরিস্থিতির ভিন্নতাকেও বিবেচনা করেছে। এর অর্থ হলো, আমাদের এখানে 'রুখসা' (ছাড়ের বিধান) এবং 'আযিমাহ' (মূল বিধান)—উভয় প্রকারের বিধানই বিদ্যমান। ইসলামি শরিয়ত কিছু মানুষের জন্য বিশেষ ছাড়ের অনুমতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ছাড়গুলো 'আযিমাহ' বা মূল বিধিবদ্ধ হুকুমের সাথে বাহ্যত সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। তবে ইসলামি শরিয়ত মানুষের প্রয়োজনে এবং তাদের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে বিধান শিথিল করেছে এবং তাদের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“রমজান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সুপথপ্রাপ্তির সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেন তাতে রোজা রাখে।” [আল-বাকারা: ১৮৫]

কিন্তু আমরা দেখি যে, কোনো ব্যক্তি যদি সফরে থাকে, তবে এমতাবস্থায় ইসলামি শরিয়ত মুসাফিরের জন্য রমজানের দিনে রোজা না রাখার (ইফতার করার) অনুমতি দিয়েছে। যদিও রোজা রাখা তার ওপর বাধ্যতামূলক ছিল, তথাপি শরিয়ত তাকে ছাড় দিয়েছে এবং সে মুসাফির অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি পেয়েছে।

সুতরাং ইসলামি শরিয়ত যখন বিধান শিথিল করে এবং এ ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করে, তখন তা ওই মুসাফিরের জান-মাল ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার লক্ষ্যেই করে থাকে। কারণ সফরে কষ্ট রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “সফর বা ভ্রমণ হলো যন্ত্রণার একটি অংশ।”

অতএব, ইসলামি শরিয়ত তার বিশেষ ছাড় সংক্রান্ত বিধানগুলোর মাধ্যমে মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ রক্ষা করেছে, তাদের কষ্ট লাঘব করার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং তাদের থেকে কাঠিন্য দূর করেছে। আর এগুলো সবই ইসলামি আইনি নীতি বা 'সিয়াসা শারইয়্যাহ' বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পাঠ

চতুর্থত: বর্তমান এই শেষ যুগে মানুষের অবস্থা ইসলামের সূচনালগ্নের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতিগুলোর মধ্যে এমন সব সামাজিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে যা এমন ধরনের প্রতিকার দাবি করে যা এই জাতিগুলোর সংশোধনের উপযোগী হয় এবং তাদের বর্তমান অবস্থা ও যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; যাতে সেইসব ত্রুটি ও ব্যাধি দূরীকরণে তা অধিক কার্যকর হয়। তবে শর্ত হলো, এটি যেন ইসলামের কোনো মূলনীতির পরিপন্থী না হয়।

এজন্য উলামায়ে কেরাম সাক্ষ্য প্রদানের অধ্যায়ে বলেন: যদি কোনো জনপদে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া না যায়, তবে তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সৎ এবং যাদের পাপাচার সবচেয়ে কম, তাদেরকেই সাক্ষ্যের জন্য মনোনীত করা হবে। বিচারক এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; যাতে জনস্বার্থ বিঘ্নিত না হয় এবং মানুষের অধিকার ও আইনি বিধানসমূহ অকার্যকর হয়ে না পড়ে।

এর অর্থ হলো: ফকীহগণ যদিও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন, এমনকি কিছু ফকীহ কেবল বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাতেই সন্তুষ্ট হননি, বরং তারা বলেছেন: মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। একারণেই বিচারকের অধীনে 'সাক্ষীদের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা যাচাইকারী' (মুযাক্কীন) নামক একটি পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। এই যাচাইকারীদের দায়িত্ব ছিল বিচারক তাদের কাছে কোনো সাক্ষীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা সেই সাক্ষীর ব্যক্তিগত ও গোপন বিষয়গুলো অনুসন্ধান করতেন। যদি যাচাইকারীগণ বলতেন যে, বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও সে সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয়, তবে সেই অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না।

সারকথা: ফকীহগণ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন এবং সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্তারোপ করতেন। এটি আল্লাহর কিতাব থেকে গৃহীত হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন: "তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী রাখো।" [সূরা আল-বাকারা: ২৮২]

এজন্য ফকীহগণ বলেছেন: এই বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা অপরিহার্য। কিন্তু মহাকালের আবর্তনে, মানুষের ধর্মীয় চেতনা থেকে বিচ্যুতি এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণার অভাবের কারণে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা হয়তো এখন আর খুঁজে পাব না...

একজন মানুষ সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং সে উচ্চ পর্যায়ের ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) গুণসম্পন্ন, যেমনটি ফকিহগণ দাবি করেছেন এবং যার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। এমতাবস্থায় করণীয় কী? অধিকারসমূহ কি খর্ব হতে দেওয়া হবে এবং আমরা কি কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না? আর বিচারক কি প্রমাণের জন্য এই দলিল অর্থাৎ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না—যা কি না স্বীকারোক্তির পরে আসে—নাকি আমরা কী করব? অধিকারসমূহ কি অকার্যকর হয়ে পড়বে, নাকি মানুষের বর্তমান অবস্থার সাথে সংগতি রেখে আমরা একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করব? আর তা হলো, আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করব যারা ন্যায়পরায়ণ (আদিল) নয়, তবে আমরা তাদের মধ্য থেকে তুলনামূলক কম দুর্নীতিপরায়ণ এবং কম পাপাচারী ব্যক্তিকে বেছে নেব।

নিশ্চয়ই বিজ্ঞ সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বলে: আমরা ঐ সকল লোকেদের সাক্ষ্য গ্রহণ করব যারা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতার স্তরে পৌঁছেনি। কেননা, যে সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে কম পাপাচারী ও সবচেয়ে কম পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা বৈধ; যাতে সে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারে এবং বিচারক এই সাক্ষ্য গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে পারেন। ন্যায়পরায়ণতাহীন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ বৈধ হওয়ার এই বিষয়টি বা বক্তব্যটি মূলত সিয়াসাহ শারইয়্যাহর কারণেই আমরা বলছি। কিন্তু আমরা যদি সাধারণ মূলনীতিসমূহ এবং ফকিহগণের বক্তব্যের আলোকে চলতাম, তবে ন্যায়পরায়ণতাহীন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতাম না। কিন্তু সিয়াসাহ শারইয়্যাহ আমাদের বলে: মানুষের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, আমরা সাক্ষ্য প্রদানের দুয়ার বন্ধ না করি এবং প্রমাণের এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম অর্থাৎ সাক্ষ্যকে অকার্যকর না করি। আর এই কারণেই আমরা ন্যায়পরায়ণতাহীন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে সাক্ষ্যদানের বিষয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম দুর্নীতিগ্রস্ত ও কম পাপাচারী ব্যক্তিকে নির্বাচন করি।

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। ফকিহগণ বিচারকের জন্য অনেকগুলো শর্তারোপ করেছেন, যার শীর্ষে রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা। সাক্ষীর ক্ষেত্রে যদি ন্যায়পরায়ণতা শর্ত হয়, তবে বিচারকের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রয়োজনীয় এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা যদি ধরে নিই যে, মানুষের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমরা ফকিহগণের বর্ণিত শর্তাবলি সম্পন্ন কোনো বিচারক খুঁজে পাচ্ছি না; উদাহরণস্বরূপ—অধিকাংশ ফকিহ শর্তারোপ করেছেন যে বিচারককে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে। কিন্তু যদি আমরা এমন এক স্তরে পৌঁছাই যেখানে দেখা যায় যে মানুষের মধ্যে কোনো মুজতাহিদ বিচারক পাওয়া যাচ্ছে না, তবে এমন পরিস্থিতিতে করণীয় কী? আমরা কি বিচারব্যবস্থার দুয়ার বন্ধ করে দেব, নাকি আমরা একজন বিচারক নিয়োগ করব—যদিও তিনি মুজতাহিদ নন?

প্রথম পাঠ

অনুরূপভাবে, আমরা যদি কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে না পাই এবং কোনো ব্যক্তির মাঝে বিচারক হওয়ার মতো ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা না থাকে, তবে এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়? আমরা কি বিচারক নিয়োগ দেওয়া থেকে বিরত থাকব, ফলে মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও জনকল্যাণ বিঘ্নিত হবে এবং মানুষের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা হবে না? নাকি আমরা তাদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ ব্যক্তিকে বেছে নেব? এবং বর্তমানে যারা বিদ্যমান আছে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করব?

নিশ্চয়ই সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এখানে প্রকাশিত হয় এবং বলে: যদি কোনো ব্যক্তির মাঝে সকল শর্ত পূর্ণ না হয়, তবে বর্তমানে বিদ্যমানদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য তাকেই আমরা গ্রহণ করব। সুতরাং আমরা তাকেই গ্রহণ করব যার মধ্যে এই শর্তগুলোর অধিকাংশ বিদ্যমান, যেন মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, জীবনের গতিধারা অব্যাহত থাকে এবং মুসলিম সমাজে বিচার বিভাগের কাজ যাতে স্থবির হয়ে না পড়ে; কারণ বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা এমন কোনো সমাজের কথা কল্পনা করতে

পারি না যেখানে মানুষের বিরোধ মীমাংসার জন্য কোনো বিচারিক ফয়সালা নেই।

সুতরাং সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এখানে হস্তক্ষেপ করে এবং বলে: আমরা পর্যায়ক্রমে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করব, তা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেই হোক; যেন মানুষের জনস্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। সম্ভবত এটি হানাফী আলেমদের নিকট সুবিদিত ছিল অথবা তারা এটি অনুধাবন করেছিলেন, যারা বিচারক হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি এবং নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসরণকারী মুকাল্লিদ বিচারকের বিচারকার্য পরিচালনা করাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন।

এটিও হানাফী জামাতের পক্ষ থেকে এক প্রকার সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও একজন বিচারক থাকা আবশ্যক এবং একজন সাক্ষী থাকা অপরিহার্য। আর যারা এমনটি বলেন, তা মূলত সিয়াসাহ শারইয়্যাহর দাবি অনুযায়ীই বলে থাকেন। সিয়াসাহ শারইয়্যাহর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মুসলিম সমাজে বিচার বিভাগের দ্বার রুদ্ধ হতে না দেওয়া।

পঞ্চমতঃ সিয়াসাহ শারইয়্যাহর বিধানসমূহ সামগ্রিকভাবে এবং সাধারণভাবে সহজীকরণ ও মানুষের কষ্ট লাঘব করার মূলনীতি, ন্যায়বিচারের নীতি এবং পরস্পরের কল্যাণে নসিহত করার বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। আর মুসলিমদের সকল কাজ হবে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, যা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করবে। এই মূলনীতিসমূহ সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত, যেগুলোর ওপর আমল করার ব্যাপারে কিতাব (কুরআন) এবং সুন্নাহর দলীলসমূহ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

২৯

পৃষ্ঠা 30

প্রথম পাঠ
সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (ইসলামি রাষ্ট্রনীতি)

কুরআন মাজীদ থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী: **"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না।"** [আল-বাকারা: ১৮৫] এবং তাঁর বাণী: **"আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে চান না।"** [আল-মায়িদাহ: ৬] এবং তাঁর বাণী: **"এবং তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।"** [আল-হাজ্জ: ৭৮] এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে।"** [আন-নিসা: ৫৮] এবং তাঁর বাণী: **"এবং তাদের কার্যাবলি তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়; আর তারা আমার দেওয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে।"** [আশ-শুরা: ৩৮]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র দ্বীনকে 'নসীহত' (কল্যাণকামিতা/সতর্কতা)-এর মধ্যে একত্রিত করে বলেছেন: **"দ্বীন হলো নসীহত"** —কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য?" তিনি বললেন: **"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।"**

এই সাধারণ মূলনীতিগুলোর অনুসরণ করা— যা মানুষের মধ্যে পরামর্শ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং মানুষের থেকে কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করে —মূলত 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিজ্ঞানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। কারণ আমাদের নিকট এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের থেকে কষ্ট বা সংকীর্ণতা দূর করা এবং তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টি 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে মানুষের কল্যাণসমূহও 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়, যার মধ্যে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানুষের স্বার্থ রক্ষা এবং পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেছেন: **"এবং কার্যাবলিতে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন"** [আল-ইমরান: ১৫৯] এবং **"তাদের কার্যাবলি তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে**

সম্পাদিত হয়" [আশ-শুরা: ৩৮]।

পরামর্শ ব্যবস্থাকে কে সুসংগঠিত করবে? এটা সত্য যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের পরামর্শ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন: **"এবং কার্যাবলিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন"** এবং বলেছেন: **"তাদের কার্যাবলি তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।"** কিন্তু পরামর্শ করার পদ্ধতি কী হবে? কোন্ প্রক্রিয়ায় বা মাধ্যমে এই পরামর্শ বাস্তবায়িত হবে? কুরআনুল কারীম এই বিষয়টি 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিজ্ঞানের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিজ্ঞান মূলত এই বিষয়গুলো অর্জনের জন্যই এসেছে। যদি 'মানুষের থেকে কষ্ট দূর করা'র কোনো মূলনীতি থাকে, তবে সেই মূলনীতিটি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং মানুষের ওপর তা কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তা আমাদের নিকট 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিজ্ঞানই স্পষ্ট করে। আর যেহেতু কুরআনুল কারীম আমাদের ইনসাফের সাথে বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে...

শরয়ি রাজনীতি (আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ) - প্রথম পাঠ

মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার কীভাবে বাস্তবায়িত হয়? আর সেই ন্যায়বিচার অর্জনের মাধ্যমগুলোই বা কী? এই সকল বিষয় শরয়ি রাজনীতি (আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ) শাস্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একইভাবে আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: "এবং তাদের কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়", এবং তাঁর বাণী: "আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো"; তখন এটি একটি মূলনীতি—মুসলমানদের মাঝে পরামর্শের মূলনীতি। কিন্তু পরামর্শ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে? আর কোন মাধ্যমগুলোর দ্বারা এই পরামর্শ বাস্তবায়িত হবে? কোন্ পদ্ধতিতে পরামর্শ সম্পন্ন হবে? এই বিষয়টি শরয়ি রাজনীতি শাস্ত্রের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; কারণ শরয়ি রাজনীতি শাস্ত্র মানুষের অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী তাদের কল্যাণ সাধনে কাজ করে। কেননা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তন হওয়া অনস্বীকার্য।

অতএব, শরয়ি রাজনীতিই হলো সেই মাধ্যম যা আমাদের জন্য ন্যায়বিচারের শাসন, পরামর্শ এবং মানুষের কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করার এই মূলনীতিগুলো বাস্তবায়ন করে। আর একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরয়ি রাজনীতিকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনার সমতুল্য করেছেন যখন তিনি বলেছেন: "দীন হলো কল্যাণ কামনা (নসিহত)"। কিন্তু কে কল্যাণ কামনা বা নসিহত করবে? মুসলমানদের সাধারণ জনগণ এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে কে নসিহত করবে? আইন তথা শরয়ি রাজনীতি শাস্ত্রই এটি স্পষ্ট করে দেয়।

ইসলাম যেসব সাধারণ মূলনীতি নিয়ে এসেছে সেগুলোর যথাযথ অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ, নিখুঁত অনুধাবন এবং প্রয়োগস্থলগুলো চিহ্নিত করা মানুষের জন্য এমন এক প্রশস্ত পথ উন্মোচন করে, যা জাতিসমূহের রাজনীতি পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এবং যারা রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি সংস্কার ও সঠিক নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আগ্রহী, তাদের জন্য পাথেয় হয়।

এই দলিলের সারকথা: এটি নির্দেশ করে যে, মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা, বিচার ব্যবস্থা বিন্যাস, মুসলমানদের মাঝে পরামর্শ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা মানুষের কষ্ট লাঘব ও সহজিকরণ—এই সকল ক্ষেত্রেই আমাদের শরয়ি রাজনীতি শাস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে। এই সাধারণ মূলনীতিগুলো মূলত শরয়ি রাজনীতি শাস্ত্রই সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করে থাকে, আর কিতাব (কুরআন)-এ এগুলোর পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়নি।

প্রথম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

...এবং সুন্নাহ; কারণ এই বিষয়গুলো সময়ের ব্যবধানে এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়। এ কারণে এই বিষয়গুলোকে সুশৃঙ্খল করা, বিস্তারিত বর্ণনা করা এবং প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে 'আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ' (ইসলামি রাজনীতি শাস্ত্র) সবচেয়ে উপযুক্ত। এর অর্থ হলো ইসলামি শরিয়াহ প্রতিটি সময়ে এবং প্রতিটি স্থানে প্রয়োগের উপযোগী। এটি নতুন উদ্ভূত সমস্যা এবং নতুন নতুন পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করার সামর্থ্য রাখে। আর কে এই কাজটি করে এবং কার পক্ষে তা করা সম্ভব? তা হলো কেবল 'আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ' বা ইসলামি রাজনীতি শাস্ত্র।

ষষ্ঠত: আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (অচিহ্নিত জনকল্যাণ):

আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ ফকিহ বা ফিকহশাস্ত্রবিদদের নিকট মতভেদপূর্ণ দলিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন হলো: এটি কি শরিয়তের বিধান আহরণের কোনো দলিল, নাকি এটি কোনো দলিল নয়?

কেননা উসুলুল ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রে এমন কিছু দলিল রয়েছে যা সর্বসম্মত, সেগুলো হলো: কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। ফকিহদের নিকট এগুলো সর্বসম্মত দলিল। তবে আরও অনেক দলিল রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে মতভেদ আছে, যেমন: ইসতিহসান, ইসতিসহাব, পূর্ববর্তী উম্মতের শরিয়ত ইত্যাদি। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহর সাথে আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, যা আমাদের বর্তমান আলোচনায় স্পষ্ট হবে। আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ হলো এমন বিষয়, যা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে শরিয়ত থেকে কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহর অর্থ হলো: এমন কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা যার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিতাব (কুরআন) থেকে কোনো স্পষ্ট পাঠ আমরা খুঁজে পাই না; কিতাব বা সুন্নাহতে এমন কোনো পাঠ নেই যা আমাদের নির্দেশ দেবে যে এই কল্যাণটি (মাসলাহাত) গ্রহণ করা হবে নাকি বর্জন করা হবে। এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'মুরসালাহ' (মুক্ত বা অচিহ্নিত); কারণ এটি গ্রহণ বা বর্জনের সুনির্দিষ্ট দলিলের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ, এমন কোনো দলিল নেই যা নির্দেশ করে যে এটি শরিয়তসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য, আবার এমন কোনো দলিলও নেই যা নির্দেশ করে যে এটি শরিয়তসম্মতভাবে বাতিল বা বর্জনীয়। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ কেবল এমন সব ঘটনার ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় যে ব্যাপারে শারি’ (বিধানদাতা) নীরব থেকেছেন এবং যার কোনো নির্দিষ্ট মূল ভিত্তি নেই যার ওপর কিয়াস বা তুলনা করা যায়। এতে একটি উপযুক্ত অর্থ বিদ্যমান থাকে। আর 'উপযুক্ত অর্থ' বলতে বোঝায়: যা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে অথবা তাদের থেকে ক্ষতি প্রতিরোধ করে।

প্রথম পাঠ

আমি বলছি: এতে এমন এক উপযুক্ত অর্থ নিহিত থাকে যা কোনো শরঈ বিধানের ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী, মাসালিহে মুরসালাহ (জনকল্যাণ) শরীয়তের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মাসালিহে মুরসালাহ সেসব শরঈ দলিলের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কিছু ফকিহ এই মাসালিহে মুরসালাহকে গ্রহণ করেন না এবং একে বিধানের দলিল হিসেবে গণ্য করেন না। আবার কিছু ফকিহ এই মাসালিহে মুরসালাহ গ্রহণ করেছেন এবং একে শরীয়তের দলিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন।

যারা এগুলোকে শরীয়তের দলিল বলেছেন এবং এই মাসালিহে মুরসালাহকে গ্রহণ করেছেন, তারা মূলত সিয়াসাহ শারঈয়াহর মূলনীতিই প্রয়োগ করছেন। কারণ, যেখানেই কল্যাণ (মাসলাহাহ) বিদ্যমান সেখানেই সিয়াসাহ বিদ্যমান। সুতরাং যদি মুসলিমদের কোনো কল্যাণ থাকে, তবে সেখানে সিয়াসাহ শারঈয়াহর উপস্থিতি ঘটে এবং এই সিয়াসাহ শারঈয়াহর বিধানসমূহ গ্রহণ করা হয়। আমরা বলি: অগ্রগণ্য মতানুসারে, মাসালিহে মুরসালাহ বিধান প্রণয়নের অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য। কেননা ইমামগণের ফিকহ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তাঁরা দলিলসমূহ থেকে বিধান আহরণের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে মাসলাহাহ মুরসালাহকে গ্রহণ করেছেন। কেউই এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাননি, তবে তাঁরা একে ইস্তিদলাল মুরসাল বা মাসলাহাহ মুরসালাহ ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ, বিষয়টি ফকিহদের মাঝে মতপার্থক্যপূর্ণ; কেউ কেউ এই মাসালিহে মুরসালাহ গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ করেন না।

অন্যদিক থেকে: তাঁদের মধ্যে কেউ—অর্থাৎ ফকিহদের কেউ—জনকল্যাণের কারণে শরঈ নস বা দলিলসমূহ বর্জন করেন না। বরং শরঈ দলিলের সাথে জনকল্যাণের বিরোধ দেখা দিলে দলিলসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের নিয়মাবলী প্রয়োগ করা হয়। এই বিষয়ে সারকথা হলো: যেসব জনকল্যাণ বা স্বার্থের সপক্ষে শরীয়তে তা গ্রহণ করার কোনো দলিল নেই, কিংবা তা বাতিল করারও কোনো দলিল নেই; যদি কোনো শরঈ দলিল তার প্রতিকূলে থাকে, তবে ফকিহদের সর্বসম্মতিক্রমে সেই জনকল্যাণের দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হবে না।

এর অর্থ হলো: এগুলো প্রত্যাখ্যাত স্বার্থ, যা শরঈভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মাসালিহে মুরসালাহ নিয়ে তখনই মতপার্থক্য থাকে যখন সেটি বাতিলের স্বপক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। এ কারণেই যদি...

প্রথম পাঠ

যদি এই মাসলাহাত (জনস্বার্থ) কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার কোনো শারঈ দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেই অবস্থায় তাকে মাসলাহাত বলা যাবে না; বরং এটি একটি 'বাতিলকৃত মাসলাহাত' (মাসলাহাতে মুলগাহ্), যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই ফকীহগণ বা যেসব ইমামগণ মাসলাহাতের সপক্ষে মত দিয়েছেন, তাঁরা যে মাসলাহাতকে দলিল হিসেবে পেশ করেন তাকে তারা বলেন: 'উপযুক্ত মাসলাহাত' (আল-মাসলাহাতুল মুলাইমাহ)—অর্থাৎ যার সপক্ষে সামগ্রিকভাবে দলিলাদি বিদ্যমান রয়েছে। অন্য কথায়: যা ইসলামী ফিকহের সাধারণ মূলনীতি ও সাধারণ বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এই মাসলাহাত অবশ্যই ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া আবশ্যক। এ কারণেই তাঁরা এর জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন। তাহলে এই

মাসলাহাতের শর্তাবলি কী কী, যার ভিত্তিতে আমরা এটি গ্রহণ করতে পারি?

তাঁরা বলেন: আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্য মাসলাহাতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শর্ত করা হয়েছে:

প্রথম শর্ত: এটি যেন কুরআন-সুন্নাহর নস বা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কারণ যদি কোনো সংঘর্ষ দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাকে 'বাতিলকৃত মাসলাহাত' হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ এমন বিষয় যা শরীয়ত প্রণেতা বাতিল করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ: রমজানের দিনে সহবাস করার কাফফারা হিসেবে দাসের মালিকের ওপর দুই মাস রোজা রাখা আবশ্যক করা। কেননা সে দাসের মালিক হওয়ায় দাস মুক্ত করার বিধান তাকে রোজা ভাঙা থেকে বিরত রাখবে না, কারণ তা তার জন্য সহজসাধ্য। তাই তার ক্ষেত্রে দাস মুক্ত করার পরিবর্তে দুই মাস রোজা রাখার বিধানটিই উপযুক্ত মনে হতে পারে—অর্থাৎ দাসের পরিবর্তে দুই মাস সিয়াম পালন করা। তারা বলেন: তার ওপর সিয়ামের বিধান আরোপ করাই অধিক উপযুক্ত যাতে রমজানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করে কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে তাকে কঠোরভাবে বিরত রাখা যায়। মূলত এটি 'বাতিলকৃত মাসলাহাতের' অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টির ব্যাখ্যা: ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী যে ব্যক্তি রমজানের দিনে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার কাফফারার বিষয়ে বলা হয়েছে: তাকে ওই রোজাটি কাজা করতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা বলতে কী বোঝায়? তাঁরা বলেন: একজন দাস মুক্ত করা। যদি সে সামর্থ্য না রাখে, তবে দুই মাস রোজা রাখা। যদি তাতেও সমর্থ না হয়, তবে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো। তাহলে বিষয়টি কী দিয়ে শুরু হয়েছে? এটি দাস মুক্ত করার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে।

কিছু ফকীহ বলেন, অথবা মাসলাহাতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কেউ কেউ বলেন: যে সম্পদশালী ব্যক্তির অধীনে অনেক দাস রয়েছে, তার জন্য উত্তম হলো—আমরা তার কাছে যা দাবি করব তা হলো, যদি সে রমজানের দিনে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে...

পৃষ্ঠা 35

রমজান; যা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর পরিপন্থী: **"সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসটি প্রত্যক্ষ করবে, সে যেন তাতে রোজা রাখে।"** [আল-বাকারাহ: ১৮৫]। এর দণ্ড হিসেবে তারা বলেন: সে ওই দিনের কাজা করবে এবং এরপর তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কাফফারা কী? কুরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, কাফফারা শুরু হয় দাসমুক্তির মাধ্যমে। কতিপয় ফকিহ বিষয়টি এভাবে দেখেছেন এবং বলেছেন: যদি আমরা তার ওপর দাসমুক্তি আবশ্যক করি, তবে তা কার্যকর হবে না। কারণ সে একজন ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তি এবং তার মালিকানায় অনেক দাস রয়েছে। এমতাবস্থায় যখন তাকে বলা হবে: একটি দাস মুক্ত করো, তখন তার কাছে বিষয়টি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হবে; যেহেতু তার নিকট দাসের প্রাচুর্য রয়েছে। ফলে সে এই বিধান বা শাস্তির দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এই কারণেই কিছু ফকিহ বলেছেন: আমরা তার ওপর দুই মাস রোজা রাখা অবধারিত করব। অর্থাৎ দাসমুক্তির পরিবর্তে আমরা তাকে বলব: তোমার ওপর দুই মাস রোজা রাখা আবশ্যক। কেন? তারা বলেছেন: কারণ এই অবস্থায় দুই মাস রোজা রাখাই হবে এমন এক শাস্তি যা সে উপলব্ধি করবে এবং এর ফলে সে পুনরায় এমন কাজ করবে না।

তবে এই অভিমতটি—যা নিশ্চিতভাবেই সকল ফকিহর ঐকমত্য নয়—এর বিপরীতে তারা অবস্থান নিয়েছেন এবং বলেছেন: যারা এই বিত্তশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাসমুক্তির পরিবর্তে দুই মাস রোজা রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা মনে করেছেন যে 'মাসলাহাত' (উপকারিতা) এটিই দাবি করে। কারণ সে রোজার পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে। আর মাসলাহাত দাবি করে যে, আমরা তার ওপর দুই

মাস রোজা রাখা আবশ্যক করব, দাসমুক্তি নয়; কেননা এটিই তার জন্য ফলপ্রসূ শাস্তি হবে, পক্ষান্তরে দাসমুক্তি তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

কিন্তু তাদের এই কথার জবাবে বলা হবে: এই মাসলাহাত যা আপনারা দেখছেন তা বাতিল; কারণ এটি কিতাবের (কুরআনের) সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি রমজানের দিনে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার ওপর কাজা এবং কাফফারা ওয়াজিব। আর কাফফারা শুরু হয় দাসমুক্তির মাধ্যমে। অতএব কুরআন যখন আমাদের বলছে: দাসমুক্তির মাধ্যমে শুরু করো, তখন আপনাদের এই দাবি করা যে, মাসলাহাত তাকে টানা দুই মাস রোজা রাখার শাস্তি প্রদান দাবি করে, অথবা আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী: দাসমুক্তির বদলে দুই মাস রোজা রাখা—তা সঠিক নয়।

পৃষ্ঠা 36

প্রথম পাঠ - আস-সিয়াসা আশ-শারইয়াহ

সুতরাং আপনারা যে জনকল্যাণ বা মাসলাহাহর দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তা মূলত একটি বাতিলকৃত মাসলাহাহ, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা মাসলাহাহর ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করি যে, তা যেন কুরআন বা সুন্নাহর কোনো নসের (সুস্পষ্ট পাঠের) বিরোধী না হয়।

দ্বিতীয় শর্ত: মাসলাহাহটি যেন শারীয়াহর উদ্দেশ্যসমূহের (মাকাসিদুশ শারীয়াহ) অন্তর্ভুক্ত হয়। শারীয়াহর উদ্দেশ্যসমূহ হলো: দ্বীন, জীবন, আকল (বুদ্ধিবৃত্তি), সম্ভ্রম এবং সম্পদ সংরক্ষণ করা। শারীয়াহর আগমন ঘটেছে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় (আদ-দারুরিয়্যাতুল খামস) অথবা পাঁচটি সামষ্টিক মূলনীতিকে (আল-কুল্লিয়্যাতুল খামস) হেফাজত করার লক্ষ্যে। এই পাঁচটি বিষয় বা সামষ্টিক মূলনীতিগুলো হলো: দ্বীন সংরক্ষণ, জীবন সংরক্ষণ, আকল সংরক্ষণ, সম্ভ্রম সংরক্ষণ এবং সম্পদ সংরক্ষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সকল আসমানি শারীয়ত এই পাঁচটি সামষ্টিক মূলনীতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছে। সুতরাং কোনো মাসলাহাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্তব্য বা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং যারা এর প্রবক্তা তাদের নিকটও তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না—যদি না তা এই পাঁচটি সামষ্টিক মূলনীতির গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হয় অথবা এর দ্বারা এই পাঁচটি মূলনীতির কোনো একটির সংরক্ষণ উদ্দেশ্য হয়।

অতএব, প্রতিটি মাসলাহাহ যা শারীয়াহর কক্ষপথের ভেতরে থেকে এই পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মাসলাহাহ। আর যে মাসলাহাহর সপক্ষে আকল (যুক্তি) ছাড়া অন্য কোনো দলিল নেই, তা শারীয়াহর দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত।

অন্য কথায়: মাসলাহাহকে অবশ্যই 'দারুরিয়্যাহ' (অপরিহার্য), 'কাতইয়্যাহ' (সুনিশ্চিত) এবং 'কুল্লিয়্যাহ' (সামষ্টিক) হতে হবে। 'দারুরিয়্যাহ' হলো এমন যা পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়ের কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত, আর সেগুলো হলো— দ্বীন, জীবন, আকল, সম্পদ ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ। যদি এই পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিও উদ্দেশ্য না হয় অথবা এগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আরও শর্ত হলো একে 'কাতইয়্যাহ' বা সুনিশ্চিত হতে হবে। 'কাতইয়্যাহ' হলো এমন বিষয় যার মাধ্যমে মাসলাহাহ অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। আর 'কুল্লিয়্যাহ' হলো যা ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনে।

এর কিছু উদাহরণ:

এই মাসলাহাহটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একে অবশ্যই শারীয়াহর উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, যা হলো— দ্বীন, জীবন, আকল, সম্ভ্রম এবং সম্পদ সংরক্ষণ। যেমন: যদি আক্রমণকারী কাফিররা মুসলিম বন্দীদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে...

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
প্রথম পাঠ

মুসলমানদের—অর্থাৎ: তারা তাদের কাছে থাকা বন্দী মুসলমানদের গ্রহণ করেছে এবং তাদের সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে স্থাপন করেছে, যাতে মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করলে এই মুসলিম বন্দীদেরই আঘাত করা হয়। এটিই হলো 'তাতররুস' (মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার) ব্যবস্থা। যখন আক্রমণকারী কাফেররা নিজেদের রক্ষার জন্য মুসলমানদের ঢাল বানায় এবং মুসলিম বন্দীদের সেনাবাহিনীর সামনে রাখে, আর আমরা যদি নিশ্চিত হই যে, আমরা যদি তাদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ না করি এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি, তবে তারা এই ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলমানদের এবং সেই সাথে অন্যদেরও সমূলে বিনাশ করবে। এর অর্থ হলো: আমরা যদি ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আক্রমণ থেকে বিরত থাকি, তবে তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আমাদের ভূখণ্ড দখল করে নেবে, আর সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করবে, এমনকি তাদের সাথে থাকা বন্দীদেরও যাদের তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে, আমরা যদি সেই ঢালের দিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করি, তবে আমরা কোনো অপরাধ ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করব।

এমতাবস্থায়, ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা 'মাসলাহাতে মুরসালাহ' (অচিহ্নিত জনকল্যাণ)-এর অন্তর্ভুক্ত; কারণ শরিয়তে কোনো অপরাধ ছাড়া একজন মুসলমানকে হত্যা করার বৈধতা স্বীকৃত নয়। আবার মুসলমানদের সাধারণ জনকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে হত্যা করা অবৈধ হওয়ার বিষয়েও কোনো অকাট্য দলীল নেই। তবে এটি একটি অপরিহার্য, অকাট্য এবং সামগ্রিক জনকল্যাণ; তাই একে বিবেচনা করা সঠিক। অর্থাৎ: একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদ তাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে যে: এই বন্দী যে কোনো অবস্থাতেই নিহত হবে; তাই একজন মুসলমানকে রক্ষা করার চেয়ে সকল মুসলমানকে রক্ষা করা শরিয়তের উদ্দেশ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। অর্থাৎ: আমরা কি ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলমানদের জীবন রক্ষা করব, যা একটি বিশেষ জনকল্যাণ, নাকি আমরা সকল মুসলমানের সাধারণ জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখব? ফকীহগণ বলেছেন: এমতাবস্থায় জনকল্যাণ দাবি করে যে, আমরা এই ঢালকে, অথবা মুসলমানদের এই অংশকে, অথবা তাদের সাথে থাকা মুসলিম বন্দীদের সাধারণ জনকল্যাণের স্বার্থে উৎসর্গ করব।

ফিকহী মূলনীতিতেও এর সমর্থন রয়েছে; আর তাই আমরা বলি: সাধারণ ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করা হয়। এর অর্থ হলো: বিশেষ কল্যাণের ওপর সাধারণ কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ: যখন দুটি অনিষ্ট বা ফাসাদ পরস্পর বিরোধী হয়, তখন বৃহত্তর অনিষ্টকে প্রতিহত করার জন্য ক্ষুদ্রতর অনিষ্টটি বেছে নেওয়া হয়; এগুলোই হলো ফিকহী মূলনীতি।

সুতরাং ফিকহী মূলনীতিগুলো অবশ্যই আমাদের সুবিন্যস্ত করতে হবে অথবা এই পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা বলি: এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা কাফেরদের সাথে তাদের কাছে ঢাল হিসেবে থাকা মুসলমানদেরও হত্যা করি, তবে এক্ষেত্রে তাদের জন্য একটি বিশেষ ক্ষতি রয়েছে...

যে মুসলিমকে আমরা হত্যা করেছি এবং যাকে কাফিররা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল, (তার ফলে) আমরা একটি সাধারণ স্বার্থ অর্জন করেছি; আর তা হলো অবশিষ্ট মুসলিমদের সুরক্ষা প্রদান এবং ইসলামি রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। এই কারণেই আমরা সাধারণ স্বার্থের খাতিরে—যা হলো অবশিষ্ট মুসলিমদের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্র রক্ষা—সেই বিশেষ স্বার্থটিকে বিসর্জন দিচ্ছি যা ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত ব্যক্তির জীবন রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এটি সুপরিচিত ফিকহি মূলনীতি দ্বারা সমর্থিত, আর তা হলো: "যখন দুটি অনিষ্ট বা ক্ষতির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তখন বৃহত্তর অনিষ্ট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অনিষ্টটি গ্রহণ করা হবে।" তদুপরি, সাধারণ স্বার্থ সর্বদা বিশেষ স্বার্থের ওপর অগ্রগণ্য।

ফকিহগণ যে শর্তগুলো বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তবে বাস্তবতা হলো, ইমাম মালিক এই বিষয়ে অধিক প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন: এটি অপরিহার্য নয় যে, স্বার্থটিকে সামগ্রিক, আবশ্যকীয় ও অকাট্য হতে হবে। তিনি বলেন: গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্বার্থের উপস্থিতি। সুতরাং যখনই সাধারণ স্বার্থ পাওয়া যাবে, তখনই তা বিশেষ স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। যেহেতু ইসলামি শরিয়ত 'মাসলাহাহ মুরসালাহ'-কে (অনির্ধারিত জনস্বার্থ) ইসলামি আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করে; কারণ কিছু ফকিহ বলেন যে, মাসলাহাহ মুরসালাহ ইসলামি শরিয়তে দলিল হিসেবে যোগ্য। আমরা বলি: যেহেতু ইসলামি শরিয়ত মাসলাহাহ মুরসালাহ-কে শরিয়তের উৎসসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এর অর্থ হলো এই মাসলাহাহ বা স্বার্থগুলো নিত্যনতুন উদ্ভূত ঘটনাবলি এবং অগণিত জনস্বার্থকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম, যার নাগাল পেতে নুসূস (কুরআন ও সুন্নাহর পাঠ) অক্ষম। কেননা নুসূস হলো সীমাবদ্ধ, আর যা সীমাবদ্ধ তা অসীম বা সীমাহীন বিষয়কে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে না।

আর মাসলাহাহ মুরসালার মাধ্যমে উম্মাহর সামনে আসা নিত্যনতুন পরিস্থিতি ও উদ্ভূত সমস্যাবলির মোকাবিলা করা সম্ভব। এর তাৎপর্য হলো: ফকিহগণ মাসলাহাহ মুরসালা সম্পর্কে যেসব শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলোকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি, সেগুলোর আলোকে আমরা বলি: এই মাসলাহাহ মুরসালাগুলো গ্রহণ করার ফলে কিছু বিষয় অবধারিত হবে। আর এই বিষয়গুলো হলো মুসলিমদের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই সব পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি যেগুলোকে আমরা মুসলিমদের স্বার্থের মানদণ্ডে বিচার করি। সুতরাং এই ঘটনাবলির মধ্যে যদি মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে আমাদের ওপর কর্তব্য হলো এমন বিধান প্রদান করা যা মুসলিমদের সাধারণ স্বার্থকে নিশ্চিত করে—অর্থাৎ, আমরা কেবল...

ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং আমরা জনস্বার্থের দিকেই লক্ষ্য করি। মানুষের ঘটনাবলি ও কর্মকাণ্ড সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অসীম। কিন্তু আমাদের নিকট রয়েছে কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহর নস (মূল পাঠ)। কুরআন ও সুন্নাহর এই নসগুলো সসীম ও সুনির্দিষ্ট। অন্যদিকে, প্রতিদিন যেসব নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যা উদ্ভূত হয় এবং সৃষ্টি হয়, সেগুলো অসীম; প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয় সামনে আসে।

উদাহরণস্বরূপ: কুরআন ও সুন্নাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেনি—যেমন উদাহরণ হিসেবে মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন। একইভাবে, ক্লোনিং-এর বিষয়েও কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়নি—তা সে উদ্ভিদের ক্লোনিং হোক, কিংবা প্রাণীর অথবা মানুষের ক্ষেত্রে। তাহলে এই সকল নবউদ্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা কী করব?

এটা সত্য যে আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ এই সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণা করেননি; তারা এই ঘটনাগুলো অনুসন্ধান করেননি।

কারণ তাদের যুগে মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি বিদ্যমান ছিল না। এগুলো আধুনিক সময়ের নবউদ্ভূত বিষয়। এই সমস্যাগুলোকেই আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ইসলামি ফিকহের মানদণ্ডে আমাদের এগুলোকে দেখতে হবে এবং এগুলোর বিধান প্রদান করতে হবে।

আমরা যেমনটি বলেছি: এই নতুন বিষয়গুলোর বিধানের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার কোনো স্পষ্ট নস নেই; যেমন মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা কৃষি, প্রাণী বা মানুষের ক্ষেত্রে ক্লোনিং-এর বিধান। এমতাবস্থায় আমরা কী করব? আমরা যদি কেবল কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলোর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকি এবং এই নসগুলো থেকেই সরাসরি বিধান গ্রহণ করতে চাই, তবে আমরা তা খুঁজে পাব না। কারণ এই নসগুলো সসীম ও সীমিত। পক্ষান্তরে মানুষের কর্মকাণ্ড, ঘটনাপ্রবাহ ও উদ্ভূত সমস্যাসমূহ প্রতিনিয়ত নতুন রূপ নিচ্ছে এবং এগুলো সীমিত নয়। সুতরাং আমরা যখন কুরআন বা সুন্নাহর দ্বারস্থ হই, তখন অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা ক্লোনিং-এর মতো এই নতুন বিষয়গুলোর সরাসরি কোনো বিধান সেখানে খুঁজে পাই না। এমতাবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? আমরা কি বলব যে, আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না? আমরা কি বলব যে, এগুলোর কোনো বিধান নেই? আমরা এটা বলতে পারি না যে, ইসলামে এই নবউদ্ভূত সমস্যা ও ঘটনাবলির কোনো বিধান নেই। কারণ যদি আমরা তা বলি, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে—আমাদের শরীয়ত স্থবির ও অপ্রগতিশীল এবং এটি সর্বকাল ও সর্বস্থানের জন্য উপযোগী নয়।

প্রথম পাঠ - আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

তবে ইসলামি শরীয়াহকে যখন আল্লাহ সকল শরীয়াহর সমাপ্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তখন তিনি চেয়েছেন যে, এটি যেন সব সময়ের জন্য এবং সব স্থানের জন্য প্রয়োগযোগ্য হয়, যতক্ষণ না আল্লাহ পৃথিবী এবং এর ওপর যা কিছু আছে তার উত্তরাধিকারী হন (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত)। আর এই কারণেই আমাদের 'ইলমুস সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ' বা শরীয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের দিকে যেতে হবে। শরীয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা এই জীবনে মানুষের জনকল্যাণ অর্জনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এ কারণে আমরা শরীয়াহর সাধারণ মূলনীতিগুলোর দিকে ফিরে যাই। আমাদের অবশ্যই এমন বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, বর্তমান সময়ের নতুন নতুন বিষয়গুলো—যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন—এতে মানুষের কোনো কল্যাণ নিহিত আছে কি না, নাকি তাদের জন্য ক্ষতি রয়েছে? আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা একটি বিধান দিতে চাই।

সুতরাং পরিমাপকাঠি হলো সেই জনকল্যাণ (মাসলাহাত) যা নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি। আমরা এই ঘটনা এবং সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সামনে আরও যেসব নতুন বিষয় উদ্ভূত হবে, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করব এবং সেগুলোকে কল্যাণ ও অকল্যাণের গণ্ডিতে স্থাপন করব। অতঃপর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে এবং যাতে ক্ষতির চেয়ে কল্যাণের দিকটি প্রবল হবে, আমরা তা বৈধ করে দেব। আর যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর হবে অথবা যাতে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির দিকটি প্রবল হবে, আমরা তা থেকে বারণ করব।

অতএব, এখান থেকেই 'মাসালিহ মুরসালাহ' (অনির্ধারিত জনকল্যাণ) এর বিধানটি আসে। সুতরাং যখন আমরা মাসালিহ মুরসালাহ গ্রহণ করি, তখন তা আমাদের জন্য সিয়াসা আশ-শারঈয়াহর লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ, মাসালিহ মুরসালাহর ওপরই সিয়াসা আশ-শারঈয়াহর বিধানসমূহ আবর্তিত হয়। কেননা সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে মানুষের জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করে। এ কারণেই মাসালিহ মুরসালাহ মূলত সিয়াসা আশ-শারঈয়াহকেই প্রকাশ করে। তাই আমরা যদি এই মাসালিহ মুরসালাহর ওপর নির্ভর না করি, তবে মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া সমসাময়িক বিষয় এবং নিত্যনতুন উদ্ভূত সমস্যাবলির কোনো বিধান আমরা খুঁজে পাব না। সুতরাং এই ঘটনাবলিকে আমরা ইসলামি শরীয়াহর সাধারণ মূলনীতিগুলোর সামনে পেশ করব, সেগুলোকে সিয়াসা আশ-শারঈয়াহর আলোকে মূল্যায়ন করব এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের (মাসালিহ ও মাফাসিদ) মানদণ্ডে যাচাই করব। অতঃপর যাতে কল্যাণ রয়েছে তা আমরা বৈধ করব এবং যাতে ক্ষতি রয়েছে তা থেকে আমরা বারণ করব।

মাসলাহাত মুরসালাহ সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে যা আমরা উল্লেখ করতে চেয়েছি; কারণ এতে

প্রকৃত জনকল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এটি আমাদের ফকিহগণের (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) গভীর প্রজ্ঞার প্রমাণ দেয় যে, শরীয়াহ...

শরয়ী রাজনীতি

প্রথম পাঠ

এটি প্রতিটি কাল ও পাত্রে প্রয়োগের উপযোগী, এবং যা কিছু সেদিকে ধাবিত করে আমাদের উচিত তাকে সমর্থন করা এবং গ্রহণ করা। ইবনে তাইমিয়াহ ইবনে আকীল এবং কিছু ফকীহগণের মধ্যে সংঘটিত সেই বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিতর্কে এসেছে: অপরজন—অর্থাৎ যিনি ইবনে আকীলের সাথে বিতর্ক করছিলেন—তিনি বললেন: "শরীয়তের অনুকূল হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই।" তখন ইবনে আকীল বললেন: "রাজনীতি হলো মানুষের এমন সব কর্মকাণ্ড যার ফলে তারা কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী হয় এবং অমঙ্গল বা ফাসাদ থেকে অধিক দূরে থাকে—যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.) তা প্রবর্তন করেননি এবং এ বিষয়ে কোনো ওহীও নাযিল হয়নি।"

ইবনে আকীলের এই উক্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন—যিনি ইসলামকে অতি উত্তমভাবে অনুধাবন করেছেন, যিনি শরীয়তকে যথাযথভাবে বুঝেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, একে প্রতিটি কাল ও পাত্রের জন্য প্রয়োগযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতির সামনে যেন আমরা স্থবির হয়ে না পড়ি। ইবনে আকীল সেই ব্যক্তির প্রতিবাদ করছেন যিনি বলছিলেন: "শরীয়তের অনুকূল হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই।" তিনি তাকে বলছেন: "রাজনীতি হলো সেই সব কর্মপন্থা যার মাধ্যমে মানুষ কল্যাণের অতি নিকটে পৌঁছে এবং ফাসাদ থেকে দূরে থাকে।" আর 'মাসালিহে মুরসালা' (অবারিত জনকল্যাণ) ঠিক এই কাজটিই করে থাকে। বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলোকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি; যা কল্যাণকর তা আমরা বৈধ করি, আর যা ক্ষতিকর তা আমরা প্রতিহত করি। যে বিষয়ে অমঙ্গলের চেয়ে কল্যাণ বেশি তাকে আমরা অনুমতি দিই, আর যে বিষয়ে কল্যাণের চেয়ে অমঙ্গল বেশি তাকে আমরা নিষিদ্ধ করি। তিনি বলেন: ইবনে আকীল এই অর্থকে সমর্থন করে বলেছেন: "রাজনীতি হলো মানুষের এমন সব কার্যাবলি যার দ্বারা তারা মঙ্গলের অধিক নিকটবর্তী হয় এবং অমঙ্গল থেকে দূরে থাকে, যদিও নবী (সা.) তা প্রবর্তন করেননি এবং এ বিষয়ে কোনো ওহীও নাযিল হয়নি।" অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহ কিংবা সুন্নাহতে এই সুনির্দিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে কোনো বর্ণনা বা নস (দলীল) না থাকলেও তা গ্রহণ করা হবে।

এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যার বিধান আল্লাহর কিতাবে কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহতে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। "রাসূল (সা.) তা প্রবর্তন করেননি এবং এ বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি"—বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা কী করব? ইবনে আকীল বলেন: আমরা একে জনকল্যাণের (মাসলাহাত) দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করব। অতঃপর যা কল্যাণকর তা আমরা বৈধ করব, আর যা অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর তা আমরা নিষিদ্ধ করব।

প্রথম পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

তিনি বলছেন: যদিও তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করেননি এবং এ বিষয়ে কোনো ওহীও নাজিল হয়নি। এটি হলো ইবনু আকীলের বক্তব্য, যা তিনি তাঁর সাথে বিতর্ককারী পক্ষকে বলছেন: আপনি যদি আপনার একথার দ্বারা—'শরীয়তসম্মত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো রাজনীতি নেই'—এর অর্থ করেন যে, যা শরীয়তের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়, তবে তা সঠিক। আর যদি আপনি বুঝাতে চান যে, শরীয়তের বাচনিক ভাষ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তা ছাড়া অন্য কোনো রাজনীতি নেই, তবে তা ভুল এবং সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডকে ভুল সাব্যস্ত করার নামান্তর।

আপনি যদি আপনার এই কথা—'শরীয়তসম্মত হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই'—দ্বারা উদ্দেশ্য করেন যে, শরীয়তের বাচনিক ভাষ্যে যা এসেছে তা ছাড়া কোনো রাজনীতি নেই—অর্থাৎ যা কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—তবে এটি একটি অকেজো কথা এবং আমরা এই কথাটি মোটেই গ্রহণ করি না। কারণ আমরা যদি এই অর্থে এই বক্তব্যটি গ্রহণ করি যে, কুরআন বা সুন্নাহতে যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে বা যার বিধান স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা ব্যতিরেকে অন্য কিছু গ্রহণ করব না, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে যে আমাদের শরীয়ত স্থবির হয়ে পড়বে। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে উপস্থাপিত শরীয়তের সুনির্দিষ্ট পাঠ বা প্রমাণসমূহ তো সীমিত ও নির্ধারিত, পক্ষান্তরে মানুষের প্রাত্যহিক ঘটনাপ্রবাহ ও নিত্যনতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলো অসীম ও অগণিত।

সেই কারণে আমরা যদি বলি: 'শরীয়তসম্মত হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই'—অর্থাৎ শরীয়ত যা স্পষ্টভাবে বলেছে তা ছাড়া কোনো রাজনীতি নেই—তবে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিণতির দিকে ধাবিত করবে এবং এর দ্বারা প্রতীয়মান হবে যে, শরীয়ত সকল যুগে এবং সকল স্থানে প্রয়োগের উপযোগী নয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই কথার—'শরীয়তসম্মত হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনীতি নেই'—দ্বারা উদ্দেশ্য করি যে, শরীয়তের পরিপন্থী হলে কোনো রাজনীতি বৈধ নয়, তবে তা সঠিক। কারণ শরীয়ত-পরিপন্থী হওয়ার অর্থ হলো শরীয়তের বিধানসমূহের সামগ্রিক বিরোধিতা করা। আর প্রতিটি শরয়ী রাজনীতি বা শাসননীতি ইসলামের সাধারণ কাঠামোর অধীনে হওয়া উচিত—অর্থাৎ ইসলামের সাধারণ মূলনীতিসমূহ, সাধারণ বিধানাবলি এবং ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের সামগ্রিক মৌল নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং যা কিছু সাধারণ মূলনীতিসমূহের পরিপন্থী নয়, তা আমরা গ্রহণ করব এবং এতে কোনো বাধা নেই। পক্ষান্তরে যা সাধারণ মূলনীতিসমূহের বিরোধী, তা আমরা গ্রহণ করব না। কোনো বিষয় সাধারণ মূলনীতিসমূহের বিরোধী কি না, তা আমরা কীভাবে জানব? আমরা তা জনকল্যাণ বা অকল্যাণের মানদণ্ডে বিচার করব। যদি তাতে জনকল্যাণ থাকে তবে আমরা তাকে বৈধ সাব্যস্ত করব, আর যদি তাতে কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি থাকে তবে আমরা তা নিষেধ করব।

প্রথম পাঠ

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে: কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নস (পাঠ) দ্বারা সিয়াসা শারঈয়্যার (শরয়ি রাষ্ট্রনীতি) বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত না হওয়া কোনো ক্ষতিকর বিষয় নয়। কোনো নীতি শরয়ি হওয়ার পথে এটি কোনো অন্তরায় নয় যে, উক্ত জনস্বার্থের (মাসলাহাত) বিধানটি কুরআন বা সুন্নাহর পাঠে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; বরং সিয়াসা শারঈয়্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যথেষ্ট, অথবা ইসলামি শরিয়তের সাধারণ মূলনীতি ও সাধারণ বিধানাবলির আওতাভুক্ত হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো সাধারণ মানদণ্ড ও শরয়ি বিধানাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে, ততক্ষণ আমরা তা গ্রহণ করব।

তবে যা ক্ষতিকর এবং যা তা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা হলো—যখন সিয়াসা শারঈয়্যার সেই বিধানগুলো কোনো বিস্তারিত নসের (পাঠের) সাথে প্রকৃত অর্থে সাংঘর্ষিক হয়।

এর অর্থ হলো: সিয়াসা শারঈয়্যার বিধানগুলো গ্রহণযোগ্য এবং আমরা তা গ্রহণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো বিস্তারিত নসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ তা কুরআন বা সুন্নাহর কোনো নস কিংবা ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক না হবে, ততক্ষণ আমরা তা গ্রহণ করব। কিন্তু যদি সিয়াসা শারঈয়্যার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বিধানসমূহ কোনো বিস্তারিত নসের সাথে প্রকৃত অর্থে সাংঘর্ষিক হয়—আর বিস্তারিত নস বলতে আমরা উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত বিস্তারিত বিধানাবলিকে বোঝাচ্ছি, যা মূলত সামগ্রিক দলিলসমূহ যেমন: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে গৃহীত—সুতরাং যদি সিয়াসা শারঈয়্যার এই বিধানগুলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা কিংবা কিয়াস দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো বিধানের পরিপন্থী হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা তা গ্রহণ করব না। কারণ এমতাবস্থায় এই বিষয়ে একে সিয়াসা শারঈয়্যাহ (শরয়ি নীতি) হিসেবে গণ্য করা হবে না।

আমরা বলি: সুতরাং যখন এটি এজাতীয় বিরোধ থেকে মুক্ত থাকবে এবং শরিয়তের মেজাজ (রুহ) ও এর সাধারণ মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে, তখন এটি একটি ইসলামি ব্যবস্থা এবং সিয়াসা শারঈয়্যাহ হিসেবে গণ্য হবে, এমনকি সেখানে যদি কোনো ভিন্নতা থাকেও।

পৃষ্ঠা 44

শরয়ী রাজনীতি

প্রথম পাঠ

কিন্তু তা প্রকৃত নয়। আমরা বলি: যদি কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ বা ইজমার কোনো নসের (সুস্পষ্ট বিধান) সাথে প্রকৃত কোনো বিরোধিতা বা সংঘর্ষ থাকে, অথবা কিয়াসের সাথে কোনো প্রকৃত সংঘর্ষ থাকে; তবে আমরা তা গ্রহণ করি না।

কিন্তু যদি আমরা ধরে নেই যে সেখানে একটি বিরোধিতা রয়েছে, তবে তা কেবল বাহ্যিক—অর্থাৎ শুধুমাত্র বাহ্যিক দৃষ্টিতে। কিন্তু গভীর অভিনিবেশ ও চিন্তার সময় আমরা দেখতে পাই যে বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। যেমনটি আমরা পূর্বে ‘মুআল্লাফাতুল কুলুব’ (যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য) এবং ‘হারানো উট’-এর বিষয়ের ক্ষেত্রে বলেছি; যা আমাদের নেতা উসমান ইবনে আফফান এবং আমাদের নেতা উমর ইবনে আল-খাত্তাব করেছিলেন। তারা যা করেছেন তা নসের সাথে কোনো প্রকৃত বিরোধ ছিল না, বরং বাস্তবে তা কেবল বাহ্যিক বৈপরীত্য ছিল মাত্র, প্রকৃত কোনো বিরোধ নয়। কারণ আমরা যদি বিধানের বিষয়বস্তুর দিকে তাকাই, এবং এই বিধানের রহস্য ও প্রজ্ঞার (হিকমত) দিকে লক্ষ্য করি যা আমাদের নেতা উমর গ্রহণ করেছিলেন; তবে আমরা দেখতে পাব যে তিনি নসের বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি দেখেছিলেন যে, যে কারণের (ইল্লত) ওপর ভিত্তি করে এই বিধানটি দেওয়া হয়েছিল, তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আর তা হলো যখন মুসলমানরা শক্তিশালী হয়েছে। সুতরাং বাস্তবে সেখানে বাহ্যিক বৈপরীত্য ছাড়া অন্য কিছু নেই। তবে পর্যালোচনার পর দেখা যায় যে সেখানে কোনো বিরোধ নেই।

তেমনিভাবে বিষয়টি এমনও হতে পারে যে, সেখানে বিরোধিতা আছে ঠিকই, তবে তা বাহ্যিক এবং অস্পষ্ট, প্রকৃত নয়। এটি আমাদের নেতা উসমান ইবনে আফফান-এর হারানো উটের বিষয়ে অবস্থানের ক্ষেত্রে ঘটেছে। মূলত হারানো উটের বিধান হলো তা ধরা যাবে না, বরং তা ছেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ না তার মালিক এসে তা নিয়ে যায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা অনুযায়ী তার কোনো ভয় নেই; তার সাথে তার পানির আধার ও খুর রয়েছে, সে পানি পান করে এবং গাছপালা খায়। তাই তিনি একে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তার মালিক না আসা পর্যন্ত কেউ একে স্পর্শ না করে। উসমান ইবনে আফফান যখন এর বিপরীত করলেন, তখন তা বাহ্যিকভাবে নসের বিপরীত মনে হলেও তা কোনো প্রকৃত বিরোধিতা ছিল না। বরং তা ছিল বাহ্যিক বিরোধিতা মাত্র। অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের নেতা উসমান-এর অবস্থান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে আমরা দেখতে পাব যে বাস্তবে তিনি নসের বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি নসের বিষয়বস্তু, বিধানের প্রজ্ঞা এবং এই নসের

রহস্যের দিকে লক্ষ্য করেছেন। তাই বাস্তবে দেখা যায় যে, যদি নসটি এই উটের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়—

সিয়াসা শরইয়্যাহ
প্রথম পাঠ

হাদিসে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, কেউ সেগুলোর (উটের) কোনো ক্ষতি করত না; কারণ সেখানে এমন ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল যা তাদের এই উটগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখত। কিন্তু যখন মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং তাদের ধর্মীয় সচেতনতা দুর্বল হয়ে পড়ল; তখন দেখা গেল যে, হাদিসে নবী ﷺ যে কারণের (ইল্লাত) ওপর ভিত্তি করে এই হুকুম প্রদান করেছিলেন—অর্থাৎ উট কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না—সেই কারণটি আর বিদ্যমান নেই। কারণটি আর অবশিষ্ট ছিল না, বরং তা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের মনে এই উটগুলো গ্রহণ করা বা চুরি করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা অবশিষ্ট রইল না।

এই কারণেই সাইয়্যিদিনা উসমান (রা.) অনুধাবন করলেন যে, হুকুম তার কারণের (ইল্লাত) উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপর আবর্তিত হয়। অতঃপর যখন তিনি দেখলেন যে, এই লোকদের মধ্যে এই উটগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, তখন তিনি বললেন: এগুলো কুড়িয়ে নেওয়া হবে এবং এর পরিচয় প্রচার করা হবে, এরপর বিক্রি করে এর মূল্য মালিকের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

""

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ

দ্বিতীয় পাঠ

মক্কা ও মদীনায় ইসলামি ব্যবস্থার ধারণা এবং এর উদ্ভব

পাঠের উপাদানসমূহ

প্রথম উপাদান : নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে গোত্রীয় জীবন বিন্যাসে নবী (সা.)-এর অভিজ্ঞতা — ৪৯

দ্বিতীয় উপাদান : মক্কায় নবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নীতিমালাসমূহ — ৫৩

তৃতীয় উপাদান : মদীনায় নবী (সা.) কর্তৃক প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন এবং মৌলিক ব্যবস্থাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ — ৬৫

চতুর্থ উপাদান : রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যায়সমূহ এবং এর বিবর্তনের ধাপসমূহ — ৮০

""

শরয়ী রাজনীতি
দ্বিতীয় পাঠ

নবুওয়াত-পূর্ব গোত্রীয় জীবন বিন্যাসে নবী ﷺ-এর অভিজ্ঞতা

'নজম' হলো 'নিযাম'-এর বহুবচন; এটি এমন একটি শব্দ যা প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যেখানে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করা হয়। এই বিবেচনায় এটি একটি কণ্ঠহারের মতো, যার পাথরগুলো একটির সাথে অন্যটি সুশৃঙ্খলভাবে গেঁথে থাকে। যেকোনো রাষ্ট্রের ব্যবস্থা (নিযাম) মূলত এমন কিছু আইন, নীতিমালা ও ঐতিহ্যের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়

যার ওপর ভিত্তি করে সেই রাষ্ট্রের জীবন পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে: রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা। এছাড়াও ইবাদত সংক্রান্ত আরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে যেমন: সালাত, সিয়াম, হজ ও জাকাত। আরও এক প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে, আর তা হলো সামাজিক ব্যবস্থা যা জনগণের অবস্থা পর্যালোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আমরা যদি ইসলামি ব্যবস্থাগুলোর উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, তবে আমাদের এই ইসলামি ব্যবস্থাগুলোর প্রাথমিক উৎসসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা মক্কায় রাসূল ﷺ-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং এরপর মদীনায় তাঁর ﷺ-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করব।

মক্কায় রাসূল ﷺ-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম:

ইসলামি দাওয়াত এবং তা প্রসারে মহান রাসূল ﷺ-এর সংগ্রাম মূলত সেই সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণাসমূহ গঠন করে যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচিত সকল ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দণ্ডায়মান। কারণ, ইসলামের শিক্ষাসমূহকে সেই রাসূলের ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় যিনি তা শিক্ষা দিয়েছেন; ঠিক তেমনি মহান রাসূলের ব্যক্তিত্বকে তাঁর আরব জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এই সবকটি বিষয় ইসলামি ব্যবস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে এগুলোকে একত্রে অধ্যয়ন করা আবশ্যক; কারণ এদের প্রতিটিই একে অপরের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যেমনটি গর্ভস্থ সন্তান তার ধারকের সাথে মিশে থাকে।

দ্বিতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরিয়াভিত্তিক রাজনীতি)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী প্রাথমিক বছরগুলোতে আরব জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তন এক তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সংকট সমগ্র আরব উপদ্বীপের গোত্রীয় জীবনের ভিত্তিগুলোকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান সকল গোত্রীয় ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল—চাই তা ইয়েমেনের রাজতন্ত্র হোক, উর্বর অর্ধচন্দ্রের প্রান্তীয় আমিরাতগুলো হোক, কিংবা আরব ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বিশেষ করে মক্কায় বিদ্যমান গোত্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাগুলো হোক। এই সংকটের মূল ভিত্তি ছিল গোত্রীয় ব্যবস্থার মজ্জাগত সেই ব্যক্তিগত আধিপত্যের মানসিকতা এবং বৃহৎ রাজনৈতিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জোট গঠনের উদ্যোগের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। কেননা, গোত্রীয় ব্যবস্থার লক্ষ্য কোনো বৃহৎ মৈত্রী স্থাপন বা স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণ ছিল না; বরং এই ব্যবস্থা একটি প্রভাবশালী পরিবারের প্রতিপত্তি সুসংহত করা অথবা একটি বংশ বা গোত্রের মর্যাদা উচ্চকিত করা এবং তাদের সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর লক্ষ্যেই পরিচালিত হতো।

এই গোত্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সমাজগুলো ছিল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্ব ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কারণ, গোত্রই ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক একক এবং গোত্রপ্রধানই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। এই সংকীর্ণ গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বড় কোনো ঘটনার সূচনার সুযোগ দিত না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে আরব ভূখণ্ডের গোত্রীয় জীবনের চিত্রটি একটি জরাজীর্ণ ইমারতের রূপ ধারণ করেছিল এবং সেই পতনের সাথে সাথে তৎকালীন জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী সকল ব্যবস্থার মধ্যে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।

গোত্রীয় ব্যবস্থার এই পতনের লক্ষণগুলো ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে, যে বছর মহানবী (সা.)-এর জন্ম হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শোরগোলপূর্ণ গোত্রীয় জীবনের মাঝেই বেড়ে ওঠেন এবং ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খুব কাছ থেকে এর সকল ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। যা তাঁকে (সা.) আমানত বহন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করেছিল; যাতে তিনি আরবদেরকে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যবস্থাগুলো থেকে ইসলামের আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন এবং একই সাথে এই দ্বীন প্রচারের জন্য তাদেরকে গড়ে তুলতে পারেন।

পৃষ্ঠা 51

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
দ্বিতীয় পাঠ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ন্যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর জন্মভূমি মক্কায় গোত্রীয় জীবনের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের এক সুসংহত রূপ পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো, মক্কা তখন আরব ভূখণ্ডের প্রথম ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেখানে বিভিন্ন গোত্রের আগমন ঘটছিল। আমি বলব: মক্কা এমন এক বৈপরীত্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হয়েছিল, যেখানে যাযাবর জীবন এবং নগর সভ্যতার রীতিনীতি সমান্তরালে বিদ্যমান ছিল।

এই বৈপরীত্য কুরাইশদের অনুসৃত ব্যবস্থার মধ্যেও পরিলক্ষিত হতো। তাদের এক একজন ব্যক্তি একদিকে লুণ্ঠন, আধিপত্য এবং আভিজাত্য ও বংশীয় গৌরব প্রদর্শনের মতো গোত্রীয় অন্ধ গোঁড়ামিকে তার নিকৃষ্টতম রূপে আঁকড়ে ধরে রাখত, আবার একই সাথে সে মক্কার মতো একটি ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বসবাসের স্থায়িত্ব ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে গর্ববোধ করত। কুরাইশদের এই আভিজাত্যের মানসিকতা ‘মালা’ (নেতৃস্থানীয়দের সভা) গঠনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই ‘মালা’ আসলে ছিল কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের একটি পরিষদ, যা তাদের ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। তারা একদিকে যেমন নিজ গোত্র নিয়ে অহংকার করত, তেমনি অন্যদিকে তাদের ধন-সম্পদ নিয়েও গর্ব করত। তাদের কেউ কেউ গর্বভরে ও অত্যন্ত দম্ভের সাথে পথ চলত, যেন সে তার দুই পা দিয়ে মাটিকে বিদীর্ণ করে ফেলবে এবং উচ্চতায় পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাবে। আবার অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটার সময় অত্যন্ত জঘন্যভাবে সীমালঙ্ঘন করত এবং তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো দুর্বলদের চপেটাঘাত করত—যাদের কোনো বড় বংশ বা শক্তিশালী গোত্র ছিল না তাদের রক্ষা করার জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে মক্কা গোত্রীয় রীতিনীতির বৈপরীত্যের এক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটি ছিল এমন এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, যার অধিবাসীরা একদিকে যেমন যাযাবর জীবনের বাহ্যিক ঐতিহ্যের প্রতি আসক্ত ছিল, তেমনি অন্যদিকে তাদের জীবনযাত্রার ধরণ ও বাহ্যিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটত। সেখানে একদিকে ছিল প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় মগ্ন এক উচ্চবিত্ত শ্রেণী, আর অন্যদিকে ছিল শোষিত ও বঞ্চিত এক দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

পৃষ্ঠা 52

দ্বিতীয় পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ

সুদ এবং অসদাচরণ; ফলে গোত্রীয় ব্যবস্থা কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল, যা তারা অন্যদের

দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে নিজেদের বিলাসী জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবহার করত।

এই ছিল নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মক্কার সেই গোত্রীয় ব্যবস্থা যা আমরা বর্ণনা করেছি। আমরা আরও বর্ণনা করেছি যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এই পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং এসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি মক্কায় প্রচলিত এই গোত্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এই গোত্রীয় জীবনধারা এবং এর রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লবের সূচনা হয়। আমানতদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর এবং তিনি যখন হেরা গুহায় ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর ওপর কুরআনের ওহি নাযিল হয়। পবিত্র কুরআন মক্কায় পুঞ্জীভূত গোত্রীয় প্রবণতা, এর নিয়ম-নীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লব হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি সংকীর্ণ গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত এবং বিশ্বজনীন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নতুন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়।

অতএব, পবিত্র কুরআন নাযিলের মাধ্যমে সেই জরাজীর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব শুরু হয় যা গোত্রপ্রীতি এবং অন্যদের তুলনায় নিজ গোত্রের প্রতি অন্ধ মমত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যা মক্কার আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল। পবিত্র কুরআন এই জরাজীর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করতে এবং এমন এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে অবতীর্ণ হয়েছে যার দিগন্ত হবে সুদূরপ্রসারী এবং যা সমগ্র বিশ্বকে শামিল করবে। দাওয়াত প্রচারকালীন সময়ে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাংগঠনিক কার্যক্রম দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল:

প্রথমত: এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ইসলামের শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, যা মক্কায় ব্যক্তির জীবনকে সুশৃঙ্খল করবে; যেন মক্কার মতো পাপিষ্ঠ গোত্রীয় দুর্গে গোত্রীয় গোঁড়ামির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত: এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর মুমিনদের জামাতকে সুসংগঠিত করার কাজ করেন; যাতে নবজাত ইসলামি সমাজের মর্যাদা সমুন্নত করা যায় এবং এর সদস্যদেরকে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

দ্বিতীয় পাঠ

মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিসমূহ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী মক্কায় নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন:

১. সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত এবং একটি নতুন সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে এই ধর্মীয় আকিদাহকে গ্রহণ করা, যার নিজস্ব ব্যবস্থা ও উচ্চতর আদর্শ রয়েছে। এটি গোত্রীয় সমাজ এবং গোত্রীয় গোঁড়ামি থেকে উদ্ভূত প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল—যা ইসলামি পরিভাষায় এবং ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে 'জাহিলিয়্যাত' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

সুতরাং আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত ছিল সেই কুঠার যা গোত্রীয় জীবনের স্থবিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এটি ছিল চিন্তা-চেতনাকে জাগ্রত করার এবং গোত্রীয় ব্যবস্থা যে রক্ষণশীল মানসিকতার দিকে আহ্বান করত, তা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি

পথ। পবিত্র কুরআন এই নতুন দাওয়াতের গুরুত্ব স্পষ্ট করেছে এবং এটাও স্পষ্ট করেছে যে, আরবরা এর আগে এই সম্পর্কে অবগত ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন: “আর আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি।” [সাবা: ৪৪]। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াতের সাথে সাথে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা যুক্ত ছিল। গোত্রীয় ব্যবস্থা যে অন্ধ আনুগত্য এবং হেদায়েত না থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের প্রতি আঁকড়ে থাকার আহ্বান জানাত, তা পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন বহু আয়াতে এই স্থবিরতার নিন্দা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: “তারা তো তাদের পিতৃপুরুষদের পথভ্রষ্ট পেয়েছিল। ফলে তারা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। আর তাদের পূর্বেও অধিকাংশ পূর্ববর্তী লোক পথভ্রষ্ট হয়েছিল।” [আস-সাফফাত: ৬৯-৭১] একই সময়ে পবিত্র কুরআন গভীর চিন্তা, গবেষণা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অন্বেষার প্রতি উৎসাহিত করেছে। স্রষ্টার নিদর্শনসমূহ, মহাবিশ্বের পারম্পরিক সম্পর্ক ও প্রকৃতির নিয়মাবলি, এমনকি মানুষের নিজের সত্তা এবং তাকে যা দান করা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ মানুষের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

আল্লাহ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং জীবনের অন্যান্য উপকরণ দান করেছেন; এই কারণে মহান আল্লাহ বলেন: **“আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শনাবলি রয়েছে), তবে কি তোমরা দেখবে না?”** [আয-যারিয়াত: ২১]।

২. মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের ধারণাকে সুদৃঢ় করা; যেখানে মানুষ হয় চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে অথবা দুনিয়ার জীবনে তার হাত যা পেশ করেছে সেই অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: **“প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।”** [আল-মুদ্দাসসির: ৩৮]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: **“আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। আর তার প্রচেষ্টা অচিরেই দেখা হবে।”** [আন-নাজম: ৩৯-৪০]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: **“সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন এক অবস্থা হবে যা তাকে (অন্য সবার থেকে) বিমুখ করে রাখবে।”** [আবাসা: ৩৪-৩৭]।

যেমনটি আমরা বলেছি: এই মূলনীতিটি মূলত মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও হিসাবের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ বহন করে, যেখানে মানুষ দুনিয়ার জীবনে তার হাত যা পেশ করেছে তার ভিত্তিতে হয় চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে অথবা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। এই আকিদা জাহেলিয়াতের সেকেলে গোত্রীয় ধ্যান-ধারণাকে নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং নবজাতক ইসলামি সমাজের জন্য একটি নতুন মূলনীতি ঘোষণা করেছে। সুতরাং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়বদ্ধতা হবে ব্যক্তিগত, যেখানে মানুষকে তার হাত যা উপার্জন করেছে সেই অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। **“অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।”** [আয-যিলযাল: ৭-৮]। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এই ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে এই ভিত্তিতে যে, কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝার ভার বহন করবে না এবং কিয়ামতের দিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কোনো দায়ভার গ্রহণ করবে না, আর কোনো সন্তানও তার পিতার পক্ষ থেকে সামান্যতম দায়ভার গ্রহণ করবে না; বরং প্রত্যেক মানুষ কিয়ামতের দিন তার নিজের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

এই কারণে এই আকিদা জাহেলিয়াতের সেই গোত্রীয় অন্ধ পক্ষপাতের (আসাবিয়্যাহ) দাবিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে যা এই ধারণা পোষণ করত যে, এক ব্যক্তির অপরাধের কারণে অন্য ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হবে—যেমনটি গোত্রীয় প্রতিশোধ গ্রহণের প্রথায় বিদ্যমান ছিল—এবং যার সাথে গোত্রের প্রত্যেক সদস্যকে সাহায্য করার ডাক যুক্ত ছিল, সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। এর অর্থ হলো, পুনরুত্থান ও হিসাবের ধারণা মানুষের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাকে সাব্যস্ত করে এবং প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী। **“প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।”** [আল-মুদ্দাসসির: ৩৮]। **“আর মানুষ যা চেষ্টা করে তা-ই সে পায়।”**

পৃষ্ঠা 55

শরয়ী রাজনীতি

দ্বিতীয় পাঠ

“মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করে এবং শীঘ্রই তার প্রচেষ্টার ফল তাকে দেখানো হবে।” [আন-নাজম: ৩৮-৩৯]। “আর কোনো ভার বহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না।” [আল-আন’আম: ১৬৪]। এটি জাহিলী যুগের গোত্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রচলিত কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কেননা তখন ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা বলে কিছু পরিচিত ছিল না। বরং তারা একজনকে অন্যের অপরাধে এবং অন্যের পাপের কারণে পাকড়াও করত, যেমনটি প্রতিশোধ গ্রহণের (রক্তের বদলা) ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটত।

ইসলাম বিধান দিয়েছে যে, কেবল হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তারা (জাহেলিয়াতের লোকেরা) যদি হত্যাকারীকে পাকড়াও করতে সক্ষম না হতো, তবে তারা তার পরিবারের যে কোনো সদস্যকে হত্যা করত। এটি এমন একটি বিষয় যা ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম যে আকিদা বা বিশ্বাসের দাওয়াত নিয়ে এসেছে, তার মাধ্যমে এই প্রথাকে নির্মূল করেছে; আর তা হলো: ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা। পবিত্র কুরআন পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের দিনের এক ভয়াবহ চিত্র অংকনের মাধ্যমে মানুষের কাছে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার গুরুত্বকে সুনিশ্চিত করেছে। সেদিনের ভয়াবহতা প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী মাকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কে ভুলিয়ে দেবে এবং সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন এক অবস্থা হবে যা তাকে অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ করে রাখবে।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি উন্মুক্ত আমলনামা বের করা হবে, যাতে লেখা থাকবে: “তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।” [আল-ইসরা: ১৪]। আরও ইরশাদ হয়েছে: “সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন এক অবস্থা হবে যা তাকে (ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য) যথেষ্ট হবে।” [আবাসা: ৩৪-৩৬]। “যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। আর তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়; বরং আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।” [আল-হজ্জ: ২] ।

এভাবেই পুনরুত্থান ও হিসাবের আকিদা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা রক্তের সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত গোত্রীয় গোঁড়ামির বন্ধনকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। এর স্থলাভিষিক্ত করেছে এক নতুন দায়বদ্ধতা, যা ব্যক্তিকে এমন এক কেন্দ্রে পরিণত করে যা বিবেকের পর্যবেক্ষণ এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা বা তাকওয়ার ভিত্তিতে বিকশিত হয়। আর সেই ঐক্য দ্বারা আমরা উদ্দেশ্য নিচ্ছি: সেই সংহতি যার মধ্যে ব্যক্তিরা একে অপরের পাশে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: “মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতার উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়; যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন পুরো দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তার কষ্টে অংশীদার হয়।” তিনি আরও বলেন: “এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় রাখে।”

দ্বিতীয় পাঠ: শরয়ি রাজনীতি

৩. গোত্রীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে তাকওয়াকে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা, যার পরিধি কেবল গোত্রের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয় এবং একই সাথে তা কেবল আরবদের অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং তাদের পার্শ্ববর্তী সকল জাতিগোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামে তাকওয়াই এমন এক নতুন নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে যা এমন একটি সমাজ গঠনের পথ দেখায় যেখানে গোত্রীয় মানদণ্ডের কোনো আধিপত্য থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" [আল-হুজুরাত: ১৩]। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হলো কেবল তাকওয়া এবং সৎকর্ম। বংশ, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোনো পার্থক্যের দিকে ইসলাম দৃষ্টিপাত করে না; বরং তা কেবল তাকওয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখে: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।"

নবী (সা.) আরও স্পষ্ট করেছেন যে, তাকওয়া ও সৎকর্ম ব্যতীত কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তিনি (সা.) বলেন: "মানুষ চিরুনির দাঁতের ন্যায় সমান, তাকওয়া ব্যতীত একজনের ওপর অন্যজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" অতএব, ইসলামের শরীয়ত মানুষের মাঝে সমতা বিধানের জন্য এসেছে এবং তারা আল্লাহর সম্মুখে সমান। তবে যা একজনের থেকে অন্যজনকে পৃথক করে তা হলো তাকওয়া, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর উল্লিখিত আয়াতে ব্যক্ত করেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" ইসলামে জাতি ও গোত্রসমূহ কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, বরং সমাজ ব্যবস্থায় মানুষেরা আল্লাহর সামনে সমান, তাদের মূল উৎস ও বংশ নির্বিশেষে। মানুষের মধ্যকার পার্থক্যটি হলো নৈতিক পার্থক্য যা বংশগত উত্তরাধিকারের ওপর ভিত্তি করে নয়, যেমনটি গোত্রীয় গোঁড়ামিতে দেখা যায়। যে কেউ মর্যাদা লাভ করে তা বংশমর্যাদা বা ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নয়, বরং তার প্রচেষ্টা, পুণ্য ও তাকওয়ার ভিত্তিতে।

ইসলামে তাকওয়া ও এর নৈতিক মানদণ্ডগুলো মানুষের মধ্যকার সম্পর্কগুলোকে নতুন নিয়মের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করতে শুরু করে এবং তাদেরকে গোত্রীয় প্রথার অন্ধকার থেকে বের করে আনে যা পৌঁছেছিল...

শরয়ী রাজনীতি
দ্বিতীয় পাঠ

মক্কার সমাজে এর কুপ্রভাবগুলো অত্যন্ত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ইসলামি ব্যবস্থা যা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা মক্কার সেই ঘৃণ্য বস্তুবাদী অবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে যা গোত্রীয় ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল। কেননা সেখানে মানুষ সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারা সম্পদ জমা করা এবং এর মোহে মত্ত হয়ে এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করত এবং অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহিত করত না। তারা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক পাপে নিমজ্জিত ছিল এবং সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল। অর্থনৈতিক লেনদেন ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তারা প্রবৃত্তির অনুসারী ছিল। জাহেলি যুগে অবস্থা এমনই ছিল; তখন জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ধন-সম্পদের মোহ এবং দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের ভিত্তিতে। কিন্তু তাকওয়া এসে এ কথা স্পষ্ট করে দিল যে, সকল মানুষ সমান এবং তাকওয়া ছাড়া একজনের ওপর অন্যজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বংশমর্যাদা বা

ধন-সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন যা প্রাচীন গোত্রীয় প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং নতুন সমাজের শৃঙ্খলা ও এর সদস্যদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তাকওয়ার মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে। মহান আল্লাহ বলেন: **"বলুন, এসো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না—আমিই তোমাদের ও তাদের রিজিক দেই, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য কোনো অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না এবং আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝতে পারো। আর এতিমের সম্পদের ধারেকাছেও যেও না, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে অতি উত্তম পন্থায় তার দেখাশোনা করা যাবে। আর মাপ ও ওজন পূর্ণ করো ন্যায়ের সাথে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব প্রদান করি না। আর যখন তোমরা কোনো কথা বলবে তখন ন্যায়ের সাথে বলবে, যদিও সে নিকটাত্মীয় হয় এবং আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"** [আল-আনআম: ১৫১-১৫২]

ইসলাম একই সাথে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে যে, তাকওয়া ও এর মূলনীতিগুলোর উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিকভাবে এই দায়িত্বগুলো পালন করা নয়; বরং এর প্রকৃত লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, একজন মুসলিমের কাছে দাবি হলো সে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত এসকল ফরজ ইবাদত পালন করবে, তখন সে যেন তা একমাত্র আল্লাহর চেহারার উদ্দেশ্যে খাঁটি মনে আদায় করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: **"তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।"** [আল-বাইয়্যিনাহ: ৫]। অতএব, ইখলাস বা নিয়তের একনিষ্ঠতা থাকা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

আল্লাহর জন্য কর্ম সম্পাদন; এই কারণেই নবী (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত পার্থিব কোনো সম্পদ লাভের জন্য কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।" এই কারণেই আমরা বলেছি: ইসলাম একই সাথে এই বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে যে, তাকওয়া এবং এর মূলনীতিগুলো কেবল বাহ্যিক বাধ্যবাধকতা পালনের নাম নয়; বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কারণ মানুষকে তার সকল কর্মের জন্য সেই দিন জবাবদিহি করতে হবে যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোনো কাজে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।

৪. সকল ঐশী বাণীর (রিসালাত) অভিন্নতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা; আর এগুলোর সকল শিক্ষা মূলত একটি উৎস থেকেই উৎসারিত, আর তা হলো মহান আল্লাহ। এটি ছিল প্রাক-ইসলামী গোত্রীয় জীবনে বিদ্যমান বহুবিধ বিশ্বাস এবং মূর্তিপূজা, শিরক ও বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় ব্যবস্থার অবসানের জন্য, যা খ্রিষ্টান বা ইহুদি অনুসারীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআন বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে, ইসলামি দাওয়াত পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সত্যায়নকারী এবং এটি বিশেষভাবে আরবদের জন্য তাদের পিতা ইব্রাহিম (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণের আহ্বানস্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন:
"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমি তোমার প্রতি ওহি করেছি এবং যার নির্দেশ আমি ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছ, তা তাদের নিকট অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন সান্নিধ্যে টেনে নেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি তাঁর পথ দেখান।" [আশ-শূরা: ১৩]

ইসলাম সকল ঐশী বাণীর ঐক্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছে; কারণ সকল রিসালাতের মূল প্রতিপাদ্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, আর তা হলো আল্লাহর একত্ববাদ। আর ইসলামই হলো এই সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই

আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।" [আল-ইমরান: ১৯]। তিনি আরও বলেন: "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করলে তা কখনোই তার থেকে কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [আল-ইমরান: ৮৫]।
সুতরাং সকল ঐশী বাণী কেবল একটি উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছে, আর তা হলো আল্লাহর একত্ববাদ। নতুন এই দ্বীন এই প্রসঙ্গের ওপরই গুরুত্বারোপ করেছিল, যা নবুওয়াত-পূর্ব গোত্রীয় প্রথাগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বিতীয় পাঠ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে আকিদাহ ও বিশ্বাস ছিল বহুমুখী; যেমন মূর্তিপূজা, দেব-দেবীর উপাসনা এবং আরও অনেক কিছু। অতঃপর ইসলাম এসে তাদের নিকট এটি স্পষ্ট করে দিল যে, সকল আসমানি বার্তার মূল উৎস অভিন্ন এবং আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।

পবিত্র কুরআন আরবদেরকে কাহলান বা আদনান গোত্রীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সম্বোধন করেনি; অর্থাৎ কেবল আরবীয় গোত্র হওয়ার ভিত্তিতে সম্বোধন করেনি, বরং কুরআনের আয়াতসমূহ তাদেরকে তাদের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাত বা আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। এটি তোমাদের পিতা ইবরাহিমের আদর্শ। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'।" [আল-হাজ্জ: ৭৮]

সকল আসমানি বার্তার এই একত্বই ছিল সেই পথ, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদেরকে গোত্রীয় অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি থেকে বের করে সেই ঐক্যের পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, যেদিকে তিনি শেষ নবী হিসেবে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর ইসলামি দ্বীন হলো তাদের পিতা ইবরাহিমের দ্বীন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিশা দিয়েছেন, যা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন এবং একনিষ্ঠ ইবরাহিমের আদর্শ; আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" [আল-আনআম: ১৬১]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "মানুষের মধ্যে ইবরাহিমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তো তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।" [আলে ইমরান: ৬৮]

এগুলোই ছিল সেই মূলনীতি যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং মক্কায় ইসলামি বিধিবিধানের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু মক্কাবাসী ও কাফেররা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই গোত্রীয় প্রথাগুলো ভেঙে ফেলার সুযোগ দিয়েছিল, যার ছায়াতলে তারা বসবাস করত এবং যা থেকে তারা সুবিধা লাভ করত?

তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলামি বিধিবিধানগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তার বিপরীতে গোত্রীয় ব্যবস্থার পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, যা আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে আনীত নতুন ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রমিক উন্নতির পথ অবলম্বন করেছিলেন; বিশেষ করে মক্কার গোত্রীয় ব্যবস্থার পক্ষ থেকে তিনি যে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার মোকাবিলায়।

দ্বিতীয় পাঠ

পবিত্র কুরআন মক্কায় রাসূলের দাওয়াতি সংগ্রামের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করেছে:

প্রথম: আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর বংশের লোক ও নিকটাত্মীয়দের থেকে দাওয়াত শুরু করেন। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীতে বর্ণিত হয়েছে: "আর আপনার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করুন।" [আশ-শুআরা: ২১৪]। রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে, যখন দাওয়াতের পরিধি অন্যান্য বংশ ও গোত্রে সম্প্রসারিত হবে, তখন তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য তাঁর বংশীয় লোকেরা অধিকতর প্রস্তুত থাকবে।

দ্বিতীয়: এরপর আল্লাহ নবীকে মক্কা ও তার চারপাশের এলাকায় তাঁর রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহর বাণী: "যাতে আপনি জনপদসমূহের জননী (মক্কা) এবং তার চারপাশের অধিবাসীদের সতর্ক করতে পারেন।" [আল-আনআম: ৯২]। এই পর্যায়টি দাওয়াতকে একটি নির্দিষ্ট বংশ থেকে মক্কার সার্বভৌমত্বের অধিকারী কুরাইশ গোত্র এবং মক্কার বাইরে বসবাসরত তাদের মিত্রদের মাঝে স্থানান্তরের প্রতিনিধিত্ব করে।

তৃতীয়: আল্লাহ রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের নিকট এটি স্পষ্ট করতে যে, তাঁর দাওয়াত এবং তা প্রচারের ধারাবাহিকতার মানে এই নয় যে এটি কুরাইশ ও আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি আহ্বান। এই দাওয়াতের মাধ্যমে আনীত সকল আকিদা ও ব্যবস্থার অপরিসীম গুরুত্ব মহান আল্লাহর এই বাণীতে স্পষ্ট হয়: "এটি তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।" [ইউসুফ: ১০৪] এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" [সাবা: ২৮]। সুতরাং এই দাওয়াত হলো সকল মানুষের জন্য একটি বিশ্বজনীন দাওয়াত। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; কারণ এটি সর্বশেষ দাওয়াত এবং রাসূল হলেন সর্বশেষ রাসূল। এই কারণেই এটি ছিল সকল মানুষের জন্য দাওয়াত, যা সমগ্র মানবজাতির নিকট পাঠানো হয়েছে, যেমনটি নবী স্পষ্ট করেছেন। রাসূলের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে কিছু লোক ইসলামি দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন, তবে এটি ছিল একটি ব্যক্তিগত সাড়া যার মূলে ছিল পবিত্র কুরআন যা নিয়ে এসেছে তার প্রতি অকৃত্রিম ঈমান। এতে গোত্রীয় পক্ষপাতের (আসাবিয়্যাহ) কোনো প্রভাব ছিল না। অর্থাৎ: রাসূলের বংশের যে কয়জন লোক তাঁর দাওয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা গোত্রীয় পক্ষপাতের কারণে কিংবা তিনি তাঁদের বংশের লোক বলে ঈমান আনেননি, বরং পবিত্র কুরআন যেভাবে এই দাওয়াতকে স্পষ্ট করেছে তার প্রতি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ

সম্মানিত রাসূল তাঁর গোত্র থেকে তখন উপকৃত হয়েছিলেন যখন তাঁর চাচা আবু তালিব ইসলামী দাওয়াতের সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে একই সময়ে সম্মানিত রাসূল তাঁর গোত্রের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বা নিজেকে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি; কারণ এটি তাঁর দাওয়াতের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না, যার লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার গোত্রীয় সংকীর্ণতা বা আছাবিয়্যাহ নির্মূল করা। উপরন্তু, গোত্রীয় সংকীর্ণতা নিজেই অন্ধভাবে রাসূলের বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে চরম কষ্ট দিতে শুরু করেছিল। ঠিক যেমনটি করেছিলেন রাসূলের নিজের এক চাচা, যার নাম আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী। এই গোঁড়া মুশরিকের বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে: "আবু লাহাবের হাত দুটি ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও যা সে অর্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসেনি। শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে, এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহনকারী; তার গলায় রয়েছে পাকানো রশি।" [সূরা আল-মাসাদ: ১-৫]।

এর অর্থ হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত গোত্রপ্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এর প্রমাণ হলো, নবীর সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি—যিনি তাঁর চাচা—তিনিই তাঁর চরম শত্রু হিসেবে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই যখন এই দাওয়াত সক্রিয় হয় এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর অর্থ এই নয় যে এটি কোনো গোত্রীয় বা বংশীয় দাওয়াত; বরং এটি সকল মানুষের জন্য একটি দাওয়াত। মানুষ যখন এই দাওয়াতে প্রবেশ করে, তখন তারা কোনো গোত্রীয় বা বংশীয় টানে প্রবেশ করে না; বরং দাওয়াত যে সকল দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে তার ভিত্তিতেই এতে প্রবেশ করে, যা প্রমাণ করে যে এটিই সত্য দাওয়াত এবং এতে সকল মানুষের প্রবেশ করা উচিত।

যখন ইসলামী দাওয়াত গোত্রীয় প্রথাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সফল হলো এবং ইসলাম গ্রহণকারী প্রাথমিক ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন গোত্রীয় সংকীর্ণতার আগুন পরিবার থেকে কুরাইশ গোত্র পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। কুরাইশদের উচ্চবিত্ত সমাজ—অর্থাৎ বিভিন্ন বংশ ও উপ-বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা রাসূলের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল তখন, যখন তারা তাদের গোত্রীয় ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য রাসূলের অনুসারীদের এই সংগঠনের মধ্যে বিপদ অনুভব করেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

সুতরাং: যখন তারা দেখল যে এই দাওয়াত (আহ্বান) সেই গোত্রীয় ব্যবস্থার ক্ষতি করবে যার ওপর তারা দাওয়াতের আগে চলত, তারা এতে বিপদ অনুভব করল। তাই তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে ওঁত পেতে দাঁড়াল তাঁকে প্রতিহত করার জন্য এবং এই গোত্রীয় ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য যা তাদের স্বার্থ নিশ্চিত করত। এজন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রথমে রাসূলুল্লাহ যা নিয়ে এসেছিলেন তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করল এবং একে তাদের গোত্রীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী হিসেবে বর্ণনা করল। তারা এ সম্পর্কে তেমনটাই বলেছিল যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে এ কথা শুনিনি।" [আল-কাসাস: ৩৬] এবং আরও: "আমরা শেষ ধর্মাদর্শে এ কথা শুনিনি।" [সোয়াদ: ৭] ।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এরপর কেবল নিন্দা করার গণ্ডি পেরিয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে বস্তুগত ও আদর্শগতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিকে ধাবিত হলো। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, যদিও তাঁর দাওয়াত ধর্মীয়ভাবে শুরু হয়েছে, তবে এর শিক্ষাগুলো তাঁর অনুসারীদের মাঝে এমন নতুন নিয়ম তৈরি করতে শুরু করেছে যা গোত্রীয় ব্যবস্থার ঐক্য ও ঐতিহ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নতুন দ্বীনের অনুসারীরা তাদের বংশ ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের গোত্রীয় গোঁড়ামি ও বন্ধন ত্যাগ করল।

তারা নতুন বন্ধন এবং নতুন আদর্শ ও মূল্যবোধের একটি গোষ্ঠী গঠন করল। পবিত্র কুরআন একই পরিবারের ভেতরের এই সংগ্রামের প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করেছে, যেখানে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার কেউ করেনি। মহান আল্লাহ বলেন: "আর যে তার পিতামাতাকে বলে, 'উফ তোমাদের প্রতি! তোমরা কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, আমি পুনরুত্থিত হব? অথচ আমার আগে বহু প্রজন্ম গত হয়ে গেছে।' তখন তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার! ঈমান আনো, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলে, 'এগুলো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়'।" [আল-আহকাফ: ১৭]।

অতঃপর পবিত্র কুরআন এই প্রাথমিক পরিস্থিতির বিশেষ রূপরেখা অঙ্কন করেছে মহান আল্লাহর এই বাণীতে: "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তবে তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।" [আল-আনকাবুত: ৮]। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দেখতে পেল যে, মক্কার সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে: এক সমাজ যার নিয়ম-কানুন তাকে বিস্তৃতি ও প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য প্রস্তুত করেছে এবং যা ইসলামে বিশ্বাসী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করেছে; আর অন্যটি একটি স্থবির সমাজ যা পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, আর তা হলো সেই গোত্রীয় সমাজ যা...

শরয়ী রাজনীতি
দ্বিতীয় পাঠ

মক্কায় নেতৃবৃন্দ (আল-মালা) এর নেতৃত্ব পরিচালনা করত। তৎকালীন পরিস্থিতি এই নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে রাসূলের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছিল, যাঁর শিক্ষা ও নতুন মানদণ্ড খোদ নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্ব এবং মক্কার ভেতরে ও বাইরে কুরাইশ গোত্রের মর্যাদাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। ইসলামি দাওয়াত এবং এটি যে নতুন ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছিল, তা বংশীয় আভিজাত্য ও ধন-সম্পদের পরিবর্তে তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিল। এটি সাধারণ নেতৃত্বের এমন এক নতুন অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল, যেখানে মক্কার নেতৃবৃন্দ বা গোত্রীয় প্রধানদের কোনো অংশ ছিল না। নেতৃবৃন্দের ভয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ ইসলামি বিধান অনুযায়ী এই নতুন নেতৃত্বের সর্বোচ্চ বিষয়গুলো খোদ রাসূলের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল, যেখানে কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিল।

নেতৃবৃন্দ এই নতুন ইসলামি ব্যবস্থার অগ্রযাত্রার ব্যাপারে তাদের ভীতি প্রকাশ করেছিল; কারণ এটি গোত্রীয় নেতৃত্ব ব্যবস্থার নির্ধারিত নিয়মাবলী থেকে ভিন্ন ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণীতে এসেছে: "তারা বলল, 'এই কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না?'" (যুখরুফ: ৩১)। পবিত্র কুরআন মক্কায় নেতৃবৃন্দের তাদের নিজেদের মর্যাদা হারানোর ভয়ের প্রকৃত কারণগুলো সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি যখনই কোনো জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিত্তশালী ও প্রভাবশালীরা বলেছে, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করি'। তারা আরও বলেছে, 'আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক শক্তিশালী, আমাদের কখনো শাস্তি দেওয়া হবে না'। আপনি বলুন, 'নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না'। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে শান্তিতে থাকবে" (সাবা: ৩৪-৩৭)।

অবশেষে নেতৃবৃন্দ সাধারণ কুরাইশ ও তাদের গোত্রগুলোকে নিজেদের পতাকাতলে একত্রিত করার জন্য একটি উসিলা খুঁজে পেল, যখন ইসলামি শিক্ষা কুরাইশদের পৌত্তলিকতা ও মুশরিকদের উপাস্যদের আক্রমণ করল। কারণ নেতৃবৃন্দ মনে করল যে, নতুন ইসলামি দাওয়াতের সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো: মক্কার মূর্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত কুরাইশদের সার্বভৌমত্বের বিলুপ্তি।

পৃষ্ঠা 64

দ্বিতীয় পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

কাবায় গোত্রসমূহ এবং ঐ সকল গোত্রের ব্যবসায়ী ও তাদের অধিবাসীদেরকে তাদের প্রাচীন গৃহ থেকে বিমুখ করার বিষয়ে। আল-কুরআনুল কারীম এই বিষয়টি নিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গ এবং রাসূলের মধ্যে চলা দ্বন্দ্বের প্রতি ইশারা করেছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে: "তারা বলে, 'যদি আমরা তোমার সাথে হিদায়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদের দেশ হতে আমাদের উচ্ছেদ করা হবে।' আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ পবিত্র স্থান (হারাম) প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে সব ধরণের ফলমূল সংগৃহীত হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। আর আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা তাদের জীবনোপকরণের মোহে দম্ভ করত। এগুলোই তাদের ঘরবাড়ি, তাদের পরে এগুলোতে অল্পই বসবাস করা হয়েছে এবং আমিই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী।" [আল-কাসাস: ৫৭-৫৮]

কুরাইশ নেতৃবর্গ এবং সম্মানিত রাসূলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বিভিন্ন পর্যায়ে অতিবাহিত হয়, যার প্রতিটি পর্যায়ের ফলাফল এটি প্রকাশ করেছে যে, গোত্রীয় ব্যবস্থা তার প্রভাব হারিয়েছে এবং এটি যে প্রতিরোধ প্রদর্শন করছিল তা ছিল মূলত মৃত্যুর পূর্বে শেষ স্পন্দন মাত্র। অন্যদিকে ইসলামী বিধানসমূহ এমন এক তেজস্বিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বহন করছিল যা এক নতুন বিশ্বজনীন সমাজের অগ্রযাত্রার বার্তা দিচ্ছিল। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতের জন্য বিজয় লিখে দিয়েছিলেন। এভাবেই ইসলামী শিক্ষা তার অনুসারীদের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গের সামনে এক নতুন মূলনীতি বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছিল, আর তা হলো: ব্যক্তির দায়িত্ব আর কেবল নিজের গোত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এখন থেকে ইসলামী দাওয়াতের অনুসারী সকল মুমিনদের পরিব্যপ্ত করবে, তারা যে গোত্রীয় বংশ থেকেই আসুক না কেন। এই নতুন ধারণাটি সমগ্র গোত্রীয় জীবন ব্যবস্থাকে প্রকম্পিত করতে শুরু করেছিল, যদিও কুরাইশদের ঔদ্ধত্য এবং তাদের নেতৃবর্গ সেই গোত্রীয় জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। একই সময়ে সম্মানিত রাসূলের সামনে এই ধারণা এবং এই দাওয়াতকে — যার ওপর ভিত্তি করে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত — একটি নতুন ময়দানে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না। এটি ছিল অনেকটা এমন চারাগাছের মতো যা তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অধিকতর উপযোগী নতুন মাটিতে রোপণ করা প্রয়োজন। কারণ সম্মানিত রাসূলের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মক্কার পরিবেশ কুরাইশ নেতৃবর্গের হঠকারিতার কারণে গোত্রীয় ব্যবস্থা এবং জাহেলী আভিজাত্যের দুর্গে পরিণত হয়েছে, এবং কুরাইশদের মাটি ছাড়া অন্য কোনো নতুন মাটি অনুসন্ধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই নবী (সা.) মদীনা মুনাওয়ারাহকে বেছে নিয়েছিলেন।

পৃষ্ঠা 65

শারয়ি রাজনীতি

মদীনায় নবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত অন্তর্বর্তীকালীন ও মৌলিক ব্যবস্থাসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

সম্মানিত রাসূল ﷺ-এর কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মক্কার পরিবেশ—কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হঠকারিতার কারণে—গোত্রীয় প্রথা এবং তাদের জাহিলি গোত্রপ্রীতির এক দুর্গে পরিণত হয়েছে। ফলে কুরাইশের মাটি ছাড়া ভিন্ন কোনো নতুন মাটির সন্ধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘উকায’ বাজারকে নির্বাচন করেন, কেননা তা ছিল গোত্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তিনি মক্কার বাইরে থেকে এই বাজারে আসা আরব গোত্রসমূহ এবং তাদের মিত্রদের কাছে ইসলামি দাওয়াত পেশ করতে শুরু করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াসরিবের—যা পরবর্তীতে মদীনায় পরিণত হয়েছে—আউস গোত্রের একদল লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা তাদের গোত্রের জন্য খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করতে মক্কায় এসেছিল। খাযরাজ ছিল ইয়াসরিবের দ্বিতীয় বৃহৎ গোত্র। নবী ﷺ আউস গোত্রের এই দলটির কাছে তারা যে গোত্রীয় দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ছিল তার ভয়াবহ পরিণতি এবং কুরাইশদের সাথে মিত্রতার মাধ্যমে সেই যুদ্ধের আগুন উসকে দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তিনি ﷺ তাদের এর চেয়ে উত্তম কিছুর প্রতি আহ্বান জানান, আর তা হলো ইসলাম গ্রহণ। যদিও এই দলটি তখন ঈমান আনেনি, তবুও যখন তারা ইয়াসরিবে ফিরে গেল, তখন তারা এর অধিবাসীদের মাঝে নতুন ইসলামি দাওয়াতের খবর এবং মক্কায় রাসূল ﷺ-এর সংগ্রামের কথা ছড়িয়ে দিল। মক্কার নতুন নবী সম্পর্কে আউস গোত্রের লোকদের দেওয়া তথ্যে খাযরাজ গোত্র আলোড়িত হয়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করল যে, ইয়াসরিবের পরিস্থিতিই তাদের নবী ﷺ-এর দাওয়াত সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করছে। এর কারণ ছিল ইয়াসরিবের আউস ও খাযরাজ গোত্রের অধিবাসীরা তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছ থেকে একজন নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে আসার কথা শুনেছিল এবং ইহুদিরা এই নবুওয়াতকে পুঁজি করে পুরো ইয়াসরিবের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করছিল।

তাই যখন খাযরাজ গোত্রের বনু আবদিল আশহাল শাখার একদল লোক উকায বাজারে বের হলো এবং নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করল, তারা ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে ইসলামি দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হলো; যাতে আউস বা ইহুদিরা এই পথে তাদের চেয়ে এগিয়ে যেতে না পারে। আর এই বিষয়টি পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে...

মহান রাসুল ﷺ-এর সাথে খাযরাজ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ইসলামের সুমহান শিক্ষার আহ্বান অনুযায়ী ব্যক্তির কর্তব্যের পরিধি গোত্রের গণ্ডির বাইরে বিস্তৃত হওয়ার মূলনীতির প্রতি খাযরাজ গোত্রের ইতিবাচক সাড়াদানের গভীরতা ফুটিয়ে তোলে। এই মূলনীতিটি ছিল ইয়াসরিবে মুসলিমদের রাজনৈতিক সংগঠনের অগ্রযাত্রা হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর ও উপযোগী, যা মহান রাসুল ﷺ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তারা মহান রাসুল ﷺ-কে বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আমাদের কওমকে এমন এক অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তাদের মাঝে যে শত্রুতা ও বিবাদ বিদ্যমান, তেমনটি আর কোনো কওমের মধ্যে নেই। আশা করা যায় আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করবেন। সুতরাং আমরা তাদের কাছে ফিরে যাব এবং তাদেরকে আপনার এই দ্বীনের দাওয়াত দেব ও তাদের সামনে তা পেশ করব যা আমরা আপনার নিকট থেকে গ্রহণ করেছি। যদি আল্লাহ তাদেরকে এই দ্বীনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে দেন, তবে আপনার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও শক্তিশালী আর কেউ থাকবে না।"

অতঃপর ইসলামি দাওয়াত ও এর আদর্শ ইয়াসরিববাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পেতে শুরু করল। এমনকি পরবর্তী হজের মৌসুম এলে ইয়াসরিব থেকে বারো সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হলো; যাদের মধ্যে নয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং তিনজন ছিলেন আওস গোত্রের। তারা মিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী আকাবায় মহান রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ইসলামের ওপর তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলেন। খাযরাজ ও আওস—উভয় গোত্রের সমন্বয়ে এই প্রতিনিধিদল গঠন এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ব্যক্তির কর্তব্যের ধারণাটি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তা আর কেবল নির্দিষ্ট গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

এরপর মহান রাসুল ﷺ আরও একটি সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, যা মুসলিম জামাতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। নবী ﷺ এই প্রতিনিধিদল যখন ইয়াসরিবে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তাদের সাথে ইসলামের প্রথম দিককার জনৈক সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। তিনি হলেন বনু আবদুদ দারের মুসআব বিন উমাইর। তাকে পাঠানো হয়েছিল তাদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান প্রদানের জন্য। ইয়াসরিবে এই সাহাবী 'আল-মুকরি' (কুরআন শিক্ষক) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই উপাধিটি গোত্রীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামি দাওয়াতকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে নেতৃত্বের এক নতুন ধারার পরিচয় দেয়। কেননা, এই 'মুকরি' আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেদের সালাতে ইমামতি করতেন যেন কোনো প্রকার গোত্রীয় আভিজাত্যের লড়াই মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে। একইভাবে, মহান রাসুল ﷺ-এর অনুসৃত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি ও ধৈর্যশীলতার ওপর নিষ্ঠার সাথে অবিচল থেকে তিনি ইয়াসরিবে মুসলিম জামাতের অনুকূলে আওস গোত্রের প্রধান দুই নেতাকে জয় করতে সক্ষম হন। তারা হলেন: সা'দ বিন মুআয এবং উসায়েদ বিন হুদায়র।

শরয়ি রাজনীতি

দ্বিতীয় পাঠ

এই শিক্ষক নেতার বদৌলতে ইয়াসরিব এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের অগ্রযাত্রার সাক্ষী হতে শুরু করে, যা গোত্রীয় গোঁড়ামি এবং রক্ত সম্পর্কের পরিবর্তে দ্বীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মুসলিমদের এই নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন পরবর্তী বছরের হজের সময় মুসআব মক্কায় আসেন এবং তার সাথে তেহাত্তর জন পুরুষ ও দুইজন নারীর একটি প্রতিনিধি দল ছিল। তারা আকাবায় আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিখ্যাত দ্বিতীয় 'বায়আতে আকাবা' সম্পাদন করেন। এই বায়আতের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল এবং ইয়াসরিবের মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে পারস্পরিক অঙ্গীকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ, গোত্রীয় ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থায় উত্তরণ একই সাথে বাস্তব প্রয়োগ এবং পরীক্ষার স্তরে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল, যখন আল্লাহর রাসূল এবং ইয়াসরিবের মুসলিমরা একে অপরের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি বিনিময় করেন।

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব তখন নবীজির সাথে দ্বিতীয় আকাবার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। যদিও তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও ইয়াসরিববাসীদের কাছ থেকে আল্লাহর রাসূলের পক্ষে প্রতিশ্রুতি আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি আলোচনার সূচনা করেন। তিনি বললেন: "হে খাযরাজ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ আমাদের মাঝে কোন অবস্থানে আছেন তা তোমরা জানো। আমরা তাকে আমাদের কওমের মধ্যকার ঐসব লোকদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছি যারা আমাদের মতোই তার বিরোধী মত পোষণ করে। তিনি তার কওমের মাঝে অত্যন্ত মর্যাদায় এবং নিজের শহরে নিরাপত্তায় আছেন। তবে তিনি তোমাদের পক্ষাবলম্বন করতে এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে অনড়। এখন তোমরা তাকে যে দাওয়াত দিয়েছ, যদি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার এবং বিরুদ্ধবাদীদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার সামর্থ্য রাখো, তবে সেই দায়িত্ব তোমাদের। কিন্তু তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা তাকে শত্রুহস্তে সঁপে দিতে চাও এবং সাহায্যহীন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবে এখনই তাকে ত্যাগ করো। কেননা তিনি আপন কওম ও শহরে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যেই আছেন।" আব্বাসের কথার জবাবে খাযরাজ প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন: "আপনি যা বলেছেন তা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন এবং আপনার নিজের ও আপনার রবের জন্য যা পছন্দ করেন তা নির্ধারণ করুন।" অতঃপর আল্লাহর রাসূল কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন।

এরপর তিনি বললেন: "আমি তোমাদের নিকট এই মর্মে বায়আত নিচ্ছি যে, তোমরা আমাকে সেই সব কিছু থেকে রক্ষা করবে যা থেকে তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করো।" তখন সম্প্রদায়ের নেতা আল-বারা বিন মা'রূর আল্লাহর রাসূলের হাত ধরলেন এবং তাকে বললেন: "হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন..."

শরয়ী রাজনীতি
দ্বিতীয় পাঠ

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমরা আপনাকে অবশ্যই সেভাবেই রক্ষা করব যেভাবে আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের রক্ষা করি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম, আমরা তো যুদ্ধের মানুষ ও সমরাস্ত্রের অধিকারী; পুরুষানুক্রমে আমরা এর উত্তরাধিকারী। এখানে ইয়াসরিবের এক ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করলেন এবং রাসূলের কাছে আরও দৃঢ় অঙ্গীকার প্রার্থনা করলেন। কারণ ইসলামি দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ ছিল ইয়াসরিবের গোত্রগুলোর সাথে পার্শ্ববর্তী ইহুদিদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও এই লোকগুলোর—অর্থাৎ মদিনার ইহুদিদের—মাঝে কিছু চুক্তির বন্ধন রয়েছে, যা আমরা এখন ছিন্ন করতে যাচ্ছি। আমরা যদি তেমনটি করি এবং আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করেন, তবে কি আপনি আপনার কওমের কাছে ফিরে যাবেন এবং আমাদের ত্যাগ করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন: "না, বরং রক্তের বদলে রক্ত এবং ধ্বংসের বদলে ধ্বংস; আমি তোমাদের থেকে আর তোমরা আমার থেকে। তোমরা যার সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তার সাথে যুদ্ধ করব, আর তোমরা যার সাথে সন্ধি করবে আমিও তার সাথে সন্ধি করব।"

অতঃপর তিনি তাদের বললেন: "তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নকিব (প্রতিনিধি) বের করে দাও, যাতে তারা তাদের নিজ নিজ কওমের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে পারে।" তারা বারোজন নকিব নির্বাচন করল; নয়জন খাযরাজ গোত্র থেকে এবং তিনজন আওস গোত্র থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন: "ঈসা ইবনে মারইয়ামের হাওয়ারিগণ যেভাবে তাদের কওমের জিম্মাদার ছিলেন, তোমরাও তোমাদের কওমের ব্যাপারে সেভাবেই জিম্মাদার; আর আমি আমার কওমের জিম্মাদার।" এই বাইয়াত—যা 'দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, অথবা 'যুদ্ধের বাইয়াত' কিংবা যেটিকে তারা 'কালো ও লাল বর্ণ নির্বিশেষে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শপথ' হিসেবে ব্যক্ত করত—এই বাইয়াত ইসলামি দাওয়াত ও এর প্রবর্তককে রক্ষার অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই নবজাতক ইসলামি সমাজের সদস্যদের নিকট স্থানান্তরের ঘোষণা হিসেবে গণ্য হলো। এই চুক্তিটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যা তৎকালীন গোত্রীয় ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং একে সমূলে উৎখাতের বার্তা দিয়েছিল। কারণ তৎকালীন প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গোত্রের নিরাপত্তা বিধান ছাড়া কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু গোত্রের ক্ষমতার গণ্ডির বাইরে অন্য কোনো শক্তি এই রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে—যেমনটি দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত নির্ধারণ করেছিল—তা ছিল এক নতুন ব্যবস্থা যা কুরাইশ ও তাদের নেতৃবৃন্দ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যখন দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াতের সংবাদ পেল, তখন তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা তাদের গোত্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনায় যেতে বাধা দেওয়ার জন্য তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়নি।

পৃষ্ঠা 69

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বিতীয় পাঠ
দারুন নাদওয়ায় অনুষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মিলিতভাবে হত্যা করা হবে, যেখানে কুরাইশদের প্রতিটি শাখা থেকে একজন করে যুবক অংশগ্রহণ করবে। এর ফলে তাঁর রক্তের দাবি সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং রাসূলের পরিবার সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে অক্ষম হয়ে রক্তপণ গ্রহণে বাধ্য হবে। কিন্তু এই গোত্রীয় চিন্তাধারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত রাজনৈতিক কাঠামোর বিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সামগ্রিক গোত্রীয় পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে সক্ষম হন এবং সফলভাবে ইয়াসরিবে হিজরত করেন। সেখানে তিনি ইসলামী ব্যবস্থার ময়দানে এবং এর অর্জন ও লক্ষ্যসমূহের বিকাশে এক বিস্তৃত ও চমৎকার অধ্যায়ের সূচনা করেন। এখন আমরা মদীনায় মুমিন জামাতের ব্যবস্থা বা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণীত প্রশাসনিক বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

১. মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়সমূহ:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসরিবে হিজরতের পর ইসলামী দাওয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে ক্রমধারা ও বিবর্তনের একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যদিও এই পর্যায়ে মক্কার তুলনায় অনেক বেশি ও ব্যাপক প্রশাসনিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। এই নতুন পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাজনৈতিক প্রতিভা এবং ইয়াসরিবের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এটি মক্কায় প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ আদর্শ এবং শিক্ষার প্রসারে বা সেই দাওয়াত ও ব্যবস্থার প্রতিরক্ষায় তাঁর বিরল সাহসিকতার চেয়ে কোনো অংশেই কম চমৎকার ছিল না; যা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত গোত্রীয় প্রথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

ইয়াসরিবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের এক অনন্য সমন্বয় দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল; চাই তা বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে হোক কিংবা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার আলোকে হোক।

পৃষ্ঠা 70

ইসলামি রাজনীতি

দ্বিতীয় পাঠ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াসরিবে তাঁর হিজরতের প্রথম দিনগুলোতে যে সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে কিছু ছিল অন্তর্বর্তীকালীন এবং কিছু ছিল স্থায়ী বা মৌলিক। এগুলোর প্রতিটিই ছিল নবগঠিত ইসলামি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: ভ্রাতৃত্বের বিধান (নিযামুল মুআখাত): এটি ছিল মক্কার সেই সকল মুসলিমদের জীবনযাত্রার উপায় সহজ করার একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, যারা তাদের ইসলামি আকিদা ও সুদৃঢ় ঈমান রক্ষার তাগিদে নিজেদের সম্পদ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে ইয়াসরিবে হিজরত করেছিলেন। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই একদল মুসলিমের জন্য সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই ভ্রাতৃত্বের বিধানই ছিল গোত্রীয় চুক্তির ইসলামি বিকল্প। কেননা ধর্মের ভিত্তিই ছিল এই ভ্রাতৃত্বের মূল ভিত্তি, কোনো গোত্রীয় সংকীর্ণতা নয় যা ইতিপূর্বে গোত্রীয় চুক্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মুহাজিরদের ইয়াসরিবের মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের ভাই হওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে মক্কার প্রত্যেক মুহাজির ইয়াসরিবের একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে বসবাস করতে শুরু করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হতেন। ইয়াসরিবের মুসলিমগণ ভ্রাতৃত্বের এই বিধান পালনে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তার প্রশংসা করে বলেন: "আর যারা মুহাজিরদের আসার আগে এই নগরীতে (মদিনা) বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। তারা নিজেদের উপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যারা তাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই মূলত সফলকাম।" [সূরা হাশর: ৯]

ফলে ইয়াসরিবের প্রত্যেক মুসলিম তাঁর মুহাজির ভাইকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশীদার করে নেন এবং তাঁর কষ্ট লাঘব করতে সম্ভাব্য সব কিছু পেশ করেন। যখন মুহাজিরদের অবস্থার উন্নতি হলো, ইসলামের প্রভাব ও পরিধি বিস্তৃত হলো এবং অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন এই ভ্রাতৃত্বের ব্যবস্থার (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত) আর প্রয়োজন থাকল না। ফলে ইসলামি শরিয়ত এই অন্তর্বর্তীকালীন বিধানটি রহিত করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের অধিকতর হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সূরা আনফাল: ৭৫]

শারঈ রাজনীতি
দ্বিতীয় পাঠ

দ্বিতীয়ত: "মুহাজির ও আনসার" এই ইসলামি পরিভাষার ব্যবহার: ইয়াসরিবে নতুন ব্যবস্থার অগ্রগামীদের নির্দেশ করার জন্য এবং গোত্রীয় আভিজাত্য ও তার প্রথার পরিবর্তে আকিদাহ ও দ্বীনকে ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করার জন্য। মুহাজির বলতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সকল মুসলিমকে বোঝানো হতো, তাদের গোত্র বা বংশের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই। এই নতুন পরিভাষাটি তাঁদের জন্য এমন এক স্বতন্ত্র ঐক্যের পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল যা তাঁদের পূর্বতন গোত্রীয় পরিচয় থেকে তাঁদের আলাদা করে দিয়েছিল।

অনুরূপভাবে, "আনসার" পরিভাষাটি আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় ইয়াসরিবের মুসলিমদের একটি সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত হয়, যেখানে সংকীর্ণ গোত্রীয় আভিজাত্যের কোনো স্থান ছিল না। আকিদাহ ও দ্বীনের ঐক্যই ছিল মুহাজির ও আনসার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এটি সংকীর্ণ গোত্রপ্রীতি পরিহার করার এবং গোত্রপ্রীতির সাথে সম্পৃক্ত বিভেদের সকল কারণকে মূলোৎপাটন করার পথ প্রশস্ত করেছিল। মুহাজির ও আনসার ব্যবস্থা—এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভ্রাতৃত্বের (মুআখাত) ব্যবস্থা—একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের সোপান হয়ে উঠল। এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য এই দুই দলকে শামিল করল এবং পরবর্তীতে তাদের একটি একক সত্তায় একীভূত করল যা 'মুমিনদের জামাত' হিসেবে পরিচিতি পায়।

এই নতুন দল ও তার ব্যবস্থা ইয়াসরিবকে এমন এক জনপদে পরিণত করল যা 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শহর' বা মদিনাতুন্নবী হিসেবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। এটি এই নতুন ইসলামি ব্যবস্থা নির্মাণে এবং সেই জনপদে এর ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে ইয়াসরিব তার গোত্রীয় জীবনকে বিদায় জানায় এবং ইসলামের সুমহান ব্যবস্থা ও সুউচ্চ শিক্ষার যুগে পদার্পণ করে। এই নতুন যুগে ইয়াসরিব সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে তারা তাঁদের মহান নবীর নেতৃত্বে সরল পথের সন্ধান করত। এই নতুন যুগে সকলে একে 'নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শহর' বলতে শুরু করে—যে নামে আজও এটি স্মরণ করা হয় এবং মদিনা মুনাওয়ারা হিসেবে সবাই একে সম্মানের সাথে উচ্চারণ করে।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (ইসলামি রাজনীতি)
দ্বিতীয় পাঠ

এটি সেই অন্তর্বর্তীকালীন পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়াসরিব তথা মদিনায় আগমনের সময় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা বলেছি যে, এই অন্তর্বর্তীকালীন পদ্ধতিসমূহ ভ্রাতৃত্বের ব্যবস্থা (মুয়াখাত) এবং এরপর মুহাজির ও আনসারদের ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল।

২. মদিনায় মুমিনদের জামাতের জন্য নবী কর্তৃক প্রণীত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ:

সেখানে আরও কিছু মৌলিক পদ্ধতি ছিল যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গঠন করেছিলেন। এই সাংগঠনিক ব্যবস্থাগুলো ছিল সেই প্রবাহমান প্রস্রবণ সদৃশ যেখান থেকে ইসলামি পদ্ধতিসমূহ তাদের স্বকীয়তা এবং একই সাথে বিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছিল। কেননা সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সকল সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মুমিনদের জামাতকে একটি নতুন সমাজের উত্তম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল ইসলাম প্রচারের পথে জিহাদ এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনা। সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় হিজরতের পরবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হন:

প্রথমত: গোত্র ও প্রথার পরিবর্তে রাষ্ট্র ও আইনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কায় প্রচলিত কলুষিত গোত্রীয় ব্যবস্থা এবং অন্ধ গোত্রপ্রীতি সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল, যা গোত্রসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণেই তিনি—তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—মদিনায় তাঁর নবগঠিত জামাতের মধ্যে এই সকল গোত্রীয় ব্যাধিগুলোর বিস্তার রোধ করতে সচেষ্ট হন, যখন সেই সমাজটি তার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। অতঃপর তিনি মুহাজির ও আনসার মুসলিমদের একত্রিত করার মূল ভিত্তি হিসেবে দ্বীন ও আকীদাহকে গ্রহণ করেন, একটি এমন রাষ্ট্রে যেখানে এর সদস্যরা তাদের নতুন দ্বীনের মাঝে এক সুদৃঢ় বন্ধন খুঁজে পায়, যা গোত্রীয় সম্পর্কের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ব্যবস্থাকে একটি নতুন ভিত্তির ওপরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আর তা হলো গোত্রীয় প্রথার পরিবর্তে শরীয়ত ভিত্তিক আইন এবং সেই প্রথাগত ধ্বংসাত্মক গোত্রপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকা।

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
দ্বিতীয় পাঠ

মদিনায় রাসূলুল্লাহর ওপর নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো এমন সব বিধি-বিধানে সমৃদ্ধ ছিল যা নবজাতক ইসলামি রাষ্ট্রের ভিতকে শক্তিশালী করেছিল। এটি রাষ্ট্রকে এমন এক গতিশীল ও প্রাণবন্ত শক্তিতে পরিণত করেছিল যা তার চারপাশের স্থবির ও অচল গোত্রীয় সমাজব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিল।

দ্বিতীয়ত: নাগরিকত্ব ব্যবস্থা এবং এর অধিকারসমূহের স্বীকৃতি:

এর ভিত্তি ছিল গোত্রীয় সংকীর্ণতার পরিবর্তে বাতিলের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হিজরত করা। নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করার মূল ভিত্তি ছিল হিজরত। এটি ছিল রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ, যিনি শিরক ও গোত্রীয় গোমরাহির আবাসস্থল থেকে হিজরত করে হেদায়েত, দ্বীনের বিজয় এবং মানবিক মর্যাদার ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করেছিলেন। এই নতুন ব্যবস্থাকে সুসংহত করে মহান আল্লাহর বাণী নাযিল হয়েছে: "নিশ্চয়ই ফেরেশতারা যখন এমন লোকদের প্রাণ হরণ করে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন তারা (ফেরেশতারা) বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা জমিনে অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল হলো জাহান্নাম, আর তা কতই না মন্দ গন্তব্য।" [সূরা আন-নিসা: ৯৭]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্ব বা সহযোগিতার বিষয়ে তোমাদের কোনো দায় নেই।" [সূরা আল-আনফাল: ৭২]। এভাবে আদর্শিক অর্থে নাগরিকত্বের ধারণা নবজাতক ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হতে শুরু করে এবং এর অধিবাসীদের মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

তৃতীয়ত: শূরা (পরামর্শ) ব্যবস্থা কার্যকর করা:

এটি করা হয়েছিল নতুন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামষ্টিক চেতনাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসমানি বিধানের অর্থ এই নয় যে, মানুষকে তাদের কার্যাবলি বিন্যাস বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বরং এই বিধান নতুন রাষ্ট্রের সদস্যদের জন্য সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে যেন তারা সমস্ত বিষয়ে—বিশেষ করে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে—মতামত প্রদান করতে পারে।

কুরআনের আয়াতসমূহ শূরার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" [সূরা আল-ইমরান: ১৫৯]। এবং মহান আল্লাহর বাণীতে শূরার গুরুত্ব নিশ্চিত করে...

দ্বিতীয় পাঠ: শরয়ি রাজনীতি

নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনে এটি একটি পদ্ধতি ছিল। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" (আশ-শূরা: ৩৮)। নতুন রাষ্ট্রে শূরা (পরামর্শ) ব্যবস্থা শাসক—তার পদমর্যাদা যাই হোক—এবং শাসিত—রাষ্ট্রে তার ভূমিকা যাই হোক না কেন—উভয়ের মধ্যে এক

নিবিড় সম্পর্কের মডেল তৈরির সুযোগ করে দিয়েছিল। শূরা ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকেই তাদের জীবন গঠন এবং জনস্বার্থের আলোকে সময় ও স্থানের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের বিষয়াদি বিন্যাসের ক্ষেত্রে অংশীদার ছিলেন।

মুসলিমগণ তাদের রাষ্ট্রের বিবর্তনকালে উন্নয়নের সঠিকতা যাচাই এবং বিচ্যুতি ও ভুল থেকে দূরে থাকার জন্য শূরা ব্যবস্থাকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই শূরা ব্যবস্থাই নবীন ইসলামি রাষ্ট্রের সঠিক পথচলা নিশ্চিত করেছিল; কারণ এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নাগরিকদের তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালনের সুযোগ করে দিয়েছিল। এটি আরবদের স্বভাবজাত গণতান্ত্রিক চেতনার এক ব্যাপকতর, সূক্ষ্মতর এবং সুশৃঙ্খল বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল।

চতুর্থ: মসজিদ ব্যবস্থার স্বীকৃতি:

এটি কেবল ধর্মীয় কার্যাবলীর জন্য নয়, বরং নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকদের একত্রিত হওয়ার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এটি ছিল সাধারণ ও বিশেষ কার্যাবলী পরিচালনার সদর দপ্তর এবং নতুন শাসনব্যবস্থা ও এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত মসজিদের ব্যবস্থাটি ছিল গঠন ও তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত সহজ ও সরল। তবে ইসলামি রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এটি মুসলিমদের জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়—চাই তা মসজিদের স্থাপত্যশৈলী হোক কিংবা সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রসমূহ।

মুসলিমগণ তাদের রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরে এই মসজিদের মূল কাঠামো বজায় রেখে এর অনুসরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই মসজিদ থেকে যেসব বিধান ও নীতিমালা ঘোষণা করেছিলেন, তা মুসলিমদের কাছে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা এবং এক সুশীতল ঝরনাধারা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, যেখান থেকে তারা সর্বদা জ্ঞান আহরণ করতে আগ্রহী ছিলেন।

এবং দিকনির্দেশনা, যা নবী (সা.)-এর সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল; যখন তিনি প্রতিনিধি দলগুলোকে গ্রহণ করতেন এবং তাদের সঠিক পথের দিশা দিতেন।

পঞ্চম: স্থায়ী সংবিধান "আস-সহীফা":

নবী (সা.) মদীনায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: স্থায়ী সংবিধান বা সহীফা, যাতে তিনি নতুন রাষ্ট্রের পরিচালনা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এই দস্তাবেজ বা সংবিধানে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্ব স্পষ্ট করেছিলেন। আমরা বলতে পারি: নবী (সা.) যে স্থায়ী সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তার মাধ্যমে কেবল মুমিনদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সুসংহত হয়নি, বরং তাদের এবং মদীনার অন্যান্য প্রতিবেশীদের মধ্যকার সম্পর্কও সুবিন্যস্ত হয়েছিল। এই দস্তাবেজটি "আস-সহীফা" নামে পরিচিতি লাভ করে—যা নবজাতক ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং যুগে যুগে এই রাষ্ট্রের বিবর্তন ও প্রসারের সাথে সাথে ইসলামি ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়।

এই সংবিধান নিম্নলিখিত ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ সাব্যস্ত করেছে:

প্রথম নীতি: উম্মাহর ধারণা এবং নাগরিক অধিকার। এই নীতির অধীনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

১. সংবিধান উম্মাহর এমন এক সংজ্ঞা প্রদান করেছে যা গোত্রীয় ভিত্তি বা বংশীয় আভিজাত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। বরং এটি নির্ধারণ করেছিল যে, যারা এই নতুন দ্বীন গ্রহণ করবে তারা তাদের পূর্ব পরিচয় বা গোত্র বিবেচনা ছাড়াই এই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই নীতিটি নতুন উম্মাহকে একটি নমনীয় ও সম্প্রসারণযোগ্য উম্মাহতে পরিণত করেছে এবং এর ছায়াতলে বহু জাতিকে স্থান দিয়েছে। উম্মাহর এই নতুন ধারণাটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলিমগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সাথে এসে মিলিত হবে এবং তাদের সাথে মিলে জিহাদ করবে, তারা অন্যান্য সমস্ত মানুষের বিপরীতে একটি একক উম্মাহ হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

২. সংবিধান (মদীনা সনদ) নিশ্চিত করেছে যে, এই উম্মত কোনো প্রকার শ্রেণীগত বৈষম্য বা ব্যক্তিগত শোষণের স্বীকৃতি দেয় না, যেমনটি গোত্রীয় প্রথাগুলোতে বিদ্যমান ছিল। বরং এটি ভেদাভেদ বিলোপের পথ উন্মোচিত করেছে এই মর্মে যে, গোত্রসমূহকে নতুন উম্মতের সেবায় একটি সামাজিক কাঠামো হিসেবে বিন্যস্ত করেছে। ফলে শাখা-গোত্র ও মূল-গোত্রগুলো উম্মতের সদস্য হিসেবেই বহাল থাকে, তবে তা ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন আদর্শিক কাঠামোর অধীনে। উদাহরণস্বরূপ, মুহাজিরদের একটি পৃথক শাখা-গোত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, ঠিক যেমনটি অন্যান্য শাখা-গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই শাখা ও উপ-গোত্রগুলোর ভূমিকা কেবল রক্তপণ (দিয়ত) পরিশোধ এবং যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজ সহজ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, সংবিধান উম্মত এবং গোত্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের এমন এক নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে যার মূল ভিত্তি হলো এই উম্মতের দাবিগুলো পূরণ করা এবং যেকোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। সংবিধান প্রতিটি শাখা-গোত্রকে পৃথকভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের ধরণ সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, যা নতুন উম্মতের মধ্যে তাদের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য না করেই তা করা হয়েছে।

৩. সংবিধান নবগঠিত এই উম্মতের অধিকার ও কর্তব্যসমূহকে নিম্নলিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট করেছে:

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক দয়া ও সহযোগিতা বজায় রাখা, বিশেষত যারা ঋণের ভারে ন্যুব্জ, এবং তাদেরকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করতে সহায়তা প্রদানের আবশ্যকতা।

অনুরূপভাবে, আনুগত্যের নিরিখে ব্যক্তির দায়িত্ব নিরূপণ এবং তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাথে তার সম্পর্কের বিন্যাস করা, যা রাষ্ট্রের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নতুন ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় নীতি: আইনের শাসন ও প্রয়োগিক ব্যবস্থাসমূহ:

মদীনা সনদ (আস-সাহীফাহ) আইনের শাসনের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনজীবনকে সুসংগঠিত করেছে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োগিক পদক্ষেপসমূহ নিশ্চিত করেছে। অতএব, যদি কেউ শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অথবা কোনো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে সমগ্র উম্মত সম্মিলিতভাবে তার ওপর নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এবং উক্ত দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংহতি প্রদর্শন করা সকলের ওপর অপরিহার্য—তা সে অপরাধী কারো সন্তান হলেও।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বিতীয় পাঠ

আইনের শাসনের সাথে প্রতিশোধকে দণ্ডে রূপান্তরিত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ছিল। এর অর্থ হলো এটি এমন একটি কাজ যা জাতির দায়বদ্ধতা হিসেবে গণ্য হয়, অথচ ইতিপূর্বে বাতিল গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন শাখা ও উপগোত্রগুলো তা সম্পাদন করত। একইসাথে আইন ব্যক্তির জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাস্তির ধরন নির্ধারণ করার অধিকার সংরক্ষণ করেছে, যেমন শাস্তি কার্যকর করা অথবা উদাহরণস্বরূপ মুক্তিপণ গ্রহণ করা। এই সনদে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রের সাথে তার অনুসারীদের সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ।

তৃতীয় মূলনীতি: ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সাথে অনুসারীদের সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ:

এই সনদ নতুন রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহের মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি স্পষ্ট করেছে, আর তা হলো আসমানি ধর্মসমূহের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং তাদের অনুসারীদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা। নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত শর্তানুসারে রাষ্ট্রের সুরক্ষা ভোগের অধিকার তাদের থাকবে। যেহেতু ইয়াসরিবে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রে ইহুদি গোত্র ও তাদের শাখাগুলো জনসংখ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল, তাই এই সনদ তাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে; তা তাদের মুসলিম প্রতিবেশী নাগরিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক অথবা রাষ্ট্র ও তার কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক। এটি নিম্নরূপ:

সনদটি ইহুদিদের এবং তাদের সেই সব গোত্র ও শাখার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে যারা ইতিপূর্বে আউস ও খাজরাজ গোত্রের শাখাগুলোর সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ ছিল। তবে নাগরিকত্বের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ছিল, যেন তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করে অথবা অপরাধ ও পাপাচার করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সুরক্ষাকে অপব্যবহার না করে। সনদটি নিশ্চিত করেছে যে, অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি হবে কর্মের সমজাতীয় এবং তা আইনি ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তি বা তার পরিবারের ওপর বর্তাবে।

এছাড়াও সনদটি যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের অংশগ্রহণ এবং যে কোনো বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নতুন রাষ্ট্রকে রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সুসংগঠিত করেছে। সুতরাং যদি যুদ্ধ...

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

দ্বিতীয় পাঠ

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষ তাদের নিজস্ব ব্যয়ভার বহন করবে। তবে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষই অপর

পক্ষের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকবে না।

তেমনিভাবে ‘সাহীফা’ (মদিনার সনদ) কুরাইশদের বিরুদ্ধে ইয়াসরিবের অধিবাসীদের সাথে ইয়াহুদীদের অবস্থানও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল; কুরাইশরাই ছিল নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু। সনদটি কুরাইশরা ইয়াসরিব আক্রমণ করলে ইয়াহুদীদেরও তা প্রতিরোধে অংশগ্রহণের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেছিল। এছাড়া কুরাইশদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

চতুর্থ নীতি: ‘সাহীফা’ এই শর্তসমূহ কেবল আওস ও খাজরাজ গোত্রের মিত্র ইয়াহুদীদের ওপরই নয়, বরং বড় বড় ইয়াহুদী গোত্রগুলোর ওপরও প্রয়োগ করার সুযোগ দিয়েছিল যদি তারা তা চায়। ‘সাহীফা’ ইয়াহুদীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তার ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছিল এই বলে যে, তাদের কাউকেই অন্যের অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে না; বরং প্রতিটি গোষ্ঠীর সাথে তাদের কর্মপন্থা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করা হবে।

পঞ্চম নীতি: রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং সেই সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশের স্বীকৃতি প্রদান:

‘সাহীফা’ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ নিয়মাবলী স্বীকার এবং রাষ্ট্রের প্রধান অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকারসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছিল। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নীতিমালাসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানে এমন যেকোনো আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষ্যে সকল অধিবাসীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া; চাই এই আগ্রাসন কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেই আসুক যা রাষ্ট্রের কার্যাবলী বা নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই নিয়মটি ছিল নতুন রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এবং তার চারপাশের শত্রুদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অন্যতম কারণ। কেননা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সকল নাগরিকের জন্য একটি সুরক্ষা প্রাচীরে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের সম্মুখীন বিপদ মোকাবিলায় সকলকে এক কাতারে শামিল হওয়াকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

২. যুদ্ধ ও শান্তিকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে এককভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়।

৩. স্বদেশ ও তার ভূমির পবিত্রতা; যা তৎকালীন সময়ে ইয়াসরিব (মদিনা) অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করত। এই পবিত্রতার অর্থ হলো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক—উভয় দিক থেকেই স্বদেশের ভূমিকে যেকোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

৪. পরিশেষে, সনদটি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনের বিশেষ বিধানগুলোকে সুসংহত করেছে। তাকে প্রতিটি বিরোধের ক্ষেত্রে রেফারেন্স বা মূল কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা মুমিনদের নিজেদের মধ্যে হোক কিংবা তাদের ও তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই সনদে নির্ধারিত সকল বিধির প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলো তদারকি করতেন। আর এই বিধিগুলোর ব্যাখ্যা, স্পষ্টীকরণ বা রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন চূড়ান্ত ফয়সালাকারী।

সনদে উল্লিখিত কিছু মূল পাঠ:

এতে এসেছে: "কেউ তার মিত্রের অপরাধের কারণে পাপিষ্ঠ হবে না। মজলুম বা নির্যাতিতকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। যে ব্যক্তি

হঠকারিতা বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে নিজের ওপরই তা করবে। কোনো উপার্জনকারী তার নিজের অর্জিত পাপ ছাড়া অন্য কারো জন্য দায়ী হবে না। এই সনদে যা কিছু আছে তার মধ্যে যা সবচেয়ে সত্য এবং পুণ্যময় আল্লাহ তার সাথেই আছেন। এই চুক্তি কোনো জালিম বা অপরাধীকে রক্ষা করবে না। যে ব্যক্তি (মদিনা থেকে) বের হবে সে নিরাপদ থাকবে, আর যে মদিনায় অবস্থান করবে সেও নিরাপদ থাকবে; তবে যে জুলুম বা অপরাধ করবে সে ব্যতীত। আল্লাহ পুণ্যবান ও মুত্তাকিদের অভিভাবক এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

এতে আরও এসেছে: "তোমরা যে বিষয়েই মতবিরোধ করো না কেন, তার ফয়সালা মহান আল্লাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ন্যস্ত হবে। আর এই সনদে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা বা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয় যাতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে, তবে তার ফয়সালা মহান আল্লাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সোপর্দ হবে।"

এটিই সেই সনদ বা সংবিধান যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর প্রণয়ন করেছিলেন। এই সংবিধানে অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং এই সংবিধান অনুযায়ীই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালিত হতো।

৭৯

পৃষ্ঠা ৪০

শরয়ী রাজনীতি

দ্বিতীয় পাঠ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যায়সমূহ এবং এর বিবর্তনের স্তরসমূহ

এটি লক্ষ্যণীয় যে, সংবিধান বা সাহীফার রাজনৈতিক ব্যবস্থা তিনটি বড় পর্যায় অতিক্রম করেছে, যার শেষে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার স্তরে উপনীত হয়েছে, যা আমরা নিম্নে ব্যাখ্যা করছি:

আমরা বলি: ইয়াসরিববাসীদের সাথে সাহীফা সম্পাদন এবং মহান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের মধ্যবর্তী সময়কালে নতুন ব্যবস্থাগুলোর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, যা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল; যতক্ষণ না এই সব কিছু মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা গঠিত হয়। আর এই ব্যবহারিক দিকটি এমন একটি উৎসে পরিণত হয়েছে যেখান থেকে মুসলিমরা উত্তরসূরি হিসেবে পূর্বসূরিদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে। তারা মহান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জন্য রাষ্ট্রের যে ভিত্তি রেখে গেছেন তা সমুন্নত করছেন এবং একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মকানুন প্রণয়ন করছেন। এর কারণ হলো, আমরা যে সাহীফা বা সংবিধানের কথা বলেছি তা ছিল একটি সৃজনশীল ধারণা, যা ইসলামী রাষ্ট্রের আনীত শিক্ষাগুলোকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রূপদান করেছে। এই ব্যবস্থাটি তার শত্রুভাবাপন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর মুখোমুখি হতে এবং সেগুলোকে একে একে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল; প্রথমে ইয়াসরিবে, এরপর সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ভূখণ্ডে। সাহীফার রাজনৈতিক ব্যবস্থা তিনটি বড় পর্যায় অতিক্রম করেছে -যেমনটি আমরা বলেছি- যার শেষে আদর্শ যোগ্যতা এবং একটি অনন্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার স্তরে উপনীত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়: প্রথম পর্যায়টি মহিমান্বিত হিজরতের প্রথম পাঁচ বছরকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সময়ে সাহীফার ব্যবস্থাটি ইয়াসরিবে সদ্যজাত ইসলামী দাওয়াতকে বহিরাগত সমস্ত শত্রু -যাদের শীর্ষে ছিল কুরাইশ- এবং অভ্যন্তরীণ শত্রু -যাদের শীর্ষে ছিল মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়- থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধে বহিঃশত্রুর বিপদ দূরীভূত হওয়ার

মাধ্যমে এই পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে, এরপর সর্বশেষ গোত্র বনু কুরাইজাকে বহিষ্কার করা হয়...

ইয়াথরিবের ইহুদিরা; ইতিপূর্বে তারা 'সাহীফাহ' বা সংবিধানের যে শর্তাবলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিদান স্বরূপ এটি করা হয়েছে, যে সংবিধান সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

ইয়াথরিবের নতুন ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে তার শক্তির প্রমাণ দিয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন এবং ইয়াথরিবের পবিত্রতার ওপর প্রথম বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করা।
- বদরের যুদ্ধের পর ইহুদি বনু কাইনুকা গোত্রকে ইয়াথরিব থেকে বহিষ্কার করা; কেননা তারা নতুন ইসলামি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।
- উহুদ যুদ্ধে পুনরায় কুরাইশদের মোকাবিলা করা।
- ইহুদি বনু নাযির গোত্রকে ইয়াথরিব থেকে বহিষ্কার করা; ইয়াথরিবের নতুন ইসলামি ব্যবস্থার সাথে চুক্তির শর্তাবলি লঙ্ঘন করার কারণে।
- কুরাইশ এবং তাদের মিত্র বেদুঈন ও ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইয়াথরিবের ওপর পরিচালিত বিশাল আক্রমণ প্রতিহত করা, যা হিজরি ৫ সনের খন্দকের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল।

এটিই ছিল 'সাহীফাহ' বা সংবিধানের পর্যায়সমূহের মধ্যে প্রথম সময়কাল বা প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় ধাপ: খন্দকের যুদ্ধের পর সংবিধানের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি দৃঢ় অবস্থানের পর্যায় থেকে সমর্থন ও অগ্রগতির পর্যায়ে উপনীত হয়। এটিই সেই পর্যায় যা দ্বিতীয় ধাপের বছরগুলোকে পরিব্যপ্ত করেছিল এবং হিজরি সপ্তম সনে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। কেননা এই ব্যবস্থা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরাইশদের কাছ থেকে নিজের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। এটি গোত্রীয় ব্যবস্থাগুলোকে আক্রমণ ও আগ্রাসনের পর্যায় থেকে বিমুখ হওয়া এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কুরাইশদের পক্ষ থেকে গ্রহণের মাধ্যমে—

গোত্রীয় ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অন্যান্য গোত্রগুলোর সাথে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করার এবং সেগুলোকে তাঁর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি প্রদান, যা তাঁর নিজস্ব শর্তাবলী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্যকর হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো ইয়াসরিবের (মদিনা) ইসলামী ব্যবস্থার জন্য এক মহা বিজয় ছিল, যদিও তৎকালীন সময়ে অনেকেই এই ধ্রুব সত্যটি অনুধাবন করতে পারেননি। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে বর্ণিত শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

প্রথমত: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বছর মক্কা থেকে ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন। কুরাইশরা তিন দিনের জন্য তাঁর অনুকূলে মক্কা ত্যাগ করবে যাতে তিনি বাইতুল আতিকে (কাবায়) তাওয়াফ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হবে, যাতে উভয় পক্ষই একে অপরের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

তৃতীয়ত: যেসকল গোত্র চাইলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৈত্রী চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে এবং একইভাবে যারা কুরাইশদের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তারাও তা করতে পারবে। এই শর্তটি ইসলামী ব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সমগ্র আরব ভূখণ্ডে মক্কার একক সার্বভৌমত্বের ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার সক্ষমতা প্রদান করে।

চতুর্থত: এই সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কেউ যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসে, তবে তাকে মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। পক্ষান্তরে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে কেউ কুরাইশদের নিকট গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। এই শর্তটি মুসলিমদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সন্ধি সম্পাদনে অবিচল ছিলেন, কারণ এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে অসামান্য সাফল্যগুলো অর্জিত হবে তা পরবর্তীতে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়: এই পর্যায়টি নমনীয়তা এবং ইয়াসরিবের বাইরেও মদিনার অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের মতো সমদক্ষতায় কাজ করার সক্ষমতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এই ব্যবস্থাটি তার শর্তাবলী ও চুক্তিসমূহকে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে বিস্তৃত করে দেয়।

কুরাইশদের ওপর তাদের আস্থা এবং গোত্রীয় ব্যবস্থায় কুরাইশদের নেতৃত্বের ওপর তাদের বিশ্বাস টলে গিয়েছিল। একইসাথে এই ব্যবস্থা এমন সব শর্তাবলিও তৈরি করেছিল যা ঐ সব গোত্রের জন্য ইসলাম ধর্ম বুঝতে এবং আকিদা ও ঈমানের সাথে তা গ্রহণে একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করেছিল। এই নতুন বিবর্তনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল খুজাআ গোত্রের আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৈত্রীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। এই গোত্রটি ইসলাম-পূর্ব যুগে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের মিত্র ছিল এবং তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাদের চুক্তি নবায়ন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। আব্দুল মুত্তালিবের সাথে তাদের চুক্তিতে বর্ণিত ছিল:

"আব্দুল মুত্তালিব, তার বংশধর এবং খুজাআ গোত্রের লোকেরা একে অপরের সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে। আব্দুল মুত্তালিবের

দায়িত্ব হবে তাদের সাহায্য করা এবং সমস্ত আরবের বিরুদ্ধে আব্দুল মুত্তালিব ও তার সন্তানদের সাহায্য করা খুজাআ গোত্রের ওপর অপরিহার্য হবে।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মৈত্রী চুক্তিটি বহাল রাখেন, তবে তিনি এতে নতুন ইসলামী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুটি শর্ত যোগ করেন, যা হলো:

প্রথমত: খুজাআ যদি অন্যায়কারী হয় তবে তাদের সাহায্য করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: খুজাআ যদি মজলুম বা অত্যাচারিত হয় তবে অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে হবে। কেননা খুজাআ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাইলেন যেন এই মৈত্রীর ভিত্তি হয় ইসলামী ব্যবস্থার মূলনীতি, যা প্রাচীন গোত্রীয় মৈত্রী এবং এর সেই জরাজীর্ণ নীতি—"তোমার ভাইকে সাহায্য করো চাই সে জালিম হোক বা মজলুম হোক"—কে সমর্থন করে না। মক্কা বিজয়ের বরকতে মক্কার গোত্রীয় জীবন ও শৃঙ্খলা পরিবর্তনের মাধ্যমে ৮ম হিজরিতে এই তৃতীয় পর্যায়টি সমাপ্ত হয়।

এই শক্তিশালী দুর্গটি (মক্কা) ইয়াসরিবের মুসলিম জামাতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয়। মদিনার সনদের (সাহীফাহ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই সুস্পষ্ট বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপের গোত্রীয় জীবনে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। কারণ আরব গোত্রগুলো মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে গোত্রীয় ব্যবস্থার সেই প্রাচীন যুগের পতনের প্রমাণ পেয়েছিল, যা মূলত মূর্খতা ও অন্ধ গোত্রীয় মোহের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ: শরয়ি রাজনীতি

সেই সব গোত্র দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে শুরু করল এবং হিজরি অষ্টম বর্ষে ও নবম হিজরি বর্ষ জুড়ে তারা ইয়াসরিবে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠাতে শুরু করল। তারা তাঁর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার ঘোষণা দিল এবং তারা যেসব চুক্তি ও অঙ্গীকার চেয়েছিল তাও লাভ করল।

সম্মানিত রাসূল দেখলেন যে, এই বিশাল অগ্রগতি সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক ব্যাপক সংশোধনের দাবি রাখে যা তিনি ইতিপূর্বে ‘সহিফা’ বা আমরা যে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পাশাপাশি এই ব্যবস্থাকে এমন এক চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিল যা সমগ্র আরব উপদ্বীপে তাঁর অর্জিত সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সর্বশেষ সংশোধনের বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অধিকার সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল, যাতে এর জনগণের মধ্যে বৈষম্যের যে কোনো রূপ দূর হয় এবং যা তাদের একতাবদ্ধ করতে সহায়ক হয়; যাতে এই রাষ্ট্রের বার্তা তথা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করা যায়। কারণ ইসলাম হচ্ছে সকল মানুষের জন্য এক বিশ্বজনীন আহ্বান। আল্লাহ বলেন: “আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” [সুরা সাবা: ২৮]। “আর আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।” [সুরা আম্বিয়া: ১০৭] ।

সংশোধনের প্রথম অংশ:

এই সর্বশেষ সংশোধনের প্রথম অংশটি ছিল ইহুদি ও অন্যান্য আহলে কিতাবদের নাগরিকত্বের অধিকার লাভের সুযোগ দেওয়া, তবে তা আর চুক্তির মাধ্যমে নয়—যেমনটি ইতিপূর্বে ‘সহিফা’তে নির্ধারিত ছিল—বরং জিজয়া প্রদানের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিজয়া প্রদান

করে।” [সুরা আত-তাওবাহ: ২৯] ।

দ্বিতীয় পাঠ

এই জিজিয়া ব্যবস্থার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সক্ষম পুরুষদের ওপর, যেখানে বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ইসলামি শর্ত যা আহলে কিতাবদেরকে নতুন রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ভোগের সুযোগ করে দেয় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতি প্রদানের বিনিময়ে; যেহেতু রাষ্ট্রের প্রথম লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা, এবং যেহেতু নতুন এই ধর্ম ইয়াহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মতো আসমানি ধর্মসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে, তাই তাদেরকে নতুন রাষ্ট্রের নিজস্ব সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা ইনসাফের পরিপন্থী ছিল। ফলে জিজিয়া এমন এক নতুন শর্তে পরিণত হয় যা পূর্ববর্তী চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহের স্থলাভিষিক্ত হয়, যাতে নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের আহলে কিতাব অধিবাসীরা আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিক অধিকার লাভ করতে পারে।

সংশোধনীর দ্বিতীয় অংশ:

এই অংশটি আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে যারা আহলে কিতাব ছিল না তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল; কারণ নতুন রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করাকেই প্রথম এবং প্রধান শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আর এর ভিত্তিতে পৌত্তলিকতার টিকে থাকার আর কোনো অবকাশ রইল না, যখন এর ক্ষতিকর দিক এবং অনিষ্টতা প্রমাণিত হলো এবং যখন কাবাঘরকে মূর্তিমুক্ত করা হলো—যা ছিল শিরকের প্রতীক এবং গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা ও তাদের অন্ধ ধ্যান-ধারণাসমূহকে শোষণের হাতিয়ার।

একই সময়ে মুশরিকদের মক্কায় হজ্জ করার অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; কারণ এই ইবাদতটি নতুন ধর্মের বাণীর উচ্চতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ছিল উদীয়মান রাষ্ট্রের এক মজবুত ভিত্তি ও সার্বভৌমত্বের পরিচয়। মহান আল্লাহ বলেন: "আর মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে, যারা আসবে দূর-দূরান্তের গভীর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে সে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর ওপর যা তিনি তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ অভাবী লোককে আহার করাও। এরপর তারা যেন তাদের ময়লা-আবর্জনা দূর করে এবং তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে আর প্রাচীন গৃহের (কাবার) তওয়াফ করে।" [হজ্জ: ২৭-২৯]

দ্বিতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

সংশোধনীর তৃতীয় ও শেষ অংশ:

এই অংশটি বিশেষভাবে সেই সকল পদক্ষেপের জন্য নির্ধারিত যা নাগরিক অধিকারের প্রসারের ফলে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। কারণ একদল লোক ইসলামে প্রবেশ করেছিল যাদের অন্তর তখনও গোত্রপ্রীতি বা আসাবিয়্যাহর ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত ছিল, অথবা তারা গোত্রীয় ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অহংকার ও পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের পেছনে ছোটার মোহে মত্ত ছিল। নিফাক বা গোপন কুফরের এই রূপটি নতুন রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল; কারণ এর অনুসারীদের চিনে নেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। এই কারণেই ‘সহীফাহ’-র (মদিনা সনদ) সর্বশেষ সংশোধনীসমূহে এই মুনাফিক গোষ্ঠীকে—অথবা আধুনিক যুগে যাদেরকে ‘পঞ্চম বাহিনী’ বলা হয়, যারা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায়—উন্মোচনের দায়িত্ব উম্মাহর ব্যক্তিদের ওপরই অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি বলছি: সর্বশেষ সংশোধনীগুলোতে নাগরিক অধিকার নিয়ে কারসাজি করা এই মুনাফিক গোষ্ঠীকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব খোদ উম্মাহর সদস্যদের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেননা উম্মাহর সদস্যরাই সেই শ্রেণীর লোকদের সন্ধান করবেন—যারা মুনাফিক এবং যারা যা অন্তরে পোষণ করে তার বিপরীতটা প্রকাশ করে। কারণ উম্মাহর সদস্যরা তাদের প্রাত্যহিক লেনদেনের মাধ্যমে বিচ্যুতির নানা বহিঃপ্রকাশ ও এর হোতাদের চিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর সক্ষম। আর এই চারিত্রিক বিষয়টি রাষ্ট্রীয় কোনো দপ্তরের পক্ষে তদারকি করা সম্ভব নয়, বরং তা কেবল উম্মাহর সন্তানরাই সম্পাদন করতে পারে। নাগরিক অধিকার নিয়ে কারসাজি করা বা এর অবমাননাকারী যেকোনো গোষ্ঠীকে একঘরে করার একক অধিকার কেবল তাদেরই রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

“তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা কিছু বলেনি; অথচ তারা অবশ্যই কুফরি কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। আর তারা এমন কিছুর সংকল্প করেছিল যা তারা অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দিয়েছিলেন বলেই কি তারা শত্রুতা পোষণ করছে? সুতরাং তারা যদি তাওবা করে তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর যমীনে তাদের জন্য কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই।”

“হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।” [আত-তাওবাহ: ৭৩, ৭৪]

শরয়ী রাজনীতি

দ্বিতীয় পাঠ

এই নতুন সংশোধনীগুলো হিজরি নবম বর্ষে জারি করা হয়েছিল এবং রাসুলুল্লাহ-এর প্রতিনিধি ও তাঁর নিকটতম ব্যক্তি হিসেবে আলী ইবন আবি তালিব মক্কায় হজ্জে আকবরের দিন এগুলো প্রচার করেন। এই ঘোষণাটি 'বারাত' (সম্পর্কচ্ছেদ) এর ঘোষণা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে; কারণ মহান রাসুল চেয়েছিলেন আরব গোত্রগুলোর নিকট সেই সকল চুক্তির সাথে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করতে যেগুলোর সাথে ইসলামের আর কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল না। তিনি আরও বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা একটি আসমানী শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা 'সুরা আত-তাওবাহ'র মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে ঘোষণার পাঠে

মহান আল্লাহর এই বাণীর তিলাওয়াত অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে সেই সব মুশরিকদের জন্য সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।
২. সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে চার মাস বিচরণ করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন।
৩. আর হজ্জে আকবরের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটি এক বিশেষ ঘোষণা যে, আল্লাহ মুশরিকদের প্রতি দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অতএব তোমরা যদি তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।
৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, এরপর তারা তোমাদের চুক্তিতে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।
৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের বন্দি করো, তাদের অবরুদ্ধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬. আর যদি মুশরিকদের কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। এটি এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না।
৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কীভাবে বলবৎ থাকতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সঠিক পথে অটল থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সঠিক পথে থেকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। [সুরা আত-তাওবাহ: ১-৭]

সুরা বারাত-এর এক নম্বর আয়াত থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত এই বিধানগুলোই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৮৭

পৃষ্ঠা ৪৪

শারঈ রাজনীতি

দ্বিতীয় পাঠ

এভাবে আমরা ইসলামি ব্যবস্থার ধারণা ও এর উৎপত্তি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সেই উৎপত্তির যেসব পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত সম্পন্ন করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যেসব নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় তিনি যেসব নিয়ম-ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন তাও আমরা আলোচনা করেছি। অতঃপর এই চুক্তিপত্র বা এই সংবিধান, যা প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষেত্রে একটি অগ্রগামী সংবিধান ছিল; চাই তা শাসন প্রক্রিয়ার দিক থেকে হোক, বা প্রশাসনিক দিক থেকে, অথবা অধিকার ও কর্তব্যসমূহ স্পষ্ট করার দিক থেকে। এটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য ছিল, তেমনি ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

এভাবে আমাদের নিকট স্পষ্ট হলো যে, এই সময়ে—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল এবং 'রফীকে আলা'-র সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে—একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। আর এর মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে এইটুকুর ওপরই ক্ষান্ত হচ্ছি।

৮৮

পৃষ্ঠা 89

শারঈ রাজনীতি
তৃতীয় পাঠ

ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা

পাঠের বিষয়বস্তু

প্রথম বিষয়: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সম্পদ হিসেবে জাকাত — ৯১

দ্বিতীয় বিষয়: আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে আর্থিক ব্যবস্থা — ৯৬

তৃতীয় বিষয়: খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে আর্থিক ব্যবস্থার বিবর্তন > দেওয়ান (দপ্তর) প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী প্রদেশসমূহের আর্থিক বিন্যাস — ১০০

চতুর্থ বিষয়: উসমান বিন আফফান এবং আলী বিন আবু তালিব (রা.)-এর যুগে আর্থিক ব্যবস্থা { এবং তাঁদের পরবর্তী উমাইয়া যুগে — ১২৩

৮৯

পৃষ্ঠা 90

""

পৃষ্ঠা 91

নবী (সা.)-এর যুগে জাকাত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক উৎসগুলোর অন্যতম

যেকোনো রাষ্ট্রের ব্যবস্থা মূলত বিভিন্ন আইন, মূলনীতি এবং ঐসব রীতিনীতির সমষ্টির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়, যার ওপর সেই রাষ্ট্রের জীবন পরিচালিত হয়। এ সকল ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে রয়েছে: রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা, বিচারিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থা। আমরা নিম্নে এই ব্যবস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করব:

প্রথমত: আর্থিক ব্যবস্থা:

প্রতিটি রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি তার সম্পদ এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কাজ করে; সেখানে আয় যেমন আছে, তেমনি ব্যয়ও রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র তার সূচনালগ্ন থেকেই এই নীতি অনুসরণ করে আসছে। ফলে এটি 'বাইতুল মাল' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) প্রতিষ্ঠা করেছে যা সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে তা ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করে। এটি বর্তমান যুগের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সদৃশ এবং এর দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্তমান সময়ের অর্থমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে "সাহিবু বাইতিল মাল" উপাধিতে ভূষিত করা হতো।

আর্থিক ব্যবস্থাগুলো সাধারণত একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় যার দুটি মেরু হলো: সম্পদ এবং ব্যয়। ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাগুলো এই নিয়মানুযায়ী এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নির্ধারিত পূর্ববর্তী নজিরগুলোর আলোকে পরিচালিত হতো। এতে একদিকে যেমন মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো, তেমনি সময়ের বিবর্তন, যুগের প্রেক্ষাপট এবং এর চাহিদার বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা হতো না।

ফলশ্রুতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাটি ইসলামী চিন্তাধারার একটি দর্পণে পরিণত হয়েছিল যা তার নমনীয়তা এবং বাস্তববাদিতার প্রতিফলন ঘটায়; ঠিক যেভাবে সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল।

ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় দুটি মৌলিক বিষয়ে কথা বলা সমীচীন:

প্রথম বিষয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়ের আর্থিক ব্যবস্থা।
দ্বিতীয় বিষয়: বাইতুল মালের উৎসসমূহ, অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদসমূহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক উৎসসমূহ:

প্রথম উৎস: জাকাত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট খাত সংবলিত কোনো আর্থিক ব্যবস্থা ছিল না। বরং এই সময়ে রাষ্ট্রের আয় বলতে মূলত সেই সম্পদকে বোঝাত যা সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম দরিদ্রদের

জন্য বা কিছু জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য উদারভাবে দান করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করল, তখন এমন আয়াতসমূহ নাজিল হলো যা মুসলমানদের সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ করে দিল। মহান আল্লাহ বলেন: "তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আত-তাওবাহ: ১০৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ করা।" এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, জাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের অন্যতম একটি।

কুরআনের আয়াতসমূহ সেই সব শ্রেণির বর্ণনাও দিয়েছে যারা জাকাত পাওয়ার যোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন: "সদকা (জাকাত) তো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী এবং যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং দাসমুক্তির জন্য..."

“...এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আত-তাওবাহ: ৬০]

সুন্নাহ সেসব সম্পদের বর্ণনা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে যাতে জাকাত ওয়াজিব হয়, নিসাবের পরিমাণ কী এবং সেই নিসাবে ওয়াজিবের পরিমাণ কতটুকু। এরপর জাকাতদাতার মধ্যে এবং সম্পদের মধ্যে যেসব শর্ত থাকা আবশ্যক তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জাকাত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রথম উৎস।

দ্বিতীয় উৎস: গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ):

সূরা আল-আনফালে মহান আল্লাহর এই বাণীতে এসেছে: “আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়দের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং সত্য-মিথ্যার ফয়সালার দিন—যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল—আমি আমার বান্দার ওপর যা নাজিল করেছিলাম তাতে ঈমান রেখে থাক। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [আল-আনফাল: ৪১]। একে ফকিহগণ গনিমতের আয়াত বলে অভিহিত করেন— “আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়দের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং মুসাফিরদের জন্য”। এই আয়াতটি গনিমত বণ্টনের পদ্ধতি বর্ণনা করে। গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ হবে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য, অর্থাৎ তা মুসলমানদের জনকল্যাণে ব্যয় করা হবে। আর পবিত্র কুরআন এই আয়াতে অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে নীরব থেকেছে। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ মূলত গনিমত লাভকারীদের (যোদ্ধাদের) জন্যই।

তৃতীয় উৎস: ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ):

মহান আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ তাদের থেকে তাঁর রাসূলকে যা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উট ছুটিয়ে যুদ্ধ করোনি। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার ওপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ

জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা ফাই হিসেবে দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়দের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে তা (তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যে আবর্তিত) না হয়...”

তৃতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

"...যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [আল-হাশর: ৭]

চতুর্থ উৎস: জিযিয়া:

মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে: "তোমরা কিতাবধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।" [আত-তাওবাহ: ২৯]

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক উৎসসমূহ ছিল যাকাত, গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল), ফায় এবং জিযিয়া।

সম্পদ সংগ্রহের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সম্পদগুলো সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। যেমন সাদাকা (যাকাত) আদায়কারী কর্মকর্তা—যিনি মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তা 'আল-মুস্তাউফী' নামক অন্য একজন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতেন, যিনি তা পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করতেন। অনুরূপভাবে গনীমতের মালের জন্যও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকতেন যাকে প্রত্যেক যুদ্ধে নিয়োগ দেওয়া হতো; যেন তিনি গনীমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে তা শরীয়ত নির্দেশিত খাতসমূহে ব্যয় করা হয়। আর জিযিয়া আদায়কারী কর্মকর্তা জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করতেন এবং তা প্রদানকারীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করতেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এই সম্পদগুলো জমা রাখার জন্য কোনো 'বায়তুল মাল' (রাজকোষ) ছিল না; কারণ সম্পদ সংগ্রহের সাথে সাথেই তা হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো। ফলে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম (যাদের অন্তর জয় করা কাম্য) এর অংশ:

যাকাতের মালের মধ্যে 'মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম'-দের একটি নির্দিষ্ট অংশ ছিল—যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে এসেছে: "নিশ্চয়ই সাদাকাহ (যাকাত) হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী এবং যাদের অন্তর জয় করা কাম্য তাদের জন্য, এবং দাসমুক্তির জন্য..."

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

তৃতীয় পাঠ

“...এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আত-তাওবা: ৬০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ অর্থের মাধ্যমে অনেকের অন্তর জয় করার জন্য কাজ করেছেন; তাদের সেই উচ্চমর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা বিবেচনা করে, যা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে তাদের অন্তর জয় করার প্রয়োজনীয়তা দাবি করছিল। তাদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ, আবু সুফিয়ান বিন হারব, তার পুত্র মুয়াবিয়া, আল-হারিস বিন হিশাম এবং অন্যদের নাম।

যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য ছিল, তারা ছিল তিন শ্রেণির:

প্রথম শ্রেণি: যাদেরকে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য দান করতেন; যেমন সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ। তার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছিলেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে দান করতেন অথচ তিনি আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে অনবরত দান করতে থাকলেন, এমনকি তিনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।"

দ্বিতীয় শ্রেণি: যাদেরকে তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের থেকে তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করার জন্য দান করতেন; যেমন উয়াইনাহ বিন হিসন এবং আল-আকরা বিন হাবিস।

তৃতীয় শ্রেণি: যাদেরকে তিনি তাদের ইসলামকে সুদৃঢ় করার জন্য দান করতেন, তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে; যেমন আবু সুফিয়ান বিন হারব, যাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ ওকিয়া স্বর্ণ এবং একশটি উট দিয়েছিলেন। তিনি তার দুই পুত্র মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদকেও দিয়েছিলেন। তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলেছিলেন: "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই অত্যন্ত মহানুভব।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাধারণ আরবদের এবং বিশেষভাবে কুরাইশদের এই শ্রেণিগুলোকে দান করতেন এবং তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করতেন; এমনকি আনসারদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এতে আনসারদের কেউ কেউ বলতে বাধ্য হলেন: "এটি তো বিস্ময়কর ব্যাপার; তিনি কুরাইশদের দিচ্ছেন আর আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন, অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি তাদেরকে সমবেত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন: "তোমাদের পক্ষ থেকে এটি কী কথা আমার কাছে পৌঁছাল? আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত দান করেছেন? তোমরা অভাবগ্রস্ত ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের অভাবমুক্ত করেছেন? তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে..."

অতঃপর তিনি আমার মাধ্যমে তোমাদের অন্তরসমূহের মাঝে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। নিশ্চয়ই কুরাইশরা কুফর থেকে সদ্য মুক্ত হয়েছে, তাই আমি চেয়েছি তাদের অভাব দূর করতে এবং তাদের অন্তর জয় করতে। হে আনসার সম্প্রদায়! দুনিয়ার নগণ্য কোনো জিনিসের জন্য কি তোমরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছ, যার মাধ্যমে আমি একটি কওমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের ওপর ছেড়ে দিয়েছি? – যা সুদৃঢ় ও বিচলিত হওয়ার নয়। এ কথা শুনে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! বণ্টন ও পাওনা হিসেবে আমরা আল্লাহর রাসূলকে পেয়েই সন্তুষ্ট।" এবং তারা তাতেই খুশি হলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, তাদের সাথে এভাবেই আচরণ করতেন।

আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আমলের আর্থিক ব্যবস্থা

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আমলের আর্থিক ব্যবস্থা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমল থেকে ভিন্ন ছিল না। তাঁর আমলে রাষ্ট্রের আয়ের উৎসগুলো ঠিক তেমনই ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমলে ছিল; যেমন— জাকাত, গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ), ফায় এবং জিজিয়া। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই একই আর্থিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করেছিলেন। তিনি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলতেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে কারো কোনো প্রতিশ্রুতি পাওনা থাকলে সে যেন আসে।" অর্থাৎ: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে কোনো ধন-সম্পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে যেন আমাদের কাছে আসে।
অতঃপর জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ এসে বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছিলেন, "যদি বাহরাইন থেকে সম্পদ আসে তবে আমি তোমাকে এভাবে এভাবে দেব।" তখন আবু বকর তাঁকে বললেন: "নাও।" অতঃপর তিনি তাঁর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ নিলেন এবং তা গণনা করে পাঁচশত পেলেন। তখন আবু বকর বললেন: "এর সাথে আরও এক হাজার নাও।" তিনি এক হাজার নিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিলেন যাদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট সম্পদ তিনি ছোট-বড়, স্বাধীন-দাস এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন। ফলে প্রত্যেকের ভাগে সাত দিরহাম ও তিন ভাগের এক ভাগ দিরহাম পড়ল।

পরবর্তী বছর যখন এর চেয়েও অনেক বেশি সম্পদ আসল, তখন তিনি তা মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিলেন এবং প্রত্যেকের ভাগে বিশ দিরহাম করে পড়ল। তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক এসে বলল: হে...

রাসূলুল্লাহর খলিফা, আপনি এই সম্পদ বণ্টন করেছেন এবং মানুষের মাঝে সমতা রক্ষা করেছেন। অথচ মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রগামিতা এবং সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আপনি যদি সুদৃঢ় ঈমানদার, অগ্রগামী এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রাধান্য দিতেন—অর্থাৎ তারা যেন আবু বকর (রা.)-এর নিকট দাবি করছিলেন যেন তিনি প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমতা না করেন। অর্থাৎ: এটি অনেকটা রাষ্ট্র কর্তৃক কর্মচারীদের প্রদানকৃত বেতনের মতো; তারা

দাবি করছিলেন যেন তিনি প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমতা না করেন, বরং ইসলামের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের মাঝে পার্থক্য করেন; যেমন অন্য কারো আগে ইসলাম গ্রহণ করা অথবা ইসলামে তার বিশেষ মর্যাদা থাকার কারণে। তখন তিনি বললেন: তোমরা অগ্রগামিতা, সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং শ্রেষ্ঠত্বের যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছ, আমি তা খুব ভালোভাবেই জানি। তবে এগুলো এমন বিষয় যার পুরস্কার মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে। আর এই সম্পদ হলো জীবনোপকরণ, তাই এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করাই অগ্রাধিকার প্রদানের চেয়ে উত্তম।

কারণ আমাদের নেতা আবু বকর (রা.) প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে তাদের সাথে একমত হননি। বরং তিনি তাদের বলেছিলেন, আমি সেই সব মানুষকে চিনি ইসলামে যাদের বিশেষ মর্যাদা ও অগ্রগামিতা রয়েছে ইত্যাদি। তবে এগুলোর প্রতিদান মহান আল্লাহর কাছে। কিন্তু এই সম্পদ মানুষের জীবনধারণের উপায়, যা দিয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা এবং সমানাধিকার নিশ্চিত করা আছরা (অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া) অপেক্ষা উত্তম; অর্থাৎ এক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার চেয়ে এটিই শ্রেয়।

এ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, আবু বকর (রা.) মানুষের মাঝে সম্পদ বণ্টনে সমতা বজায় রাখতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহায্যকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কিংবা যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতি কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেননি; কারণ তিনি মানুষকে যা প্রদান করতেন তা ছিল তাদের জীবনোপকরণ।

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা: আবু বকর (রা.) কিছু মানুষের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে নবী (সা.)-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন; অথবা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করতে কিংবা তাদের আকিদার দুর্বলতার কারণে ইসলামে তাদের সুদৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে। যেমনটি আমরা বলেছি যে নবী (সা.) তিন শ্রেণির মানুষকে প্রদান করতেন, তেমনি আমাদের নেতা আবু বকর (রা.)-ও এই তিন শ্রেণির মানুষকে দান করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন, তিনি—

তৃতীয় পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

তিনি চেয়েছিলেন তাদের অন্তরসমূহ জয় করতে অথবা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করতে কিংবা তাদের ইসলামকে সুদৃঢ় করতে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। তবে ঘটনাটি হলো, উয়াইনা ইবন হিসন এবং আল-আকরা ইবন হাবিস এসে একটি ভূখণ্ড দাবি করেন। আবু বকর (রা.) এতে সম্মত হন এবং তাদের জন্য একটি লিপি লিখে দেন। এ সময় উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিপিটি হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন।

মনে হলো সাইয়্যেদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে আবু বকর (রা.)-এর এই কাজ পছন্দ হয়নি। তিনি আবু বকর (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের কোনো অংশ তাদের দান করবেন—এতে সম্মত হননি। তিনি সেই লিপিটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাদের বললেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের তা প্রদান করতেন তোমাদের ইসলামে আকৃষ্ট করার জন্য। আর এখন আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। সুতরাং তোমরা যদি ইসলামে অবিচল থাকো (তবে ভালো), অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মাঝে কেবল তলোয়ারই ফয়সালা করবে।" অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন: "বলো, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরি করুক।" [আল-কাহাফ: ২৯]। তখন তারা আবু বকর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনি কি খলিফা নাকি উমর?!! সাইয়্যেদুনা আবু বকর আল-হাকিম (রা.) বললেন: ইনশাআল্লাহ, তিনিই। আবু বকর (রা.) উমরের মতামতের ওপর অটল থাকলেন এবং উয়াইনা ইবন হিসন ও আল-আকরা ইবন হাবিসকে তাদের দাবিকৃত ভূখণ্ড প্রদান করলেন না।

নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাতে চেয়েছিল। তারা এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর এই বাণীর ওপর নির্ভর করেছিল: "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আত-তাওবাহ: ১০৩]। নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল: আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলকে যাকাত গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন: "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন" [আত-তাওবাহ: ১০৩]। এখন যেহেতু নবী ﷺ ইন্তিকাল করেছেন, তাই আমরা সেই সদকা প্রদান করব না অথবা যাকাত দেব না। তারা আয়াতটি থেকে বুঝেছিল যে, নবী ﷺ-ই ছিলেন তাদের থেকে যাকাত গ্রহণকারী। যেহেতু তিনি ইন্তিকাল করেছেন, তাই তারা আর যাকাত দেবে না। এ কারণেই সাইয়্যেদুনা আবু বকর (রা.) আয়াতের এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর আবু বকর (রা.) রুখে দাঁড়ালেন এবং...

শরয়ী রাজনীতি
তৃতীয় পাঠ

তাঁর কোমল স্বভাব এবং অগাধ সহনশীলতা সত্ত্বেও বিষয়টি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি তাদের ব্যাপারে কঠোর ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং যারা জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা সংগ্রহে বাধা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিস্থিতিতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট এসে বললেন: হে আবু বকর! আপনি কীভাবে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। অতএব, যে ব্যক্তি তা বলবে, সে আমার নিকট থেকে তার জান ও মাল নিরাপদ করে নিল, তবে হকের দাবি ব্যতিরেকে; আর তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।”

আমাদের নেতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন, তখন আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে আপত্তি জানালেন এবং তাঁকে বললেন: হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ যখন সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তখন তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা যাবে না; যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: “আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। অতএব, যে ব্যক্তি তা বলবে, সে আমার নিকট থেকে তার জান ও মাল নিরাপদ করে নিল, তবে হকের দাবি ব্যতিরেকে; আর তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।” মূলত তিনি যেন আমাদের নেতা আবু বকরের প্রতি আপত্তি জানাচ্ছিলেন; অর্থাৎ: আপনি কেন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান অথচ তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? আর তাদের পক্ষ থেকে কেবল জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উত্তর দিয়ে বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা জাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি ছাগলছানা (আনাক) দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে প্রদান করত, তবে তা দিতে অস্বীকার করার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।” এটি আমাদের নেতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে এক সুদৃঢ় ও অনড় অবস্থান ছিল; কারণ তিনি জাকাতকে সালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করতেন। এর প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের স্তম্ভসমূহের বর্ণনায় তা উল্লেখ করেছেন; যখন তিনি বলেছিলেন: “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ সম্পাদন করা।” সুতরাং জাকাত সালাতের সমপর্যায়ের ছিল এবং জাকাত ইসলামের অন্যতম একটি রুকন বা স্তম্ভ, যেমনটি সালাতও ইসলামের একটি রুকন। একারণেই আমাদের নেতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার উত্তরে এমন বলেছিলেন যখন তিনি (উমর) তাঁকে বলেছিলেন: নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

তৃতীয় পাঠ

তিনি বলেন: ((যে ব্যক্তি বলবে: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সে আমার থেকে তার সম্পদ ও জীবন নিরাপদ করে নিল, তবে তার হকের বিষয়টি ভিন্ন))। আর এটি হলো ইসলামের হক তথা যাকাত। এই কারণেই উমর (রা.) বলেছিলেন: আল্লাহর কসম, বিষয়টি কেবল এমন ছিল যে, আল্লাহ আবু বকরের (রা.) বক্ষকে [সত্যের জন্য] প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, ফলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটিই সত্য।

সুতরাং আমাদের নেতা উমর (রা.), যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করতেন না এবং তাঁর মুখে সত্য উচ্চারিত হতো—যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন—তিনি আবু বকর (রা.) যা করেছিলেন তাতে একমত পোষণ করেছিলেন। আর তা ছিল, তিনি (আবু বকর রা.) সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যারা যাকাত—যা একটি ইসলামী আর্থিক উৎস—প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। আমাদের নেতা আবু বকর (রা.) তাঁর কাছে এর কারণ বর্ণনা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তাতে সম্মতি প্রদান করেন।

খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন > দেওয়ান প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী প্রদেশগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে যে নতুন সম্পদের প্রবাহ ঘটেছিল, তা আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন ইসলামী যুগ এবং বিজিত দেশগুলোর সভ্যতার মধ্যকার সভ্যতাগত বিনিময়ের সূচনা প্রকাশ করে। একইভাবে খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এই বিনিময়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যার কার্যাবলী সেই পথেই পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর এই কাজগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আর্থিক নীতিমালার পাশাপাশি একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিল, যা পরবর্তী সকল মুসলিম খলীফা মেনে চলেছিলেন। এই খলীফা—উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)—বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের ইতিপূর্বে পতিত হওয়া যুলুম এবং অসহনীয় আর্থিক বোঝা থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন; একই সাথে তিনি নবগঠিত রাষ্ট্রের জন্য এমন সম্পদের সংস্থান করতে সচেষ্ট ছিলেন যা এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক চাহিদা পূরণ করে। খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এই নতুন সমীকরণ সমাধানের ওপর নির্ভর করেছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বহুবিধ ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সেই সাথে যাদের কাছ থেকে এই সম্পদ নেওয়া হচ্ছে তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম না করা।

সিয়াসাতে শারইয়াহ

তৃতীয় পাঠ

আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাবই সেই ব্যক্তি যিনি এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষার চিন্তা করেছিলেন: কীভাবে আমরা রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ অর্জন করব এবং একই সাথে সেই সকল মানুষের প্রতি জুলুম করব না যাদের কাছ থেকে আমরা এই সম্পদ গ্রহণ করছি?

আমি বলছি: খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর রাষ্ট্রের সম্মুখীন হওয়া এই নতুন সমীকরণের সমাধানে সেই একই মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন যা তিনি প্রশাসনিক বিন্যাসে অনুসরণ করেছিলেন। আর তা হলো বিজিত দেশগুলোতে পূর্বে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থাগুলোকে বহাল রাখা, তবে ইসলামের ন্যায়বিচার ও এর সুউচ্চ আর্থিক বিধানের মাধ্যমে সেগুলোতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা। এই পথে তিনি এক বিরল দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতা, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চতর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা তাঁকে ইসলামি রাষ্ট্রের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে অভিহিত করার যোগ্য করে তুলেছে। এর কারণ হলো, শাম, ইরাক ও মিশর বিজয়ের পরপরই এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল; যখন বিজয়ী সৈন্যরা যুদ্ধলব্ধ মালের (গনিমত) বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী সেই দেশগুলোর ভূমি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি জানায়। যে নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন হবে পাঁচটি ভাগে; যার একটি ভাগ গনিমত সংক্রান্ত পবিত্র আয়াতের আলোকে বণ্টিত হবে এবং বাকি চার-পঞ্চমাংশ বিজয়ীদের মালিকানাধীন হবে।

সুতরাং যারা ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চল থেকে এই ভূমিগুলো গনিমত হিসেবে লাভ করেছিল—তারা যেসব গনিমত হস্তগত করেছিল তার মধ্যে এই ভূমিগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল—তারা এই ভূমিগুলো সেখানকার মানুষসহ দখল করেছিল এবং বলেছিল: "এটি গনিমত"। তারা আমাদের নেতা উমরের কাছে দাবি করেছিল যেন তিনি গনিমতের নিয়ম এবং গনিমত বণ্টনের সেই বিধান প্রয়োগ করেন যা "সূরা আল-আনফাল"-এ আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে বর্ণিত হয়েছে: "আর জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, নিকটাত্মীয়দের জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকিনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমরা আল্লাহ এবং সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান আনো যা আমি আমার বান্দার ওপর ফয়সালার দিনে নাযিল করেছিলাম—যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" [আল-আনফাল: ৪১]। ফলে এটি প্রতীয়মান হলো যে, এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য, আর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ কেবল গনিমত লাভকারী ও বিজয়ীদের প্রদান করা হবে। আর এটিই নবী (সা.) তাঁর যুগে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি

তৃতীয় পাঠ

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এভাবেই বণ্টন করা হতো; তা পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হতো—একটি অংশ আল্লাহর পথে, আর বাকি চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হতো। আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ও এটি প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এই পদ্ধতিতেই বণ্টিত হতো: এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, আর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের জন্য। আর যোদ্ধারা এটিই দাবি করেছিল। আমরা এখানে ‘যোদ্ধা’ বলতে তাদের বোঝাচ্ছি যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের নিকট থেকে এই

ভূমি জয় করেছিলেন—অর্থাৎ লড়াইকারী সৈনিকবৃন্দ। সুতরাং আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, তারা চার-পঞ্চমাংশের অধিকারী। এই কারণে তারা আয়াতের ওপর অটল থাকলেন এবং আমাদের নেতা উমর (রা.)-এর কাছে দাবি জানালেন যাতে তিনি তাদের মাঝে এই ভূমি বণ্টন করে দেন। এটি ছিল এক বিশাল ও অত্যন্ত উর্বর ভূখণ্ড। তারা তাঁর কাছে এই ভূমি তাদের মধ্যে বণ্টন করার আবেদন জানিয়েছিলেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাবাহিনী প্রধানগণ খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পত্র লিখে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। এটি ছিল বিজিত ভূখণ্ডগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার ব্যাপারে সৈন্যদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। তাদের মধ্যে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও ছিলেন, যিনি ইরাকের সাওয়াদ অর্থাৎ ইরাকের ভূমিতে প্রথম এই সমস্যার সম্মুখীন হন। এরপর আবু উবাইদাহ আমের ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে উমর (রা.)-এর কাছে একটি পত্র আসে, যাতে শামের শহরসমূহ, সেখানকার অধিবাসী এবং ভূমি—গাছপালা ও ফসলসহ—বণ্টন করার বিষয় ছিল।

আমাদের নেতা উমর (রা.)-এর কাছে যখন এই বিষয়টি পৌঁছাল এবং তিনি জানতে পারলেন যে, যেসব সৈন্য এই ভূমি জয় করেছে তারা তা নিজেদের মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ হারে বণ্টন করার দাবি করছে, তখন তিনি এতে সন্তুষ্ট হলেন না। এই বিষয়ে তাঁর ভিন্ন মত ছিল।

নিশ্চয়ই আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সর্বদা মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাই তিনি তাঁর সামনে আসা এই সমস্যার সমাধানে যা করলেন তা হলো—তিনি এই ভূমি এর মালিকদের হাতেই বহাল রাখলেন এবং এর ওপর ‘খরাজ’ (ভূমি কর) ধার্য করলেন। আর এই খরাজ বর্তমানের মুসলিমদের জন্য এবং যারা পরবর্তীতে আসবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। কিন্তু লড়াইকারী বা বিজয়ী যোদ্ধারা তা চাচ্ছিলেন না; বরং তাঁরা চেয়েছিলেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যেন তাঁদের মাঝে সেভাবেই বণ্টন করা হয় যেভাবে নবী (সা.)-এর যুগে এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে অনুসৃত হতো।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

তৃতীয় পাঠ

আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব—যেমনটি তিনি সর্বদা করতেন—যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তিনি নিজের মতকে প্রাধান্য দিতেন না; বরং তিনি পরামর্শ করতেন। আর কেনই বা তিনি তা করবেন না, অথচ তিনি মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করেছেন: "আর আপনি কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করুন" [আলে ইমরান: ১৫৯] এবং মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তাদের কাজ তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়" [আশ-শূরা: ৩৮]। আমাদের নেতা উমর ছিলেন পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সর্বাধিক অনুসরণকারী ব্যক্তিদের একজন। তাই তাঁর অভ্যাস ছিল যে, কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে তিনি তা মুসলমানদের সামনে পেশ করতেন, তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং যে মতামতে তারা একমত হতেন তা গ্রহণ করতেন।

খলিফা উমর এই নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন; কারণ এর আগে মুসলমানরা কখনো জনবসতিপূর্ণ, শহর ও সম্পদে ভরপুর এমন বিশাল উর্বর ভূমি জয় করেনি। খলিফা উমর এবং মুহাজির সাহাবীদের মধ্য থেকে তাঁর উপদেষ্টাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হলো। খলিফা উমরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, সৈন্যদের মাঝে জমি বণ্টন করে দিলে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত হবে, যা জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়, দেশের সুরক্ষা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য প্রয়োজনে প্রয়োজন ছিল।

মুহাজিরদের একটি দল এই মতের বিরোধিতা করেন। উমর (রা.)-এর এই মতের বিরোধিতাকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ। তিনি খলিফা উমরের নিকট কঠোর ভাষায় বললেন: জমি বণ্টন না করা বিজয়ী যোদ্ধাদের তাদের মৌলিক

অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শামিল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এই মৌলিক অধিকার বলতে গনিমতের আয়াতে তাদের জন্য নির্ধারিত অধিকারকেই বুঝিয়েছেন: "আর তোমরা জেনে রাখো যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য, এতিমদের জন্য, অভাবীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং সেই দিনে বিশ্বাস রাখো যেদিন আমি ফয়সালার দিনে আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" [আল-আনফাল: ৪১]। এই আয়াতটি নির্ধারণ করে যে, গনিমতের চার-পঞ্চমাংশ মূলত বিজয়ীদের জন্য। আর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ খলিফা উমরের নিকট এটি স্পষ্ট করেন যে, বিজয়ীদের মধ্যে জমি বণ্টন করা একটি ন্যায্য অধিকার যা...

তৃতীয় পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

...তাদের অধিকার; কারণ তারা এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট আয়াতের ওপর নির্ভর করে, যা হলো গণিমত সংক্রান্ত আয়াত: "আর জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু গণিমত হিসেবে লাভ করো..." [আল-আনফাল: ৪১]।

তখন খলিফা আনসারদের দশজন প্রবীণ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাদের কাছে মুসলিমরা ফয়সালা চাবে। কমিটিটি আউস গোত্রের পাঁচজন এবং খাযরাজ গোত্রের পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হলো। আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর মতের বিরোধী এক পক্ষের সম্মুখীন হলেন। তিনি ভূমিগুলো এর মূল মালিকদের হাতেই বহাল রাখতে চাইলেন এবং সেগুলোর ওপর খারাজ বা কর ধার্য করতে চাইলেন। এই খারাজ বা কর বায়তুল মালে জমা হবে এবং তা থেকে মুসলিমদের অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। কিন্তু যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল—যাদের অগ্রভাগে ছিলেন যোদ্ধারা—তারা বলছিল যে, এই ভূমিগুলো বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে; খারাজ বা কর আরোপ করার উদ্দেশ্যে তা মালিকদের হাতে রাখা যাবে না। তাই তিনি সাহাবায়ে কিরামের দশজন শ্রেষ্ঠ নেতার একটি দল নির্বাচন করলেন; আউসের পাঁচজন এবং খাযরাজের পাঁচজন। তিনি তাদের সামনে সমস্যাটি তুলে ধরতে চাইলেন এবং বিজয়ী ও কিছু সাহাবীদের মধ্যে তাঁর যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা উপস্থাপন করতে চাইলেন। তিনি তাদের সামনে বিষয়টি পেশ করে এই সমস্যার ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ করতে চাইলেন।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সেই দশজনের কমিটির সামনে উপস্থাপিত সমস্যার ব্যাপারে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বললেন: "তোমরা কি এই সীমান্ত এলাকাগুলো দেখছ না? এগুলোর জন্য অবশ্যই এমন লোক প্রয়োজন যারা সেখানে অবস্থান করবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করবে। অথবা তোমরা কি এই বিশাল শহরগুলো দেখছ না? এগুলোকে অবশ্যই সৈন্যবাহিনী দ্বারা পূর্ণ রাখতে হবে এবং তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।"

তিনি যখন সেই সীমান্তগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যেগুলোতে সৈন্য মোতায়েন প্রয়োজন—আর এই সৈন্যদের বেতন, খরচ এবং তাদের সুসজ্জিত করার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন—তখন তিনি তাদের বললেন: যোদ্ধাদের যা কিছু প্রয়োজন, যেমন বেতন, শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র—যদি তারা ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করতে চায়—এই সবকিছুর জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাহলে আমরা কোথা থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করব? একইভাবে তিনি তাদের বললেন: মুসলিমরা যে বিশাল শহরগুলো জয় করেছে, সেগুলোর জন্য অবশ্যই...

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
তৃতীয় পাঠ

তার (রাষ্ট্রের) এমন ইসলামি সেনাবাহিনীও রয়েছে যারা সেখানে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। আর এই ইসলামি বাহিনীর জন্য খরচেরও প্রয়োজন আছে। সৈন্যদের জন্য বেতন আবশ্যক, তাদের পানাহারের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং তাদেরকে কোথা থেকে (এই অর্থ) দেওয়া হবে? অর্থাৎ, যতক্ষণ আমরা বা ইসলামি রাষ্ট্র এই বাহিনীর পেছনে ব্যয় করার জন্য সম্পদের মুখাপেক্ষী থাকব—যারা মুসলমানদের বিজিত শহরগুলো রক্ষা করে অথবা শত্রুদের হাত থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়—ততক্ষণ বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। তাহলে তাদেরকে কোথা থেকে (অর্থ) দেওয়া হবে? অর্থাৎ, যারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেই সৈন্যদের ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে আসবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খলিফা আবু বকর (রা.)-এর যুগে যেমনটি অনুসৃত হতো, যদি জমিন এবং তার অধিবাসীদেরকে (যোদ্ধাদের মাঝে) বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তাদেরকে কোথা থেকে অর্থ দেওয়া হবে? যদি আমরা তাদের মাঝে এই জমিন বণ্টন করে দিই, তবে এই ব্যয়নির্বাহের অর্থ কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু আমরা যদি এই জমিন তার মালিকদের অধিকারে রেখে দিই এবং তার ওপর কর বা খারাজ ধার্য করি, তবে তার অর্থ হলো—এই কর বা খারাজ থেকে বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) আয়ের একটি উৎস তৈরি হবে। এর মাধ্যমে আমরা ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ করতে পারব, যার অগ্রভাগে রয়েছে এই ইসলামি বাহিনী যাদের বেতন, পানাহার ও অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেন: যদি জমিন এবং তার ওপর যা কিছু আছে তা বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে তাদের (সৈন্যদের) কোথা থেকে দেওয়া হবে? এরপর খলিফা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, বিজিত ভূমি বিজয়ীদের মাঝে বণ্টন করা উচিত নয়; বরং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জনগণের জন্য একে রাষ্ট্র ও জনগণের সম্মিলিত সম্পদ হিসেবে গণ্য করা উচিত। তিনি বলেন: এই 'ফাই' এদের সবার মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সুতরাং আমরা কীভাবে তা এদের মধ্যে বণ্টন করে দেব এবং যারা পরে আসবে তাদেরকে বঞ্চিত করব?

যেন আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) স্পষ্ট করছেন যে, কুরআনের আয়াতসমূহ এটিই বর্ণনা করছে যে পরবর্তীতে মুসলমানদের আরও বহু প্রজন্ম আসবে। সুতরাং আমরা যদি এই সমৃদ্ধ ও উর্বর ভূমি এই যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিই...

শরয়ী রাজনীতি
তৃতীয় পাঠ

যেন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদের সিংহভাগ গ্রহণ করে নিচ্ছে, তাহলে যারা তাদের পরে আসবে তাদের জন্য কী অবশিষ্ট থাকবে? "আর আল্লাহ তাদের থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) হিসেবে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট চালিয়ে যুদ্ধ করোনি; কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার ওপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে

সর্বশক্তিমান।" [আল-হাশর: ৬]

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ জনপদবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য; যাতে তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।" [আল-হাশর: ৭]

আমাদের নেতা উমর বর্ণনা করছেন যে, আমরা যদি এই উর্বর ও বিশাল বিস্তীর্ণ ভূমি এই বিজয়ী বা যোদ্ধাদের দিয়ে দিতাম, তবে তারা এমন এক শ্রেণীতে পরিণত হতো যারা সমস্ত সম্পদের মালিক হতো এবং অবশিষ্ট মুসলিমরা কিছুই পেত না। মহান আল্লাহ তাঁর এই বাণীর মাধ্যমেই এটি নিষেধ করেছেন: "যাতে তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" এই কারণেই তিনি তাদের বলেছিলেন: আমি কি তোমাদের দিয়ে দেব? আর তোমাদের পরে আসা মুসলিমদের জন্য কী বাকি থাকবে? যখন তারা তাঁকে বলেছিল: আপনি আমাদের অর্জিত গনিমত এমন লোকদের দিচ্ছেন যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না এবং এমন লোকদের সন্তানদের দিচ্ছেন যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না, এটা কীভাবে সম্ভব? তখন তিনি তাদের বললেন: কীভাবে আমি তোমাদের এই ভূমি দিয়ে দিই যাতে তোমরা তা লাভ করে ধনী হয়ে যাও আর অবশিষ্ট মুসলিমরা দরিদ্র রয়ে যায়? যদি আমি তোমাদের এই ভূমি দিয়ে দিই, তবে তোমাদের পরে আসা মুসলিমদের জন্য কী বাকি থাকবে?

আমি বলব, তিনি এই আয়াতগুলো নিয়ে এসেছেন এবং এগুলো দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা উমর পরামর্শের জন্য গঠিত কমিটির সামনে বা মাঝে নিজের মতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করছিলেন। তখন সেই কমিটি বা শুরা পরিষদ—যদি আমাদের এই অভিব্যক্তিটি সঠিক হয়—খলিফা উমরের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করে, যা গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং ফায়-এর সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্ট করেছিল। এর আগে এই দুই শব্দের অর্থের মধ্যে সংমিশ্রণই বিজিত দেশসমূহের ভূমি বণ্টনের বিষয়টি উত্থাপনের কারণ হয়েছিল। কেননা খলিফা গনিমতের অর্থকে কেবল যুদ্ধের ফলে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। আর ফায়-এর অর্থের ক্ষেত্রে খলিফা এর পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন যাতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত সম্পদ এবং সন্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ—উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজিত ভূমি এবং এর অধিবাসীদের ওপর আরোপিত জিযিয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলো ফায়-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এটি উম্মাহর অধিকারে পরিণত হয়, যাতে শুরা মজলিসের প্রতিনিধিত্বে ইজতিহাদ করা সম্ভব হয়।

তাঁর গঠিত কমিটি এতে একমত হয়েছে। এই কমিটি স্পষ্ট করেছে যে, কোনো বিরোধ নেই। আমাদের নেতা উমরের মতটি হলো—জমিগুলো বিজয়ীদের মাঝে বণ্টন না করে বহাল রাখা এবং তা তাদের মালিকদের হাতেই রেখে দেওয়া যাদের ওপর মুসলিমরা বিজয় লাভ করেছে। এটি গনিমত সংক্রান্ত আয়াতের বিরোধী নয়: "আর জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ করেছ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, নিকটাত্মীয়দের জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকিনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য।" [আল-আনফাল: ৪১]। অর্থাৎ, গনিমতের আয়াত এবং ফায়-এর আয়াতের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব। আর তাদের মধ্যে সমন্বয়টি হলো: গনিমত যা পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়—এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং চার ভাগ যোদ্ধাদের জন্য—তা কেবল অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, যেমন জমি; তা গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর এই জমিগুলো তাদের মালিকদের হাতেই রাখা হবে যাতে এর ওপর কর ধার্য করা যায়, অথবা খরাজ আরোপ করা হয়। ফলে এই খরাজ বা কর ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি আর্থিক উৎসে পরিণত হবে যা বাইতুল মালে জমা করা হবে এবং মুসলিমদের সাধারণ কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সাইয়্যিদিনা উমর এভাবেই বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন। আর যা সাইয়্যিদিনা উমরকে এই অবস্থানের দিকে এবং যোদ্ধাদের পক্ষ

থেকে আসা তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এই মতে অটল থাকতে ধাবিত করেছিল—যেখানে অনেক সাহাবীও তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তবুও তিনি এতে অবিচল ছিলেন; কারণ এটি ছিল একটি আর্থিক নীতি যা সাইয়্যিদিনা উমর ইবনুল খাত্তাব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, এই আর্থিক নীতিটি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে মুসলিমদের স্বার্থ নিশ্চিত করে। তাই উম্মাহর পক্ষ থেকে শূরা মজলিসের প্রতিনিধিত্বে ইজতিহাদ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন সাইয়্যিদিনা উমর ইবনুল খাত্তাব সেই সমস্যার ক্ষেত্রে শূরা মজলিস গঠন করেছিলেন যা তাঁর এবং যোদ্ধাদের বা বিজয়ীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এর অর্থ হলো, শূরা (পরামর্শ) এমন একটি বিষয় যা মুসলিমদের তাদের সকল বিষয়ে গ্রহণ করা আবশ্যক, বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীতে।

তৃতীয় পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

সুতরাং উম্মাহর অধিকার হলো মজলিসে শুরার মাধ্যমে একটি নতুন আর্থিক আইন অনুমোদনের ব্যাপারে ইজতিহাদ করা, যা বিজিত ভূমিকে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হিসেবে গণ্য করার বিধান দেয়। এটি তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন শুরা সদস্যরা খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব-এর মতামতের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তারা তাকে বলেছিলেন: "হে উমর, আপনার রায়ই উত্তম; আপনি যা বলেছেন তা কতই না সুন্দর এবং আপনি যা ভেবেছেন তা কতই না সঠিক।"

যখন তারা উমরের মতের সাথে একমত হলেন, তখন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব প্রাদেশিক সেনাপতিদের কাছে এই সিদ্ধান্তের কথা লিখে পাঠালেন। শুরা মজলিসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ভূমিকে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হিসেবে বহাল রাখা। অর্থাৎ: জমি তার মালিকদের হাতেই বহাল থাকবে এবং তার ওপর খরাজ বা ভূমি কর ধার্য করা হবে, আর স্বাভাবিকভাবেই এর অধিবাসীদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হবে। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব প্রাদেশিক সেনাপতিদের কাছে এই সিদ্ধান্তের কথা লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি ইরাকে তার সৈন্যদের মাঝে প্রথম এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি তাকে লিখেছিলেন: "লোকেরা গবাদি পশু বা ধন-সম্পদ—এখানে যুদ্ধাস্ত্র বুঝানো হয়েছে—যা কিছু নিয়ে এসেছে তা লক্ষ্য করুন এবং উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিন। আর জমি ও নদীগুলো তার শ্রমিক ও মালিকদের জন্য রেখে দিন, যাতে তা মুসলমানদের 'আতা' বা ভাতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ তা যেন ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস বা সম্পদে পরিণত হয়, যা থেকে মুসলমানদের ভাতা প্রদান করা হবে এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের জনকল্যাণ সাধিত হবে। এভাবেই বিজিত ভূমিগুলো পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উম্মাহর জন্য একটি স্থায়ী আর্থিক উৎস ও ওয়াকফে পরিণত হয়েছিল।"

উমর ইবনুল খাত্তাব-এর আমলের ভাতা (আতা) ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা বলতে পারি: বিজিত ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন আর্থিক আইনের বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্বাহী কাঠামো তৈরির প্রয়োজন ছিল যা এর কার্যক্রম তদারকি করবে। কারণ, এই আইনে সৈন্যদের জন্য ভাতার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়েছিল, যেখানে তারা আশা করেছিল যে ভূমিগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব যদিও ভূমিগুলো বিজয়ী ও যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেননি, তবে তিনি এর বিনিময়ে তাদের অন্য সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। এরপর সেই বিজিত ভূমিগুলোর আয়তন নির্ধারণের জন্য বিশেষ জরিপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

পৃষ্ঠা 109

শরয়ি রাজনীতি – তৃতীয় পাঠ

এবং এর অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল বিশাল ও অকল্পনীয়; কারণ এটি ছিল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড। মুসলিমরা এই দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগে সাসানীয় ও বাইজেন্টাইন কর্তৃপক্ষ—যারা এই ভূখণ্ডের ওপর বিজয় অর্জনের আগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল—জমির ওপর 'খরাজ' আরোপ করত, যা ছিল একটি অত্যন্ত বড় অংকের এবং ভারী বস্তুগত কর। এছাড়া তারা জনগণের ওপর 'জিযিয়া'ও আরোপ করত, যা ছিল একটি অন্যায্য আর্থিক কর। একারণে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খরাজ ও জিযিয়া উভয়কেই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, তবে তা ইসলামের ন্যায়বিচার এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নতুন প্রজাদের কল্যাণ ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পন্থায়। ফলে খরাজের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির বাস্তব অবস্থা ও তার উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করা হতো এবং এমনভাবে ধার্য করা হতো যাতে এর সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকে। আর ইসলাম যে জিযিয়া নির্ধারণ করেছিল, তা পূর্বতন ব্যবস্থার মতো দমন-পীড়ন, লাঞ্ছনা বা শোষণের অর্থ বহন করত না। বরং ইসলামি শাসনের অধীনে এটি আদায় করা হতো করদাতাদের জান-মালের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং উপাসনালয় সুরক্ষার বিনিময়ে। অর্থাৎ, এটি ছিল অনেকটা প্রতিরক্ষা করের মতো এবং রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা—যারা 'আহলুজ জিম্মাহ' নামে পরিচিত—এবং মুসলিম প্রজা—যারা তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে—তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটি মাধ্যম।

এই আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো: আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) দশজন জ্যেষ্ঠ সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত শূরা মজলিসের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এই ভূমিকে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তিনি এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেন যে, জমিগুলো তাদের মালিকদের কাছেই থাকবে এবং তার ওপর খরাজ ধার্য করা হবে, আর এর অধিবাসীদের ওপর জিযিয়া ধার্য করা হবে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) দেখতে পান যে, জিযিয়া ও খরাজ ব্যবস্থা—জিযিয়া ব্যবস্থা বলতে বোঝায় মাথাপিছু কর অর্থাৎ এই ভূমির অধিবাসীদের ওপর কর, আর খরাজ ব্যবস্থা বলতে বোঝায় খোদ ভূমির ওপর ধার্যকৃত কর—ইতিপূর্বেই এই দেশগুলোতে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম বিজয়ের আগে এখানকার শাসকরা এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করত...

পৃষ্ঠা 110

তৃতীয় পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)

মুসলিমগণ এই ভূখণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ ও বিজয় করেন। আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব এই ব্যবস্থাটি বহাল রাখেন যে, ভূমির ওপর খরাজ ধার্য করা হবে। আর খরাজ মূলত ভূমির ওপর ধার্যকৃত একটি আর্থিক কর, অথবা বর্তমান সময়ে একে কৃষিজমির খাজনা বলা হয়ে থাকে।

তবে আমাদের নেতা উমর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই ভূখণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণকারী পূর্ববর্তী শাসকদের বিরোধিতা করেন। বিষয়টি হলো, এই অঞ্চলগুলোতে ইতিপূর্বে যারা শাসন করত, তারা ভূমির ওপর অত্যন্ত অন্যায় ও জুলুমপূর্ণ কর আরোপ করত, যা ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। একইভাবে তারা জজিয়ার এমন এক অন্যায় পরিমাণ

ধার্য করত, যা জজিয়া প্রদানকারী ব্যক্তিদের সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব সেই নীতি অনুসরণ করেননি; কারণ ইসলাম হলো ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ধর্ম। তাই তিনি তাদের ওপর জজিয়া ধার্য করেন, তবে তা ছিল তাদের আর্থিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, আমাদের নেতা উমর করদাতাদের আর্থিক সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন, যেমনটি বর্তমান যুগে বলা হয়। তিনি মানুষের সামর্থ্যের বাইরে জজিয়া গ্রহণ করেননি। এই কারণে জজিয়াকে মানুষের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ধনিক শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং দরিদ্র শ্রেণির ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়েছিল। দরিদ্রদের থেকে কোনো জজিয়া নেওয়া হতো না, মধ্যবিত্তদের থেকে মাঝারি মানের জজিয়া নেওয়া হতো এবং ধনীদের থেকে উচ্চ হারের জজিয়া নেওয়া হতো। এভাবে তিনি মানুষের অবস্থা বা করদাতাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন, যেমনটি আমরা বলে থাকি।

অনুরূপভাবে কৃষিজমির ক্ষেত্রেও আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব খরাজ কর ধার্য করেছিলেন, তবে তিনি এই করকে ভূমির সক্ষমতা ও তা থেকে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের সাথে সংগতিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ফসলের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন; যার ফলে এটি একটি ন্যায়সংগত কর হিসেবে গণ্য হয়েছিল। একইভাবে মাথাপিছু জজিয়াও ছিল ন্যায়সংগত; কারণ ইসলাম এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। ইসলাম যখন জজিয়া ধার্য করে, তখন তার উদ্দেশ্য মোটেও মানুষকে অপমানিত করা নয়। এই ভূখণ্ডে ইসলামের আগমনের পূর্বে সাসানি ও বাইজেন্টাইনরা যে জজিয়া ধার্য করত, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়ন। এর উদ্দেশ্য ছিল লাঞ্ছনা, দমন-পীড়ন এবং শোষণ। কিন্তু মুসলিমগণ যখন এই স্থানগুলোতে গমন করেন, তখন জজিয়ার মাধ্যমে শোষণ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং এই জজিয়া যা...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
তৃতীয় পাঠ

মুসলমানদের পক্ষ থেকে এটি (জিজিয়া) আরোপ করা মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি এই লোকদের আনুগত্যের একটি নিছক চিহ্ন মাত্র। এছাড়াও, জিজিয়ার কারণ ছিল এই যে, মুসলমানরাই এই লোকদের—অর্থাৎ মুসলমানদের বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের—রক্ষা করবে। সুতরাং এটি একটি প্রতিরক্ষা কর হিসেবে গণ্য হয়, জিজিয়া হিসেবে নয়। এই কারণে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, তাদের থেকে জিজিয়া মওকুফ করা হতো।

এই কারণেই কিছু ফকীহ—যেমন শাফেয়ীগণ—বলেন যে, জিজিয়া তাদের ওপর কেবল তাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিনিময়ে আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং, তারা যদি নিজেরাই এই সুরক্ষা বা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষায় মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের থেকে এই জিজিয়া রহিত হয়ে যায়।

অতএব, ইসলাম কর্তৃক আরোপিত জিজিয়া অমুসলিম স্বৈরাচারী রাজাদের আরোপিত জিজিয়ার চেয়ে ভিন্ন। এই জিজিয়া ছিল ইনসাফপূর্ণ, এবং এটি কোনো দমন-পীড়ন বা লাঞ্ছনার জন্য ছিল না। বরং এটি ছিল ইসলামী আইন ও শাসনের প্রতি এই লোকদের আনুগত্যের একটি নিদর্শন ও চিহ্ন। অনুরূপভাবে, মুসলমানদের বিজিত ভূমির ওপর যে ‘খারাজ’ (ভূমি কর) আরোপ করা হয়েছিল, সেই খারাজ করটিও ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত যা ভূমির উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই কারণেই খারাজের পরিমাণ এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে ভিন্ন হতো। শক্তিশালী ও উর্বর ভূমির খারাজ বেশি হতো এবং দুর্বল ভূমির খারাজ কম হতো।

যেমনটি আমরা বলেছি: ইসলাম নির্ধারিত জিজিয়া প্রাচীনকালের সেই অর্থ বহন করত না যা দমন, লাঞ্ছনা ও শোষণকে নির্দেশ করে। বরং ইসলামের ছায়াতলে এটি প্রদান করা হতো রাষ্ট্র কর্তৃক করদাতাদের জান-মাল, স্বাধীনতা ও উপাসনালয়সমূহের নিরাপত্তার বিনিময়ে। অর্থাৎ এটি অনেকটা প্রতিরক্ষা করের মতো এবং রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক (যারা আহলুয যিম্মাহ নামে পরিচিত) এবং মুসলিম নাগরিকদের (যারা তাদের সম্পদের ওপর যাকাত প্রদান করে) মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরির পথস্বরূপ

ছিল।

সুতরাং জিজিয়া ছিল অন্যদিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সমতা বিধানের একটি মাধ্যম। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকরা মুসলিম ও অমুসলিম উভয় প্রকার লোক নিয়ে গঠিত; কারণ যারা প্রদান করে...

তৃতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শারীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)

জিজিয়া প্রদানকারীরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমরা জাকাত প্রদান করে, তাই ন্যায়বিচারের দাবি ছিল যে অমুসলিমরা অন্য কিছু প্রদান করবে, যা জিজিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্যে এক প্রকার সমতা। কারণ মুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হয় এবং অমুসলিমরাও ইসলামী রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হয়; তাই ন্যায়বিচারের দাবি ছিল যে, প্রতিটি পক্ষ এই সুযোগ-সুবিধার ব্যয়ভার থেকে নিজেদের জন্য যা উপযুক্ত তা বহন করবে।

বিজিত ভূমির জন্য বিশেষ নতুন আর্থিক আইন:

বিজিত ভূমির বিশেষ নতুন আর্থিক আইন বাস্তবায়নের জন্য এই নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাগুলো তদারকি করার লক্ষ্যে একটি নির্বাহী মাধ্যম তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ এই আইনে সৈন্যদের সেই ভূমির পরিবর্তে ভাতা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছিল, যা তারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল। সেই বিজিত ভূমির আয়তন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যার বিশেষ পরিসংখ্যানটি ছিল বিশাল ও অকল্পনীয় সংখ্যায় পূর্ণ। ইসলামী বিজয়ের আগে সেই ভূমিগুলোর সার্বভৌমত্বের অধিকারী সাসানীয় এবং বাইজেন্টাইন কর্তৃপক্ষ ভূমির ওপর 'খরাজ' আরোপ করত—যা ছিল একটি অত্যধিক পণ্যভিত্তিক কর। তারা অধিবাসীদের ওপর 'জিজিয়া'ও আরোপ করত—যা ছিল একটি অন্যায় ও নিপীড়নমূলক আর্থিক কর। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব খরাজ এবং জিজিয়া উভয়কেই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, তবে তা ইসলামের ন্যায়বিচারের সাথে সংগতিপূর্ণ রূপে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন প্রজাদের সাধারণ কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। ফলে খরাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমির প্রকৃত অবস্থা ও এর উৎপাদন এবং যা এর সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখে তা বিবেচনায় নেওয়া হতে লাগল। আর ইসলাম যে জিজিয়া নির্ধারণ করেছে, তা পূর্বের মতো দমন, অবমাননা ও শোষণের অর্থ বহন করত না; বরং ইসলামে এটি প্রদান করা হতো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিরক্ষা, এবং তাদের স্বাধীনতা ও উপাসনালয়গুলোর সুরক্ষার বিনিময়ে। অর্থাৎ এটি ছিল অনেকটা প্রতিরক্ষা করের মতো, এবং রাষ্ট্রের জিজিয়া প্রদানকারী প্রজাদের মধ্যে ভারসাম্য তৈরির একটি মাধ্যম যা...

তারা জিম্মি নামে পরিচিত হতে শুরু করল এবং রাষ্ট্রের সেই মুসলিম প্রজাদের মাঝে (পার্থক্য সূচিত হল) যারা তাদের সম্পদের ওপর জাকাত প্রদান করে। অর্থাৎ, এখান থেকে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয় যে, উমর ইবনুল খাত্তাব সেই একই ব্যবস্থার ওপর চলেছিলেন যার ওপর ইসলাম প্রবেশের পূর্বে এই দেশগুলো শাসনকারী শাসকরা পরিচালিত হতো। ফলে তারা খরাজ ও জিজিয়া ব্যবস্থার ওপর পরিচালিত হতেন। সাইয়্যেদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব দেখলেন যে এটি একটি ভালো বিষয়, তাই তিনি খরাজ বহাল রাখলেন এবং জিজিয়াও বজায় রাখলেন। তবে তিনি তাতে ইসলামের ন্যায়বিচার রক্ষা করেছেন। কেননা ইসলামের পূর্বে এই ভূখণ্ডগুলো শাসনকারী শাসকরা জিজিয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করত, খরাজে অতিরঞ্জন করত এবং মানুষের ওপর জুলুম করত। উমর ইবনুল খাত্তাব এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; কারণ উমর ইবনুল খাত্তাব কেবল ইসলামের সেই শিক্ষাগুলোই বাস্তবায়ন করতেন যা আমাদের নিকট ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। এজন্য তিনি খরাজ বহাল রাখলেন, তবে একে সুষম করেছেন, যা জমির গুণমান ও উর্বরতার ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতো। তেমনিভাবে তিনি জিজিয়াও বহাল রাখলেন, তবে জিজিয়া ধার্যের ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; যেহেতু মানুষের সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের পরিমাণও ভিন্ন হতো। খরাজ ও জিজিয়া থেকে সংগৃহীত অর্থ সুশৃঙ্খল করা এবং নির্ধারিত খাতসমূহে তা ব্যয় করার জন্য একটি নতুন প্রশাসনের প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট আসা এই নতুন সম্পদসমূহ—যা জিজিয়া ও খরাজে প্রতিফলিত—এমন একটি ব্যবস্থাপনার দাবি রাখে যা এই বিষয়টি তদারকি করবে; খরাজ আদায় করবে, জিজিয়া সংগ্রহ করবে এবং এরপর ইসলামী ফিকহ-এ নির্ধারিত খাতসমূহে তা ব্যয় করবে।

খরাজ ও জিজিয়া ব্যয়ের পদ্ধতি:

খলিফা উমর এই বিষয়েও সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন; কেননা তিনি কোনো একক সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং যখনই এমন কোনো বিষয় সামনে আসত যা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তখন তিনি এই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ নিতেন। তিনি তাদের বলেছিলেন: "এই খরাজ এবং এই জিজিয়া যা প্রতি বছর আমাদের কাছে আসে, সে বিষয়ে আমরা কী করব? আমরা কি তা একবারেই বণ্টন করে দেব, নাকি বিভিন্ন কিস্তিতে বা সময়ে দেব?"

আলী বিন আবি তালিব তাকে বললেন: প্রতি বছর আপনার কাছে যে সম্পদ জমা হবে তা বণ্টন করে দিন এবং এর কিছুই নিজের কাছে আটকে রাখবেন না।

উসমান বিন আফফান তাকে বললেন: আমি প্রচুর সম্পদ দেখতে পাচ্ছি যা মানুষের জন্য পর্যাপ্ত। কিন্তু যদি তাদের হিসাব রাখা না হয় যাতে জানা যায় কে গ্রহণ করেছে আর কে করেনি, তবে আমি আশঙ্কা করি বিষয়টি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

ওয়ালিদ বিন হিশাম বিন আল-মুগীরা বললেন: আমি সিরিয়া সফর করেছি এবং দেখেছি সেখানকার রাজারা ‘দিওয়ান’ (রেজিস্ট্রার খাতা) তৈরি করেছেন এবং সেনাবাহিনী গঠন করেছেন; সুতরাং আপনিও একটি দিওয়ান তৈরি করুন এবং সৈন্যদল গঠন করুন।

দিওয়ানের অর্থ হলো: এতে মানুষের নাম ও তাদের ভাতার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হবে। মুসলমানদের এই ভূখণ্ডগুলো বিজয়ের আগে বিভিন্ন রাজা ও রাষ্ট্রগুলোতে এটি একটি পরিচিত বিষয় ছিল।

এ কারণে শেষোক্ত এই মতটি খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের পছন্দ হয় এবং তিনি রোমান ও সাসানীয়দের প্রশাসনিক পদ্ধতি থেকে

শিক্ষা নিয়ে ইসলামে প্রথম ‘দিওয়ান’ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

তবে খলিফা এই দিওয়ানের জন্য যে নিয়মাবলী নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারার এবং এমন এক স্তরবিন্যাস অনুযায়ী যা প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করে। এতে কারও মর্যাদা বা শ্রমের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রাপ্য অংশকে খাটো করা হয়নি। খলিফা তার নির্ধারিত মূলনীতি ব্যাখ্যা করে বললেন: "এই সম্পদে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে, চাই তাকে তা দেওয়া হোক বা না হোক। আমি তোমাদেরই একজনের মতো। তবে আমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নিজেদের মর্যাদার স্তরে এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিস্যায় বিভক্ত। সুতরাং কোনো ব্যক্তির ইসলামে তার প্রাচীনতা, ইসলামে তার অগ্রগামিতা, ইসলামে তার সচ্ছলতা এবং ইসলামে তার অভাব ও প্রয়োজন [বিবেচিত হবে]।"

উমর ইবনুল খাত্তাব যখন এই নতুন দিওয়ান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তখন এই ছিল তার দিকনির্দেশনা। খলিফা উমর আকীল বিন আবি তালিব, ইবনে নাওফাল এবং জুবাইর বিন মুতয়িমকে এই নতুন নিয়মগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কারণ প্রবীণ সাহাবীদের এই দলটি কুরাইশদের বংশতালিকা সম্পর্কে আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি তাদের বললেন: "লোকদের তাদের মর্যাদা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করো," অর্থাৎ: ইসলামে তাদের অগ্রগামিতা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাদের আত্মীয়তার নৈকট্যের পরিমাণ অনুযায়ী। এবং তা...

তৃতীয় পাঠ

যাতে প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এই দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়; যার প্রথম ভিত্তি হলো ইসলামে মানুষের মর্যাদা এবং দ্বিতীয়টি হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাদের আত্মীয়তা। এর মাধ্যমে ‘আল-আতা’ (প্রদান) নামে পরিচিত প্রথম ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কেননা একদল লোক খলিফাকে নিজের নাম দিয়ে প্রদানের তালিকা শুরু করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন: "বনু হাশিম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আত্মীয়দের দিয়ে শুরু করো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটবর্তী হওয়ার ক্রম অনুসারে বনু হাশিম থেকে শুরু করো।" আর লোকেরা যখন আত্মীয়তার দিক থেকে সমান হতো, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের প্রাধান্য দিতেন। এছাড়াও তিনি ‘আহলুল মাশাহিদ’ অর্থাৎ যারা ইসলামি যুদ্ধ ও বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদেরও প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন।

প্রদান ব্যবস্থার সূক্ষ্মতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি প্রত্যেক নবজাতকের জন্য একশত দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন; যখন শিশুটি বড় হতো, তখন তার বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দুইশত দিরহাম হতো। এই নিয়মের একটি চমৎকার দিক ছিল যে, প্রথম দিকে শিশুর দুধ ছাড়ানোর আগে অর্থাৎ বুকের দুধ পান করার সময় শেষ হওয়ার আগে তার জন্য বরাদ্দ ধার্য করা হতো না। পরবর্তীতে উমর (রা.) তার ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন যেন সে ঘোষণা করে: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের দুধ ছাড়াতে তাড়াহুড়ো করো না, কারণ আমরা ইসলামের প্রতিটি নবজাতকের জন্যই বরাদ্দ নির্ধারণ করছি।" অর্থাৎ বায়তুল মাল থেকে তার জন্য ভাতা বরাদ্দ করা হবে। ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী এই প্রদান পদ্ধতির সূক্ষ্মতা ও মহত্ত্ব এতে ফুটে ওঠে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আরব এবং মাওয়ালিদের (আজাদ করা দাস বা অনারব মুসলিম) মধ্যে প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রেখেছিলেন। তিনি পারস্যের হরমুজানের জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি সেনাপতিদের কাছে লিখেছিলেন: "অনারবদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা মুক্ত করেছো এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের তাদের অভিভাবকদের সাথে যুক্ত করো। তাদের পাওনা ও দায়িত্ব অন্যদের সমান হবে। আর তারা যদি স্বতন্ত্র গোত্র হিসেবে থাকতে চায়, তবে প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সমমর্যাদা প্রদান করো।"

খলিফা তার একজন গভর্নরকে—যিনি মাওয়ালিদের প্রাপ্য প্রদানের বিষয়ে অবহেলা করেছিলেন—লিখেছিলেন: "একজন

মানুষের মন্দের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আস-সালাম।"

আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, তিনি মাওয়ালিদের—অর্থাৎ যারা আগে দাস ছিল এবং পরে মুক্ত হয়েছে—সাধারণ মুসলিমদের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন, এমনকি যারা তাদের মুক্ত করেছিল তাদের সাথেও সমতা রক্ষা করেছিলেন। এর ফলে প্রতিটি ব্যক্তি আর্থিক বরাদ্দের পাশাপাশি বস্তুগত রসদও লাভ করত।

তৃতীয় পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার পর মাসিক একটি রিযিক বা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেন, যার পরিমাণ ছিল দুই 'জারিব' খাদ্যদ্রব্য। জারিব হলো শস্য পরিমাপের একটি নির্দিষ্ট পাত্র বা মাপ। এই বরাদ্দ পুরুষ, নারী, দাস এবং শিশুদের জন্যেও নির্ধারিত ছিল। এই বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় প্রচলিত ছিল যে, কেউ যখন তার সাথীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে চাইত, তখন বলত: "আল্লাহ তোমার জারিব বিচ্ছিন্ন করে দিন", অর্থাৎ বায়তুল মাল থেকে তাকে যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হতো তা যেন বন্ধ হয়ে যায়।

খলিফা উমর নিজেই কিছু গোত্রের বরাদ্দ বহন করে তাদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কোনো কুমারী বা বিবাহিতা নারীই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকত না, তিনি তাদের নিজ হাতেই বরাদ্দ পৌঁছে দিতেন। এই দান বা বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতি ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থার শক্তি এবং একই সাথে এর নিয়মাবলীর ইনসাফ ও সূক্ষ্মতার এক সর্বোত্তম বাস্তব মডেলে পরিণত হয়েছিল।

প্রদেশসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে সম্পদ ও বরাদ্দের এই ক্রমবিকাশ প্রদেশসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্বারোপ করাকে আবশ্যক করে তোলে। কারণ প্রদেশগুলোই ছিল প্রধান উৎস যেখান থেকে এই ক্রমবিকাশ তার মূল উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রহণ করত। এই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার নমনীয়তা এবং প্রদেশগুলোর অবস্থার উন্নতি সাধনে এর সক্ষমতার বিষয়টি ফুটে ওঠে; এমনকি তা ফকীহগণ যাকে 'দারুল ইসলাম' বলে অভিহিত করেছেন তার এক সুউচ্চ প্রাসাদে পরিণত হয়। প্রতিটি প্রদেশের জন্য নিজস্ব অভিজ্ঞ জনবল নিয়ে গঠিত আর্থিক প্রশাসন ছিল যারা সেখানকার প্রাচীন অবকাঠামো সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইসলামী ব্যবস্থা ও এর ন্যায়বিচারের সাথে সঙ্গতি রেখে সেখানে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম ছিলেন।

তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান প্রদেশের ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, আর সেগুলো হলো ইরাক, শাম ও মিশর। আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ইরাককে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল: এর মধ্যে একটি হলো দক্ষিণ অংশ যা 'আস-সাওয়াদ' নামে পরিচিত ছিল এবং এতে অত্যন্ত উর্বর ভূমি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এবং অন্যটি: এটি উচ্চতর অংশ যা আল-জাযিরা আল-ফুরাতিয়া নামে পরিচিত ছিল এবং এটি দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূমি নিয়ে গঠিত।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব সাওয়াদ অঞ্চল—অর্থাৎ সাওয়াদুল ইরাক—জরিপ করার জন্য এবং কৃষি জমি থেকে প্রদেয় খারাজ ও সেখানে বসবাসকারী জিম্মিদের ওপর ধার্যকৃত জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য দুইজন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করেন। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে যে দুইজন এই দায়িত্ব পালন করেন তারা হলেন উসমান বিন হানিফ ও হুযাইফা বিন আল-ইয়ামান। তারা ঐ এলাকার পূর্ববর্তী সাসানিদের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য স্থানীয় জনগণের সহায়তা গ্রহণ করেন। সাসানিরা—অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে ঐ ভূখণ্ডের পূর্ববর্তী শাসকরা—মানুষ এবং গবাদি পশুর জীবন রক্ষাকারী খাদ্যশস্যের ওপর খারাজ ধার্য করত, যেমন: গম, যব, চাল এবং আঙ্গুর, খেজুর ও জলপাইয়ের ওপর। তদ্রূপ প্রতিটি বাগান সংলগ্ন খেজুর গাছের ওপরও কর ধার্য ছিল। আর এই খারাজের পরিমাণ জমির আয়তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো।

দেহকানরা—অর্থাৎ গ্রাম্য প্রধানরা—এই খারাজ সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতেন। তারা এই করের বোঝা বড় মালিকদের পরিবর্তে ছোট মালিকদের ওপর চাপিয়ে দিতেন। সাসানিরা জিযিয়াও আরোপ করেছিল যা তারা চারটি স্তরে বিভক্ত করেছিল; যেখানে সম্ভ্রান্ত পরিবার, উচ্চবিত্ত শ্রেণি, যোদ্ধা, লিপিকার এবং রাজকীয় সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়া হতো। অথচ এর সম্পূর্ণ দায়ভার এসে পড়ত স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষের ওপর। এটি ছিল এমন এক অবিচার যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই এই ইসলামি ব্যবস্থা খারাজ আদায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে এবং ছোট ভূমি মালিকদের ওপর সাসানিদের আরোপিত বৈষম্য দূর করেছে। ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার অধীনে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ওপর জিযিয়া ধার্য করে সমতাকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, যেখানে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির আয় ও সম্পদের ওপর ভিত্তি করে এই কর বছরে ৪৮ দিরহাম, ২৪ দিরহাম এবং ১২ দিরহাম হিসেবে নির্ধারিত হতো এবং এতে কোনো ব্যতিক্রম বা বিশেষ কাউকে অব্যাহতি দেওয়া হতো না।

এই পরিমাণটি সাধারণ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকারক ছিল না, যেমনটি খলিফা ওমর বলেছিলেন যে, মাসে এক দিরহাম কোনো

ব্যক্তিকে নিঃস্ব করে দেয় না এবং ব্যক্তির ওপর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জিজিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্যের ভিত্তি ছিল সামাজিক অবস্থা এবং ব্যক্তির উপার্জনের পরিমাণ। ফলে 'দেহাকান'দের জন্য—অর্থাৎ যারা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত—৪৮ দিরহাম ধার্য করা হয়েছিল; কারণ তারা ছিল ধনী ও বিত্তবান শ্রেণীভুক্ত। তাদের মধ্যে মধ্যম স্তরের ব্যবসায়ীদের ওপর জনপ্রতি বার্ষিক ২৪ দিরহাম ধার্য ছিল। আর কৃষক এবং অবশিষ্টদের ওপর—যারা শ্রমিক শ্রেণী—১২ দিরহাম ধার্য ছিল। এর অর্থ হলো, জিজিয়ার হার ভিন্ন ভিন্ন ছিল; অতি বিত্তশালীদের জন্য বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও নিম্নবিত্তদের জন্য বার্ষিক ১২ দিরহাম। ফলে এটি ব্যক্তির অবস্থা বা তার আয় ও সম্পদের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

জাজিরা আল-ফুরাতিয়্যা (ফোরাত অঞ্চল) অঞ্চলের ভূমিতেও ঠিক সেই একই ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছিল যা 'সাওয়াদ' অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ছিল; যাতে ঐ সব অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী ন্যায়বিচার বজায় থাকে।

শাম (সিরিয়া) অঞ্চলের প্রদেশগুলোতেও মুসলমানগণ জিজিয়া ও খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন যা তারা জাজিরা আল-ফুরাতিয়্যা অঞ্চলে অনুসরণ করেছিলেন; কারণ পারসিক ও বাইজান্টাইনদের শাসনামলে উভয় অঞ্চলের অবস্থা ছিল প্রায় একই রকম।

মিশরের ক্ষেত্রে, সেখানে জিজিয়া আদায়ের পদ্ধতি স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল; যা প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করত। এর কারণ হলো, 'আখনা'-এর অধিপতি আমর ইবনুল আস-এর নিকট এসে জিজিয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণের দাবি করেছিলেন—অর্থাৎ জিজিয়ার এমন একটি সুনির্দিষ্ট অংক নির্ধারণ করা যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা ছাড়াই প্রদান করতে বাধ্য থাকবে—কিন্তু আমর ইবনুল আস তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে, এ ধরনের নির্ধারণ একটি অবাস্তব বিষয়।

শরয়ী নীতি
তৃতীয় পাঠ

পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে এবং সেই পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ওপর ধার্যকৃত জিজিয়া সংশোধন করার অধিকার ওয়ালির (গভর্নর) রয়েছে।

মিশরের অধিবাসীদের জন্য তাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক স্বাধীনতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল, যা তাদের জন্য ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছিল এবং রোমান আমলে তারা যে চরম শোষণের শিকার হয়েছিল তা থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছিল।

মিশরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেশটির এবং এর জনগণের স্বার্থ রক্ষার নীতি অনুসারে পরিচালিত হতো। রাজধানী মদীনায় খেলাফতের নিকট কাঙ্ক্ষিত খেরাজ (ভূমি কর) তখনই পাঠানো হতো, যখন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী খাল খনন, সেতু নির্মাণ এবং বাঁধ নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করার পর উদ্বৃত্ত থাকত। তদুপরি আমর ইবনুল আস (রা.) খেরাজ ততক্ষণ পাঠাতেন না যতক্ষণ না মানুষ তাদের কৃষি কাজ এবং আঙুর মাড়াইয়ের কাজ থেকে অবসর হতো।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যা করেছিলেন তা ছিল মুসলিমদের বিজিত দেশসমূহের জন্য ইসলামী আর্থিক নীতির একটি নতুন সিদ্ধান্ত ও নতুন বিন্যাস। আমরা যদি প্রথম ইসলামী যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখব যে মুহাম্মদ কুর্দি আলী রচিত ‘আল-ইদারাহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব’ নামক একটি কিতাব রয়েছে। সেই কিতাবের ৪৩ পৃষ্ঠায় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে: "যে ব্যক্তি ফিকহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায় সে যেন মুআয

ইবনে জাবালের কাছে যায়, আর যে ব্যক্তি সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায় সে যেন আমার কাছে আসে; কারণ আল্লাহ আমাকে তার কোষাধ্যক্ষ ও বণ্টনকারী বানিয়েছেন।" ওমর (রা.) জনগণকে তাদের গোত্র অনুযায়ী নিবন্ধিত করেছিলেন, অর্থাৎ তাদের তালিকাভুক্ত করেছিলেন। এরপর তিনি ভাতা নির্ধারণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের অগ্রগণ্যতা অনুসারে অনুদান প্রদান করেন। অর্থাৎ যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটাত্মীয়দের থেকে শুরু করেন। অতঃপর তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং এরপর হুদায়বিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ান পর্যন্ত যারা শরীক ছিলেন তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন, এরপর তাদের পরবর্তী স্তরের লোকদের জন্য এবং কাদিসিয়া ও ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য। তিনি নবী (সা.)-এর পবিত্র পত্নীগণ ও অন্যদেরও প্রদান করেন এবং শিশু, ইমাম, মুয়াজ্জিন, শিক্ষক ও বিচারকদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন। তিনি তিনটি কসম করে বলেছিলেন: "আল্লাহর শপথ, কোনো..."

পৃষ্ঠা 120

তৃতীয় পাঠ

কেউই এই সম্পদের ব্যাপারে অন্য কারো চেয়ে বেশি হকদার নয়, এবং আমিও কারো চেয়ে এর অধিক হকদার নই। আল্লাহর কসম, মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার এই সম্পদে কোনো অংশ নেই, কেবল মালিকানাধীন ক্রীতদাস ব্যতীত। তবে আমরা মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মর্যাদা এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আমাদের নির্ধারিত বন্টন অনুযায়ী অবস্থানে রয়েছি। সুতরাং কোনো ব্যক্তি এবং ইসলামে তার ত্যাগ ও পরীক্ষা, কোনো ব্যক্তি এবং ইসলামে তার অগ্রগামিতা, কোনো ব্যক্তি এবং ইসলামে তার সমৃদ্ধি, এবং কোনো ব্যক্তি ও তার প্রয়োজন (অনুযায়ী বন্টন হবে)।

অতঃপর উমর বলেন: "আল্লাহর কসম, আমি যদি তাদের মাঝে বেঁচে থাকি, তবে সানআ পাহাড়ের রাখালও এই সম্পদ থেকে তার অংশ পাবে, অথচ সে তার নিজ স্থানেই পশু চরাবে।" এটি উমর ইবনুল খাত্তাব-এর এই সংকল্পের প্রমাণ দেয় যে, জিজিয়া বা খারাজের মাধ্যমে বায়তুল মালে যে সম্পদ আসে, তাতে প্রত্যেক মুসলিমেরই অংশ থাকা অপরিহার্য, এমনকি সে যদি একজন সাধারণ মানুষও হয়—যেমন ইয়েমেনের সানআয় পশু চড়ানো কোনো রাখাল। তিনি শপথ করে বলতেন যে, অবশ্যই এই দান থেকে তার নিকট অংশ পৌঁছাতে হবে; কারণ যেমনটি আমরা বলেছি, তিনি বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম, কেউই এই সম্পদের জন্য অন্য কারো চেয়ে অধিক হকদার নয়।" অর্থাৎ: এই সম্পদে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে।

উমর তাঁর শাসনকালের শুরুতে মুসলমানদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন: "এই সম্পদ থেকে ওয়ালীর (শাসকের) জন্য কী পরিমাণ গ্রহণ করা বৈধ?" যখন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন: "এই সম্পদ থেকে ওয়ালীর জন্য কী বৈধ?" অর্থাৎ: জিজিয়া, খারাজ ইত্যাদি উৎস থেকে বায়তুল মালে যে সম্পদ আসে (তা থেকে)। তখন তারা সকলে বললেন: "তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য কেবল তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য, যাতে কোনো কমতি বা বাড়াবাড়ি থাকবে না; শীত ও গ্রীষ্মের জন্য তাদের এবং তাঁর পোশাক; তাঁর জিহাদ, প্রয়োজন, সালাত, হজ ও উমরার জন্য দুটি বাহন; এবং সমহারে বন্টন। আর তিনি দেশের জনগণকে তাদের অবদান অনুযায়ী প্রদান করবেন এবং বিপদ-আপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এর হকদারদের থেকে প্রদান শুরু করবেন।"

উমরের যখন প্রয়োজন হতো, তিনি বায়তুল মালের দায়িত্বশীলের কাছে গিয়ে ঋণ গ্রহণ করতেন। কখনো হয়তো তিনি পরিশোধে বিলম্ব করতেন, তখন বায়তুল মালের দায়িত্বশীল তাঁর কাছে এসে তা পরিশোধের দাবি জানাতেন এবং তাঁর ওপর তা আবশ্যক করতেন। তখন উমর তার ব্যবস্থা করতেন। অর্থাৎ উমর যখন মুসলমানদের জনস্বার্থে ব্যয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন বোধ করতেন, তখন তিনি বায়তুল মালের দায়িত্বশীলের কাছে আসতেন, আর এটিই হলো...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

তৃতীয় পাঠ

বর্তমানে যাকে আমরা অর্থমন্ত্রী বলি, তিনি নিজের জন্য এমনভাবে ঋণ চাইতেন যেন মনে হতো তিনি নিজের প্রয়োজনেই ঋণ চাচ্ছেন। তিনি বাইতুল মালের দায়িত্বশীলকে বলতেন: হে বাইতুল মালের রক্ষক, যখন ঋণ পরিশোধের সময় আসবে, তখন আপনার প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্য আমার কাছে আসবেন। এটি ছিল সায়্যিদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব-এর একান্ত ব্যক্তিগত ঋণ। এটি করার ক্ষেত্রে তার অত্যন্ত সতর্কতা ও একাগ্রতা কাজ করত যাতে সম্পদ তার নির্দিষ্ট গন্তব্যেই পৌঁছায়। অনেক সময় এমন হতো যে, তার ভাতা আসার পর তিনি তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতেন। আবার কখনও তিনি তার কোনো সঙ্গীর নিকট ঋণ চাইতেন। তখন তাকে বলা হতো: হে উমর! বাইতুল মাল থেকে ঋণ নিতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? উমর উত্তরে বলতেন: যদি কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তবে পাওনাদাররা সম্ভবত সেই ঋণ আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু পাওনাদার যদি কোনো ব্যক্তি হয়, তবে তার সম্পদের প্রতি মোহের কারণে সে উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে তা দাবি করবে এবং যথাযথভাবে তা উসুল করে নেবে। এর ফলে উমরের দায়মুক্তি ঘটবে।

বাইতুল মালে রক্ষিত সম্পদের প্রতি উমর ইবনুল খাত্তাবের সতর্কতা এমনই ছিল। তিনি যদি মুসলমানদের জনকল্যাণে ব্যয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন বোধ করতেন, তবে কোনো সঙ্গীর কাছ থেকে ঋণ নিতে যেতেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে, কেন আপনি বাইতুল মাল থেকে ঋণ নিচ্ছেন না? তখন তিনি বলতেন: আমি আশঙ্কা করি যে আমি মারা যেতে পারি, আর সম্ভবত বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক বা অর্থের জিম্মাদার অলসতা করবেন এবং এই অর্থ দাবি করবেন না; কারণ এটি তার নিজস্ব সম্পদ নয়, বরং তা মুসলমানদের সম্পদ। কিন্তু যখন আমি আমার কোনো সঙ্গীর কাছ থেকে তা গ্রহণ করি, তখন আমি মারা গেলেও তিনি নিজের সম্পদের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকবেন এবং উত্তরাধিকারীদের কাছে গিয়ে সেই অর্থ চেয়ে নেবেন, ফলে তারা তাকে তা দিয়ে দেবে।

সম্পদের ব্যাপারে সায়্যিদুনা উমর ইবনুল খাত্তাবের নীতি ছিল এমনই। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের বিস্তৃতির ফলে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনে নতুন নতুন প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করাও উমরের কর্মতৎপরতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'দুররা' (একটি সাধারণ লাঠি) হাতে নিয়ে চলতেন। তিনিই সর্বপ্রথম পারস্য ও রোমানদের আদলে 'দিওয়ান' (প্রশাসনিক দপ্তর বা রেজিস্টার) প্রবর্তন করেন। আকিল ইবনে আবি তালিব, ইবনে নাওফাল এবং জুবায়ের ইবনে মুতইম তার জন্য এই দিওয়ানগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারা কুরাইশ বংশের অত্যন্ত মেধাবী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং বংশলতিকা ও সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অগাধ জ্ঞান ছিল। এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট 'দিওয়ান' হলো সেই খাতা বা নথিপত্র যেখানে সেনাবাহিনী এবং ভাতা গ্রহণকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হতো। তারা দিওয়ানকে এমন এক স্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যেখানে রাষ্ট্রীয় অধিকার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়।

যা সেনাবাহিনী এবং কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সকল সরকারি নথিপত্র এবং যে স্থানে এই নথিপত্রগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বসেন, তার উপরেও 'দিওয়ান' শব্দটি প্রয়োগ হতে শুরু করে।

এভাবেই উমর (রা.) ইসলামে খারাজ (ভূমি কর) এবং অর্থ সংক্রান্ত প্রথম দিওয়ান দামেস্ক, বসরা ও কুফায় স্থাপন করেছিলেন, যেমনটি তাঁর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামে প্রথম যে দিওয়ানটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো 'দিওয়ানুল ইনশা' (চিঠিপত্র ও দাপ্তরিক বিভাগ)। সিরিয়ার দিওয়ানগুলো রোমান ভাষায়, ইরাকের দিওয়ানগুলো ফারসি ভাষায় এবং মিশরের দিওয়ানগুলো কিবতি (কপটিক) ভাষায় লিখিত হতো; যা মুসলিমদের পরিবর্তে খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকরা পরিচালনা করত।

দিওয়ান লিপিবদ্ধ করার কারণ হলো— বাহরাইনের গভর্নর উমর (রা.)-এর নিকট পাঁচ লক্ষ দিরহাম পাঠালে তিনি একে অনেক বড় অংক মনে করেন এবং বলেন: "এটি অনেক টাকা।" তিনি এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মসজিদে পাহারাদার নিযুক্ত করেন। তখন পারস্য ও সিরিয়ার অভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন দিওয়ান লিপিবদ্ধ করেন, যেখানে নামগুলো লিখে রাখা হবে। তিনি প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট জীবিকা অর্থাৎ মাসিক ভাতা নির্ধারণ করলেন। উমর (রা.) দলিলপত্র এবং সন্ধিপত্রগুলো একত্রিত রাখার জন্য 'তাবুত' অর্থাৎ সিন্দুক তৈরি করলেন। তিনি সৈন্যদের জন্য একটি তালিকা তৈরি করলেন, যার নাম 'আল-ফায়ালিক' (সেনাদল)। সেখানে ফিলিস্তিন, জাজিরা, মসুল ও অন্যান্য স্থানে সৈন্য ছিল।

যখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের সাথে ইরাকের উজির এবং শিক্ষক হিসেবে পাঠালেন—যাকে তিনি সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন—তখন তিনি ইরাকবাসীদের নিকট লিখেছিলেন: "আমি তোমাদের বায়তুল মালের দায়িত্বে ইবনে মাসউদকে নিয়োজিত করেছি এবং নিজের ওপর তোমাদের অগ্রাধিকার দিয়েছি।" কখনো তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে সালাত ও যুদ্ধের জন্য একজন আমিল (গভর্নর) পাঠাতেন এবং তাকে 'আমির' বলতেন, আবার বিচারকার্য ও বায়তুল মালের জন্য আলাদা একজন আমিল নিযুক্ত করতেন এবং তাকে 'শিক্ষক' ও 'উজির' বলতেন। অথবা মিশরের আমিলের মতো সালাত ও খারাজ উভয় দায়িত্বই একজনের ওপর ন্যস্ত করতেন। সিরিয়ায় আমিলদের কাজের বন্টন ইয়ামেনের থেকে ভিন্ন ছিল, আবার বাহরাইনের আমিল ইয়ামামার মতো ছিল না। তিনি কিছু মানুষকে জমি জরিপের জন্য, কিছু মানুষকে খারাজ নির্ধারণের জন্য এবং অন্যদেরকে লোক গণনার জন্য পাঠাতেন। ইরাকের জমি জরিপ এবং তার ওপর খারাজ নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত দুইজন আমিলকে তিনি বলেছিলেন: "আমি আশঙ্কা করছি যে তোমরা ভূমির ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ যা বহনে সে সক্ষম নয়।" তিনি বললেন: "যদি আল্লাহ আমাকে শান্তিতে রাখেন, তবে আমি ইরাকের বিধবাদের এমন অবস্থায় রেখে যাব যে..."

"...আমার পরে তারা কখনোই কোনো ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হবে না।" তিনি আরও বলেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনাকে জনপদের গভর্নরদের ব্যাপারে সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁদেরকে কেবল একারণেই পাঠিয়েছি যেন তাঁরা মানুষকে তাঁদের দ্বীন ও তাঁদের নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দেন, তাঁদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করেন, তাঁদের প্রাপ্য তাঁদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং তাঁদের নিকট যে সকল বিষয় জটিল মনে হয় তা আমার নিকট উত্থাপন করেন।"

তিনি কর্মীদেরকে তাঁদের প্রয়োজন এবং তাঁদের শহর অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতেন। আবু বকর (রা.) সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সমতা বজায় রাখতেন এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিতেন না। তিনি বলতেন: "তাঁরা তো কেবল আল্লাহর জন্যই আমল করেছেন, সুতরাং তাঁদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট। আর এই সম্পদ হলো একটি ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী যা পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠ সবাই ভোগ করে, এটি তাঁদের আমলের কোনো বিনিময় নয়।" উমর (রা.) বলতেন: "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাকে আমি এমন ব্যক্তির সমান করব না যে তাঁর সাথে হয়ে যুদ্ধ করেছে।" সুতরাং হে

উমর! তোমার ওপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক।

উসমান ইবনে আফফান ও আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর শাসনামল এবং তাঁদের পরবর্তী উমাইয়্যা আমলের আর্থিক ব্যবস্থা

১. উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর আমলের আর্থিক ব্যবস্থা:

আমাদের নেতা উমর (রা.)-এর পর উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যখন উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পেলেন, তখন তিনি উমরের আর্থিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনেননি। যদিও তিনি মুসলমানদের সম্পদ আহরণ, প্রাসাদ নির্মাণ এবং বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। উমরের সেই কঠোরতা যা মুসলমানদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করত এবং তাঁদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হতে বিরত রাখত, তা দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর শাসনামল ছিল মুসলমানদের জন্য এক সচ্ছলতার যুগ, আর এই সচ্ছলতা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির দিকে ধাবিত করেছিল।

উসমান (রা.)-এর আমলে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি—আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন—খরাজ ও জিজিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থকেই যথেষ্ট মনে করলেন এবং নিজেকে সাদাকা (যাকাত) সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রাখা থেকে বিরত থাকলেন। ফলে তিনি দায়িত্ব অর্পণ করলেন...

সম্পদশালীদের জাকাত তারা নিজেরাই বের করবে এবং কোনো নির্দিষ্ট সংগ্রাহক বা কর্মচারী নিয়োগ ছাড়াই তা সরাসরি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতির ব্যতিক্রম করেছিলেন; কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, নগদ অর্থ এবং ব্যবসায়িক পণ্য—যা 'গোপন সম্পদ' হিসেবে পরিচিত—তার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মালিকদের নিকট এই সম্পদের অনুসন্ধান চালানো তাদের জন্য কষ্টকর। তাই তিনি জাকাত বের করার এবং সরাসরি অভাবীদের হাতে তা পৌঁছে দেওয়ার অধিকার মালিকদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি কেবল সেই সম্পদগুলো সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন যা 'প্রকাশ্য সম্পদ' হিসেবে পরিচিত, অর্থাৎ সায়িমা—সায়িমা বলতে আমরা উট, গরু ও বকরি জাতীয় গবাদিপশু বুঝি—এবং ফসল ও ফলমূল। কারণ তাদের হাতের নাগালে থাকা এসব সম্পদের তদারকি করা কোনো কষ্টের বিষয় ছিল না।

২. আলী ইবন আবি তালিবের শাসনামলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:

যখন আমরা খলীফা আলী ইবন আবি তালিবের যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি, তখন বলতে হয়: আলী ইবন আবি তালিব তার আর্থিক নীতিতে নিজের এবং তার নিকটাত্মীয়দের ওপর কঠোরতা ও মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে উমরের (রা.) খুব কাছাকাছি ছিলেন। তিনি প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাদের স্বার্থ রক্ষা করতেন এবং তাদের বিষয়াবলীর প্রতি যত্নবান ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তার ভাই আকীল বাইতুল মাল থেকে কিছু চেয়েছিলেন, কিন্তু আলী (রা.) তাতে তার কোনো অধিকার আছে বলে মনে করেননি। ফলে তিনি তাকে তা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন: "তোমাকে আমি যা দিয়েছি, তা ব্যতীত এই সম্পদে তোমার আর কোনো অধিকার নেই। তবে তুমি ধৈর্য ধরো যতক্ষণ না আমার ব্যক্তিগত সম্পদ আসে, তখন আমি তোমাকে তা থেকে দেব।" এই কথা আকীলকে রাগান্বিত করল এবং তিনি তাকে ছেড়ে সিরিয়ায় মুআবিয়ার নিকট চলে গেলেন।

অনুরূপভাবে তিনি তার জনৈক গভর্নরকে লিখেছিলেন: "তুমি খারাজের (ভূমি রাজস্ব) বিষয়টির প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য রাখো যাতে তা আদায়কারীদের জন্য কল্যাণকর হয়। কেননা খারাজ এবং করদাতাদের অবস্থার উন্নতির মধ্যেই অন্যদের কল্যাণ নিহিত। আর

তাদের অবস্থার উন্নতি ছাড়া অন্যদের কল্যাণ সম্ভব নয়; কারণ সকল মানুষই খারাজ এবং করদাতাদের ওপর নির্ভরশীল।" যেন সাইয়্যেদুনা আলী ইবন আবি তালিব তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তার জনৈক গভর্নরকে খারাজের ব্যাপারে অসিয়ত করে বলছেন: যদি তুমি চাও যে অবস্থা ভালো হোক...

আশ-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ

তৃতীয় পাঠ

জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনার কর্তব্য হলো খরাজ (ভূমি কর) ব্যবস্থার সংস্কার করা—অর্থাৎ খরাজযোগ্য ভূমির উন্নতি সাধন এবং সেই ভূমির মালিকদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা যারা চাষাবাদে লিপ্ত। কারণ আপনি যদি সংস্কার সাধন করেন এবং সেই ভূমির প্রতি যত্নবান হন যা থেকে ফসল উৎপাদিত হয়, তবে এর অর্থ হলো খরাজ বৃদ্ধি পাবে। আর খরাজ ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে না এবং ভূমি ততক্ষণ সংস্কার হবে না, যতক্ষণ না চাষাবাদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নতি ঘটে। আমাদের নেতা আলী ইবনে আবি তালিব তাঁর গভর্নরদের প্রতি এমনই বলতেন।

তিনি তাদের আরও বলতেন: “ভূমি আবাদের প্রতি তোমার দৃষ্টি যেন খরাজ সংগ্রহের চেয়ে অধিক গভীর হয়। কারণ খরাজ তো কেবল আবাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি আবাদ করা ছাড়াই খরাজ প্রার্থনা করে, সে জনপদকে উজাড় করে এবং প্রজাদের ধ্বংস করে। তার শাসন কেবল অল্প সময়ের জন্যই স্থির থাকে। বস্তুত ভূমি তখনই ধ্বংস হয় যখন এর অধিবাসীরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আর অধিবাসীরা তখনই নিঃস্ব হয় যখন শাসকরা কেবল সম্পদ সঞ্চয়ে লিপ্ত হয়, নিজেদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হওয়া নিয়ে সন্দিহান থাকে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কম করে।”

আলী ইবনে আবি তালিব তাঁর একজন গভর্নরের কাছে যে পত্রটি লিখেছিলেন, তাতে কর ধার্য ও তার বিন্যাসের ক্ষেত্রে এমন কিছু সুমহান ভিত্তি ও মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। এটি সুদৃঢ় নিয়মের মাধ্যমে জনপদের আবাদ বৃদ্ধি ও সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে এবং জনপদকে ধ্বংস ও দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৩. উমাইয়া শাসনামলে আর্থিক ব্যবস্থা:

উমাইয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের সূচনা করে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল প্রদেশগুলোর আর্থিক বিষয়ে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা লাভ। কারণ উমাইয়াদের বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর দাবি ছিল গভর্নরদের কেবল প্রশাসনিক বিষয়েই নয়, বরং আর্থিক বিষয়েও ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রদান করা।

উমাইয়া শাসকরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক বিষয় থেকে আর্থিক বিষয়গুলোকে পৃথক রাখার চেষ্টা করতেন। তবে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং...

শরয়ী রাজনীতি

তৃতীয় পাঠ

কিছু প্রদেশের বিজয় ও সম্প্রসারণের ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে এটি আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, প্রদেশের আর্থিক বিষয়াবলী—অর্থাৎ খারাজ—আমীরের শাসনাধীনে একীভূত করা অথবা তার পক্ষ থেকে খারাজ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষমতা তাকে অর্পণ করা। এভাবে প্রতিটি প্রদেশের জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তৈরি হয়, যা সংশ্লিষ্ট আমীর স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো থেকে বহাল রেখেছিলেন। এর পাশাপাশি খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রণীত আর্থিক ব্যবস্থার আলোকে পূর্ব-নির্ধারিত মূলনীতিগুলোও বিদ্যমান ছিল।

ফলে উমাইয়াদের আর্থিক ব্যবস্থা নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এর মধ্যে ছিল শরীয়াহ ও ইসলামি নজির দ্বারা সুসংগঠিত আয়ের উৎসের উপস্থিতি এবং সেই সাথে স্থানীয় প্রথা পুনর্জীবনের ফলে সৃষ্ট কিছু ব্যতিক্রমী আয়ের উৎস। এই নতুন আর্থিক বিন্যাসের বহিঃপ্রকাশ ইরাক, শাম ও মিশরের উমাইয়া প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিলক্ষিত হয়।

উমাইয়া যুগে প্রবর্তিত নতুন আর্থিক বিষয়াবলী:

উপহারসমূহ:

যদি আমরা এই নতুন উমাইয়া ব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে ইরাকের দিকে লক্ষ্য করি, তবে দেখব যে তারা এমন কিছু নতুন আয়ের উৎস প্রবর্তন করেছিল যা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না। উমাইয়ারা জিযিয়া ও খারাজের ক্ষেত্রে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক ব্যবস্থাটি বহাল রেখেছিল। কিন্তু খলিফা মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান এই প্রদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমন কিছু স্থানীয় প্রথা পুনরুজ্জীবিত করার কাজ শুরু করেন যা সাসানীয় যুগে প্রচলিত ছিল। সাসানীয় বলতে আমরা সেই শাসকদের বুঝাচ্ছি যারা ইসলাম আগমনের পূর্বে এই ভূখণ্ড শাসন করত।

তিনি সওয়াদ (উর্বর নিম্নভূমি) অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট দাবি করেন যেন তারা নওরোজ ও মিহরিজান উৎসবে তাকে উপহার প্রদান করে। এই উপহারের পরিমাণ দশ হাজার হাজার (এক কোটি) দিরহামে পৌঁছেছিল। নওরোজ ছিল পারস্যবাসীদের একটি মহান উৎসব, যা গ্রীষ্মকালের শুরুতে অনুষ্ঠিত হতো। এটি খারাজ আদায় শুরু এবং কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদানের সংকেত হিসেবে বিবেচিত হতো। আর মিহরিজান অনুষ্ঠিত হতো...

তৃতীয় পাঠ

শীতের আগমন ও শৈত্য প্রবাহের সময়; পারস্যবাসীদের রীতি ছিল তাদের সম্রাটদের নিকট উপঢৌকন পেশ করা। এই প্রাচীন আর্থিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন উমাইয়্যা আমলে জিজয়া ও খারাজের পাশাপাশি ইরাক প্রদেশের আয়ের একটি নতুন উৎসে পরিণত হয়। এর অর্থ হলো, ইসলামি অর্থসম্পদের সাথে এক নতুন ধরনের আর্থিক উৎস যুক্ত হয়েছিল।

এটি একটি নতুন বিষয় এবং বায়তুল মালের সম্পদের ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের ব্যবস্থাপনা যা নবী (সা.)-এর যুগে ছিল না, ছিল না আবু বকর, উমর কিংবা উসমানের যুগেও; বরং উমাইয়্যারা এটি প্রবর্তন করেন। মুয়াবিয়াও 'আল-বাতাইহ' নামক অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ইরাকের আয়ের উৎস বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এটি হলো বসরা ও কুফার মধ্যবর্তী নিচু ভূমি যা পানিতে নিমজ্জিত ছিল। ইরাক প্রদেশের খারাজ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তিনি বিশাল ভূসম্পত্তি সংস্কার করতে সক্ষম হন, বর্তমান হিসাব অনুযায়ী যার উৎপাদন মূল্য পাঁচ হাজার দিরহামে পৌঁছেছিল। মুয়াবিয়া কর্তৃক সম্পাদিত এই কাজটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যে পরিণত হয় যা তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ অনুসরণ করেন, এমনকি ইরাকের আয়ের একটি বড় অংশ এই নতুন ভূমিগুলো থেকে আসতে শুরু করে।

ভূমি সংস্কার:

সেখানে এমন বিশাল ভূমি ছিল যেখানে কোনো চাষাবাদ হতো না, তারা সেই ভূমিগুলো সংস্কার করেন। যখন এই ভূমিগুলো সংস্কার করা হলো, তখন সেগুলোর ওপর কর ও অন্যান্য বিষয় ধার্য করা হলো। ফলে এই ভূমিগুলো থেকে প্রচুর অর্থ আসতে শুরু করে। তাই ভূমি সংস্কার উমাইয়্যা আমল থেকে একটি অনুসৃত নীতিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তী শাসকরাও এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। এই সংস্কারকৃত ভূমিগুলো উমাইয়্যা আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের একটি স্থায়ী উৎসে পরিণত হয়েছিল।

ইরাকের উমাইয়্যা গভর্নররা সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে তাদের আর্থিক কাঠামো বিন্যাসেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাদের অভিজ্ঞতার কারণে 'দাহাকিন' বা গ্রাম প্রধানদের নিয়োজিত করেছিলেন।

আরব কর্মকর্তাদের পরিবর্তে আর্থিক বিষয়াদির দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে উমাইয়ারা তাদের কাছে আসা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতিটিও অবলম্বন করেছিল। আয়ের নতুন উৎস হিসেবে তারা মুসলিম কর্মকর্তাদের পরিবর্তে 'দিহকান' নামে পরিচিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়—যারা ছিলেন গ্রামের প্রধান। আরব কর্মকর্তাদের তুলনায় আর্থিক বিষয়ে তাদের অধিক অভিজ্ঞতার কারণেই এটি করা হয়েছিল। এই দিহকানরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অর্থের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখত এবং সম্ভবত তারা মুসলিমদের প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না; এই কারণেই উমাইয়ারা মুসলিমদের পরিবর্তে তাদের নিয়োগ করেছিল।

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তার এই নীতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেছিলেন: "যদি আমি কোনো আরবকে নিয়োগ করি, তবে সে খারাজ (ভূমি রাজস্ব) কমিয়ে দেয়। আমি যদি তার গোত্রকে জরিমানা করি বা তার কাছে দাবি করি, তবে তা তাদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর যদি আমি তাকে ছেড়ে দেই, তবে আমি আল্লাহর সম্পদ নষ্ট করলাম, অথচ আমি জানি তা কোথায়। তাই আমি দিহকানদের রাজস্ব আদায়ে অধিক পারদর্শী, আমানত রক্ষায় অধিক বিশ্বস্ত এবং তাদের কাছে পাওনা দাবি করাকে (আরবদের তুলনায়) সহজতর পেয়েছি।"

খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে উত্তর ইরাকের আল-জাজিরা অঞ্চলে সম্পদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আনা হয়। তিনি আদ-দাহহাক ইবনে আবদুর রহমান আল-আশআরিকে আল-জাজিরার অধিবাসীদের কাছে পাঠান। তিনি তাদের সংখ্যার একটি শুমারি করেন এবং একজন শ্রমিক সারা বছরে যা উপার্জন করে তা হিসাব করেন। অতঃপর তিনি তার খাদ্য ও পোশাকের খরচ বাদ দেন এবং দেখতে পান যে, প্রত্যেকের কাছে বছর শেষে অবশিষ্ট থাকে চার দিনার। ফলে তিনি তাদের সবার জন্য এই পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলক করেন এবং তাদের সকলকে একটি অভিন্ন স্তরে গণ্য করেন। এটিও উমাইয়াদের খিলাফত আমলে প্রবর্তিত ও উদ্ভাবিত নতুন ধরনের আর্থিক সম্পদের একটি উৎস ছিল, যা মূলত জনগণের শুমারির ওপর ভিত্তি করে এবং তাদের ওপর কর আরোপের মাধ্যমে কার্যকর হতো; যা 'মাথাপিছু কর' হিসেবে পরিচিত।

উমাইয়ারা যখনই সম্পদের সংস্কার প্রয়োজন মনে করত, তখনই ইরাকে জনসংখ্যা শুমারি নীতির আশ্রয় নিত। এই ধারায় উমাইয়াদের সর্বশেষ পদক্ষেপ ছিল হিজরি ১০৫ সালে দ্বিতীয় ইয়াজিদের খিলাফতকালে উমর ইবনে হুবাইরা যা করেছিলেন। তিনি 'সাওয়াদ'—অর্থাৎ ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চলের—একটি ভূমি জরিপ পরিচালনা করেন এবং যে সব এলাকা থেকে কর আদায় করা হবে তা নির্ধারণ করেন। এটি এমন একটি জরিপ ছিল যা পরবর্তীতে মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়...

শরিয়া রাজনীতি

তৃতীয় পাঠ

উমাইয়া যুগের অবসান এবং আব্বাসীয়দের খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরেও ওই প্রদেশের আর্থিক ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় বহাল ছিল।

সিরিয়ায় উমাইয়ারা ইরাকে অনুসৃত সাধারণ নিয়মগুলোই অনুসরণ করেছিল; যেমন যখনই আর্থিক সম্পদে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিত, তখন জনসংখ্যার আদমশুমারি পরিচালনা করা হতো। একই সময়ে সিরিয়া ভূখণ্ডে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালাগুলো কার্যকর ছিল; সেখানে শহরগুলো তাদের জিযিয়া ও খারাজের পাওনা একসাথেই পরিশোধ করত। তবে সিরিয়ার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের উপস্থিতি, যেখানে বিভিন্ন প্রদেশের বায়তুল মাল থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ জমা হতো। দামেস্কের উমাইয়া খলিফাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল বিভিন্ন প্রদেশের ওপর তাদের নির্ধারিত অতিরিক্ত কর অথবা বিজয়ী সেনাপতিদের পক্ষ থেকে পাঠানো সম্পদ। সেইসাথে ‘সাওয়াফি’ (রাষ্ট্রীয় খাস জমি) থেকেও আয় আসত; আর এগুলো হলো সেইসব জমি যা মূলত পারস্য সম্রাট কিসরা ও রোম সম্রাট কায়সারদের মালিকানাধীন ছিল, অথবা যুদ্ধে নিহত কোনো ব্যক্তির কিংবা শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেওয়া কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। এই জমিগুলোকে ‘সাওয়াফি’ বলা হতো।

এগুলোকে ‘সাওয়াফি’ বলা হতো কারণ খলিফা এগুলোকে বায়তুল মালের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট করে নিতেন। কখনো কখনো একে ‘কাতায়ি’ (ইকতা/জায়গির) বলা হতো; কারণ খলিফা এর কিছু অংশ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ইকতা হিসেবে বণ্টন করে দিতেন। এটিও উমাইয়াদের উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এক নতুন ধরনের আর্থিক উৎস ছিল।

এর মাধ্যমে উমাইয়া খলিফারা দামেস্কের রাজদরবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন; কেননা তখন তাদের কাছে আগত প্রতিনিধিদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের জন্য উচ্চমানের উপঢৌকনের প্রয়োজন হতো। এছাড়া বিভিন্ন গোত্রকে সন্তুষ্ট রাখা এবং অর্থের বিনিময়ে তাদের আনুগত্য লাভের জন্যও এর প্রয়োজন ছিল। উমাইয়ারা তাদের উত্তরসূরিদের জন্য এমন সব শিল্প ও স্থাপত্যের ভাণ্ডার রেখে গেছে যা তাদের বিপুল ঐশ্বর্য এবং সুনিপুণ আর্থিক ব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে।

শরয়ী রাজনীতি

তৃতীয় পাঠ

আর্থিক ব্যবস্থা ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন নিয়মাবলী:

রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিস্তৃতি এবং ব্যয়ের খাতসমূহের আধিক্যের ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের কার্যক্রম ও কাজের ধারা তদারকির জন্য নতুন নিয়মাবলী প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান সর্বপ্রথম এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যা ছিল প্রদেশগুলোর আর্থিক স্বাধীনতার একটি ফলাফল। তিনি আমর ইবনে যুবাইরকে এক লক্ষ দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তাকে এই মর্মে একটি পত্র প্রদান করেন যেন তিনি ইরাকের গভর্নর জিয়াদ ইবনে আবিহি-র কাছ থেকে উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। আমর ইবনে যুবাইর পথিমধ্যে পত্রটি খোলেন এবং এক লক্ষকে দুই লক্ষে পরিবর্তন করে দেন। খলিফা যখন ইরাকের বাজেট পর্যালোচনা করেন, তখন তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তিনি এই কারচুপির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও আর্থিক কর্তৃপক্ষ সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করেছিল, তবুও মুয়াবিয়া মনে করেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি 'দিওয়ানুল খাতাম' (সিলমোহর বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করেন। 'খাতাম' বলতে আমরা সেই সিলমোহরকে বুঝাচ্ছি, যা খলিফার নিকট থেকে জারিকৃত পত্রাবলীতে লাগানো হতো।

মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের সাথে আমর ইবনে যুবাইরের এই ঘটনাটি ছিল একটি প্রতারণা। তিনি তার হাতে থাকা কাগজপত্রের সাথে কারসাজি করেছিলেন এবং এক লক্ষকে দুই লক্ষে পরিণত করেছিলেন। এই জালিয়াতির ঘটনাটি মুয়াবিয়াকে এই বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে। তাই তিনি সংঘটিত এই জালিয়াতির ভয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি মনে করেন। কারণ যদি খলিফার সাথেই জালিয়াতি হতে পারে, তবে রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তা হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম 'দিওয়ানুল খাতাম'।

উমাইয়া যুগে এই নতুন বিভাগটি আর্থিক নিয়মাবলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এর ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খল নিয়ম এবং সদা সতর্ক কর্মীবাহিনী। যখন খলিফার পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে আদেশের স্বাক্ষর আসত, তখন সেই স্বাক্ষরটি এই বিভাগে আনা হতো এবং সেখানে এর একটি অনুলিপি সংরক্ষিত হতো। এরপর সেটি সুতা দিয়ে বেঁধে মোম দ্বারা সিলগালা করা হতো এবং বিভাগীয় প্রধানের মুহর দ্বারা তাতে মোহর মারা হতো।

আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ
তৃতীয় পাঠ

মুয়াবিয়ার শাসনামলে এই দিওয়ানের (দপ্তরের) প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুহসিন আল-হিমইয়ারী নামক একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারককে নিযুক্ত করা হয়। আর্থিক বিষয়সমূহে আমানতদারি বা বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করা হয়েছিল। খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ও তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদের যুগে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল 'দিওয়ানুল খাতাম' (সীলমোহর দপ্তর) এককভাবে পর্যাপ্ত নয়। বরং রাষ্ট্রের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রতিটি প্রদেশে 'দিওয়ানুল খারাজ' (ভূমি উন্নয়ন কর দপ্তর) আরবিতে রূপান্তর (তআরীব) করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। যেহেতু এটিই ছিল সম্পদ ও এ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় তদারকির প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রদেশসমূহে খারাজ দপ্তরের ভাষা ছিল মূলত ইসলামি বিজয়ের পূর্ববর্তী প্রচলিত ভাষাগুলোই। যেমন—ইরাকে খারাজ দপ্তরের ভাষা ছিল ফারসি, শামে ছিল গ্রিক এবং মিসরে ছিল গ্রিক ও কিবতি (কপ্টিক)। আরব গভর্নরদের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রের আয়ের বিবিধ উৎসের প্রেক্ষাপটে এই অবস্থা আর সংগতিপূর্ণ ছিল না। ফলে খারাজ দপ্তরসমূহ আরবিতে রূপান্তরের মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব গভর্নরদেরকে তাঁদের প্রদেশের আর্থিক বিষয়ের ওপর পূর্ণ তদারকির ক্ষমতা প্রদান করা। কেননা বিদেশি ভাষায় নথিপত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ নিয়ে অধস্তন কর্মচারীরা জালিয়াতি এবং হিসাবে কারচুপি করতে উৎসাহিত হতো, যা ধরা পড়ার ভয় থাকত না।

খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের চিঠিপত্র বিভাগের লেখক সুলাইমান ইবনে সাদ আল-খুশানী ৮১ হিজরিতে শামের খারাজ দপ্তরকে আরবিতে রূপান্তরের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামি রাষ্ট্রের আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুয়াবিয়ার সময় থেকেই এই দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও যাবতীয় গোপনীয়তা গ্রিক বংশোদ্ভূত মানসুর ইবনে সারজুনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। খলিফা এই মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলাইমান ইবনে সাদকে জর্দানের সংগৃহীত খারাজ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করেন, যার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ আশি হাজার দিনার।

খারাজ দপ্তর আরবিতে রূপান্তরের সফলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো গ্রিক ভাষাভাষী পুরাতন লেখকদের উদ্দেশে মানসুর ইবনে সারজুনের সেই উক্তি: "তোমরা এখন এই পেশা ব্যতীত অন্য কোথাও জীবিকা অন্বেষণ করো।" এটি প্রমাণ করে যে, এই বিষয়ে তারা বিশ্বস্ত ছিল না; কারণ যখনই বিষয়টির অভিমুখ পরিবর্তন হলো...

তৃতীয় পাঠ

উমাইয়া যুগে আরবরা দিওয়ানসমূহকে (প্রশাসনিক দপ্তর) আরবিকরণ এবং সেগুলোকে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হন। মূলত এই অনারবরা — যারা ছিল অমুসলিম এবং এই দিওয়ানগুলোতে কাজ করত — এর ফলে নিজেদের জন্য বিপদ অনুভব করল। তাদের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হলো এবং এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা ছিল জালিয়াতকারী এবং তারা অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাৎ করত। এর ফলে আরব গভর্নরগণ তাদের প্রদেশের আর্থিক বিষয়াবলির ওপর পূর্ণ তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হলেন।

সে সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফির পক্ষ থেকে ইরাকের দিওয়ানুল খারাজ (ভূমি রাজস্ব বিভাগ) তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন ‘যাদান ফারুখ’ নামক এক ব্যক্তি। হিজরি ৮২ থেকে ৮৩ সালের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আল-আশ’আস-এর বিদ্রোহের সময় এই কর্মচারীটি ঘটনাক্রমে নিহত হন। এই বিষয়টি হাজ্জাজের জন্য দিওয়ানসমূহ আরবিকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের নতুন আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করা সহজ করে দেয়। এরপর হাজ্জাজ সালেহ বিন আব্দুর রহমান নামক এমন এক ব্যক্তিকে ইরাকের রাজস্ব বিভাগ আরবিতে রূপান্তরের দায়িত্ব দেন, যিনি পারস্য ও আরবি উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। নিহত ‘যাদান ফারুখ’-এর ছেলে ‘মর্দান শাহ’ সালেহ বিন আব্দুর রহমানকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন যাতে তিনি তাকে এই দিওয়ানসমূহ আরবিকরণের কাজ থেকে

বিরত রাখতে পারেন। কিন্তু এই আরব কর্মকর্তা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে তার কাজ সম্পন্ন করেন। তার হাতেই ইরাকের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আরব আর্থিক কর্মকর্তা তৈরি হন।

এই ঘটনাটি আমাদের প্রমাণ দেয় যে, এই অমুসলিম কর্মচারীরা এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কাজের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল; আর সেটি হলো দিওয়ানসমূহের কাজ এমন ভাষায় পরিচালনা করা যা কেবল তারাই জানত এবং মুসলমানরা জানত না। তারা দিওয়ানসমূহের আরবিকরণ চায়নি; কারণ দিওয়ান আরবি করা হলে আরবরা কাজগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পারবে, যা তাদের জন্য বিপদজনক ছিল। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, 'মর্দান শাহ' নামক এই ব্যক্তি সালেহ বিন আব্দুর রহমানকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন যেন তিনি দিওয়ানগুলো আরবি না করেন এবং তিনি তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এই কাজে বহাল থাকতে পারেন, যা জালিয়াতির মাধ্যমে তাকে প্রচুর অর্থ এনে দিচ্ছিল।

শরয়ি রাজনীতি
তৃতীয় পাঠ
আল-ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে মিসরের রাজস্ব বিভাগের (দীওয়ানুল খারাজ) আরবিয়করণ সম্পন্ন হয়। এটি সম্পন্ন হয়েছিল তাঁর ভাই এবং মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালিকের তত্ত্বাবধানে হিজরি ৭৮ সালে (৭০৭ খ্রিস্টাব্দ)। তখন এই দপ্তরের প্রধান "আতনাস"-কে বরখাস্ত করে তার স্থলে জনৈক আরব ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়, যার নাম ছিল ইবনে ইয়ারবু আল-ফাজারি। এরপর মুসা বিন নুসাইরের হাতে মাগরেব অঞ্চলের বাকি দপ্তরগুলোর আরবিয়করণ সম্পন্ন হয়। সর্বশেষ আরবিয়করণ হয়েছিল খোরাসানের রাজস্ব বিভাগের, যা হিজরি ১২৪ সালে গভর্নর নাসর বিন সাইয়ারের নির্দেশে ইসহাক বিন তুলিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

এর ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের সমস্ত রাজস্ব দপ্তরে একটিমাত্র ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা প্রচলিত হয়। এটি ছিল সেই রাষ্ট্রের সর্বত্র আরব জাতীয়তাবোধ প্রসারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ মানুষ তখন প্রশাসনের নতুন আরব কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ সহজ করার জন্য এবং নিজেদের অধিকার ও পাওনা নিশ্চিত করার স্বার্থে আরবি ভাষা শিখতে বাধ্য হয়েছিল। রাজস্ব বিভাগগুলোর এই আরবিয়করণের বৈশিষ্ট্য কেবল আর্থিক গুরুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইসলামি সভ্যতার বিকাশে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

এই ঘটনাটি একটি চমৎকার প্রমাণ যে, ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা কোনো প্রাণহীন ব্যবস্থা ছিল না—যেমনটি আধুনিক তাত্ত্বিক গবেষণাগুলো এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার চেষ্টা করে—বরং এটি ছিল ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের এক সক্রিয় অঙ্গ। এটি ইসলামি ব্যবস্থার অন্যান্য অঙ্গের সাথে সুসমন্বিতভাবে কাজ করত, যাতে ইসলামি সমাজের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

নতুন আরবি মুদ্রা:
রাজস্ব দপ্তরের আরবিয়করণের সাথে সাথে রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নতুন মুদ্রা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশগুলোর মধ্যে আর্থিক লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

পৃষ্ঠা 134

তৃতীয় পাঠ: আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ

...অধিবাসীদের নিকট থেকে কর সংগ্রহ করা হতো, কারণ সেই সব প্রদেশের কয়েকটি যেমন শাম (সিরিয়া) ও মিশরে স্বর্ণের দীনারের প্রচলন ছিল। এটি ছিল মুদ্রার প্রাথমিক একক যা ইসলামপূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধীন থাকা কাল থেকেই উভয় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আর ইরাক ও পারস্যে রূপার দিরহাম প্রচলিত ছিল, যা ইসলামপূর্ব সাসানীয় যুগ থেকেই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আরবরা জাহেলী যুগ থেকেই এই দুই ধরণের মুদ্রা সম্পর্কে অবগত ছিল, কারণ রোম থেকে তাদের কাছে দীনার আসত এবং পারস্য থেকে দিরহাম আসত। তাদের কাছে মুদ্রার বিনিময় হার ছিল প্রতি দশ দিরহামের বিপরীতে সাত দীনার। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি অনুমোদন করেছিলেন এবং আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-ও তা বহাল রেখেছিলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া (রা.) এসে একে তার পূর্বাবস্থায় বহাল রাখেন।

তবে শীঘ্রই এই দ্বি-মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রাখার অসুবিধাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সীমানা ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে কিছু মুদ্রার মধ্যে অবক্ষয় ও জালিয়াতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। মানুষ নিম্নমানের বা কম মূল্যের মুদ্রা দিয়ে খেরাজ (ভূমি কর) পরিশোধ করার এবং উচ্চ মূল্যের মুদ্রাগুলো নিজেদের কাছে জমিয়ে রাখার অভ্যাসে লিপ্ত হয়। এটি খেরাজ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করছিল এবং কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ছিল। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যখন প্রজাদের কাছে বকেয়া পাওনা (কুসুর) দাবি করা হয়। এই ‘কুসুর’ হলো বকেয়া পাওনার অবশিষ্টাংশ; করদাতারা এই বকেয়া অংশগুলো নিম্নমানের মুদ্রা দিয়ে পরিশোধ করার উদ্যোগ নিচ্ছিল।

ইমাম আল-মাওয়ার্দী তাঁর ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’ গ্রন্থে এই পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেন: "অতঃপর মানুষের মধ্যে অসাধুতা দেখা দিল, ফলে খেরাজ প্রদানকারীরা ‘তাবারিয়্যাহ’—যা এক প্রকার মুদ্রা এবং চার দানিক সমপরিমাণ—দিয়ে কর পরিশোধ করতে শুরু করল এবং তারা ‘ওয়াফি’ নিজেদের কাছে রেখে দিল, যার ওজন ছিল এক মিষকাল। যিয়াদ যখন ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি ‘ওয়াফি’ পরিশোধের দাবি জানালেন এবং তাদেরকে বকেয়া অংশ (কুসুর) পরিশোধে বাধ্য করলেন। উমাইয়া বংশের কর্মকর্তারাও একই নীতি অনুসরণ করেন। পরিশেষে যখন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি উভয় মুদ্রার ওজনের বিষয়টি পর্যালোচনা করলেন এবং দিরহামের ওজন এক মিষকালের অর্ধেক ও এক-পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ সাত-দশমাংশ) নির্ধারণ করলেন এবং মিষকালকে তার পূর্বাবস্থায় বহাল রাখলেন।"

পৃষ্ঠা 135

তৃতীয় পাঠ

ইরাক, পারস্য এবং খুরাসানের মতো পূর্বদেশীয় প্রদেশগুলোতে ব্যবহৃত পারস্য মুদ্রার অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল রুপার ওজনে ত্রুটি এবং এতে ভেজালের আধিক্যের কারণে। আল-মাওয়ারদী এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেন: "পারস্যদের শাসনব্যবস্থায় যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন তাদের মুদ্রাব্যবস্থায়ও বিপর্যয় নেমে আসে। ইসলাম আগমনের সময় তাদের মুদ্রা ছিল ‘আইন’ (স্বর্ণমুদ্রা) ও ‘ওয়ারাখ’ (রৌপ্যমুদ্রা) - অর্থাৎ অশুদ্ধ রূপা; তবে লেনদেনে এগুলো খাঁটি মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। এই পরিস্থিতি রাজস্ব (খরাজ) আদায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল এবং প্রকৃত করের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। কারণ খরাজ দপ্তরে এমন সব জাল বা নিম্নমানের মুদ্রা আসত যা নতুন করে দ্রুত মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছিল, যাতে এসব অনিয়ম দূর করা যায় এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায়।"

রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশগুলো - বিশেষ করে মিশর ও শাম - ভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন ছিল। এর কারণ ছিল বাইজেন্টাইন রোমানদের দীনারের একচেটিয়া অধিকার এবং এর মূল্য নির্ধারণে তাদের নিয়ন্ত্রণ। ফলে উমাইয়া রাষ্ট্র ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্রুতই সংকটের সৃষ্টি হয়, যা উমাইয়া কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রদেশগুলোর জন্য নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ত্বরান্বিত করে। এটি সংঘটিত হয়েছিল খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে। এর কারণ ছিল মিশর তখন ‘কারাতিস’ (প্যাপিরাস বা লেখার কাগজ) উৎপাদন করত - যা তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের লিখন সামগ্রী ছিল। ইসলামি বিজয়ের আগে থেকেই মিশর তাদের অধীনস্থ ছিল এবং মিশরের কিবতিরা (কপ্টিকরা) বড় বড় কাগজের শিটগুলোর শুরুতে 'ঈসা মসিহের নাম' এবং 'ত্রিত্ববাদের বাক্য' লেখার রীতি বজায় রেখেছিল।

কিন্তু খলিফা আবদুল মালিক দেখলেন যে, এই লিপি নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই তিনি এই বাক্যের পরিবর্তে এই বাণীটি প্রতিস্থাপন করার আদেশ দেন: **{বলুন, তিনি আল্লাহ, এক}** [আল-ইখলাস: ১]। এই নতুন লিপি যখন রোমান সাম্রাজ্যে পৌঁছাল, তখন রাজদরবারে প্রবল শোরগোল সৃষ্টি হলো। কারণ সম্রাট 'জাস্টিনিয়ান দ্বিতীয়' ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং সার্বভৌমত্বের অধিকার চর্চায় ইসলামি রাষ্ট্রের এই উত্থানকে ধৃষ্টতা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি খলিফা আবদুল মালিকের কাছে লিখলেন...

তৃতীয় পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

সম্রাট বলেছিলেন: "তোমরা তোমাদের কাগজপত্রে (কিরাতাসে) এমন কিছু উদ্ভাবন করেছ যা আমরা অপছন্দ করি—আর তিনি এর মাধ্যমে সেই বাণীটি বুঝিয়েছেন যা এই মুদ্রার গায়ে লেখা ছিল, আর তা হলো: ‘বলুন: তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়’। যদি তোমরা তা পরিহার করো তবে ভালো; অন্যথায় দিনারগুলোতে তোমাদের নবীর এমন কিছু উল্লেখ আসবে যা তোমরা অপছন্দ করো।" যেন "সম্রাট জাস্টিনিয়ান" আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে হুমকি দিচ্ছিলেন এবং তাকে বলছিলেন: "হয় তোমরা এই মুদ্রার ওপর যা লিখেছ তা সরিয়ে ফেলো—যা হলো ‘বলুন: তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়’ এই বাণীটি—অন্যথায় আমরা সেগুলোর ওপর নবী সম্পর্কে এমন কিছু লিখব যা তোমরা অপছন্দ করো।"

এই বক্তব্য খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করল এবং তিনি রোমান সম্রাটের হুমকির কারণে মুদ্রার পরিস্থিতির বিপর্যয় এবং সাধারণ মুসলিমদের মনে এর কুপ্রভাবের আশঙ্কা করলেন; কারণ রোমান দিনারই ছিল অভ্যন্তরীণ ইসলামি বাজার এবং এমনকি বিদেশের সাথে বাণিজ্যের আনুষ্ঠানিক মুদ্রা। এই সংকটের সময় উমাইয়া বংশের শক্তিমত্তা প্রকাশ পায় এবং সেই সময় তাদের চিন্তাভাবনায় এই মুদ্রাগত পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য স্বতন্ত্র নতুন মুদ্রা চালুর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। খালিদ বিন ইয়াজিদ খলিফা আব্দুল মালিককে সেই কাগজপত্রের (কিরাতাস) ওপর অটল থাকার পরামর্শ দিলেন—অর্থাৎ: সেই কাগজপত্র যেগুলোর ওপর এই বাণী লিখিত ছিল: ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই’—বাইজেন্টাইন হুমকির পরোয়া না করেই।

তিনি বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন, তাদের দিনার নিষিদ্ধ করুন, যাতে মানুষ তা দিয়ে লেনদেন না করে, এবং জনগণের জন্য মুদ্রা তৈরি করুন—অর্থাৎ: নতুন মুদ্রা প্রস্তুত করুন—এবং স্ট্যাম্পের ক্ষেত্রে এই কাফেররা যা অপছন্দ করেছে তা থেকে তাদের ছাড়

দেবেন না—অর্থাৎ: সেই বাণীটি সরিয়ে ফেলবেন না যা তাদের ক্ষুব্ধ করেছে, আর তা হলো: ‘বলুন: তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়’।"

এই প্রস্তাবটি খলিফার পছন্দ হলো এবং তিনি একে রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার এবং নিজস্ব মুদ্রার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ঐক্য সৃষ্টির একটি মৌলিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করলেন। অতঃপর আব্দুল মালিক নতুন ইসলামি দিনার তৈরির কাজ শুরু করলেন, যার ওপর কোরআনের আয়াত খোদাই করা ছিল।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (ইসলামি রাষ্ট্রনীতি)
তৃতীয় পাঠ

আল-কারিম; এগুলো 'দামেস্কি দিনার' নামে পরিচিত ছিল। একইভাবে তিনি ইরাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফিকে পারস্য দিরহামের পরিবর্তে ইসলামি দিরহাম তৈরির নির্দেশ দেন। খলিফা শরীয়ত অনুযায়ী এই দুই প্রকার মুদ্রার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করেন।

এই নতুন ইসলামি মুদ্রা তার ওজনের সঠিকতার কারণে সর্বত্র মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। ইসলামি রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করেই তারা দ্রুত এর ব্যবহার শুরু করে। এই নতুন আর্থিক লেনদেনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খলিফা নির্দেশ জারি করেন যে, রাষ্ট্রের অধীনস্থ টাঁকশালগুলোই হবে মুদ্রা তৈরির একমাত্র স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ। টাঁকশালের বাইরে কোনো মুদ্রা তৈরি করা নিষিদ্ধ করা হয় এবং বাজার থেকে প্রচলিত পুরনো মুদ্রাগুলো তুলে নেওয়া হয়।

উমাইয়া রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা এই মুদ্রার স্থিতিশীলতা থেকে উপকৃত হয়। এই নতুন মুদ্রা প্রজা ও রাষ্ট্রীয় রাজস্ব উভয়ের ক্ষেত্রেই ইনসাফ নিশ্চিত করেছিল। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এই মুদ্রাগুলো যে ওজনে তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল সেই শরয়ী ওজন যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র যুগে প্রচলিত ছিল। সেগুলো হলো: পারস্য দিরহাম এবং রোমান দিনার।

ইবনে খালদুন এই নতুন মুদ্রাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: আব্দুল মালিকের মুদ্রাগুলো ওই ওজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে এগুলোই শরয়ী মুদ্রা। সকলে এর ওপর আমল করতে সম্মত হন, ফকিহগণ এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং এ কথা স্বীকৃত হয় যে, এগুলোই সেই ওজন যা দ্বারা জাকাত আদায় করা হবে এবং এর মাধ্যমেই শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়াজিব বা মুস্তাহাব পাওনা পরিশোধ করা হবে। ফলে ইসলামি যুগে এই ওজনগুলোর মাধ্যমেই লেনদেন পরিচালিত হতে থাকে।

উমাইয়া যুগে আর্থিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে ওমর বিন আব্দুল আজিজের অবস্থান:

এ পর্যায়ে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা সমীচীন হবে, তাই আমরা বলছি:

আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ

তৃতীয় পাঠ

উমাইয়াদের আর্থিক ব্যবস্থার সাথে বেশ কিছু অস্বাভাবিক বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর কোনটি প্রদেশগুলোতে খরাজ (ভূমি কর) আদায়কারীদের প্রয়োগিক সমস্যার কারণে উদ্ভূত হয়েছিল, আবার কোনটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিকাশ ও প্রসারের ফলে সৃষ্ট বিবর্তনের সমস্যার ফলাফল ছিল। প্রথম প্রকারের বিচ্যুতি প্রতিফলিত হয়েছিল কর আদায়কারীদের সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে; তাদের সীমালঙ্ঘনের অর্থ হলো, তারা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করত, যা করদাতা বা অর্থ প্রদানকারীদের জন্য চরম জুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রকারের বিচ্যুতি ঘটেছিল উমাইয়াদের সেই নীতির কারণে, যার মাধ্যমে তারা তাদের সমর্থক ও পরিবারের সদস্যদের অঢেল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করত। পরবর্তীতে এটি উমাইয়া কর্তৃপক্ষের বিভ্রান্তিতে রূপ নেয়, বিশেষ করে যখন দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে এবং এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার মোকাবিলা করতে গিয়ে। এই বিচ্যুতিগুলো চরম সীমায় পৌঁছেছিল যখন খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খেলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো ধ্বংস ও পতনের হুমকিতে ছিল। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এই বিচ্যুতিগুলো সমাধানের জন্য দ্রুত আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়ন করেন; কারণ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তিনি এই সব বিষয় ও তার কারণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি উমাইয়াদের কিছু গভর্নরের অপকর্ম সম্পর্কে জানতেন, যেমন: ইরাকের হাজ্জাজ, শামের ওয়ালিদ, মিশরের কুররাহ, মদীনার উসমান এবং মক্কার খালিদ। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! দুনিয়া জুলুম ও অন্যায়-অবিচারে ভরে গেছে, আপনি মানুষকে স্বস্তি দান করুন।"

তিনি খলিফা হওয়ার আগেই এই সব গভর্নর এবং খরাজ আদায়কারীদের উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে মিশরের খরাজ আদায়কারী উসামা ইবনে যায়েদও ছিলেন। ওমর তার সেই অজুহাত গ্রহণ করেননি, যে অজুহাতে গভর্নর খলিফা সুলায়মানের নীতি বাস্তবায়নের দোহাই দিচ্ছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন: "সুলায়মানের নীতি আল্লাহর কাছে তোমার কোনো কাজে আসবে না।" ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লাব এবং তার পরিবার সম্পর্কেও বলেছিলেন: "ওরা হলো স্বৈরাচারী, আর আমি তাদের মতো লোকদের পছন্দ করি না।"

শারঈ রাজনীতি
তৃতীয় পাঠ
ওমর বিন আব্দুল আজিজ মিসর থেকে উসামা বিন জায়েদ এবং খোরাসান থেকে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে বরখাস্ত করার মাধ্যমে তাঁর খিলাফতের সূচনা করেন। তিনি তাঁদের পরিবর্তে এমন সব কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করেন যারা ছিলেন অধিকতর ন্যায়পরায়ণ ও বিনম্র। এরপর তিনি প্রতিটি প্রদেশে ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক অসঙ্গতিসমূহ দূর করার উদ্যোগ নেন। মিসরে সন্ন্যাসীদের ওপর নিপীড়নমূলক অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়েছিল, অথচ ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে সকল প্রকার কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। ইয়েমেন এমন কর প্রদান করছিল যার নজির ইতিপূর্বে ছিল না। আর ইরাকের ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক অসঙ্গতিগুলো ছিল সংখ্যায় অনেক, যা নিম্নরূপ:

১. আবাদি ও অনাবাদি উভয় প্রকার জমির ওপর সমহারে কর আরোপ।

২. অতিরিক্ত কর আদায়, যার কতক ছিল "আল-আবীন" নামে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী সাসানীয় শুল্কের পুনরুজ্জীবন এবং অন্যগুলো ছিল মুদ্রার টাঁকশালে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে আদায়কৃত কর।
৩. জনগণের নিকট থেকে সরকারি আবেদনপত্রে ব্যবহৃত কাগজের মূল্য আদায়।
৪. পতিতা বা ভ্রষ্টাদের ওপর কর আরোপ।
৫. কিছু নির্দিষ্ট বসতবাড়ির ওপর কর আরোপ।
৬. জনগণের কাছে সহজলভ্য মুদ্রার পরিবর্তে নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রায় কর প্রদানের শর্তারোপ এবং মুদ্রার মানের পার্থক্যজনিত অর্থ কর্মকর্তাদের নিজেদের জন্য আত্মসাৎ করা।
৭. কুফার নাজরানিদের ওপর বিশেষ কর বৃদ্ধি করা; কারণ তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের সহায়তা করার অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ কুফার গভর্নরের কাছে এই সকল অস্বাভাবিক পদক্ষেপ বাতিলের নির্দেশ দিয়ে পত্র লেখেন। তিনি বলেন: "অতঃপর, কুফাবাসী আল্লাহর বিধানে পরীক্ষা, কঠোরতা ও জুলুমের শিকার হয়েছে এবং মন্দ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাদের ওপর এক অশুভ রীতি প্রচলিত হয়েছে। অথচ দ্বীনের মূল ভিত্তি হলো ইনসাফ বা ন্যায়বিচার।"

শারয়ি রাজনীতি
তৃতীয় পাঠ

...এবং সদাচার। এরপর তিনি তাকে বললেন: তোমরা অনাবাদি জমির বোঝা আবাদি জমির ওপর চাপিয়ে দিও না, আর আবাদি জমির বোঝা অনাবাদি জমির ওপর দিও না। অনাবাদি জমির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো এবং তা থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করো, আর তা সংস্কার করো যাতে তা আবাদযোগ্য হয়। আবাদি জমি থেকে কেবল নির্ধারিত খরাজটুকুই গ্রহণ করা হবে, যা ভূমির অধিবাসীদের প্রতি কোমলতা ও স্বস্তি প্রদানের মাধ্যমে হবে। তুমি খরাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার কারিগরদের মজুরি, নওরোজ ও মেহেরজানের (পারস্য উৎসবের) উপহার, কাগজের মূল্য, পত্র বিনিময়ের মজুরি, ঘর ভাড়া কিংবা বিবাহের দিরহাম গ্রহণ করবে না। আর ভূমির অধিবাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের ওপর কোনো খরাজ ধার্য হবে না।

খলিফা কুফায় বসবাসরত নাজরানবাসীদের ওপর ধার্যকৃত করের পরিমাণ হাজ্জাজের শাসনামলে বলবৎ থাকা এক হাজার তিনশ 'হুল্লা' থেকে কমিয়ে মাত্র দুইশ 'হুল্লা' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হুল্লা হলো এক প্রকার পোশাক। আর এটি তারা পূর্বে যা প্রদান করত তার দশ ভাগের এক ভাগ—অর্থাৎ তাঁর খিলাফত লাভের পূর্বে তারা যা প্রদান করত।

একই সময়ে তিনি আদেশ প্রদান করেন যে, ইয়েমেনের অধিবাসীদের থেকে যেন খরাজের শারয়ি পরিমাণ ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কিছু নেওয়া না হয়, আর তা হলো উশর (দশ ভাগের এক ভাগ) অথবা তার অর্ধেক। তিনি বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম! ইয়েমেন থেকে এক মুষ্টি 'কাতাম'—যা এক প্রকার মেহেদি—আসা আমার কাছে এই করের বোঝা বহাল রাখার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।" পরিশেষে তিনি মিশরের সন্ন্যাসীদের ওপর ধার্যকৃত করও মওকুফ করে দেন।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ ইসলামি রাষ্ট্রের বিকাশের সমস্যার সাথে যুক্ত হওয়া বিভিন্ন অস্বাভাবিক অসংগতিগুলোরও মোকাবিলা করেন। এটি ছিল এমন এক মোকাবিলা যা ইসলামি ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস এবং ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের বিষয়ে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। তিনি প্রথম যে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা হলো 'সওয়াফি' (রাষ্ট্রীয় খাস জমি) সংক্রান্ত সমস্যা। উমাইয়া বংশের সদস্যরা এই জমিগুলো থেকে বড় একটি অংশ ভোগ করত এবং তারা রাষ্ট্রের সাধারণ ভূমি ব্যবস্থার নিয়মনীতি তোয়াক্কা করত না। এই উমাইয়াগণ এসব খাস জমির লভ্যাংশ গ্রহণ করত, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে এগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যবস্থার অধীনে থাকা উচিত এবং তা মুসলমানদের জনকল্যাণে ব্যয় হওয়া আবশ্যক।

উমাইয়াদের দখলে থাকা সেসব ভূমিকে তিনি 'মাযালিম' (অন্যায্যভাবে দখলকৃত সম্পদ) নাম দেন। তিনি সেগুলোকে অন্যায় হিসেবে গণ্য করেন। এর অর্থ হলো, এই অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পদগুলো অবশ্যই তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি এই প্রক্রিয়া শুরু করেন নিজের কাছে যা ছিল তা দিয়ে এবং তাঁর বংশধরদের কাছে যা ছিল তা দিয়ে...

তিনি নিজের ওপর এটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে শুরু করেন এবং তা (অন্যায়ভাবে গ্রহণকৃত সম্পদ) রাষ্ট্রের নিকট ফিরিয়ে দেন। এই বিষয়সমূহ বা সম্পদসমূহ যা "সাওয়াফি" (রাষ্ট্রীয় ভূমি) থেকে আসত, তা বনু উমাইয়াদের মাঝে বণ্টন করা হতো। এই কারণে তিনি এগুলোকে এক প্রকারের অন্যায় বা জুলুম (মাজালিম) হিসেবে গণ্য করতেন এবং মনে করতেন যে, এই সম্পদসমূহ তার প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। বনু উমাইয়ারা এই শাসননীতির কারণে এবং এর ফলে তাদের সম্পদের যে ঘাটতি তৈরি হয়েছিল তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। তারা তাকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর ফুফু ফাতিমা বিনতে মারওয়ানকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আযাব বা শাস্তি হিসেবে নয়। মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে সকল মানুষের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর জন্য যা নির্ধারিত ছিল তা চয়ন করে নিলেন (তাঁর মৃত্যু হলো), এমতাবস্থায় তিনি তাদের জন্য একটি নদী রেখে গেলেন যেখানে তারা সকলেই সমান ছিল। অতঃপর আবু বকর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নদীটিকে তার পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখেন। এরপর উমর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গীর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেন। অতঃপর যখন উসমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সেই নদী থেকে একটি নহর বা শাখা খনন করেন। এরপর মুয়াবিয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তা থেকে আরও কিছু নহর খনন করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে ইয়াজিদ, মারওয়ান, আব্দুল মালিক এবং সুলাইমান দায়িত্ব পালন করেন, এমনকি পরিশেষে বিষয়টি আমার নিকট এসে পৌঁছেছে। আর এখন সেই প্রধান নদীটি শুকিয়ে গেছে। এই নদীর প্রকৃত অংশীদারগণ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হবে না, যতক্ষণ না নদীটি পুনরায় তার সেই মূল বিশাল ধারায় ফিরে আসে।"

সম্ভবত তিনি "নদী" বলতে বুঝিয়েছেন: সেই সকল ইসলামী অর্থ-উৎসসমূহ যা যাকাত, জিজিয়া, উশর এবং খারাজের মাধ্যমে সংগৃহীত হতো। এটি একটিই নদী সদৃশ ছিল যা থেকে সবাই উপকৃত হতো এবং এর একটিই মূল প্রবাহ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এর থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তৈরি করা হয় (বণ্টনে বৈষম্য করা হয়), আর একারণেই তিনি এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

"নদীর অংশীদারগণ তৃপ্ত হবে না" এর অর্থ হলো: তিনি সকল মুসলিমকে বুঝিয়েছেন, যারা এই নদী থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করবে। আর এই নদী বলতে বুঝায়—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—সেই সকল সম্পদ যা ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। "ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার পূর্বের মহান ধারায় ফিরে না আসে" বলতে বুঝিয়েছেন: যা নবী (সা.)-এর যুগে এবং আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল।

তিনি এই সকল অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দিতে গিয়ে কোনো হত্যাকারীর হুমকি কিংবা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় পাননি। তিনি বলতেন: "কিয়ামতের দিন আসার আগেই প্রতিটি দিন আমি যা থেকে আত্মরক্ষা করি এবং যাকে ভয় করি, (তা যদি না করতাম) তবে আমি রক্ষা পেতাম না।" অর্থাৎ: তিনি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়ার ভয় পেতেন না।

তৃতীয় পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরিয়াহসম্মত রাজনীতি)

উমাইয়াদের থেকে, যাদের কাছ থেকে তিনি সেই সম্পদগুলো গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যা তারা অন্যায়ভাবে দখল করেছিল এবং তা তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি তাদের কাউকেই কোনোদিন ভয় পাননি। তিনি বলেছিলেন: "আমি প্রকৃতপক্ষে যে দিনটিকে ভয় পাই তা হলো কিয়ামতের দিন; আর যদি আমি কিয়ামতের দিন ছাড়া অন্য কোনো দিনকে ভয় পাই, তবে এ বিষয়ে আমার কোনো অধিকার থাকবে না।"

এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন যা ইতিপূর্বে হারিয়ে গিয়েছিল; কারণ 'সাওয়াফি' (রাষ্ট্রীয় খাস জমি) আর্থিক ব্যবস্থা অনুযায়ী 'খরাজ' (ভূমি কর) প্রদান করত।

কিন্তু উমাইয়াদের অধীনে থাকাকালীন তারা কেবল 'উশর' (ফসলের দশমাংশ) প্রদান করত। অর্থাৎ: এই সাওয়াফি জমিগুলোর মূল বিধান ছিল এগুলোর ওপর খরাজ ধার্য করা, কিন্তু উমাইয়াদের যুগে তারা এগুলোর ওপর খরাজ ধার্য করেনি, বরং তারা কেবল উশর প্রদান করত।

আমাদের নেতা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এটিই এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি এতে সফল হন।

খলিফা আর্থিক বিবর্তনের সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় এক বিশাল সমাধান-ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। দ্বীনি বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ইসলামী নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁকে এক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ছিল বিভিন্ন প্রদেশে জিম্মিদের (অমুসলিম প্রজা) দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। এর ফলে ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী তাদের ওপর থেকে জিজিয়া রহিত হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের রাজস্বে এক বিশাল ঘাটতি দেখা দেয়। কেউ কেউ হয়তো এই বিষয়গুলোকে সমস্যা হিসেবে দেখতে পারেন, কারণ রাষ্ট্রের রাজস্ব আসত খরাজ ও জিজিয়া থেকে। কিন্তু জিজিয়া কেবল অমুসলিমদের ওপর ধার্য করা হতো। সুতরাং যখন কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তার ওপর থেকে জিজিয়া রহিত হয়ে যেত। আর তার ওপর থেকে জিজিয়া রহিত হওয়ার অর্থ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের যে উৎসটি জিজিয়া থেকে আসত, তা আগের তুলনায় অনেক কমে যাওয়া।

আমি বলব: এটি ছিল খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের মোকাবিলা করা সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এই বৈপরীত্যের এমন একটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকেও রক্ষা করেছিল এবং একই সাথে ইসলামী নীতিমালার পবিত্রতাকেও সমুন্নত রেখেছিল।

শরয়ি রাজনীতি
চতুর্থ পাঠ

ইসলামি রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদসমূহ
যাকাত

পাঠের বিষয়সমূহ

প্রথম বিষয় : যাকাতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি বলতে যা বোঝায় — ১৪৫
দ্বিতীয় বিষয় : যাকাতের ক্ষেত্রে আইনি সত্তা — ১৬১
তৃতীয় বিষয় : গবাদি পশুর মিশ্রণের বিধান এবং যাকাতের ওপর এর প্রভাব — ১৭৩

""

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্থ পাঠ

যাকাতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তির উদ্দেশ্য

আমরা এখন ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক উৎসসমূহ যেমন: যাকাত, জিজিয়া, খারাজ... ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তবে এটি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এই উৎসগুলো সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হচ্ছে শরয়ী রাজনীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিছক বিশুদ্ধ ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

এর ব্যাখ্যা হলো: ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট তার প্রজাদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করার দাবি রাখে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমতা ও ইনসাফ হলো এমন দুটি সাধারণ মূলনীতি, যার প্রয়োগের বিস্তারিত বিবরণ এবং এই প্রয়োগের পদ্ধতি শরয়ী রাজনীতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; যা সর্বদা স্থান ও কালের পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখে।

এই ভিত্তিতে, আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্যে সমতা ও ইনসাফ অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোকে এই উৎসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আর এটি দাবি করে যে, আমরা যাকাত এবং অন্যান্য আর্থিক উৎসসমূহের ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করি, তারপর অর্থদাতার পরিস্থিতির প্রতি আর্থিক বিধানসমূহের বিবেচনার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি; কারণ সেই

পরিস্থিতিগুলো বিবেচনা করা মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক উৎসসমূহ:

প্রথম উৎস: যাকাত:

শাব্দিক অর্থে যাকাত শব্দটি প্রবৃদ্ধি, পরিবর্ধন এবং বৃদ্ধি থেকে গৃহীত। একে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি সম্পদকে ফলপ্রসূ করে এবং বৃদ্ধি করে। বলা হয়: ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন এর উৎপাদন প্রচুর হয়। আবার বলা হয়: ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন তাতে বরকত হয়। এটি 'আল-মিসবাহুল মুনীর' গ্রন্থের 'যাকা' ধাতুর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। আর সম্পদ থেকে বের করা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশকে 'যাকাত' নামকরণ করা হয়েছে; কারণ এটি এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা প্রবৃদ্ধি আশা করা হয়।

যাকাতের শাব্দিক অর্থ হলো পবিত্রতা। এটি নফস বা আত্মাকে কৃপণতা ও পাপাচারের কলুষতা থেকে পবিত্র করে এবং হকদারদের নিকট অন্যের প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করে। অভিধানে যাকাতের সংজ্ঞা এটাই।

আর ফকীহগণের পরিভাষায় যাকাত হলো: বিশেষ শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট মালের মালিকানা তার হকদারকে প্রদান করা। এর অর্থ হলো: যারা যাকাতের নিসাবের মালিক, তাদের ওপর আবশ্যক হলো তাদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ মালিকানা হস্তান্তরের পন্থায় দরিদ্র ও যাকাতের অন্যান্য হকদারদের প্রদান করা। এই কারণেই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: 'নির্দিষ্ট মালের মালিকানা প্রদান করা'। আর সংজ্ঞায় 'তার হকদারকে' বলতে যাকাত পাওয়ার যোগ্য সেই আটটি শ্রেণিকে বোঝানো হয়েছে, যাদের কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: "নিশ্চয়ই সদকা (যাকাত) হচ্ছে কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [আত-তাওবা: ৬০]। এই হলো সেই আটটি শ্রেণি।

একজন মুসলিমের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক, যা ফকীহগণ ফিকহ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

যাকাতের বিধান এবং এই বিধানের দলীল:

যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি; কেননা এটি ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি। যার মাঝে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তার জন্য এটি ফরযে আইন। দ্বীনের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে এর ফরয হওয়া সর্বজনবিদিত। মহান আল্লাহর কিতাব এর প্রমাণ বহন করে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।" [আল-বাকারাহ: ৪৩]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন, নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আত-তাওবা: ১০৩]। এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য।" [আল-মাআরিজ: ২৪-২৫]

পৃষ্ঠা 147

শরীয়াহভিত্তিক রাজনীতি
চতুর্থ পাঠ

সুন্নাহ থেকে জাকাত ফরয হওয়ার দলীল হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত: এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, হজ সম্পাদন করা এবং রমযানের সিয়াম পালন করা।"

এছাড়াও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াজকে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন: "তুমি কিতাবধারী এক জাতির কাছে যাচ্ছো। সুতরাং তাদের এ সাক্ষ্যের প্রতি দাওয়াত দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের জানাও যে, আল্লাহ দিনে ও রাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এটিও মেনে নেয়, তবে তাদের জানাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে সদকা (জাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।"

আর ইজমা তথা ঐকমত্যের ব্যাপারে বলা যায় যে, সকল যুগের মুসলিমগণ জাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। সাহাবীগণ জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি বকরির বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে যা তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রদান করত, তবে তা না দেওয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

এই ইজমার ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেছেন: যে ব্যক্তি জাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কুফরী করল; কারণ সে দ্বীনের একটি স্বতঃসিদ্ধ ও অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করল। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল জাকাত দিতে অস্বীকার করে অথচ এর ফরয হওয়াকে বিশ্বাস করে, সে কাফির হবে না; বরং সে গুনাহগার হবে। তাকে জাকাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হবে। যদি সে বিরত থাকে, তবে তার থেকে জোরপূর্বক তা আদায় করা হবে—প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও; যেমনটি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সাথে করেছিলেন।

সুতরাং অস্বীকারকারী যদি অস্বীকারের সাথে সাথে এর আবশ্যকতাকে মনে-প্রাণে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে কুফরী করল এবং তার কুফরীর কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এটি তখন প্রযোজ্য হবে যদি সে তাওবা না করে এবং জাকাত আদায় না করে, যেমন মুরতাদকে হত্যা করা হয়। কারণ জাকাত ফরয হওয়া দ্বীনের একটি স্বতঃসিদ্ধ ও অকাট্য বিষয়। তাই যে ব্যক্তি এর আবশ্যকতাকে অস্বীকার করল, সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এই কারণেই তার ওপর কুফরীর ফয়সালা দেওয়া হয়।

আর এটি ঐ জাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেটির ফরয হওয়া এবং প্রদানের ব্যাপারে ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ
আর যে সকল যাকাতের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে, যেমন— ব্যবসার যাকাত, রিকায (খনি বা গুপ্তধন), খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত অন্য ফলের যাকাত, খরাজি জমির শস্যের যাকাত, মুকাল্লাফ নয় এমন ব্যক্তির সম্পদের যাকাত, নারীর অলঙ্কার এবং পাওনাদার বা দেনাদারের ক্ষেত্রে ঋণের সম্পদের যাকাত; এমতাবস্থায় তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; কারণ এগুলোতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

যাকাতের ব্যাপকতা:
যাকাতের ব্যাপকতা বলতে বুঝায় যে, যার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পূর্ণ হবে, তাকেই যাকাত আদায় করতে হবে। কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে তা আদায় করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। এছাড়াও এই ব্যাপকতার অর্থ হলো: সমস্ত সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য করা যখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যাবে। এর মর্মার্থ হলো: যাকাতের ব্যাপকতা ব্যক্তি এবং বস্তুগত—উভয় দিককেই শামিল করে। এটি ব্যক্তির অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন; আবার এটি সম্পদের ওপর ধার্য করার ক্ষেত্রে বস্তুগত, সম্পদের ধরন যা-ই হোক না কেন।

যাকাতের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা:
যাকাতের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা বলতে বুঝায় যে, যার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পূর্ণ হবে, তাদের সকলের ওপর যাকাত ধার্য করা হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে এই যাকাত আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। যাকাত আদায়ের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তি শর্তসমূহ পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে 'প্রাকৃতিক ব্যক্তি' হতে পারে, আবার 'আইনি ব্যক্তি' হতে পারে; আমরা বিষয়টি নিচে স্পষ্ট করছি।

প্রাকৃতিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা বলব: ইসলামি শরিয়ত আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ওপর রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক দায়ভার বহনে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। আর তা হলো যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক প্রত্যেক মুসলিমের ওপর যাকাত ফরজ করার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির লিঙ্গ, গায়ের রং, বয়স বা সামাজিক স্তরের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। সুতরাং নারী-পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ...

শারয়ি রাজনীতি
চতুর্থ পাঠ

...এবং কালো, উচ্চবংশীয় ও দুর্বল, শাসক ও শাসিত—সবাই এই বিধানের সামনে সমান। এটি ড. ইউসুফ আল-কারদাভি রচিত 'ফেকহুয যাকাত' (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর বিধান ও দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৩৯ এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ আছে; ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

এ প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন মুসলিম—যে নিসাব পরিমাণ মালের পূর্ণ মালিক—তার ওপর যাকাত ওয়াজিব, যদি তার সম্পদের ওপর যাকাত আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ পূর্ণ হয়। তবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী), শিশু এবং পাগলের ক্ষেত্রে ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ফকিহগণ যেহেতু মুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাই তারা স্বভাবতই মূল কাফিরের ওপর—সে হারবি (যুদ্ধরত) হোক বা যিম্মি (চুক্তিভুক্ত অমুসলিম)—যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারেও ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সুতরাং ইমাম শাফিঈ যেমনটি বলেছেন—কুফরি অবস্থায় তার কাছে যাকাত দাবি করা হবে না, আর সে ইসলাম গ্রহণ করলেও কুফরি অবস্থার সময়ের যাকাত তার কাছে দাবি করা হবে না; কারণ এটি ইসলামের একটি শাখা, যা (কুফরি অবস্থায়) অনুপস্থিত থাকে। সুতরাং কাফির থাকা অবস্থায় তার কাছে যাকাত দাবি করা হবে না এবং এটি তার জিম্মায় কোনো ঋণ হিসেবেও থাকবে না যা সে ইসলাম গ্রহণের পর আদায় করবে।

কাফিরের ওপর যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার সপক্ষে আলেমগণ বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুয়ায (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন: “তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদের সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দাওয়াত দেবে তা হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া (বণ্টন করা) হবে।” এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, দুনিয়াতে ফরজ বিধানসমূহ পালনের দাবি কেবল ইসলাম গ্রহণের পরেই করা হয়। অতএব, ইসলাম হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার একটি শর্ত, আর এ বিষয়টি সর্বসম্মত।

এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন ইবনে কুদামা রচিত 'আল-মুগনি', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭ ও পরবর্তী অংশ।

চতুর্থ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

কাফেরের ওপর যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার স্বপক্ষে দলীলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: যাকাত একটি ইবাদত, আর কাফের ইবাদত করার যোগ্য নয়; কারণ ইবাদতের যোগ্য হওয়ার শর্ত তথা ইসলাম তার মাঝে অনুপস্থিত। এছাড়া যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ, তাই নামায ও রোযার মতোই কাফেরের ওপর তা ওয়াজিব নয়। যেভাবে তার ওপর নামায ও রোযা ওয়াজিব নয়, তেমনিভাবে তার ওপর যাকাতও ওয়াজিব নয়; কারণ যাকাতও একটি রুকন, যেমন রোযা ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। এর স্বপক্ষে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ‘কিতাবুস সাদাকাহ’-তে বর্ণিত উক্তিটিও প্রমাণ বহন করে: "এটি হলো সাদাকার (যাকাত) সেই বিধান যা রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিমদের ওপর ফরয করেছেন।" এটি রিমলী আশ-শাফিঈ রচিত (নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশসমূহে উল্লেখ রয়েছে।

এটি হলো কাফেরের ক্ষেত্রে বিধান। দলীলসমূহের মাধ্যমে আমাদের নিকট এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ফকীহগণ কাফেরের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত যাকাত সহীহ বা শুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

মুরতাদের ক্ষেত্রে বিধান:

মুরতাদের (ধর্মত্যাগী) ব্যাপারে ফকীহগণ দুটি দিক থেকে মতভেদ করেছেন:

প্রথমত: যা তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছিল।
দ্বিতীয়ত: যা তার মুরতাদ হওয়ার পর অর্থাৎ মুরতাদ অবস্থায় তার ওপর সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রথম দিকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুরতাদ হওয়ার পূর্বে তার ওপর যে যাকাত সাব্যস্ত হয়েছিল: হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন যে, মুরতাদ হওয়ার পূর্বে যা সাব্যস্ত হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। তাদের নিকট মূলনীতি হলো: মুরতাদ ব্যক্তি কাফেরে আসলী বা জন্মগত কাফেরের মতো হয়ে যায়। এটি (হাশিয়া ইবনে আবিদিন আল-হানাফী) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন: মুরতাদ হওয়ার পূর্বে মুরতাদের ওপর যে যাকাত সাব্যস্ত হয়েছিল তা মুরতাদ হওয়ার কারণে রহিত হবে না; কারণ তা ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং মুরতাদ হওয়ার কারণে এটি রহিত হবে না, যেমন নষ্ট করা সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান রহিত হয় না। এটি ইমাম নববী রচিত (আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব) গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশসমূহে বিদ্যমান।

১৫০

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্থ পাঠ

শাফেয়ী মাযহাবের অভিমতটিই এখানে মনোনীত; কারণ এখানে যাকাত কোনো কাফিরের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে না, বরং একজন মুসলিমের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। কেননা এটি ইতিপূর্বেই তার ওপর ওয়াজিব হয়েছিল, তবে তা আদায় করার আগেই সে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়েছে। ফলে এটি তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে রয়ে গেছে যতক্ষণ না তার থেকে তা আদায় করা হয়।

আমরা মনে করি যে, শাফেয়ীগণ যা বলেছেন সেটিই অগ্রগণ্য; কারণ এটি যাকাতের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে। আর যাতে মুরতাদ ব্যক্তি তার ধর্মত্যাগের কারণে যাকাত মওকুফ হওয়ার মতো কোনো অন্যায় সুবিধা না পায় এবং এর মাধ্যমে সে এমন একটি সাধারণ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি না পায় যাতে সকলের সমান হওয়া আবশ্যক, যতক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় দিকের ক্ষেত্রে—যা তার মুরতাদ থাকা অবস্থায় যাকাত হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে: তার মুরতাদ থাকা অবস্থায় যা সাব্যস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু শাফেয়ী এবং কিছু হাম্বলী ফকীহ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেছেন। একে ভরণপোষণ ও জরিমানার সাথে তুলনা (কিয়াস) করা হয়েছে। যেহেতু এটি এমন একটি হক যা সে ইসলামের মাধ্যমে নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছিল, তাই মানুষের হকের মতো এটিও ধর্মত্যাগের কারণে বাতিল হয়ে যায় না। আর যেহেতু যাকাত একটি মালের হক, তাই ধর্মত্যাগের কারণে এটি মওকুফ হয় না। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) মুরতাদের মাল থেকে তা গ্রহণ করবেন, যেভাবে তিনি যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানানো মুসলিমের থেকে জোরপূর্বক তা আদায় করেন। যদি সে তা আদায় করার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে আর দ্বিতীয়বার তা আদায় করতে হবে না; কারণ এটি আদায়ের মাধ্যমেই তার দায়মুক্তি ঘটেছে, যেমনটি যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানানো মুসলিমের থেকে তা আদায় করার মাধ্যমে ঘটে থাকে।

আমরা এই মতটিই পছন্দ করছি কারণ এটি নাগরিকদের মধ্যে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে এবং যাতে মুরতাদ তার ধর্মত্যাগের কারণে যাকাত মওকুফ হওয়ার সুবিধা ভোগ করতে না পারে। এর মাধ্যমে যাকাতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সার্বজনীনতা অর্জিত হয়।

শিশু ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মালের যাকাত সম্পর্কে ফকীহগণের অবস্থান:

আলেমগণ যখন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিমের মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তখন তারা শিশু ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মালের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন: তাতে কি যাকাত ওয়াজিব হবে? নাকি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না?

চতুর্থ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

এখানে ফকিহগণ (আইনবিদগণ) ব্যাপকভাবে মতভেদ করেছেন, যাকে আমরা প্রধান দুটি দলে বিভক্ত করতে পারি:

প্রথম দল: তারা শিশু ও পাগলের সম্পদের ওপর জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে মত দেন, তা নিরঙ্কুশভাবে হোক কিংবা বিশেষ কিছু সম্পদের ক্ষেত্রে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: ইবনে হাজম রচিত 'আল-মুহাল্লা', ৫ম খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশ, ১৯৬৮ সংস্করণ।

হানাফিদের অভিমত হলো: শস্য ও ফলমূল ব্যতীত তাদের অন্য কোনো সম্পদে জাকাত নেই; তবে এ দুটির (শস্য ও ফলমূল) ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হবে। শিশু ও পাগলের সম্পদ থেকে যে জাকাত নেওয়া হবে না, সে ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আত-তাওবাহ: ১০৩]

আয়াত থেকে দলিলের যৌক্তিকতা: পবিত্রতা কেবল গুনাহের পঙ্কিলতা থেকেই অর্জিত হয়। অথচ শিশু ও পাগলের কোনো গুনাহ নেই যে তাদের পবিত্রতা ও পরিশোধনের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, তারা ওইসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নন যাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাভি রচিত 'ফিকহুয জাকাত', ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশ।

তাদের দলিলের মধ্যে নবি ﷺ-এর এই বাণীটিও রয়েছে: "তিন শ্রেণির ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: শিশু যতক্ষণ না সে সাবালক হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।"

হাদিস থেকে দলিলের যৌক্তিকতা: এখানে 'কলম উঠিয়ে নেওয়া' দ্বারা শরয়ি দায়িত্ব (তাকলিফ) রহিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং তারা জাকাতের বিধান পালনে আদিষ্ট নন।

কিয়াসের (যৌক্তিক তুলনা) আলোকে: তারা দলিল পেশ করে বলেন যে, জাকাত হলো সালাতের মতোই একটি বিশুদ্ধ ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয়, যা শিশু ও পাগলের ক্ষেত্রে কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই তাদের ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়, ঠিক যেমন তাদের ওপর সালাত ওয়াজিব নয়।

আস-সিয়াহু আশ-শারইয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ

তারা আরও বলেছেন যে: জনস্বার্থ দাবি করে যে শিশুর সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব না হোক। তারা বলেছেন: তাদের স্বার্থ তাদের সম্পদ টিকিয়ে রাখার এবং তাতে যাকাত ফরজ না করার দাবি করে; কারণ এটি তাদের সম্পদ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেহেতু তারা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম নয়, আর এর ওপর যাকাত আরোপ করা হলে তা মূলধন কমিয়ে দেবে। তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ করা হলে তাদেরকে প্রয়োজনের সময় লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের সম্মুখীন করা হবে। এ বিষয়ে

বিস্তারিত জানতে দেখুন ডক্টর আল-কারযাভী (ফিকহুয যাকাত, প্রথম খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী অংশ) এবং হানাফী মাযহাবের হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী অংশ)।

এগুলো হলো প্রথম মতের অনুসারীদের দলিল, যারা বলেন যে শিশু ও পাগলের সম্পদের ওপর যাকাত নেই।

দ্বিতীয় পক্ষ: জমহুর (অধিকাংশ) ফকীহগণের মতে শিশু ও পাগলের সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব:

তিন ইমাম—মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ এবং আস-সাওরী, ইসহাক, আবু সাওর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আলী, আয়িশা ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (আল্লাহ তাদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট হন)—এর মতে শিশু ও পাগলের সকল প্রকার সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইবনে কুদামার আল-মুগনী (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী অংশ) দেখা যেতে পারে।

তারা তাদের অবস্থানের সপক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

তারা ধনীদের সম্পদে সাধারণভাবে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহনকারী সাধারণ দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যেখানে শিশু ও পাগলের জন্য কোনো বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়নি।

যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আত-তাওবা: ১০৩]। এই আয়াতটি এখানে সাধারণভাবে অবতীর্ণ হয়েছে; যে সম্পদ গ্রহণ করা হচ্ছে তা কোনো শিশু, পাগল, জ্ঞানবান বা প্রাপ্তবয়স্ক—কার সম্পদ সে বিষয়ে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাই আয়াতটি তার ব্যাপকতার কারণে শিশু ও পাগলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ওপর যাকাত আদায়ের বিধান কার্যকর থাকে, ততক্ষণ তা শিশু ও পাগলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৫৩

পৃষ্ঠা 4

চতুর্থ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযি.)-কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁকে যা বলেছিলেন তার মতো: "তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" সুতরাং "তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে" বাক্যটি সাধারণভাবে এসেছে, এতে ধনী ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া অথবা শিশু বা পাগল হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

অতএব: এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, শিশুর সম্পদে যাকাত ওয়াজিব, যেহেতু হাদীসে বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতটি—যেমন ইবনে হাযম বলেছেন—প্রত্যেক ছোট, বড়, বুদ্ধিমান ও পাগলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কারণ তারা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জনের মুখাপেক্ষী এবং তারা সকলেই মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন: এটি মুসলিমদের প্রত্যেক ধনীর জন্য প্রযোজ্য সাধারণ হুকুম। আর এর মধ্যে ছোট, বড় এবং পাগলও অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তারা সম্পদশালী হয়। এ বিষয়ে ইবনে হাযম রচিত 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থের ৫ম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

এর মধ্যে ইয়াতীমের সম্পদের যাকাত প্রদানের নির্দেশ সংক্রান্ত একটি বিশেষ হাদীসও রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের মাধ্যমে অথবা ইয়াতীমদের সম্পদের মাধ্যমে (উন্নতি) অন্বেষণ করো, যেন যাকাত তা

নিঃশেষ না করে ফেলে।" তিনি ﷺ আরও বলেছেন: "তোমরা ইয়াতীমদের সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করো, যেন যাকাত তা খেয়ে না ফেলে।"

দলীলের তাৎপর্য: নবী ﷺ ব্যবসার মাধ্যমে ও মুনাফা অর্জনের দ্বারা ইয়াতীম এবং একইভাবে পাগলদের সম্পদ বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তা বৃদ্ধি না করে ফেলে রাখা থেকে সতর্ক করেছেন, যাতে যাকাত তা খেয়ে না ফেলে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যাকাত বের করার কারণেই তা সম্পদকে কমিয়ে দেয় (খেয়ে ফেলে), আর যাকাত বের করা তখনই বৈধ হয় যখন তা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়। কেননা অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব ক্ষেত্র ব্যতীত শিশুর সম্পদ থেকে দান-সদকা করা বৈধ নয়।

সুতরাং এই হাদীস দুটি শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে।

১৫৪

পৃষ্ঠা 5

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
চতুর্থ পাঠ

তাঁরা ইয়াতীম ও পাগলের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

নিশ্চয়ই এটি উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। কিছু অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা ব্যতীত তাঁদের কোনো বিরোধিতাকারী সম্পর্কে জানা যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইবনে হাজম রচিত 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থের ৫ম খণ্ড, ৩০২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো দেখা যেতে পারে।

তাঁরা কিয়াস (অনুমান) দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

নিশ্চয়ই যার ফসলের ওপর উশর (দশমাংশ) ফরজ হয়, সুস্থ মস্তিষ্কের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় তার অন্যান্য সকল সম্পদের ওপরও যাকাত ফরজ হয়। ইমাম আবু হানিফা শিশু ও পাগলের মালিকানাধীন শস্য ও ফলের ক্ষেত্রে উশর এবং তাদের সম্পদের ওপর যাকাতুল ফিতর ফরজ হওয়ার বিষয়ে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন। যখন তাদের সম্পদের ওপর এগুলোর বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হলো, তখন একইভাবে তাদের অন্যান্য সম্পদের ওপরও যাকাত ফরজ হবে। অর্থাৎ, এই মতের অনুসারীগণ—যারা হচ্ছেন জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ফকীহ এবং যারা শিশু ও পাগলের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার কথা বলেন—তাঁরা ইমাম আবু হানিফার ওই উক্তির ওপর কিয়াস করেন যেখানে তিনি বলেছিলেন: শিশুদের মালিকানাধীন শস্য ও ফল ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদে যাকাত ফরজ নয়। ফলে জমহুর ফকীহগণ বলছেন: আমরা শস্য ও ফলের ওপর কিয়াস করছি; যেহেতু শিশু ও পাগলের শস্য ও ফলের ওপর যাকাত ফরজ, সেহেতু তাদের অবশিষ্ট সম্পদের ওপরও যাকাত ফরজ হবে। এর কারণ হলো, এই সবগুলোই শিশুর মালিকানাধীন সম্পদ।

তাঁরা যাকাত প্রবর্তনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দলিল পেশ করেছেন:

যাকাতের উদ্দেশ্য হলো দাতার সওয়াব লাভ এবং দরিদ্রের সাহায্য। অর্থাৎ এর লক্ষ্য হলো: দরিদ্রকে সহায়তা করা এবং দাতার জন্য সওয়াব হাসিল করা। আর শিশু ও পাগল সওয়াব লাভের যোগ্য এবং তারা অন্যকে সহায়তা করারও যোগ্য। এই কারণেই তাদের ওপর নিকটাত্মীয়দের ভরণপোষণ প্রদান করা ওয়াজিব হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে পিতা মুক্ত হয়ে যায় যখন...

পৃষ্ঠা 6

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

চতুর্থ পাঠ

তারা মালিকানা লাভ করেছে, তাই তাদের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হয়েছে। এটিও এক প্রকার কিয়াস বা অনুমান। অর্থাৎ: যেহেতু তাদের ওপর নিকটাত্মীয়দের ভরণপোষণ ওয়াজিব—আর নিকটাত্মীয়দের ভরণপোষণ প্রদান হলো এক প্রকার সহমর্মিতা—তেমনিভাবে তাদের ওপর জাকাতও ওয়াজিব; কারণ জাকাতও হলো দরিদ্রদের প্রতি এক প্রকার সহমর্মিতা।

তারা আরও বলেছেন: জাকাতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া স্বরূপ এবং সম্পদ পবিত্র করার লক্ষ্যে ধনীদের সম্পদ থেকে দরিদ্রদের অভাব পূরণ করা। আর শিশু ও পাগলের সম্পদ যেহেতু ভরণপোষণ এবং জরিমানা প্রদানের যোগ্য, তাই তা জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো সংকীর্ণতা বা বাধা তৈরি করে না। অর্থাৎ: যতক্ষণ পর্যন্ত জাকাতের উদ্দেশ্য হলো ধনীদের সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবীদের প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো, তবে শিশু হোক বা বড় হোক, এবং পাগল হোক বা সুস্থ হোক—সবাই এতে সমানভাবে অংশীদার। আর এ কারণেই শিশু ও পাগলের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হয়।

প্রথম পক্ষের দলীলসমূহের ওপর জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের খণ্ডন:

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তারা—যারা হলেন জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম এবং যারা শিশু ও পাগলের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা—তারা তাদের দাবির পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যেসব দলীল পেশ করেছেন শুধুমাত্র সেগুলোর ওপরই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তারা সেই সব দলীলও খণ্ডন করেছেন যা প্রথম মতের প্রবক্তারা শিশু ও পাগলের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে পেশ করেছিলেন।

আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে:

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আত-তাওবাহ: ১০৩]। তারা বলেন: পবিত্র হওয়া বিষয়টি কেবল গুনাহ দূর করার সাথে খাস বা নির্দিষ্ট নয়, বরং এতে উন্নত চরিত্র গঠন, আত্মাকে সচ্চরিত্রের ওপর গড়ে তোলা এবং একে অন্যকে সাহায্য ও দয়া করার বিষয়ে অভ্যস্ত করার বিষয়টিও শামিল। ঠিক তেমনি এতে সম্পদ পবিত্র হওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং: এই আয়াতটি সাধারণ। এটি কেবল গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি প্রথম মতের প্রবক্তারা বলেছিলেন। বরং এটি একটি ব্যাপক অর্থ বহন করে, যার মধ্যে সম্পদ পবিত্র করার বিষয়টিও শামিল রয়েছে...

পাপসমূহ; এবং এটি পবিত্রতা অর্জন, অথবা চরিত্রের উন্নয়ন, আত্মাকে সদ্গুণাবলীর ওপর বিকশিত করা এবং তাকে সাহায্য ও দয়ার প্রশিক্ষণ প্রদানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। শিশুর ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি প্রযোজ্য। তাই এই আয়াতটি প্রথম মতের অনুসারীদের দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ বহন করে না, যার মাধ্যমে তারা শিশু ও পাগলের ওপর জাকাত ফরজ না হওয়ার সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন।

হাদিসের প্রেক্ষিতে:

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: "তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে"; তাদের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন: "শিশু যতক্ষণ না সে সাবালক হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।" দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা—যারা ফুকাহায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (জুমহুর)—এর উত্তরে বলেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো: পাপ এবং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা তুলে নেওয়া। আমরা বলি: তাদের ওপর কোনো পাপ নেই এবং তাদের ওপর (ব্যক্তিগতভাবে) জাকাত ফরজ নয়। বরং জাকাত ফরজ হয় তাদের সম্পদের ওপর, আর তাদের অভিভাবককে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঠিক যেমন তাদের সম্পদ থেকে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কোনো বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয় এবং অভিভাবকের ওপর তা প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

এই হাদিসটি—অর্থাৎ: "কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে"—এর প্রেক্ষিতে জুমহুর উলামায়ে কেরাম আরও মনে করেন যে: হাদিসের অর্থ হলো তাদের ওপর কোনো পাপ নেই এবং তাদের কোনো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নেই। আমরা বলি: হ্যাঁ, তবে এই ওয়াজিব হওয়া বা আবশ্যকতাটি মূলত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর আবশ্যকতা যখন সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন শিশু ও অ-শিশু এবং পাগল ও সুস্থ ব্যক্তি—উভয়ই সমান। তারা বিষয়টিকে শিশুর দ্বারা অন্যের সম্পদ নষ্ট করার সাথে তুলনা করেন। যদি কোনো শিশু অন্যের সম্পদ নষ্ট করে, তবে এমতাবস্থায় আমরা বলি: সে দায়ী হবে এবং অভিভাবকের ওপর আবশ্যক হলো শিশুর সম্পদ থেকে সেই বিনষ্ট জিনিসের মূল্য পরিশোধ করা। সুতরাং এখানে আবশ্যকতাটি সম্পদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর জাকাতের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব হওয়া বা আবশ্যকতা এমন একটি বিষয়, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও পাগল—সবাই সমান।

সালাতের সাথে জাকাতের তুলনার প্রেক্ষিতে:

তারা এর উত্তরে একটি সাধারণ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যে, উভয়ই ইবাদত। তারা বলেন: আমরা জাকাত একটি ইবাদত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করি না, তবে এটি তার সামাজিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। সুতরাং এটি একটি আর্থিক ইবাদত, যা পরিচালিত হয়...

এতে প্রতিনিধিত্ব বৈধ, এমনকি তা প্রতিনিধির আদায়ের মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়, যদিও প্রতিনিধি জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক)

হয়—যেমনটি হানাফীগণ বলেছেন—যদিও সে ইবাদত করার যোগ্য নয়; কারণ তারা বলেন: সালাতের ওপর যাকাতকে কিয়াস (তুলনা) করাটা মূলত অসম তুলনা; কেননা সালাত হলো নিছক একটি শারীরিক ইবাদত, যা কেবল মুসলিম এবং স্বয়ং ব্যক্তির পক্ষ থেকেই শুদ্ধ হয়।

কিন্তু যাকাত কেবল শারীরিক ইবাদত হওয়ার পাশাপাশি এটি একটি আর্থিক ইবাদতও বটে, যা ইবাদত ও অর্থ উভয়কে একত্রিত করেছে। এজন্য এটি এর সামাজিক-আর্থিক বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্র। যেমনটি আমরা বলেছি যে এটি এমন একটি আর্থিক ইবাদত যাতে প্রতিনিধিত্ব চলে, কিন্তু সালাতে প্রতিনিধিত্ব চলে না। আর এ কারণেই সালাতের ওপর যাকাতের তুলনা করাটা অসম তুলনা হিসেবে গণ্য হয়েছে, এবং এ কারণে এর মাধ্যমে দলিল পেশ করা সঠিক নয়। যাকাত এদিক দিয়ে সালাত ও সওমের (রোজা) বিপরীত, কারণ এই দুটি কেবল শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত। পক্ষান্তরে যাকাত হলো এমন একটি হক যা মালিকের সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে এটি আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রীদের ভরণপোষণ, অপরাধের ক্ষতিপূরণ এবং ধ্বংসকৃত মালের মূল্যের সদৃশ হয়ে থাকে।

যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য নিয়তের শর্ত সম্পর্কে ইবনে হাযম বলেন: হ্যাঁ, তবে ইমাম ও মুসলিমদের যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন, নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" সুতরাং যাকে যাকাত গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যদি সদাকাহ হওয়ার নিয়তে তা গ্রহণ করেন, তবে তা অনুপস্থিত ব্যক্তি, বেহুঁশ ব্যক্তি, উন্মাদ, শিশু এবং যার কোনো নিয়ত নেই—সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। এ বিষয়ে ইবনে হাযমের 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থের ৫ম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা এবং এর পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

যেন ইবনে হাযম এখানে বলছেন: শিশু এবং উম্মাদ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের নিয়ত করা আবশ্যক নয়; বরং আমরা বলি: ইমাম যখন শিশু বা উন্মাদের কাছ থেকে এই যাকাত গ্রহণ করবেন তখন নিয়ত বিদ্যমান থাকবে। কেননা ইমাম এবং তার প্রতিনিধি মূলত এই যাকাত গ্রহণে আদিষ্ট হয়েছেন মহান আল্লাহর এই বাণীতে: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন।"

১৫৮

চতুর্থ পাঠ
আদ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

শিশু এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্পদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের মতের সমর্থনে আরব দেশগুলোর সামাজিক গবেষণা চক্রের আলেমগণ বলেছেন (তৃতীয় অধিবেশনের গ্রন্থ, দামেস্ক ১৯৫২, পৃ. ২৩৭, আরব লীগ, সাধারণ সচিবালয়, সমাজকল্যাণ বিভাগ, মিসর প্রেস, ১৯৫৫ খ্রি., শেখ আবদুর রহমান হাসান, শেখ মুহাম্মদ আবু জাহরা এবং শেখ আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফের "জাকাত ও ওয়াকফ" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ): জাকাত হলো সম্পদের হক। এটি একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতা যার কারণ হলো সম্পদের মালিকানা। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটি প্রতিটি সামাজিক বাধ্যবাধকতার মতোই, যেমনটি আমরা আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। কেননা উপার্জন করতে অক্ষম অভাবী নিকটাত্মীয়ের জন্য মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তি) এবং অ-মুকাল্লাফ উভয়ের সম্পদের ওপরই ভরণপোষণ ওয়াজিব হয়। যেহেতু এটি মালের হক, তাই মালিক যে-ই হোক না কেন তা সেখান থেকে গ্রহণ করা হবে; যেমনটি ইসলামের আর্থিক দণ্ডবিধি এবং বিনষ্ট জিনিসের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই সবই মুকাল্লাফ ও অ-মুকাল্লাফ উভয়ের সম্পদ থেকে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা যে 'আরব রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক গবেষণা চক্রের' প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তা দ্রষ্টব্য।

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির (মাজমা আল-বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ) ১৯৬৫ সালের দ্বিতীয় সম্মেলনে (পৃষ্ঠা: ৪০২, ৪০৩) সুপারিশ করা হয়েছে যে, মুকাল্লাফ ব্যক্তির নিজের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পাশাপাশি অ-মুকাল্লাফ ব্যক্তির সম্পদেও জাকাত

ওয়াজিব। আর উক্ত সম্পদের ওপর যার অভিভাবকত্ব রয়েছে, তিনি সেই সম্পদ থেকে তা আদায় করবেন।

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত (তারজীহ):

উভয় পক্ষের বর্ণিত দলিলসমূহ, নির্দিষ্ট কিছু দলিলের ওপর পর্যালোচনা এবং সামাজিক গবেষণা চক্রের আলেমগণ ও ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির পক্ষ থেকে আমরা যা উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে: জমহুর বা অধিকাংশ ফকীহগণ শিশু ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সকল প্রকার সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে মত পোষণ করেছেন, সেটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত (রাজিহ)। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:
তাদের দলিলের সক্ষমতা বা দৃঢ়তা এবং পূর্বে বর্ণিত অন্য পক্ষের দলিলগুলোর অসারতা প্রমাণ করা।

শরয়ি রাজনীতি — চতুর্থ পাঠ

জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফের সক্ষমতা সে শিশু হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক, পাগল হোক বা সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী—তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। জ্ঞান বা প্রাপ্তবয়স্কতার অভাব মুকাল্লাফের জাকাত প্রদানের সামর্থ্য এবং তার আর্থিক অবস্থাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না। শিশু এবং পাগলের সম্পদের ওপর থেকে জাকাত বাদ দেওয়া জাকাতের ক্ষেত্রে ‘ব্যক্তিগত ব্যাপকতা’র মূলনীতির একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন। শিশু ও পাগলকে জাকাতের আওতাভুক্ত না করা মুসলমানদের মাঝে সাধারণ আর্থিক দায়িত্ব ও খরচ বহনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে; আর এই আর্থিক দায়বদ্ধতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জাকাত, যা ইসলামি শরিয়ত মুসলমানদের ওপর নির্ধারণ করেছে।

আরও কথা হলো: শিশু এবং পাগল রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত সাধারণ জনকল্যাণমূলক সুবিধাসমূহ ভোগ করে থাকে। তারা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের মতোই যাতায়াত, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি জনসেবামূলক খাতসমূহ ব্যবহার ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়, ঠিক সেই সব নাগরিকদের মতো যারা তাদের সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করতে বাধ্য।

অনুরূপভাবে, তারা রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের জন্য বরাদ্দকৃত নিরাপত্তাও ভোগ করে, চাই তা কোনো বাহ্যিক আক্রমণ থেকে সুরক্ষা হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ; যাতে তারা তাদের বসবাসের স্থানে নিরাপদ থাকতে পারে। অথবা চোর ও ডাকাতদের হাত থেকে তাদের সম্পদের সুরক্ষা। ‘আল-গুনমু বিল গুরমি’ (লাভ দায়বদ্ধতার অনুগামী) নীতি অনুযায়ী ইনসাফের দাবি হলো—শিশু এবং পাগল উভয়ই অন্যান্য নাগরিকদের মতো তাদের সম্পদ থেকে জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হবে। এর মাধ্যমেই সাধারণ আর্থিক বোঝা বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে প্রধানতম হলো ইসলামি রাষ্ট্রে নির্ধারিত জাকাত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে: জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ স্বাভাবিক ব্যক্তিগণ হলেন—সেই সমস্ত মুসলিম যারা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পূরণ করে এমন সম্পদের মালিক। এক্ষেত্রে ব্যক্তির লিঙ্গ, বর্ণ, বংশ বা সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করা হবে না। ফলে পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, সুস্থ মস্তিস্ক ও পাগল, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ এবং শাসক ও শাসিত—সকলেই জাকাত প্রদানের বিধানের সামনে সমান, তারা যেখানেই বসবাস করুক না কেন।

পৃষ্ঠা 11

চতুর্থ পাঠ

একজন মুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, চাই তার বসবাসের স্থান যেখানেই হোক না কেন, এমনকি যদি সে কোনো অমুসলিম দেশে বসবাসকারী হয়। এই অবস্থায় তার ওপর আবশ্যক হলো তার ওপর পাওনা যাকাত তার মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠানো। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে সেটি তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে যতক্ষণ না সে তার মুসলিম দেশে ফিরে আসে। এর মাধ্যমেই যাকাতের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে পূর্ণ সমতা অর্জিত হয়।

যাকাতের ক্ষেত্রে আইনি সত্তা

যাকাত প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রকার হিসেবে ‘আইনি সত্তা’র (Legal Person) অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার জন্য গবাদি পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে ‘খুলতাহ’ বা সংমিশ্রণের প্রভাব সম্পর্কে ফকীহগণের অবস্থান অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তবে প্রারম্ভে এটি উল্লেখ করা উপকারী হবে যে, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ‘খুলতাহ’ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: অংশীদারিত্বমূলক সংমিশ্রণ (খুলতাহ ইশতিরাক), যা কখনো কখনো ‘খুলতাহ আল-আ’ইয়ান’ এবং ‘খুলতাহ আশ-শুয়ূ’ নামেও ব্যক্ত করা হয়। এর অর্থ হলো: কোনো একজন বা একাধিক মালিকের অংশ অন্যের অংশ থেকে পৃথক না হওয়া; যেমন একদল লোক উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো গবাদি পশুর মালিক হলো অথবা তা ক্রয় করলো, ফলে সেগুলো তাদের মাঝে অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। তারা এতে অংশীদার এবং তাদের মধ্যে কারো জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা আলাদা থাকে না।

দ্বিতীয় প্রকার: গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ‘খুলতাহ’ এর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো প্রতিবেশীমূলক সংমিশ্রণ (খুলতাহ জাওয়ার)—যা ‘জাওয়ার’ (প্রতিবেশ) শব্দ থেকে এসেছে। একে কখনো ‘খুলতাহ আল-আওসাফ’ নামেও ব্যক্ত করা হয়। এর অর্থ হলো: মালিকদের প্রত্যেকের সম্পদ অন্যের সম্পদ থেকে নির্ধারিত ও স্বতন্ত্র হওয়া; যেমন একজন মালিকের নির্দিষ্ট ষাটটি ভেড়া থাকা এবং অন্যজনেরও সমপরিমাণ বা তার কম-বেশি নির্দিষ্ট ভেড়া থাকা, কিন্তু সেগুলো সব একত্রে পাশাপাশি একটি সম্পদের মতো মিশ্রিত থাকা। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবন সালাম রচিত ‘আল-আমওয়াল’ গ্রন্থ (১৯৭৫ সালের তাহকীককৃত সংস্করণ, দারুল ফিকর আল-আরাবী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৪৯১ ও পরবর্তী) এবং ডক্টর ইউসুফ আল-কারযাভী রচিত ‘ফিকহুয যাকাত’ (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭ ও পরবর্তী) দেখা যেতে পারে।

পৃষ্ঠা 12

চতুর্থ পাঠ

এর পরবর্তীতে এবং অনুরূপভাবে ইমাম নববী রহ.-এর 'আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব'-এর পঞ্চম খণ্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা এবং এর পরবর্তী অংশগুলোতে উল্লেখ রয়েছে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, যাকাতের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার জন্য 'খুলতাহ' (সম্পদ মিশ্রণ)-এর কিছু শর্ত থাকা আবশ্যক। এই শর্তগুলোর মধ্যে কিছু উভয় প্রকার খুলতাহ- অর্থাৎ 'খুলতাহ আল-ইশতিরাক' (অংশীদারিত্বমূলক মিশ্রণ) এবং 'খুলতাহ আল-জিওয়ার' (প্রতিবেশীমূলক মিশ্রণ) উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আর কিছু শর্ত শুধুমাত্র 'খুলতাহ আল-জিওয়ার'-এর সাথে নির্দিষ্ট।

উভয় প্রকার মিশ্রণের সাধারণ শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১. মিশ্রণকারী বা অংশীদারদের যাকাত প্রদানের যোগ্য হতে হবে; অর্থাৎ যাদের ওপর যাকাত ফরজ হয়।
২. মিশ্রিত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে।
৩. মিশ্রণটি পূর্ণ এক বছর স্থায়ী হতে হবে। অর্থাৎ যাকাতের ক্ষেত্রে খুলতাহর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই এই শর্তগুলো থাকা আবশ্যক।

আর 'খুলতাহ আল-জিওয়ার'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. 'মারাহ' (রাত্রিযাপনের স্থান) এক হওয়া। অর্থাৎ যে স্থানে গবাদি পশুরা যেমন- ভেড়া বা গরু রাত কাটায় সেই স্থানটি এক হতে হবে। এর অর্থ হলো, এর এবং ওর পশুরা একই স্থানে রাত কাটাবে।
২. পানি পান করার স্থান এক হওয়া, অর্থাৎ গবাদি পশুদের একই উৎস থেকে পানি পান করাতে হবে। তদ্রূপ 'মাসরাহ' (একত্রিত হওয়ার স্থান) এক হওয়া, অর্থাৎ যেখানে পশুদের একত্রিত করা হয় এবং এরপর চারণভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া চারণভূমিও এক হওয়া, অর্থাৎ যে চারণভূমিতে তারা ঘাস খায়।

যাকাতের ক্ষেত্রে এই মিশ্রণের প্রভাব আছে কি নেই তা নিয়ে আলোচনার জন্য এই শর্তগুলোর উপস্থিতি আবশ্যক। যদি এই শর্তগুলো না পাওয়া যায় অথবা এর কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা 'খুলতাহ' বা এর কোনো বিধানের আওতাভুক্ত থাকব না।

মতভেদপূর্ণ শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:

রাখালের অভিন্নতা; অর্থাৎ: তাদের কারো জন্য রাখাল নির্দিষ্ট না থাকা। এর অর্থ হলো: রাখাল হবে একজনই, যে এর ভেড়াগুলোও চরাবে এবং ওর ভেড়াগুলোও চরাবে।
অনুরূপভাবে: প্রজননক্ষম পুরুষ পশুর অভিন্নতা; অর্থাৎ: পুরুষ পশুগুলো তাদের উভয় পালের পশুর মধ্যে বিচরণ করবে, তাদের কারো পাল কোনো নির্দিষ্ট পুরুষ পশুর জন্য নির্ধারিত হবে না।
আরও: পশুর দুধ দোহনের স্থানের অভিন্নতা; এটি পশুর বিশ্রামস্থলের অভিন্নতার মতোই একটি শর্ত।
আরও: দোহনকারীর অভিন্নতা; আর তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পশু দোহন করেন। অর্থাৎ: তাদের কেউ এমন দোহনকারীর সাথে পৃথক হয়ে যাবে না যে অন্যের পশু দোহন করতে বাধা দেয়।

আরও: যে পাত্রে দোহন করা হয় তার অভিন্নতা; অর্থাৎ: দোহনপাত্রগুলো তাদের মাঝে সর্বজনীন হবে। তাদের কেউ নির্দিষ্ট কোনো পাত্র বা পাত্রসমূহের অধিকারী হবে না যা অন্যের ব্যবহারে বাধা প্রদান করে।
অতঃপর অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারিত্বের (খুলতাহ) নিয়ত বিদ্যমান থাকা।

অতএব: কিছু শর্ত আছে যা সর্বসম্মত, আর কিছু শর্ত আছে যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ: কেউ কেউ এগুলোকে শর্ত বলেছেন বা এগুলোকে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন, আবার কেউ কেউ এগুলো আবশ্যক না হওয়ার কথা বলেছেন।

যাকাতের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের প্রভাব নিয়ে ফকীহগণের অবস্থান:

আমরা যদি এর একটি উদাহরণ দিই: ধরা যাক, একজনের কাছে বিশটি ভেড়া আছে এবং অন্য একজনের কাছেও বিশটি ভেড়া আছে। অতঃপর তাদের মাঝে—উদাহরণস্বরূপ—প্রতিবেশীসুলভ অংশীদারিত্ব তৈরি হলো এবং তাদের রাখালও ছিল একজন। এমতাবস্থায় তাদের মোট ভেড়ার সংখ্যা হলো: চল্লিশটি। আমরা জানি যে, ভেড়ার যাকাতের নিসাব চল্লিশ থেকে শুরু হয়। এমতাবস্থায় এই ভেড়াগুলোর ওপর কি যাকাত ওয়াজিব হবে? এই বিবেচনায় যে, আমরা একজনের অংশ অন্যজনের সাথে যুক্ত করেছি এবং ফলস্বরূপ আমরা সম্পূর্ণ সম্পদের দিকে অথবা অংশীদারিত্বের দিকে লক্ষ্য করেছি...

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ

সমষ্টির ক্ষেত্রে? এমতাবস্থায় আমরা কি বলব: জাকাত ওয়াজিব; নাকি আমরা সেদিকে তাকাব না? এবং প্রত্যেক মালিক নিজের মালিকানাধীন সম্পদের ওপর পৃথকভাবে বহাল থাকবে, ফলে জাকাত ওয়াজিব হবে না?

যদি আমরা সংমিশ্রণ (খলতা) ছাড়াই তাদের উভয়ের দিকে লক্ষ্য করি, তবে বিশটি (ছাগল বা ভেড়া) এর মালিকের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না এবং অন্যজনের ওপরও জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেন? কারণ তাদের কেউ-ই নেসাব পর্যন্ত পৌঁছেনি; কেননা বকরির নেসাব—যাতে জাকাত ওয়াজিব হয়—তা হলো চল্লিশটি বা তার বেশি হওয়া। অথচ তারা প্রত্যেকে আলাদাভাবে এই নেসাবে পৌঁছেনি।

সুতরাং আমরা যদি বলি: সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে, তবে এমতাবস্থায় তাদের ওপর জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হবে; কারণ আমরা এক বিশের সাথে অন্য বিশকে যুক্ত করব, যার ফলে আমাদের নিকট নেসাব পূর্ণ হবে এবং তখন জাকাত ওয়াজিব হবে।

এর ওপর ভিত্তি করে, যারা বলেন যে জাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে, তারা বলেন: এই দুই মালিকের ওপর জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব; কেননা তাদের উভয়ের সম্পদ একত্রিত হওয়ার ফলে নেসাব পাওয়া গেছে।

পক্ষান্তরে যারা বলেন যে: জাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই, তারা বলেন যে: তাদের কারো ওপরই জাকাত নেই; কারণ তাদের প্রত্যেকের সম্পদ আলাদাভাবে জাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌঁছেনি।

চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এটি একটি সাধারণ ধারণা; কারণ কোনো বিষয়ের ওপর হুকুম প্রদান করা ওই বিষয়টি উপলব্ধিরই একটি অংশ। আর এই উদাহরণটি হচ্ছে বিষয়টি চিত্রায়িত করার সমতুল্য।

জাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব সম্পর্কে ফকিহগণের অবস্থান:

প্রথমত: সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে ফকিহগণের অবস্থান:
ফকিহগণ এই মাসআলায় দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: জাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে। এর অর্থ হলো: এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্পদকে জাকাতের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সম্পদের মতো গণ্য করে। আর এটিই জমহুর বা সংখ্যাগুরু উলামাদের মাজহাব: মালিক, শাফেয়ি এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ

জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতানুসারে: যদি কোনো ব্যক্তির নিকট বিশটি ছাগল থাকে এবং অন্য ব্যক্তির নিকট বিশটি ছাগল থাকে এবং তাদের মধ্যে—আমাদের বর্ণিত শর্তানুসারে—মিশ্রণ ঘটে, তবে এই অবস্থায় তাদের উভয়কে জাকাত প্রদান করতে হবে; কারণ মিশ্রণের প্রভাব রয়েছে। আর মিশ্রণের ফলে দুই ব্যক্তির সম্পদ জাকাতের নিসাবে পৌঁছেছে, যা হলো চল্লিশটি ছাগল। এর ফলে এই নিসাব থেকে জাকাত বের করা হবে। এর অর্থ হলো: তাদের প্রত্যেকের ওপর অর্ধেক ছাগলের দায়ভার বর্তাবে। এটিই হলো জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রভাব।

দ্বিতীয় মত: এটি হানাফীদের মত। তারা বলেন যে, জাকাতের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই মিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই—অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে—নির্ধারিত জাকাতের পরিমাণের ক্ষেত্রেও নয় এবং নিসাবের ক্ষেত্রেও নয়। অংশীদারদের প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পদ নিসাব পরিমাণ হোক বা নিসাবের কম হোক এবং তাদের উভয়ের মোট সম্পদ নিসাবের চেয়ে বেশি হলেও (তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না)। সুতরাং যদি তাদের প্রত্যেকের সম্পদ নিসাবের কম হয়, তবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না; যদিও তাদের উভয়ের মোট সম্পদের পরিমাণ নিসাবের বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুই অংশীদারের সম্পদের পরিমাণ ষাটটি ছাগল হয় এবং তাদের প্রত্যেকের ত্রিশটি করে থাকে, তবে তাদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ প্রত্যেকের মালিকানা নিসাবের নিচে। এটি ঠিক তেমনই যেন সে অন্য কারো সাথে তার সম্পদ মিশ্রিত করেনি।

এ বিষয়ের সারকথা হলো: কোনোভাবেই মিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই, জাকাতের পরিমাণের ক্ষেত্রেও নয় এবং নিসাবের ক্ষেত্রেও নয়। এর অর্থ হলো: যদি আমরা ধরি যে, দুইজন ব্যক্তির প্রত্যেকের নিকট বিশটি করে ছাগল রয়েছে এবং তাদের মধ্যে শর্তানুসারে মিশ্রণ ঘটেছে, তবে হানাফীদের মতানুসারে: এই সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হবে না—যদিও উভয় সম্পদের সমষ্টি নিসাবে পৌঁছেছে, যা হলো: চল্লিশটি ছাগল। আর ছাগলের নিসাব—যেমন আমরা বলেছি—চল্লিশ থেকে শুরু হয়। হানাফীদের মতানুসারে তারা বলেন, এই সম্পদে কোনো জাকাত নেই; কারণ তাদের প্রত্যেকের সম্পদ এককভাবে নিসাবে পৌঁছেনি। এটি জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, এই সম্পদে জাকাত ওয়াজিব। কারণ তারা জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রভাবকে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে হানাফীরা বলেন যে, এই সম্পদে কোনো জাকাত নেই। কারণ তারা জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রভাবকে স্বীকার করেন না।

চতুর্থ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ

সংমিশ্রণের (খালতাহ) প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের অবস্থান এটিই।

অতএব: হানাফী জামাত—যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন—তারা নিসাব বা অন্য কোনো পরিমাণের ব্যাপারে এরপর আর আলোচনা করেন না। তারা বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নাকচ করেছেন এবং এখানেই আলোচনার সমাপ্তি। তারা বলেছেন: এই সংমিশ্রণের দিকে মোটেও লক্ষ্য করা হবে না, বরং প্রত্যেকের মালের দিকে পৃথকভাবে লক্ষ্য করা হবে।

সাধারণভাবে সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে এটিই তাদের অবস্থান।

হানাফীগণ বলেন: আর যদি দুই নিসাবের মাঝে সংমিশ্রণ ঘটে, এভাবে যে প্রত্যেকের মালিকানায় একটি করে নিসাব থাকে, তবে সেক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন—দুই অংশীদারের মোট মালের পরিমাণ যদি আশি হয় এবং প্রত্যেকের নিকট চল্লিশটি করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে একটি বকরি ওয়াজিব হবে; কারণ প্রতি চল্লিশটি বকরিতে একটি বকরি যাকাত দিতে হয়।

জুমহুর ফকীহগণ তাদের দাবির সপক্ষে দলিল পেশ করেছেন যে, যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে। এই মতের প্রবক্তারা এ বিষয়ে বর্ণিত দলিলসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন, যা যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী অন্যতম: **“যাকাত (বেশি প্রদান) থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে পৃথক মালকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিত মালকে পৃথক করা যাবে না। আর যে মাল দুই অংশীদারের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, তারা সমহারে তা একে অপরের সাথে সমন্বয় করে নেবে।”** সুতরাং এই হাদিসটি স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, দুই অংশীদারের মালিকানা একজন ব্যক্তির মালিকানার ন্যায়। আর এই হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর জন্য সুনির্দিষ্টকারী দলিল: **“পাঁচটি উটের কম পরিমাণে কোনো যাকাত নেই।”**

এর ওপর ভিত্তি করে আমাদের পূর্বোল্লিখিত উদাহরণে: যদি প্রত্যেকের বিশটি করে বকরি থাকে এবং তাদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে, তবে জুমহুর ফকীহগণের মতানুসারে তাদের ওপর একটি বকরি প্রদান করা আবশ্যক হবে। কারণ দুটি মাল একত্রিত হওয়ার ফলে নিসাব পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যখন তারা একটি বকরি প্রদান করবে, তখন প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর সাথে হিসেব সমন্বয় করবে; এমতাবস্থায় আমরা যেমনটি উল্লেখ করেছি, তাদের প্রত্যেকেই অর্ধেক বকরির দায়িত্ব বহন করবে।

দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা—যারা হানাফী—প্রথম মতের অনুসারীদের (জুমহুর) পেশকৃত দলিলের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। তারা বলেছেন: দুইজন অংশীদারকেও ‘সংমিশ্রণকারী’ বলা হতে পারে,

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এই বাণী: "পৃথক থাকা বস্তুকে একত্রে জড়ো করা যাবে না এবং একত্রে থাকা বস্তুকে পৃথক করা যাবে না" - এর দ্বারা এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি মূলত জাকাত সংগ্রাহকদের জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা। যাতে তারা একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদকে এমনভাবে বণ্টন না করে যা তার ওপর অতিরিক্ত সদকা (জাকাত) প্রদানকে আবশ্যক করে তোলে। যেমন: কোনো ব্যক্তির ১২০টি বকরি রয়েছে, এখন তারা সেটিকে তিনভাগে ৪০টি করে ভাগ করল, অথবা একজনের মালিকানাধীন সম্পদকে অন্য একজনের সম্পদের সাথে এমনভাবে একত্র করে দিল যেখানে একত্রীকরণের ফলে জাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তারা বলেন: যদি এই হাদিসের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাটি সাব্যস্ত হয়, তবে এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এই হাদিসকে—"পাঁচটি উটের কম হলে তাতে সদকা নেই"—নির্দিষ্ট করা আবশ্যক হবে না। এর অর্থ হলো: তারা মনে করেন যে, পৃথক বস্তুকে একত্র করা এবং একত্রিত বস্তুকে পৃথক করা কেবল মালিকানার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ, এতে সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো দলিল নেই।

আবার দলিলের ওপর তাদের আপত্তির ক্ষেত্রে তারা বলেন: এটিও সম্ভব যে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর বাণী: "পৃথক থাকা বস্তুকে একত্রে জড়ো করা যাবে না এবং একত্রে থাকা বস্তুকে পৃথক করা যাবে না" - মূলত জাকাত সংগ্রাহকদের প্রতি একটি নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ, সম্ভাবনা আছে যে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে জাকাত সংগ্রাহকদের উদ্দেশ্য করেছেন এবং এই হাদিসটি তাদের প্রতি নির্দেশিত। আমাদের উদ্দেশ্য হলো: সেই জাকাত কর্মীবৃন্দ যারা মানুষের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করতেন। যেন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের বলছেন: তোমরা পৃথক থাকাকে একত্র করো না এবং একত্র থাকাকে পৃথক করো না; যাতে তোমরা এই সম্পদের মালিকদের ক্ষতিগ্রস্ত না করো।

অতএব, হাদিসটি কেবল মালিকদের সাথে নির্দিষ্ট নয়, তাই জাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে এটি কোনো দলিল হতে পারে না।

যেন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের বলছেন: তোমরা এমনটি করো না; বরং একশ বিশটি বকরির বিপরীতে একটি বকরি গ্রহণ করো। তোমরা এই সম্পদকে পৃথক করো না; একে চল্লিশ, চল্লিশ এবং চল্লিশে বিভক্ত করো না। কারণ তারা যদি একে চল্লিশ, চল্লিশ এবং চল্লিশ হিসেবে বিন্যস্ত করে, তবে তারা একটি বকরির পরিবর্তে তিনটি বকরি গ্রহণ করবে। সুতরাং এটি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে সেইসব কর্মী বা জাকাত সংগ্রাহকদের প্রতি একটি নিষেধ, যাতে তারা একত্রিত কোনো কিছুকে পৃথক না করে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে একশ বিশটির মধ্যে থাকা কোনো বস্তুকে পৃথক করা; এটি সঠিক নয় যে তারা সেটিকে বা...

তারা সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে দেবে, যাতে করে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় তিনটি ছাগল যা ঐ ব্যক্তি প্রদান করবে, একটি ছাগলের পরিবর্তে।

উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তির একশত বিশটি ছাগল আছে, অতঃপর তারা সেগুলোকে তার জন্য তিনবার চল্লিশটি করে ভাগ করে দিল। অথবা এক ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদ অন্য ব্যক্তির সম্পদের সাথে একত্রিত করা হলো, যেখানে একত্রিত করার ফলে সদকার (যাকাতের) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এটি যাকাত সংগ্রহকারীদের জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা; তাদের জন্য এটি বলা বৈধ নয় যে: অমুক ব্যক্তি যে অমুকের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করে, তার বিশটি উট আছে এবং তার অন্য প্রতিবেশীরও বিশটি উট আছে, সুতরাং আমরা এই দুইটিকে একত্রিত করে ফেলি এবং সেগুলোকে চল্লিশটি বানিয়ে দিই। এর ফলে আমরা এই চল্লিশটি থেকে যাকাত গ্রহণ করতে পারব; কারণ একত্রিত করার মাধ্যমেই নিসাব পূর্ণ হয়েছে এবং ফলস্বরূপ আমরা যাকাত গ্রহণ করছি।

যাকাত সংগ্রহকারীদের জন্য এটি করা নিষিদ্ধ।

বিদ্বানগণ বলেন: এটিই হলো হাদীসের মর্মার্থ— "ভিন্ন ভিন্ন সম্পদকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিত সম্পদকে পৃথক করা যাবে না সদকার ভয়ে।" অর্থাৎ যাকাতের আধিক্যের আশঙ্কায়; যেন যাকাত সংগ্রহকারীরা যে কোনো উপায়ে মানুষের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করতে চায়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

সুতরাং, বিষয়টি যখন এই রূপ, তখন হাদীসটি দ্বারা যাকাত সংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং এটি তাদের প্রতিই নির্দেশিত। ফলস্বরূপ এটি সম্পদ মালিকদের প্রতি নির্দেশিত নয় এবং যাকাতের ক্ষেত্রে 'খুলতাহ' বা সংমিশ্রণের প্রভাবের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এই উত্তরটি হানাফী মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে এসেছে। এইজন্য তারা বলেন: যদি হাদীসে এই সম্ভাবনার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তবে তার ওপর আমল করা হবে না। কারণ একটি মূলনীতি রয়েছে যা বলে: "দলীলের মাঝে যখন একাধিক সম্ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন তা দ্বারা দলিল পেশ করা বাতিল হয়ে যায়।" এই কারণে তারা বলেন: যতক্ষণ হাদীসে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীসটিকে খাস (সুনির্দিষ্ট) করা আবশ্যক হবে না যে— "পাঁচটির কম উটের ক্ষেত্রে কোনো সদকা (যাকাত) নেই।"

এর অর্থ হলো তারা মনে করেন: পৃথক সম্পদকে একত্রিত করা এবং একত্রিত সম্পদকে পৃথক করা কেবল মালিকানার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। সুতরাং এতে সংমিশ্রণের (খুলতাহ) প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার কোনো দলিল নেই। এই বিষয়ে ইবনে রুশদ রচিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

১৬৮

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

চতুর্থ পাঠ

প্রথম মতের অনুসারীগণ এই আপত্তি বা হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সেই বিতর্কের উত্তরে বলেছেন যে: 'খুলতাহ' (মিশ্রণ) শব্দটি অংশীদারিত্বের (শিরকাহ) তুলনায় খোদ মিশ্রণের ক্ষেত্রেই বেশি স্পষ্ট। আর বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: "কেননা তারা সমতার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে হিসাব সমন্বয় করে নিবে" একথাই প্রমাণ করে যে, তাদের উভয়ের ওপর ওয়াজিব হকের বিধান একজন ব্যক্তির বিধানের অনুরূপ। এটি আরও প্রমাণ করে যে, দুই মিশ্রণকারী মূলত অংশীদার নয়; কারণ অংশীদারদের মধ্যে হিসাব সমন্বয়ের (তারাজু') বিষয়টি কল্পনা করা যায় না, যেহেতু যা গ্রহণ করা হয় তা যৌথ কারবারের সম্পদ থেকেই নেওয়া হয়। কারণ যৌথ কারবারকে একটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় যার অংশীদারদের থেকে আলাদা আর্থিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ হয়, ফলে একজন অংশীদারের পক্ষে অন্য অংশীদারদের নিকট কোনো কিছুর জন্য পুনরায় ফিরে যাওয়ার (দাবি করার) অবকাশ থাকে না।

হাদীসের এই ব্যাখ্যাটিই অনেক আলেম গ্রহণ করেছেন এবং আবু উবাইদও এটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন: এ বিষয়ে আমার নিকট সঠিক দিক হলো তা-ই যার ওপর ঐসব ব্যক্তিগণ একমত হয়েছেন যারা মনে করেন যে, হাদীসটি মালিক এবং জাকাত সংগ্রহকারী—উভয়ের জন্যই একযোগে একটি নিষেধাজ্ঞা। কারণ জাকাত সংগ্রহকারীর পক্ষ থেকে মালিকের ওপর অন্যায় বা সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে, ঠিক যেমন মালিকের পক্ষ থেকে জাকাত থেকে পলায়ন করার আশঙ্কা থাকে।

এখানে 'মুসাদ্দিক' বলতে উদ্দেশ্য হলো: জাকাত কর্মকর্তা বা যিনি জাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন। যেহেতু সম্পদের মালিকের পক্ষ থেকে জাকাত ফাঁকি দেওয়ার বা পলায়নের সম্ভাবনা থাকে, তাই নবী ﷺ তাদের উভয়কেই (মালিক ও সংগ্রাহক)

এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

অতঃপর আবু উবাইদ বলেন: এটি সুওয়াইদ বিন গাফালাহ থেকে বর্ণিত সেই হাদীসে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যখন তিনি নবী ﷺ-এর জাকাত সংগ্রহকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রদত্ত নির্দেশে রয়েছে যে, আমি যেন দুটি একত্রিত সম্পদকে পৃথক না করি এবং দুটি পৃথক সম্পদকে একত্রিত না করি।" এটি আপনার নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞাটি জাকাত সংগ্রহকারীর প্রতি।

এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: "(জাকাতের ভয়ে) সতর্ক থাকো" অর্থাৎ: জাকাতের আশঙ্কায়; যেমনটি বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, যা আপনার নিকট স্পষ্ট করে যে নিষেধাজ্ঞাটি সম্পদের মালিকদের প্রতি।

সুতরাং: এটিও হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের একটি ধরন। এখানে কি কেবল জাকাত সংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্য করে নিষেধ করা হয়েছে এবং মালিকদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই? নাকি কেবল মালিকদের উদ্দেশ্য করে নিষেধ করা হয়েছে এবং জাকাত সংগ্রহকারীদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই? যদি আমরা বলি যে এটি একটি নিষেধাজ্ঞা...

১৬৯

চতুর্থ পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

যদি এটি শুধুমাত্র সংগ্রাহকদের জন্য হয়, তবে হানাফিদের মত অনুযায়ী এটি প্রমাণ করে যে, যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই। আর যদি আমরা বলি যে এটি মালিকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবে তা প্রমাণ করে যে যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে, যেমনটি জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম (অধিকাংশ ফকিহ) মনে করেন।

তবে এমনও কেউ আছেন যারা উভয় মতকে একত্রিত করেছেন এবং বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "পৃথক বিষয়কে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিত বিষয়কে পৃথক করা যাবে না" - এটি সংগ্রাহকদের উদ্দেশ্যে হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি মালিকদের উদ্দেশ্যে হওয়াও সম্ভব।

সংগ্রাহকদের উদ্দেশ্যে হওয়ার অর্থ হলো যাতে তারা যা পাওনা তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করতে না চায়। আর মালিকদের উদ্দেশ্যে হওয়ার অর্থ হলো যাতে তারা যাকাত থেকে পলায়ন করার জন্য সম্পদ একত্রিত না করে, অথবা যাকাত মওকুফ করার জন্য বা যাকাতের পরিমাণ কমানোর জন্য সম্পদ পৃথক না করে। ইমাম আবু উবাইদ তাঁর 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৬) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীসটি সম্পদের মালিকদের উদ্দেশ্যে হওয়া যেমন সঠিক, তেমনি সংগ্রাহকদের অর্থাৎ যারা যাকাত সংগ্রহের কাজ করেন তাদের উদ্দেশ্যে হওয়াও সঠিক।"

ফলস্বরূপ, আবু উবাইদ কর্তৃক পছন্দকৃত এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাদীসটি জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর তা হলো: যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব রয়েছে; অর্থাৎ এটি যাকাতের ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির সম্পদকে এক ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় গণ্য করে—যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি।

এই সবকিছুর সারকথা হলো, জুমহুর উলামায়ে কেরাম মনে করেন যে, এই হাদীসটি মালিক এবং সংগ্রাহক উভয়কেই এই সব কাজ থেকে নিষেধ করার অর্থ প্রদান করে। একইভাবে তারা মনে করেন যে, এটি সংমিশ্রণ এবং মালিকানা উভয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়; শুধুমাত্র মালিকানার ওপর নয়, যেমনটি দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা মনে করেন। সুতরাং এর মাধ্যমে তিনি সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন।

আমরা জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছি যে, যাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের সম্পদ মিশ্রিত করবে, তখন তারা যাকাতের জন্য তাদের সম্পদকে একত্রিত করবে এবং তারা যাকাত প্রদান করবে।

...এক ব্যক্তি হিসেবে। আর এটি জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেমদের নিকট তাদের গৃহীত মতের সপক্ষে দলীল শক্তিশালী হওয়ার কারণে এবং তাদের বিরোধী মতের দলীলসমূহ খণ্ডন করার কারণে। যখন এটি সাব্যস্ত হলো যে, যাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের (খলতাহ) প্রভাব রয়েছে—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে জমহুর ফকীহগণ এমনটিই মনে করেন—তবে কোন ধরনের মিশ্রণের ক্ষেত্রে এই প্রভাব সাব্যস্ত হবে? আমরা নিম্নে এর উত্তর প্রদান করছি:

দ্বিতীয়ত: যে সকল মিশ্রণের প্রভাব রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ফকীহগণের অবস্থান:

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মিশ্রণ (খলতাহ) দুই প্রকার: অংশীদারিত্বের মিশ্রণ এবং প্রতিবেশিত্বের মিশ্রণ। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, জমহুর ফকীহগণ মনে করেন যে যাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রভাব রয়েছে, অর্থাৎ: দুই ব্যক্তির সম্পদকে এক ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় গণ্য করা। এর অর্থ হলো: তারা যাকাতের ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ একত্রিত করবে এবং এক ব্যক্তির সম্পদের যাকাতের ন্যায় যাকাত প্রদান করবে, যেমনটি আমরা দেখেছি। যে সকল ফকীহগণ এই মত পোষণ করেন, তারা উভয় প্রকার মিশ্রণের ক্ষেত্রেই এই প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পোষণ করেন না, চাই তা সত্তাগত মিশ্রণ (খলতাহ আ'ইয়ান) হোক কিংবা গুণগত মিশ্রণ (খলতাহ আওসাফ) হোক। বরং আমরা দেখতে পাই যে, শায়খ আবু হামিদ আল-ইসফরাইয়িনি তার তালীক গ্রন্থে মুসলিমদের ইজমা (ঐক্যমত) নকল করেছেন যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার মিশ্রণের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেছেন যে, প্রত্যেক অংশীদারের সম্পদ পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ বা তার বেশি হতে হবে। পক্ষান্তরে অপর অংশ—যারা মিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার প্রবক্তা জমহুর আলেম—তারা এমন শর্তারোপ করেননি। সুতরাং মিশ্রণের প্রভাব কার্যকর হবে, চাই তা সত্তাগত মিশ্রণ হোক কিংবা গুণগত মিশ্রণ হোক, এবং চাই প্রত্যেক অংশীদার নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হোক বা না হোক। এই বিষয়ে তারা সাধারণ হাদীসসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন; কেননা হাদীসসমূহ দুই প্রকার মিশ্রণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি এবং প্রত্যেক অংশীদারের সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া বা না হওয়ার মধ্যেও কোনো পার্থক্য করেনি। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম নববীর (আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযাব) ৫ম খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী অংশ এবং ইবনে কুদামার (আল-মুগনী) ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশ দেখা যেতে পারে।

তৃতীয়: মিশ্রণের প্রভাবের ক্ষেত্র সম্পর্কে ফকীহগণের অবস্থান:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মিশ্রণ কি কেবল প্রদেয় (ওয়াজিব) পরিমাণের ওপর প্রভাব ফেলে? নাকি এটি প্রদেয় পরিমাণ এবং নিসাব—উভয়ের ওপরই প্রভাব ফেলে?

এই মাসআলাটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, ফকীহগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম দল: তাঁরা মনে করেন যে, মিশ্রণ কেবল প্রদেয় পরিমাণের ওপরই প্রভাব ফেলে।
দ্বিতীয় দল: তাঁরা মনে করেন যে, এটি প্রদেয় পরিমাণ এবং নিসাব—উভয়ের ওপরই প্রভাব ফেলে।

প্রথম মতের অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: "তারা সমতার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে হিসাব সমন্বয় করে নেবে"-এর মাধ্যমে প্রদেয় পরিমাণের ওপর মিশ্রণের প্রভাব প্রমাণিত হওয়ার পর সেখানেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন এবং এর ওপর নিসাবকে কিয়াস (তুলনামূলক অনুমান) করেননি। তাঁদের অভিমত হলো, দুই অংশীদার কেবল তখনই একজন ব্যক্তির ন্যায় জাকাত প্রদান করবে, যদি তাদের প্রত্যেকের কাছে পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা কেবল এতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তাঁরা প্রদেয় পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নিসাবের ক্ষেত্রেও কিয়াস করেছেন। তাঁদের মতে, দুই বা ততোধিক অংশীদারের মিলিত সম্পদ একজন ব্যক্তির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে, ঠিক যেভাবে তাঁদের জাকাত একজন ব্যক্তির জাকাত হিসেবে গণ্য হয়। এই মতভেদের রেশ ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: "পৃথক সম্পদকে একত্রে জমা করা যাবে না এবং একত্রিত সম্পদকে পৃথক করা যাবে না"-এর মর্মার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। উভয় পক্ষই এই হাদিসটিকে নিজ নিজ মতের সপক্ষে গ্রহণ করেছেন।

এই বিষয়ে আলোচনার সারকথা হলো: এই মাসআলায় অগ্রগণ্য মতটি হলো, জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রভাব কার্যকর হওয়ার জন্য দুই অংশীদারের প্রত্যেকের সম্পদ পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। বরং আমরা যেমনটি বলেছি, কেবল উভয় সম্পদের সমষ্টি নিসাব পরিমাণ হওয়াই যথেষ্ট।

আমরা দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের অভিমতটিই গ্রহণ করছি কিয়াসের ওপর আমল করে; কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট শরয়ি দলিল (নস) এর বিরোধী না থাকে, ততক্ষণ কিয়াস শরয়িভাবে গ্রহণযোগ্য। আমাদের এই মাসআলায় ইতিপূর্বে বর্ণিত নস প্রদেয় পরিমাণের ওপর মিশ্রণের প্রভাব সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং নিসাবকেও এর ওপর কিয়াস করা হবে। আর এভাবেই মিশ্রণের প্রভাবের ক্ষেত্রটি হবে প্রদেয় পরিমাণ এবং নিসাব—উভয়টিই।

পশুসম্পদের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা (আল-খুলতাহ)-র বিধানসমূহ এবং জাকাতে এর প্রভাব

চতুর্থত: যে সকল সম্পদে যৌথ মালিকানা প্রভাব ফেলে, সেগুলোর ধরণ সম্পর্কে ফকিহগণের অবস্থান:

যাঁরা বলেন যে জাকাতে যৌথ মালিকানার প্রভাব রয়েছে, তাঁরা কোন কোন সম্পদে এই প্রভাব কাজ করবে সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এই মতভেদকে দুটি মতের দিকে ফিরিয়ে নেয়া যেতে পারে:

প্রথম মত: এই মতের অনুসারীরা মনে করেন যে, যৌথ মালিকানার প্রভাব কেবল পশুসম্পদের (মাশিয়া) ক্ষেত্রেই কার্যকর। পশুসম্পদ ছাড়া অন্য কোনো সম্পদে যৌথ মালিকানার কোনো প্রভাব নেই।

দ্বিতীয় মত: এই মতের অনুসারীরা মনে করেন যে, যৌথ মালিকানার প্রভাব সকল প্রকার সম্পদের ক্ষেত্রেই কার্যকর; চাই তা পশুসম্পদ হোক, নগদ অর্থ হোক, বাণিজ্যিক পণ্য হোক, শস্যদানা হোক কিংবা ফলমূল হোক। এই মতগুলোর বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইবনে কুদামা রচিত 'আল-মুগনি' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯০ এবং পরবর্তী অংশ) এবং নববী রচিত 'আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব' (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০ এবং পরবর্তী অংশ) দেখা যেতে পারে।

প্রথম মতের দলিলসমূহ: যাঁরা এই মত পোষণ করেন যে যৌথ মালিকানার প্রভাব কেবল পশুসম্পদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এবং গবাদিপশু ছাড়া অন্য কিছুতে এর প্রভাব নেই, তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "দুইজন অংশীদার (আল-খলিতান) তারাই, যারা জলাধার, প্রজননকারী পুরুষ পশু এবং রাখালের ক্ষেত্রে একত্রিত হয়।" "দুইজন অংশীদার তারাই যারা জলাধারে একত্রিত হয়..." এখানে 'জলাধার' (আল-হাওয) বলতে সেই স্থানকে বোঝানো হয়েছে যেখান থেকে গবাদিপশু পানি পান করে। আর 'প্রজননকারী পুরুষ পশু' (আল-ফাহল) বিষয়টি কেবল পশুসম্পদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তদ্রূপ 'রাখাল' (আর-রায়ি) বিষয়টিও কেবল গবাদিপশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁরা বলেন: এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, যে সম্পদে এই বিষয়গুলো পাওয়া যাবে না, সেখানে জাকাতকে প্রভাবিত করার মতো কোনো যৌথ মালিকানা থাকবে না।

তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর ওপরও নির্ভর করেছেন: "জাকাত (বেশি হওয়ার) ভয়ে পৃথক সম্পদকে একত্রিত করা যাবে না।" এক্ষেত্রে তাঁরা বলেন: এটি কেবল পশুসম্পদের জন্যই নির্দিষ্ট। কারণ গবাদিপশু একত্রিত করলে কখনও জাকাতের পরিমাণ কমে যায়, আবার কখনও বেড়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সকল সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাবের অতিরিক্ত মালের জাকাত আনুপাতিক হারে হিসেব করে আদায় করতে হয়, তাই সেগুলোকে একত্রিত করার ফলে (জাকাতের পরিমাণে) কোনো প্রভাব পড়ে না।

এর অর্থ হলো: বিচ্ছিন্নকে একত্রিত করা এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা। তারা বলেন: এটি প্রকৃতপক্ষে সদকার (যাকাত) ওপর প্রভাব ফেলে, তবে তা কেবল গবাদি পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এটি অন্য কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না, যেমন উদাহরণস্বরূপ নগদ অর্থ; কারণ নগদ অর্থ যখন নিসাব পরিমাণ হয়, তখন সেই সম্পদের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। ফলে সেখানে একত্রিতকে পৃথক করা বা বিচ্ছিন্নকে একত্রিত করার বিষয়টি কল্পনা করা যায় না। এ কারণে তারা বলেছেন: এই হাদিসটিও কেবল গবাদি পশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তাই তারা বলেন: যাকাতের ক্ষেত্রে 'খুলতাহ' (অংশীদারিত্ব)-এর প্রভাব কেবল গবাদি পশুর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং গবাদি পশু ছাড়া অন্য কিছুতে অংশীদারিত্ব থাকলেও যাকাতের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব নেই। অর্থাৎ, সেখানে দুই ব্যক্তির সম্পদকে এক ব্যক্তির সম্পদের মতো গণ্য করা হবে না। দুই ব্যক্তির সম্পদকে এক ব্যক্তির সম্পদের মতো ধরা কেবল গবাদি পশুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ;

এছাড়া অন্য কোনো সম্পদে দুই ব্যক্তির সম্পদকে এক ব্যক্তির সম্পদের মতো গণ্য করা হবে না।

ফলস্বরূপ এই অবস্থায় প্রত্যেক মানুষ তার মালপত্র ও সম্পদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যদি পৃথকভাবে তার সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় তবে সে যাকাত দেবে, আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তবে সে যাকাত দেবে না।

এটিই হলো প্রথম মতের সারকথা এবং সেই সকল আলেমদের দলিল যারা বলেন যে, যাকাতের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের প্রভাব কেবল গবাদি পশুর ক্ষেত্রে হয়, অন্য কোনো সাধারণ সম্পদের ক্ষেত্রে নয়।

দ্বিতীয় মতের দলিলসমূহ: তারা তাদের অবস্থানের সপক্ষে দলিল পেশ করে বলেন যে, যদি প্রজননকারী, পানির উৎস এবং শস্য শুকানোর স্থান এক হয় তবে ব্যয়ভার লাঘব হয়। একইভাবে ব্যবসা পণ্যের ক্ষেত্রেও যদি দোকান, দাঁড়িপাল্লা এবং বিক্রেতা এক হয় তবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাই এটি গবাদি পশুর সদৃশ।

ইমাম নববী বলেন: সঠিক মত হলো সকল প্রকার সম্পদের ক্ষেত্রেই অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়া। অর্থাৎ সকল সম্পদের ক্ষেত্রে হাদিসের এই ব্যাপক হুকুম প্রযোজ্য হবে: "একত্রিত সম্পদকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না"। তিনি এর সপক্ষে আরও একটি যুক্তি যোগ করে বলেন: গবাদি পশুর ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব মূলত পারস্পরিক সুবিধার (ইরতিফাক) জন্য সাব্যস্ত হয়, আর এখানেও ঐক্যের মাধ্যমে সেই সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ

খলিয়ান; আর শস্য ও পানির ক্ষেত্রে খলিয়ানের ঐক্য এবং শস্যের ক্ষেত্রে খেজুর সংগ্রহের সময়কালও (একই হওয়া) বিবেচ্য। দোকান মূলত ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পাল্লাও ব্যবসার সাথে নির্দিষ্ট। পরিমাপকারী, ওজনকারী এবং জিম্মাদার—এসবই শস্য ও ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত।

সমসাময়িক অনেক আলেম সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে 'সংমিশ্রণের' (খালতাহ) প্রভাবের মতটি গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা একে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জাকাত বিধান ও তা আদায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কোম্পানিকে একক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা; যেহেতু তারা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলোকে একজন ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন, ফলে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের কিয়াসের ভিত্তিতে সরাসরি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সামগ্রিক মালের ওপর জাকাত ধার্য করা হয়।

অতএব, জাকাত কোম্পানির মালের ওপর আবশ্যক হবে, প্রত্যেক অংশীদারের মালের ওপর পৃথকভাবে নয়। এর ফলে সেই শেয়ারহোল্ডার জাকাত থেকে অব্যাহতি পাবেন না যার মালিকানাধীন শেয়ারের মূল্য জাকাতের নিসাব অপেক্ষা কম। এর অর্থ হলো, যদি এই কোম্পানির শেয়ারের পরিমাণ নিসাব অতিক্রম করে কিন্তু অংশীদারদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শেয়ার এই সংমিশ্রণের প্রভাবের কারণে নিসাব পর্যন্ত না পৌঁছায়, তবুও কোম্পানির মালের ওপর জাকাত আবশ্যক হবে; যদিও শেয়ারহোল্ডারদের কারোরই এককভাবে নিসাব পরিমাণ মালিকানা নেই যার কারণে তার ওপর জাকাত আবশ্যক হতে পারত।

এছাড়াও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত পাবলিক ল-এর আওতাধীন ব্যক্তিবর্গের (আইনগত সত্তা) ওপরও জাকাত প্রয়োগের মত ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা বলেছি যে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলো হলো প্রাইভেট ল-এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যকার কোম্পানি, যা প্রাইভেট ল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু ফকিহ বলেছেন: জাকাতের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের প্রভাব কেবল ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং তাদের কেউ কেউ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত পাবলিক ল-এর অন্তর্ভুক্ত

ব্যক্তিবর্গের ওপরও জাকাত প্রয়োগের মত পোষণ করেন। কারণ রাষ্ট্র যেমন বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, তেমনি তার ওপর করের দায়বদ্ধতা আসাও সঠিক। আর এই ভিত্তিতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কেবল...

১৭৫

কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তিগত আইনের আওতাভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়; বরং কিয়াসের (অনুমিতি) মাধ্যমে এটি বাণিজ্যিক প্রকৃতির পাবলিক আইনের আওতাভুক্ত ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। এ বিষয়ে ড. শওকী ইসমাইল শেহাতা রচিত ‘পুঁজির যাকাত হিসাবায়ন: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক’ (মুহাসাবাতু যাকাতিল মাল ইলমান ওয়া আমালান) গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশগুলো দেখা যেতে পারে (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, প্রকাশক: মাকতাবাতুল আংলো আল-মিসরিয়্যাহ)। অনুরূপভাবে ড. আব্দুল আজিজ আল-আলী আল-সালিহ রচিত ‘ইসলামে কর ব্যবস্থা ও সৌদি আরব রাজ্যে এর প্রয়োগের পরিধি’ (নিজামুদ দরাইব ফিল ইসলাম...) গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশগুলো দেখা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ: পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, যাকাতের ক্ষেত্রে ‘খুলতাহ’ বা মিশ্রণের প্রভাব রয়েছে; অর্থাৎ দুই ব্যক্তির সম্পদকে এক ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় গণ্য করা হবে। এই প্রভাব কেবল গবাদি পশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যাকাতযোগ্য সকল সম্পদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। আর এটিই আমাদের মনোনীত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত। সকল প্রকার যাকাতযোগ্য সম্পদে মিশ্রণের এই প্রভাব সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের সামনে যাকাতের ক্ষেত্রে ‘প্রাকৃতিক ব্যক্তি’র (মুকাল্লাফ তাবি’ই) পাশাপাশি ‘সাঙ্কেতিক ব্যক্তি’ বা ‘আইনি সত্তা’র (মুকাল্লাফ মানাউয়ি) অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা যদি জানি যে, যাকাতের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ব্যক্তি বলতে সেই সকল মুসলিম মালিককে বোঝায় যাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হয়েছে—যেখানে ছোট-বড় কিংবা সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ও পাগলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তবে সাঙ্কেতিক ব্যক্তি বা আইনি সত্তা গঠিত হয় নিম্নোক্তদের সমন্বয়ে:

১. ব্যক্তিগত আইনের আওতাভুক্ত সেই সকল ব্যক্তি যারা গবাদি পশু এবং যাকাতযোগ্য অন্যান্য সকল সম্পদে অংশীদার; ইসলামের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী যাকাতের ক্ষেত্রে যাদেরকে একক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, যখন তাদের সম্মিলিত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে আধুনিক যুগে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে গড়ে ওঠা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলো, যেগুলোর ক্ষেত্রেও মিশ্রণের (খুলতাহ) নিয়ম প্রযোজ্য হয়। এই কোম্পানিগুলো বর্তমান সময়ে বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান ও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এতে শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে এবং এর একটি স্বতন্ত্র সাঙ্কেতিক ব্যক্তিত্ব বা আইনি সত্তা বিদ্যমান।

১৭৬

২. বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত পাবলিক ল-এর ব্যক্তিবর্গ, যেমন সেই সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যাকাতের বিধান যাদের ওপর প্রযোজ্য তারা দুই প্রকার: প্রথম প্রকার হলো স্বাভাবিক ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো আইনগত ব্যক্তি। আমরা মনে করি যে, আইনগত ব্যক্তির ওপর যাকাত ধার্য করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এটি 'লাভের হার ঝুঁকির হারের আনুপাতিক' (আল-গুনমু বিল-গুরমি) নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। কারণ এই সত্তাটি রাষ্ট্রের এমন কিছু জনকল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে যা তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন রাষ্ট্র কর্তৃক তাকে সম্ভাব্য যে কোনো আক্রমণ বা অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ন্যায়বিচারের দাবি হলো— প্রতিটি অধিকার ভোগের বিপরীতে একটি আনুষঙ্গিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে, যা উক্ত নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ফলত, এই আইনগত ব্যক্তির ওপর যাকাত প্রদান ওয়াজিব হবে।

তদুপরি, আইনগত ব্যক্তির ওপর যাকাত আবশ্যক করার মাধ্যমে যাকাতের ব্যক্তিগত ব্যাপকতাকে তার চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই বিধানের ফলে যাকাত এমন সব সম্পদের কাছে পৌঁছাতে পারে যেখানে অন্য কোনোভাবে পৌঁছানো সম্ভব হতো না যদি আইনগত ব্যক্তির ওপর যাকাত ধার্য না করা হতো। বিষয়টি এমন যে, যদি আইনগত ব্যক্তি গঠনকারী অংশীদারদের প্রত্যেকের শেয়ার এককভাবে যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয়, কিন্তু সেই শেয়ারগুলো অন্যান্য শেয়ারের সাথে সম্মিলিত হওয়ার ফলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নিসাবে পৌঁছে যায়, তবে এমতাবস্থায় তাতে যাকাত আবশ্যক হবে।

এ বিষয়ে বক্তব্যের সারকথা হলো: যদি এই কোম্পানিগুলোতে মিশ্রণ বা অংশীদারিত্বের নীতি অনুযায়ী আমল করা না হতো— যার অর্থ হলো দুই ব্যক্তির সম্পদকে একজন ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় গণ্য করা— তবে এই সকল সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত আদায় করা সম্ভব হতো না। কারণ আমরা যদি প্রত্যেকের সম্পদের দিকে পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখা যাবে যে সে নিসাবের মালিক নয়, ফলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। কিন্তু যখন আমরা কোম্পানিতে এই সম্পদগুলোকে একে অপরের সাথে একত্রিত করি, তখন আমরা যাকাত পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হই; কারণ এই শেয়ারগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমরা নিসাবে উপনীত হতে পারি এবং ফলস্বরূপ সেখানে যাকাত প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

সুতরাং এর অর্থ হলো, যখন আমরা আইনি সত্তা বা কৃত্রিম ব্যক্তিবর্গের ওপর যাকাত ধার্য করি, তখন এটি আমাদের এমন অর্থের ওপর যাকাত আরোপের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ধার্য হতো না। আর যদি আমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং আইনি ব্যক্তিবর্গের ওপর যাকাত ফরজ করি—তা সাধারণ হোক বা বিশেষ—তবে এর অর্থ হলো রাষ্ট্র যা এসব কোম্পানি পরিচালনা করে এবং ব্যক্তিবর্গ যারা এসব কোম্পানি পরিচালনা করে; আমরা বলি যে, আইনি ব্যক্তিবর্গের ওপর যাকাত ধার্য হওয়া, তা সাধারণ হোক বা বিশেষ, এটি স্বাভাবিক ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি যাকাতের পরিধিকে বিস্তৃত করে। ফলে আমরা দেখতে পাই যে যাকাত এমন সমস্ত সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হয়েছে যা যাকাতযোগ্য হওয়ার উপযোগী, চাই তার মালিক কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি হোক বা কোনো কৃত্রিম সত্তা। এর অর্থ হলো যাকাতের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় অর্জিত হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আর্থিক দায়ভার বহনে পূর্ণ সমতা অর্জিত হয়, যার মধ্যে যাকাত হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যা রাষ্ট্রের প্রজাদের ওপর নির্ধারিত। স্বাভাবিক ব্যক্তিবর্গ বা কৃত্রিম ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে যাকাতের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা শেষ করার পর আমরা বলি: যদি ব্যক্তিগত ব্যাপকতা সকল

সক্ষম স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, তবে এটি তাদের মালিকানাধীন সম্পদসমূহকেও তাদের উৎসের ভিন্নতা নির্বিশেষে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ মূলত দায়বদ্ধতা সম্পদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। অতএব, যাকাতের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনার পর এখন আমরা যাকাতের বস্তুগত ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করব।

যাকাতের বস্তুগত ব্যাপকতা:

যাকাতের বস্তুগত ব্যাপকতা বলতে বোঝায়: যাকাত এমন সমস্ত সম্পদের ওপর ধার্য হওয়া যাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায়। সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত ফরজিয়াতের বিধান এসেছে যেমনটি আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে স্পষ্ট হয়: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন।"

শারঈ রাজনীতি
চতুর্থ পাঠ

“...এবং এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন। আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন, নিশ্চয় আপনার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [আত-তাওবাহ: ১০৩]

এটি প্রমাণ করে যে, যাকাতের মূলনীতি হলো তা প্রতিটি সম্পদে ওয়াজিব হওয়া, যতক্ষণ না সুন্নাহ এর বিপরীত কিছু বর্ণনা করে অথবা কোনো শারঈ দলিল উপস্থিত হয় যে নির্দিষ্ট কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত নেই, অথবা কোনো নির্দিষ্ট সম্পদে যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার দলিল পাওয়া যায়।

সম্পদের উৎস হয় উপার্জন অথবা যা জমিন থেকে বের হয়। তা মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে স্পষ্ট হয়:
“হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উত্তম বস্তুসমূহ ব্যয় করো। আর তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের সংকল্প করো না, যা তোমরা চোখ বুজে না থাকলে গ্রহণ করতে না। আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।” [আল-বাকারাহ: ২৬৭]

যেহেতু কুরআনুল কারীম প্রতিটি সম্পদে যাকাত ওয়াজিব করেছে, তবে সুন্নাহ বর্ণনা করেছে যে এই ফরজটি নিম্নোক্ত সম্পদসমূহে ওয়াজিব হয়:

প্রথম প্রকার: গৃহপালিত পশু (আন-না'আম); আর তা হলো উট, গরু এবং ছাগল-ভেড়া।
দ্বিতীয় প্রকার: জমি থেকে উৎপন্ন শস্য ও ফল (আল-মু'আশশারাত); আর তা হলো সেই খাদ্যদ্রব্য যাতে উশর (দশমাংশ) বা অর্ধ-উশর ওয়াজিব হয়।
তৃতীয় প্রকার: নগদ অর্থ (আন-নাকদ); এর দ্বারা সোনা ও রুপা উদ্দেশ্য, চাই তা মুদ্রাকারে হোক বা না হোক।
চতুর্থ প্রকার: ব্যবসায়িক পণ্য; আর পঞ্চম প্রকার হলো যাকাতুল ফিতর।

সম্পদের এই পাঁচটি প্রকার মূলত আট জাতীয় মালের সমষ্টি। তা হলো: “সোনা, রুপা, উট, গরু, ছাগল-ভেড়া, শস্য, খেজুর এবং আঙুর।” একারণেই আট শ্রেণির মানুষের জন্য যাকাত (বণ্টন) ওয়াজিব করা হয়েছে। মহান আল্লাহর এই বাণী এর প্রমাণ বহন করে:
“সাদাকা তো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের মন জয় করা হয়, দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আত-তাওবাহ:

৬০]

সুতরাং এই আটটি শ্রেণী যাদের নিকট যাকাতের অর্থ প্রদান করা হয়, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে, যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় তাও আট প্রকার।

১৭৯

পৃষ্ঠা 30

পাঠ চার
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

যে সকল পশুর যাকাত ওয়াজিব এবং যাকাত প্রদানের শর্তাবলি:

গবাদি পশুর যাকাত ওয়াজিব, অর্থাৎ উট, গরু এবং ছাগল-ভেড়া। এটি শরয়ি দলীল এবং ইজমা (ঐক্যমত) দ্বারা সাব্যস্ত। এ বিষয়ক দলীলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত নবী (সা.)-এর হাদীস। তিনি বলেছেন: "উট, গরু কিংবা ছাগল-ভেড়ার এমন কোনো মালিক নেই যে তার যাকাত আদায় করে না, অথচ কিয়ামতের দিন সেই পশুগুলো তাদের দুনিয়ার অবস্থার চেয়েও বিশাল দেহ ও অধিক মাংস নিয়ে আসবে না; তারা তাকে তাদের শিং দিয়ে গুঁতো দেবে এবং খুর দিয়ে মাড়াবে। যখনই পালের শেষ পশুটি তাকে অতিক্রম করে যাবে, অমনি প্রথমটি আবার ফিরে আসবে—যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়।"

গবাদি পশুর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ছয়টি: ইসলাম, স্বাধীনতা, পূর্ণ মালিকানা, নিসাব (নির্ধারিত পরিমাণ), এক বছর অতিবাহিত হওয়া এবং 'সাওম' বা চারণভূমিতে চরে খাওয়া। ইজমা অনুযায়ী শর্ত হলো পশুটি একজন মুসলমানের মালিকানাধীন হতে হবে। এর অর্থ হলো, পশুটি যদি কোনো কাফিরের মালিকানায় থাকে তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না; কারণ যাকাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলাম একটি শর্ত। আর এর কারণ হলো যাকাত একটি ইবাদত, যা কাফির থাকা অবস্থায় শুদ্ধ হয় না। এছাড়া অধিকাংশ ফকীহদের মতে, পূর্ণ বছর পশুটিকে 'সায়িমা' (তৃণচারী) হতে হবে। 'সাওম' এর অর্থ হলো পশুটি নিজে নিজে চারণভূমিতে বিচরণ করবে, অর্থাৎ মালিককে তার খাবারের খরচ বহন করতে হবে না। কেননা 'সায়িমা' বা তৃণচারী পশু জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত চারণভূমিতে ঘাস খেয়ে থাকে যার জন্য কোনো ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে যে পশুকে উন্মুক্ত চারণভূমি ব্যতীত অন্য উপায়ে খাবার খাওয়ানো হয় (মা'লুফাহ), তার পানাহারের জন্য মালিককে অর্থ ব্যয় করতে হয়। একইভাবে কাজকর্মে নিয়োজিত পশুর (মাশিয়াহ আল-আমিলাহ) বিধানও অনুরূপ।

অর্থাৎ, গবাদি পশুর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তসমূহের মধ্যে একটি হলো পশুটি 'সায়িমা' হতে হবে। এর অর্থ হলো পশুটি নিজে নিজেই উন্মুক্ত চারণভূমিতে বিচরণ করে আহার করবে। যদি মালিক তাকে ঘাস-খাদ্য সংগ্রহ করে খাওয়ায়, তবে সেক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবে না। একইভাবে কাজকর্মে নিয়োজিত গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও যাকাত ওয়াজিব হবে না; যেমন যে সকল পশু জমি চাষে বা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। জমহুর বা অধিকাংশ ফকীহদের মতে এসকল পশুর ওপর যাকাত নেই। তবে ইমাম মালিক (রহি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কাজকর্মে নিয়োজিত এবং ঘাস-খাদ্য খাওয়ানো পশুর নিসাব পূর্ণ হলে তাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ
চতুর্থ পাঠ

উটের যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ বাণী— “প্রত্যেক পাঁচটি (উটের) জন্য একটি ছাগল”—এর ওপর ভিত্তি করে এটি নির্ধারিত। মদীনার অধিবাসীগণ এর ওপর আমল করতেন এবং তাদের নিকট এ ব্যাপারে অন্য কোনো মূলনীতি নেই।

সুতরাং এর অর্থ হলো, গবাদি পশুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য তা ‘সায়েমাহ’ (তৃণভূমিতে বিচরণকারী) হওয়া কিংবা ‘গাইরে মালুফাহ’ (মালিক কর্তৃক খাদ্য সরবরাহ করা হয় না এমন) হওয়া শর্ত নয়। ইমাম মালিকের মতে—অর্থাৎ তাঁর এই মতানুসারে—গবাদি পশুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, এমনকি যদি সেগুলো ‘মালুফাহ’ (মালিক কর্তৃক খাদ্য সরবরাহকৃত) হয় এবং এমনকি যদি সেগুলো ‘আমিলাহ’ বা কর্মক্ষম (অর্থাৎ মালিক সেগুলোকে কৃষিকাজে ব্যবহার করেন) হয় তবুও। ইমাম মালিক যখন কর্মক্ষম ও খাবার সরবরাহকৃত পশুর ওপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন, তখন তিনি—যেমনটি আমরা বলেছি—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই সাধারণ হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন যেখানে তিনি উটের ক্ষেত্রে বলেছেন: “প্রত্যেক পাঁচটির জন্য একটি ছাগল।” যখন তিনি ﷺ বললেন: “প্রত্যেক পাঁচটির জন্য একটি ছাগল”, অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচটি উটের বিপরীতে একটি ছাগল, তখন হাদীসটি সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ এর মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি যে সেগুলো খাবার সরবরাহকৃত কি না, কিংবা তিনি এর মাঝেও কোনো পার্থক্য করেননি যে সেগুলো কাজ করে কি না। এ কারণেই ইমাম মালিক হাদীসে বর্ণিত এই সাধারণ নির্দেশের (উমুম) প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং গবাদি পশুর ওপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন, যদিও সেগুলো কর্মক্ষম হয় এবং যদিও সেগুলো মালিকের সরবরাহকৃত খাদ্যে লালিত হয়।

কিন্তু জমহুর (অধিকাংশ) আলিমগণের নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ‘সাওম’ (তৃণভূমিতে চরে খাওয়া) শর্ত হওয়ার স্বপক্ষে দলিল রয়েছে। জমহুর দলিল পেশ করেছেন যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ‘সাওম’ শর্ত। আর ‘সাওম’—যেমনটি আমরা বলেছি—হলো গবাদি পশুর উন্মুক্ত চারণভূমিতে ঘাস খেয়ে বেড়ানো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: “প্রত্যেক সায়েমাহ (তৃণভূমিতে বিচরণকারী) পশুর ক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশটিতে একটি ‘বিনতে লাবুন’ (দুই বছর বয়সী মাদী উট) যাকাত দিতে হবে।” এটি প্রমাণ করে যে, এ ছাড়া অন্য পশুর ওপর যাকাত নেই। তারা বলেন যে, নবী ﷺ এই হাদীসে ‘সাওম’-এর বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: “প্রত্যেক সায়েমাহ পশুর ক্ষেত্রে।” আর ‘মাফহুমুল মুখালাফাহ’ (বিপরীত অর্থবোধক ধারণা) অনুযায়ী, যা ‘সায়েমাহ’ নয়—অর্থাৎ যা ‘মালুফাহ’ (মালিকের সরবরাহকৃত খাদ্যে পালিত)—তার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। সুতরাং জমহুর গবাদি পশুর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ‘সাওম’ শর্ত হওয়ার স্বপক্ষে দলিল দিয়েছেন এবং তারা নবী ﷺ-এর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: “প্রত্যেক সায়েমাহ পশুর ক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন।” এটি এমন একটি হাদীস যা ‘মাফহুমুল মুখালাফাহ’-এর মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, যে পশুকে খাদ্য প্রদান করা হয় তার ওপর যাকাত নেই।

আশ-শারিইয়্যাহ আস-সিয়াসাহ (শরয়ী রাজনীতি)
চতুর্থ পাঠ
তারা আরও প্রমাণ পেশ করেছেন এই বর্ণনার মাধ্যমে যে, আবূ বকর (রা.) যখন তাঁর কর্মচারীদের কাছে ওয়াজিব যাকাত সংক্রান্ত পত্র লিখেছিলেন, তখন তাতে লিখেছিলেন: "বকরীর যাকাত হলো, যখন তা চারণভূমিতে বিচরণকারী (সায়িমা) হবে এবং সংখ্যায় চল্লিশটি হবে, তখন তাতে যাকাত দিতে হবে।" এর অর্থ হলো, আমাদের নেতা আবূ বকর (রা.) যেন এটি স্পষ্ট করছেন যে, বকরীর যাকাত কেবল তখনই ফরয হয় যখন তা সংখ্যায় চল্লিশটি হয়; তবে তিনি শর্ত দিয়েছেন যে সেগুলোকে অবশ্যই চারণভূমিতে বিচরণকারী হতে হবে, যখন তিনি বলেছেন: "বকরীর যাকাত তার চারণভূমিতে বিচরণকারী হওয়ার ক্ষেত্রে।" সুতরাং এখানে

আমাদের নেতা আবূ বকর (রা.) স্পষ্টভাবে চারণভূমিতে বিচরণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর এর মর্মার্থ অনুযায়ী, পালিত পশুর (যাদের ঘাস কিনে খাওয়ানো হয়) ওপর যাকাত ফরয হবে না।

তারা আরও বলেছেন যে, কর্মরত গবাদি পশু—অর্থাৎ যে পশুগুলো কাজ করে—এবং পালিত পশুসমূহ সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লালন-পালন করা হয় না; বরং তা মানুষের উপকার ও প্রয়োজনীয়তার খাতিরে রাখা হয়। ফলে তা শরীরের পোশাক এবং ঘরের ভিত্তির মতো হয়ে যায়, যার ওপর যাকাত ফরয না হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তদুপরি জমহূর (অধিকাংশ) ফকীহগণ বলেন যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পশু চারণভূমিতে বিচরণকারী হওয়ার শর্ত থাকা অপরিহার্য। তারা এর স্বপক্ষে যুক্তি দেন যে, কর্মরত এবং পালিত পশুকে সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাখা হয় না। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এগুলো লালন-পালন করে, সে সাধারণত নিজের কল্যাণ ও মৌলিক প্রয়োজনে তা করে থাকে। আর যাকাত মূলত বর্ধনশীল মালের ওপর ফরয হয়। কিন্তু এই পশুগুলো বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাখা হয় না, ফলে তা শরীরের পোশাকের মতো হয়ে যায়—অর্থাৎ মানুষ নিজের প্রয়োজনে যে কাপড় পরিধান করে। তাই এতে যাকাত ফরয হবে না।

আর এই তিন প্রকার পশু ছাড়া অন্য কোনো গবাদি পশুর ওপর যাকাত ফরয নেই। আমরা বলেছি যে, গবাদি পশুর মধ্যে যাকাত ফরয হয় উট, গরু এবং ছাগল/বকরীর ওপর। এই তিন প্রকার ছাড়া কি অন্য কোনো প্রকারের পশুতে যাকাত ফরয হবে? উট, গরু ও ছাগল ব্যতীত অন্য কোনো পশুর ওপর যাকাত ফরয হবে না, যেমন: ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা। কারণ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন: "মুসলমানের ওপর তার গোলাম এবং তার ঘোড়ার জন্য কোনো সদকা (যাকাত) নেই।" এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, গোলাম এবং ঘোড়ার ওপর যাকাত ফরয নয়। এর অর্থ হলো, হাদীসে বর্ণিত এই প্রকারগুলো—অর্থাৎ উট, গরু এবং ছাগল ছাড়া অন্য কিছুতে যাকাত ফরয হবে না।

অনুরূপভাবে গৃহপালিত পশু এবং বন্য পশুর সংমিশ্রণে জন্ম নেওয়া বাচ্চার ওপর যাকাত ফরয নেই। তেমনি যা মুসলিমের পূর্ণ মালিকানায় নেই এবং যে মালের ওপর এক বছর পূর্ণ হয়নি, তাতেও যাকাত নেই। কেননা আবূ বকর, উসমান এবং আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে—

শারয়ি রাজনীতি

চতুর্থ পাঠ

আর এটি মদিনার আলেমগণ ও বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণের মাজহাব। কারণ, সাধারণত এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে এগুলোর প্রবৃদ্ধি পূর্ণতা পায় না। সুতরাং বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক। তারা কেন এই পশুগুলোর ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত করেছেন? তারা বলেছেন যে, বছর অতিক্রান্ত হওয়া হলো প্রবৃদ্ধির প্রমাণ। অর্থাৎ, সাধারণত পূর্ণ এক বছরের মধ্যেই বৃদ্ধি সাধিত হয়। আর এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সাধারণত বৃদ্ধি ঘটে না; এই কারণেই তারা বছর অতিক্রান্ত হওয়াকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। গরু বলতে বন্য গরুও অন্তর্ভুক্ত, আর ছাগল বলতে ভেড়া ও ছাগল উভয়কেই বোঝায়।

হানাফিগণ জমহুর ওলামাদের মতোই পশু চরে খাওয়াকে শর্ত করেছেন, তবে তারা পুরো বছর চরে খাওয়া শর্ত করেননি; বরং বছরের অধিকাংশ সময় হলেই চলে, যা অর্ধেকের বেশি। এই কারণে যদি বছরের অর্ধেক সময় প্রাণীকে ঘাস খাওয়ানো হয়, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না; কারণ তখন তাকে ‘সাইমাহ’ (চরে খাওয়া পশু) হিসেবে গণ্য করা হয় না।

বছর অতিক্রান্ত হওয়ার—অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার—শর্তের ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাউদ তাঁর সনদে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "কোনো সম্পদে জাকাত নেই যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়।" সাধারণত সম্পদ বা পশুর প্রবৃদ্ধি পূর্ণতা পায় না—যেমনটি আমরা বলেছি—এক বছর পূর্ণ হওয়া ব্যতীত। আর জমহুর ওলামাদের নিকট পুরো বছর চরে খাওয়ার শর্তের স্বপক্ষে আনাস (রা.)-এর বর্ণিত সাধারণ হাদিসটি রয়েছে: "আর চরে খাওয়া ছাগলের জাকাতের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব।" এবং আবু দাউদ ও অন্যদের বর্ণিত হাদিস: "প্রতিটি ৪০টি চরে খাওয়া উটের জন্য একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে।" হাকেম যেমনটি বলেছেন, এর সনদ বিশুদ্ধ এবং খাত্তাবিও এটি উল্লেখ করেছেন।

অতএব, মালিকি মাজহাবের একটি অভিমত ব্যতীত জমহুর ফকিহগণ পশু চরে খাওয়াকে শর্ত করেছেন। যদিও জমহুর ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, পশুতে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য তাকে 'সাইমাহ' বা চরে খাওয়া হতে হবে; অর্থাৎ এটি এমন উন্মুক্ত চারণভূমিতে চরবে যেখানে তার মালিককে খাবার ও পানির খরচ বহন করতে হয় না। তারা এ বিষয়ে একমত হওয়ার পর আবার দ্বিমত করেছেন যে: চরে খাওয়া কি সারা বছর হওয়া শর্ত, নাকি বছরের অধিকাংশ সময় হওয়াই যথেষ্ট? হানাফিগণ বলেছেন, অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ বছরের অধিকাংশ সময় হওয়াই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় তারা পুরো বছর চরে খাওয়া শর্ত করেন না, কিন্তু জমহুর ফকিহগণ বলেছেন: চরে খাওয়া অবশ্যই পুরো বছর জুড়ে হতে হবে।

১৮৩

চতুর্থ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

এখন আমরা উটের জাকাতের নিসাব প্রসঙ্গে আসছি। সর্বসম্মত মতানুসারে (ইজমা) উটের প্রথম নিসাব হলো পাঁচটি। জমহুর ফকিহগণের মতে, চরে চরে বেড়ানো (সায়েমাহ) উটের সংখ্যা পাঁচটি হয়ে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে জাকাত ওয়াজিব হয় না। এর সপক্ষে বুখারি ও মুসলিমের (সহীহাইন) হাদিসটি রয়েছে: "পাঁচটির কম উটের ক্ষেত্রে কোনো সদকা (জাকাত) নেই।" এখানে 'যাওদ' হলো উটের একটি প্রকার। সুতরাং এই হাদিসটি বলছে যে, উটের সংখ্যা পাঁচটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাতে কোনো জাকাত নেই; অর্থাৎ পাঁচটির কম উটের ক্ষেত্রে কোনো সদকা নেই। তবে উট যখন পাঁচটিতে পৌঁছাবে, তখন তা নিসাব পূর্ণ করবে। কিন্তু এখান থেকে কি উটের জাত থেকেই জাকাত দিতে হবে নাকি অন্য কিছু থেকে? এখানে আমরা বলব: উটের সংখ্যা যখন পাঁচটিতে পৌঁছাবে, তখন তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে এবং ওয়াজিব হিসেবে একটি ছাগল বা দুম্বা প্রদান করতে হবে। এটি সম্পদের মূল জাতের বাইরে থেকে প্রদান করা হলো, যা সাধারণত মূলনীতির পরিপন্থী।

মূল বিধান হলো জাকাত সেই সম্পদের জাত থেকেই বের করা হবে। কিন্তু ফকিহগণের বর্ণনায় এসেছে যে, উট যখন পাঁচটিতে পৌঁছাবে তখন তা নিসাবে পৌঁছাল অর্থাৎ এতে জাকাত ওয়াজিব হলো। তবে যে পরিমাণ সম্পদ বের করা ওয়াজিব তা উটের জাত থেকে নয়, বরং এই পাঁচটি উটের বিপরীতে আমরা একটি ছাগল বের করব। আমরা যেমনটি বলেছি, এটি মূলনীতির পরিপন্থী হওয়ার কারণ হলো সম্পদশালী এবং দরিদ্র উভয়ের প্রতি সদয় হওয়া। কেননা সম্পদের মূল বিধান হলো সেই সম্পদ থেকেই জাকাত বের করা। এখানে যদি ওয়াজিব জাকাত উটের জাত থেকে বের করা হতো এবং তা যদি একটি পূর্ণাঙ্গ উট হতো, তবে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হতো; কারণ এটি অতিরিক্ত হয়ে যেত। আবার যদি আমরা উটের কেবল একটি অংশ প্রদান করা ওয়াজিব করতাম, তবে দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এমনকি সম্পদের মালিকও অংশটুকু প্রদানে অক্ষম হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কারণ জবাই করা ছাড়া কেবল একটি অংশ তাদের বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এটি তার জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি এতে উটের মূল্যও হ্রাস পেতে পারে। আবার দরিদ্রদের হয়তো গোশতের প্রয়োজন নেই, বরং তাদের রুটি বা পোশাকের প্রয়োজন হতে পারে এবং তারা হয়তো সেই গোশত কেনার মতো কাউকে খুঁজে পাবে না। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ একটি উটের পরিবর্তে একটি ছাগল বের করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ আমরা যেমনটি বলেছি, একটি ছাগলের মূল্য একটি উটের মূল্যের চেয়ে অনেক কম। তাই এখানে ছাগল ওয়াজিব করা হয়েছে, কারণ এতে উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা পায়।

দরিদ্রের স্বার্থ এই যে, সে যেন সম্পদের এই পরিমাণের জাকাত থেকে বঞ্চিত না হয়। আবার এতে সম্পদশালীরও স্বার্থ রয়েছে;

কারণ আমরা যদি তার উপর চারটি উটের মধ্য থেকে একটি উট ওয়াজিব করতাম, কিংবা যদি আমরা তার উপর...

এই পাঁচটি উটের মধ্য থেকে যদি একটি উট (যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হয়), তবে তা তার (মালিকের) জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এই কারণে সেখানে দরিদ্র এবং সম্পদের মালিকের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে, যেমনটি আমরা বলেছি যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন; অর্থাৎ আমরা যেন পাঁচটি উট থেকে (একটি উট বের না করে) একটি বকরী প্রদান করি। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী মুসলিমগণও এই রীতির ওপর অটল ছিলেন।

ইমাম বুখারী তাঁর সনদসহ আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন তাঁকে বাহরাইনে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন: "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি যাকাতের সেই ফরজ বিধান যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিমদের ওপর নির্ধারণ করেছেন এবং যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে যার কাছে যথাযথ নিয়মে যাকাত চাওয়া হবে, সে যেন তা প্রদান করে। আর যার কাছে এর অতিরিক্ত চাওয়া হবে, সে যেন তা প্রদান না করে। পঁচিশটির কম উটের ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরী। যখন উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তাতে একটি মাদি 'বিনতে মাখাদ' দিতে হবে। 'বিনতে মাখাদ' হলো সেই মাদি উট যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে; একে এই নামে অভিহিত করা হয় কারণ তার মা পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার সময় হয়েছে, ফলে সে গর্ভবতী উটদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং তাতে একটি মাদি বিনতে মাখাদ দিতে হবে; আর যদি সেখানে বিনতে মাখাদ না থাকে, তবে একটি নর 'ইবনে লাবুন' দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তাতে একটি মাদি 'বিনতে লাবুন' দিতে হবে। 'বিনতে লাবুন' হলো সেই উট যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে; কারণ তার মা তখন পুনরায় দুগ্ধবতী হওয়ার সময় হয়েছে, অর্থাৎ সে শাবক প্রসব করেছে ফলে সে দুগ্ধবতী। যখন উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তাতে একটি 'হিক্কাহ' দিতে হবে। 'হিক্কাহ' হলো সেই মাদি উট যার বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে; একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ সে তখন ষাঁড়ের সাথে মিলিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। আর নর উটের ক্ষেত্রে যখন সে বাহন হওয়ার এবং পিঠে আরোহন করার উপযোগী হয়। যখন উটের সংখ্যা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তাতে একটি 'জাযা'আহ' দিতে হবে। 'জাযা'আহ' হলো সেই মাদি উট যার চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে; একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ সে তার সামনের দাঁত হারিয়েছে অর্থাৎ তার দাঁত পড়ে গিয়েছে, আবার কেউ বলেছেন তার দাঁতগুলো পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর যখন উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত পৌঁছাবে..."

তাতে দুটি বিন্তে লাবুন (দুই বছর বয়সী মাদী উট) দিতে হবে। অতঃপর যখন সংখ্যাটি একানব্বই থেকে একশ বিশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তাতে দুটি হিক্কাহ (তিন বছর বয়সী মাদী উট) দিতে হবে যা প্রজননক্ষম উটের উপযুক্ত। যখন তা একশ বিশের অধিক হবে, তখন প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিন্তে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কাহ দিতে হবে।

পঁচিশটির কম উটের ক্ষেত্রে ওয়াজিব বকরি হলো হয় জাযআহ মেষ (ভেড়া); এটি এমন পশু যার সামনের দাঁত পড়ে গেছে অর্থাৎ তা পূর্ণ হয়েছে বা পড়ে গেছে, চাই তা এক বছর বয়সে পৌঁছাক বা তার কম হোক। যদিও সঠিক মত হলো, তা যা এক বছর পূর্ণ করেছে অথবা এক বছরের কিছু কম যা ছয় মাস পর্যন্ত পৌঁছে না। আর জাযআহ মেষের পরিবর্তে সানিয়্যাহ ছাগল প্রদান করা যথেষ্ট হবে, যা সঠিক মতানুসারে দুই বছর বয়সী এবং কেউ কেউ বলেছেন এক বছর বয়সী।

প্রদানকারী অর্থাৎ যিনি যাকাত প্রদান করবেন, তিনি সঠিক মতানুসারে বকরির ক্ষেত্রে মেষের জাযআহ অথবা ছাগলের সানিয়্যাহ থেকে প্রদানের ব্যাপারে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা রাখেন; কারণ 'শাহ' (বকরি) শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যাকাত হিসেবে যা প্রদান করা হবে—অর্থাৎ বকরি বা অন্যান্য জিনিস—তা সুস্থ হওয়া শর্ত। এমনকি যার পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান করা হচ্ছে সেই সম্পদ যদি অসুস্থও হয় এবং যদি সে সুস্থ সম্পদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, তবে তার উচিত সুস্থ সম্পদই প্রদান করা। যদি সে সুস্থ সম্পদ সংগ্রহে অক্ষম হয়, তবে যাকাত গ্রহণকারী বা যাকাতদাতার মাঝে প্রচলিত প্রভাবশালী মুদ্রা থেকে যাকাতযোগ্য মালের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে, এক্ষেত্রে উভয়ের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর তা বিবেচনা করতে হবে। আর যার ওপর যাকাত হিসেবে বিন্তে মাখাদ (এক বছর বয়সী মাদী উট) প্রদান করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং তার নিকট বিন্তে লাবুন রয়েছে, তবে সে তাই যাকাত হিসেবে প্রদান করবে এবং বিনিময়ে দুটি বকরি অথবা বিশ দিরহাম রূপা গ্রহণ করবে। অথবা যদি এই দুটির মূল্য সমান হয় তবে যেকোনো একটির মূল্য গ্রহণ করবে, এক্ষেত্রে দাতা—চাই সে মালিক হোক বা যাকাত কর্মকর্তা—পছন্দ করার অধিকার পাবে।

আর গরুর যাকাতের নিসাবের ক্ষেত্রে, গরুর যাকাতের প্রথম নিসাব হলো ত্রিশটি গরু। আমরা বলেছি উটের যাকাতের প্রথম নিসাব হলো পাঁচটি উট, কিন্তু গরুর যাকাতের প্রথম নিসাব হলো ত্রিশটি গরু, আর তাতে...

গরুর মধ্য থেকে এমন একটি বাছুর দিতে হবে যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। আর প্রতি চল্লিশটি গরুর ক্ষেত্রে এমন একটি বাছুর দিতে হবে যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। এভাবেই এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সংখ্যার বৃদ্ধির হিসাব করা হবে। সুতরাং প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য একটি এক বছর বয়সী বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটি গরুর জন্য একটি দুই বছর বয়সী বাছুর দিতে হবে, সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন। এর ভিত্তি হলো মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি ইয়েমেনের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে এক দিনার গ্রহণ করেন এবং গরুর ক্ষেত্রে প্রতি ত্রিশটির জন্য একটি এক বছর বয়সী পুং বা স্ত্রী বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি দুই বছর বয়সী বাছুর গ্রহণ করেন।

বকরির প্রথম নিসাব হলো চল্লিশটি এবং তাতে একটি বকরি দিতে হয়। একশ একুশটি হলে দুটি বকরি এবং দুইশ একটি হলে তিনটি বকরি। এরপর প্রতি একশ বকরির জন্য একটি করে বকরি দিতে হবে। এর কারণ হলো আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে

বর্ণিত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই পত্র, যা তিনি বকরির জাকাত সম্পর্কে লিখেছিলেন: "যদি বকরির সংখ্যা চল্লিশ থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত হয়, তবে তাতে একটি বকরি। অর্থাৎ যখন চল্লিশ থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত হবে তখন তাতে একটি বকরি। আর যদি দুইশ এর অধিক থেকে তিনশ পর্যন্ত হয় তবে তাতে তিনটি বকরি। এরপর যদি তিনশ এর অধিক হয় তবে প্রতি একশ বকরির জন্য একটি করে বকরি।"

আমরা ইতিপূর্বে যখন জাকাতের ব্যক্তিগত সাধারণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন অংশীদারিত্ব বা অংশীদারিত্বের জাকাত এবং জাকাতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এখন গবাদিপশুর অংশীদারিত্ব ও যৌথ মালিকানার জাকাত নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। গবাদিপশুর যৌথ সম্পদ—অর্থাৎ যা দুই ব্যক্তির মধ্যে অংশীদারিত্বে থাকে—তাতে জাকাত ওয়াজিব হয় যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। অধিকাংশ ফকিহদের মতে, এই অংশীদারিত্ব অবিভক্ত হোক বা মিশ্রিত হোক, জাকাত আবশ্যক হবে; তবে শর্ত হলো চারণভূমি, বিশ্রামস্থল, পানিস্থল, দোহনস্থল, প্রজননকারী পুরুষ পশু এবং রাখাল অভিন্ন হতে হবে এবং এই অংশীদারিত্বের ওপর এক পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। এটি ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্য থেকে অধিকাংশ ফকিহদের অভিমত। যদিও বিভিন্ন মাযহাবের ফকিহগণ এই শর্তগুলোর কোনো কোনোটির বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছেন। ইমাম মালিকের কোনো কোনো অনুসারী বলেছেন: যৌথ মালিকানায় মাত্র দুটি শর্ত ধর্তব্য: রাখাল ও চারণভূমি। অপরদিকে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন: চারণভূমি, বিশ্রামস্থল, পানিস্থল, প্রজননকারী পুরুষ পশু, রাখাল এবং দোহনস্থল এক বছর পর্যন্ত অভিন্ন থাকা শর্ত। এমতাবস্থায় তা থেকে একজন ব্যক্তির জাকাতের ন্যায় জাকাত প্রদান করা হবে।

চতুর্থ পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

ইমাম আবু হানিফা বলেন: জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই, যেখানে প্রতিটি অংশীদারের জন্য পৃথকভাবে নিসাব বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, যদি কারো একক সম্পদে নিসাব পূর্ণ হয়, তবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। এর ভিত্তিতে—অর্থাৎ এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে—যদি দুই ব্যক্তি ছাগলের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মিশ্রণ ঘটায় এবং তাদের ছাগলের সংখ্যা নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ চল্লিশটি হয়, যেখানে প্রত্যেকের বিশটি করে বা তার কম বা বেশি রয়েছে, তবে তাদের কারো ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না; কারণ সে এককভাবে পূর্ণ নিসাবের মালিক হয়নি। কিন্তু যদি তারা একত্রে আশিটি ছাগলের মালিক হয় এবং প্রত্যেকের চল্লিশটি করে থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের ওপর একটি করে ছাগল জাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে; কারণ সে স্বতন্ত্রভাবে নিসাবের মালিক হয়েছে। তাই আশিটি ছাগলের ক্ষেত্রে দুটি ছাগল দেওয়া আবশ্যক হবে।

এটি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী; কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু হানিফা মনে করেন জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই। এ কারণে—যেমনটি আমরা বলেছি—তিনি মনে করেন যে, যদি উদাহরণস্বরূপ দুই ব্যক্তির ছাগলের মধ্যে মিশ্রণ থাকে এবং প্রত্যেকের বিশটি করে ছাগল থাকে, যার মোট পরিমাণ চল্লিশ, তবে তার নিকট এই ছাগলগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেন? কারণ প্রত্যেকের সম্পদ এককভাবে জাকাতের নিসাবে পৌঁছেনি, ফলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাই আমরা যেমনটি বলেছি যে, ইমাম আবু হানিফা মনে করেন জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের কোনো প্রভাব নেই, ওয়াজিবের পরিমাণের ক্ষেত্রেও নয় এবং নিসাবের ক্ষেত্রেও নয়। মিশ্রণকারীদ্বয়ের প্রত্যেকে পৃথকভাবে তার সম্পদের জাকাত প্রদান করবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে অন্যজনের সম্পদের সাথে মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হলেও তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু—যেমনটি আমরা বলেছি—জমহুর (অধিকাংশ) ফকিহগণের মাযহাব হলো, প্রত্যেকের যদি বিশটি করে থাকে এবং একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে চল্লিশটি পূর্ণ হয়, তবে তারা জাকাত প্রদান ওয়াজিব মনে করেন; কারণ তাদের মতে জাকাতের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রভাব রয়েছে। আর জমহুর ফকিহগণের মতটিই অগ্রগণ্য।

কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিস হলো: "সদকার (জাকাতের) ভয়ে পৃথক সম্পদকে একত্রিত করা যাবে না

এবং একত্রিত সম্পদকে পৃথক করা যাবে না।" জমহুর ওলামাদের নিকট মিশ্রণের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, মিশ্রণকারী উভয়কে জাকাত প্রদানের উপযুক্ত হতে হবে এবং সেই সাথে চারণভূমি, বিশ্রামস্থল, পানীয় স্থান ও রাখাল সংক্রান্ত ইতিপূর্বে আলোচিত শর্তাবলি বাস্তবায়িত হতে হবে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ
এবং এছাড়া, যদি দুই অংশীদারের একজন অমুসলিম হয়, তবে তার অংশীদারিত্ব গণ্য করা হবে না। নিসাব নির্ধারণে এর কোনো প্রভাব নেই, কারণ এক্ষেত্রে কেবল মুসলিমের মালিকানাধীন সম্পদই বিবেচনা করা হবে। সুতরাং যদি তা নিসাবে পৌঁছায়, তবে প্রতিটি প্রকারের নিসাব সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে, অন্যথায় নয়।

গবাদি পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব এবং বছর অতিক্রান্ত হওয়া: বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে, গবাদি পশুর নিসাব রয়েছে—যেমনটি আমরা বলেছি। সুতরাং পাঁচটি উটের কম থাকলে তাতে যাকাত নেই, ৪০টি ভেড়া বা ছাগলের কম হলে তাতে যাকাত নেই এবং ৩০টি গরু বা মহিষের (উভয়ই সমান) কম হলেও তাতে যাকাত নেই। এই সীমার মধ্যবর্তী অংশটুকু মাফ (অব্যাহতিপ্রাপ্ত), এতে যাকাত হিসাব করা হয় না। সুতরাং ৩০ থেকে ৪০টি গরুর মধ্যবর্তী সংখ্যাটুকু মাফ, অর্থাৎ এতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। এর অর্থ হলো, যদি কেউ উদাহরণস্বরূপ ৩০টি গরুর মালিক হয়, তবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং সে একটি 'তাবি' (এক বছর বয়সী বাছুর) প্রদান করবে। যদি ৩০টির পরিবর্তে ৩৯টিও হয়, তবে সেক্ষেত্রেও সে একটি 'তাবি'-ই প্রদান করবে।

অতএব, ৩০ এর অতিরিক্ত থেকে ৪০ এর আগ পর্যন্ত সংখ্যাটি মাফ, অর্থাৎ এর ওপর কোনো যাকাত নেই। সুতরাং ৩০ থেকে ৪০টি গরুর মধ্যবর্তী সংখ্যা মাফ, এবং ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যবর্তী সংখ্যাও মাফ; এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই হিসাবগুলো বর্তমান সময়ে অর্থের মাধ্যমে মূল্যায়ন করলে এর পরিমাণ অনেক বড় হবে। হাদীসগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এগুলোর মূল্য কেমন ছিল। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি ছাগলের পরিবর্তে ২০ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন, যা নির্দেশ করে যে একটি ছাগলের মূল্য ছিল ১০ দিরহাম। সেই অনুযায়ী, মোট ৪০টি ছাগলের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৪০০ দিরহাম। সুতরাং আমরা যদি বর্তমান যুগে যাকাত প্রয়োগ করতে চাই, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত পরিমাণের দিকে লক্ষ্য করব এবং এর কোনো ব্যতিক্রম করব না। এরপর বর্তমান সময়ে এর মূল্যের দিকে তাকাব; অর্থাৎ আমরা দেখব যে ৪০০ দিরহাম সমমূল্যের অর্থ মিশরীয় পাউন্ড বা সৌদি রিয়াল বা অন্য মুদ্রায় কত হয়। যদি এই সম্পদগুলোর মূল্য নিসাব পর্যন্ত পৌঁছায়, তবে সেই অবস্থায় যাকাত প্রদান করা হবে।

আর ফকীহদের মধ্য থেকে ইমাম আবু হানীফা যাকাতের সমমূল্য পরিশোধ করা বৈধ বলেছেন। অর্থাৎ যখন আমরা বলি: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত এই মূল্যকে অনুমান করব বা বিবেচনা করব, যা স্পষ্ট করেছে যে ৪০টির মূল্য...

চতুর্থ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

সামগ্রিকভাবে একটি ভেড়ার মূল্য প্রায় চারশ দিরহাম। এরপর আমরা দেখি যে, এই চারশ দিরহাম বর্তমান সময়ে আমাদের ব্যবহৃত মুদ্রা যেমন উদাহরণস্বরূপ মিশরীয় পাউন্ড বা সৌদি রিয়ালে কত হয়। সুতরাং ভেড়াগুলোর মূল্য যখন এই নিসাবে পৌঁছাবে, তখন জাকাত আদায় করতে হবে।

এটি অবশ্যই ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে: জাকাতের ক্ষেত্রে সমমূল্য প্রদান করা বৈধ। তবে অবশ্যই জমহুর (অধিকাংশ) ফকিহগণ তা নিষেধ করেছেন। তারা বলেছেন: জাকাত অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট সম্পদ থেকেই প্রদান করতে হবে যাতে তা ওয়াজিব হয়েছে। আমরা বলি, জমহুর ফকিহদের মাঝে আবু হানিফাই জাকাতের সমমূল্য প্রদান করা বৈধ করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারণকৃত পরিমাণের বাস্তবায়নকারী হবো; কারণ সম্পদের মূল্য তার স্থলাভিষিক্ত হয়। নিঃসন্দেহে সমমূল্য গ্রহণ করা বর্তমান যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি সম্পদশালীদের মাঝে ব্যবধান কমিয়ে আনে। আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও বিদ্যমান ছিল।

অতএব, নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা জাকাত প্রদান করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে দরিদ্র ব্যক্তিকে তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করার সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত নয়। তেমনিভাবে সম্পদশালীদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিও আমাদের হারানো উচিত নয়, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারণকৃত বিষয়গুলোতে লক্ষণীয় ছিল। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি:

প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভেড়ার মূল্য দশ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে জাকাতের নিসাব চারশ দিরহামে পৌঁছে। আর প্রতি চল্লিশটি ভেড়ায় একটি ভেড়া জাকাত দিতে হয়, অর্থাৎ জাকাতের পরিমাণ হলো ওশরের এক-চতুর্থাংশ, যা শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫%)।

দ্বিতীয়ত: আমাদের ধরে নিতে হবে যে পাঁচটি উটের মূল্য চারশ দিরহাম, তবে তার জাকাত হলো একটি ভেড়া। অর্থাৎ এর পরিমাণ হলো দশ দিরহাম, যা পুনরায় শতকরা ২.৫ ভাগ হয়।

তৃতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার নিসাব দুইশ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। এর ফলে ভেড়ার নিসাব এবং নগদ অর্থের নিসাবের মূল্যের মাঝে একটি পার্থক্য তৈরি হয়। তদুপরি, সবকিছুর নিসাব বা তার মূল্য সমান হওয়া আবশ্যক নয়। আমরা বলেছি যে, মূল্যের দিক থেকে ভেড়ার নিসাব এবং নগদ অর্থের নিসাবের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তবে ভেড়ার নিসাব চারশ দিরহাম এবং...

মুদ্রার নিসাব হলো দুইশত দিরহাম। আমরা বলি: সুতরাং মূল্যের দিক থেকে এখানে একটি পার্থক্য রয়েছে। তবে সব জিনিসের নিসাব বা তার মূল্য সমান হওয়া আবশ্যক—এমন কোনো বিধান নেই।

সম্ভবত মুদ্রার ক্ষেত্রে নিসাব কমিয়ে রাখা—যা স্বচ্ছলতার সর্বনিম্ন সীমা—তার হিকমত বা নিহিত রহস্য হলো, এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য কোনো সম্পদের ফল বা প্রবৃদ্ধি হিসেবে অর্জিত হয়। যদিও এটি নিজেই তার পরবর্তী সম্পদের মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর গবাদি পশুর ক্ষেত্রে পশু নিজেই মূল সম্পদ এবং তাতেই প্রবৃদ্ধি ঘটে। আবার ব্যবসার পণ্যের প্রবৃদ্ধি গবাদি পশুর প্রবৃদ্ধির চেয়েও অধিক স্পষ্ট।

এ বিষয়ে আলোচনার সারকথা হলো: উদাহরণস্বরূপ মুদ্রা ও বকরির নিসাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, গবাদি পশু—যার অন্তর্ভুক্ত হলো বকরি—এমন এক প্রবৃদ্ধি যা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যেন এর কিছু উপকারের মুখাপেক্ষী থাকে। এই কারণে এই অবস্থায় মুকাল্লাফ বা ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে প্রকৃত মুদ্রা হলো অন্য সম্পদের প্রবৃদ্ধি। তাই দুইশত দিরহাম হলে তার ওপর জাকাত ধার্য হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই।

আমরা যেমনটি বলেছি, গবাদি পশুর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়া একটি শর্ত। সুতরাং যদি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই নিসাব কমে যায়, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না। এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বছরের শুরুতে চল্লিশটি বকরির মালিক হয়, তবে আমরা বলবো যে তার নিসাব পূর্ণ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, সে যখন নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ চল্লিশটি বকরির মালিক হলো, তখন কি তাকে এখনই জাকাত আদায় করতে হবে? আমরা বলবো: না। বরং এই নিসাবের মালিকানায় একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। যদি এই পূর্ণ বছর অতিবাহিত না হয়, যেমন উদাহরণস্বরূপ এই নিসাবের মালিক হওয়ার ছয় মাস পর সেই নিসাব আর বিদ্যমান না থাকে অথবা বছরের শেষ নাগাদ নিসাব সামান্য কমে যায়, তবে কি তার থেকে জাকাত নেওয়া হবে? তার থেকে জাকাত নেওয়া হবে না। কারণ শর্ত হলো নিসাবের মালিক হওয়া এবং সেই নিসাবের মালিকানায় এক বছর পূর্ণ হওয়া। সুতরাং যদি বছর পূর্ণ হওয়ার সময় নিসাব কমে যায়, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "কোনো সম্পদে জাকাত নেই যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়।"

চতুর্থ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

যদি বছরের মধ্যবর্তী সময়ে জাকাতের মাল নিসাব (ন্যূনতম সীমা) থেকে কমে যায়, অথচ বছরের শুরুতে এবং শেষে তা নিসাব পরিমাণ থাকে; অর্থাৎ বছরের শুরুতে নিসাব বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বছরের মাঝখানে তা নিসাব পরিমাণ থাকেনি, আবার বছরের শেষে তা নিসাব পূর্ণ হয়েছে—এমতাবস্থায় আমাদের কী করণীয়? আমরা বলি: যদি জাকাতের মাল বছরের মাঝখানে নিসাব অপেক্ষা কমে যায় এবং বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ীদের মতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর মালিকীদের মতে, বছরের শুরু এবং শেষে নিসাব পূর্ণ থাকাই ধর্তব্য, বছরের মাঝখানে কমে যাওয়ার কোনো গুরুত্ব নেই। তবে যদি সম্পদ পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে নতুন করে নিসাবের হিসাব শুরু হবে।

এ বিষয়ে সারকথা হলো: যদি বছরের শুরুতে সম্পদ বা নিসাব বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বছরের মাঝখানে কমে যায় এবং বছরের শেষে আবার পূর্ণ হয়, তবে কী করতে হবে? ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ীরা বলেন: কোনো জাকাত নেই। যেন তারা পুরো বছর জুড়ে নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত করেন। সুতরাং যদি বছরের মাঝখানে নিসাব কমে যায়, তবে তারা বলেন জাকাত ওয়াজিব হবে না; কারণ তারা পুরো বছর জুড়ে নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত করেন। ফলে বছরের যেকোনো অংশে তা নিসাব থেকে কমে গেলে আর জাকাত ওয়াজিব হয় না। কিন্তু মালিকীরা এই মত গ্রহণ করেননি। তারা বলেন: এ ক্ষেত্রে আমাদের নিকট বিবেচ্য বিষয় হলো বছরের শুরুতে এবং শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা; মাঝখানে কমে যাওয়া কোনো ধর্তব্য বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে মালিকীরা হানাফী ও শাফেয়ীদের মতের বিরোধিতা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

আমরা বলেছি: হানাফী ও শাফেয়ীরা বলেন যে, বছরের মাঝে নিসাব কমে গেলে এবং শেষে পূর্ণ হলেও জাকাত ওয়াজিব হবে না; কারণ তাদের নিকট পুরো বছর জুড়ে নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত। কিন্তু মালিকীরা বলেন যে, আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হলো বছরের শুরু এবং শেষে নিসাবের উপস্থিতি, বছরের মাঝখানে যে ঘাটতি হয়েছে তা আমাদের নিকট ধর্তব্য নয়। এর ওপর ভিত্তি করে

মালিকীদের মতে জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে যদি বছরের মাঝখানে গবাদি পশু বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বছরের মাঝে বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, তবে তা থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ জাকাত মূল নিসাব এবং তার বৃদ্ধি উভয় থেকেই গ্রহণ করা হবে; এক্ষেত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশের ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কি হয়নি, সেটির প্রতি লক্ষ্য করা হবে না।

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
চতুর্থ পাঠ
...বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, নাকি যাকাত কেবল ঐ সম্পদ থেকে নেওয়া হবে যার ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধির ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু নেওয়া হবে না যতক্ষণ না তার ওপর বছর পূর্ণ হয়?

ফকিহগণ এই মাসআলায় একটি অনুমান পেশ করেছেন, আর তা হলো—আমরা উদাহরণস্বরূপ ধরে নিই যে, বছরের শুরুতে এক ব্যক্তি চল্লিশটি ছাগলের মালিক হলো, ফলে সে নিসাবের মালিক হলো। বছরের মাঝপথে তার প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল অথবা এই ছাগলগুলো সংখ্যায় বেড়ে নিসাবকে ছাড়িয়ে গেল। এমতাবস্থায় ফকিহগণ বলেন: এই যে বৃদ্ধি ঘটল—ধরা যাক বছরের মাঝামাঝি সময়ে—এই প্রবৃদ্ধি বা নিসাবের ওপর অতিরিক্ত এই মালের বছর কি মূল মালের বছরের অনুগামী হবে, নাকি তা অস্তিত্বে আসার সময় থেকে তার জন্য একটি স্বতন্ত্র বছর গণ্য হবে? নিসাবের ওপর বছরের মাঝামাঝি সময়ে যে বৃদ্ধি ঘটেছে, তার জন্য কি বছরের একটি স্বতন্ত্র সূচনা হবে, নাকি তা মূল বছরের সাথে যুক্ত হবে এবং তার যাকাত মূল মালের যাকাতের সাথেই গণ্য হবে? এটি এমন একটি মাসআলা যাতে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন।

প্রথমত: ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তার মালিকানায় যদি বছরের শেষ পর্যন্ত সেই প্রবৃদ্ধি অবশিষ্ট না থাকে—যেমন বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে তা বিক্রি করে দিল বা জবাই করে ফেলল—তবে তাতে কোনো যাকাত নেই। আর যদি এমনটি না হয় (অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি অবশিষ্ট থাকে), তবে ফকিহগণ তিনটি মতভেদে বিভক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, যদি সে তা থেকে নিষ্কৃতি না পায় বরং তা বিদ্যমান থাকে, তবে এই প্রবৃদ্ধি কি মূল মালের বছরের বিধান গ্রহণ করবে এবং বছরের হিসাবের ক্ষেত্রে তার যাকাত কি মূল মালের যাকাতের অনুগামী হবে, নাকি আমরা এই বৃদ্ধির জন্য একটি স্বতন্ত্র বছর গণনা শুরু করব এবং মূল মালের বছর থেকে এটি আলাদা হবে? আমি বলব: ফকিহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত হলো—যাকাত কেবল ঐ মালের ওপরই নেওয়া হবে যার ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে; কারণ যাকাতের শর্ত হলো বছর অতিক্রান্ত হওয়া, যা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় তা থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে মূল টেক্সটের পরিপন্থী; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে নাকচ করেছেন। সুতরাং যদি তা থেকে যাকাত গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে প্রমাণহীন একটি বাধ্যবাধকতা, বরং এটি হাদিসের স্পষ্ট পাঠের বিরোধী।

চতুর্থ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

এই বিষয়ে শাফেয়ী মতের সারসংক্ষেপ হলো: তারা বলেন যে, মূল সম্পদের জন্য একটি বছর নির্ধারিত রয়েছে এবং বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধির জন্য একটি স্বতন্ত্র বছর রয়েছে। এর অর্থ হলো, যখন মূল সম্পদের বছর পূর্ণ হয়, তখন আমরা তা থেকে যাকাত গ্রহণ করি এবং তা বন্টন করি; কিন্তু আমরা এই প্রবৃদ্ধি থেকে ততক্ষণ যাকাত গ্রহণ করি না যতক্ষণ না এই প্রবৃদ্ধির ওপর একটি পৃথক বছর অতিবাহিত হয়। তারা যেন মূলের জন্য একটি বছর এবং প্রবৃদ্ধির জন্য একটি স্বতন্ত্র বছর নির্ধারণ করেন। কারণ, যদি আমরা মূলের বছর পূর্ণ হওয়ার সময় এই প্রবৃদ্ধি থেকে যাকাত গ্রহণ করি, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে এই প্রবৃদ্ধির ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়নি। এর মাধ্যমে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিরোধিতা করব, যা এই মর্ম প্রদান করে যে, পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত গ্রহণ করা যাবে না।

শাফেয়ীগণ বলেন: যাকাত কেবল সেই সম্পদের ওপরই গ্রহণ করা হবে যার ওপর বছর অতিবাহিত হয়েছে, অর্থাৎ এই ছাগল বা গবাদি পশু থেকে। আর বছরের মাঝখানে যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করা হবে; অর্থাৎ এটি তার মূলের সাথে যাকাতযোগ্য হবে না। বরং এর বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এই বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা দলিল হলো—যাকাতের শর্ত হলো বছর অতিবাহিত হওয়া, যা এই প্রবৃদ্ধি বা অতিরিক্তের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। তাই এই অতিরিক্ত অংশ থেকে যাকাত গ্রহণ করা টেক্সট বা নস-এর পরিপন্থী হবে। অর্থাৎ, যদি আমরা মূলের বছর পূর্ণ হওয়ার সময় তা থেকে যাকাত গ্রহণ করি, তবে যেন আমরা বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা থেকে যাকাত গ্রহণ করলাম। আর এতে নস-এর বিরোধিতা রয়েছে; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাতের আবশ্যকতাকে নাকচ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: হাম্বলী ও মালিকীদের মতো কেউ কেউ এই মত পোষণ করেছেন যে, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অতএব, মালিকী ও হাম্বলীগণ বলেন যে, এই প্রবৃদ্ধি বা অতিরিক্তের ওপর যাকাত ওয়াজিব। তারা যেন এই প্রবৃদ্ধির বছরকে মূলের বছরের অনুগামী করেন। সুতরাং যখন মূলের বছর পূর্ণ হয়, তখন আমরা তা থেকে যাকাত গ্রহণ করি এবং বছরের মাঝখানে অর্জিত প্রবৃদ্ধি বা অতিরিক্ত থেকেও যাকাত গ্রহণ করি। এই বিষয়ে তাদের যুক্তি হলো—এটি মূলের সমজাতীয় সম্পদ; অর্থাৎ অতিরিক্ত অংশটি মূল সম্পদেরই প্রকারভুক্ত। ফলে এটি মূলের অনুগামী হবে এবং এর সাথে যুক্ত হবে, আর মূলের বছরকেই এর বছর হিসেবে গণ্য করা হবে।

শরয়ী রাজনীতি

চতুর্থ পাঠ

মূলের সাথে, কারণ তা অবিচ্ছেদ্য বৃদ্ধির সদৃশ যেমন মোটাতাজা হওয়া ও অনুরূপ। আর এর ওপর ভিত্তি করেই মালিকী ও হাম্বলীগণের নিকট বৃদ্ধি ও মূল উভয়টির ওপর একত্রে জাকাত বর্তাবে। তাদের মতে মূলের সাথে বৃদ্ধিকে যুক্ত করা হবে এবং মূলের সাথে এই বৃদ্ধিরও জাকাত প্রদান করা হবে। যেমনটি আমরা বলেছি যে, তারা এক্ষেত্রে এই দলিল পেশ করেছেন যে, এই বৃদ্ধি তো মূলের স্বজাতীয় বস্তু। সুতরাং তা মূলের অনুগামী হবে এবং তার হুকুমই গ্রহণ করবে এবং বৃদ্ধির বছর গণনা মূলের বছর গণনার অনুসারী হিসেবে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত: এটি ইমাম আবু হানিফা এবং ইরাকের কতিপয় ফকীহগণের অভিমত। তাঁরা এই বিষয়ে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন: যদি বড় পশুগুলোর সবকয়টি বা কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে, যদিও ওই বড় পশুগুলো অবশিষ্ট না থাকে যাদের ওপর বছর অতিবাহিত হয়েছিল, এমনকি একটি মাত্র বড় পশু অবশিষ্ট থাকলেও জাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ এটিই হলো তৃতীয় অভিমত এবং এটিই ইমাম আবু হানিফার মত। তিনি বলেন: আমরা মূলের দিকে লক্ষ্য করব; যদি মূলের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, এমনকি তা যদি একটিও হয়, তবে এই অবস্থায় বৃদ্ধি মূলের সাথেই জাকাতযোগ্য হবে। কিন্তু আমরা যদি

ধরে নিই যে, বছর পূর্ণ হওয়ার সময় এই মূলের অস্তিত্ব আর নেই বা তার কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবে এই অবস্থায় তিনি বলেন: আমরা এই বৃদ্ধির জন্য নতুন করে বছর গণনা শুরু করব।

আর যে মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এই মতটি প্রতিষ্ঠিত তা হলো, যখন সবগুলো বড় পশু তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়, অর্থাৎ যে মূল থেকে এই বৃদ্ধিগুলো জন্মেছিল তার সবকয়টি যখন মালিকানা থেকে চলে যায়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে আসলি নিসাব (মূল নিসাব) বছরের মাঝামাঝি সময়েই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আর যখন মূল হারিয়ে যায়, তখন আর অনুগামী হওয়ার কোনো কার্যকারিতা থাকে না। আর বাচ্চার ওপর জাকাত তো কেবল মূলের অনুগামী হওয়ার কারণেই ওয়াজিব হয়েছিল। সুতরাং যখন অনুসরণ করার বিষয়টি বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন বাচ্চার ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিটি তখন স্বতন্ত্রভাবে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ তার জন্য নতুন করে বছর শুরু হবে। ফকীহগণ এই মাসআলাটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর এটিই হলো সেই মাসআলা যে, বছরের মাঝখানে যে বৃদ্ধি (বাচ্চা) জন্মে তার জাকাত কি মূলের সাথে হবে এবং সে কি মূলের জাকাতের হুকুম গ্রহণ করবে এবং তার বছর গণনা কি মূলের বছর গণনার সাথে হবে?

১৯৫

পৃষ্ঠা 46

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
চতুর্থ পাঠ

ফকীহগণ কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি ক্ষেত্র:

এমন অবস্থা যেখানে বছরের শুরুতে (সম্পদের) সংখ্যাটি নিসাব পূর্ণ করে না, অতঃপর বছরের মাঝামাঝি সময়ে উৎপাদনের মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়; এক্ষেত্রে বছরের গণনা কি বছরের শুরু থেকে হবে, নাকি উৎপাদনের মাধ্যমে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে হবে?

জমহুর (অধিকাংশ) ফকীহগণ বলেছেন: বছরের গণনা শুরু হবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে। আর এটি এই কারণে যে, একটি পূর্ণ নিসাবের ওপর বছর অতিবাহিত হয়নি। তদুপরি ব্যবসা ও নগদ অর্থের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার হিসাব নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকেই শুরু হয় এবং এর পূর্ববর্তী সময়ের কোনো বিবেচনা নেই। পাশাপাশি, বছর অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি রাখা হয়েছে সচ্ছলতা প্রমাণের জন্য এবং প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ার জন্য যা জাকাতের একটি শর্ত। আর যেহেতু জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো নিসাব, তাই নিসাব পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি জাকাত ফরজ করা হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে কারণ (সবব) উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই কার্য (মুসাব্বাব) উপস্থিত হওয়া। অতএব সেই অনুযায়ী, বছরের গণনা শুরু হবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে।

নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে বছর গণনা করা হবে নাকি মূল সম্পদের মালিক হওয়ার সময় থেকে—এই বিষয়ে ফকীহগণ যা বলেছেন তা হলো এটি। অধিকাংশ ফকীহ বলেন যে, নিসাব বা বছরের হিসাব নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকেই কেবল গণ্য করা হবে। আর এ সম্পর্কে এমন সব দলিল বর্ণিত হয়েছে যা একথারই প্রমাণ দেয়।

১৯৬

শরয়ি রাজনীতি

পঞ্চম পাঠ

যাকাতের অবশিষ্ট প্রকারসমূহ এবং এর ব্যাপকতা অর্জনে সহায়ক বিষয়াবলি

পাঠের আলোচ্য বিষয়সমূহ

প্রথম বিষয়: সোনা ও রূপার যাকাত (১৯৯)

দ্বিতীয় বিষয়: যাকাতযোগ্য অবশিষ্ট অন্যান্য সম্পদ এবং আধুনিক সম্পদসমূহ (২১০)

তৃতীয় বিষয়: যাকাতের ব্যাপকতা অর্জনে সহায়ক বিষয়াবলি (২২৯)

""

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

পঞ্চম পাঠ

সোনা ও রূপার জাকাত

এরপর আমরা সোনা ও রূপার জাকাত সংক্রান্ত হাদিস আলোচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি:

আলী ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "আমি তোমাদের ঘোড়া ও দাসের জাকাত ক্ষমা করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা 'রিক্কাহ'—অর্থাৎ রূপার—জাকাত প্রদান করো; প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। আর একশত নব্বই দিরহামে কোনো কিছু নেই। তবে যখন তা দুইশত দিরহামে পৌঁছাবে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম জাকাত দিতে হবে।"

আবু দাউদও আলী ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: "যখন তোমার কাছে দুইশত দিরহাম থাকবে এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হবে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। আর সোনার ক্ষেত্রে তোমার ওপর কোনো কিছুই নেই যতক্ষণ না তোমার কাছে বিশ দিনার থাকে। অতঃপর যখন তোমার বিশ দিনার হবে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন তাতে অর্ধেক দিনার জাকাত দিতে হবে।" এই হাদিস দুটি তিনটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে:

প্রথমত: নগদ দুই মুদ্রার—সোনা ও রূপা—জাকাতের নিসাব হলো রূপার ক্ষেত্রে দুইশত দিরহাম এবং সোনার ক্ষেত্রে বিশ মিসকাল। অর্থাৎ রূপা যখন দুইশত দিরহাম বা তার ঊর্ধ্বে পৌঁছাবে, তখন সেখানে জাকাত ওয়াজিব হবে; কারণ এর নিসাব হলো দুইশত দিরহাম। একইভাবে সোনা যখন বিশ মিসকাল বা তার বেশি হবে, তখন তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে; কারণ সোনার বিশ মিসকাল পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই নিসাব বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়ত: অবশ্যই বছর অতিক্রান্ত হতে হবে যেন এই সময়ের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি সচ্ছলতার এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যেখানে তার কাছে উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে যা দিয়ে সে নিঃস্বদের সাহায্য করতে পারে। এর মাধ্যমেই ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা 'নিসাব' সাব্যস্ত হয় এবং এর শর্ত হলো বছর অতিক্রান্ত হওয়া। অতএব, উক্ত হাদিসের মর্মার্থ হলো—প্রথমত এটি সোনা ও রূপার নিসাব স্পষ্ট করে; সোনার নিসাব একশত দিরহাম এবং রূপার নিসাব বিশ মিসকাল। এছাড়া হাদিসটি আমাদের আরও স্পষ্ট করে যে, বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত জাকাত ওয়াজিব হবে না এবং নিসাব তার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ হতে হবে। কারণ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সাথেই সম্পদের প্রবৃদ্ধি জড়িত এবং এই সময়ের মধ্যে যেন সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে।

পঞ্চম পাঠ

কারণ সাধারণত এক বছর অতিবাহিত হওয়া ছাড়া (সম্পদে) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় না। তাই এই এক বছর অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সোনা ও রুপার ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়া অন্যতম একটি আবশ্যকীয় শর্ত।

তৃতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অবশ্যই দুইশত দিরহামের মূল্য বিশ মিসকাল সোনার মূল্যের সমান ছিল; কারণ গবাদি পশু, ফলমূল এবং শস্যের বিপরীতে জাকাতের ক্ষেত্রে এ দুটি একই জাতীয় সম্পদ। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন যে, রুপার নিসাব হলো দুইশত দিরহাম এবং সোনার নিসাব হলো বিশ মিসকাল, এর অর্থ হলো তাদের মূল্য সমান ছিল। অথবা বিশ মিসকাল দুইশত দিরহামের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অবশ্যই দুইশত দিরহামের মূল্য বিশ মিসকাল সোনার মূল্যের সমান হতে হতো; কারণ জাকাতের ক্ষেত্রে তারা একজাতীয়, আর তা হলো দুই মুদ্রার (নাকদাইন) জাকাত। এর অর্থ হলো বিশ মিসকাল দুইশত দিরহামের সমান এবং দুইশত দিরহাম বিশ মিসকালের সমান।

আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাদের মূল্য অভিন্ন হয়ে থাকে, তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে এটি প্রমাণিত হয়েছে

যে, কেবলমাত্র সোনাই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড হওয়ার যোগ্য; তাই বিভিন্ন যুগে সাধারণত এর মূল্য পরিবর্তিত হয় না। কারণ এটি বস্তুর মূল্য পরিমাপের একটি স্থিতিশীল মানদণ্ড। আর এটি প্রমাণিত যে রুপা তেমন নয়। যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সোনা ও রুপা উভয়ই প্রধান মুদ্রা হিসেবে একত্রে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে রুপার মূল্য পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আমরা জাকাতের ক্ষেত্রে সোনাকে মূল্যায়নের একক হিসেবে গণ্য করি। অর্থাৎ যেহেতু রুপার মূল্য পরিবর্তিত হয় এবং সোনার মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, এমতাবস্থায় আমাদের সোনাকেই মূল্যায়নের একক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

আর এই কারণেই যখন সোনা ও রুপার (মুদ্রারূপে) অস্তিত্ব আর থাকল না এবং বর্তমান সময়ে সোনা ও রুপা কোনো জিনিসের দাম বা ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর বিনিময় মূল্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তখন তারা আর মুদ্রা হিসেবে গণ্য রইল না। বর্তমানে কাগজের মুদ্রাই প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং পাউন্ডের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো...

মিশরীয় পাউন্ড বা সৌদি রিয়াল, উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তির কাছে এই মুদ্রাগুলোর—মিশরীয় পাউন্ড বা সৌদি রিয়াল—পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে এবং সে তার নগদ অর্থের জাকাত প্রদান করতে চায়; তবে এই অবস্থায় আমরা তাকে বলব: আপনার কাছে থাকা সম্পদের হিসাব কি স্বর্ণের মাপে করবেন নাকি রূপার মাপে? আমরা বলব: এক্ষেত্রে স্বর্ণের মাধ্যমে হিসাব করাই অধিকতর সংগতিপূর্ণ; কারণ স্বর্ণের মূল্য স্থিতিশীল, পক্ষান্তরে রূপার মূল্য পরিবর্তনশীল। এজন্য, যেমনটি আমরা বলেছি, বর্তমান সময়ে স্বর্ণকেই মূল্যায়নের একক হিসেবে গণ্য করা উচিত।

কিন্তু সেই দিরহামের ওজন কত ছিল, যার দুইশত দিরহামকে নিসাব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে? আমরা তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্য একটি হাদীস থেকে বুঝতে পারি যা রূপার জাকাতের নিসাব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পাঁচ উকিয়ার কম রূপার ক্ষেত্রে কোনো জাকাত নেই।" আর 'আওয়াকি' হলো 'উকিয়া' শব্দের বহুবচন। ("পাঁচ উকিয়ার কম রূপার ক্ষেত্রে কোনো জাকাত নেই") আর এখানে 'ওয়ারাক্ব' বলতে রূপাকে বোঝানো হয়েছে। যদি এই অধ্যায়ের সকল হাদীস একই অর্থের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে: পাঁচ উকিয়া হলো দুইশত দিরহাম; অর্থাৎ প্রতিটি উকিয়ার ওজন হলো চল্লিশ দিরহাম। আর নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ওজনের ভিত্তিতে, সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র মুদ্রা ছিল না, বরং তারা দিরহাম ও দিনার ব্যবহার করত এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মুদ্রা গ্রহণ করত। দিরহামের তিনটি প্রকার ছিল: কিছু ছিল এমন যেখানে প্রতি দশ দিরহামের ওজন ছিল দশ দিনার, কিছু ছিল এমন যেখানে প্রতি দশ দিরহামের ওজন ছিল পাঁচ দিনার বা মিথকাল, আর কিছু ছিল এমন যেখানে প্রতি দশ দিরহামের ওজন ছিল সাত মিথকাল। অতঃপর ইমাম উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) খারাজ ও জাকাতের ক্ষেত্রে সেই মানটি বেছে নেন যেখানে দশটির ওজন হয় সাত মিথকাল। সম্ভবত তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এগুলোর চল্লিশটির ওজন হয় এক উকিয়া। ফলে তার এই আমল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর একটি বাস্তব প্রয়োগ হিসেবে গণ্য হয়।

আর স্বর্ণের নিসাবের বিশ মিথকাল—যেমনটি আমরা বলেছি—ভিন্ন হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে আমরা বলতে পারি যে, এটি গড়ে বা সাধারণত পঁচাশি গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে থাকে...

স্বর্ণ; এর ভিত্তিতে বর্তমানে যাদের কাছে এই কাগজের মুদ্রা রয়েছে, তা মিশরীয় পাউন্ড হোক বা সৌদি রিয়াল—আমরা যেমনটি বলেছি—নিসাব হলো ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। সুতরাং কারও কাছে যদি মুদ্রার মান অনুযায়ী ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমপরিমাণ অর্থ থাকে, তবে তার ওপর জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হবে। আর যদি তার কাছে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের চেয়ে কম থাকে, তবে তার ওপর কোনো জাকাত নেই।

বৈধ ও নিষিদ্ধ অলংকারের জাকাত এবং ফকীহগণের মতামত:

আমরা এখন সোনা ও রূপার জাকাত সংশ্লিষ্ট অন্য একটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করছি, আর তা হলো অলংকারের জাকাত। আমরা বলব: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফকীহগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিষিদ্ধ অলংকার—যা কোনো প্রয়োজন (যেমন কৃত্রিম দাঁত) ছাড়া পুরুষের জন্য সোনা বা রূপার তৈরি হয়, এবং অনুরূপভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ তৈজসপত্র কিংবা পুরুষের জন্য সাজসজ্জার বস্তু—এসব ক্ষেত্রে আমরা বলব: এগুলো নিসাব পরিমাণ হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব। নিষিদ্ধ অলংকারের ক্ষেত্রে ফকীহগণ একমত যে এতে জাকাত ওয়াজিব। তবে তারা বৈধ অলংকারের জাকাতের বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে কি না? ইমাম লাইস, মালিকী ও শাফেয়ীগণের প্রসিদ্ধ মত এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রকাশ্য মত অনুযায়ী: মহিলার বৈধ অলংকারে কোনো জাকাত নেই, তার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন। আর হানাফীগণ বলেছেন—এবং এটি শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত—তা নিসাব পরিমাণ হলে জাকাত ওয়াজিব হবে।

অতএব, ফকীহদের মধ্যকার মতভেদটি হলো বৈধ অলংকার অর্থাৎ সোনার বৈধ অলংকারের ক্ষেত্রে—তাতে কি জাকাত ওয়াজিব হবে নাকি হবে না? জুমহুর বা অধিকাংশ ফকীহ বলেন: এতে জাকাত ওয়াজিব নয়। অন্যদিকে হানাফীগণ এবং কিছু ফকীহ বলেন এতে জাকাত ওয়াজিব। এই মাসআলায় ফকীহদের মতভেদের কারণ হলো, অলংকারের বিষয়টি আসবাবপত্রের (আওরুদ) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া যেখান থেকে বৈধ উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য এবং যাতে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো জাকাত নেই; আবার তা কাঁচা সোনা ও রূপার সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ যা দ্বারা যাবতীয় লেনদেন উদ্দেশ্য হয় এবং যার নিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব। সুতরাং যারা অলংকারকে আসবাবপত্রের সদৃশ মনে করেছেন...

...যা থেকে উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য, তিনি বলেছেন: এতে জাকাত নেই। আর যিনি একে স্বর্ণ বা রৌপ্যপিণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন যা দ্বারা লেনদেন করা উদ্দেশ্য হয়, তিনি এতে জাকাত রয়েছে বলে মত দিয়েছেন। একইভাবে এ ব্যাপারে বর্ণিত আসার ও শরয়ি

দলিলসমূহে তাঁদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

বৈধ অলংকারে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের দলিলসমূহ:

তারা এবং তাদের সাথে যারা একমত পোষণ করেছেন, তাঁরা তাঁদের অভিমতের স্বপক্ষে এমন সব দলিল ও আছার পেশ করেছেন যা তাঁদের মতকে শক্তিশালী করে। তন্মধ্যে একটি হলো ইমাম তিরমিযী তাঁর সানাদে আমর ইবন শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে: ((এক মহিলা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন, তাঁর সাথে তাঁর এক কন্যা ছিল যার হাতে স্বর্ণের দুটি মোটা চুড়ি ছিল— 'মাসাকাতান' অর্থ যা নারী তার হাতে অলংকার হিসেবে পরিধান করে—তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি এর জাকাত প্রদান কর? তিনি বললেন: না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে এ দুটির বদলে আগুনের দুটি চুড়ি পরিয়ে দেবেন? বর্ণনাকারী বলেন: তখন তিনি চুড়ি দুটি খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন: এ দুটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ও তাঁর রাসুলের জন্য।)) তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে এই হাদিসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যার একটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীও রয়েছে: ((তোমরা এর জাকাত আদায় কর।))

এই হাদিসটি স্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলার নিকট স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর কন্যার হাতের এই স্বর্ণের ওপর জাকাত ওয়াজিব, যদিও তাঁর কন্যা তা অলংকার হিসেবে পরিধান করেছিল। সুতরাং এটি স্পষ্ট দলিল যে, বৈধ অলংকারে জাকাত ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো: ((তোমরা এর জাকাত আদায় কর।)) অর্থাৎ তোমার মেয়ের হাতের এই স্বর্ণের জাকাত বের কর।

এছাড়াও তাঁরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেখানে তিনি বলেন: ((আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং আমার হাতে রুপার কয়েকটি আংটি দেখলেন—'ওয়ারাক' অর্থ হলো রৌপ্য—অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: হে আয়েশা, এগুলো কী?))

আমি বললাম: আমি আপনার জন্য সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে এগুলো তৈরি করেছি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন: তুমি কি এগুলোর জাকাত প্রদান করো? আমি বললাম: না, অথবা আল্লাহ যা চান। তিনি বললেন: "এটিই তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হিসেবে যথেষ্ট হবে।" অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সতর্ক করছিলেন যে, যদি তিনি জাকাত আদায় না করেন, তবে তিনি নিজেকে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন করছেন—আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই। এটি যদি কিছু নির্দেশ করে তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে, এতে জাকাত ওয়াজিব। আর এটি আরও প্রমাণ করে যে, বৈধ অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও জাকাত ওয়াজিব হয়।

যারা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন, তাদের দলিলের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল থেকে বর্ণিত একটি আছার রয়েছে: তিনি আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট লিখেছিলেন: "তোমার নিকট দিয়ে মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে যারা অতিক্রম করবে, তাদের অলঙ্কারের জাকাত দিতে বলো এবং একে অপরের মধ্যে অলঙ্কার ধার দেওয়াকে যেন তারা জাকাতের বিনিময় (বা স্থলাভিষিক্ত) না করে।" এটিও স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ যে, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসা আল-আشআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তার নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী মুসলিম

নারীদের পরিহিত অলঙ্কারের জাকাত গ্রহণ করেন। আর এটি জাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলিল।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উক্তি, তিনি বলেছেন: "অলঙ্কার পরিধানে কোনো দোষ নেই যখন তার জাকাত প্রদান করা হয়।" তাবেঈনদের মধ্য থেকে যারা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেছেন তারা হলেন: নাখঈ, তাউস, মুজাহিদ, আতা, জাবির বিন যায়েদ, ইবনে সিরিন, হাসান বসরী প্রমুখ। যারা বলেন যে বৈধ অলঙ্কারে জাকাত ওয়াজিব, এগুলোই হলো তাদের দলিল।

বৈধ অলঙ্কারে জাকাত নেই—যারা এই মত পোষণ করেন তাদের দলিলসমূহ:

এই মাযহাবের অনুসারীরা—যারা হলেন মদীনার অধিবাসী, ইমাম মালিক এবং যারা তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন—তারা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, তিনি বলেছেন: "অলঙ্কারে কোনো জাকাত নেই।" এটি এই বিষয়ের একটি অকাট্য বক্তব্য যে, বৈধ অলঙ্কারে কোনো জাকাত নেই। এই মাযহাবের প্রবক্তারা ইমাম মালিক (রহ.) কর্তৃক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণিত আছার দ্বারাও দলিল পেশ করেন যে: "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ভ্রাতুষ্পুত্রীদের অলঙ্কার পরাতেন, যারা তার তত্ত্বাবধানে এতিম হিসেবে লালিত-পালিত হচ্ছিল। তিনি তাদের অলঙ্কার পরাতেন অথচ সেই অলঙ্কারের জাকাত আদায় করতেন না।" এটিও সেই দলিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা দ্বারা তারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে...

আয়িশা (রাযি.) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের অলঙ্কার পরিধান করাতেন, তা সত্ত্বেও তিনি এই অলঙ্কারের যাকাত আদায় করতেন না। এটি এই কথার প্রমাণ যে, বৈধ অলঙ্কারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা যদি তা ওয়াজিব হতো, তবে সাইয়্যেদাহ আয়িশা (রাযি.)-এর নিকট তা অবিদিত থাকত না এবং তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরিহিত সেই অলঙ্কারের যাকাত আদায় না করে ছেড়ে দিতেন না।

তারা ইমাম মালিক বর্ণিত নাফে' থেকে প্রাপ্ত রেওয়ায়েত দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন যে: "আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) তাঁর কন্যা ও দাসীদের স্বর্ণালঙ্কার পরাতেন—অর্থাৎ তাদের স্বর্ণ পরিধান করাতেন—অতঃপর তিনি তাদের অলঙ্কারের যাকাত প্রদান করতেন না।" আর এই আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) শরীয়ত সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর কন্যাদের যে অলঙ্কার পরিধান করাতেন তাতে যদি যাকাত থাকত, তবে তিনি অবশ্যই সেই যাকাত আদায় করতেন। তারা আবু উবায়েদ বর্ণিত ইবনে উমর (রাযি.) সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি তাঁর কন্যাদের দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিয়ে দিতেন এবং তাদের অলঙ্কারের পরিমাণ চার হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেত, তবুও তাঁরা এর যাকাত দিতেন না।

তদ্রূপ তারা আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি তাঁর কন্যাদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার পরাতেন এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার (মূল্যের) হলেও তার যাকাত দিতেন না। একইভাবে জাবির ও আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারাও দলিল দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের উভয়কে অলঙ্কারের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেছিলেন: "না"। এছাড়াও তারা আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তাঁকে অলঙ্কারের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "আমি কাউকে এটি করতে দেখিনি।" তিনি আরও বলেন: আমি আমার ফুফু আয়িশা (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমি কাউকে এটি করতে দেখিনি, অথচ আমার কাছে বারো বছর ধরে (অলঙ্কার) ছিল, আমি কখনও তার যাকাত আদায় করিনি।"

সুতরাং এই সকল আসার (সাহাবীদের বাণী ও আমল)—অর্থাৎ তারা আসার ও হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন—সাহাবীদের

থেকে বর্ণিত এই সকল আসার একথাই প্রমাণ করে যে, বৈধ অলঙ্কারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ যদি তা ওয়াজিব হতো, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ তা পালনে পিছপা হতেন না, অথচ তাঁরাই ছিলেন শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। আমি বলব: তাঁরা যাকাত আদায়ে পিছপা হননি। এ কারণেই মাযহাবসমূহের উল্লেখ এবং অলঙ্কারের যাকাতের ব্যাপারে তাঁদের দলিলসমূহ বর্ণনার পর আমাদের কাছে আপত্তি ও পর্যালোচনাগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়।

পঞ্চম পাঠ

প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা তাদের বিরোধীদের দলীলসমূহের মোকাবিলায় এবং সেগুলোর খণ্ডন ও দুর্বলতা প্রমাণের বিষয়ে যা বলেছেন তার সারকথা হলো: যখন দলীলসমূহের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তখন সম্ভব হলে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রাধান্য (তারজীহ) নির্ধারণ করতে হয়। আর যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তবে দলীলসমূহের মধ্যে তুলনা করে সবলটিকে গ্রহণ করতে হয় এবং দুর্বলটিকে বর্জন করতে হয়। একইভাবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সবলটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দিতে হয়, এবং এভাবেই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে।

উভয় মাযহাবের মধ্যে সমন্বয় করা—অর্থাৎ যারা অলঙ্কারের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন এবং যারা অলঙ্কারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় বলেন—তাদের বিষয়ে আমি বলব: উভয় মাযহাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমল করা সম্ভব নয়; কারণ বিধানের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিরোধী। তেমনি উভয় পক্ষের দলীলসমূহ সামগ্রিকভাবে শক্তি ও দুর্বলতার দিক থেকে সমপর্যায়ের। ফলে একটি মতকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না। যেহেতু সূক্ষ্ম অর্থগত দিক থেকে প্রাধান্য নিরূপণ করা আমাদের জন্য এই পর্যায়ে কঠিন, এবং সাহাবী, তাবিঈ ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণের যুগেও সামগ্রিকভাবে প্রতিটি মাযহাবের দলীল অনুযায়ী আমল করা হয়েছে, তাই আমরা এই বিষয়ে ফকীহ ও উলামাগণ যা উল্লেখ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকব।

ইমাম শিরাযী আশ-শাফিঈ বলেন: নারীদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত অলঙ্কার এবং পুরুষদের রুপার আংটি সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে: প্রথমটি হলো এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "অলঙ্কারের ওপর কোনো যাকাত নেই"। তাছাড়া যেহেতু এটি ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত বস্তু, তাই এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না; যেমন কাজের পশু—অর্থাৎ সেই উট ও গরু যা মানুষ চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করে, সেগুলোতে কোনো যাকাত নেই। দ্বিতীয় মতটি হলো: এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিঈ আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা (ইস্তিখারা) করে এই মতটিকেই বেছে নিয়েছেন; অর্থাৎ তিনি এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এর কারণ হলো যা বর্ণিত হয়েছে: "ইয়ামানের জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলেন, তার সাথে ছিল তার কন্যা যার হাতে স্বর্ণের দুটি মোটা চুড়ি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন: তুমি কি এগুলোর যাকাত প্রদান করো? সে বলল: না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তুমি কি এটি পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে এগুলোর পরিবর্তে আগুনের দুটি চুড়ি পরিয়ে দেবেন? তখন সে সেগুলো খুলে নবী (সা.)-এর সামনে দিয়ে দিল এবং বলল: এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।" এছাড়া অলঙ্কার মূল্যের শ্রেণিভুক্ত বস্তু, তাই এটি দিরহাম ও দিনারের সদৃশ।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
পঞ্চম পাঠ

ইবনে রুশদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা—"অলঙ্কারে কোনো জাকাত নেই"—উল্লেখ করার পর বলেন: এটি তাদের জন্য দলীল যারা অলঙ্কারের ওপর জাকাত ওয়াজিব মনে করেন না। এছাড়া আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে বর্ণিত সেই নারীর বর্ণনা, যে তার মেয়ের সাথে এসেছিল এবং তার মেয়ের হাতে সোনার মোটা কঙ্কণ ছিল; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি এটার জাকাত দাও?" এই বর্ণনাটি আগে পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় বর্ণনাটিই দুর্বল, বিশেষ করে জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি।

আল-মাওসিলী সোনা ও রূপার জাকাত অধ্যায়ে বলেন: মুদ্রার আকারে হোক, পিণ্ড আকারে হোক, অলঙ্কার হোক বা পাত্র হোক—ব্যবসায়ের নিয়ত থাকুক বা না থাকুক, তাতে জাকাত ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।"** [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪]। এখানে ওয়াজিব হওয়াকে সোনা ও রূপা নামের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, যা আমাদের উল্লিখিত সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান। কারণ ‘কানজ’ বা পুঞ্জীভূত করার উদ্দেশ্য হলো জাকাত প্রদান না করা। জাবের ও ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীস: "যে সম্পদের জাকাত দেওয়া হয় না তা-ই ‘কানজ’ (পুঞ্জীভূত সম্পদ), যদিও তা দৃশ্যমান থাকে। আর যার জাকাত দেওয়া হয় তা ‘কানজ’ নয়, যদিও তা মাটির নিচে প্রোথিত থাকে।"

উম্মে সালামা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি সোনার কিছু অলঙ্কার পরতাম। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি ‘কানজ’ (পুঞ্জীভূত সম্পদ)? তিনি বললেন: যদি তুমি এর জাকাত আদায় করো, তবে তা কানজ নয়।" এর প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: **"আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।"** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই মহিলার হাতে দুটি সোনার কঙ্কণ দেখে বললেন: "তোমরা কি এটি পছন্দ করো যে আল্লাহ তোমাদের আগুনের দুটি কঙ্কণ পরিয়ে দিন? তারা বললেন: না। তিনি বললেন: তবে এগুলোর জাকাত আদায় করো।"

উভয় মাযহাবের দলিল ও বর্ণনাগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করার পর একজন মুকাল্লাফের জন্য যে মতটির প্রতি তার মন প্রশান্ত হয় তা বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ এই বিষয়টি মুসলিমদের অনেক বেশি ভাবিয়ে তোলে। আমরা মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল এবং ওয়াজিব না হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল ও এ বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্যসমূহ উল্লেখ করার পর বলব যে, আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করার পর যে মতের প্রতি তার মন সায় দেয় সে যেন তা-ই গ্রহণ করে; যেমনটি ইমাম শাফেঈ করেছিলেন। ইস্তিখারা করার পর কেউ যদি ইমাম শাফেঈর বক্তব্য অনুযায়ী আমল করার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে সেটিই হবে অধিকতর উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞাত।

চাষাবাদ থেকে যে সব বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হয়:

এরপর আমরা চাষাবাদ থেকে যে সব বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হয় তার আলোচনায় প্রবেশ করছি; অর্থাৎ ভূমি থেকে যা কিছু উৎপাদিত হয়। আমরা বলি, ভূমি থেকে যা উৎপাদিত হয় তা তিন প্রকার: শস্যদানা, শাকসবজি এবং ফলমূল।

ফকীহগণ এই তিন প্রকারের বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা কোনো কোনোটির যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, আবার কোনো কোনোটির ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। প্রত্যেক পক্ষই তাদের নিজ নিজ অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আমরা এই যাকাতের ওপর আলোকপাত করব। প্রথমে শস্যদানার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। আমরা বলব: ফকীহগণ গম এবং যবের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছেন। এখানে 'হিনতাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গম। এটি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত, অর্থাৎ তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে গম ও যবের ওপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন।

এরপর অন্যান্য শস্যদানার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারতম্য ও মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, যা কিছু প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা সংরক্ষণযোগ্য, তার সবকিছুর ওপরই যাকাত ওয়াজিব। আবার অন্য অনেকে ভূমি থেকে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিসের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেন। এজন্য আমরা এ বিষয়ে ফকীহদের দলীলসমূহ উল্লেখ করব—যেমনটি আমরা বলেছি—অর্থাৎ তারা গম ও যবের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়ার পর, কোন কোন শস্যদানায় যাকাত ওয়াজিব হবে সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কিছু ফকীহ বলেছেন যে, শস্যদানার যাকাত মূলত সেই সব শস্যের ওপর ওয়াজিব যা প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সংরক্ষণ করা যায়।

কিছু ফকীহ মনে করেন যে, শস্যদানার যাকাত কেবল সেসব শস্যের ক্ষেত্রে হবে যা প্রধান খাদ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য। অর্থাৎ, কোনো শস্য বা ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য দুটি গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথমত: সেটি প্রধান খাদ্য হতে হবে, অর্থাৎ যা মানুষ আহার করে এবং যার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত: তা সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে, যাতে মানুষ তা সংগ্রহ করে রাখতে পারে এবং সারা বছর তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তারা তাদের এই অভিমতের স্বপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলীল পেশ করেন: "যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করো এবং ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করো; আর অপব্যয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা আল-আন'আম: ১৪১] ।

এই আয়াত থেকে দলীল গ্রহণের পদ্ধতি: মালিকী মাযহাবের আল-কারাফী বলেন: উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, এই বিষয়গুলোতে এটি একটি সাধারণ বিধান; আর সাধারণ বিধানকে সাধারণত একটি সাধারণ কারণ (ইল্লাত) দ্বারা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আর ইমাম মালিকের নিকট এটি হলো সাধারণত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা; কারণ দেহের সুরক্ষার জন্য খাদ্যের সংস্থান করা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কারণ। আর যখন নিয়ামত ব্যাপক হয়, তখন যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তার শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেন ইমাম আল-কারাফী মালিকী মাযহাবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করছেন যে, তা আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে গৃহীত: **"যখন ফলবান হয় তখন তার ফল খাও এবং ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) আদায় কর। আর অপচয় করো না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"** তিনি বলেন: এটি এমন শস্য বা দানা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত যা সাধারণত খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়; কারণ এই জিনিসগুলোতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ থাকে যা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কারণ। আর যখন নিয়ামত ব্যাপক হয়, তখন যাকাত প্রদানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

ওয়াজিব হয়। সুতরাং এটি এই কথার দলীল যে, যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তা ব্যতীত অন্য কিছুতে যাকাত ওয়াজিব নয়।

আর সুন্নাহ থেকে ঐ সকল ফকীহগণ দলীল পেশ করেছেন যারা মনে করেন যে, যাকাত কেবল ঐ সব জিনিসেই ওয়াজিব যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তারা আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: **"শস্যদানা এবং খেজুরে যাকাত নেই যতক্ষণ না তা পাঁচ ওসাক (এক বিশেষ পরিমাপ) পরিমাণ হয়, এবং পাঁচ যুদের (উটের সংখ্যা) কম হলে যাকাত নেই, আর পাঁচ উকিয়ার কম রূপার ক্ষেত্রে যাকাত নেই।"** আর মুহাম্মদ ইবনে রাফে'র বর্ণনায় আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণিত হয়েছে: **"শস্যদানা ও ফলে যাকাত নেই..."** তিনটি নুকতা বিশিষ্ট 'ছা' অক্ষরের সাথে।

আমি বলছি: তারা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, আর তা হলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: **"শস্যদানা ও খেজুরে যাকাত নেই যতক্ষণ না তা পাঁচ ওসাক পরিমাণ হয়।"** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী থেকে দলীল গ্রহণের পদ্ধতি হলো যে, "পাঁচ ওসাক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত শস্যদানা ও ফলফলাদিতে যাকাত নেই" - এই কথাটি সাধারণভাবে সকল শস্য ও ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত হয়। তারা আরও যা দ্বারা দলীল পেশ করেন তা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: **"শাকসবজিতে কোনো যাকাত নেই।"** আর "শাকসবজিতে কোনো যাকাত নেই" এর অর্থ হলো শাকসবজি খাদ্য হিসেবে জমা রাখা হয় না এবং তা দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণও করা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাকসবজির বিপরীত বিষয়গুলোতে যাকাত ওয়াজিব, আর তা হলো ঐ সব বস্তু যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। পরিশেষে, এই হাদীসটি এই কথারই প্রমাণ বহন করে যে, যাকাত কেবল ঐ সব বস্তুর উপর ওয়াজিব যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত হয়।

পঞ্চম পাঠ
সিয়াসাহ শারইয়্যাহ

অন্যান্য ফকীহগণ মনে করেন যে, ভূমি থেকে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিসের ওপর যাকাত ধার্য হবে। এক্ষেত্রে এক প্রকার ও অন্য প্রকারের মধ্যে অথবা খাদ্যযোগ্য ও খাদ্যযোগ্য নয় এমন জিনিসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ঘাস ও জ্বালানি কাঠ ব্যতীত জমিন থেকে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিসের ওপরই যাকাত রয়েছে। তবে যদি ঘাস ও জ্বালানি কাঠ ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এটিই হানাফী মাযহাবের অভিমত।

শস্যদানা সম্পর্কিত ফকীহগণের মতামত এবং কোন কোন শস্যের ওপর যাকাত ফরয হয় আর কোনগুলোর ওপর হয় না তা পর্যালোচনার পর আমরা দেখছি যে, হানাফীগণ ভূমি থেকে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিসের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে মত দিয়েছেন, সেটিই আমাদের নির্বাচিত মত। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর সাধারণ নসসমূহ (দলিলসমূহ) একে সমর্থন করে এবং এটিই যাকাত বিধানের হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। যব ও গম চাষীর নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে আর কমলা, আম বা আপেল বাগানের মালিককে তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে—এটি ইনসাফসম্মত নয়। বর্তমান সময়ে এই শেষোক্ত প্রকারের ফলমূল থেকে মালিকরা প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করছেন যা যব ও গমের সম্পদের তুলনায় অনেক বেশি ও ব্যাপক। তাই রাষ্ট্রের সাধারণ আর্থিক দায়ভার বহনে সকলের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সকল প্রকার ফলের ওপর যাকাত ওয়াজিব করা ইনসাফের দাবি, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো যাকাত।

যাকাতযোগ্য অবশিষ্ট সম্পদ ও উদ্ভাবিত নতুন সম্পদসমূহ

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত:

অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন যে, ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব, চাই তা স্থাবর হোক বা অস্থাবর—অর্থাৎ যা ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করা হয়। কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, কিয়াস ও ইজমা এই ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ প্রদান করে। কিতাব থেকে মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।" [আল-বাকারা: ২৬৭]। ইমাম তাবারী এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন: অর্থাৎ তোমরা তোমাদের উপার্জিত উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে যাকাত প্রদান করো।

তোমরা তোমাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যা উপার্জন করেছ, চাই তা ব্যবসার মাধ্যমে হোক কিংবা শিল্পের মাধ্যমে। আর মুজাহিদ মনে করেন যে, আয়াতে 'উপার্জন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা।

সুন্নাহ থেকে এ প্রসঙ্গে সামুরাহ বিন জুনদুব (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিতেন যেন আমরা বিক্রির জন্য যা প্রস্তুত রাখি তা থেকে সাদাকা (যাকাত) বের করি", অর্থাৎ: ব্যবসার জন্য।

তদুপরি ব্যবসা পণ্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কিয়াসের (যৌক্তিক তুলনা) মাধ্যমেও প্রমাণিত; কারণ ব্যবসা পণ্য এমন সম্পদ যা প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাখা হয়। ফলে এটি সেই তিন প্রকারের সম্পদের সাদৃশ্যপূর্ণ হয় যাতে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব, যেমন: ফসল, গবাদি পশু এবং সোনা ও রুপা। ফসল উৎপাদনের আধিক্যের দিক থেকে এটি ফসলের অনুরূপ, আর বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে সংখ্যাধিক্য ঘটার দিক থেকে এটি গবাদি পশুর অনুরূপ। এই কারণেই আমরা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং এটিই অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত যে, ব্যবসা পণ্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব।

রিকায (গুপ্তধন) এবং খনিজ সম্পদ:

রিকায হলো জাহেলী যুগের প্রাচীনদের দ্বারা জমিনে প্রোথিত বিভিন্ন প্রকারের ধন-সম্পদ। ফকীহগণ মনে করেন যে এতে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) প্রদেয়। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি এটি খুঁজে পায়, তবে কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন এতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে; কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "রিকাযের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে।" আর জমিনে পুঁতে রাখা সম্পদ সর্বসম্মতভাবে 'রিকায'; কারণ এটি সেখানে গ্রথিত থাকে।

খনিজ সম্পদের (মা'দান) ক্ষেত্রে কেউ কেউ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, জমিন থেকে বের হওয়া মূল্যবান প্রতিটি বস্তু যা জমিনের মধ্যে মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি হয়। খনিজ সম্পদে প্রদেয় পরিমাণের ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন এতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব, আবার অন্যেরা মনে করেন এতে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (২.৫%) ওয়াজিব।

কোন ধরণের খনিজ সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, তা নির্ধারণেও ফকীহগণ নিম্নোক্তভাবে মতভেদ করেছেন:

শাফেঈগণ একে সোনা ও রুপার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আর এগুলো ছাড়া অন্য সম্পদ যেমন লোহা, তামা ও সিসার ওপর কোনো যাকাত নেই।

পৃষ্ঠা 62

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চম পাঠ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মনে করেন যে, পৃথিবী থেকে উত্তোলিত সকল খনিজ পদার্থ যা আগুনে গলে ছাঁচে ঢালাইযোগ্য হয়, তাতে হক (জাকাত) ওয়াজিব। আর তরল খনিজ বা এমন কঠিন খনিজ যা ছাঁচে ঢালাইযোগ্য নয়, তাদের নিকট তাতে কোনো কিছু (ওয়াজিব) নেই।

হাম্বলিগণ মনে করেন যে, খনিজ পদার্থের মধ্যে ছাঁচে ঢালাইযোগ্য এবং অ-ঢালাইযোগ্যর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যে খনিজের সাথে (জাকাত) ওয়াজিব হওয়া সংশ্লিষ্ট, তা হলো পৃথিবী থেকে নির্গত এমন প্রতিটি বস্তু যা সেখানে অন্য বস্তু থেকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং যার মূল্য রয়েছে; চাই তা কঠিন হোক যেমন লোহা, তামা ও সীসা, অথবা তরল খনিজ হোক যেমন নাফত অর্থাৎ পেট্রোল।

আমরা মনে করি যে, পৃথিবী থেকে নির্গত সকল প্রকার খনিজের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে হাম্বলিদের অভিমতটিই গ্রহণের অধিক যোগ্য এবং এটিই আমরা পছন্দ করি। কেননা এটি কঠিন ও তরল খনিজের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না, তেমনি যা আগুনে গলে ছাঁচে ঢালা যায় এবং যা ঢালা যায় না তার মাঝেও কোনো বিভেদ করে না। এটি লোহা ও সীসা এবং পেট্রোলের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না, কারণ মানুষের নিকট এ সবগুলোই মূল্যবান সম্পদ। তাই পেট্রোলের মতো খনিজকে জাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ এবং ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। অথচ বর্তমান যুগে এটি মানুষের মালিকানাধীন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছে এবং এটি তাদের জন্য এমন আয় বয়ে নিয়ে আসে যা সীসার মতো খনিজ থেকে প্রাপ্ত আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং তরল খনিজের ওপর জাকাত ধার্য করা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবশ্যক। অতএব হাম্বলিদের মতটি জাকাতের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপকতা পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জনের দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে বিভিন্ন প্রকার খনিজের মালিকদের মাঝে পূর্ণ সমতা অর্জিত হয়, যখনই জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পূরণ হয়।

সমুদ্র থেকে উত্তোলিত বস্তুর জাকাত:

সমুদ্র থেকে উত্তোলিত মূল্যবান রত্ন যেমন মুক্তা ও প্রবাল এবং সুগন্ধি আম্বর-এর ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করেন যে, এগুলো যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না রাখা হয় তবে এতে কোনো কিছু (জাকাত) নেই। কিন্তু যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয় তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে—

পৃষ্ঠা 63

শরয়ি রাজনীতি

সমুদ্র থেকে যা আহরিত হয় তাতে একটি ওয়াজিব হক (প্রাপ্য) রয়েছে। আর এই ওয়াজিবের পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে: তা কি রিকাজ (গুপ্তধন) এর ন্যায় এক-পঞ্চমাংশ? নাকি তা শস্যের ন্যায় এক-দশমাংশ? অথবা তা দিরহাম ও দিনারের ন্যায় এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ?

আলেমদের তিনটি বক্তব্য রয়েছে যা আবু উবাইদ তার 'আল-আমওয়াল' কিতাবের ৪৩৩ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ করেছেন। আর আমরা কারও কারও মতকে প্রাধান্য দিচ্ছি যে, এই ওয়াজিবের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শের অধীন হওয়া উচিত; কারণ শরয়ি বিধান শস্য ও ফলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব পরিমাণের মাঝে তারতম্য করেছে চাষাবাদে পানি সেচ ও পরিশ্রমের ভিন্নতার কারণে। ফলে সেচের ক্ষেত্রে যদি যন্ত্রের সাহায্যে পানি দেওয়া হয় তবে তা এক-দশমাংশের অর্ধেক নির্ধারণ করা হয়েছে, আর যদি যন্ত্র ছাড়া পানি দেওয়া হয় তবে তা এক-দশমাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে সমুদ্র থেকে যা আহরিত হয় তার ক্ষেত্রেও ওয়াজিবের পরিমাণ তা আহরণের ব্যয় ও পরিশ্রমের ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন হওয়া উচিত। সুতরাং যদি ব্যয় ও পরিশ্রম কম হয় তবে তা এক-পঞ্চমাংশ হবে, আর যদি ব্যয় ও পরিশ্রম বৃদ্ধি পায় তবে তা এক-দশমাংশ হবে।

আমরা মনে করি যে, গ্রহণযোগ্য মতটি হলো সমুদ্র থেকে আহরিত প্রতিটি বস্তুর ওপর হক (যাকাত) আবশ্যক করা, আর আমরা এটিকেই বেছে নিয়েছি। কারণ কীভাবে সমুদ্র থেকে আহরিত অতি উচ্চমূল্যের মুক্তার ওপর থেকে এই ওয়াজিব হকটি মাফ করে দেওয়া সম্ভব, যেখানে একই সময়ে সমুদ্র থেকে আহরিত মূল্যবান রত্নরাজির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের কৃষি পণ্যের ওপর যাকাত আবশ্যক করা হচ্ছে? সুতরাং এই মতটি পূর্ণাঙ্গভাবে যাকাতের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও আর্থিক ব্যাপকতা নিশ্চিত করে এবং ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা অর্জন করে।

এছাড়া সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও তারা নিম্নোক্তভাবে মতভেদ করেছেন:

কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন যে, এই মাছের ওপর কোনো যাকাত নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের ওপর ওয়াজিব হক রয়েছে যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়, তারা এই বিষয়ে দলিল পেশ করেছেন যে...

এটি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর কর্মকর্তার নিকট লিখেছিলেন যেন মাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ না করা হয় যতক্ষণ না তার মূল্য দুইশত দিরহামে পৌঁছে। যখন তা দুইশত দিরহামে পৌঁছাবে, তখন যেন তা থেকে জাকাত গ্রহণ করা হয়। এই বক্তব্যগুলো আবু উবাইদ রচিত ‘কিতাবুল আমওয়াল’-এর ৪৩৪ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে।

নির্ভরযোগ্য মত:

আমরা মনে করি যে, নির্ভরযোগ্য মত হলো সেটিই যা মাছের ওপর জাকাত আবশ্যক করে এবং এটিই আমরা গ্রহণ করেছি। কারণ আহরিত মাছের পরিমাণ বর্তমানে অনেক বেশি হতে পারে যা বিপুল পরিমাণ অর্থের সমতুল্য। বর্তমান যুগে মৎস্য শিকার এমন সব বড় বড় কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালিত হয় যারা এর জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিকতম সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত। তাই ন্যায়বিচারের দাবি হলো, সমুদ্র থেকে যা আহরণ করা হয় তা যখন নেসাব পরিমাণ হবে, তখন তাকে তার ওপর ধার্যকৃত হক বা পাওনা থেকে অব্যাহতি না দেওয়া। এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা

প্রতিষ্ঠিত হবে।

বর্তমান যুগে উদ্ভূত সম্পদের জাকাত:

জাকাতের বস্তুগত ব্যাপকতার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হলো ক্রমবর্ধমান সম্পদসমূহ যা এই যুগে নতুনভাবে উদ্ভূত হয়েছে: সেগুলোর ওপর কি জাকাত ধার্য করা হবে নাকি হবে না? বর্তমান সময়ে এমন কিছু কার্যক্রমের ধরণ ও বিনিয়োগের পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ছিল না। বর্তমানে যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানি এবং ব্যাংকসমূহ আত্মপ্রকাশ করেছে। বাণিজ্যিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের উন্নতি ঘটেছে এবং কর্মলব্ধ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এর পাশাপাশি আবাসন খাতে বিনিয়োগ থেকেও উচ্চ আয় আসছে। ফলে কিছু সম্পদ এখন আর জাকাত থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নেই, যেমন প্রাথমিক শিল্পের সরঞ্জামাদি ও বসবাসের জন্য নির্ধারিত ঘরবাড়ি। কারণ বর্তমানে কলকারখানা ও শিল্পের সরঞ্জামসমূহ নিজেই ক্রমবর্ধমান পুঁজিতে পরিণত হয়েছে, যা সেগুলোকে জাকাতের আওতাভুক্ত করাকে আবশ্যক করে। এই অর্থেই শেখ মুহাম্মদ বলেন...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চম পাঠ

আবু জাহরা বলেন: যাকাত ফরয হওয়ার পেছনের যে কারণ (ইল্লাত) যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিধানটি নির্ভরশীল, তা হলো প্রকৃতপক্ষে বর্ধনশীল বা বর্ধনক্ষম সম্পদ। অর্থাৎ: সম্পদ বৃদ্ধি করার সামর্থ্য থাকা, যদিও বাস্তবে তা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা না হয়। আর এই কারণটি বিভিন্ন স্থানে ফকীহগণের যুক্তি-বিশ্লেষণ এবং যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় সেগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

তারপর তিনি বলেন: অতএব বর্তমান যুগে যদি এমন কোনো বর্ধনশীল সম্পদ উদ্ভাবিত হয়, যার কিছু অংশ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে বর্ধনশীল ছিল না, এমনকি সাহাবায়ে কেরাম কিংবা মুজতাহিদ ইমামগণের যুগেও ছিল না, তবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিধানের জন্য ফকীহগণ যে কারণটি (ইল্লাত) উদ্ভাবন করেছেন, তা প্রয়োগ করে আমাদের জন্য কি সেই সম্পদে যাকাত নির্ধারণ করা বৈধ হবে? যদি আমরা তা করি, তবে আমরা শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে কোনো অভিনব বিদআত নিয়ে আসব না। এর উত্তর হলো, এটি আমাদের জন্য বৈধ এবং এতে আমরা নতুন কোনো ইজতিহাদ করছি না, বরং আমরা কেবল কিয়াসের ইল্লাতটি প্রয়োগ করছি। এটি ১৩৮৫ হিজরী (১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে 'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি'র দ্বিতীয় সম্মেলনের গবেষণাপত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত শায়খ আবু জাহরার একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া, যার শিরোনাম ছিল "যাকাত", পৃষ্ঠা ১৭৯ এবং পরবর্তী অংশ।

অতঃপর শায়খ বলেন: যাকাত সংক্রান্ত বিশেষ বিধানগুলোকে সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা যেখানে এই কারণটি (ইল্লাত) পাওয়া যায়, তা একটি সঠিক বিষয়ের দিকে ধাবিত করে এবং একটি জুলুমপূর্ণ বিষয়কে প্রতিহত করে। কারণ এটি মানুষের মাঝে ইনসাফপূর্ণ সমতা নিয়ে আসে। সুতরাং এমন হতে পারে না যে, কয়েক বিঘা জমির ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, অথচ যে ব্যক্তি বিলাসবহুল অট্টালিকার মালিক—যা থেকে প্রচুর আয় হয় যা কয়েক ডজন বিঘা জমির আয়ের সমান—তাকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। অথবা যার বিশাল পুঁজি রয়েছে যা তিনি কোনো কলকারখানায় বিনিয়োগ করেছেন এবং সেখান থেকে অনেক মুনাফা অর্জন করছেন, তাকেও অব্যাহতি দেওয়া হবে। আর যে বিষয়টি যালিম ও বাতিল তা হলো—সেই সকল সম্পদ যা থেকে প্রচুর আয় হয় কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তা ছিল না, সেগুলোর ওপর যাকাত আরোপ না করা। এর ফলে মানুষ যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় তা থেকে পলায়ন করে এমন সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়বে যাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। ফলে উপার্জনের কিছু পথে সম্পদের ব্যাপক আধিক্য ঘটবে এবং অন্য পথে স্বল্পতা দেখা দেবে, অথচ উম্মাহর

হয়তো সেটিরই সবচেয়ে বেশি ও তীব্র প্রয়োজন ছিল।

এই প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলোর আলোকে আমরা বলি: যে কোনো সম্পদের মালিকের ক্ষেত্রে যখন সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং ফকীহগণের বর্ণিত শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তখন তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে; যদিও এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সরাসরি কোনো নস বা পাঠ বর্ণিত না হয়ে থাকে।

পঞ্চম পাঠ

ইসলামী ফিকহশাস্ত্রে কিয়াস একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় এবং কিয়াসের দাবি বাস্তবায়ন করা সকল যুগে ও সময়ে স্বীকৃত। এটি ইজতিহাদের এমন একটি প্রকার যা কোনো যুগেই অনুপস্থিত থাকা সমীচীন নয়, যাতে করে শারঈ দলীলসমূহের অন্তর্নিহিত কারণ (ইল্লাত) বৈজ্ঞানিক ও সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

বর্তমান যুগে উদ্ভাবিত কিছু সম্পদ:

প্রথমত: কাগজের মুদ্রা: কাগজের মুদ্রা কেবল আধুনিক যুগেই পরিচিতি লাভ করেছে, যেখানে এটি মানুষের মাঝে লেনদেনের প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। মানুষের জীবন থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কাগজের মুদ্রাই এখন সম্পদ, বিনিময় ও পণ্যের মূল্যের মূল আধারে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমেই বেতন ও মজুরি প্রদান করা হয় এবং একজন ব্যক্তির কাছে এর পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেই তার সচ্ছলতা বিবেচনা করা হয়। লেনদেন ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমপর্যায়ের। এই বিবেচনায় এটি একটি বর্ধনশীল অথবা প্রবৃদ্ধির যোগ্য সম্পদ, ঠিক যেমনটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের বৈশিষ্ট্য।

এর সারকথা হলো, কাগজের মুদ্রার ওপর যাকাত ফরয। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শেখ কারযাভীর ‘ফিকহুয যাকাত’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো দেখা যেতে পারে। কাগজের মুদ্রার যাকাতের নিসাব স্বর্ণের মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে; কারণ এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্ধারিত মানদণ্ড এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পরবর্তী সময়ে যাকাত সংগ্রহ করা হতো। কাগজের মুদ্রায় যাকাত ওয়াজিব করার মাধ্যমে যাকাতের আর্থিক ব্যাপকতা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং এর ফলে রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক বোঝা বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা অর্জিত হয়।

দ্বিতীয়ত: উট, গরু, ছাগল ও ঘোড়া ব্যতীত অন্যান্য চারণশীল পশু: যদি এমন ঘটে যে মানুষ নতুন কোনো প্রকারের প্রাণী খুঁজে পায় বা উদ্ভাবন করে যা তারা লালন-পালন করে মোটাতাজা করে এবং তা থেকে প্রবৃদ্ধি ও উপার্জনের পথ তৈরি করে, তবে সেগুলো কি উট, গরু ও ছাগলের মতো যাকাতের আওতাভুক্ত হবে কি না? এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যা পূর্বে প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হতো না, বরং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো, যেমন খচ্চর; কিন্তু পরবর্তীতে তা প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন শুরু হয়েছে।

সামাজিক গবেষণা চক্রের আলেমগণ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। আরব রাষ্ট্রসমূহের লিগ থেকে উদ্ভূত সামাজিক গবেষণা চক্র বলেছে: সামাজিক গবেষণা চক্র এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছে এবং ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তথ্য থেকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা হলো ভেড়ার ওপর ঘোড়াকে কিয়াস (তুলনা) করা; যেখানে তিনি বলেছিলেন: "আমরা কি প্রতি চল্লিশটি ভেড়ার জন্য একটি ভেড়া গ্রহণ করব আর ঘোড়া থেকে কিছুই নেব না?" ফলে তিনি ঘোড়ার ওপর দিনার ধার্য করেছিলেন। আমি বলব: তারা এই বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, জাকাতের ক্ষেত্রে কিয়াস বা অনুমান আমাদের জন্য বৈধ। তবে তারা বলেছেন যে, ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত সংবাদটি আমাদের জন্য জাকাতের ক্ষেত্রে কিয়াসের বৈধতা দেয় না, কারণ এর মূল পাঠসমূহ (নাস) কারণহীন নয়, বরং সেগুলো এমন পাঠ যার কারণ (ইল্লত) বিদ্যমান এবং তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ঘোড়ার ওপর জাকাত আবশ্যক করেছিলেন যাতে ‘বৃদ্ধি’ বা প্রবৃদ্ধির কারণটি বাস্তবায়িত হয়; এবং কিয়াসের ক্ষেত্রে ফকিহদের প্রধান আবু হানিফা তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর তারা বলেন: যদি ইমাম ওমর ‘বৃদ্ধি’ বা প্রবৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে গণ্য করে থাকেন এবং আবু হানিফা তাঁকে অনুসরণ করেন, তবে এই পদ্ধতির আলোকে এ কথা বলা সঠিক হবে যে: ওই সকল প্রাণীর ওপর জাকাত ওয়াজিব যা প্রবৃদ্ধির জন্য লালন-পালন করা হয় এবং যা উন্মুক্ত চারণভূমিতে বিচরণ করে এবং নিসাব পরিমাণ হয়—যার মূল্য দশ মিথকাল স্বর্ণের সমপরিমাণ—তবে তাতে জাকাতের পরিমাণ হবে দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (২.৫%)। (আরব রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক গবেষণা চক্র, পৃষ্ঠা ২৪৬ এবং পরবর্তী)।

আমরা মনে করি যে, প্রবৃদ্ধি ও উপার্জনের জন্য পালিত সকল প্রাণীর ওপর জাকাত ওয়াজিব করাটা জাকাতের ক্ষেত্রে আর্থিক সামষ্টিকতার লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জনে সহায়ক। ফলে বর্ধনশীল সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের মধ্যে পার্থক্যের কোনো অবকাশ থাকে না। এর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ও উপার্জনের জন্য লালিত সম্পদের মালিকদের মধ্যে পূর্ণ সমতা অর্জিত হয় এবং রাষ্ট্রের সাধারণ আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ইনসাফ নিশ্চিত হয়।

তৃতীয়: কল-কারখানা এবং এগুলোর জাকাতের বিধান:

প্রাচীন ফকিহগণ প্রাথমিক শিল্পের সরঞ্জাম যেমন কাঠমিস্ত্রির যন্ত্র বা কামারের যন্ত্রপাতির ওপর জাকাত অব্যাহতি দিয়েছেন; কারণ এই সম্পদগুলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো স্বয়ং বর্ধনশীল সম্পদ নয়।

স্বভাবগতভাবে বা সুপ্ত ক্ষমতার মাধ্যমে নয়; বরং বর্তমান যুগে এমন কিছু ক্রমবর্ধমান সম্পদ প্রকাশ পেয়েছে যা ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবনের যুগে ক্রমবর্ধমান ও বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ হিসেবে পরিচিত ছিল না। আর সেগুলো হলো শিল্পের যন্ত্রপাতি, যা বিনিয়োগের জন্য মূলধন হিসেবে বিবেচিত এবং এর মালিকের নিকট তা বিনিয়োগের মাধ্যম। যেমন কোনো বড় কারখানার মালিক, যিনি সেগুলো পরিচালনার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন; তার বিনিয়োগের মূলধন হলো সেই শিল্প-যন্ত্রপাতিগুলো। এই বিবেচনায় এগুলোকে বর্ধনশীল সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়; কারণ এই যন্ত্রগুলো থেকেই লভ্যাংশ অর্জিত হয়। সুতরাং এগুলোকে সেই কামারের যন্ত্রপাতির মতো গণ্য করা হবে না যে নিজ হাতে কাজ করে, কিংবা সেই কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতির মতোও নয় যে নিজ হাতে কাজ করে, ইত্যাদি। এই কারণেই আধুনিক আলেমগণ মনে করেন যে, এই সম্পদগুলোর উপর জাকাত আবশ্যক, যেহেতু এগুলো বর্ধনশীল সম্পদ এবং এমন কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী নয় যা দ্বারা কেবল ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানো হয়। এ বিষয়ে সামাজিক গবেষণা চক্রের ফকিহগণ বলেন:

যদি পূর্ববর্তী যুগের ফকিহগণ তাদের সময়ে শিল্পের যন্ত্রপাতির উপর জাকাত ধার্য না করে থাকেন, তবে তা এই কারণে যে, তখন সেগুলো ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের যন্ত্রপাতি যা কারিগরের দক্ষতার মাধ্যমে শিল্প ও উৎপাদনের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ছিল না। ফলে সেগুলো উৎপাদনশীল বর্ধনশীল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত ছিল না; বরং উৎপাদন ছিল মূলত শ্রমিকের শ্রমের ফল। কিন্তু বর্তমানে কারখানাগুলো নিজেই শিল্পের যন্ত্রপাতি হিসেবে বিবেচিত এবং এর ক্রমবর্ধমান মূলধন। এই কারণেই আমরা বলি: একজন কারিগর যে শিল্পের যন্ত্রপাতির মালিক, যেমন একজন নাপিতের যন্ত্রপাতি যা দিয়ে সে নিজ হাতে কাজ করে, সেগুলো জাকাত থেকে মুক্ত; কারণ এগুলো তার নিকট মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত সামগ্রী হিসেবে গণ্য। পক্ষান্তরে কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে জাকাত আবশ্যক হবে। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, এটি ফকিহদের বক্তব্যের পরিপন্থী; কারণ তারা এ সম্পর্কে কোনো বিধান দেননি যেহেতু তারা এগুলো দেখেননি। যদি তারা এগুলো দেখতেন তবে আমাদের মতোই বলতেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমরা তাদের বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হইনি, বরং আমরা তাদের ফিকহে উদ্ভাবিত বিধানের ভিত্তি (মানাত) প্রয়োগ করছি। (দ্রষ্টব্য: আরব রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক গবেষণা চক্র, পৃষ্ঠা ২৪১ এবং পরবর্তী)।

ইসলামি গবেষণা একাডেমির দ্বিতীয় সম্মেলনের কারখানার জাকাত সংক্রান্ত তৃতীয় সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে:

---

১. বাণিজ্যিক ব্যবহারের ইমারত, কারখানা, জাহাজ, উড়োজাহাজ এবং এই জাতীয় বস্তুসমূহের মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। বরং নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তে এগুলোর নিট আয়ের ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়।

২. বছর শেষে নিট আয়ের ওপর প্রদেয় জাকাতের হার হলো আড়াই শতাংশ (এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ)।
(ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির দ্বিতীয় সম্মেলন, পৃষ্ঠা ৪০৩, আদ-দারুল কাওমিয়্যাহ লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশর, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।)

আমরা মনে করি যে, কল-কারখানার মাধ্যমে পরিচালিত অর্থের ওপর জাকাত ওয়াজিব করা জাকাতের আর্থিক ব্যাপকতাকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করে। কারণ, কল-কারখানার মালিকদের সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ—যা তাদের প্রচুর মুনাফা দিচ্ছে—জাকাতের আওতার বাইরে রাখা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী; অথচ একই সময়ে কল-কারখানার তুলনায় কম আর্থিক মূল্যের কৃষিজাত পণ্যের নিসাবের অধিকারী ব্যক্তি জাকাতের আওতাভুক্ত হচ্ছে। সুতরাং, জাকাত ওয়াজিব করার এই বিষয়টি রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে।

চতুর্থ: ইমারতসমূহ এবং সেগুলোর জাকাতের বিধান:

প্রাচীন ফকিহগণ ঘরবাড়ির ওপর জাকাত আরোপের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেননি; কারণ তাঁদের যুগে ঘরবাড়ি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো না, বরং তা কেবল ব্যক্তিগত বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাই তাঁরা এগুলোকে মৌলিক প্রয়োজনের (হাওয়ায়েজে আসলিয়্যাহ) অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করতেন এবং তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিচারে এটিই ছিল সঙ্গত। কিন্তু বর্তমানে প্রবৃদ্ধি ও মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ও অট্টালিকা নির্মাণ করা হচ্ছে এবং এগুলো থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হচ্ছে। তাই এগুলোর আয়ের ওপর জাকাত ধার্য করা আবশ্যক। কেননা যে কারণে সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ করা হয়েছে—অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি বা উৎপাদনশীলতা—তা এখানে বিদ্যমান। বিশেষ করে বর্তমান যুগে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আবাসন খাতে অর্থ বিনিয়োগ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে, যা থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়।

মালিকের জন্য। আয় উপার্জনে ব্যবহৃত গৃহ তথা অট্টালিকাগুলোকে যাকাতের অন্তর্ভুক্ত করার অভিমতটি প্রাচীন ফকীহগণের বক্তব্যের বিরোধী নয় যখন তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, বাসগৃহে কোনো যাকাত নেই; কারণ তাঁদের যুগে ঘরবাড়ি খুব সামান্যই আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো, বরং সেগুলো ছিল মৌলিক প্রয়োজনে। তাই তাঁরা বিরল বিষয়টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি; কেননা বিধান অধিকাংশ ও প্রচলিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়, আর শরীয়তে বিরল বিষয়ের কোনো স্বতন্ত্র বিধান নেই। বরং ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর কিছু দোকান থেকে আয় আসত যা তিনি ভাড়া দিতেন। তিনি সেই আয়ের যাকাত বের করতেন, যদিও তা ছাড়া তাঁর জীবিকার অন্য কোনো উৎস ছিল না। যখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন: "আমি এ ক্ষেত্রে সাওয়াদ ভূমির ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাবের অভিমতের দিকে গিয়েছি, কেননা তিনি তা থেকে যাকাত গ্রহণ করতেন।"

সামাজিক গবেষণা চক্র দালানকোঠার যাকাতকে শস্য ও ফলের যাকাতের সাথে কিয়াস করা সংগত মনে করেছে। কেননা এই দুটির প্রতিটিই এমন এক স্থায়ী মূল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত যা থেকে আয় আসে। ফলে এর আয়ের ওপর দায়বদ্ধতার ধরণ অনুযায়ী ৫% থেকে ১০% হারে যাকাত ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে আরব রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক গবেষণা চক্রের ২৪১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো দেখা যেতে পারে।

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির দ্বিতীয় সম্মেলনের তৃতীয় সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনিয়োগকৃত অট্টালিকার মূল কাঠামোর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়, বরং নেসাব পূর্ণ হওয়া এবং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তে তার নিট মুনাফার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্মিত অট্টালিকাগুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব করার মাধ্যমে যাকাতের আর্থিক ব্যাপকতা সর্বোত্তমভাবে বাস্তবায়িত হয়। কেননা এটি কোনোভাবেই ন্যায়বিচার হতে পারে না যে, যে ব্যক্তি জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করবে সে যাকাতের আওতাভুক্ত হবে, আর যে অট্টালিকায় বিনিয়োগ করবে সে অব্যাহতি পাবে। এটি মূলত দুটি সদৃশ বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়ার নামান্তর, আর তা হলো জমিতে বিনিয়োগ এবং অট্টালিকায় বিনিয়োগ। নিঃসন্দেহে এটি মুকাল্লাফ বা দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, বিনিয়োগকৃত অট্টালিকার ওপর যাকাত ওয়াজিব করা সেই অবহেলিত সমতা নিশ্চিত করে।

শারয়ী রাজনীতি

পঞ্চম পাঠ

পঞ্চম: আর্থিক সিকিউরিটিজ এবং এগুলোর জাকাতের বিধান:

শিল্প ও বাণিজ্যিক বিবর্তন মূলধনের একটি নতুন ধরন পরিচিত করেছে যা শেয়ার ও বন্ড নামে পরিচিত। এগুলো এমন কিছু আর্থিক দলিল যার ওপর ভিত্তি করে বিশেষ বাজারে বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। এই দলিলগুলোকে অর্থনীতিতে "অস্থাবর সম্পদ" বলা হয়। এগুলোর আয়ের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয় যাকে অস্থাবর সম্পদের আয়ের ওপর ধার্যকৃত কর বলা হয়। সম্পদের প্রবৃদ্ধির এই রূপটি প্রাচীন ফকিহদের যুগে বিদ্যমান ছিল না। তবে আধুনিক কালের কিছু ফকিহ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন এই বিবেচনায় যে, এগুলো বর্তমান যুগে প্রবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন সম্পদ। ফলে এগুলোতে জাকাত ওয়াজিব হবে। বিষয়টি আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি:

প্রথমত: শেয়ার: এর স্বরূপটি সংক্ষেপে এই যে, কোনো ব্যক্তি একটি কোম্পানির মূলধনের অংশবিশেষের মালিকানা লাভ করে যার মূলধন শেয়ারে বিভক্ত। বছরের শেষে লাভ-ক্ষতির ফলাফলের ভিত্তিতে তার শেয়ারের লভ্যাংশ নির্ধারিত হয়। ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে এটি একটি বৈধ পদ্ধতি।

এ বিষয়ে আলেমদের অভিমত: সমাজবিজ্ঞানীদের একটি দল মনে করেন যে, শেয়ার যদি ব্যবসা ও উপার্জনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়, তবে তা ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পণ্যের মতো করে এগুলোর জাকাত প্রদান করা হবে। কিন্তু যদি শেয়ারগুলো মালিকানায় রাখা এবং এর লভ্যাংশ ভোগ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়—ব্যবসা করার জন্য নয়, তবে কোম্পানিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান হোক বা অন্য কিছু, এ বিষয়ে সংগতিপূর্ণ অভিমত রয়েছে। এই মতামতে দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে:

প্রথম অবস্থা: শেয়ারগুলো ব্যবসার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হবে, ফলে সেগুলো শেয়ার বাজারে পুনরায় বিক্রয় ও ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে কেনা হবে। এমতাবস্থায় বছর শেষে এগুলোর বর্তমান মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে, যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

দ্বিতীয় অবস্থা: এই শেয়ারগুলো বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মালিকানায় রাখা, ফলে তা বার্ষিক মুনাফা প্রদান করে। এই অবস্থায় কোম্পানির ওপর ধার্যকৃত যাকাতই শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ত: বন্ডসমূহ: এই পদ্ধতির সারকথা হলো, কোনো স্বাভাবিক বা আইনি ব্যক্তি অপর কোনো স্বাভাবিক বা আইনি ব্যক্তিকে একটি লিখিত দলিলের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রদান করবে এই শর্তে যে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক সুদ গ্রহণ করবে; ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ ব্যবহার করে লাভ করুক বা লোকসান, তা বিবেচনা করা হবে না। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটিই হলো সুদের চিত্র, যেখানে লাভ বা লোকসানের তোয়াক্কা না করেই সুদ নির্ধারণ করা হয়। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, অনেক আলেম এই বন্ডগুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন। এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মদ আবু জাহরা তাঁর ‘যাকাত’ শীর্ষক গবেষণাপত্রে—যা দ্বিতীয় ইসলামী গবেষণা সম্মেলনে (পৃষ্ঠা ১৮৪ এবং পরবর্তী) উপস্থাপিত হয়েছিল—বলেছেন: কেউ বলতে পারেন যে, বন্ড থেকে প্রাপ্ত সুদ তো অপবিত্র সম্পদ; কারণ তা সুদ, সুতরাং তা থেকে কীভাবে যাকাত নেওয়া হবে? এর উত্তরে আমরা বলি, যদি আমরা একে যাকাত থেকে অব্যাহতি দিই, তবে তা মানুষকে শেয়ারের পরিবর্তে বন্ড সংগ্রহে প্রলুব্ধ করবে। এর ফলে মানুষ হালাল ত্যাগ করে হারামের দিকে ধাবিত হবে। যেহেতু অপবিত্র সম্পদ তার মালিকের অজ্ঞাতসারে সদকার খাতেই ব্যয় করতে হয়, সেহেতু উপার্জনের অপবিত্রতা একে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পরিবর্তে বরং সদকা প্রদানেরই দাবি রাখে।

শায়খ মাহমুদ শালতুত এ প্রসঙ্গে বলেন: যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, ইসলামী শরীয়ত সেটির ওপরও কর বা দায়ভার আরোপের বিষয়টি স্বীকার করে। কারণ হারাম উপার্জনের পরিণতি হলো সদকা। মূলনীতি হলো, বিধান লঙ্ঘনকারী যেন তার লঙ্ঘনের কারণে লাভবান না হয়। সুতরাং তাকে দায়ভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া তাকে হালাল পথ অবলম্বনকারীর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দেবে। অথচ শরীয়ত ক্ষতির বিনিময়ে ক্ষতি দূর করাকে সমর্থন করে না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার ও জনস্বার্থে অংশগ্রহণ না করাও একটি ক্ষতি, যখন তাকে তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এটি শায়খ মাহমুদ শালতুতের ‘আল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থের ৬২০ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

সামাজিক শিক্ষা চক্রের (Social Studies Circles) প্রতিবেদনে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ: নিশ্চয়ই এই বন্ডগুলো (সিন্দাত) বর্তমানে একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই যদি আমরা সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হারাম উপাদানের কারণে সেগুলোকে জাকাত থেকে অব্যাহতি দেই, তবে মানুষ সেগুলো কেনার প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে এবং তা এই লেনদেনে আরও গভীরে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করবে। ফলে এটি হারামের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক হবে, তা নির্মূলকারী হবে না। তাছাড়া, অসৎ উপার্জন (খবীস উপার্জন) সদকাহ হিসেবে ব্যয় করা নিষিদ্ধ নয়। (আরব লীগের সামাজিক শিক্ষা চক্র, পৃষ্ঠা ৩৭৩ এবং পরবর্তী)।

ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাভী বন্ডের বিষয়ে মনে করেন যে, এগুলো বৃদ্ধি পায় এবং পাওনাদারের জন্য মুনাফা বয়ে আনে, যদিও তা নিষিদ্ধ। এই মুনাফা নিষিদ্ধ হওয়া বন্ডের মালিককে জাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ হতে পারে না; কারণ হারামে লিপ্ত হওয়া তার মালিককে অন্যের তুলনায় বিশেষ কোনো মর্যাদা দান করে না। এরপর তিনি বলেন: এই কারণেই ফকীহগণ হারাম অলঙ্কারের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, অথচ তারা বৈধ অলঙ্কারের ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। (শেখ কারজাভীর 'ফিকহুজ জাকাত', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৭ এবং পরবর্তী)।

এগুলোই সেইসব ফকীহদের বক্তব্য যারা বন্ডের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষপাতি। এ বিষয়ে আলেমগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা প্রচলিত কর আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা এই বিধান দেয় যে, আয়ের বৈধতা বা অবৈধতা বিবেচ্য নয়। যদি করদাতার কোনো অবৈধ আয় অর্জিত হয়, তবে তা করের আওতাভুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি মাদক ব্যবসা করে এবং এর মাধ্যমে আয় করে, তবে আয়ের বৈধতা বিবেচনা ছাড়াই সেই আয় বাণিজ্যিক ও শিল্প মুনাফা করের আওতাভুক্ত হবে।

এই বন্ডগুলোর জাকাত আদায়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে কেউ কেউ মনে করেন যে, যদি সেগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত হয়, তবে তা বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। এতে বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় জাকাত ওয়াজিব হবে যখন তা নিসাব পরিমাণ হবে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হবে। বছরের শেষে এর পূর্ণ মূল্যের ওপর—অর্থাৎ মূলধনের সাথে মুনাফা যোগ করে—বার্ষিক ২.৫% হারে অর্থাৎ এক-দশমাংশের চার ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে। আর যদি বন্ডগুলো কেবল মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তবে এই অবস্থায় কেবল মুনাফা থেকে জাকাত নেওয়া হবে। কারণ এমতাবস্থায় বন্ডগুলো স্থায়ী সম্পদের স্থলাভিষিক্ত এবং এক্ষেত্রে প্রদেয় হার হবে নিট আয়ের ১০%, যেহেতু এই অবস্থায় আয় অর্জনে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যয় নেই।

২২৩

আমরা বন্ডের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ফকিহগণ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই গ্রহণ করছি, আর তা তারা যে সকল কারণ বা যুক্তি উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে।

ষষ্ঠ: কর্মের উপার্জন এবং তার জাকাতের বিধান:

যদি সুন্নাহে নববী কর্মের উপার্জনের ক্ষেত্রে জাকাতের বিধান বর্ণনার ব্যাপারে নীরব থেকে থাকে, তবে তার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অধিকাংশ মুসলিম জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন না। আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম নিয়োগের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সীমিত; কৃতদাস এবং তাদের পর্যায়ভুক্তরাই কাজগুলো সম্পাদন করত। ফলে কর্মের উপার্জনের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য কাজী আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ-এর ‘কিতাবুল খারাজ’ (পৃষ্ঠা ৪৫, আস-সালাফিয়্যাহ প্রকাশনী ও লাইব্রেরি, কায়রো) দেখা যেতে পারে।

তবে ‘আতা’ বা রাষ্ট্রীয় অনুদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণার একটি ভিত্তি আমাদের নিকট রয়েছে। তাই আমরা এই প্রসঙ্গে এমন কিছু ইসলামি উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব যা ‘আতা’-এর ধারণার ওপর আলোকপাত করে, অতঃপর আমরা সেই উদ্ধৃতিগুলোর ওপর মন্তব্য করব।

প্রথমত: প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে ‘আতা’ প্রদান: আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এবং এটি ‘কিতাবুল খারাজ’ গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে—আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইবনে আবি নাজিহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট কিছু সম্পদ আসলো। তখন তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে যার কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল সে যেন আসে।” অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে কোনো সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে যেন আসে। তখন জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন: “যদি বাহরাইনের সম্পদ আসে তবে আমি তোমাকে এভাবে এবং এভাবে দেবো”—এ কথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের তালু দিয়ে ইশারা করেছিলেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন: “নাও।” তিনি তাঁর দুই হাতের তালু ভরে নিলেন এবং গণনা করে দেখলেন যে তা পাঁচশত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “এর সাথে আরও এক হাজার নাও।” ফলে তিনি এক হাজার নিলেন। এরপর তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দান করলেন যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকল তা তিনি

ছোট-বড়, স্বাধীন-ক্রীতদাস এবং পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন। ফলে প্রত্যেকের ভাগে সাত দিরহাম এবং দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ করে পড়ল। অতঃপর যখন...

শরয়ী রাজনীতি - পঞ্চম পাঠ

পরবর্তী বছর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ আসল। তিনি তা মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ দিরহাম করে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন: তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি এই সম্পদ বণ্টন করেছেন এবং মানুষের মাঝে সমতা বজায় রেখেছেন। অথচ মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের বিশেষ মর্যাদা, ইসলামে অগ্রগণ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা রয়েছে। আপনি যদি এই অগ্রগণ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মর্যাদার কারণে মর্যাদাবানদের অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিতেন (তবে ভালো হতো)। তিনি বললেন: তোমরা যে অগ্রগণ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছ, সে সম্পর্কে আমি অত্যন্ত অবগত। তবে এগুলো এমন বিষয় যার পুরস্কার মহামহিম আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর এটি হলো জীবনোপকরণ; সুতরাং এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে উত্তম।

দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে রাষ্ট্রীয় অনুদান:
আবু ইউসুফ এই প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা অব্যাহত রেখে বলেন: যখন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগ এল এবং বিভিন্ন দেশ বিজয় হতে লাগল, তখন তিনি (বণ্টনে) তারতম্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলেন। তিনি বললেন: যারা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের আমি সেই ব্যক্তিদের সমান করব না যারা তাঁর সাথে হয়ে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম করে নির্ধারণ করলেন। আর যারা বদরে উপস্থিত ছিলেন না তাদের জন্য চার হাজার করে দিরহাম নির্ধারণ করলেন। আর যারা বদরবাসীদের মতো ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাদের সমপর্যায়ের ছিলেন না, তাদের জন্য তাদের ইসলামের অগ্রগণ্যতা ও মর্যাদার স্তর অনুযায়ী অংশ নির্ধারণ করে দিলেন।

আমরা যে সকল পাঠ উল্লেখ করেছি তা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করা সম্ভব:

আবু বকরের নিকট রাষ্ট্রীয় অনুদান:

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয় অনুদানকে মানুষের জন্য একটি স্থায়ী জীবনোপকরণ হিসেবে গণ্য করতেন যা সম্পদ থাকলেই পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হতো। তবে এর পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—প্রথম বছর মাথাপিছু অংশ ছিল সাত ও এক-তৃতীয়াংশ দিরহাম, যা দ্বিতীয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ দিরহামে উন্নীত হয়।

আবু বকর এই জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা সমীচীন মনে করতেন। তাই তিনি ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বজায় রেখেছিলেন।

স্থায়ী জীবনোপকরণের পাশাপাশি এই অনুদান সেই সকল উপঢৌকনকেও অন্তর্ভুক্ত করত, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কারো জন্য দিয়েছিলেন।

পৃষ্ঠা 76

পঞ্চম পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

উমর (রা.)-এর নিকট রাষ্ট্রীয় অনুদান নীতি:

উমর (রা.) বণ্টনের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমতা না রাখাকেই শ্রেয় মনে করতেন—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। তিনি অনুদান বা আতা প্রদানকে প্রতি বছর অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট আবর্তনে স্থায়ী করেছিলেন। তিনি বলতেন: "আমি মনে করি যে অনুদান প্রতি বছর প্রদান করা উচিত এবং সম্পদ একত্রিত করা উচিত; কারণ এটি বরকতের জন্য অধিক সহায়ক।"

উমরের দৃষ্টিতে বণ্টনের ক্ষেত্রে একজনের ওপর অন্যজনকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণগুলো ছিল নানাবিধ। সেগুলোর মধ্যে ছিল অর্পিত দায়িত্ব পালন, সম্পাদিত কর্মের ধরন, জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামে তার মর্যাদা বা অগ্রগামিতা। সুতরাং, ইসলামে ব্যক্তির জিহাদ, ইসলামে ব্যক্তির অগ্রগামিতা, ইসলামে ব্যক্তির সচ্ছলতা এবং ব্যক্তির অভাব—এসবই ছিল মানদণ্ড।

উমর (রা.) সম্পদের প্রাচুর্য ও পর্যাপ্ততা থাকলে সমতা রক্ষার দিকেও ঝুঁকে পড়তেন। আবু উবাইদ বলেন: উমরের প্রথম অভিমত ছিল ইসলামের অগ্রবর্তীদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ইসলামের তরে তাদের অবদানের মূল্যায়ন করা। এটিই ছিল তার প্রসিদ্ধ অভিমত। অন্যদিকে আবু বকরের অভিমত ছিল সমতা বজায় রাখা। পরবর্তীতে উমর (রা.) থেকে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যা আবু বকরের অভিমতে ফিরে আসার সদৃশ।

এখান থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, খলিফা আবু বকর রাষ্ট্রীয় অনুদানকে একটি স্থায়ী জীবিকা হিসেবে বিবেচনা করতেন, পক্ষান্তরে উমর ইবনুল খাত্তাব একে ইসলামের তরে সম্পাদিত কাজের প্রতিদান বা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা হিসেবে দেখতেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি আবু বকরের অভিমতের দিকেই ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুদান থেকে যাকাত গ্রহণ:

এটি সাব্যস্ত যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় অনুদানের ওপর যাকাত ধার্য হতো। হুবাইরাহ ইবনে মারইয়াম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাদের ছোট ঝুড়িতে (যাবিল) করে অনুদান দিতেন, অতঃপর তা থেকে যাকাত নিয়ে নিতেন। আরও বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব যখন অনুদান প্রদান করতেন, তখন উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের প্রাপ্য সম্পদের ওপর যাকাত গ্রহণ করতেন।

পৃষ্ঠা 77

আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

অনুরূপভাবে উমর বিন আব্দুল আজিজ যখন কোনো ব্যক্তিকে তার পারিশ্রমিক অর্থাৎ তার মজুরি প্রদান করতেন, তখন তা থেকে জাকাত গ্রহণ করতেন। এছাড়া তিনি যখন প্রাপকদের অনুকূলে সরকারি অনুদান বা ভাতা (আতা) প্রদান করতেন, তখনও তা থেকে জাকাত কেটে রাখতেন।

আমরা মনে করি যে, অনুদান বা ভাতার ওপর জাকাত আরোপের যে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি, এ সংক্রান্ত প্রচলিত কর আইনের ব্যবস্থার সাথে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি মিশরের কর আইনের দিকে লক্ষ করি, তবে দেখতে পাব যে, সেখানে বেতনের সমপর্যায়ের আয়ের ওপর কর আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮১ সালের আয়কর সংক্রান্ত ১৫৭ নম্বর আইনের ৫৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বেতন এবং বেতনের সমতুল্য আয়ের ওপর কর প্রযোজ্য হওয়ার বিধান রয়েছে। এর অর্থ হলো, যেসব আয় নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়, সেগুলোর ওপর কর প্রযোজ্য হবে, এমনকি তা বর্তমান বা অতীতের কোনো কাজ বা সেবার বিনিময়ে না হলেও।

যদি আমরা এই নিয়মটি সরকারি অনুদানের (আতা) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তবে দেখা যাবে যে এর ওপর কর বা জাকাত আরোপের ক্ষেত্রে এটি বেতনের বিধানই লাভ করে। এমনকি যদি তা কোনো কাজ বা সেবার বিনিময়ে না-ও হয়, তবুও যদি আমরা তাকে একটি স্থায়ী ভাতা হিসেবে গণ্য করি—যেমনটি খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে করতেন—তবে তা এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি আমরা একে ইসলামে কোনো কাজের প্রতিদান বা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা হিসেবে গণ্য করি—যেমনটি খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে করতেন—তবে তো এটি কর বা জাকাত আরোপের ক্ষেত্রে বেতনের বিধানভুক্ত হওয়ার অধিক দাবিদার। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি বলা সম্ভব নয় যে, শ্রমলব্ধ আয় জাকাত থেকে মুক্ত। বিশেষত বর্তমান সময়ে এই জাতীয় আয়ই জাতীয় আয়ের প্রধান অংশে পরিণত হয়েছে। একে জাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া জাকাতের দায় বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ বা দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সমতা রক্ষার যে মূলনীতি রয়েছে, তার পরিপন্থী।

এ কারণে বর্তমান সময়ের অনেক ফকিহ শ্রমলব্ধ আয়ের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে সামাজিক গবেষণা চক্রের (Social Studies Circle) আলেমগণ বলেন: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বেতন থেকে যদি জাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ জমা হয় এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত করে—যদিও বছরের মাঝখানে তা হ্রাস পায়—তবুও বছরের শুরু এবং শেষে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে, তবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি তা হ্রাস পায় এবং পূর্ণ না থাকে...

পৃষ্ঠা 78

পুরো বছর সম্পদ নিঃশেষ না হওয়া—যেমনটি হানাফী মাযহাবের অভিমত—এর কারণ হলো, এটি পুরো বছর ব্যয় না হওয়া প্রমাণ করে যে তা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি সুপ্তভাবে প্রবৃদ্ধিশীল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত, কারণ ইসলামি দৃষ্টিতে মুদ্রা ব্যবহারের জন্য বা বিনিয়োগের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, পুঞ্জীভূত করে রাখার জন্য নয়। এই যৌক্তিক ব্যাখ্যার (তাখরীজ) ভিত্তিতে উপার্জিত আয়ের ওপর প্রতি বছর যাকাত ধার্য করা সম্ভব; কারণ বছরের পুরো সময় আয় অব্যাহত থাকা এবং এর উভয় প্রান্তে (শুরু ও শেষে) নিসাব পূর্ণ হওয়া বিরল বিষয়। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপার্জিত আয়কে যাকাতের আধার হিসেবে গণ্য করা সঠিক হয় যাতে ফকীহগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত যাকাতের মূল কারণটি (ইল্লত) কার্যকর হয়। আমরা বিষয়টিকে নিসাবের অনুগামী হিসেবে গণ্য করি যা যাকাতের মূল ভিত্তি।

হানাফীগণ বিষয়টিকে সহজ করেছেন এবং বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন, যদি বছরের

মাঝখানে তা পুরোপুরি নিঃশেষ না হয়ে যায়। সুতরাং উপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন পেশাজীবীদের ওপর যাকাত আরোপের সময় এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী সীমারেখা বজায় থাকে। (দ্রষ্টব্য: দিরাসাতুল ইজতিমাঈয়াহ লিল দুওয়ালিল আরাবিয়াহ, পৃষ্ঠা ২৪৩ এবং পরবর্তী)।

এই অভিমত থেকে যা প্রতীয়মান হয়:

১. অর্জিত আয় দুই মুদ্রার (স্বর্ণ ও রূপা) যাকাতের হারের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা হলো ২.৫% বা এক-চল্লিশাংশ। যাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব থাকা এবং বছর অতিক্রান্ত হওয়া অপরিহার্য।
২. শর্ত হলো এই নিসাব যেন মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। যদি উপার্জিত আয়ের সবটুকুই ব্যয় হয়ে যায় তবে তাতে কোনো যাকাত নেই। সারকথা হলো, নতুন লব্ধ সম্পদসমূহে যাকাত ওয়াজিব করার মাধ্যমে—যা নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি—সর্বোচ্চ পর্যায়ের বস্তুগত জনকল্যাণ সাধিত হয়। এর ফলে সমাজের সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় যারা যাকাতের নিসাব পরিমাণ এমন যেকোনো সম্পদের মালিক যাতে প্রবৃদ্ধির গুণাগুণ বিদ্যমান।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ
পঞ্চম পাঠ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবশিষ্ট শর্তাবলী পূর্ণ হয়েছে, আর তা যাকাতের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে।

এবং যেহেতু আমরা যাকাতের বস্তুগত ব্যাপকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আমাদের প্রাচীন ফকীহগণের যুগে পরিচিত সম্পদসমূহের কথা উল্লেখ করেছি, অতঃপর এই পরবর্তী যুগে নতুনভাবে উদ্ভূত বা ক্রমবর্ধমান সম্পদসমূহ যেমন—কারখানা, ভবন, বেতন এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাই এই ব্যাপকতা বাস্তবায়নের জন্য কিছু নিয়ামক থাকা আবশ্যক। আর সে কারণেই আমরা এখন যাকাতের ব্যাপকতা অর্জনে সহায়ক নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা বলি: যখন আমরা যাকাতের বস্তুগত ব্যাপকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আমাদের প্রাচীন ফকীহগণের যুগে পরিচিত সম্পদসমূহ ও এই যুগে নতুনভাবে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান সম্পদসমূহ—যেগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হয়—তার কথা উল্লেখ করেছি, তখন আমরা বলি: যাকাতের ক্ষেত্রে এই ব্যাপকতা অর্জনের জন্য কিছু নিয়ামক থাকাও জরুরি। আর এটি এই লক্ষ্যে পরিচালিত করে যেন উম্মাহর সদস্যদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সেই সকল সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হয় যেগুলোতে যাকাতের শর্তাবলী পূর্ণ হয়েছে।

যাকাতের ব্যাপকতা অর্জনে সহায়ক নিয়ামকসমূহ

যাকাতের ব্যাপকতার ধারণাটি আমাদের অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে, সেই ব্যাপকতা পূর্ণাঙ্গভাবে নিশ্চিত হয়েছে। তবে যাকাত সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো কেবল সেই ব্যাপকতার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কাজ করেছে। কেননা ব্যাপকতা হয়তো বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোনো কর্ম এসে তাতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, এই বিধানগুলো একদিকে যেমন এই ব্যাপকতার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে এমন সব কিছু দূর করার চেষ্টা করছে যা...

পঞ্চম পাঠ

...এর ব্যাঘাত ঘটানো; আর আমরা এখানে দেখতে পাই যে, যাকাতের ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু উপাদান সহায়তা করে থাকে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

- যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা।
- যাকাতের ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষতা (রেট্রোঅ্যাক্টিভিটি) পরিহার করা।
- যাকাত ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা।

আমরা এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকটির ওপর আলোকপাত করব।

ক. যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা:

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই আইনি মূলনীতি যা নবী ﷺ তাঁর বাণীর মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন: "সাদাকার (যাকাত) ক্ষেত্রে কোনো দ্বিত্ব নেই।" আবু উবাইদ বলেন: অর্থাৎ এক বছরে দুইবার যাকাত গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং, যাকাত সংক্রান্ত দ্বৈততার বিষয়টি তখনই কার্যকর হয় যখন একই ব্যক্তির ওপর, একই সম্পদের জন্য এবং একই বছরে একই যাকাত বা একই ধরণের যাকাত দুইবার আরোপ করা হয়। ইবন কুদামা ও অন্যান্যরা এই হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, একই বছরে একই কারণে দুটি যাকাত আবশ্যক করা বৈধ নয়। ফকীহগণ এই বিষয়ে বেশ কিছু বিধান ও মূলনীতি চয়ন করেছেন:

তার মধ্যে একটি হলো, ইমাম আবু হানিফা মনে করেন যে— উট, গরু বা ছাগলের মালিক যদি সেগুলোর যাকাত হিসেবে উট, গরু বা ছাগল প্রদান করে এবং এরপর সেগুলো বিক্রয় করে দেয়, তবে বিক্রয়লব্ধ সেই অর্থকে তার কাছে থাকা নিসাব পরিমাণ এমন নগদ অর্থের সাথে যুক্ত করবে না যার যাকাত প্রদানের ইচ্ছা সে পোষণ করছে; কারণ এই অর্থের যাকাত ইতিপূর্বে উট, গরু বা ছাগলের মাধ্যমেই আদায় হয়ে গিয়েছে। অতএব, এটিকে সেই নগদ অর্থের সাথে যুক্ত করা যার যাকাত এখনো দেওয়া হয়নি এবং তার সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করাকে "দ্বিত্ব" (পুনরাবৃত্তি) হিসেবে গণ্য করা হবে। এর অর্থ হলো একই সম্পদ থেকে দুইবার যাকাত গ্রহণ করা, যা যাকাতের ক্ষেত্রে দ্বিত্ব হিসেবে গণ্য; কেননা এই অবস্থায় উক্ত সম্পদ থেকে দুইবার যাকাত বের করা হবে।

হাদীসের মাধ্যমে যাকাতের পুনরাবৃত্তি বা দ্বৈততাকে নাকচ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার নগদ অর্থের যাকাত প্রদান করল, এরপর সেই অর্থ দিয়ে উট বা অন্য কোনো চরে বেড়ানো গবাদি পশু ক্রয় করল, এমতাবস্থায় তার কাছে আগে থেকেই সেই প্রজাতির চরে বেড়ানো পশু বিদ্যমান ছিল যা এই যাকাতকৃত নগদ অর্থ দিয়ে কেনা হয়েছে; তবে সে নতুন কেনা পশুগুলোকে আগের গুলোর সাথে যুক্ত করবে না। অর্থাৎ, মূল পশুগুলোর বর্ষপূর্তিতে সে এগুলোর যাকাত দেবে না; কারণ এগুলো এমন সম্পদের স্থলাভিষিক্ত যার যাকাত ইতিপূর্বেই আদায় করা হয়েছে। সুতরাং একই বছরে দ্বিতীয়বার যাকাত ওয়াজিব হবে না।

অধিকাংশ ফকীহ উট, গরু এবং পরিশ্রমে নিয়োজিত পশুর ক্ষেত্রে—যা হাল চাষ, সেচ প্রদান এবং শস্যের পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয়—বলেছেন যে, এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব নয়। তারা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, গমে যাকাত (সদকা) রয়েছে, আর গম গরুর মাধ্যমেই উৎপাদিত হয়। আবু উবাইদ এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন: যদি তারা সেচ দেয় এবং হাল চাষ করে, তবে যে শস্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় তা মূলত তাদের হাল চাষ, সেচ এবং মাড়াইয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় যদি এগুলোরও যাকাত নেওয়া হয়, অর্থাৎ শস্যের সাথে সাথে সেগুলোরও যাকাত আদায় করা হয়, তবে মানুষের ওপর যাকাত দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর যাকাতের ক্ষেত্রে এটাই হলো দ্বৈততা বা পুনরাবৃত্তি।

অনুরূপভাবে, হানাফী ফকীহগণ যাকাতের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে বলেন: খারাজী জমি থেকে উশর (দশমাংশ) নেওয়া হবে না। অর্থাৎ যে জমির ওপর বার্ষিক নির্দিষ্ট কর ধার্য করা হয়েছে, তাতে উশর নেওয়া হবে না, যাতে একই জমিতে উশর এবং খারাজ একত্রিত না হয়।

এই সমস্ত বিধান এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততাকে বর্জন করা হয়েছে এমনভাবে, যা দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে তার ওপর যা ওয়াজিব তার চেয়ে বেশি প্রদানে বাধা দেয়। ফলস্বরূপ, সে নিজের সম্পদের যাকাত বছরে একবারের বেশি না দেওয়ার মাধ্যমে অন্যদের সমান পর্যায়ে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রের নির্ধারিত আর্থিক ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা অর্জিত হয়।

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের পদ্ধতি:

যাকাতের দ্বৈততা রোধ করার অন্যতম প্রধান পদ্ধতি, যা ইসলামী আর্থিক আইন অনুসরণ করেছে, তা হলো স্থানীয় পর্যায়ে যাকাত সংগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী শাসকদের নিকট ছিল...

মুসলিমগণ, ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুরআহ বিন যি ইয়াযানকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন: "যখন তোমাদের নিকট আমার প্রতিনিধিরা আসবে, তখন তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিচ্ছি। তারা হলেন: মুআয বিন জাবাল, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, মালিক বিন উবাদাহ, উকবাহ বিন নিয়ার, মালিক বিন মুরারাহ এবং তাঁদের সঙ্গীগণ। তোমাদের নিকট সদকা (যাকাত) ও জিযিয়ার যা কিছু আছে তা জমা করো এবং আমার প্রতিনিধিদের নিকট সোপর্দ করো। তাদের আমির বা নেতা হলেন মুআয বিন জাবাল।" (আবু উবায়দ রচিত আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৫৯ এবং পরবর্তী অংশ)।

এর অর্থ হলো, যুরআহর নিকট আদায়ের জন্য একটি আঞ্চলিক বিভাগ ছিল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

নিকট আদায়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ ছিল, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন মুআয বিন জাবাল। কেন্দ্রীয় বিভাগের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আদায়ের জন্য নিয়োজিত একটি স্থানীয় বিভাগের উপস্থিতি একই সম্পদের ওপর এবং একই সময়ে দুইবার যাকাত গ্রহণ করাকে প্রতিরোধ করে। এর মাধ্যমে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বৈততা সৃষ্টি হয় না।

যাকাতের ক্ষেত্রে দ্বৈততা রোধ করা করদাতাদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে। মূলনীতি হলো, সমাজের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক দায়ভার ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করতে হবে, যা করদাতার আর্থিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যাতে একই যাকাতযোগ্য সম্পদের ওপর তাকে দুইবার নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে না হয়। যদি যাকাতের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ঘটে, তবে যে ব্যক্তি এই দ্বৈততার শিকার হবেন, তিনি একই আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন অন্য করদাতার তুলনায় অধিক আর্থিক বোঝা বহন করবেন। এর ফলে সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে সমতা নষ্ট হয়, যা নির্ধারিত আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বিরাজমান সমতার মূলনীতির পরিপন্থী।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি দ্বৈততার শিকার হবেন, তিনি যাকাত আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবেন; কারণ তিনি অনুভব করবেন যে তাঁর ওপর জুলুম করা হয়েছে। এর ফলে তিনি তাঁর ওপর ওয়াজিব যাকাত আদায়ে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। আর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা নির্ধারিত আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সমতার মূলনীতিকে ব্যাহত করে। পক্ষান্তরে, যদি এই দ্বৈততা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তবে প্রত্যেক মানুষ কেবল তার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারিত আর্থিক বোঝা বহন করবে এবং এর ফলে উল্লিখিত সমতার মূলনীতি বাস্তবায়িত হবে।

খ. যাকাতের ক্ষেত্রে পশ্চাদমুখিতা পরিহার করা:

যাকাতের ক্ষেত্রেও পশ্চাদমুখিতা পরিহার করা হয়। কখনো কখনো এমন ঘটে যে, কিছু মুকাল্লাফ যখন তাদের ওপর কর আরোপ করা হয়, তখন তারা তা অন্যের ওপর স্থানান্তরের মাধ্যমে এর আংশিক বা পুরোটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে। সমাজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমাজের সদস্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক এক্ষেত্রে তাদের সহায় হতে পারে, যার ফলে তারা তাদের ওপর অর্পিত কিছু আর্থিক দায়-দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়।

প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রে নির্ধারিত আর্থিক বোঝা বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা অর্জনের পথে মানবরচিত ব্যবস্থায় করের পশ্চাদমুখিতাকে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

করের পশ্চাদমুখিতার উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে: সেই উৎপাদক বা ব্যবসায়ী, যিনি তার পরিশোধিত করকে উৎপাদন খরচ বা পণ্যের দামের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পরবর্তীতে তা বিক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করে দেন। একইভাবে সেই বাড়ির মালিকও এর অন্তর্ভুক্ত, যিনি তার ওপর আরোপিত ভূমি করের কারণে বাড়িভাড়া বাড়িয়ে দেন। যদি করের পরিস্থিতি এবং জনস্বার্থকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে না পারা অনেক মুকাল্লাফের অবস্থান এমন হয়, তবে যাকাতের বিষয়টি এক্ষেত্রে কর থেকে ভিন্ন এবং যাকাতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও করের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আলাদা। একজন মুসলিম অনুভব করেন যে, যাকাত তার এবং কোনো সরকার বা কর আদায়কারী প্রশাসনের মধ্যকার কোনো সম্পর্ক নয়; বরং এটি অন্য সবকিছুর আগে তার এবং তার প্রতিপালক মহান আল্লাহর মধ্যকার একটি সম্পর্ক। আর এটাই যাকাতের ইবাদত হওয়ার প্রকৃত অর্থ, যা আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং তা আদায়ের সময় সে অনুভব করে যে, সে ইসলামের অন্যতম একটি রুকন বা স্তম্ভ পালন করছে। এই প্রেক্ষাপটেই যাকাত প্রদান করা আনুগত্য ও নেক আমলে পরিণত হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলিম ভালোভাবেই জানেন যে, যাকাত হলো আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে এমন একটি হক যা আদায় করা ওয়াজিব। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা যা উল্লেখ করেছি তা মুকাল্লাফের অন্তরে কোনো না কোনোভাবে যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অসম্ভবতার অনুভূতি জাগ্রত করে। আর এই অনুভূতিই প্রকৃতপক্ষে যাকাতের ক্ষেত্রে পশ্চাদমুখিতা পরিহার করার মৌলিক শর্ত।

২৩৩

পৃষ্ঠা 84

পঞ্চম পাঠ

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ

কর ফাঁকি বলতে কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকে বুঝায়। আর ব্যক্তিদের মধ্যে করের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের জন্য করকে অবশ্যই সাধারণ বা সর্বজনীন হতে হবে। করের সাধারণত্ব বলতে বুঝায় কর সকল সম্পদ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর অর্পিত হওয়া; একেই বলা হয় বস্তুগত ও ব্যক্তিগত সাধারণত্ব। সরকারি অর্থব্যবস্থার পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, করদাতাদের মধ্যে কর প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি মূলত কয়েকটি কারণের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে প্রধান হলো কর ফাঁকি। কেননা ফাঁকি দেওয়ার অস্তিত্ব করের সাধারণত্ব ও সমতার মূলনীতিকে চূর্ণ করে দেয়। কারণ ফাঁকি দেওয়ার ফলে ফাঁকিবাজরা সরকারি আর্থিক বোঝা থেকে নিজেদের অংশটুকু এড়িয়ে যায়, অথচ সেই সময়ে যারা ফাঁকি দেয় না তারা সেই অংশটুকু বহনে বাধ্য হয়। আর এটি সেই সকল দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত করে যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে করের বোঝা বহন করে এবং কর আদায় করে। এভাবে রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান সমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যাকাতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী শরীয়ত যাকাত ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য এমন কিছু মাধ্যম বা উপায় নির্ধারণ করেছে যা এই ফাঁকি প্রতিরোধে সক্ষম। এই উপায়গুলোকে সংক্ষেপে তিনটি পয়েন্টে বর্ণনা করা যেতে পারে:

- যাকাত প্রদানে ফাঁকি দেওয়ার দিকে ধাবিত করে এমন কারণসমূহ অবগত হওয়া।
- যাকাত প্রদান থেকে পলায়ন করার জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিরা যেসব পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করে তা অবগত হওয়া।
- যাকাত ফাঁকি প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রথমত: যাকাত ফাঁকি দেওয়ার দিকে পরিচালিত করে এমন কারণসমূহ:

যাকাত ফাঁকি দেওয়ার কারণসমূহকে প্রধানত দুটি মূল কারণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

প্রথম কারণ: যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জুলুম:

যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সম্পদ মালিকদের ওপর জুলুম করা হলে তা এসকল সম্পদের মালিকদের যাকাত প্রশাসন ও কর্মচারীদের নিকট যাকাত প্রদান থেকে ফাঁকি দিতে উৎসাহিত করতে পারে, যেমন তাদের পক্ষ থেকে এই সম্পদ আদায়ের ক্ষেত্রে বা সম্পদ মালিকদের ওপর জুলুম করা হয়...

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

পঞ্চম পাঠ

ঈমানের দুর্বলতা যেকোনো উপায়ে যাকাত প্রদান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। এই কারণটির মধ্যে যাকাত আদায় এবং বন্টন উভয় ক্ষেত্রেই জুলুম বা অন্যায় অন্তর্ভুক্ত।

আদায়ের ক্ষেত্রে জুলুমের বিষয়ে ফকিহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যাকাত আদায়ের দায়িত্বে থাকা কর্মচারী বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জুলুম করা যাকাত গোপন করার বা তা থেকে এড়িয়ে চলার জন্য একটি ওজর (অজুহাত) হিসেবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায়, এই কর্তৃপক্ষের জন্য যাকাত গোপনকারী বা প্রদান না করা ব্যক্তির ওপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা 'তা'যীর' কার্যকর করার অধিকার নেই। বরং তারা কেবল সেই এড়িয়ে যাওয়া বা গোপন করা যাকাতটুকুই গ্রহণ করবে।

সর্বোপরি, প্রশাসন বা যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জুলুম যাকাত ফাঁকি দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, মিশরে সুলতান কালউনের শাসনামলে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা বাতিল করতে বাধ্য হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আদায়কারী কর্মচারীদের জুলুম, যা যাকাত সংগ্রহে অবহেলার সৃষ্টি করেছিল।

বন্টনের ক্ষেত্রে জুলুম বলতে বোঝায় যে, যাকাতের সংগৃহীত অর্থ অপচয় করা হয় অথবা শরীয়তসম্মত খাত ব্যতীত অন্য খাতে ব্যয় করা হয়। এখানে যাকাতদাতার কাছে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। বাস্তবে এই সমস্যাটি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আধুনিক কর ব্যবস্থায় একে যেকোনো করের সাফল্য বা ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, করদাতার কর প্রদানের প্রতি আচরণ অনেকাংশেই নির্ভর করে রাষ্ট্র সেই অর্থ কীভাবে ব্যবহার করছে তার ওপর। যদি ব্যয়ের নীতি অপরিপক্ক, অস্পষ্ট বা করদাতার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়—যাতে সে তাকে দেওয়া সেবা বা সফল প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এর প্রভাব অনুভব করতে না পারে—তবে সে তার কর প্রদানের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় কারণ: সাধারণভাবে ইসলামী সচেতনতা এবং বিশেষভাবে যাকাত বিষয়ক সচেতনতার অভাব:

সাধারণভাবে ইসলামী সচেতনতা এবং বিশেষভাবে যাকাত বিষয়ক সচেতনতার দুর্বলতা যে যাকাতের বিষয়টিকে অবহেলা করা এবং এর প্রতি অনাগ্রহ তৈরির পেছনে বিশেষ প্রভাব রাখে, তা কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। এটি সদৃশ...

অর্থবিজ্ঞানীরা এটি উল্লেখ করেছেন যে, যখনই আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিপরীতভাবে, আর্থিক সচেতনতা যত দুর্বল হয়, কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ততটাই শক্তিশালী ও দৃশ্যমান হয়।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, বিশেষ করে যাকাতের ক্ষেত্রে ইসলামি সচেতনতা যত শক্তিশালী হবে, তা ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা তত কমে আসবে। এ ছাড়াও এমন আরও কিছু কারণ রয়েছে যা প্রশাসন এবং যাকাত বিষয়ক দায়িত্বশীলরা সমাজে প্রচলিত পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে সময়ে সময়ে লক্ষ্য করতে পারেন।

গ. যাকাত প্রদান থেকে পলায়ন বা ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই:

যাকাত ফাঁকি রোধ করতে পারে এমন অনেক পদক্ষেপ রয়েছে। সেসব পদক্ষেপের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রশাসনের ইনসাফ অথবা যারা যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের ন্যায়পরায়ণতা। আর এই ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত হলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইনসাফ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইনসাফ—এই বিষয়টি আমাদের যাকাত সংগ্রাহকদের সাথে যাকাতদাতাদের সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করার দাবি রাখে। আমরা দেখতে পাই যে, এই সম্পর্কটি কতগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে প্রধান হলো: যাকাতদাতার পক্ষ থেকে সংগ্রাহকের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা এবং তার এই অনুভূতি যে, সংগ্রাহক তাকে একটি সেবা প্রদান করছেন যা কেবল যাকাত আদায়কারী হওয়ার চেয়েও বেশি কিছু। ফলে যৌক্তিকভাবেই এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত সংগ্রাহক নির্বাচনের বিষয়টি। আল-মাওয়ারদী যাকাত সংগ্রাহকদের জন্য বিবেচ্য কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে প্রধান হলো: সংগ্রাহককে স্বাধীন, মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ এবং যাকাতের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে।

আর্থিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের ইনসাফ হলো—যাকে তিনি যাকাতের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন, তার ওপর নজরদারি করা, তার হিসাব নেওয়া, তার হাত ধরা (তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখা), তাকে বরখাস্ত করা এবং তার সকল সম্পদ বা অংশবিশেষ বাজেয়াপ্ত করা, যদি জানা যায় যে সে অন্যায় পথে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ধনী হয়েছে।

ইসলামি ফিকহ কেবল যাকাত সংগ্রাহক নির্বাচনের শর্তাবলি নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং যাকাত প্রদানকারীদের প্রতি কৃত প্রতিটি জুলুমের জন্য মহান আল্লাহর সামনে সংগ্রাহকের জবাবদিহিতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ...

বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ন্যায়ের সাথে সদকা (জাকাত) আদায়কারী হিসেবে কাজ করে, সে নিজ ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য।” আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কর্মকর্তাদের নিকট তাদের হাতে থাকা সম্পদের সূক্ষ্ম হিসাব নিতেন।

জাকাত বণ্টনের বিষয়ে:

যদি মানবঘটিত ব্যবস্থায় কর লব্ধ অর্থের অপবণ্টন করদাতাকে কর ফাঁকি দিতে উৎসাহিত করে—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—তবে আমরা দেখতে পাই যে, জাকাতের বণ্টনের বিষয়টি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। আল-কুরআনুল কারীম জাকাত লব্ধ অর্থের ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে বিশেষ কিছু লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়ত তার সকল উৎসের মাধ্যমে জাকাত প্রদানকারীদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করেছে। মহান আল্লাহ এই খাতগুলো সম্পর্কে বলেছেন: “সদকা তো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি বিধান; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০)।

এই সম্মানিত আয়াতে জাকাত লব্ধ অর্থের একটি অংশ জাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, জাকাত তহবিলের একটি স্বতন্ত্র হিসাব ও স্বতন্ত্র বাজেট রয়েছে। এই তহবিল থেকেই এর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আর এটিই জাকাত প্রদানকারীদের দৃষ্টিতে জাকাত তহবিলের বাস্তব অস্তিত্বকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে এবং এর ব্যবহারকে একটি দৃশ্যমান বিষয়ে পরিণত করে।

জাকাত ফাঁকি রোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

- জাকাত বিলোপের জন্য হীলা বা প্রতারণা হারাম হওয়া:
এই পদক্ষেপটিকে জাকাত ফাঁকি রোধে অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। জাকাত ফাঁকি দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, ফকিহগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে...

যাকাত ফাঁকি দেওয়ার হিলা বা ফন্দি হিসেবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সম্পদে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ হারাম হওয়া এবং এ জাতীয় হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়ে। তদ্রূপ আমরা দেখেছি যে, অধিকাংশ আলেম যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অল্প সময় আগে (যেমন এক মাস আগে) যাকাত এড়ানোর কৌশল হিসেবে সম্পদে যেকোনো ধরনের রদবদল করাকে হারাম মনে করেন এবং এ জাতীয় পদক্ষেপকে অকার্যকর গণ্য করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর 'আল-খারাজ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন:
"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য সদকা (যাকাত) প্রদান বন্ধ রাখা যেমন বৈধ নয়, তেমনি নিজের মালিকানাধীন সম্পদ অন্য কোনো দলের কাছে হস্তান্তর করাও বৈধ নয়—যাতে তা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। যেমন উট, গরু বা ছাগলের যাকাতযোগ্য সংখ্যাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে কোনো অংশেই আর সদকা ওয়াজিব না থাকে। কোনোভাবেই বা কোনো অজুহাতে সদকা বাতিলের কোনো কৌশল অবলম্বন করা যাবে না।"

- যাকাত ফাঁকিদাতার ওপর পার্থিব আর্থিক ও ফৌজদারি শাস্তি এবং পরকালীন শাস্তির বিধান:

যাকাত আদায়ে পলায়নপর ব্যক্তির ওপর যে আর্থিক দণ্ড আরোপ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন: "মাঠে বিচরণকারী প্রতি চল্লিশটি উটে একটি 'বিনতে লাবুন' (তিন বছরে পদার্পণকারী উট) যাকাত দিতে হবে। যাকাতের হিসাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে উটগুলোকে পৃথক করা যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তা প্রদান করবে, সে তার প্রতিদান পাবে। আর যে তা দিতে অস্বীকার করবে, আমরা তার থেকে যাকাত এবং তার অর্ধেক উট গ্রহণ করব; এটি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান।"

এই হাদিসটি যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীর কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ এবং তার অর্ধেক উট বাজেয়াপ্ত করার স্বপক্ষে একটি দলিল। অন্য কথায়, এটি এক প্রকার আর্থিক শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়, যা শাসক প্রয়োজন সাপেক্ষে যাকাত ফাঁকিদাতাদের শাসন করার জন্য ব্যবহার করেন। এটি 'তা'জিরি' (শাস্তিমূলক) দণ্ডসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসকের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

যাকাত ফাঁকিদাতার বিষয়টি কেবল আর্থিক দণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তার ওপর ফৌজদারি শাস্তিও আসতে পারে যদি তার ক্ষেত্রে আর্থিক শাস্তি যথেষ্ট না হয়। এ বিষয়ে ইমাম আল-মাওয়ার্দি বলেন:

২৩৮

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চম পাঠ
আর যদি কেউ জাকাত প্রদান করা ত্যাগ করে, তবে তার জন্য তাকে হত্যা করা হবে না; বরং তার সম্পদ থেকে তা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করা হবে। যদি সে কোনো সংশয় ছাড়াই তা গোপন করে, তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি তার বাধার কারণে জাকাত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এমনকি যদি সেই যুদ্ধ তাকে হত্যার পর্যায়ে নিয়ে যায় যতক্ষণ না তার থেকে তা আদায় করা হয়, যেমনটি আবু বকর সিদ্দিক (রা.) জাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য: আল-মাওয়ার্দী রচিত (আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ), পৃষ্ঠা ১৯২ ও পরবর্তী অংশ।

এই বিষয়ে ইবনে হাজমও বলেন:

জাকাত অস্বীকারকারীর বিধান হলো, তার থেকে তা আদায় করা হবে, সে তা পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক। যদি সে জাকাত না দেওয়ার জন্য লড়াই করে তবে সে একজন যোদ্ধা (মুহারিব)। আর যদি সে একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে একজন মুরতাদ। কিন্তু যদি সে তা লুকিয়ে রাখে এবং তার জন্য লড়াই না করে, তবে সে একটি মন্দ কাজ করল। ফলে তাকে শাসন করা অথবা প্রহার করা ওয়াজিব যতক্ষণ না সে তা উপস্থিত করে, অথবা সে আল্লাহর অভিশাপের দিকে ধাবিত হয়ে আল্লাহর হাতে নিহত হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয় যদি সে সক্ষম হয়।” আর এটি একটি মন্দ কাজ, তাই যে ব্যক্তি সক্ষম তার ওপর এটি পরিবর্তন করা ফরয, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি।

সুতরাং জাকাত ফাঁকিবাজ ব্যক্তির শাস্তি কেবল আর্থিক জরিমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি এসব মূলবাণী থেকে স্পষ্ট হয়; বরং এটি উপযুক্ত শারীরিক শাস্তি পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তদুপরি লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থা জাকাত ফাঁকিবাজ ব্যক্তির শাস্তিকে কেবল দুনিয়াবী আর্থিক ও শারীরিক শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তার জন্য পরকালীন শাস্তির বিধানও রেখেছে। বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) বলেছেন: “যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে তার জাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে একটি টেকো বিষধর সাপের রূপ দেওয়া হবে, যার চোখের ওপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে। কিয়ামতের দিন সাপটি তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সাপটি তার দুই চোয়াল (অর্থাৎ মুখের দুই পাশ) কামড়ে ধরবে এবং বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার।” এরপর তিনি (সা.) এই আয়াতটি পাঠ করেন: “আর আল্লাহ যাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করেছে, কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে। আর আসমান ও যমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই। আর তোমরা যা আমল করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।” [সূরা আলে ইমরান: ১৮০]। তাঁর (সা.) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “স্বর্ণ বা রৌপ্যের এমন কোনো মালিক নেই যে তার হক আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের

পাত তৈরি করা হবে...”

পৃষ্ঠা 90

পঞ্চম পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

...আগুন, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার মাধ্যমে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠ দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হবে, তা পুনরায় (উত্তপ্ত করে) ফিরিয়ে আনা হবে। এমন এক দিনে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যতক্ষণ না বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করা হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখবে, হয় জান্নাতের দিকে নতুবা জাহান্নামের দিকে।

দুনিয়া ও আখিরাতের এই যে শাস্তিসমূহ আমরা উল্লেখ করেছি, তা নিঃসন্দেহে এমন প্রতিরোধমূলক শাস্তি যা যাকাত প্রদানে ফাঁকি দিতে প্ররোচিত প্রতিটি আত্মাকে এই অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। সুতরাং, এটি এই মন্দ স্বভাব তথা যাকাত প্রদান থেকে পলায়ন বা ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদানকারী। এর মাধ্যমে সেই বিপজ্জনক বিষয়টিকে নির্মূল করা হয় যা সেই মূলনীতিকে হুমকির মুখে ফেলে যার ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর অর্পিত আর্থিক দায়-দায়িত্ব বণ্টন করা উচিত; আর তা হলো দায় বহনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা। সুতরাং, যাকাত ফাঁকি দেওয়ার ঝুঁকি দূর করার মাধ্যমে এই সাধারণ মূলনীতিটি বাস্তবায়িত হবে এবং প্রত্যেক নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে নির্ধারিত সাধারণ ব্যয়ভার বহনে অংশীদার হবে।

- উৎসস্থলে কর্তন:

এর অর্থ হলো মুসলিম ব্যক্তি সম্পদ হাতে পাওয়ার পূর্বেই কর বা পাওনা গ্রহণ করা। যাকাত আদায়ে ফাঁকি দেওয়া রোধে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে উৎসস্থলে কর্তনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর যখন মানুষকে তাদের ভাতা—অর্থাৎ তাদের বেতন—প্রদান করতেন, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতেন: "তোমার কাছে কি এমন কোনো সম্পদ আছে যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে?" যদি সে বলত: "হ্যাঁ", তবে তিনি তার প্রাপ্য ভাতা থেকে সেই যাকাতের অর্থ কেটে রাখতেন। আর যদি সে বলত: "না", তবে তিনি তাকে তার পুরো ভাতা দিয়ে দিতেন এবং সেখান থেকে কিছুই নিতেন না।

অনুরূপভাবে উমর ইবনুল খাত্তাবও যখন ভাতা প্রদান করতেন, তখন উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির দৃশ্যমান সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করতেন। উমর ইবনে আব্দুল আজিজও যখন কোনো ব্যক্তিকে তার পারিশ্রমিক বা মজুরি প্রদান করতেন, তখন তা থেকে যাকাত কেটে রাখতেন। আবার যখন অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদ (মাজালিম) ফেরত দিতেন, তখন তা থেকেও যাকাত গ্রহণ করতেন। তিনি মালিকদের অনুকূলে ভাতা প্রদানের সময় সেখান থেকে যাকাত নিতেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আবু উবাইদ কৃত 'আল-আমওয়াল', পৃষ্ঠা ৫২৬ ও পরবর্তী অংশ।

পৃষ্ঠা 91

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

- সম্পদের ঘোষণা:

ইসলামি শরিয়ত দায়িত্বশীলদের ওপর এটি আবশ্যক করেছে যে, তারা তাদের নিকট থাকা সম্পদের বিবরণ বিশ্বস্ততার সাথে জাকাত সংগ্রাহকদের কাছে পেশ করবে এবং তাদের থেকে তা গোপন করবে না। এর প্রমাণ হলো জারীর বিন আব্দুল্লাহ তাঁর সন্তানদের বলতেন: "হে আমার ছেলেরা, যখন তোমাদের কাছে জাকাত সংগ্রাহক আসবে, তখন তোমরা তোমাদের নেয়ামত (সম্পদ) থেকে কোনো কিছু গোপন করো না। যদি সে ন্যায়বিচার করে, তবে তা তোমাদের জন্য এবং তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে অবিচার করে, তবে তা তার জন্য অকল্যাণকর এবং তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" যহীর বিন ইয়ারবূ' থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: "আমি কি তাদের—অর্থাৎ জাকাত সংগ্রাহকদের—কাছ থেকে আমার মূল্যবান সম্পদগুলো লুকিয়ে রাখব?" তিনি বললেন: "না, তারা যখন তোমাদের নিকট আসবে, তখন তোমরা তাদের অবাধ্য হয়ো না। আর যখন তারা চলে যাবে, তখন তাদের গালি দিও না। অন্যথায় তোমরা পাপিষ্ঠ হবে আর জালিম ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। বরং বলো: এটি আমার সম্পদ এবং এটিই সত্য; অতএব সত্য গ্রহণ করুন এবং মিথ্যা বর্জন করুন। যদি সে এর অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন মিজানে তা তোমার জন্য জমা হবে।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই সাহাবী আবু হুরাইরা ও আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: মানুষের ওপর এটি আবশ্যক যে, যখন জাকাত সংগ্রাহক আসবে তখন তারা তাকে স্বাগত জানাবে এবং তাদের সকল সম্পদের সংবাদ তাকে দেবে, কোনো কিছুই গোপন করবে না। যদি সে ন্যায়বিচার করে তবে তা-ই সঠিক পথ, আর যদি সে অন্যথা করে এবং সীমালঙ্ঘন করে তবে সে কেবল নিজেরই ক্ষতি করল, আর আল্লাহ তাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার বিনিময় দান করবেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি শরিয়ত সম্পদের এই ঘোষণার মাধ্যমে আধুনিক জনবিত্ত (পাবলিক ফিন্যান্স) বিশেষজ্ঞদের অগ্রগামী হয়েছে, যারা করদাতা এবং কর কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তেজনার কারণগুলো দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, যাতে আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা অর্জিত হয়। কারণ করদাতা এবং কর আদায়কারীদের মধ্যকার সম্পর্ক শত্রুতার যেকোনো রূপ থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক। এজন্য বর্তমান সময়ে অর্থ বিভাগগুলো করদাতাদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে আস্থার অভাব ও উত্তেজনার কারণগুলো দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যা কর ফাঁকি রোধে ভূমিকা রাখবে।

অনুরূপভাবে: একজন মুসলিমের জানা উচিত যে, জাকাত মুসলিমের স্কন্ধে একটি ঋণ হিসেবে অবশিষ্ট থাকে, তা আদায় না করা পর্যন্ত সে দায়মুক্ত হয় না। এমনকি বহু বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও জাকাত আদায় করা ছাড়া তার ইসলাম শুদ্ধ হয় না। এই অর্থেই ইমাম ইবনে হাযম বলেন:

“কারও সম্পদে যদি সে জীবিত থাকা অবস্থায় দুই বা ততোধিক বছরের জাকাত একত্রিত হয়, তবে প্রতি বছরের ওপর ওয়াজিব হওয়া হিসাব অনুযায়ী তাকে সকল বছরের জাকাতই প্রদান করতে হবে। চাই সে নিজ সম্পদ লুকিয়ে রাখার কারণে এমনটি করে থাকুক, অথবা আদায়কারীর বিলম্বে আসার কারণে হোক, কিংবা তার অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে হোক। আর এটি নগদ অর্থ, কৃষিজাত ফসল বা গবাদি পশু—সবকিছুর ক্ষেত্রেই সমান। জাকাত পরিশোধ করতে গিয়ে তার সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাক বা না যাক, এবং জাকাত গ্রহণের পর তার অবশিষ্ট সম্পদ নিসাবের নিচে নেমে আসুক বা না আসুক—উভয়

ক্ষেত্রই সমান। আর পাওনাদাররা কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না যতক্ষণ না জাকাত পূর্ণরূপে আদায় করা হয়।”

এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী শরয়ি বিধানের পদ্ধতি আধুনিক আর্থিক আইনকানুনের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এবং দাবি না করার কারণে কর মওকুফ বা তামাদির নীতি গ্রহণ করা হয়। এর অর্থ হলো, সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে জাকাত রহিত হয় না।

জাকাত ফাঁকি দেওয়া রোধ করার জন্য এগুলোই হলো প্রধান কার্যকর ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা—নিঃসন্দেহে—জাকাত ফাঁকি দেওয়ার কুমন্ত্রণা এবং প্রকৃত ফাঁকি দেওয়ার মধ্যে অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। আমরা জানি যে, জাকাত ফাঁকি নির্মূল করার অর্থ হলো রাষ্ট্রে নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক দায়বদ্ধতায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এর ফলে রাষ্ট্রে সাধারণ আর্থিক বোঝা বহনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের (মুকাল্লাফ) মাঝে পূর্ণ সমতা অর্জিত হবে, যার মধ্যে জাকাত অন্যতম প্রধান।

যে বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত তার মধ্যে একটি হলো—মুকাল্লাফের (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা; কারণ আমরা—যেমনটি ইতিপূর্বে বলেছি—এই জাকাত বা বায়তুল মালের অন্যান্য উৎসসমূহকে সমতা ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করি। আর ন্যায়বিচার এটিও দাবি করে যে, জাকাত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ধার্য করা হবে যা মুকাল্লাফের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; আর একেই জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফের পরিস্থিতির বিবেচনা বলা হয়।

শরয়ি রাজনীতি - পঞ্চম পাঠ

আমরা বলি: যেহেতু জাকাত ফরয করার উদ্দেশ্য হলো এর কল্যাণকে সর্বজনীন করা, তাই এর দাবি এমন নয় যে, জাকাত প্রদানকারীদের ওপর তা এমন অনমনীয় পদ্ধতিতে ফরয করা হবে যা তাদের অবস্থাকে বিবেচনা করে না এবং সমাজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম যে ইনসাফ দাবি করে তা নিশ্চিত করার গুরুত্ব দেয় না। ইনসাফের দাবি হলো, মুকাল্লাফ (দায়িত্বশীল ব্যক্তি) তার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহে অংশগ্রহণ করবে, অর্থাৎ সাধারণ আর্থিক দায়-দায়িত্বসমূহ অর্থ যোগানদাতাদের সচ্ছলতা অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

জাকাতের এই সর্বজনীনতার গুরুত্ব অনেক বেশি হলেও একে অবশ্যই আরেকটি ধারণার সাথে যুক্ত হতে হবে, আর তা হলো জাকাত-সংক্রান্ত দায়ের ব্যক্তিগত রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কেবল জাকাতের বোঝা বহন করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই বোঝা অবশ্যই দাতার আর্থিক সামর্থ্য এবং তার ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইসলাম দাতার পালনযোগ্য সক্ষমতার (Taxable Capacity) ধারণা গ্রহণে অগ্রণী ছিল। তাই ইসলামি আর্থিক বাধ্যবাধকতাগুলো আর্থিক সামর্থ্য তথা পালনযোগ্য সক্ষমতার ভিত্তিতে আরোপ করা হয়। মূলত ইসলামে মূলনীতি হলো সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করা। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না।" [আল-বাকারা: ২৮৬]

পবিত্র কুরআন এই আর্থিক সামর্থ্যকে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে নির্ধারিত করে দিয়েছে: "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, তোমরা যে উত্তম বস্তু ব্যয় করো তা পিতামাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা ভালো যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [আল-বাকারা: ২১৯] আর 'আফউ' হলো প্রয়োজন ও পর্যাপ্ততার অতিরিক্ত সহজলভ্য উদ্বৃত্ত অংশ। কুরআনের আয়াতটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ থেকে ব্যয় করার আবশ্যকতা নিশ্চিত করতে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা নিজেদের মধ্যে মহানুভবতা ভুলে যেও না। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [আল-বাকারা: ২৩৬]

জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ হওয়ার পর আমরা যদি মুসলমানদের মধ্যে জাকাতের বাধ্যবাধকতায় সমতার কথা বলি, তবে তার অর্থ এই নয় যে, আর্থিক সক্ষমতা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের আদায়কৃত জাকাতের পরিমাণ সমান হতে হবে। কারণ এই পরিস্থিতিতে সমতা বিধান করা হবে জুলুম; যেহেতু এটি দুই অসম ব্যক্তির মধ্যে সমতা বিধান। তবে যদি আর্থিক সক্ষমতা সমান হয়...

পঞ্চম পাঠ

...এবং একদল অর্থদাতার সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, জাকাতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সমতা বলতে উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী আর্থিক বোঝার এমন একটি অংশ বহন করবে, যা তার পরিশোধ করার সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও আনুপাতিক হয়। ফলে প্রত্যেকে তাদের সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী এবং তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করার পর জাকাত আদায় করবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই ক্ষেত্রে সমতার নীতির সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সাংঘর্ষিক নয়: যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় তাদেরকে জাকাত থেকে অব্যাহতি প্রদান করা, অথবা এমন নিসাবের মালিক হওয়া যা তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, অথবা এমন ঋণী ব্যক্তি যার ঋণ তার সম্পূর্ণ নিসাব বা তার অংশবিশেষকে গ্রাস করে ফেলেছে, অথবা জাকাতযোগ্য সম্পদের পেছনে ব্যয়িত খরচসমূহ বাদ দেওয়া। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ে উপযুক্ত বিস্তারিত আলোচনা করব।

নিসাবের কম পরিমাণ সম্পদকে জাকাত থেকে অব্যাহতি প্রদান:

জাকাত ফরজ করার ক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায়বিচারের একটি দিক হলো, এটি সামান্য পরিমাণ সম্পদকে জাকাত থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছে। জাকাত কেবল সেই সম্পদের ওপরই ফরজ করা হয়েছে যা পূর্ণ নিসাবে উপনীত হয়েছে। এটি এজন্য যাতে জাকাত গ্রহণ করা হয় উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে, যা মানুষের মনের জন্য সহজ হয় এবং তাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা তৈরি না করে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলুন: যা উদ্বৃত্ত।" আর এখানে 'উদ্বৃত্ত' বলতে সেই সম্পদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা প্রয়োজন ও পর্যাপ্ততার অতিরিক্ত। এই অব্যাহতির মূল ভিত্তি হলো, ইসলাম উম্মাহর ধনীদের ওপর কেবল জাকাত ফরজ করেছে যাতে তা তাদের অভাবীদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে নিসাব হলো সচ্ছলতার সর্বনিম্ন সীমা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই নিসাবের মালিক নয়, সে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো সচ্ছলতা অর্জন করেনি। অতএব, তার কাছ থেকে জাকাত গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই; কারণ সে নিজেই সাহায্যের মুখাপেক্ষী, সাহায্য প্রদানকারী নয়। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "উত্তম সদকা হলো যা সচ্ছলতা বজায় রেখে প্রদান করা হয়, আর যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর তাদের দিয়ে শুরু করো।"

পঞ্চম পাঠ
আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিসাব শর্ত করার হিকমত বা রহস্য হলো— যেহেতু ধনীরাই জাকাত আদায়ের জন্য আদিষ্ট, তাই এমন একটি পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে সচ্ছল বা ধনী হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং যদি কেউ এই পরিমাণের মালিক না হয়, তবে সে দরিদ্র হিসেবে গণ্য হবে। তাকে কেবল জাকাত প্রদান থেকেই অব্যাহতি দেওয়া হবে না, বরং তাকে জাকাত প্রদান করাও সম্ভব হবে। কারণ নিসাবের চেয়ে কম সম্পদকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সীমা হিসেবে ধরা হয়; ফলে ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তবে সে জাকাত পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম প্রত্যেক প্রকার সম্পদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিসাব নির্ধারণ করেছে, যার কম হলে জাকাত ওয়াজিব হয় না। এটি করা হয়েছে দায়বদ্ধ ব্যক্তির (মুকাল্লাফ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে। আমরা ইতিপূর্বে শস্য, ফলমূল এবং অন্যান্য বিষয়ের নিসাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাই এখানে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তার ওপরই ক্ষান্ত হচ্ছি।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন মাত্রার অব্যাহতি:

কোনো কোনো ফকিহ শর্তারোপ করেছেন যে, নিসাব অবশ্যই মালিকের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমেই সচ্ছলতা ও নিআমত হওয়ার বিষয়টি বাস্তবে রূপ পায় এবং এর মাধ্যমেই সানন্দ চিত্তে জাকাত আদায় করা সম্ভব হয়। কেননা, যে সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয় করা আবশ্যক, তার মালিককে সেই সম্পদ থেকে সচ্ছল বলা যায় না এবং সেটি নিআমত হিসেবেও গণ্য হয় না। কারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কেবল মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়; আর মৌলিক প্রয়োজন হলো বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপকরণ ও শারীরিক স্থায়িত্বের ভিত্তি। মানুষের টিকে থাকার জন্য যা অপরিহার্য তা-ই মৌলিক প্রয়োজন, যেমন— তার আহার, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান এবং তাকে সহযোগিতা করার মতো জ্ঞানার্জনের বইপুস্তক, পেশাগত সরঞ্জাম ইত্যাদি। কোনো কোনো হানাফি আলেম মৌলিক প্রয়োজনের ব্যাখ্যায় বলেছেন: এটি এমন বিষয় যা বাস্তবিকভাবেই মানুষের বিনাশ বা ধ্বংস প্রতিহত করে, যেমন— ভরণপোষণ, বসবাসের ঘর, যুদ্ধের সরঞ্জাম, এবং শীত বা গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক। অথবা এটি হতে পারে আনুমানিক প্রয়োজন যেমন— ঋণ। কেননা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেও ঋণ পরিশোধের জন্য সেটির প্রয়োজন রয়েছে, যাতে সে কারাবরণ থেকে রক্ষা পায় যা ধ্বংসের নামান্তর। এছাড়া পেশাগত সরঞ্জাম, ঘরের আসবাবপত্র, সওয়ারির পশু এবং জ্ঞানার্জনের কিতাবাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

...তাদের অধিকারীদের জন্য। কারণ তার নিকট অজ্ঞতা বিনাশের তুল্য। সুতরাং যদি তার কাছে এমন দিরহাম থাকে যা ওই সকল প্রয়োজনে ব্যয় করার উপযুক্ত, তবে তা অবিদ্যমান হিসেবে গণ্য হবে। এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো জাকাতদাতার মৌলিক প্রয়োজন

(হাজাতে আসলিয়া) এবং তার ওপর নির্ভরশীল স্ত্রী, সন্তান—তাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন—পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয় যাদের ভরণপোষণ তার জন্য আবশ্যক; কারণ তাদের প্রয়োজন তার নিজেরই প্রয়োজনের সমতুল্য।

মৌলিক প্রয়োজনকে আধুনিক যুগের কোনো কোনো আলেম 'পর্যাপ্ততার সীমা' (হাদ্দুল কিফায়াহ) হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, যা একজন মানুষের জন্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কারণ এটি সম্মানজনক জীবনের চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট। এর অর্থ হলো, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ দরিদ্র হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না তার জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ এমন পরিমাণে সংগৃহীত হয় যা তাকে সচ্ছল ও অন্যের অমুখাপেক্ষী করে তোলে। ইসলামে এই পর্যাপ্ততার সীমা নিশ্চিত করা একটি পবিত্র বিষয়, যা আল্লাহর হক হিসেবে অন্য সকল হকের ঊর্ধ্বে। আর এটি উপেক্ষা করার মাঝে দ্বীনকেই অস্বীকার করার নামান্তর। এই অব্যাহতির প্রমাণ হলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: **"উত্তম দান হলো তা, যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। আর তুমি তাদের থেকে শুরু করো যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর।"** এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, দানকারীর জন্য শর্ত হলো সে নিজে বা তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা যেন অভাবগ্রস্ত না হয়। এর ওপর আরও প্রমাণ বহন করে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত এই বাণী, তিনি বলেছেন: **"একটি দিনার যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছ, একটি দিনার যা তুমি গোলাম মুক্ত করতে ব্যয় করেছ, একটি দিনার যা তুমি অভাবীকে দান করেছ এবং একটি দিনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ; এর মধ্যে সওয়াবের দিক থেকে সেই দিনারটিই শ্রেষ্ঠ যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ।"** এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, মানুষের নিজের প্রয়োজন এবং তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন অন্যের প্রয়োজনের চেয়ে অগ্রগণ্য।

বাস্তবে এই অব্যাহতি জাকাতের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যকার সাম্যনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ মানুষের নিজের প্রয়োজন অন্যের প্রয়োজনের চেয়ে অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে তার পরিবার, সন্তান এবং যাদের ভরণপোষণ সে করে, তাদের প্রয়োজন তার নিজের প্রয়োজনের সমতুল্য। সুতরাং আমরা তার কাছে এমন সম্পদ থেকে কীভাবে জাকাত দাবি করতে পারি যার প্রতি সে মুখাপেক্ষী এবং তীব্র অভাবের কারণে যার সাথে তার অন্তর সংশ্লিষ্ট? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, এই ক্ষেত্রে সাম্যের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তি তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক বোঝার এমন একটি অংশ বহন করবে যা তার সক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ...

পঞ্চম পাঠ

আদায় করা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি তার কাছে থাকা সম্পদের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তার পক্ষে তা আদায় করার আর্থিক সক্ষমতা নেই। ফলস্বরূপ, তাকে জাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ দায়-দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

জাকাতদাতার অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়, তার মধ্যে একটি হলো ঋণ বিয়োগ করা:

অর্থদাতার আর্থিক সক্ষমতা তিনি ঋণগ্রস্ত কি না তার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই আদায় করার সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করার দাবি হলো, জাকাত ধার্য করার আগে জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ঋণের বোঝা বিয়োগ করা আবশ্যক। কিছু ফকিহ এই মতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, যার ওপর এমন ঋণ আছে যা সম্পূর্ণ নিসাব বা তার অংশবিশেষকে গ্রাস করে নেয়, তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না; এমনকি সেই ঋণ যদি জাকাতযোগ্য সম্পদের ভিন্ন জাতীয়ও হয়। তাঁদের মতে, ঋণ সকল প্রকার সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং যার নিকট এমন সম্পদ আছে যাতে জাকাত আবশ্যক হয়েছে এবং তার ওপর ঋণও আছে, সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ সম্পদ তা থেকে আলাদা করে নেয়।

এরপর অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে সে তার জাকাত প্রদান করবে। এই সকল ফকিহদের বক্তব্যের সারমর্ম হলো, প্রথমে তার ওপর থাকা ঋণ বিয়োগ করা উচিত, অতঃপর ঋণের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে সেটির জাকাত দিবে, আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তবে তার ওপর কোনো জাকাত নেই।

এই বিষয়ে কিছু আলেম বলেন:

যার এমন ঋণ আছে যা তার সমস্ত সম্পদকে বেষ্টন করে আছে এবং বান্দাদের পক্ষ থেকে তার নিকট পাওনা রয়েছে—চাই তা মহান আল্লাহর হক হোক যেমন জাকাত, অথবা মানুষের হক হোক যেমন কর্জ, ক্রয়কৃত মালের মূল্য, বিনষ্ট জিনিসের ক্ষতিপূরণ, জখমের জরিমানা এবং স্ত্রীর মোহরানা; চাই তা নগদ অর্থ হোক বা অন্য কিছু, এবং চাই তা তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য হোক বা বিলম্বিত—তার ওপর কোনো জাকাত নেই। কারণ উক্ত নিসাবটি ঋণদাতার মৌলিক প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এই সম্পদটি প্রকৃত কিংবা অনুমিত ধ্বংস থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে নির্ধারিত; কেননা ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে সে এর মুখাপেক্ষী।

ঋণ বিয়োগের সমর্থনে অনেক বর্ণনা বিদ্যমান: তার মধ্যে একটি হলো উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এটি তোমাদের জাকাত প্রদানের মাস, সুতরাং যার ওপর ঋণ আছে সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়, যাতে তোমরা তোমাদের সম্পদের জাকাত বের করতে পারো।" এবং এটি...

আবু উবাইদ-এর 'কিতাব আল-আমওয়াল' (পৃষ্ঠা ৫৩৪ এবং পরবর্তী) গ্রন্থে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায়, যাতে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের পরিমাণ জানা যায়, অতঃপর নিসাব পরিমাণ হলে তার জাকাত আদায় করা হয়।

অনুরূপভাবে মাইমুন ইবনে মিহরান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: যখন তোমার ওপর জাকাত ফরজ হবে, তখন তোমার সকল সম্পদের দিকে লক্ষ্য করো, এরপর তোমার যে ঋণ রয়েছে তা বিয়োগ করো, তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তার জাকাত দাও।

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যার সম্পদ আছে কিন্তু তার ওপর ঋণও আছে, তার ওপর কি জাকাত আবশ্যক হবে? তিনি বললেন: না। এটি তখন প্রযোজ্য যখন ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ না হয়।

জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ঋণ বাদ দেওয়া ইসলামি শরিয়তের মূল চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা জাকাত কেবল প্রাচুর্য থাকলেই প্রবর্তন করা হয়েছে, যেমনটি নবী (সা.) আমাদের অবহিত করেছেন। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মাঝে প্রাচুর্য নেই, বরং তার নিজের ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনীয়তা একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজনের সমতুল্য বা তার চেয়েও বেশি। আর মালিকের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে অন্যের অভাব দূর করা প্রজ্ঞাসম্মত নয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যে ঋণ পুরো নিসাব বা এর কিছু অংশ গ্রাস করে নেয়, তা অন্যান্য সম্পদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কেননা জাকাত সামর্থ্য এবং স্বচ্ছলতার ওপর ভিত্তি করে ফরজ করা হয়েছে। আর এই সামর্থ্য নির্ধারিত হয় ব্যক্তির দায়মুক্ত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে। এছাড়া জাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হয় দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করার জন্য। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির থেকে জাকাত নেওয়া সম্ভব নয়; কারণ সে ঋণগ্রস্ত হিসেবে জাকাতের হকদারদের অন্তর্ভুক্ত। আবু উবাইদ এই বিষয়টিই এভাবে স্থির করেছেন যে: যদি ঋণটি প্রকৃতই প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় যে এটি জমির

মালিকের ওপর রয়েছে, তবে তার ওপর সদকা (জাকাত) নেই, বরং ঋণের কারণে তা মওকুফ হয়ে যায়। যেমনটি ইবনে উমর, তাউস, আতা এবং মাকহুল বলেছেন। তাদের বক্তব্যের পাশাপাশি এটি সুন্নাহর অনুসরণেরও অনুকূল। আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) কেবল ধনীদের থেকে সদকা গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। আর যার ঋণ তার পুরো সম্পদকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তার মূলত কোনো সম্পদ নেই এবং সে সদকা পাওয়ার যোগ্য। এমতাবস্থায় সে নিজে জাকাতের হকদার হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে? অথবা কীভাবে একজন ব্যক্তি একই সাথে ধনী এবং দরিদ্র হতে পারে? এর পাশাপাশি সে আট প্রকার জাকাত গ্রহণকারীর অন্যতম অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আটটি ক্ষেত্র; ফলে তিনি দুই দিক থেকে এর হকদার হয়েছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আবু উবায়দ কৃত (আল-আমওয়াল) গ্রন্থের ৬১২ পৃষ্ঠা এবং এর পরবর্তী অংশগুলোতে।

যাঁর ওপর এমন ঋণ রয়েছে যা নিসাব পরিমাণ সম্পদকে পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে গ্রাস করে নেয়, তাঁকে জাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া—আমাদের বিশ্বাস মতে—জাকাতের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের (যাঁদের ওপর বিধান অর্পিত হয়েছে) মাঝে সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ ঋণের কারণে ওই ব্যক্তির জাকাত প্রদানের আর্থিক সক্ষমতা প্রভাবিত হয়েছে; অথচ জাকাত কেবল সক্ষমতা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতেই ফরজ করা হয়—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। তদুপরি, ঋণের বাধ্যবাধকতার কারণে ওই ব্যক্তি ‘গারিমীন’ (ঋণগ্রস্ত) হিসেবে জাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে পড়েছেন, যারা জাকাত পাওয়ার নির্ধারিত শ্রেণিগুলোর অন্তর্ভুক্ত; যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এছাড়া তিনি দরিদ্র হিসেবেও এর হকদার হতে পারেন; কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পদশালী নন। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে জাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া রাষ্ট্রে নির্ধারিত সাধারণ আর্থিক দায়-দায়িত্ব—যার মধ্যে জাকাতও অন্তর্ভুক্ত—বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মাঝে সমতার নীতির সাথে পরিপন্থী নয়।

জাকাত দাতার অবস্থা বিবেচনায় আমরা যেসব বিষয় লক্ষ্য করি, তার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যয় ও খরচাদি বিয়োজন করা:

ইসলামি বিধান প্রণেতা নিট আয়ের ওপর জাকাত আরোপের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। শস্য ও ফলের জাকাতের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ফকিহ মত দিয়েছেন যে, শস্য বা ফলের মালিক চাষাবাদের খরচের প্রয়োজনে যে ঋণ গ্রহণ করেছেন তা বিয়োগ করা হবে। নিচের বর্ণনাগুলো এর প্রমাণ দেয়:

জাবির ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে ঋণ গ্রহণ করে তা নিজের পরিবার ও জমিতে ব্যয় করে। তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস বলেছেন, ‘সে তার জমিতে যা ব্যয় করেছে তা পরিশোধ করবে।’ ইবনে উমর বলেছেন, ‘সে তার জমি ও পরিবারের জন্য যা ব্যয় করেছে তা পরিশোধ করবে।’ অর্থাৎ সে প্রথমে সম্পদ থেকে এই ব্যয়গুলো বিয়োগ করবে। এরপর যদি অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি তা নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে তার ওপর কোনো জাকাত নেই। ইয়াহইয়া ইবনে আদম এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: ইবনে উমর বলেছেন, ‘সে যা ঋণ করেছে তা দিয়ে শুরু করবে এবং তা পরিশোধ করবে, এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার জাকাত দেবে।’ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ‘সে ফলের পেছনে যা ব্যয় করেছে তা পরিশোধ করবে, এরপর অবশিষ্ট অংশের জাকাত দেবে।’ এটি (আল-খারাজ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ইয়াহইয়া ইবনে আদম আল-কুরাশী-এর কিতাবে (পৃষ্ঠা ১৬২ এবং পরবর্তী) রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে শুরাইককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে উশরী ভূমি ইজারা নিয়েছে এবং তাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছে। তিনি বললেন: সে তার জিম্মায় থাকা (ইজারার) খাদ্যশস্য আলাদা করে রাখবে, অতঃপর অবশিষ্ট শস্যের জাকাত প্রদান করবে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর এবং শুরাইক এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, ভূমি এবং ফসলের পেছনে যে ঋণ ব্যয় করা হয়েছে, তা জাকাত আদায়ের পূর্বেই বাদ দিতে হবে।

মাকহুল থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঋণগ্রস্ত কৃষক সম্পর্কে বলেছেন: তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে না। এরপর যা অতিরিক্ত থাকবে, তা যদি জাকাতযোগ্য সম্পদ হয় তবে তার জাকাত প্রদান করবে। এই বর্ণনাগুলো আবু উবায়দ রচিত 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থের ৬১১ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী অংশগুলোতেও বিদ্যমান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, জাকাত মূলত নিট আয় বা নিট সম্পদের ওপর প্রযোজ্য হয়। কৃষক তার ফসলের পেছনে যা ব্যয় করেছেন তা বাদ দেওয়ার অধিকার রাখেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার জাকাত প্রদান করবেন। অর্থাৎ, ফসলের মালিক যদি ফসল ও ফলের পরিচর্যার জন্য ঋণ গ্রহণ করেন—যেমন সার ক্রয় করা বা ফসল বিধ্বংসী পোকামাকড় দমনের উপকরণ কেনা—তবে সেই ব্যয় বাদ দেওয়া হবে। সার ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য যা ব্যয় হয়েছে তা বাদ দেওয়ার পরেই কেবল জাকাতযোগ্য অংশের হিসাব করা হবে। ফসলের ন্যায় অন্যান্য খাতের ক্ষেত্রেও যেমন—কলকারখানার আয়, অট্টালিকা বা দালানকোঠার ভাড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যয়সমূহ প্রকৃতপক্ষে বাদই দেওয়া হয়; কেননা জাকাত কেবল বছর শেষে মূলধন ও মুনাফার অবশিষ্ট অংশ থেকেই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যে ব্যয়গুলো হয়ে গেছে তা শেষ হয়ে গেছে যদি না তার কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে। যেমন দোকানের বকেয়া ভাড়া যা পরিশোধ করা হয়নি তা বাদ দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অংশের জাকাত প্রদান করা হবে।

আর গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও, তার পেছনে কৃত ব্যয় জাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে, যেমনটি ফসল এবং বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে করা হয়।

ষষ্ঠ পাঠ

জিজিয়া, খারাজ এবং উশর

পাঠের বিষয়সমূহ

প্রথম বিষয়: জিজিয়া ২৫৩
দ্বিতীয় বিষয়: খারাজ ২৭৪
তৃতীয় বিষয়: উশর ২৮৯

""

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

অষ্টাদশ পাঠ

জিজিয়া

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়াহ ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের উপর কিছু আর্থিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, যা জিজিয়া, খারাজ এবং উশর-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি কোনোভাবেই তাদের ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য কোনো শাস্তি ছিল না—যেমনটি কিছু প্রাচ্যবিদ দাবি করেন—বরং এই আর্থিক দায়গুলো ছিল সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কর। কারণ প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি সমাজে জীবন অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা অনেক অধিকার ভোগ করত, আর প্রতিটি অধিকারের বিপরীতে একটি কর্তব্য থাকা অনিবার্য। অতএব, ইসলামি সমাজে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য আমাদের মতো স্বাধীনতা, ব্যবসা এবং লেনদেনের অধিকার রয়েছে; বিনিময়ে তাদেরও সাধারণ কোষাগারে —অর্থাৎ: বাইতুল মাল— তাদের

সম্পদের কিছু অংশ প্রদান করা আবশ্যক। ঠিক যেমন মুসলমানরা জাকাত ও অন্যান্য অনেক আর্থিক বোঝা বহন করে, তেমনি অমুসলিমদেরও সাধারণ ব্যয়ের একটি অংশ বহন করা আবশ্যক। আর তা জিজিয়া, খারাজ এবং উশর আকারে আদায় করা হয়; যাতে তারা রাষ্ট্র গঠনে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয়ে অবদান রাখতে পারে।

এর পাশাপাশি, এই সাধারণ আর্থিক বাধ্যবাধকতাগুলো ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি এবং তাদের উপর আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষাকারী সৈন্যদের সাহায্য করার একটি সামান্য অংশ মাত্র।

জিজিয়ার সংজ্ঞা:

অভিধান অনুযায়ী জিজিয়া: এটি ‘জাযা’ (প্রতিদান) থেকে আগত একটি শব্দরূপ, এর বহুবচন হলো ‘জিযী’, যেমন ‘লিহইয়াহ’ (দাড়ি) এর বহুবচন ‘লিহী’। আর এটি হলো আহলে জিম্মাহ (জিম্মি) দের থেকে যা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ: এটি এমন অর্থ যা একজন কিতাবধারী ব্যক্তি নিরাপত্তার চুক্তির বিনিময়ে প্রদান করে থাকে।

শরীয়তের পরিভাষায় জিজিয়া হলো: কাফেরদের কাছ থেকে গৃহীত একটি নির্ধারিত কর; যা দারুল ইসলামে (ইসলামি রাষ্ট্রে) তাদের বসবাসের বিনিময়ে প্রতি বছর গ্রহণ করা হয়।

জিজিয়ার ইতিহাস:

জিজিয়া ইসলামের কোনো নতুন উদ্ভাবন নয়, বরং এটি প্রাচীন সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। এথেন্সের গ্রীকরা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দিকে এশিয়া মাইনরের উপকূলীয় বাসিন্দাদের ওপর এটি ধার্য করেছিল, ফিনিশীয়দের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষার বিনিময়ে। সেই সময় ফিনিশীয়রা পারস্যের অধীনস্থ ছিল। ফলে ওই উপকূলের বাসিন্দাদের জন্য সেই সুরক্ষার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা সহজ ছিল। রোমানরাও তাদের বিজিত জাতিগুলোর ওপর জিজিয়া আরোপ করেছিল এবং পারস্য সম্রাটরাও তাদের প্রজাদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করত।

জিজিয়া আরোপের কারণসমূহ:

যে কারণে জিজিয়া প্রবর্তন করা হয়েছে, তা ফকীহদের মধ্যে মতভেদের বিষয় ছিল, যা নিম্নরূপ:

প্রথমত: নিরাপত্তার বিনিময়ে জিজিয়া ধার্য করা হয়েছে:

কারও কারও মতে, আহলে জিম্মাদের ওপর সুরক্ষার বিনিময়ে জিজিয়া ফরয করা হয়েছে এবং সুরক্ষা দিতে অপারগ হলে তারা তা থেকে অব্যাহতি পাবে। তারা এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক সালুবা বিন নাসতুনাকে লেখা চুক্তিনামা পেশ করেন, যখন তিনি ফরাত অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। তাতে উল্লেখ ছিল: "আমি তোমাদের সাথে জিজিয়া এবং নিরাপত্তার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলাম। সুতরাং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা রইল। যতক্ষণ আমরা তোমাদের সুরক্ষা দেব, ততক্ষণ আমাদের জন্য জিজিয়া প্রাপ্য হবে, নচেৎ নয়।" অর্থাৎ, এতে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি কোনো প্রকার আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করার

বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করছেন।

মাওয়ারদী তার 'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন:

আর তা প্রদানের মাধ্যমে—অর্থাৎ জিজিয়া—তাদের জন্য দুটি অধিকার সাব্যস্ত হয়: প্রথমটি হলো তাদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকা, এবং দ্বিতীয়টি হলো তাদের সুরক্ষা প্রদান করা; যাতে তারা (আক্রমণ থেকে) নিবৃত্ত থাকার মাধ্যমে নিরাপদ থাকে এবং সুরক্ষার মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে।

দ্বিতীয়ত: সাহায্যের বিকল্প হিসেবে জিজিয়া:
কেউ কেউ মনে করেন যে, আহলে জিম্মাদের কুফরির ওপর অটল থাকার কারণে যে সাহায্য ও সহযোগিতা তারা করতে পারছে না, জিজিয়া তারই বিকল্প হিসেবে ওয়াজিব হয়। কারণ দারুল ইসলামের অধিবাসীদের ওপর সেই রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক, কিন্তু তাদের শারীরিক অবস্থা এই সাহায্যের উপযোগী নয়; কারণ তারা শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের প্রতি ঝুঁকে থাকে। তাই তাদের থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয়, যাতে তা সেইসব যোদ্ধাদের পেছনে ব্যয় করা যায় যারা রাষ্ট্র রক্ষার কাজ আঞ্জাম দেয়।

তৃতীয়ত: নিরাপত্তা ও রক্ত রক্ষার বিকল্প হিসেবে জিজিয়া:
আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে আহলে জিম্মাদের নিরাপত্তা দান এবং তাদের রক্ত রক্ষার প্রতিদান হিসেবেই তাদের ওপর জিজিয়া ওয়াজিব করা হয়েছে।

চতুর্থত: বসবাসের বিকল্প হিসেবে জিজিয়া:
কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, কাফেরদের থেকে প্রতি বছর যে কর গ্রহণ করা হয় তা দারুল ইসলামে তাদের বসবাসের কারণে; অর্থাৎ দারুল ইসলামে তাদের অবস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার বিনিময়ে এটি নেওয়া হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে জিজিয়া:
মূল নীতি হলো, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জনকল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, তাকে তার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ দায়বদ্ধতার একটি অংশ বহন করতে হবে। এটি ‘আল-গুনমু বিল-গুরমি’ (লাভ দায়বদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত) এই মূলনীতির আলোকে; কেননা এটি গ্রহণযোগ্য নয় যে, একজন ব্যক্তি সাধারণ ও বিশেষ অধিকারসমূহ ভোগ করবে এবং রাষ্ট্রের জনসেবাগুলো গ্রহণ করবে, অথচ একই সাথে সে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান থেকে নিষ্কৃতি পাবে...

অষ্টম পাঠ

রাষ্ট্রের সাধারণ বাধ্যবাধকতা ও দায়-দায়িত্বগুলো হলো তাদের জন্য যারা এর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, জিজিয়া আরোপের মূল ভিত্তি হলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্যে সমতা বিধানের একটি মাধ্যম। সুতরাং এই প্রজাদের প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উচিত রাষ্ট্রের সাধারণ আর্থিক বোঝাগুলোতে অংশগ্রহণ করা; যাতে এর বিনিময়ে সে রাষ্ট্রের সাধারণ ও বিশেষ অধিকারসমূহ এবং জনহিতকর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। যদি এই ব্যক্তি মুসলিম হয়, তবে তার ওপর নিজের সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব—যেমনটি আমরা দেখেছি। আর যদি সে অমুসলিম হয়—অর্থাৎ আহলে জিম্মা—তবে তার ওপর জিজিয়া প্রদান করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমেই অধিকার ভোগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই প্রজাদের মধ্যে সমতা অর্জিত হয়।

সুতরাং জিজিয়া হলো সাধারণ আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সেই অংশ, যা জনহিতকর কাজে এবং অভাবী অমুসলিমদের সহায়তায় ব্যয় করা হয়।

জিজিয়ার সাধারণতা:

জিজিয়ার সাধারণতা বলতে বোঝায় যে, যাদের ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি বিদ্যমান থাকবে, তাদের সকলেরই জিজিয়া প্রদান করা। সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে এটি প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। এছাড়া জিজিয়ার সাধারণতা আরও বোঝায় যে, সেই সমস্ত সম্পদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হবে যাতে জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হয়। এর অর্থ হলো, জিজিয়ার সাধারণতা ব্যক্তিগত এবং বস্তুগত—উভয় দিককেই সমন্বয় করে।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা জিজিয়ার ব্যক্তিগত সাধারণতা এবং বস্তুগত সাধারণতা—উভয় বিষয়ে আলোচনা করব:

প্রথমত: জিজিয়ার ব্যক্তিগত সাধারণতা:

যে ব্যক্তি জিজিয়ার আওতাভুক্ত হবেন, তার মধ্যে বেশ কিছু শর্ত থাকা আবশ্যক, যার মধ্যে প্রধান হলো:

প্রথম শর্ত: পুরুষ হওয়া। সুতরাং এটি কেবল পুরুষের ওপরই ওয়াজিব হয়; কারণ সে যুদ্ধের যোগ্য এক ব্যক্তি। পক্ষান্তরে নারীর ওপর কোনো জিজিয়া নেই; কারণ সে যুদ্ধের যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ষষ্ঠ পাঠ

দ্বিতীয় শর্ত: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং শিশুদের ওপর জিজিয়া ওয়াজিব নয়; কারণ মুসলিমরা তাদের ওপর বিজয়ী হলেও তাদের হত্যা করা হয় না।

তৃতীয় শর্ত: সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া। অতএব, উন্মাদের ওপর জিজিয়া ওয়াজিব নয়; কারণ সে দায়বদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয়।

চতুর্থ শর্ত: জিজিয়া প্রদানের সক্ষমতা থাকা। সুতরাং জিজিয়া আদায়ে অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তির ওপর তা ওয়াজিব নয়। তদুপরি, জিজিয়া প্রদানকারীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়াও শর্ত। তাই এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার আরোগ্য লাভের আশা নেই, অতিবৃদ্ধ, পঙ্গু এবং অন্ধ ব্যক্তির ওপর জিজিয়া ওয়াজিব নয়; যেহেতু তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই।

জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রধান শর্তসমূহ এগুলোই।

জিজিয়া প্রদানকারীদের মধ্যে সমতা বিধান:

ইসলামি শরিয়ত যেমন -আমরা যা দেখেছি সেই অনুযায়ী- জাকাতকে সকল ধনী মুসলিমের জন্য একটি সাধারণ ও ব্যাপক বিধান করেছে, তেমনি আমরা দেখতে পাই যে, এই একই শরিয়ত সক্ষম ও সুস্থ পুরুষদের ওপর জিজিয়াকে আবশ্যক করেছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে এটি সাধারণ বিধান এবং সামাজিক মর্যাদা বা কোনো বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কাউকে এখান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। অতএব, জিজিয়া আদায়ে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতার নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগগুলোই এর বড় প্রমাণ।

জিজিয়া প্রদানকারীদের মধ্যে সমতা বিধানের চূড়ান্ত প্রমাণগুলোর মধ্যে একটি হলো নাজরানবাসী এবং অন্যান্য খ্রিস্টানদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লিখিত পত্র। সেই পত্রে উল্লেখ আছে: “আর কোনো খেরাজ (ভূমি কর) বা জিজিয়া নেই, তবে কেবল ঐ ব্যক্তির ওপর যার হাতে ভূমির উত্তরাধিকার বিদ্যমান, যাদের ওপর সুলতানের (রাষ্ট্রের) পাওনা ওয়াজিব হয়। অতএব সে তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিরা যা প্রদান করে সেই অনুযায়ী তা আদায় করবে। তার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না এবং তার সামর্থ্য, ভূমি চাষ ও আবাদের শক্তি এবং ফলন আসার পরিমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে আর কিছু গ্রহণ করা হবে না। তাকে সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব দেওয়া হবে না এবং তার সমপর্যায়ের খেরাজ প্রদানকারীদের চেয়ে তার ক্ষেত্রে কোনো সীমা লঙ্ঘন করা হবে না।” সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই...

কিতাব (কুরআন) শরয়ি বিধান পালনে আদিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সমতার নির্দেশ দেয়। জিজিয়া কিংবা খরাজ প্রদানের ক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্যজনের কোনো পার্থক্য করা হয় না, যতক্ষণ তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি একরূপ থাকে। আর কোনো করদাতার ওপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয় না।

এর একটি প্রমাণ হলো—উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বনু তাগলিবের নাসারাদের জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দেননি। অথচ তারা আরব ছিল এবং তাদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বরং তিনি তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেছিলেন যে, তাদের কাছ থেকে (সাধারণের তুলনায়) দ্বিগুণ জাকাত গ্রহণ করা হবে। এটি এই বিষয়ের একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে—অর্থাৎ উমর (রা.) বনু

তাগলিবের নাসারাদের ওপর যা ধার্য করেছিলেন তা প্রমাণ করে—যাদের ওপর জিজিয়া অবধারিত হয়েছে, তাদের সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন, তা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে না।

আরও একটি প্রমাণ হলো—যখন আমর ইবনুল আস (রা.) এবং মিশরের মুকাওকিসের মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হয়েছিল, তখন তারা একমত হয়েছিলেন যে, উচ্চ ও নিম্ন মিশরের সকল কিবতিদের (কপ্ট) ওপর জনপ্রতি দুই দিনার করে ধার্য করা হবে। এই কর তাদের প্রত্যেকের ওপর ধার্য করা হয়েছিল যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে—চাই সে সম্ভ্রান্ত হোক বা সাধারণ। এর ফলে মিশরের সকল সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জিজিয়া ধার্য করা হয়েছিল। এটি রোমান যুগে প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী ছিল, কারণ তখন প্রভাবশালী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পেত। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, আমর ইবনুল আস (রা.) জিজিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি; তিনি তা সবার কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন অথবা সবার ক্ষেত্রে সমান নীতি বজায় রেখেছেন।

নাগরিকদের মধ্যে জিজিয়ার বোঝা বহনের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার লক্ষে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিশেষ সুবিধাসমূহ বাতিল করা হয়েছিল, যা তারা বাইজেন্টাইন শাসনের অধীনে ভোগ করত। অতঃপর তাদের ওপরও ইসলামী জিজিয়া ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

আরও একটি দলিল হলো—বর্ণিত আছে যে, ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমানরা যখন পরাজিত হয়, তখন জাবালা ইবনুল আইহাম তার গোত্রের একদল লোকসহ নিজ অবস্থানে চলে যান। অতঃপর ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান তার নিকট লোক পাঠিয়ে তার ভূমির খরাজ এবং তার মস্তকের খরাজ—অর্থাৎ জিজিয়া—দাবি করেন। জাবালা ভূমির কর প্রদান করতে অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি দম্ভ প্রকাশ করেন এবং মস্তকের জিজিয়া দিতে সম্মত হননি। তিনি বললেন: 'জিজিয়া কেবল অলুজরাই (অনারব)—অর্থাৎ সাধারণ নিচু শ্রেণির মানুষরাই—প্রদান করে থাকে, আর আমি তো একজন আরব ব্যক্তি।' ফলে তাকে জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

ইসলামি প্রহরী

রোমান যুগে, যখন তিনি দেখলেন যে মুসলমানরা তার কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে অনড় এবং এক্ষেত্রে অন্যদের সাথে তাকে সমান গণ্য করা হচ্ছে; তখন তিনি দেশ ত্যাগ করে রোমান ভূখণ্ডে চলে যান, যাতে মুসলমানদের জিযিয়া প্রদান করতে না হয়। এভাবেই আমরা দেখি যে, আমাদের দ্বীন মানুষের মাঝে সমতার ডাক দেয়। ঘাসসান রাজা জাবালা বিন আল-আইহামের প্রতি কোনো পক্ষপাত করা হয়নি। নিজ কওমের মধ্যে এবং রোমানদের কাছে অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তাকে জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অথচ রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জিযিয়া আরোপের ক্ষেত্রে জুলুমপূর্ণ; তারা কৃষকদের থেকে তা আদায় করত এবং সক্ষম ব্যক্তিদের অব্যাহতি দিত; সম্রাটের নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে এবং সমাজে তাদের বিশেষ অবস্থানের কারণে। ইসলাম এই যুক্তি সমর্থন করে না। সুতরাং শর্তাবলি পাওয়া যায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর জিযিয়া আবশ্যক, তার সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন। এই কারণেই মুসলিম শাসকরা ঘাসসান রাজের নিকট জিযিয়া দাবি করেছিলেন, যেমনটি আমরা দেখেছি। আর এই অর্থেই—

আবু ইউসুফ তার 'আল-খারাজ' কিতাবে বলেন:

“ওয়ালীর (শাসক) জন্য বৈধ নয় যে, তিনি খ্রিস্টান, ইহুদি, অগ্নিউপাসক, সাবেয়ী এবং সামেরীয়দের কাউকে জিযিয়া প্রদান ব্যতীত ছেড়ে দেবেন। তাদের কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়াও জায়েয নয়। কাউকেও বাদ দেওয়া যাবে না এবং প্রত্যেকের থেকে তা গ্রহণ করতে হবে; কারণ তাদের রক্ত ও সম্পদ কেবল জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়।”

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, জিযিয়ার ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের (দায়িত্বপ্রাপ্তদের) মাঝে সমতার মূলনীতি পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়েছে। এর অর্থ হলো, জিযিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সর্বজনীনতা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: জিযিয়ার ক্ষেত্রে বৈষয়িক সর্বজনীনতা:

জিযিয়া যখন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিশোধে সক্ষম পুরুষের ওপর ওয়াজিব—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি—তবে শর্ত হলো তার নিকট এমন সম্পদ থাকতে হবে যা থেকে তা পরিশোধ করা যায়। সুতরাং জিযিয়া আবশ্যক হয়—

ষষ্ঠ পাঠ
ইসলামী রাজনীতি

সম্পদ, আর এ কারণেই অন্ধ, পঙ্গু, দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আর এটি মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে বোঝা যায়: "যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে।" [আত-তাওবাহ: ২৯]

আর প্রদান করাটা আবশ্যিকভাবে ব্যক্তিদের অধিকারে থাকা সম্পদ থেকেই হয়ে থাকে, তা সরাসরি পরিশোধের মাধ্যমে হোক কিংবা জামানতের মাধ্যমে। এই কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব জিজিয়ার পরিমাণে তারতম্য করতেন; করদাতার মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে। সুতরাং যখন তার সম্পদ বেশি হতো, তখন এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হতো, আর যদি তার সম্পদ কম হতো, তবে এর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হতো। তিনি সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের জন্য তাদের সচ্ছলতার কারণে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা বহাল রেখেছিলেন; আর ইয়ামানবাসীদের জন্য তাদের আর্থিক সম্পদের স্বল্পতার কারণে তা কমিয়ে দিয়েছিলেন।

যদিও জিজিয়ার মূল ভিত্তি ছিল দিরহাম, দিনার এবং খাদ্যদ্রব্য, তবুও নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্যসামগ্রী ও গবাদি পশু গ্রহণ করা বৈধ। উমর ইবনুল খাত্তাব জিজিয়া হিসেবে উট গ্রহণ করতেন এবং সিরিয়া থেকে জিজিয়া বাবদ অনেক গবাদি পশু তাঁর কাছে আসত। আর আলী ইবনে আবি তালিব প্রত্যেক পেশাজীবীর কাছ থেকে (তার পেশার সামগ্রী) গ্রহণ করতেন; যেমন সুঁই প্রস্তুতকারীর কাছ থেকে সুঁই, শান দেওয়ার পাথর প্রস্তুতকারীর কাছ থেকে পাথর এবং দড়ি প্রস্তুতকারীর কাছ থেকে দড়ি। অর্থাৎ, তারা করদাতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তার ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতেন না।

জিজিয়ার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা অর্জনে সহায়তাকারী উপাদানসমূহ:

আমরা জেনেছি যে ইসলামী আইন জিজিয়ার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা অর্জনে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে, তা ব্যক্তিগত সর্বজনীনতা হোক কিংবা বস্তুগত সর্বজনীনতা। তবে শরিয়ত কেবল এটি নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করেছে। কারণ সর্বজনীনতা বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় হয়তো এমন কিছু ঘটতে পারে যা এতে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী আইন একই সাথে এই সর্বজনীনতার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি এমন প্রতিটি বিষয়কে দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় যা এতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

সিয়াসাহ শারইয়াহ (শরীয়াহ ভিত্তিক শাসননীতি)

ষষ্ঠ পাঠ

জিজিয়ার ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা নিশ্চিত করতে সহায়ক বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

প্রথমত: জিজিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈত কর আরোপ রোধ করা:

নাজরানের সন্ধি সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের ওপর রৌপ্য মুদ্রার ওকিয়া হিসেবে দুই হাজার জোড়া কাপড় (হুল্লা) ধার্য ছিল। প্রতি রজব মাসে এক হাজার হুল্লা এবং প্রতি সফর মাসে এক হাজার হুল্লা প্রদান করতে হতো এবং প্রতি হুল্লার সাথে এক ওকিয়া রৌপ্য ছিল। যা কিছু খরাজের চেয়ে অতিরিক্ত হতো কিংবা ওকিয়ার চেয়ে কম হতো, তা হিসাব করা হতো। এর মাধ্যমে পবিত্র সুন্নাহ এই নির্দেশনা প্রদান করেছে যে, জিজিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা (একই কর বারবার নেওয়া) জুলুমের শামিল। অতএব, এতে কোনো দ্বৈততা নেই। এর প্রমাণ হলো, নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে কৃত সন্ধিতে খরাজের অতিরিক্ত যা হতো তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। হয় সেই বাড়তি অংশ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হতো অথবা পরবর্তী বছরের পাওনার সাথে সমন্বয় করা হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী সেই দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে: “সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম (মুয়াহিদ)-এর ওপর জুলুম করবে, অথবা তাকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজের ভার দেবে, কিংবা তার হক কমিয়ে দেবে অথবা তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে মামলাকারী (বাদী) হবো।”

জিজিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের বাস্তবিক প্রয়োগ হিসেবে, কর আদায়ের সময় করদাতাদের ঘাড়ে সিল বা মোহর মেরে দেওয়া হতো যতক্ষণ না তাদের তল্লাশি বা যাচাই সম্পন্ন হতো। এরপর সেই মোহরগুলো ভেঙে ফেলা হতো, যেমনটি উসমান বিন হুনাইফ (রা.) তাদের সাথে করেছিলেন যখন তারা সেগুলো ভেঙে ফেলার অনুরোধ করেছিল। একইভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট যিম্মিদের ঘাড়ে মোহর মেরে দেওয়ার জন্য লিখেছিলেন। এটি করা হয়েছিল কর আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ নির্ভুলতা ও নিখুঁততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, যাতে কর ধার্য করা হয়েছে এমন কেউ কর ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে এবং যাতে জিজিয়ার ক্ষেত্রে 'সানিয়্যাহ' বা দ্বৈততা সৃষ্টি না হয়।

জিজিয়া বা কর আদায়ের পদ্ধতিকেও সুশৃঙ্খল করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রধানগণ কর সংগ্রাহকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা করদাতাদের কর পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রদান করেন, যাতে এটি তাদের জন্য দলিল হিসেবে কাজ করে এবং একই বছরে একই মালের ওপর পুনরায় কর দাবি করা থেকে তাদের রক্ষা করে।

জিজিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা প্রতিরোধের বিষয়ে আমরা বলি: মূল কথা হলো, জিজিয়ার এই দায়ভার করদাতাদের ওপর এমনভাবে সুষম বণ্টন করা যেন তা ইনসাফপূর্ণ হয় এবং করদাতার আর্থিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যাতে...

ষষ্ঠ পাঠ

মুকাল্লাফ ব্যক্তি একই বছরে দুইবার তার ওপর ওয়াজিব পাওনা পরিশোধ করবে। যদি জিযিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে এই দ্বৈততা ঘটে, তবে যে ব্যক্তির ওপর এই দ্বৈততা আপতিত হলো, সে এমন এক আর্থিক বোঝা বহন করল যা তার সমপর্যায়ের আর্থিক সামর্থ্যসম্পন্ন অন্য একজন মুকাল্লাফের ওপর অর্পিত বোঝার চেয়ে অধিক। এর মাধ্যমে সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান সাম্য নীতি বিলুপ্ত হয়, অথচ জিযিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে এই সাম্য বজায় থাকা আবশ্যক। অন্যদিকে, যার ওপর এই দ্বৈত করের বোঝা চেপেছে, সে জিযিয়া সংগ্রহকারী ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে; কারণ সে তার ওপর জুলুম করা হয়েছে বলে অনুভব করবে। আর এটি তাকে জিযিয়া ফাঁকি দেওয়ার দিকে ধাবিত করতে পারে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—এটি নির্ধারিত আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে বিদ্যমান সাম্য নীতিকে বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে, এই দ্বৈততা রোধ করা হলে প্রত্যেক মুকাল্লাফ তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী যথাযথ পরিমাণ আর্থিক দায়ভার বহন করবে এবং এর ফলে জিযিয়া বহনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে সাম্য নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয়ত: জিযিয়ার ক্ষেত্রে অতীতকাল থেকে কার্যকারিতা (রেট্রোঅ্যাক্টিভিটি) পরিহার করা:

আহলে জিম্মাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে এবং এর পরিমাণও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে এক দিনার অথবা তার সমপরিমাণ 'মা'আফিরি' কাপড় গ্রহণ করেন। যেমন উমর বিন খাত্তাব (রা.) জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন এবং একে স্তরবিন্যাস করেছিলেন। তিনি ধনীদের ওপর বছরে ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের ওপর বছরে ২৪ দিরহাম এবং শ্রমিক ও হস্তশিল্পীদের ওপর বছরে ১২ দিরহাম জিযিয়া ধার্য করেছিলেন। জিযিয়া আদায়ের সময়সীমা মুকাল্লাফদের স্বার্থ ও সুবিধার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছিল। অঞ্চলভেদে এই সময়ের ভিন্নতা ছিল; সাধারণত কৃষি মৌসুমের শেষে এবং ফসল বিক্রির সময় এটি গ্রহণ করা হতো যেন করদাতাদের জন্য সহজ হয়। জিযিয়ার এই পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর কারও পক্ষেই এটি পরিবর্তন করা বৈধ নয়।

তবে সন্ধি চুক্তিতে যদি জিযিয়ার পরিমাণ উল্লেখ না থাকে, তবে শাসকের অধিকার রয়েছে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জিযিয়া ধার্য করার। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আহলে আহদ (যাদের সাথে সন্ধি হয়েছে) থেকে সেই পরিমাণই গ্রহণ করতেন যার ওপর তাদের সাথে সন্ধি হয়েছে। তিনি তা থেকে কিছুই কমাতেন না এবং তাতে কোনো বৃদ্ধিও করতেন না। আর তাদের মধ্যে যারা জিযিয়া প্রদানের শর্তে বসতি স্থাপন করত কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত থাকত না, উমর (রা.) তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন; যদি তারা অভাবী হতো তবে তিনি তাদের বোঝা লাঘব করতেন, আর যদি তারা সচ্ছল হতো তবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জিযিয়া বৃদ্ধি করতেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি শরীয়ত জিযিয়া সংক্রান্ত আইনসমূহ সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে আইনের সংখ্যাধিক্য পরিহার করেছে এবং সেগুলোকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেছে, যা কোনো প্রকার প্রতারণা বা

কূটকৌশলের উদ্রেক করে না। ফলে এটি এই আইনগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে সেই সব ছিদ্রপথ বন্ধ করা হয়েছে, যার দ্বারা জিযিয়া প্রদানে আদিষ্ট ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত জিযিয়ার বোঝা অন্য কোনো আদিষ্ট ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতো। এর অর্থ হলো জিযিয়ার ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখীতা (retroactivity) পরিহার করা। আর এই পশ্চাৎমুখীতা পরিহারের মাধ্যমেই জিযিয়ার দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে তাদের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সমতা নিশ্চিত হয়।

তৃতীয়ত: জিযিয়া প্রদানে ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ:

মুসলিমগণ জিযিয়া প্রদানে ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। হাবীব ইবনে মাসলামাহ এবং তাঁর বিজিত কিছু অঞ্চলের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখ আছে: "তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, তোমাদের পরিবার-পরিজন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের উপাসনালয়, গির্জা, ধর্ম এবং ইবাদত-বন্দেগির জন্য নিরাপত্তা প্রদান করা হলো; এই শর্তে যে, তোমরা বিনীতভাবে জিযিয়া প্রদানের স্বীকৃতি দেবে। প্রতি ঘরের অধিবাসীদের ওপর এক পূর্ণ দীনার ধার্য করা হলো। জিযিয়া ফাঁকি দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে তোমরা বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলোকে একত্রিত করতে পারবে না, আবার আমাদের পক্ষ থেকেও জিযিয়া বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একত্রিত পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।"

এর অর্থ হলো, তাদের ওপর প্রতিটি বাড়ির জন্য এক দিনার ধার্য করা হয়েছিল। তবে তাদের কাছে দাবি করা হয়েছিল তারা যেন বাড়িগুলোকে একে অপরের সাথে একত্রিত না করে, যার ফলে তারা কেবল এক দিনার পরিশোধ করবে। তাদেরকে আরও বলা হয়েছিল যে, আমরা তাদের প্রতি জুলুম করব না এবং আমরা প্রতিটি বাড়ি থেকে কেবল এক দিনারই গ্রহণ করব। এটি প্রমাণ করে যে, জিযিয়া কমানোর জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পৃথক পরিবারগুলোকে একত্রিত করা বৈধ নয়; কারণ প্রতিটি বাড়ি থেকে এক দিনার পাওনা। সুতরাং তারা যদি দুই বা ততোধিক পরিবারকে একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে, তবে তাদের ওপর ওয়াজিবকৃত অর্থের পরিমাণ কমে যাবে।

তাছাড়া উমর ইবনুল খাত্তাব তার জিযিয়া আদায়কারী কর্মকর্তাদের কাছে লিখেছিলেন যে, তারা যেন যিম্মিদের ঘাড়ে সিলমোহর মেরে দেয়। কর আদায়ের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যাতে যার ওপর কর ধার্য করা হয়েছে সে যেন কর ফাঁকি দিতে না পারে।

জিযিয়া ফাঁকি রোধের উপায়সমূহ:

জিযিয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা বা ফাঁকি দেওয়া রোধ করার জন্য বেশ কিছু উপায় রয়েছে, যার মধ্যে প্রধানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের ন্যায়পরায়ণতা:

করদাতাদের ওপর অর্পিত আর্থিক বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের জুলুম। ইবনে খালদুন যেমনটি বলেছেন— করদাতাদের প্রতি কোমলতা করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং জুলুম তা কমিয়ে দেয়, এমনকি তা দেশ ধ্বংসের কারণও হতে পারে। এছাড়া কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে কিছু করদাতার প্রতি সুআচরণের মাধ্যমে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হলে, যাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি তারা তাদের ওপর ওয়াজিবকৃত জিযিয়া ফাঁকি দিতে

উৎসাহিত হয়। এর কারণ হলো কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের আচরণে নিজেদের ও অন্যদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই...

ইসলামের শিক্ষা এই আহ্বান জানায় যে, কর আদায়কারী কর্মচারীরা যেন করদাতাদের সাথে তাদের লেনদেনে ন্যায়পরায়ণ ও সদয় হয়। কর আদায়কারী যেন মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে। সে তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দিবে না যা তারা সহ্য করতে পারে না, তাদের প্রহার করবে না, তাদের বন্দি করবে না এবং করদাতাদের শরীরে এমন কোনো কষ্ট দিবে না যা তারা অপছন্দ করে। বরং তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করতে হবে। হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফিলিস্তিনে জিজিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে একদল লোককে শাস্তি ভোগ করতে দেখে অতিক্রম করার সময় বললেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয়।"

খলিফারা প্রায়ই কর আদায়কারী কর্মচারীদের কর আদায়ে ন্যায়বিচার বজায় রাখা, করদাতাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা এবং তাদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা না চাপানোর নির্দেশ দিতেন।

এর একটি প্রমাণ হলো আবু উবায়দ যা বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট জিজিয়ার প্রচুর অর্থ আনা হলে তিনি কর আদায়কারী কর্মচারীদের বললেন: "আমার মনে হচ্ছে তোমরা মানুষকে ধ্বংস করে ফেলেছ।" তারা বলল: "না, আল্লাহর কসম! আমরা যা গ্রহণ করেছি তা সন্তুষ্টির সাথেই (অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে) গ্রহণ করেছি।" তিনি বললেন: "কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি বা ঝুলিয়ে রাখা (নির্যাতন) হয়নি তো? অর্থাৎ তোমরা কি মানুষকে প্রহার করোনি?" তারা বলল: "হ্যাঁ (প্রহার করিনি)।" তিনি বললেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার হাতে এবং আমার শাসনামলে এমনটি হতে দেননি।" উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন তাদের আনা এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ দেখলেন, তখন তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তারা সম্ভবত জিম্মিদের (অমুসলিম নাগরিকদের) কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কিছু আদায় করেছে। অতঃপর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে তারা জিম্মিদের ওপর কোনো জুলুম করেনি, তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন যে তাঁর যুগে জিম্মিদের ওপর কোনো জুলুম হয়নি।

ইসলামী শরীয়ত যে কর আদায়কারী কর্মচারীদের করদাতাদের ওপর জুলুম করার অনুমতি দেয় না, বরং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার এবং তাদের মধ্যে পূর্ণ সমতা কায়েম করার নির্দেশ দেয় তার আরও একটি প্রমাণ হলো— ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত গ্রিক প্যাপিরাস কাগজগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত একটি নির্দেশনামা। ডক্টর "ট্রাইটন" তাঁর "ইসলামে জিম্মিগণ" গ্রন্থে এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। সেখানে মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে জিজিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরিত এই নির্দেশনার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে:

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

অষ্টম পাঠ

আমাদের এটা জানতে দিও না যে, তুমি তোমার অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর -অর্থাৎ তোমার জনপদে- কর আরোপের ক্ষেত্রে কোনোভাবে অন্যায় করেছ, যা আদায়ের দায়িত্ব তোমাকে অর্পণ করা হয়েছে; অথবা তুমি কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছ কিংবা কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারো ওপর জুলুম করেছ। কারণ আমরা জানি যে, যাদের ওপর কর প্রদান আবশ্যক, তারা অবশ্যই তা প্রদান করবে এবং তোমার কোনো অন্যায় আদেশ তারা পালন করবে না। যদি আমি জানতে পারি যে জিযিয়া সংগ্রাহকরা -অর্থাৎ কর আদায়কারীগণ- কারো প্রতি অনুরাগের কারণে অতিরিক্ত শিথিলতা প্রদর্শন করেছে, অথবা কারো প্রতি বিদ্বেষের কারণে তার ওপর অত্যন্ত গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছে, তবে শরীয়ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা তাদের ব্যক্তি ও সম্পদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব। অতঃপর তাদের সতর্ক ও সাবধান করো। তাদের জানিয়ে দাও যেন তারা কোনো ব্যক্তির ওপর সাধ্যাতীত বোঝা না চাপায়, যদিও সে ব্যক্তি তাদের দলভুক্ত না হয় কিংবা তাদের থেকে দূরে অবস্থান করে। বরং কর আদায়ের ক্ষেত্রে সকলের সাথে ইনসাফ করা ওয়াজিব। প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী করের অংশ গ্রহণ করতে হবে। অমুসলিমদের থেকে বর্ণিত এই বক্তব্যসমূহ মুসলিমদের ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য দেয়; আর এই কথাগুলো ডক্টর 'ট্রাইটন' রচিত 'আহলে জিম্মা ফিল ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

ট্রাইটনের 'আহলে জিম্মা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত এই উদ্ধৃতিটি স্পষ্ট করে যে, তৎকালীন শাসকরা জিযিয়া ও খারাজ আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা আদায়কারীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের থেকে এই নিশ্চয়তা নেন যে তারা যেন কারো ওপর জুলুম না করে, যদিও সে ব্যক্তি তাদের থেকে দূরে থাকে, তাদের দলভুক্ত না হয় কিংবা তাদের সাথে চলাফেরা না করে। এটি জিযিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ইনসাফের ব্যাপারে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে এক জোরালো সাক্ষ্য।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম জিযিয়া আদায়কারী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয় যাতে তারা করদাতাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। নিঃসন্দেহে এর একটি ইতিবাচক প্রভাব ঐ ব্যক্তিদের হৃদয়ে পড়ে, যা তাদের এই কর প্রদান থেকে বিমুখ হতে বা পলায়ন করতে বাধা দেয়। ফলশ্রুতিতে এটি সকল করদাতার মাঝে তাদের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী পূর্ণ সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করে।

ষষ্ঠ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

দ্বিতীয়ত: করদাতাদের তালিকাভুক্তকরণ:

করদাতা এবং তাদের সম্পদের তালিকা তৈরি করার বিষয়টি জিজিয়া নিরূপণ এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে তা সংগ্রহ করতে সক্ষম করে তোলে। এর ফলে জিজিয়া প্রদান থেকে পলায়ন বা ফাঁকি দেওয়ার পথ রুদ্ধ হয়। এর প্রমাণ হলো, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সাওয়াদ অঞ্চলের অধিবাসীদের গণনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তাদের গণনা করা হয় এবং তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হয়। একইভাবে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানও করেছিলেন। তিনি জাজিরা অঞ্চলে তার আমেল (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) যাহহাক ইবনে আব্দুর রহমান আল-আশআরীর নিকট বার্তা পাঠান এবং তাকে জনশুমারি বা মানুষ গণনা করার নির্দেশ দেন। তিনি সকল মানুষকে শ্রমজীবী হিসেবে গণ্য করেন এবং একজন শ্রমিক পুরো বছরে যা উপার্জন করে তা হিসাব করেন। এরপর সেই আয় থেকে তার খাদ্য, আনুষঙ্গিক খাবার (তরকারি) ও পোশাকের ব্যয় বাদ দেন এবং পুরো বছরের উৎসবের দিনগুলোও বিয়োগ করেন। এরপর তিনি দেখতে পান যে, সব বাদ দিয়ে বছরে প্রত্যেকের কাছে চার দিনার অবশিষ্ট থাকে; তখন তিনি তাদের ওপর তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করেন। অর্থাৎ, তিনি তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয়

বিষয়গুলো বিবেচনা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশের ওপরই কেবল জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। এটি যিম্মিদের সাথে মুসলিমরা যে ন্যায়বিচারের নীতি বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারই প্রমাণ বহন করে।

তৃতীয়ত: জিজিয়া আদায়ে অবহেলাকারীদের সম্পদের ওপর আইন প্রয়োগ:

যদি যিম্মিরা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন যে এটি তাদের চুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। আর তাদের নিকট থেকে ঋণের ন্যায় জিজিয়া বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হবে। আমরা বলি: জিজিয়া ফাঁকি দেওয়া রোধ করার অন্যতম উপায় হলো, ফাঁকিদাতাকে তা আদায় না করা পর্যন্ত কারারুদ্ধ রাখা। এই প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: যিম্মিদের কারারুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা তাদের ওপর অর্পিত পাওনা আদায় করে। আর তাদের নিকট থেকে জিজিয়া পুরোপুরি উসুল না হওয়া পর্যন্ত তারা কারাগার থেকে মুক্তি পাবে না।

জিজিয়া ফাঁকি দেওয়া রোধ করার জন্য এগুলোই হলো প্রধান কার্যকর মাধ্যম। আর নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে যারা জিজিয়া ফাঁকি দেওয়ার কুমন্ত্রণা পায়, আর তাদের মাঝে...

ষষ্ঠ পাঠ
শরয়ি রাজনীতি (আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ)

এই পলায়নপরতা; আর আমরা জানি যে জিজিয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার প্রবণতা নির্মূল করার অর্থ হলো আহলে জিম্মাহর (সংরক্ষিত অমুসলিম নাগরিক) সকলে—যাদের ক্ষেত্রে জিজিয়া ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ বিদ্যমান—তারা যেন কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই রাষ্ট্রের নির্ধারিত আর্থিক ব্যয়ে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে জিজিয়া প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে এর বোঝা বহনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা অর্জিত হয়।

জিজিয়া প্রদানকারীদের পরিস্থিতির বিবেচনা:

আহলে জিম্মাহর অন্তর্ভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন এবং সামর্থ্যবান পুরুষগণ, যারা জিজিয়া প্রদানে আদিষ্ট, তারা মূলত তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক দায়-দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে। কেননা দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ব অর্পণ কেবল সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে; কারণ আল্লাহ কোনো প্রাণের ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। আর একারণেই এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর জুলুম করা বৈধ নয়; কারণ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: “সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের (মুয়াহিদ) প্রতি জুলুম করবে, অথবা তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে, অথবা তাকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব দেবে, অথবা তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করব।” সুতরাং তাদের থেকে জিজিয়া বাবদ যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হবে, তাতে অবশ্যই তাদের আর্থিক সক্ষমতা এবং তাদের যাবতীয় পারিবারিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর এই পরিমাণটি একেক জন থেকে অন্য জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়, এমনকি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হতে পারে, ঠিক যেমন এটি পরিবেশভেদেও পরিবর্তিত হয়। এই কারণে জিজিয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করা উচিত নয়। সুতরাং যদি দাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায় তবে জিজিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর যদি তার সম্পদ কমে যায় তবে এর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে। আর ‘রুহা’র সন্ধির বিষয়ে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি যা ইঙ্গিত করেছিলেন, তাতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন:

“আপনি যদি তাদের সাথে একটি নির্দিষ্ট অংকের বিনিময়ে সন্ধি করেন আর পরবর্তীতে তারা তা আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে তাদের হত্যা করার অধিকার আপনার থাকবে না এবং আমরা তাদের ওপর আরোপিত সেই নির্দিষ্ট অংকের শর্তটি বাতিল করতে

বাধ্য হব। পক্ষান্তরে তারা যদি সচ্ছল হয়, তবে তারা তা আদায় করবে সেই অবনত অবস্থা (সাগার) ব্যতিরেকে যার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সন্ধি গ্রহণ করুন এবং তাদের এই শর্তে সন্ধি দান করুন যে, তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী—অর্থাৎ তারা যতটুকু সক্ষম এবং প্রদানকারীর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী—তা আদায় করবে। কারণ...”

“তারা সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, তারা যা সহ্য করতে পারে তার বাইরে তাদের ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই। তোমার শর্ত পূর্ণ হয়েছে এবং তা বাতিল হয়নি।” আবু উবাইদাহ এটি গ্রহণ করলেন।

এটি নির্দেশ করে যে, সর্বোত্তম হলো জিজিয়ার পরিমাণ প্রতি বছর সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকে নির্ধারণ না করা। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তারতম্য হওয়া উচিত।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, উমর ইবনুল খাত্তাব জিজিয়ার পরিমাণে পার্থক্য করেছিলেন করদাতার সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে। যদি তার সম্পদ বেশি হতো, তবে জিজিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হতো, আর যদি সম্পদ কম হতো, তবে তা কমিয়ে দেওয়া হতো। তিনি সিরিয়া ও ইরাকবাসীর জন্য এই পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের স্বচ্ছলতার কারণে; পক্ষান্তরে ইয়েমেনবাসীর জন্য তা কমিয়ে দিয়েছিলেন তাদের আর্থিক সক্ষমতা কম হওয়ার কারণে।

করদাতার কর প্রদানের সক্ষমতা অনুযায়ী জিজিয়ার পরিমাণে এই তারতম্য আধুনিক অর্থব্যবস্থার কর সংক্রান্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে বিবেচিত, যা হলো করের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার। জিজিয়ার পরিমাণে এই পার্থক্য মূলত করদাতাদের আর্থিক সক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখারই ফল। এটি সেই সমতা নীতির ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় যেখানে ন্যায়বিচার রক্ষা করা হয়েছে; কারণ অসম ব্যক্তিদের মধ্যে সমতা বিধান করা মূলত জুলুম।

জিজিয়া প্রদানকারীর পরিস্থিতি বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো আমরা নিচে আলোচনা করছি:

জিজিয়া প্রদানে অক্ষমদের অব্যাহতি প্রদান:

আমরা যদি যাকাতের ক্ষেত্রে সমতার আলোচনার মাধ্যমে দেখে থাকি যে, নিসাবের কম সম্পদ যাকাত থেকে অব্যাহতি পায়, তবে জিজিয়ার ক্ষেত্রেও বিষয়টি ভিন্ন নয়। জিজিয়া প্রতিটি সম্পদ থেকে নেওয়া হয় না; বরং সেই সামান্য সম্পদকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যা তার মালিক থেকে দারিদ্র্যের অবস্থা দূর করে না এবং তাকে স্বচ্ছল বলে সাব্যস্ত করে না। অতএব, জিজিয়া জিম্মিদের উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন: "জিম্মিদের সম্পদের মধ্যে উদ্বৃত্ত অংশ ছাড়া আর কিছুর ওপর (জিজিয়া) নেই।" অর্থাৎ: তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

সহকারী শিক্ষক

যদি গৃহীত অংশটি হয় 'আফউ'—অর্থাৎ যা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত—তবে এর ফলশ্রুতিতে ঐসব অক্ষম ব্যক্তিদের অব্যাহতি প্রদান করা হয় যাদের সামর্থ্য জিজিয়ার বোঝা বহন করার অনুকূল নয়। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নাজরানবাসী ও সকল খ্রিস্টানদের নিকট লিখিত পত্রে পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, যার অধীনে ভূমির উত্তরাধিকার রয়েছে এবং যার ওপর শাসকের প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, এমন ব্যক্তি ব্যতীত কারো ওপর খারাজ বা জিজিয়া নেই। সুতরাং সে তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিরা যা প্রদান করে সেই অনুযায়ী তা প্রদান করবে। তার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না এবং তার সামর্থ্য, ভূমি কর্ষণ ও আবাদের শক্তি এবং ফসলের উৎপাদন অনুযায়ীই কেবল তার থেকে কর গ্রহণ করা হবে। তার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হবে না এবং তার সমপর্যায়ের খারাজ প্রদানকারীদের নির্ধারিত সীমা তার ক্ষেত্রে অতিক্রম করা হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের পরিস্থিতি যখন একই রকম হয়, তখন তাদের মধ্যে সমতার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি করদাতার ওপর তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপান না এবং যার জিজিয়া প্রদানের সামর্থ্য নেই তাকে তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা একথাই প্রমাণ করে: "খারাজ ও জিজিয়া নেই কেবল সেই ব্যক্তির ওপর ছাড়া যার হাতে ভূমির উত্তরাধিকার রয়েছে।" এর অর্থ হলো অক্ষম ব্যক্তিদের জিজিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদান করা।

এর আরও একটি প্রমাণ হলো যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নাজরানের খ্রিস্টানদের ইরাকে স্থানান্তরের সময় তাদের থেকে চব্বিশ মাসের জিজিয়া মওকুফ করেছিলেন, যেন তারা সেখানে থিতু হতে পারে এবং উৎপাদন শুরু করতে পারে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্থানান্তর ও উৎপাদন শুরুর মধ্যবর্তী সময়কালে—যা ছিল চব্বিশ মাস—নাজরানবাসীর কাছে জিজিয়া প্রদানের উপযোগী পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল না। ফলে তাদের ক্ষেত্রে 'ধনাঢ্যতা' বা 'সচ্ছলতা'র বৈশিষ্ট্যটি অর্জিত হয়নি যা জিজিয়া আবশ্যক হওয়ার শর্ত। এ কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ঐ সময়ের জন্য তাদের জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

এর সপক্ষে আরও একটি দলিল হলো যা বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ঐ মিসকিন বা দরিদ্র ব্যক্তির ওপর থেকে জিজিয়া মওকুফ করেছিলেন যাকে মানুষ সদকা প্রদান করে। বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একবার এক সম্প্রদায়ের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন...

শরয়ী রাজনীতি
অভিজ্ঞ শিক্ষক

তাঁর নিকট একজন বৃদ্ধ অন্ধ যাচনাকারী আবেদন করলে উমর (রা.) পিছন থেকে তার বাহুতে স্পর্শ করে বললেন: "তুমি কোন আহলে কিতাবভুক্ত?" সে উত্তর দিল: "আমি একজন ইহুদি।" তিনি বললেন: "তোমাকে আমি যে অবস্থায় দেখছি সে অবস্থায় কিসে বাধ্য করল?" সে বলল: "জিজিয়া (কর), অভাব এবং বার্ধক্যের কারণে (ভিক্ষা করছি)।" তখন উমর (রা.) তার হাত ধরলেন এবং

তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে যা ছিল তা থেকে তাকে কিছু দান করলেন। এরপর তিনি বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষের কাছে লোক পাঠালেন এবং বললেন: "একে এবং এর সদৃশ ব্যক্তিদের দেখাশোনা করো। আল্লাহর শপথ! আমরা তার প্রতি সুবিচার করিনি যদি আমরা তার যৌবনকাল ভোগ করি আর বার্ধক্যের সময় তাকে একা ছেড়ে দেই।" অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায়। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "নিশ্চয় সদকা কেবল ফকির ও মিসকিনদের জন্য।" [আত-তাওবা: ৬০]। এখানে ফকিররা হলো মুসলিমগণ, আর এই ব্যক্তি আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে মিসকিন। এরপর তিনি তার এবং তার সদৃশ ব্যক্তিদের থেকে জিজিয়া মওকুফ করে দিলেন।

অন্যতম আরেকটি দলিল হলো: 'হিরাহ্ সন্ধিপত্রে' বর্ণিত হয়েছে যে: "যদি কোনো বৃদ্ধ কাজ করতে অক্ষম হয়ে যায়, অথবা কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, কিংবা সম্পদশালী থাকার পর দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং তার স্বধর্মীরা তাকে দান-সদকা করতে শুরু করে, তবে তার জিজিয়া রহিত করা হবে—অর্থাৎ তার থেকে আর জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না। আর সে এবং তার পরিবার যতক্ষণ দারুল ইসলামে বসবাস করবে, ততক্ষণ মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে তাদের ভরণপোষণ দেওয়া হবে।" অর্থাৎ সে দারিদ্র্যের শিকার হলে তার থেকে আর জিজিয়া নেওয়া হবে না এবং তাকে ও তার সন্তানদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়তুল মাল থেকে দান করা হবে।

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) তাঁর গভর্নর আদি ইবনে আরতাতকে পত্রে লিখেছিলেন: "অতঃপর তোমার এলাকায় জিম্মিদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ হয়েছে এবং যাদের উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের প্রতি লক্ষ রেখো। তাদের সংশোধনের জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতার ব্যবস্থা করো। তোমার এলাকায় জিম্মিদের মধ্য থেকে যে বৃদ্ধ হয়েছে এবং সম্পদ উপার্জনে অক্ষম হয়েছে, তাকে বায়তুল মাল থেকে প্রদান করো। কেননা কোনো মুসলিমের যদি এমন কোনো দাস থাকে যার বয়স হয়েছে, শক্তি কমে গেছে এবং উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, তবে মৃত্যু বা মুক্তির মাধ্যমে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণ দেওয়া মালিকের উপর অর্পিত হক বা কর্তব্য।"

আরও বর্ণিত আছে যে, উসমান ইবনে হুনাইফ (রা.) করদাতাদের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছিলেন এবং প্রতিটি স্তরের জন্য নিম্নোক্তভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন:

ষষ্ঠ পাঠ

- অক্ষম এবং যাদের কোনো আয় নেই এমন শ্রেণিগুলো জিযিয়া থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।
- নিজের হাতে কাজ করেন এমন শ্রমিক যেমন দর্জি, তার ওপর বছরে বারো দিরহাম ধার্য।
- ব্যবসা ও শিল্পের সাথে জড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর চব্বিশ দিরহাম ধার্য।
- ব্যবসা ও শিল্পের সাথে জড়িত বিত্তবানদের প্রত্যেকের ওপর বছরে আটচল্লিশ দিরহাম ধার্য।

এর থেকে আমরা দেখতে পাই যে, অক্ষম শ্রেণি অর্থাৎ দরিদ্ররা জিযিয়া থেকে মুক্ত; কেননা তারা তা পরিশোধে অক্ষম এবং অক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। জিযিয়া আদায় থেকে অক্ষমদের এই অব্যাহতিকে আমরা যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাবের নিচে থাকাদের অব্যাহতির সমতুল্য বিবেচনা করতে পারি, যেমনটি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের মতে, এই অব্যাহতি রাষ্ট্রের নির্ধারিত আর্থিক বোঝা বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ কোনো দায়িত্ব কেবল সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ীই অর্পিত হয়, আর দরিদ্র ব্যক্তির কোনো আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাই জিযিয়া আদায় থেকে তার অব্যাহতি জিযিয়া বহনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে সমতার নীতির বিরোধী নয়।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সীমা জিযিয়া থেকে অব্যাহতি:

যাকাতের ক্ষেত্রে সমতার আলোচনার সময় পর্যাপ্ততার নিশ্চয়তার (হাদ আল-কিফায়াহ) যে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইসলামি সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা আবশ্যক, তাদের ধর্ম বা বর্ণ যা-ই হোক না কেন। ডক্টর মুহাম্মদ শওকি আল-ফাঞ্জারি তার 'ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা' (আল-ইসলাম ওয়াল মুশকিলাত আল-ইকতিসাদিয়্যাহ) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এর প্রয়োগ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম শাসকরা ইরাক ও আল-জাজিরা অঞ্চলে যেমনটি ঘটেছিল, মানুষের আয়ের থেকে তাদের ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকত তার ওপর ভিত্তি করে জিযিয়া নির্ধারণ করতেন। বিজয়ীরা জনপ্রতি এক দিনার নির্ধারণ করেছিলেন, অতঃপর যখন খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে শাসনভার গ্রহণ করেন...

মারওয়ান বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করলেন এবং সেখানকার তাঁর গভর্নরের নিকট লোক পাঠালেন। তিনি লোকদের সংখ্যা নিরূপণ করলেন এবং একজন শ্রমিক পুরো বছরে যা উপার্জন করে তা হিসাব করলেন। সেখান থেকে তার খাদ্য, ব্যঞ্জন ও পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ বাদ দিলেন এবং বছরের সকল ছুটির দিনগুলোও বাদ দিলেন। এরপর তিনি দেখতে পেলেন যে, এসবের পর প্রত্যেকের কাছে চার দিনার অবশিষ্ট থাকে। ফলে তিনি তাদের ওপর তা পরিশোধ করা আবশ্যক করে দিলেন। খাদ্য ও পোশাকের ব্যয় বাদ দেওয়াকে আমরা মুকাল্লাফের (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির) মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করতে পারি। এর অর্থ হলো, জিজিয়া প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর যা ধার্য করা হবে, তা যেন তার এবং যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার ওপর রয়েছে তাদের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ থেকে হয়; যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে জাকাতের ক্ষেত্রে দেখেছি। আমরা মনে করি যে, এই ছাড় এই ক্ষেত্রে সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ মানুষের নিজের প্রয়োজন অন্যের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে, তার পরিবার, সন্তান এবং যাদের ভরণপোষণ সে করে, তাদের প্রয়োজন তার নিজের প্রয়োজনের সমতুল্য। অতএব, আমরা কীভাবে এমন একজন মুকাল্লাফের কাছে জিজিয়া দাবি করতে পারি যার কাছে থাকা অর্থের তার নিজেরই তীব্র প্রয়োজন এবং অত্যাধিক অভাবের কারণে সেটির প্রতি তার মন পড়ে থাকে?

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, এই প্রসঙ্গে সমতার উদ্দেশ্য হলো—প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিশোধ করার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক বোঝার একটি অংশ বহন করবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি তার কাছে থাকা অর্থের তীব্র অভাব বোধ করে, তার জিজিয়া প্রদানের আর্থিক সামর্থ্য নেই। সুতরাং, তাকে তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া জিজিয়া প্রদানকারীদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে সমতার নীতির পরিপন্থী নয়।

বর্তমান যুগে জিজিয়ার আর অস্তিত্ব নেই:

কিছু ফকিহ মনে করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র রক্ষায় আহলে জিম্মিদের অংশগ্রহণ না করার বিনিময়ে তাদের ওপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়। যেহেতু তারা তাদের কুফরের কারণে রাষ্ট্র রক্ষায় উপযুক্ত নয়; কারণ ধর্মীয় ঐক্যের কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। তাই ইসলামি রাষ্ট্র রক্ষাকারী সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যে তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যদি মুসলমানদের সাথে স্বদেশ রক্ষায় আহলে জিম্মিদের উপযুক্ততা প্রকাশ পায় এবং তা তাদের আন্তরিকতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়...

মুসলিমদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তারা যদি বাস্তবে ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের ওপর থেকে জিজিয়া রহিত হয়ে যায়। একারণেই দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম জিম্মি নাগরিকগণ বসবাস করলেও তারা জিজিয়া প্রদান করে না। এর কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তারা দারুল ইসলাম রক্ষাকারী সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত হয়। আর এই দায়িত্ব অর্থাৎ ইসলামী ভূখণ্ড রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের ওপর থেকে জিজিয়া রহিত হয়ে যায়, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।
এর মাধ্যমেই আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক উৎসসমূহের অন্যতম একটি খাত হিসেবে জিজিয়া আরোপের আলোচনার সমাপ্তি ঘটালাম।

খারাজ

খারাজের সংজ্ঞা:

খারাজ হলো এমন এক প্রকার রাজস্ব যা মানুষের ধন-সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হয়। এটি এমন একটি বিষয় যা কোনো জনগোষ্ঠী বছরে তাদের সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রদান করে। আর শরীয়তের পরিভাষায় খারাজ হলো তা, যা মুসলিমদের দ্বারা শক্তি প্রয়োগে অথবা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত ভূমির ওপর ধার্য করা হয়। সুতরাং তা হলো ভূমির ওপর নির্ধারিত পাওনা যা রাষ্ট্রপ্রধান গ্রহণ করেন। একে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, এটি হলো ভূমির স্বত্বের ওপর ধার্যকৃত এমন পাওনা যা তা থেকে আদায় করতে হয়।

খারাজের ইতিহাস:

খারাজ ইসলামের কোনো নতুন উদ্ভাবন নয়, বরং এটি ইসলামের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। এটি ইতিহাসের প্রাচীনতম কর ব্যবস্থাগুলোর একটি। এটি ফেরাউন, টলেমি, রোমান এবং পারস্যবাসীদের শাসন আমলে বিদ্যমান ছিল। তবে এই জাতিগুলোর মধ্যে এর ব্যবস্থা অভিন্ন ছিল না, বরং এর পরিমাণ এবং সংগ্রহের পদ্ধতিতে ভিন্নতা ছিল।

খরাজের ব্যাপকতা:

খরাজের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা বা সাধারণত্বের অর্থ হলো, যাদের ওপর খরাজ আবশ্যক হওয়ার শর্তাবলি বিদ্যমান, তাদের প্রত্যেকেরই এই খরাজের নির্ধারিত ও ধার্যকৃত পরিমাণ আদায় করা। সুতরাং কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া কাউকে এটি আদায় করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। এছাড়া এই ব্যাপকতার আরও অর্থ হলো, সেই সকল ভূমির ওপর খরাজ ধার্য করা যাতে খরাজ আবশ্যক হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায়। এর অর্থ হলো খরাজের ক্ষেত্রে এই ব্যাপকতা ব্যক্তিগত এবং বস্তুগত উভয় বিষয়ের সমন্বয় ঘটায়।

এ কারণে আমরা খরাজের ব্যক্তিগত ও বস্তুগত ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমত: খরাজের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা:

খরাজকে স্থাবর সম্পত্তির আয়ের ওপর একটি কর হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে প্রবর্তিত আর্থিক উৎসগুলোর অন্যতম। তিনি মুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে এটি বাধ্যতামূলক করেছিলেন এবং তাঁর কিছু সাহাবী 'সাওয়াদ' ভূমিকে (ইরাকের উর্বর ভূমি) যেভাবে যুদ্ধলব্ধ গণিমত বণ্টন করা হয় সেভাবে বণ্টন করার যে দাবি জানিয়েছিলেন, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তাদের সামনে 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ) সংক্রান্ত মহান আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করেন: "আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু 'ফায়' হিসেবে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট চালিয়ে কোনো শ্রম দাওনি..." [সূরা আল-হাশর: ৬] থেকে মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: "আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা ঈমানের সাথে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে; আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি তো অত্যন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হাশর: ১০]। এরপর তিনি বললেন: "আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও এই ফায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি যদি এটি (বর্তমানদের মাঝে) বণ্টন করে দিই, তবে তোমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"

সৈয়দুনা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন খরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর তা ধার্য করেন, তখন তাঁর এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যায় আবু উবাইদ বলেছেন যে, তিনি একে প্রত্যেকের জন্য ব্যাপক ও সাধারণ করেছেন যার হাতে ভূমি ন্যস্ত হয়েছে; চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, শিশু হোক বা মুকাতাব (মুক্তিপ্রত্যাশী দাস) কিংবা সাধারণ দাস। তারা সকলে এক্ষেত্রে সমান। তিনি কাউকে এর বাইরে রাখেননি। এর প্রমাণ হলো উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 'নহরুল মালিক' অঞ্চলের জনৈকা নারী প্রধান (দেহকানাহ) সম্পর্কে বলেছিলেন যখন সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল: "তাকে তার ভূমিতে থাকতে দাও, সে তার ভূমি থেকে খরাজ আদায় করবে।" এভাবে তিনি নারীর ওপর তা-ই আবশ্যক করেছিলেন যা পুরুষদের ওপর আবশ্যক করেছিলেন।

সুতরাং, ব্যক্তিগত ব্যাপকতার ক্ষেত্রে খরাজের পরিধি জিজিয়ার তুলনায় অধিক বিস্তৃত, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। এর ভিত্তিতে, যাদের কর্তৃত্বে খরাজি জমি রয়েছে তাদের প্রত্যেকের ওপরই খরাজ আদায় করা আবশ্যক। এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, খরাজ প্রদানের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সমতার যে মূলনীতি, তা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত হয়েছে। এর অর্থ এই যে, খরাজ করের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপকতা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, মুসলিমের ওপর কি খরাজ ওয়াজিব? যেহেতু আমরা খরাজের ব্যক্তিগত ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই এই বিষয়টি স্পষ্ট করা সমীচীন হবে যে, মুসলিমের ওপর কি খরাজ ধার্য হবে? এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ

আলোচনার স্বার্থে আমরা দেখতে পাই যে, ফকিহগণ এ ব্যাপারে দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: জমহুর ফকিহগণের মতে মুসলিমের ওপর খরাজ ওয়াজিব। চাই সে ব্যক্তি পূর্বে জিম্মি ছিল এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এমতাবস্থায় যে খরাজি জমি তার অধিকারেই ছিল, অথবা কোনো মুসলিম কোনো জিম্মির নিকট থেকে খরাজি জমি ক্রয় করেছে। তারা এ বিষয়ে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, তিনি বলেছেন: উমর ইবনুল খাত্তাব 'নহরে মালিক' এলাকার জনৈক নারী প্রধানের ইসলাম গ্রহণের পর আমার নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন: "তার জমি তাকে সমর্পণ করো যেন সে তার খরাজ আদায় করে।" এর অর্থ হলো সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা সত্ত্বেও তার ওপর খরাজ ধার্য রাখা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় যে, খরাজ মুসলিমের ওপরও ওয়াজিব হয়।

দ্বিতীয় মত: কিছু সংখ্যক ফকিহ মনে করেন যে, মুসলিমের ওপর খরাজ ওয়াজিব নয়। এক্ষেত্রে তারা ভূমির খরাজকে ব্যক্তির খরাজ—অর্থাৎ জিজিয়ার—সাথে তুলনা করেন। সুতরাং যেভাবে ইসলাম গ্রহণের পর কোনো মুসলিমের ওপর জিজিয়া ওয়াজিব থাকে না, তদ্রূপ ইসলাম গ্রহণের পর তার ওপর খরাজও ওয়াজিব হবে না।

দ্বিতীয়ত: খরাজের বস্তুগত ব্যাপকতা:

সেই সকল ভূমিতে খরাজ ওয়াজিব যা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে অথবা যার অধিবাসীদের সাথে এই শর্তে সন্ধি হয়েছে যে তারা সেখানে বহাল থাকবে এবং তার খরাজ প্রদান করবে, এবং এমন প্রতিটি ভূমিতে যেখানে খরাজের পানি পৌঁছে। সুতরাং যে ভূমির ওপর খরাজ ধার্য করা হয়...

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

প্রারম্ভে, যখন কোনো ভূমি জিম্মির অধিকারে থাকে, তখন তা হলো শক্তি প্রয়োগ ও বিজয়ের মাধ্যমে জয় করা ভূমি, যদি ইমাম তার পূর্ববর্তী মালিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং তাদের নিকট তা ছেড়ে দেন। যেমনটি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মিসর, সাওয়াদ (ইরাক) এবং অন্যান্য অঞ্চলের ভূমির ক্ষেত্রে করেছিলেন। এছাড়া সেই ভূমি যার অধিবাসীদের সাথে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানের বিনিময়ে সন্ধি করা হয়েছে; কারণ উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করতেন, তখন তিনি তাদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ আদায়ের শর্ত আরোপ করতেন। এমনিভাবে ওশরি (দশমাংশ করভুক্ত) ভূমি যদি কোনো জিম্মি মালিকানায় নেয়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তা খারাজি ভূমিতে পরিণত হবে; কারণ তার ওপর ওশর ওয়াজিব নয় যেহেতু সে এর উপযুক্ত নয়। আর ভূমির ওপর ওশর অথবা খারাজ—যেকোনো একটি থাকা আবশ্যক, তাই খারাজ প্রদান অবধারিত হয়।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, যে ভূমি খারাজি পানি দিয়ে সেচ করা হয়, তা যদি ওশরি ভূমিও হয় তবুও তাতে খারাজ প্রযোজ্য হবে; কারণ খারাজি পানি দিয়ে সেচ করা তা (খারাজ) আবশ্যক হওয়ার দলিল। খারাজ কর কৃষিভূমি এবং চাষযোগ্য ভূমি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। যে ভূমিতে পানি পৌঁছায় তা চাষযোগ্য এবং তাতে খারাজ প্রদান ওয়াজিব। যে ভূমি চাষ করা সম্ভব তাতে খারাজ প্রযোজ্য হবে, এমনকি যদি মালিক তার নিজের অবহেলার কারণে তা চাষ করতে সক্ষম না হয় তবুও। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, খারাজ প্রত্যেক খারাজি ভূমির ওপর ধার্য করা হয়—চাই তা বর্তমানে চাষ করা হোক বা চাষযোগ্য হোক, যদিও বাস্তবে চাষ করা না হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে খারাজের ক্ষেত্রে বস্তুগত সর্বজনীনতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্জিত হয়, যার ফলে খারাজ প্রদানের দায়ভার বহনে করদাতাদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত হয়।

খারাজের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা অর্জনে সহায়তাকারী উপাদানসমূহ:

আমরা জেনেছি যে ইসলামি শরিয়ত খারাজের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা অর্জনে কীভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে, চাই তা ব্যক্তিগত সর্বজনীনতা হোক বা বস্তুগত সর্বজনীনতা। তবে ইসলামি বিধান কেবল এতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কারণ সর্বজনীনতা বিদ্যমান থাকতে পারে কিন্তু কর্মপন্থা বা প্রয়োগ একে বিঘ্নিত করতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামি শরিয়ত এই সর্বজনীনতার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি এমন সব বিষয় দূর করতেও সচেষ্ট থাকে যা এর পরিপন্থী হতে পারে।

খারাজে সর্বজনীনতা নিশ্চিত করতে সহায়ক এমন বেশ কিছু অনুষঙ্গ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

প্রথম অনুষঙ্গ: খারাজে দ্বৈততা রোধ করা:

খারাজে দ্বৈততা বা একই কর দুইবার আরোপ করা রোধ করার লক্ষ্যে হানাফিগণ এই মত পোষণ করেছেন যে, কোনো মুসলিমের হাতে যদি খারাজি জমি থাকে, তবে তার ওপর কেবল খারাজই অবধারিত হবে এবং তার থেকে উশর রহিত হয়ে যাবে। কারণ, উশর ও খারাজ উভয়টি একসাথে জমা হতে পারে না। তারা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, উশর ও খারাজ—উভয়েরই কারণ অভিন্ন, আর তা হলো খারাজি ভূমির ব্যয়ভার। ফলে একই ভূমিতে উশর ও খারাজ নামক দুটি পাওনা একত্রে দাবি করা যাবে না। তারা তাদের এই মতের স্বপক্ষে তৎকালীন শাসক ও ইমামগণের কর্মপন্থাকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন; কেননা তারা কখনো উশর ও খারাজকে একত্র করেননি। বিপুল সংখ্যক মুসলিমের নিকট খারাজি জমি থাকা সত্ত্বেও তাদের কারোর থেকেই উশর ও খারাজ একত্রে আদায়ের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। ফলে এটি একটি ইজমা বা ঐকমত্যের রূপ নিয়েছে, যার বিরোধিতা করা সঠিক নয়। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, খারাজের সাথে উশর গ্রহণ করা হবে ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে একটি দ্বৈততা।

অন্যদিকে জুমহুর ফুকাহাগণ (অধিকাংশ ফকিহ) এ ক্ষেত্রে উশর ও খারাজ উভয়টিই একত্রে ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন যে, উশর ও খারাজ—এই দুটির কারণ ভিন্ন ভিন্ন। খারাজি জমিতে যাকাত বা উশর ওয়াজিব হয়, কারণ এর ভিত্তি হলো ক্রমবর্ধমান সম্পদ আর সেখানে উৎপাদন বা প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। যখন কারণ বিদ্যমান থাকে, তখন তার ফলাফলও সাব্যস্ত হয়। আর খারাজি জমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়, কারণ এটি হচ্ছে ভূমির ভাড়া স্বরূপ। যেহেতু এই দুটির কারণ ভিন্ন, তাই এখানে দ্বৈততা সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া ইসলামি শরিয়াহ খারাজসহ বিভিন্ন কর পরিশোধের প্রমাণ সংরক্ষণের পদ্ধতিও সুসংগঠিত করেছে। এজন্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ কর সংগ্রাহকদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা করদাতাদের কর পরিশোধের রসিদ বা প্রমাণপত্র প্রদান করেন; যাতে তা তাদের জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় এবং একই বছরে একই সম্পদের ওপর পুনরায় কর দাবি করা থেকে তাদের রক্ষা করে।

আমরা বলতে পারি যে, খারাজে দ্বৈততা রোধ করা করদাতাদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে। মূল কথা হলো, খারাজের বোঝা করদাতাদের মধ্যে এমনভাবে সুষম ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করতে হবে যা তাদের সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

আর্থিক বিষয়াবলি এবং এমনভাবে যাতে করদাতাকে একই বছরে দুইবার তার ওপর অর্পিত ওয়াজিব পরিমাণ কর প্রদান করতে না হয়। যদি খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ঘটে, তবে যে ব্যক্তি এই দ্বৈততার শিকার হবেন, তিনি সম-আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন অন্য করদাতার তুলনায় অধিক আর্থিক বোঝা বহন করবেন। এর ফলে সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে সাম্য বিলুপ্ত হয় এবং এতে সাম্যের সেই মূলনীতিটি ভূলুণ্ঠিত হয় যা খারাজ প্রদানকারী করদাতাদের মাঝে প্রচলিত থাকা আবশ্যক।

অন্যদিকে, দ্বৈততার শিকার ব্যক্তি নিজের প্রতি ঘটা অন্যায়ের অনুভূতির কারণে খারাজ আদায়কারী কর্মচারীদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবেন। আর এটি তাকে তার ওপর ধার্যকৃত আবশ্যক খারাজ ফাঁকি দেওয়ার দিকে ধাবিত করতে পারে। আর কর ফাঁকি দেওয়া—যেমনটি আমরা জানি—রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে করদাতাদের মধ্যকার সাম্যের মূলনীতিকে বিনষ্ট করে দেয়।

পক্ষান্তরে, এই দ্বৈততা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হলে প্রতিটি করদাতা কেবলমাত্র তার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী আর্থিক দায়ভার বহন করবেন। এর ফলে খারাজ প্রদানের দায়ভার বহনের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারীদের মধ্যে সাম্যের মূলনীতি বাস্তবায়িত হবে।

দ্বিতীয় কারণ: খারাজ নির্ধারণে পূর্ববর্তী সময়ের বাধ্যবাধকতা পরিহার করা:

খারাজের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট; যদি তা 'খারাজ ওয়াজিফাহ' হয় তবে তা ভূমির আয়তনের ভিত্তিতে হয়, আর যদি তা 'খারাজ মুকাসামাহ' হয় তবে তা ভূমির উৎপাদনের নির্দিষ্ট হারের ভিত্তিতে হয়। উভয় প্রকারেই খারাজের পরিমাণ স্পষ্ট থাকে। খারাজ ওয়াজিফাহর ক্ষেত্রে বছরে একবার তা আদায় করা হয় এবং খারাজ মুকাসামাহর ক্ষেত্রে যখনই ফসল সংগ্রহ করা হয় তখনই তা আদায় করা হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের ওপর যতটুকু প্রাপ্য কেবল সেটুকুই তিনি গ্রহণ করবেন। তিনি তাদেরকে এমন কোনো অতিরিক্ত অর্থের বোঝা দিয়ে আকস্মিক বিপদে ফেলবেন না যা তাদের ওপর ধার্য করা হয়নি। তিনি বলেন: "হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি আমার কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি, সুতরাং তোমরা আমাকে সে অনুযায়ী গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা হলো—আমি তোমাদের খারাজ থেকে এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা 'ফায়' হিসেবে দান করেছেন তা থেকে এর যথার্থ হক ব্যতীত কিছুই সংগ্রহ করব না।"

অষ্টম পাঠ

যাইহোক, খরাজ করের ক্ষেত্রে আমরা করের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। কিছু শাফেয়ী ফকীহ মনে করেন যে, কোনো ভূমির ওপর যখন একবার খরাজ নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন তা স্থায়ী হয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত ভূমির সেচ ও সংস্কারের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, ততদিন এতে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা বৈধ নয়।

আমাদের কাছে ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী শরীয়ত খরাজ সংক্রান্ত আইনসমূহ বিন্যাসের ক্ষেত্রে আইনের সংখ্যাধিক্য পরিহার করেছে এবং সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট রেখেছে যাতে কোনো প্রকার প্রতারণার সুযোগ না থাকে। এর ফলে উক্ত আইনসমূহের ক্ষেত্রে নানামুখী ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হয়েছে। পরিণামে সেই ছিদ্রপথগুলো বন্ধ হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে খরাজ প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত করের বোঝা অন্য করদাতার ওপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতো। এর অর্থ হলো খরাজে পশ্চাদগামীতা পরিহার করা। আর এই পশ্চাদগামীতা পরিহারের মাধ্যমেই খরাজ কর প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী করের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা অর্জিত হয়।

খরাজ প্রদান থেকে পলায়ন (কর ফাঁকি):

ইসলামী শরীয়ত খরাজ প্রদান থেকে পলায়ন বা ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধেও কাজ করেছে। মুসলমানরা খরাজ ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন; আর তা করা হয়েছে করদাতাদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, আর্থিক বোঝার ওয়াজিব পরিমাণ আদায় থেকে পলায়ন করা এই ক্ষেত্রে করদাতাদের মধ্যে অসমতা তৈরির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খরাজ ফাঁকি রোধে বেশ কিছু উপায় রয়েছে, আমরা তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো উল্লেখ করছি:

প্রথমত: কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের ন্যায়পরায়ণতা:

করদাতাদেরকে তাদের ওপর অর্পিত ওয়াজিব দায়িত্ব পালন থেকে বিমুখ করার অন্যতম প্রধান কারণ হলো কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের জুলুম। কেননা, যদি এই কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে করদাতাদের ওপর জুলুম আপতিত হয়, তবে করের মোট আদায় কমে যায়, বরং তা দেশ ধ্বংসের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

একইভাবে, কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে করদাতাদের সাথে আচরণে বৈষম্য করা—যেমন কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা আর কারো প্রতি না করা—এমন এক বিষয় যা বঞ্চিত ব্যক্তিদের তাদের উপর ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় খাজনা (খারাজ) ফাঁকি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের শিক্ষা হলো কর আদায়কারী কর্মকর্তারা যেন করদাতাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও সদয় হন। ওমর ইবনুল খাত্তাব এই শিক্ষাগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি খাজনা আদায়ের দায়িত্ব প্রদানের জন্য কেবল সর্বোত্তম সাহাবীদের নির্বাচন করেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং তিনি খোদ করদাতাদের শরণাপন্ন হতেন; যাতে তারা আশ্বস্ত হতে পারে যে, খাজনা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হয়নি।

বর্ণিত আছে যে, ইরাক থেকে প্রতি বছর তাঁর কাছে একশ মিলিয়ন উকিয়া (খাজনা) সংগৃহীত হতো। এরপর কুফা থেকে দশজন এবং বসরা থেকে দশজন লোক তাঁর দরবারে আসতেন এবং তাঁরা আল্লাহর নামে চারবার করে সাক্ষ্য দিতেন যে, এই অর্থ অত্যন্ত

স্বচ্ছভাবে সংগৃহীত হয়েছে এবং এতে কোনো মুসলিম বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের (মুয়াহিদ) প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হয়নি। অর্থাৎ, করদাতাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিশজন ব্যক্তি আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দিতেন যে, এই অর্থ ন্যায়ের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে এবং করদাতাদের মধ্যে কোনো মুসলিম বা মুয়াহিদের ওপর অন্যায় করা হয়নি। তাঁরা যে বিষয়ে শপথ করছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কখনোই শপথ করতেন না। তাছাড়া সত্য বলা ছিল তাদের নিজেদের এবং যাদের তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের উভয়েরই স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। নিঃসন্দেহে এটি ছিল করদাতাদের মাধ্যমেই খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তাদের তদারকি করার একটি সফল পদ্ধতি।

ইমাম আবু ইউসুফ আমীরুল মুমিনীন হারুনুর রশিদের উদ্দেশ্যে খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তাদের শর্তাবলী উল্লেখ করে বলেছিলেন: "হে আমীরুল মুমিনীন—আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন—আমি মনে করি যে, আপনি নেককার, দ্বীনদার এবং আমানতদার একদল লোককে খাজনা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন।" এরপর তিনি বলেন: "আর আপনি যাদের কর্মকর্তা নিযুক্ত করবেন তাদেরকে নির্দেশ দেবেন যেন তারা তাদের অধীনস্থ জনগণের প্রতি রূঢ় না হয়, তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান না করে এবং তাদের অবজ্ঞা না করে। বরং তারা যেন তাদের সাথে কোমলতার চাদর পরিহিত অবস্থায় আচরণ করে, যার প্রান্তভাগে কিছুটা কঠোরতার মিশ্রণ থাকবে। আর তাদের ওপর জুলুম না করে বা যা তাদের ওপর আবশ্যক নয় তা চাপিয়ে না দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কর আদায় করবে। মুমিনের প্রতি হবে নম্র, পাপাচারীর প্রতি হবে কঠোর, জিম্মি বা অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি হবে ন্যায়পরায়ণ এবং মজলুমের প্রতি হবে ইনসাফকারী। জালেমের ওপর হবে কঠোর এবং মানুষের প্রতি হবে ক্ষমাশীল; কারণ এটি তাদেরকে আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। খাজনা আদায় যেন ঠিক সেভাবেই হয় যেভাবে তার জন্য রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। জনগণের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কোনো নব উদ্ভাবিত বা বিদআতী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। নিজের মজলিসে এবং দৃষ্টির সামনে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে, যাতে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এবং উচ্চবংশীয় ও নিম্নবংশীয় ব্যক্তি তার কাছে হকের বিচারে সমান হয়।"

আবু ইউসুফ রহ.-এর ‘আল-খারাজ’ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ফকীহগণ খারাজ (ভূমিরাজস্ব) আদায়কারী কর্মকর্তাদের ওপর কেবল নির্দিষ্ট কিছু শর্তারোপ করেই ক্ষান্ত হননি যাতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়, বরং তারা এই কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি রাখার প্রয়োজনীয়তাও যুক্ত করেছেন। এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, তারা তাদের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে। এই উদ্দেশ্যেই আবু ইউসুফ রহ. হারুনুর রশীদকে খারাজ কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, তিনি যেন তার কর্মকর্তাদের পেছনে এমন একদল সৎ ও পবিত্র চরিত্রের লোক পাঠান যাদের দ্বীনদারি ও আমানতদারির ওপর আস্থা রাখা যায়। তারা কর্মকর্তাদের জীবনযাত্রা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন; তারা কীভাবে খারাজ আদায় করেছে যা তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং খারাজ প্রদানকারীদের ওপর যা ধার্য ও স্থির করা হয়েছিল সে অনুযায়ী? যদি আপনার কাছে এটি প্রমাণিত ও নিশ্চিত হয়, তবে তারা যা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছে সে জন্য তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে, এমনকি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও কঠোর দণ্ড প্রদানের পর তারা তা ফেরত দেবে। যাতে তারা তাদের নির্দেশিত এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন না করে। যদি খারাজ আদায়কারী ওয়ালি জুলুম ও অন্যায় করে, তবে ধারণা করা হবে যে তাকে হয়তো এটিই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাকে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর আপনি যদি তাদের মধ্যে একজনের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কার্যকর করেন, তবে অন্যরা বিরত থাকবে, তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং ভীত হবে। আর যদি আপনি তাদের সাথে এমন আচরণ না করেন, তবে তারা খারাজ প্রদানকারীদের ওপর সীমালঙ্ঘন করবে এবং তাদের ওপর জুলুম, অত্যাচার ও যা তাদের ওপর বাধ্যতামূলক নয় তা গ্রহণে দুঃসাহস দেখাবে।

আবু ইউসুফ রহ. প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মহান ফলাফলগুলো স্পষ্ট করে বলেন: নিশ্চয়ই ন্যায়বিচার, মজলুমের প্রতি ইনসাফ এবং জুলুম পরিহার করা—এর সাথে যে সাওয়াব রয়েছে তা তো আছেই—এর মাধ্যমে খারাজ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের সমৃদ্ধি ও আবাদ বৃদ্ধি পায়। বরকত ন্যায়বিচারের সাথেই থাকে, আর অবিচারের মাধ্যমে তা হারিয়ে যায়। অবিচারের মাধ্যমে সংগৃহীত খারাজের ফলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী শরীয়ত খারাজ কর্মকর্তাদের

নির্দেশ দেয় যেন তারা খারাজ প্রদানকারী ব্যক্তিদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ব্যক্তিদের সাথে ভালো আচরণ তাদের মনে একটি সুন্দর প্রভাব ফেলবে, যা তাদের এই করের ওয়াজিব অংশ পরিশোধে ফাঁকি দেওয়ার চিন্তা থেকে পুরোপুরি বিরত রাখবে। এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত এই করের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে করদাতাদের মধ্যে পূর্ণ সমতা অর্জনের দিকে ধাবিত করে।

দ্বিতীয়ত: খরাজ (ভূমি রাজস্ব) প্রদানে টালবাহানা করলে ভূমির মালিককে কারারুদ্ধ করা:

ভূমির মালিক যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার ওপর ওয়াজিব খরাজ বা ভূমি রাজস্ব প্রদানে টালবাহানা করে, তবে তা আদায়ের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। তবে যদি তার অন্য কোনো সম্পদ থাকে, তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় তার সেই সম্পদ বিক্রি করে খরাজ আদায় করা হবে। আর যদি খরাজযোগ্য ভূমি ব্যতীত তার অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, তবে শাসকের কাছে তা বিক্রির সুযোগ থাকবে এবং তিনি খরাজের সমপরিমাণ ভূমি বিক্রি করবেন। অথবা তিনি ভূমিটি ইজারা দেবেন এবং ইজারাদারের কাছ থেকে খরাজ উসুল করবেন; যদি ইজারার অর্থ খরাজের চেয়ে বেশি হয় তবে অতিরিক্ত অংশ মালিকের প্রাপ্য হবে, আর যদি কম হয় তবে ঘাটতি মালিকের ওপরই বর্তাবে। এই আর্থিক ও শারীরিক দণ্ড মূলত ঐ ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য, যার নফস তাকে খরাজের ওয়াজিব অংশ ফাঁকি দিতে প্ররোচিত করে। এর ফলে কেউ কর ফাঁকি দেবে না এবং এভাবে করদাতাদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী খরাজের বোঝা বহনে পূর্ণ সমতা অর্জিত হবে।

তৃতীয়ত: করদাতা এবং তাদের সম্পদের তালিকা প্রণয়ন:

করের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তা পূর্ণরূপে সংগ্রহের জন্য করদাতা ও তাদের সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করা। উমর ইবনুল খাত্তাব সাওয়াদ (ইরাকের উর্বর ভূমি) অঞ্চল জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; এর পরিমাণ হয়েছিল তিন কোটি ষাট লক্ষ 'জেরিব', অতঃপর তিনি তার ওপর খরাজ নির্ধারণ করেন।

চতুর্থত: ভূমির মালিকের ওপর প্রমাণের বাধ্যবাধকতা:

ভূমির মালিক যদি দাবি করেন যে তিনি খরাজ পরিশোধ করেছেন, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কারণ খরাজ হচ্ছে ঋণের সমতুল্য একটি হক। এটি প্রমাণের একটি সাধারণ মূলনীতির প্রয়োগ, যা হলো: 'দাবিদারকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে এবং অস্বীকারকারী শপথ করবে'। যেহেতু তিনি খরাজ পরিশোধের দাবি করেছেন, তাই তিনি তা পরিশোধ করেছেন কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার ওপর প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের নথিপত্র বা রেজিস্টার খাতা যাচাই করা যেতে পারে, যেখানে খরাজ আদায়ের হিসাব লিপিবদ্ধ থাকে; যাতে তার কাছে পুনরায় তা দাবি করা না হয়।

পঞ্চম: খারাজ ব্যয়ের পদ্ধতি:

খারাজ ব্যয়ের পদ্ধতি হলো, খারাজ যে অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানেই উম্মাহর জনস্বার্থে তা ব্যয় করা হবে। এরপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তা রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল মালে প্রেরণ করা হবে। এর সপক্ষে একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ হলো, আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিশরে খারাজ সংগ্রহ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে এক অনন্য আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি মিশরের খাল খনন, সেতু নির্মাণ এবং কালভার্ট বা বাঁধ তৈরিতে খারাজ ব্যয় করতেন; অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকত তা মদিনায় আমিরুল মুমিনিনের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

সারকথা হলো: মূল নীতি হলো খারাজের অর্জিত অর্থ সেই এলাকাতেই ব্যবহার করা যেখানে তা সংগ্রহ করা হয়েছে; যাতে এই ব্যবহারের বাস্তবতা ফুটে ওঠে এবং সর্বসাধারণ তা জানতে পারে। নিঃসন্দেহে এর ফলে খারাজ প্রদানকারীদের মনে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যা তাদের ওপর অর্পিত আবশ্যিক পাওনা সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করতে সহায়তা করবে। তারা তা প্রদান থেকে পলায়ন বা ফাঁকি দেওয়ার কথা মোটেও চিন্তা করবে না; কারণ তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, তারা যা প্রদান করছে তা উপকারের মাধ্যমেই পুনরায় তাদের কাছে ফিরে আসছে। আর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত খারাজের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে করদাতাদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সমতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে।

খারাজ প্রদান থেকে পলায়ন রোধে এগুলোই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী মাধ্যম। এগুলো অনুসরণ করা নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে যার মন তাকে খারাজ ফাঁকি দিতে প্ররোচিত করে। আমরা জানি যে, খারাজ ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা নির্মূল করার অর্থ হলো রাষ্ট্রে নির্ধারিত আর্থিক বোঝা বহনে সকল করদাতা কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই অংশ নিচ্ছে এবং এর মাধ্যমেই এই বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

খারাজের ক্ষেত্রে করদাতার অবস্থা বিবেচনা:

আমাদের এখন খারাজের ক্ষেত্রে করদাতার অবস্থা বা পরিস্থিতির বিবেচনা সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত, সুতরাং আমরা বলব:

অষ্টম পাঠ

যেহেতু খারাজ আরোপ করার লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের নির্ধারিত আর্থিক ভার বহনে সকল নাগরিকের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা, তাই এর অর্থ এই নয় যে করদাতাদের ওপর তা এমন কোনো কঠোর পদ্ধতিতে আরোপ করা হবে যা তাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে না। প্রকৃতপক্ষে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার দাবি করে যে, করদাতা তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয়ে অংশগ্রহণ করবে। ফলে আর্থিক বোঝা করদাতাদের সচ্ছলতা অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। খারাজের মাধ্যমে জনস্বার্থ অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর সাথে অপর একটি ধারণা যুক্ত থাকা অপরিহার্য, তা হলো— খারাজের যে বোঝা করদাতা বহন করবে, তা অবশ্যই তার আর্থিক সক্ষমতা ও পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। খারাজ আরোপের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ কোনো কঠোর পথ

অবলম্বন করেনি, বরং এক্ষেত্রে করদাতার সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছিলেন। এছাড়া ভূমির গুণগত মান, ফসলের বৈচিত্র্য এবং তার ফলনের পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। কারণ ফসলের ধরনভেদে এর দাম ও সেচ পদ্ধতির ভিন্নতা দেখা দেয়। কেননা যে জমি গবাদিপশু বা চাকাযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষ করা হয়, তা অতটা খারাজ বহন করতে পারে না যতটা প্রাকৃতিক প্রবাহ এবং বৃষ্টির পানির মাধ্যমে সেচকৃত জমি বহন করতে সক্ষম। এর উদ্দেশ্য হলো— জমির মালিকের প্রতি অন্যায় না করে এবং কৃষকের ক্ষতি না করে ইনসাফের সাথে খারাজ নির্ধারণ করা।

এর আরও একটি প্রমাণ হলো, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর দুই আমিল (কর্মকর্তা) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং উসমান ইবনে হানিফ (রা.)-কে তাঁদের দায়িত্বাধীন এলাকার খারাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; যেন তিনি এই মর্মে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, তাঁরা করদাতাদের ওপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেননি। তাঁরা উভয়েই উত্তর দিলেন যে, তাঁরা ভূমির ওপর ততটুকুই ভার অর্পণ করেছেন যা বহন করার সক্ষমতা ভূমির রয়েছে। যদি তাঁরা এর চেয়ে বেশি চাইতেন তবে জমিও তা দিতে পারত, কিন্তু তাঁরা মানুষের জন্য উদ্বৃত্ত অংশটি ছেড়ে দিয়েছেন। উসমান (রা.) বলেছিলেন: 'আমি যদি দ্বিগুণ গ্রহণ করতাম তবুও জমি তা বহন করতে পারত, কিন্তু আমি তা বর্জন করেছি'। তাঁর আমিলদের সাথে ওমরের এই আলোচনা এবং ভূমির ওপর ধার্যকৃত খারাজের পরিমাণ যাচাই করার বিষয়টি ভূমির ক্ষেত্রে ওমরের ইনসাফ এবং অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের ন্যায়বিচার ও সহনশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অতএব, খারাজের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। আর এই কারণেই খারাজের পরিমাণের ব্যাপারে ওমর (রা.) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ভূমির গুণগত মানের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে।

ষষ্ঠ পাঠ

আর উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত ভূমির জন্য একটি অভিন্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেননি যা কখনো পরিবর্তিত হয় না। বরং তিনি প্রতিটি ভূমির ভার বহনের সক্ষমতা বিবেচনা করেছেন। এটি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। উমর (রা.) ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চলের কিছু অংশে প্রতি 'জারিব' ভূমির ওপর এক 'কাফিজ' ও এক দিরহাম ধার্য করেছিলেন এবং অন্য অঞ্চলে এর চেয়ে ভিন্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন।

আর্থিক নীতিতে ন্যায়বিচারের দাবি হলো শাসক জনগণের ওপর এমন কোনো কর আরোপ করবেন না যা তাদের জন্য অসহনীয় ও কষ্টসাধ্য হয়, অথবা যা মানুষের ধনাঢ্যতা ও সচ্ছলতার পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্য কথায়, শাসককে মানুষের অবস্থা এবং তাদের ওপর যা ধার্য করা হয়েছে তা পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। যখন মানুষ তাদের ওপর ধার্যকৃত কর পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন শাসকের কর্তব্য হলো তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তা লাঘব করা। এর প্রমাণ হলো, আব্বাসীয় খলিফাদের একজন ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চলের ওপর উমর (রা.)-এর সময় থেকে নির্ধারিত 'খারাজে ওয়াজিফা' (স্থির কর) পরিবর্তন করে 'খারাজে মুকাসামা' (উৎপাদনের অংশভিত্তিক কর) প্রবর্তন করেছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, ভূমি আর আগের মতো পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করছে না। তাই সাওয়াদবাসীদের ওপর পূর্ব নির্ধারিত কর অব্যাহত রাখা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ছিল, যখন তাদের ভূমি তাদের ওপর ধার্যকৃত কর পরিশোধের মতো পর্যাপ্ত ফসল দিচ্ছিল না।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার মাধ্যমে সকলের ওপর খারাজের বোঝা বণ্টন করার এই প্রচেষ্টা ফরাসিদের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে তাদের জন্য বাস্তবায়িত হয়নি। খারাজের পরিমাণ নির্ধারণের এই পদ্ধতি—যা আগে বর্ণনা করা হয়েছে—তা হলো ভূমি কর আরোপের আধুনিক পদ্ধতি। জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী প্রদেয় খারাজের পরিমাণের

ভিন্নতা সাম্য ধারণার মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত, যেখানে ন্যায়বিচার রক্ষা করা হয়েছে। কারণ আর্থিক সক্ষমতায় যারা অসমান তাদের মাঝে সমতা বিধান করা হলো অবিচার, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট করেছি। আর খারাজ প্রদানকারীর অবস্থা বেশ কিছু বিষয়ে বিবেচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: অক্ষমদের খারাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান। খারাজ প্রদানকারীদের ওপর খারাজ তখনই আবশ্যক হয় যখন ভূমি তা বহনে সক্ষম হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই খারাজ মওকুফ হয়ে যায়, যার মধ্যে প্রধান হলো:

ষষ্ঠ পাঠ

যদি শস্য কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত হয়, তবে মুকাল্লাফ (করদাতার) ওপর থেকে খরাজ রহিত হয়ে যায়; কারণ সে এমন এক বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তি যে সহায়তার হকদার। যদি তার নিকট থেকে খরাজ গ্রহণ করা হতো, তবে তা তার সম্পদকে সমূলে বিনাশ করার শামিল হতো। যখন জমির উৎপাদনে এমন কোনো ঘাটতি দেখা দেয় যা করদাতার কারণে ঘটেনি—যেমন বাঁধ ভেঙে যাওয়া বা নদী অচল হয়ে যাওয়া—তখন খরাজ রহিত হয়ে যায়। এছাড়া যদি জমি এমন হয় যা প্রতি বছর চাষ করা সম্ভব নয় বরং এক বছর বিশ্রাম দিয়ে অন্য বছর চাষ করতে হয়, তবে খরাজ ধার্যের শুরুতেই তার অবস্থা বিবেচনা করা হয়; অর্থাৎ প্রতি দুই জারিব জমিকে এক জারিব হিসেবে জরিপ করা হয়। ফলে এর একটি চাষাবাদের জন্য এবং অন্যটি অনাবাদি হিসেবে গণ্য হয়। এর অর্থ হলো, যে বছর জমি চাষ করা হয়নি সে বছর জমি থেকে খরাজ রহিত করা। খরাজ প্রদানের এই অব্যাহতিকে আমরা যাকাতের নিসাবের কম মালের অব্যাহতির সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মতে—এই অব্যাহতি উক্ত করের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে সমতার নীতির পরিপন্থী নয়। কারণ এই কর আরোপ মুকাল্লাফের আর্থিক সক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত, আর যতক্ষণ সেই সক্ষমতা না থাকে ততক্ষণ কর আরোপের কোনো ক্ষেত্র থাকে না। এর অর্থ হলো, এই অব্যাহতি রাষ্ট্রের নির্ধারিত সাধারণ দায়-দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফদের মধ্যে সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

দ্বিতীয়ত: জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সীমাকেও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। পর্যাপ্ততার সীমার (হাদ্দুল কিফায়াহ) নিশ্চয়তা প্রদান—যা যাকাত ও জিজিয়া আরোপের আলোচনার সময় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—ইসলামি সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আবশ্যক, তার ধর্ম বা লিঙ্গ যা-ই হোক না কেন। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন স্তর বা পর্যাপ্ততার সীমা—যাকে কেউ কেউ এই নামেই অভিহিত করেন—খরাজ করের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত। নিচের বিষয়গুলো তার প্রমাণ দেয়:

- খরাজ থেকে ঐ সকল ঘরবাড়ি ও আবাসন অব্যাহতিপ্রাপ্ত যা মুকাল্লাফদের বসবাসের স্থান, যেখানে উৎপাদনের কিছু নেই। সুতরাং মুকাল্লাফ খরাজভুক্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য অবস্থানের উদ্দেশ্যে যে স্থাপনা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, তা থেকে খরাজ রহিত হয়ে যাবে। কারণ সে তার বসবাসের ঘর ছাড়া স্থির হতে পারে না। আর বাসস্থান হলো মুকাল্লাফের জীবনযাত্রার জন্য অপরিহার্য মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। আর যা কিছু মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত, তা খরাজ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এটি প্রমাণ করে...

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

আটাশতম পাঠ

ইমাম মাওয়ার্দীর উক্তি এ বিষয়ের ওপরই ভিত্তি করে: "যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা থেকেই খারাজ (ভূমি কর) গ্রহণ করা হবে।" এর মর্মার্থ হলো, যা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে না, তা খারাজ থেকে মুক্ত।

- এছাড়াও ইসলামী শরিয়ত পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যসামগ্রী এবং সওয়ারির পশুকে খারাজ থেকে অব্যাহতি দেয়; কারণ এগুলোকে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। এর সপক্ষে আলী ইবনে আবু তালিব রাযি.-এর উক্তিটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, যা তিনি তাঁর খারাজ সংগ্রাহক কর্মচারীকে বলেছিলেন: "যখন তুমি তাদের কাছে (অর্থাৎ খারাজ প্রদানকারীদের কাছে) যাবে, তখন তাদের শীতকালীন বা গ্রীষ্মকালীন কোনো পোশাক বিক্রি করবে না, তাদের খাবারের শস্য বিক্রি করবে না এবং তারা যে গবাদি পশুর সাহায্যে কাজ করে তা-ও বিক্রি করবে না; আর খারাজের বিনিময়ে তাদের কোনো সম্পদও বিক্রি করবে না।" জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য নির্ধারিত এই অব্যাহতি—আমাদের দৃষ্টিতে—খারাজ কর বহনের ক্ষেত্রে করদাতাদের মধ্যে সমতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, মানুষের নিজের প্রয়োজন এবং তার পরিবার ও যাদের ভরণপোষণ তার ওপর আবশ্যক তাদের প্রয়োজন অন্যের প্রয়োজনের ওপর অগ্রাধিকার পায়। সুতরাং এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কীভাবে খারাজ দাবি করা যেতে পারে, যার কাছে থাকা সম্পদের জন্য সে নিজেই তীব্র অভাবগ্রস্ত? আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, এ ক্ষেত্রে সমতা বলতে বোঝানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্পিত আর্থিক বোঝা প্রতিটি ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী বহন করবে। নিঃসন্দেহে, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদের জন্য অতিমাত্রায় মুখাপেক্ষী, তার খারাজ আদায়ের সামর্থ্য নেই। সুতরাং তাকে খারাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া—প্রত্যেক করদাতা নিজ নিজ আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমতার নীতির পরিপন্থী নয়।

ব্যয়িত পরিশ্রমের ভিন্নতার কারণে প্রদেয় খারাজের পরিমাণের ভিন্নতাও এখানে লক্ষণীয়। ইসলামী ফিকহ খারাজি ভূমির উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে পার্থক্যের বিধান দিয়েছে। পরিশ্রমের তারতম্য অনুযায়ী প্রদেয় পরিমাণেও তারতম্য করা হয়েছে। সুতরাং যে ফসল উৎপাদনে অধিক পরিশ্রম ও কষ্ট হয়েছে, তাতে প্রদেয় খারাজের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও কষ্ট কম হয়েছে অথবা আদৌ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়নি, তাতে প্রদেয় খারাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ষড়বিংশ পাঠ

উশুর (শুল্ক)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.)-এর যুগ অতিবাহিত হয়েছে অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থের প্রয়োজন পড়েনি; কারণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ছিল সীমিত এবং বাড়তি কোনো চাহিদা ছিল না। অতঃপর উমর (রা.)-এর যুগ এল এবং ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তৃত হলো—আল্লাহ মুসলিমদের জন্য যেসব দেশ বিজয় করেছিলেন তার বদৌলতে। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে কর আরোপের আবশ্যকতা দেখা দিল। একারণেই উমর (রা.) 'উশুর' (শুল্ক) প্রথা প্রবর্তন করেন। সুতরাং উশুর ব্যবস্থাটি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগেরই অবদান।

বর্ণিত আছে যে, আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, আমাদের একদল মুসলিম ব্যবসায়ী 'দারুল হারব'-এ (শত্রু রাষ্ট্রে) বাণিজ্য করতে যায় এবং সেখানকার শাসকরা তাদের থেকে উশুরের অর্ধেক (৫ শতাংশ) গ্রহণ করে। তখন উমর (রা.) তাকে লিখে পাঠান: "তারা মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে যেভাবে গ্রহণ করে, তুমিও তাদের (হারবিদের) থেকে সেভাবেই গ্রহণ করো। আর আহলে জিম্মাদের (অমুসলিম নাগরিক) কাছ থেকে উশুরের অর্ধেক (৫ শতাংশ) গ্রহণ করো। আর মুসলিমদের নিকট থেকে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম—অর্থাৎ উশুরের এক-চতুর্থাংশ (২.৫ শতাংশ)—গ্রহণ করো। দুইশত দিরহামের কম সম্পদের ওপর কোনো কর নেই। আর যদি দুইশত দিরহাম হয়, তবে তাতে পাঁচ দিরহাম ধার্য হবে। এর অতিরিক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে সেই আনুপাতিক হারে হিসাব করা হবে।"

এ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) উশুরের ক্ষেত্রে মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন: মুসলিম, যাদের থেকে উশুরের এক-চতুর্থাংশ নেওয়া হয়; জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক), যাদের থেকে উশুরের অর্ধেক নেওয়া হয়; এবং হারবি (শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক), যাদের থেকে তেমনটিই নেওয়া হয় যেমনটি তারা মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে নিয়ে থাকে। কারণ তাদের ও মুসলিমদের মধ্যকার এই লেনদেনের বিষয়টি 'পারস্পরিক আচরণের' (reciprocity) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) জন্য এটি বৈধ যে, তিনি উশুরের (১০ শতাংশের) পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন অথবা কমিয়ে উশুরের অর্ধেকে নিয়ে আসবেন, কিংবা যদি তাতে জনকল্যাণ দেখেন তবে তাদের থেকে তা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেবেন। বাণিজ্য নিয়ে আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট থেকে বছরে একবারের বেশি এই কর নেওয়া যাবে না, যদিও তার আগমন বারবার ঘটে। আর এই কর ব্যবসায়ীর নিকট থেকে তখনই নেওয়া হতো যখন সে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বাণিজ্য করতে যেত। বর্তমান সময়ে আমরা একেই 'কাস্টমস ট্যাক্স' বা 'শুল্ক' বলে অভিহিত করি।

""

শারীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
সপ্তম পাঠ

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠের উপাদানসমূহ

প্রথম উপাদান : রাজনীতির ধারণা এবং ইসলামে এর ভিত্তিপ্রস্তরসমূহ — ২৯৩

দ্বিতীয় উপাদান : ইসলামী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিধানের উৎসসমূহ — ৩০৩

""

শরঈ রাজনীতি
সপ্তম পাঠ

ইসলামে রাজনীতির ধারণা ও এর ভিত্তি

রাজনীতির ধারণা:

ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনা থেকে 'রাজনীতি' পরিভাষাটি:

এমন অনেকে আছেন যারা মুসলিমদের নিকট 'রাজনীতি' নামক কোনো বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন; তাদের ধারণা এই যে, এই বিজ্ঞানটি আধুনিক যুগের উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, অথবা এটি এমন সব পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত যা কেবল অমুসলিমদের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে। কারণ, মুসলিমরা কীভাবে এটি জানবে, অথবা কীভাবে তারা এর গভীরে নিজেদের জড়িয়ে ফেলবে? রাজনীতির সাথে তাদের কী সম্পর্ক? অথচ তারা ছিল স্বভাবজাত প্রকৃতির অতি নিকটে এবং মরুবাসী জীবনের খুব কাছাকাছি, যা কোনো আকস্মিক কথা বা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের কারণে ব্যক্তিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। কেননা তারা ছিল সতর্কতা ও কৌশলী আচরণ থেকে বহু দূরে এবং কর্কশতা ও কঠোরতার পথে অটল; এর ফলে কী পরিণতি হতে পারে সেদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এই বিষয়গুলো এবং এর বাইরে আরও অনেক কিছু রাজনীতির উপলব্ধি ও এর ধারণা থেকে বহুদূরে।

অর্থাৎ: এমন লোক আছে যারা এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে যে, মুসলিমরা প্রাচীনকাল থেকেই আধুনিক অর্থের রাজনীতি সম্পর্কে অবগত ছিল। তারা বলে যে, আরবরা ছিল মরুবাসী ও গোত্রবাদী লোক; সুতরাং তারা কীভাবে রাজনীতির সেই স্তরে

পৌঁছাবে যা আসলে এক প্রকার কৌশলী আচরণ?

কিন্তু আমরা তাদের বলব: এই কথাটি ঢালাওভাবে বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ যারা এই কথা বলেন—আর তাদের সংখ্যা অনেক—তারা এমন এক গোষ্ঠী যাদের উদ্দেশ্য সুবিদিত এবং লক্ষ্যসমূহ অত্যন্ত সুপরিচিত। সম্ভবত এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের শাসনব্যবস্থা থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া এবং তাদের জীবনের গতিপথ এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে তারা ইসলামের বিধানের আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। ফলে তাদের এমন সব আকাঙ্ক্ষা ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় যা শরিয়ত অনুমোদন করে না; বরং তা থেকে নিষেধ করে এবং তাতে লিপ্ত হতে বা তার নিকটবর্তী হতে সতর্ক করে।

সপ্তম পাঠ: শরয়ী রাজনীতি

নিশ্চয়ই যারা দাবি করে যে, মুসলমানরা তাদের যুগে রাজনীতি সম্পর্কে অবগত ছিল না, তাদের এই দাবির পেছনে অত্যন্ত ঘৃণ্য উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা মূলত শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এটি একটি চরম অবিচার। যদি আপনি এ বিষয়ে সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করতে চান, তবে জেনে রাখুন যে, রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল, যার মাধ্যমে তারা আরব উপদ্বীপের আরবদের এবং ইসলামের অনুগত হওয়া অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। মুসলিমদের শাসনব্যবস্থা তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল ছিল, আর তৎকালীন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের মাধ্যমেই গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এর বিপরীতে কিছু বলা কীভাবে সম্ভব? বিভিন্ন বংশ ও জাতির মানুষ—যেমন রোমক, পারস্য, হাবশী এবং আরবগণ—ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের ছায়াতলে সহাবস্থান করেছিল, যেখানে প্রত্যেকেই আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতার সাথে দায়বদ্ধ ছিল। এটা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, এতগুলো জাতি ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের মূল শিকড়, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও দর্শনে ব্যাপক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোনো সুনির্দিষ্ট জীবন-পরিচালনাকারী রাজনীতি ছাড়াই তারা একত্রে বসবাস করেছিল?

যদি এটি সত্য হতো, তবে তা মানবীয় সমাজবিজ্ঞানের ন্যূনতম মূলনীতিরও পরিপন্থী হতো। অতএব, এ কথা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, তারা সবাই শরীয়াহ থেকে উৎসারিত রাজনীতির অধীনেই জীবন অতিবাহিত করেছিল—যা তাদের সামগ্রিক স্বার্থ নিশ্চিত করেছিল। নবুওয়াতের যুগ, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও বিস্তৃতি এর পক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ পেশ করে।

পূর্বোক্ত আলোচনা রাজনীতির প্রকৃত অর্থ এবং এর লক্ষ্য কী, সে সম্পর্কে সত্য উদঘাটন করা আবশ্যক করে তোলে। রাজনীতি (সিয়াসা) শব্দটি 'সাওয়াসা' ধাতু থেকে গৃহীত। বলা হয়ে থাকে: 'শাসক প্রজাসাধারণকে রাজনীতির মাধ্যমে পরিচালনা করেন'। আবার বলা হয়: 'তিনি বিষয়টি পরিচালনা করেছেন'—অর্থাৎ তিনি তা সম্পাদন করেছেন বা এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাজনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন: "রাজনীতি হলো এমন কর্মকাণ্ড, যার ফলে মানুষ কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী হয় এবং অনিষ্ট বা বিপর্যয় থেকে দূরে থাকে—যদিও রাসূলুল্লাহ তা সরাসরি নির্ধারণ করে যাননি কিংবা এ বিষয়ে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি।"

পৃষ্ঠা 145

সপ্তম পাঠ: শরয়ি রাজনীতি

এর সারকথা হলো: রাজনীতি হলো সুপরিচিত ইসলামী মূলনীতির বাস্তব রূপদান, যা হলো কল্যাণ আনয়ন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ করা। এটি কেবল কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহের (নস) আক্ষরিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে বরং কুরআন, সুন্নাহ, শরয়তের চেতনা ও এর লক্ষ্যসমূহের আলোকে মানুষের জন্য যা উপকারী তা অন্বেষণ করা এবং তাদেরকে অপকার থেকে দূরে রাখা।

কতিপয় আধুনিক চিন্তাবিদের মতে রাজনীতির অর্থ হলো: ইসলামী রাষ্ট্রের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি এমনভাবে পরিচালনা করা যা কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং ক্ষতি দূর করে, যা শরয়তের সীমানা এবং এর সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ লঙ্ঘন করে না—যদিও তা মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের সাথে হুবহু না মেলে।

ইসলামে রাজনীতির ভিত্তি:

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যটি মেনে চলা অপরিহার্য তা হলো: এর রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা এবং এর ইসলামী পরিচয়ের মধ্যে কোনো বিভাজন না থাকা। কারণ এখানকার রাজনীতি ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এরই ছত্রছায়ায় অবস্থান করে। সম্ভবত এই সত্যটি কুরআনের অনেক আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: “বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। এটাই সঠিক ধর্ম।” [ইউসুফ: ৪০]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: “তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধান কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে?” [আল-মায়িদাহ: ৫০]।

এই তাৎপর্যটিই ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার ওপর সেই পুরো সময়টি জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যখন মুসলমানদের গৌরব ও মহিমা বিদ্যমান ছিল।

আমরা যদি ইসলামী ধর্মীয় রাজনীতির ভিত্তিগুলো নিয়ে চিন্তা করি, তবে তা আমাদের সামনে নিম্নরূপভাবে স্পষ্ট হবে:

প্রথমত: আদর্শের প্রতি বিশ্বাস এবং ঐক্যের প্রতি আনুগত্য: এই ভিত্তিটি যদিও দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত—যথা আদর্শের প্রতি বিশ্বাস এবং ঐক্যের প্রতি আনুগত্য—তবে এদের প্রতিটিই একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

পৃষ্ঠা 146

শারয়ী রাজনীতি

এর সারমর্ম হলো এই যে, রাষ্ট্রকে একটি অভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করতে হবে, যার মূলকথা হলো আকীদা ও শরীয়াহ হিসেবে ইসলামের চারপাশেই আবর্তিত হওয়া। ইসলামে মুসলিম ও রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ও আইনি বন্ধন হিসেবে 'ইসলামী পরিচয়' বা 'ইসলামী নাগরিকত্বকেই' গণ্য করা হবে। এই কাঠামোর মধ্যেই একজন মুসলিমের আনুগত্য আবর্তিত হবে, যেখানে সে তার ইসলাম ও দ্বীনের পথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে এবং এই বন্ধনকে অন্য সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দেবে। এভাবেই একজন মুসলিম তেমন হবে যেমনটি আল্লাহ তাআলা চান, তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" (আল-আনআম: ১৬২) এবং মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার চেহারাকে সেই সত্তার দিকে ফেরালাম যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।" (আল-আনআম: ৭৯)।

এর ফলে এটি সাব্যস্ত হয় যে, এই আদর্শিক বিশ্বাসের ছায়ায় এমন কোনো রাষ্ট্রের অবকাশ নেই যেখানে গোত্রবাদ বা দলাদলি নিয়ে লড়াই হবে, অথবা যেখানে জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, কিংবা যেখানে বর্ণবাদ বা বংশগৌরব প্রকাশ পাবে। কেননা ধর্মীয় রাজনীতি তার আকিদার মাধ্যমে এই সমস্ত গোঁড়ামিকে বিলীন করে দিয়েছে এবং সকল মুসলিমকে তাদের বিশ্বাসে তাওহীদের পতাকা সমুন্নত করার নির্দেশ দিয়েছে। তারা সকল নবীর ওপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে শেষ রাসূল—তার ওপর ঈমান রাখে। তারা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের দাওয়াত হলো সকলের জন্য একটি সার্বজনীন বার্তা এবং তারা অন্যদের সাথে তাদের নীতি নির্ধারণ করবে এই সত্যের আলোকেই।

এর অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলিম তার স্বজাতির বা নিজ বংশের লোকদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করবে না; বরং এর অর্থ হলো—এটি যেন তার ইসলামের প্রতি আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। ভ্রাতৃত্বই হবে সেই মানদণ্ড যা তাকে সকল মুসলিমের সাথে আবদ্ধ করবে, তারা তার স্বগোত্রীয় হোক বা অন্য কোনো বংশের। তেমনিভাবে, অমুসলিমদের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনার অর্থ এই নয় যে, তাদের ওপর ইসলামের আকিদা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে। কারণ আল্লাহ তাআলার এই অকাট্য বাণীর আলোকে ইসলাম এটি প্রত্যাখ্যান করে: "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; ভ্রান্তি থেকে সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে।" (আল-বাকারা: ২৫৬) এবং মহান আল্লাহর বাণী: "তবে কি আপনি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়?" (ইউনুস: ৯৯)।

ঐক্যের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, ঐক্য হলো ইসলামী রাজনীতির অন্যতম ভিত্তি, যা মুসলিমদেরকে আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে এবং বিভেদ থেকে দূরে রাখে। আর যে রাজনীতি...

শারীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
সপ্তম পাঠ

এর অন্যতম একটি নীতিমালা হলো এমন রাজনীতি যা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। মুসলমানদের রুচি, অভ্যাস ও বংশগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এটি একটি ইসলামি দাবি, যা শরিয়তের মূল পাঠসমূহ (নصوص) নির্দেশ দিয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। এটি নিছক তাত্ত্বিক চিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তব প্রয়োগের দিকে ধাবিত করে। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [আল-ইমরান: ১০৩]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত তো একই উম্মত, আর আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।" [আল-আম্বিয়া: ৯২]।

হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তোমাদের বিষয়াদি (নেতৃত্ব) যখন একজনের অধীনে সুসংহত থাকে, এমতাবস্থায় যদি কেউ তোমাদের নিকট এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় অথবা তোমাদের জামাতে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, তবে তাকে হত্যা

করো।" এই দলিলগুলোর মধ্যে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির আবশ্যকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে; কারণ এটিই হলো শক্তি ও প্রতিরোধের উৎস এবং এর মূল ভিত্তি। এটি এমন এক অন্যতম মাধ্যম যা তাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করে এবং এর মাধ্যমেই তারা তাদের দ্বীনি ও পার্থিব লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়।

একারণেই ইমাম বা শাসককে একক সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; কারণ এর উদ্দেশ্য হলো এমন একজন আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য দূরদর্শী ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা, যিনি বিচ্ছিন্ন মতগুলোকে একত্রিত করবেন এবং মুসলমানদের মাঝে বিবাদ ও অনৈক্যের পথ রুদ্ধ করবেন। তিনি তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণকর বিষয়ের দিকে পরিচালিত করবেন। যদি এই দায়িত্ব পালনের জন্য একাধিক ইমাম দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব সাহায্যকারী দল গ্রহণ করতেন ও বিজয়ী হওয়ার জন্য শক্তির আশ্রয় নিতেন, তবে এর ফলে মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতো এবং সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ত। একারণেই ওলামায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেছেন যে, ইমাম বা শাসক একজনই হবেন।

মুসলমানদের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তা এই ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। এই বাস্তবতার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার ফলে গোত্রবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, ক্ষমতার লোভ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা, ইউরোপীয় আধিপত্য এবং মুসলমানদের ওপর পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আরও অনেক কারণ রয়েছে। তবে একটি সাধারণ মূলনীতি রয়েছে—যা পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তের মুসলমানদের রাজনীতিতে প্রাধান্য পাওয়া উচিত—

সপ্তম পাঠ
শরয়ী রাজনীতি

পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত—এর উদ্দেশ্য হলো এটি ইসলামী পরিমণ্ডলে প্রচলিত থাকা এবং এর মৌলিক উৎসগুলো থেকে আহরিত হওয়া। এই কথা বলার অর্থ ইসলামী চিন্তাধারাকে রুদ্ধ করা নয়; কেননা মুসলিমরা গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপযোগী নতুন নতুন উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করতে আদিষ্ট। তেমনিভাবে অন্যদের থেকে উপকৃত হওয়া ও তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোও তাদের জন্য আবশ্যক। কারণ রাজনৈতিক জটিলতাসমূহ এমন বিষয় যাতে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং এ সংক্রান্ত মতামতের সংখ্যাও বহু। এটি এমন বিষয় যা রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে এবং ঘটনা ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

এর অন্যতম ফলাফল হলো, ইসলামী জগতের প্রতিটি অঞ্চলের বিশেষ বাস্তব চাহিদাসমূহ মোকাবিলা করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এতে কোনো দোষ নেই এবং এটি ইসলামী মূলনীতি বা শরীয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। কারণ প্রতিটি জনপদের সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এসবের ওপর সেই অঞ্চলের জন্য প্রণীত রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে, যার লক্ষ্য থাকে জাগরণ ও উন্নতি সাধনের সর্বোত্তম উপায়গুলো খুঁজে বের করা। আর এই প্রক্রিয়াটি শূরা বা পরামর্শ, মতবিনিময় এবং একই ধর্ম ও অভিন্ন মাতৃভূমির সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামোর ভেতরে সম্পন্ন হয়।

প্রদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও জাগরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপায় বা পদ্ধতি অন্বেষণের ক্ষেত্রে সকল মত ও পথকে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য এটি একটি সঠিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়, যার মাধ্যমে কখনো কখনো সেগুলোর মধ্য থেকে সর্বোত্তমটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আর কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে তা মান্য করা সকলের জন্য আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে ভিন্ন মতাবলম্বীকে তুচ্ছজ্ঞান করা কিংবা তার মতামতের অবমূল্যায়ন করা চলবে না।

তবে চিন্তার স্বাধীনতা, পরামর্শের আবশ্যকতা এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচালনার সুযোগ মূলত একটি

বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ, যা সকল মুসলিমকে শাসন করে। এর সারমর্ম হলো: এমন সব মৌলিক ভিত্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া যা সকলের কল্যাণ কামনা করে এবং মুসলিমরা যেন একটি সুসংহত কাতারে পরিণত হয়।

এর জন্য এমন মাধ্যম থাকা আবশ্যক যার দ্বারা মতভেদের সময় এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিচার-মীমাংসা করা যায়; যাতে প্রতিটি অঞ্চলকে তার বিষয়াদি পরিচালনায় সহায়তা নিশ্চিত করা যায়, এবং যাতে বিশেষ স্বার্থ সাধারণ স্বার্থের ওপর প্রাধান্য বিস্তার না করে বা তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, এবং যাতে ইসলামি ধারার প্রতি আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত হয়।

দ্বিতীয়ত: ধর্মীয় রাজনীতির চর্চা ইসলামি আইনের অধীনে হওয়া অপরিহার্য - কারণ এটাই হচ্ছে সেই মানদণ্ড যার ভিত্তিতে রাজনীতি সঠিক না ভুল তা নির্ধারণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে, ইসলামে রাজনীতি 'নিরঙ্কুশ রাজনীতি'র অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ নিরঙ্কুশ রাজনীতির অর্থ হলো: রাষ্ট্র, শাসক এবং ব্যক্তিরা শরীয়তের দলীলসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং তারা নিছক মানবীয় যুক্তিতে যা তাদের কাছে জনস্বার্থ বলে মনে হয় তা অনুসরণ করবে, এবং এক্ষেত্রে তাদের পথপ্রদর্শক হবে কেবল তাদের জনগণ ও শাসকের ইচ্ছা, দ্বীন ও সত্যের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ ছাড়াই; যা ইসলামে বৈধ নয়।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে:

প্রথম বিষয়: রাজনীতির যে সকল মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহর ধর্মীয় দলীলে বর্ণিত হয়েছে অথবা যে বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই মূলনীতিসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য এবং তা থেকে বিচ্যুত হওয়া বা বের হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমন ন্যায়বিচার করা এবং হকদারদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: **“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে ফেরত দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।”** [আন-নিসা: ৫৮]। অনুরূপভাবে পরামর্শ (মাশওয়ারা) ও মতবিনিময়ের পদ্ধতিও রাজনীতির অন্যতম মূলনীতি। মহান আল্লাহ বলেন: **“এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন তুমি কোনো সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো।”** [আলে ইমরান: ১৫৯]।

অনুরূপভাবে শাসকের আনুগত্য করা যতক্ষণ না তিনি কোনো পাপের নির্দেশ দেন; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **“স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।”** এবং মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: **“মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান।”**

সপ্তম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (শরয়ি রাজনীতি)
অথবা যা ইজমা (ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত, যেমন ইমামের বায়আত। এই নীতিগুলো এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়—যেসব নীতি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যেমন ইনসাফের সাথে শাসন পরিচালনা করা, পরামর্শ গ্রহণ করা, পাপাচার নয় এমন বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের মধ্যে সমতা বিধান করা—এগুলো ইসলামি রাজনীতির এমন কিছু ভিত্তিস্তম্ভ যাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো সুযোগ নেই। জাতি যদি এগুলো গ্রহণ না করে অথবা শাসক যদি এর বিরোধিতা করে তবে তার কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। এই ভিত্তিস্তম্ভগুলো মেনে চলার কারণ হলো, একটি সৎ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুদৃঢ় রাজনীতি পরিচালনার জন্য এগুলোর ওপর নির্ভর করা বা এগুলোর সাহায্য নেয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। যদি আপনি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহে থাকেন, তবে অতীত ও বর্তমানের মহান জাতিসমূহের নিদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছানোর অন্যতম কারণ হলো এই মূলনীতিসমূহ আঁকড়ে ধরা, আর এগুলো ছাড়া উন্নতির কোনো অবকাশ নেই।

এ কারণেই শরীয়ত এই নিয়মগুলো মেনে চলার ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আপনি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করুন আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যাতে তারা আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোনো অংশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" [আল-মায়িদাহ: ৪৯]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "অতঃপর আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।" [আল-জাছিয়াহ: ১৮]

বিষয়টি যখন এরূপ, তখন নস বা অহি-র বিধানের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি এমন বিষয়ে পরিণত হয় যা কোনো বিতর্কের ঊর্ধ্বে। আর জাতির জন্য বা শাসকের জন্য যা করণীয় তা হলো এর ব্যাখ্যা প্রদান, বিভিন্ন জাতির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সময়ের বিবর্তনে মূলনীতির আওতাধীন বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে কাজ করা। এছাড়া মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগের এমন সব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যা মূলনীতির মূল সত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

দ্বিতীয় বিষয়: রাজনীতির এমন সব মূলনীতি ও শাসন সংক্রান্ত বিধান যা কুরআন বা সুন্নাহতে সরাসরি আসেনি, তবে তা শরীয়তের সাধারণ মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: গণভোটের মাধ্যমে শাসক নিয়োগ করা, শাসকের শাসনকাল নির্দিষ্ট মেয়াদী হওয়া এবং প্রতিনিধি সভার (সংসদ/কাউন্সিল) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ জাতীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরয়ি মূলনীতিসমূহের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব।

পৃষ্ঠা 1

শরঈ রাজনীতি
সপ্তম পাঠ
এর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের প্রেক্ষিতে এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে যে, এই বিধানগুলোকে শরীআতের মূলনীতি এবং ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের নজিরসমূহের সামনে উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি তা কোনো মূলনীতির বাস্তব প্রয়োগ হয় অথবা কোনো নজিরের অনুসরণ হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন বিধিবিধান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি ইসলামী মূলনীতির কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা সেগুলোর কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে তাও গ্রহণ করা হবে।

এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, শরীআতের সাধারণ নীতিমালা অনুসরণের ক্ষেত্রটি সেই স্তরে পৌঁছায় না যা কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল বা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তবে অনুসরণের বিষয়টি বজায় থাকে; আর যদি তা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ বয়ে আনে, তবে তা পরিপালন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

শরীআতের সাধারণ নীতিমালা অনুসরণের ভিত্তি হলো ইসলামের এমন সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা যা সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে চিহ্নিত করা সম্ভব, এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করা। এর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে শাসনের খুঁটিনাটি পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা না থাকার মধ্যে, এবং শাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র যে সকল মূলনীতি অনুসরণে বাধ্য, সেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমার আলোকে সীমাবদ্ধ করার মধ্যে। আর এগুলিই হলো ইসলামী ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতার মূল উৎস যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

এই ক্ষেত্রে ইসলামী উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে, যাতে তা জাতির প্রয়োজন মেটাতে আরও সক্ষম হয়ে ওঠে; যার ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয় এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। এতে করে ক্ষমতার লড়াই অনেকাংশেই হ্রাস পায়—যদি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নাও হয়।

যদি বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তবে মঁতেসকিউ তার 'দ্য স্পিরিট অফ লজ' গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করে যে দাবি করেছেন, তা সঠিক নয়। তিনি বলেন: "এই সাম্রাজ্যগুলো —অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন..."

পৃষ্ঠা 2

সপ্তম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র—আমরা দেখতে পাই যে, অন্য সব রাজ্যের তুলনায় এগুলোতে ধর্মের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল, আর এতে বিরাজ করে ভয়ের ওপর ভয়। কেননা ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে আপনি দেখতে পাবেন যে, প্রজাদের পক্ষ থেকে বাদশাহর প্রতি যে

বিস্ময়কর ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তা ধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর তিনি তুরস্কে যা ঘটেছিল সে বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন: মানুষ বাদশাহকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং তার কারণ ছিল ধর্ম। সুতরাং এর অর্থ হলো, তিনি দেখাতে চাইছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক রাষ্ট্র ছিল যা 'শুরা' বা পরামর্শ সম্পর্কে জানত না এবং এটি ধর্মের ভয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ধর্ম মানুষকে ভীত করে রাখত এবং তাদেরকে শাসকের বিরোধিতা করা থেকে বিরত রাখত, এমনকি তিনি জালিম হলেও; আর এটি একটি বিশাল বিভ্রান্তি।

আমরা 'মন্টেস্কু'র প্রতিবাদ করে তাকে বলি: আপনি যা বলেছেন তা একটি বড় বিভ্রান্তি। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রকে 'নিরঙ্কুশ' হিসেবে অভিহিত করা এই রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে। কারণ এটি হলো সেই ঐশী পদ্ধতির রাষ্ট্র যা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষের খিলাফত কায়েমের জন্য মনোনীত করেছেন। অতএব, এই রাষ্ট্রকে অবশ্যই সেই পদ্ধতির সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে; যে পদ্ধতি ন্যায়বিচার, অধিকারীদের নিকট তাদের অধিকার পৌঁছে দেওয়া এবং একে অপরের প্রতি মানুষের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। এটি মূলত মহান আল্লাহর প্রতি সকলের দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

মন্টেস্কুর এই বর্ণনা বা ইসলাম ধর্মকে এভাবে বিশেষিত করা সঠিক নয় যে, এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভয়ের ওপর ভয় বৃদ্ধি করে। কারণ ইসলাম হলো বিবেক ও সন্তুষ্টির ধর্ম; এটি জবরদস্তি বা নিপীড়নের ধর্ম নয়। মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত করে এবং এই সত্যের আলোকেই তাঁর শরীয়ত মেনে চলে। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, এটি মূলত আশা ও ভীতির সমন্বয়ে হয়ে থাকে। কেবল উৎসাহদান বা কেবল ভীতি প্রদর্শন এর জন্য যথেষ্ট নয়, যদিও আশা ভীতির অগ্রগামী ও সম্মুখবর্তী থাকে। আর এটি ধর্ম থেকে উৎসারিত ভয়ের সেই ধারণাকে বাতিল করে দেয়, যেটিকে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

পরিশেষে, ইমাম বা শাসকের প্রতি যে বিস্ময়কর ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা তিনি দাবি করেছেন এবং যার ভিত্তি ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অবকাশ নেই। আবু বকর (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমালোচনার অধিকারের সামনে এর কোনো স্থান আছে কি? তিনি বলেছিলেন: "যদি আমি ভালো কাজ করি..."

পৃষ্ঠা 3

শরয়ী রাজনীতি

সপ্তম পাঠ

"...সুতরাং তোমরা আমাকে সাহায্য করো, আর যদি আমি ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করে দিও।" প্রজাসাধারণ ওমরের মুখের ওপর স্পষ্টভাবে এটি বলেছিল; যেমন একজন মুসলিমের উক্তিতে রয়েছে: "আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতাম, তবে আমাদের তলোয়ার দিয়ে তা সোজা করে দিতাম।" সূক্ষ্মদর্শী গবেষক মঁতেস্কুর জন্য কি এটিই অধিকতর সংগত ছিল না যে, তিনি ধর্মকে তার কল্পিত কোনো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে টেনে আনবেন না? অথবা তুর্কিদের কর্মকাণ্ডকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করার কোনো মূল্য নেই এবং তা কোনো ধর্তব্য বিষয়ও নয়; কারণ তারা ইসলামের জন্য কোনো প্রমাণ নয়—যদিও তারা মুসলিম ছিল—কেননা তারা ইসলাম থেকে কেবল খিলাফতের বাহ্যিক রূপটি গ্রহণ করেছিল এবং নিছক মানবরচিত রাজনৈতিক কারণে এর মূল বিষয়বস্তুকে ছুড়ে ফেলেছিল, যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনীতি ইসলামী শরীয়তের বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা এমন যা কোনো অকাট্য বর্ণনাকে (নস) অকার্যকর করে না, কিংবা তা লঙ্ঘন করে না অথবা ইসলামের কোনো মূলনীতির সাথে বৈরিতা পোষণ করে না।

ইসলামী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিধানের উৎসসমূহ

ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সেই শরয়ী বিধানাবলিরই অংশ, যা সামগ্রিকভাবে 'ইসলামী ফিকহ' নামে পরিচিত। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎসসমূহ বর্ণনা করতে চান, তাকে সাধারণভাবে ফিকহ শাস্ত্রের উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। কারণ ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহ অভিন্ন, তা দেওয়ানি আইন, আন্তর্জাতিক আইন, অর্থনৈতিক আইন, রাজনৈতিক আইন কিংবা এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এই সকল ব্যবস্থাপনাই একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে তাদের বিধান গ্রহণ করে, আর তা হলো: ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের উৎসসমূহ বা বিধানের দলিলসমূহ, যা উসূলে ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং তাতে আর কোনো সংযোজনের অবকাশ নেই।

তবে এটি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই উৎসগুলো সম্পর্কে পরিচিত হতে বাধা দেয় না; যাতে আমরা দেখতে পারি যে, কীভাবে তা থেকে ইসলামী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানাবলি উদ্ভাবন করা সম্ভব।

সপ্তম পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

এটি সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী ফিকহের উৎসসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, বর্ণনাভিত্তিক (নাকলী) উৎস, যা কুরআন ও সুন্নাহর সমন্বয়ে গঠিত; কারণ এগুলো ওহীর মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং এগুলো প্রণয়নে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কোনো সুযোগ ছিল না, যদিও তা অনুধাবন করতে এবং তা থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবন (ইস্তিনবাত) করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ অপরিহার্য।

অনুরূপভাবে এগুলোকে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক (আকলী) উৎস হিসেবেও বিভক্ত করা যায়, যা ইজতিহাদের—তার ব্যাপক অর্থে—মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সকল উৎসকে অন্তর্ভুক্ত করে। উসূলবিদদের মধ্যে কেউ কেউ এই উৎসগুলোকে এভাবে বিভক্ত করেন: মৌলিক উৎস, যা হলো কুরআন ও সুন্নাহ; এবং অনুগামী (তাবেয়ী) উৎস, যার দিকে মূল পাঠ্যসমূহ (নাস) নির্দেশনা দিয়েছে এবং কোনো স্পষ্ট নাসের অনুপস্থিতিতে বিধান উদ্ভাবন বা তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা সেগুলোকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। যেমন: ইজমা, কিয়াস, মাসালিহে মুরসালাহ এবং এই জাতীয় উৎসসমূহ।

তাই আমরা আমাদের এই আলোচনায় ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎসসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করব, চাই তা মৌলিক হোক বা অনুগামী। আমরা প্রথমে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানের উৎস হিসেবে আল-কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমত: আল-কুরআনুল কারীম:

আল-কুরআনুল কারীম: এটি আল্লাহর বাণী যা বিশ্বস্ত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটি মুসহাফের দুই মলাটের মধ্যবর্তী সেই কালাম যা মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত) বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর বর্ণনা এবং একে অন্য সব কিছু থেকে পৃথক রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি তাঁরা এ ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতেন; যার ফলে তাঁরা হরকত (জের-যবর) এবং নুকতাহ (বিন্দু) প্রদানকেও অপছন্দ করতেন যাতে কুরআনের সাথে অন্য কিছু মিশে না যায়। সুতরাং মুসহাফের দুই মলাটের মাঝে যা লিখিত আছে তা পূর্ণাঙ্গ কুরআন, যাতে কোনো কমতি নেই। কারণ প্রথাগত ও স্বাভাবিক নিয়মে—যেখানে কুরআন মুখস্থ রাখা ও বর্ণনার সকল উপকরণ বিদ্যমান—এর কিছু অংশ বাদ পড়ে যাওয়া এবং বর্ণিত না হওয়া, অথবা এর সাথে যা কুরআনের অংশ নয় তা মিশে যাওয়া অসম্ভব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মক্কাতুল

মুকাররামায়। আর তা ছিল তাঁর জন্মের একচল্লিশতম বছরের রমজান মাসের সতেরো তারিখে।

শরয়ি রাজনীতি

সপ্তম পাঠ

নবী ﷺ এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারা হিজরি দশম বর্ষের জিলহজ মাসের নয় তারিখ অর্থাৎ হজ্জুল আকবরের দিন পর্যন্ত এবং তাঁর জন্মের তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পবিত্র কুরআন কিস্তিতে কিস্তিতে পৃথকভাবে অবতীর্ণ হতো, যাতে এর মাধ্যমে নবী ﷺ এর অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং নবুওয়াতের সূচনা থেকে শুরু করে মদিনায় নবী ﷺ এর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ইসলামি সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির সাথে এটি সংগতিপূর্ণ হয়।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র পর্যায় অতিক্রম করেছে: প্রথমটি হলো মাক্কি পর্যায়—যাতে কুরআনের অধিকাংশ অংশ অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাগুলোকে 'মাক্কি কুরআন' বলা হয়। এই আয়াত ও সূরাগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে সঠিক আকিদা গঠন এবং প্রাচীন কুসংস্কার ও ভ্রষ্টতা থেকে তা মুক্ত করার লক্ষ্য রাখে।

অতঃপর মাদানি পর্যায়, যা হিজরত থেকে শুরু করে নবী ﷺ এর ইন্তেকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ে শরয়ি বিধানসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। এই সময়ে অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাগুলোকে 'মাদানি কুরআন' বলা হয়। এই পর্যায়ের বিধানগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো বিধিবিধান এবং শরয়ি দায়িত্বসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা; কেননা মাক্কি পর্যায়ে আকিদা সংশোধনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা (মুকাল্লাফগণ) এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী ﷺ এর যুগে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত ছিল না, বরং তা বিভিন্ন পত্রে লিখিত ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম এটি সংকলন করার উদ্যোগ নেন, যখন ইয়ামামার যুদ্ধে আল্লাহর কিতাবের হাফেজদের এক বিশাল অংশ শাহাদাত বরণ করেন।

পরবর্তীতে যখন ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হলো এবং সাহাবায়ে কেরাম বিজিত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়লেন, তখন উসমান (রা.) আশঙ্কা করলেন যে, মুসলমানরা কুরআনের কিরাআত বা পাঠরীতি নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হতে পারে। ফলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে দ্বিতীয়বারের মতো এটি সংকলন করেন। এক্ষেত্রে তিনি আবু বকর (রা.)-এর পূর্ববর্তী প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করেন এবং পবিত্র কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন ইসলামি জনপদে পাঠিয়ে দেন। একই সাথে তিনি মূল পাণ্ডুলিপি ব্যতীত অন্য কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন, যাতে মুসলমানরা কুরআনের বিষয়ে কোনো প্রকার মতভেদে লিপ্ত না হয়।

সপ্তম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

কুরআনের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি এবং এর মোট আয়াতের সংখ্যা ৬৩৪১টি। এই আয়াত ও সূরাসমূহ সুবিন্যস্ত। অধিকাংশ আলিমের মতে, এই বিন্যাসটি 'তাওকিফি' (আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত), এতে সাহাবায়ে কিরামের কোনো নিজস্ব রায় বা অভিমত নেই। এরপর থেকে মুসলমানদের প্রচেষ্টা একাধারে অব্যাহত রয়েছে—এবং যতদিন আল্লাহ এই পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী রাখবেন (তথা কিয়ামত পর্যন্ত)—পবিত্র মাসহাফের লিখন, মুদ্রণ, সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যার যত্নের বিষয়ে। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন: "নিশ্চয় আমিই এই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।" [সূরা হিজর: ৯]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধানসমূহ (আহকাম) কয়েক ভাগে বিভক্ত: আকিদাগত বিধানসমূহ, যার উদ্দেশ্য হলো মানুষের আকিদা বা বিশ্বাসকে সংশোধন করা। এটি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) যা সংবাদ দিয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে।

এছাড়াও রয়েছে চারিত্রিক বিধানসমূহ, যা আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত।

তৃতীয়ত, সেখানে আরও রয়েছে আমলগত বিধানসমূহ। এগুলো মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে দায়বদ্ধ ব্যক্তি) কর্তৃক সম্পাদিত কথা, কাজ ও আচরণের বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধান বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। একেই ‘ফিকহ’ বা ‘ইসলামি শরিয়ত’ (তাশরি' ইসলামি) বলা হয়।

এর সারসংক্ষেপ হলো এই যে, পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান বিধানসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত: আকিদাগত বিধান, চারিত্রিক বিধান এবং আমলগত বিধান।

কুরআনে আহকামের আয়াত সংখ্যা পাঁচশর বেশি নয়। এগুলো ‘ইবাদত’ সংক্রান্ত বিধানে বিভক্ত, যার উদ্দেশ্য হলো মানুষ ও তার রবের মধ্যে সম্পর্ক বিন্যস্ত করা; এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৪০টি আয়াত। আর ‘মুআমালাত’ (লেনদেন ও সামাজিক আচরণ) সংক্রান্ত বিধানসমূহ হচ্ছে সেগুলো, যা ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্পর্ক, অথবা ব্যক্তি ও শাসকের মধ্যকার সম্পর্ক, অথবা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের আইনি বিন্যাস নিশ্চিত করে। শেখ আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রকারের বিধানগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত:

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি

সপ্তম পাঠ

১. ব্যক্তিগত অবস্থা সংক্রান্ত বিধিবিধান বা পারিবারিক আইন: এতে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, অসিয়ত (ইচ্ছাপত্র) এবং হজর (আইনি সীমাবদ্ধতা) সংক্রান্ত বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত এবং এতে প্রায় সত্তরটি আয়াত রয়েছে।

২. দেওয়ানি বিধিবিধান: এগুলো ব্যক্তিদের পারস্পরিক লেনদেন এবং তাদের বিনিময় যেমন— ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা (ভাড়া), বন্ধক,

জামিনদার, অংশীদারিত্ব এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত; এতে প্রায় সত্তরটি আয়াত রয়েছে।

৩. ফৌজদারি বিধিবিধান: এগুলো মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে দায়বদ্ধ ব্যক্তি) কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ এবং সেগুলোর জন্য প্রাপ্য দণ্ডের বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত; এতে প্রায় ত্রিশটি আয়াত রয়েছে।

৪. বিচারিক কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিধিবিধান: এগুলো মানুষের অধিকার পর্যালোচনার জন্য আদালত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পরিচালনা এবং মামলা ও প্রমাণের বিধিবিধান বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত; এতে প্রায় ১৩টি আয়াত রয়েছে।

৫. সাংবিধানিক বিধিবিধান: এগুলো শাসন ব্যবস্থা এবং এর মূলনীতিসমূহের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ: শাসক ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের বর্ণনা; এতে প্রায় দশটি আয়াত রয়েছে।

৬. আন্তর্জাতিক বিধিবিধান: এগুলো শান্তি ও যুদ্ধের অবস্থায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্কের বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত; এর আয়াত সংখ্যা প্রায় ২৫টি।

৭. পরিশেষে অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিধিবিধান: এগুলো সম্পদ, ব্যয়ের খাত এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পর্ক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট; এতে প্রায় দশটি আয়াত রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জন্য যা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, পবিত্র কুরআন—শরীয়তের প্রথম উৎস হিসেবে—অনেক সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধিবিধান সুনিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এর সম্মানিত আয়াতসমূহে শাসন, নেতৃত্ব, রাজতন্ত্র, কর্তৃত্ব, অভিভাবকত্ব, সার্বভৌমত্ব, বিচার ব্যবস্থা, যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধিচুক্তি, ব্যক্তির অধিকার, তাদের স্বাধীনতা এবং অধিকার...

সপ্তম পাঠ: সিয়াসাহ শারইয়াহ (শরয়ি রাজনীতি)

শাসক, যিম্মি নাগরিকদের অধিকার, অথবা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে যা বিদেশি ও সংখ্যালঘু মর্যাদা হিসেবে পরিচিত, এবং শাসনব্যবস্থা হিসেবে 'শুরা' (পরামর্শ ব্যবস্থা) ও অন্যান্য মৌলিক সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর প্রতি পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত প্রদান করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ লিখিত সংবিধানের ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার এবং তার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধিবিধানসমূহ সুসংবদ্ধ করার অনেক পূর্বেই এই বিষয়গুলো সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে। যা এই মহান শরীয়তকে এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তবে এটি লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ কেবল সাধারণ মূলনীতি এবং সামষ্টিক ধারণাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এটি খুঁটিনাটি ও পদ্ধতিগত বিস্তারিত বর্ণনায় খুব সামান্যই লিপ্ত হয়; কেননা তা কুরআনের অলঙ্কারশাস্ত্র এবং সমস্ত শরয়ি বিধানের জন্য একটি সংবিধান স্বরূপ কিতাব হওয়ার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। সুতরাং বর্ণনার এই পদ্ধতি -অতএব- মানুষের সংকল্পকে জাগ্রত করে এবং সেই সামষ্টিক মূলনীতিগুলো অনুধাবন করতে ও সেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে যা মূল পাঠের (নস) অনুকূলে থাকে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে না। যেমনটি কুরআন মাজিদে রাজনৈতিক শুরার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামো নির্ধারণ না করেই বর্ণনা এসেছে। ফলে এটি এমন প্রতিটি শাসনব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে যা ন্যায়বিচার কায়েম করে এবং জুলুম, স্বৈরতন্ত্র ও ব্যক্তিতন্ত্র পরিহার করে; এরপর সেই ব্যবস্থাটি প্রজাতন্ত্র হোক, রাজতন্ত্র হোক, খিলাফত হোক বা অন্য যা-ই হোক না কেন, যাতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে না, বরং তা সমাজের সাধারণ জনকল্যাণের চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

এই প্রসঙ্গের সারকথা হলো: শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং সাংবিধানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ কেবল সাধারণ বিধানসমূহের ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছে। পক্ষান্তরে বিস্তারিত বিষয়গুলো তা এড়িয়ে গেছে এবং সবিস্তারে বর্ণনা করেনি। কেন? কারণ ইসলামের শরীয়ত হলো সর্বশেষ শরীয়ত -তথা সকল শরীয়তের পরিসমাপ্তি- আর তাই এটি কিয়ামত কায়েম হওয়া এবং আল্লাহ জমিন ও এর অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এজন্য কুরআন মাজিদ মানুষের জন্য চিন্তাভাবনার একটি অবকাশ রাখা নিশ্চিত করেছে -বিশেষ করে সমাজের বিবর্তন এবং ঘটনা ও পরিস্থিতির আধিক্যের প্রেক্ষিতে। আর এই কারণেই কুরআন তাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনার বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছে এবং স্থাপন করেছে...

পৃষ্ঠা 9

শারঈ রাজনীতি
সপ্তম পাঠ

তাদের জন্য শাসনব্যবস্থার নিয়মাবলি রয়েছে, চাই তা সাংবিধানিক দিক থেকে হোক বা অন্য কোনো দিক থেকে। পরবর্তীতে তাদের জন্য বিস্তারিত বিবরণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; সুতরাং তারা উদ্ভূত এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়ন করতে পারে শারঈ নীতিমালা এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সামগ্রিক বিধান অনুযায়ী।

আমরা এর উদাহরণ হিসেবে পরামর্শের (শূরা) কথা উল্লেখ করতে পারি; মহান আল্লাহ বলেন: "এবং তাদের বিষয়গুলো তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" [আশ-শূরা: ৩৮]। তিনি আরও বলেন: "এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করুন" [আলে ইমরান: ১৫৯]। পবিত্র কুরআন শূরার মূলনীতির ওপর সুনিশ্চিত বিধান দিয়েছে, কিন্তু কীভাবে এই পরামর্শের চর্চা করা হবে তার পদ্ধতি আমাদের বলে দেয়নি; আর এ কারণেই এই বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্তিদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিস্তারিত রূপ সময় ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মূল বিষয় হলো, তা যেন পবিত্র কুরআনের অঙ্কিত সাধারণ নীতিমালার আলোকে সম্পন্ন হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, পবিত্র কুরআন হলো ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম উৎস। আর এই বিষয়গুলোর বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এতে আয়াতের স্বল্পতা থাকার কারণ হলো—পবিত্র কুরআন কেবল সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এর বাইরের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রতিটি সমাজের পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে নতুন উদ্ভূত বিষয় ও ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে তা নির্ধারিত হতে পারে, যতক্ষণ না তা শরীয়তের ভিত্তি ও উদ্দেশ্যসমূহ থেকে বিচ্যুত হয়। এটি বিধানদাতার (শারী') পক্ষ থেকে এই বিধানগুলোর প্রতি গুরুত্বের অভাবের কারণে ছিল না—যেমনটি আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ ভুলভাবে বুঝেছেন অথবা ভালো উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও ভুল করেছেন; কারণ তারা একদিক থেকে মানবরচিত পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং অন্যদিক থেকে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের যথেষ্ট পরিচয় ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন যখন তিনি তাঁর কিতাবের বর্ণনায় বলেন: "এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা" [আন-নাহল: ৮৯]।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ নববী:

অভিধানে সুন্নাহ অর্থ হলো পথ ও জীবনপদ্ধতি। বলা হয়ে থাকে যে, এটি 'সান্না' ধাতু থেকে গৃহীত যার অর্থ হলো 'সুস্পষ্ট করা'। সুন্নাহকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী।

সপ্তম পাঠ

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

আর পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতিকে বোঝায়।

- মৌখিক সুন্নাহ: এটি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বাণীসমূহ, যা সুন্নাহর অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে। যেমন তাঁর বাণী: "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করো।" তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যার সে নিয়ত করেছে।" তাঁর বাণী: "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতির বিনিময়ে ক্ষতি করাও চলবে না।" এবং তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে থাকে, সে যেন তা মনে পড়ার সাথে সাথেই আদায় করে নেয়।"

- ব্যবহারিক সুন্নাহ: এটি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহ, যেমন তাঁর সালাত ও হজ পালনের পদ্ধতি। তিনি বলেছেন: "তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।" তিনি আরও বলেছেন: "তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজের নিয়মাবলি গ্রহণ করো।" এর অন্তর্ভুক্ত হলো একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে তাঁর বিচার কার্য পরিচালনা করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, যা তাঁর কর্মের কারণে সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হয়।

- মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ: এটি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ হতে দেখা বা কোনো কথা শুনতে পাওয়া এবং অতঃপর তা সমর্থন করা, তা অস্বীকার না করা। এর মাধ্যমে সেই বিষয়ে তাঁর স্বীকৃতি প্রমাণিত হয়। এর উদাহরণ হলো: যা বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠান, তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন: "তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার করবে?" তিনি উত্তর দিলেন: "আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও?" তিনি বললেন: "তবে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: "যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহতেও না পাও?" তিনি বললেন: "তবে আমি আমার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করব এবং কোনো ত্রুটি করব না।" তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে হাত চাপড়ে দিলেন এবং বললেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন তাওফিক দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে।" এর আরেকটি উদাহরণ হলো আলী (রা.)-এর অনেক বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর স্বীকৃতি। এছাড়া সাহাবীদের সেই কাজের প্রতি তাঁর স্বীকৃতি যারা পানি না পেয়ে সালাতের জন্য তায়াম্মুম করেছিলেন, অতঃপর সালাত আদায়ের পর পানি পেয়েছিলেন কিন্তু তারা পুনরায় সেই সালাত আদায় করেননি। এ সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মৌন সম্মতি বা স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য।

সুতরাং সুন্নাহ হলো: মৌখিক সুন্নাহ, ব্যবহারিক সুন্নাহ এবং মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ।

সপ্তম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

পবিত্র সুন্নাহ পবিত্র কুরআনের পরে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়; কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই আনুগত্যকে তাঁর নিজের আনুগত্যের সাথে যুক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর রাসূল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" [আল-হাশর: ৭]। তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল।" [আন-নিসা: ৮০] ।

ইমাম শাওকানী বলেন: এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা, তাঁর সুউচ্চ শান এবং সুমহান মাকামের এমন এক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যার পরিমাপ করা সম্ভব নয় এবং যার শেষ সীমায় পৌঁছানো যায় না। এর কারণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তা-ই নির্দেশ দেন যা আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেবল তা থেকেই নিষেধ করেন যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এই ভিত্তিতে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম এই বিষয়ে একমত যে, সুন্নাহ গ্রহণ করা ওয়াজিব এবং একে ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক। বিশেষ করে যেহেতু কিছু বিধান কুরআনে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, যেমন সালাত, জাকাত ও হজ্জের আবশ্যকতা; সুন্নাহর ব্যাখ্যা ছাড়া এই বিধানগুলো অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুন্নাহ যদি শরীয়তের উৎস না হতো, তবে কুরআন ও সুন্নাহর দাবি অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

প্রমাণের (সাব্যস্ত হওয়ার) দিক থেকে পবিত্র সুন্নাহ তিন ভাগে বিভক্ত:
- সুন্নাহে মুতাওয়াতিরা
- সুন্নাহে মাশহুরা
- সুন্নাহে আহাদ

সুন্নাহে মুতাওয়াতিরা: এটি হলো সেই হাদিস যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সনদের শেষ পর্যন্ত এমন এক বিশাল দল বর্ণনা করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার ওপর একমত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব। তবে শর্ত হলো, এই বিশাল জনসমষ্টি সনদের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান থাকতে হবে; কারণ সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এত সংখ্যক লোক সমবেত হওয়া সাধারণ অভ্যাসের পরিপন্থী। আমরা বলি: তাদের সংখ্যাধিক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের কারণে তাদের পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় নিতে একজোট হওয়া অসম্ভব। সুন্নাহে মুতাওয়াতিরার উদাহরণ হলো সেই সব বর্ণনা যা...

নবী ﷺ-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি, হজের নিয়মাবলি, যাকাতের পরিমাণ, আযানের পদ্ধতি এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা নবী ﷺ-এর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের নিকট নিরবচ্ছিন্নভাবে (মুতাওয়াতির সূত্রে) বর্ণিত হয়ে আসছে।

সুন্নাহ মশহূরাহ: এটি হলো সেই সকল বিষয় যা নবী ﷺ থেকে এমন একটি দল বর্ণনা করেছেন যারা মুতাওয়াতির হওয়ার সংখ্যায় পৌঁছেননি, কিন্তু পরবর্তীতে এই দলটির থেকে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির স্তরে পৌঁছেছে। সুতরাং সুন্নাহ

মশহূরাহ-এর ক্ষেত্রে বর্ণনার প্রথম স্তরে মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি ছিল না। আর এটাই একে সুন্নাহ মুতাওয়াতিরাহ থেকে পৃথক করে, কারণ সুন্নাহ মুতাওয়াতিরাহ-তে সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুতাওয়াতির হওয়ার শর্ত বিদ্যমান থাকে, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর অনুসারীদের মতে সুন্নাহ মশহূরাহ সুনিশ্চিত জ্ঞান (ইলমে ইয়াকিন) প্রদান করে, তবে তা সুন্নাহ মুতাওয়াতিরাহ থেকে অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। তারা কখনো একে প্রশান্তিদায়ক জ্ঞান (ইলমে তুমআনিনাহ) বলে অভিহিত করেন, যা নিশ্চিত জ্ঞানের স্তরে না পৌঁছালেও তার সদৃশ হয়। এ কারণে হানাফীগণ এই প্রকার সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব মনে করেন এবং তাঁরা এর মাধ্যমে কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক বিধানসমূহকে সীমাবদ্ধ করেন এবং সাধারণ বিধানসমূহকে নির্দিষ্ট করেন ইত্যাদি।

সুন্নাহ আ-হাদ: সুন্নাহ আ-হাদ হলো এমন প্রত্যেকটি সংবাদ যা নবী ﷺ থেকে একজন, দুইজন বা তার বেশি ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হানাফী পরিভাষা অনুযায়ী তাতে মুতাওয়াতির বা মশহূরাহ হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায় না। সুন্নাহ আ-হাদ প্রবল ধারণার (গলাবাতুজ জান্ন) উদ্রেক করে এবং তা নিশ্চিত জ্ঞান (ইলমে ক্বাতঈ) প্রদান করে না; কারণ নবী ﷺ-এর সাথে এর বর্ণনাসূত্রের সংযোগটি সংশয়পূর্ণ।

কোনো কোনো আলিম বলেন: এর সংযোগের ক্ষেত্রে রূপগত এবং অর্থগত সংশয় রয়েছে। রূপগত সংশয় এই কারণে যে, নবী ﷺ-এর সাথে এর সংযোগ অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। আর অর্থগত সংশয় এই কারণে যে, উম্মাহ এটি গ্রহণ করে নিয়েছে, অর্থাৎ তাবেয়ীদের পরবর্তী স্তরে। সুন্নাহ আ-হাদ-এর সনদে এই সংশয়ের কারণে উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যদি কোনো বিপরীত দলিল না থাকে তবে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, কিন্তু আকিদাহর ক্ষেত্রে এটি গ্রহণ করা হবে না। কারণ আকিদাহর ভিত্তি হলো দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চিত জ্ঞান, আর সুন্নাহ আ-হাদ কেবল প্রবল ধারণার ফায়দা দেয়, তাই আকিদাহর ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা হয় না।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
সপ্তম পাঠ

বিশ্বাসসমূহ; কারণ বিশ্বাসসমূহ—যেমনটি আমরা বলেছি—দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এতে কেবল একক (আহাদ) সুন্নাহর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রবল ধারণা যথেষ্ট নয়। কারণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা সত্যের মোকাবিলায় কোনো কাজে আসে না।

ইমাম আবু হানিফার মতে খবরে ওয়াহেদ (একক সংবাদ) অনুযায়ী আমল করার শর্ত হলো—বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা ছাড়াও—বর্ণনাকারী যা বর্ণনা করছেন তার আমল যেন তার বর্ণিত হাদিসের পরিপন্থী না হয়। অর্থাৎ, বর্ণনাকারী তার বর্ণিত হাদিসের বিরুদ্ধে আমল করবেন না। এর একটি উদাহরণ হলো যা বর্ণিত হয়েছে যে, আবু হুরায়রা (রা.) এই হাদিসটি বর্ণনা করতেন: "তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে, যার একটি হবে পবিত্র মাটি দিয়ে।" কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এই সাতবারের শর্তটি গ্রহণ করেননি। কেন? তাঁরা বলেছেন: কারণ খোদ আবু হুরায়রা (রা.)—যিনি এই সংবাদের বর্ণনাকারী—নিজে আমল করার ক্ষেত্রে তিনবার ধৌত করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এটি বর্ণনাকারীর নিজের কাছে এই বর্ণনার সম্বন্ধের সত্যতার বিষয়ে দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে গণ্য হয়।

ইমাম মালিক (রহ.) একক সুন্নাহ (আহাদ) অনুযায়ী আমল করার জন্য শর্তারোপ করেন যে, তা যেন মদিনাবাসীদের আমলের পরিপন্থী না হয়। কারণ তাঁর মাযহাব অনুযায়ী, ধর্মীয় বিষয়াবলিতে মদিনাবাসীদের আমল এতোটাই প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত যে তা

কারো কাছে গোপন থাকে না।

শাইখ আবু জাহরা এই প্রসঙ্গে বলেন: ইমাম মালিক এক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক রাবিআতুত রায়-এর মতো মনে করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে মদিনাবাসীদের আমল হলো নবী (সা.) পর্যন্ত একজনের বর্ণনা নয় বরং হাজার জন থেকে হাজার জনের বর্ণনার মতো। তাই যখন কোনো একক সংবাদ (খবরে আহাদ) এর পরিপন্থী হয়, তখন রাসূল (সা.)-এর দিকে এর সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তা দুর্বল হয়ে যায় এবং মদিনাবাসীদের আমলকে এর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং ইমাম মালিকের নিকট একক সুন্নাহর ওপর মদিনাবাসীদের আমলকে প্রাধান্য দেওয়া মানে হলো একক সংবাদের ওপর প্রসিদ্ধ, বহুল প্রচারিত ও মুতাওয়াতির বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া। এটি নিছক একক সংবাদকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। অর্থাৎ ইমাম মালিক একক সংবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন না; বরং একক সংবাদ যদি মদিনাবাসীদের আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে ইমাম মালিকের নিকট মদিনাবাসীদের আমল অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি একক সংবাদ অনুযায়ী আমল করাকে প্রত্যাখ্যান করছেন।

সপ্তম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

সুন্নাহর সকল প্রকারের প্রামাণ্যতা:

এই ভূমিকার পর আমরা আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসছি, আর তা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ইসলামী ব্যবস্থায় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানের অন্যতম মৌলিক উৎস হওয়া।

যেহেতু আমরা এটি সাব্যস্ত করেছি যে, সুন্নাহ সমস্ত শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য আইনগত উৎস এবং ইসলামী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানসমূহ ব্যবহারিক শরয়ি বিধানেরই একটি অংশ; সেহেতু আমরা এই বিষয়ে পূর্ণ প্রশান্তি ও দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করছি যে, সুন্নাহ অন্যান্য বিধানের মতোই এই বিধানগুলোর জন্যেও একটি পূর্ণাঙ্গ উৎস। এক্ষেত্রে সুন্নাতে মুতাওয়াতিরাহ, সুন্নাতে মাশহুরাহ এবং সুন্নাতে আহাদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। এটি সেই লিখিত দলিলে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যা মদিনার সংবিধান বা ‘সহীফা’ নামে পরিচিত। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি ছিল।

অনুরূপভাবে পবিত্র সুন্নাহর ভাষ্যসমূহে শাসক, প্রজা, বায়াত (আনুগত্যের শপথ), ইমারত (নেতৃত্ব), আমীরের আনুগত্য প্রভৃতি শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে শাসকের অধিকার ও দায়িত্ব, জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শান্তি, যুদ্ধ, চুক্তি, বিচারব্যবস্থা, শূরা (পরামর্শ সভা) এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থানসহ এমন অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা আধুনিক পরিভাষায় সরাসরি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো, সুন্নাহ পবিত্র কুরআনের মতোই ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানের উৎস হিসেবে গণ্য। কারণ—যেমনটি আমরা বলেছি—এতে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়ের মূল বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে; যেমন: নেতৃত্ব, আমীরের আনুগত্য, জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা এবং মুসলিম ব্যতীত অন্যদের সাথে যুদ্ধ ও শান্তির সম্পর্ক ইত্যাদি।

অতএব, বর্তমান সময়ের কিছু লেখকের এহেন কর্মকাণ্ড আমাদের নিকট চরম বিস্ময়কর মনে হয় যে, তারা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রে ‘আহাদ’ পর্যায়ের সুন্নাহর প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করেন!

আমরা বলেছি: সুন্নাহ চাই তা সুন্নাত-ই মুতাওয়াতিরাহ হোক বা সুন্নাত-ই মশহুর হোক কিংবা সুন্নাত-ই আহাদ হোক, তা ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানসমূহের মূল উৎস। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু আধুনিক লেখক এ বিষয়ে বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। তারা মনে করেন যে, সুন্নাত-ই আহাদ ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানের উৎস হতে পারে না, কিংবা এটি উৎস হওয়ার যোগ্য নয়!

আমরা বলি: আমরা যদি এই লেখকের জন্য এই মর্মে কোনো অজুহাত খুঁজি যে, তিনি হাদিস ও সুন্নাহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন কিংবা ইসলামী গবেষণায় পারদর্শী নন, তবে তার বক্তব্য কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একটি নিজস্ব মতামত হিসেবেই গণ্য হবে এবং বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনশাস্ত্রের প্রখ্যাত লেখক ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতাওয়াল্লীর কিছু চিন্তাধারা পেশ করা থেকে আমাদের বিরত রাখে না। তিনি আইন অনুষদসমূহের সাংবিধানিক আইনের একজন ডক্টর। আমাদের উচিত তার কিছু চিন্তাধারা তুলে ধরা; যাতে এই চিন্তাগুলোর মধ্যকার সংশয়সমূহ স্পষ্ট হয় এবং যা সংশোধন করা আবশ্যক তা আমরা সংশোধন করতে পারি। ডক্টর এই বিষয়ে যে মতামতের সারসংক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন, তা তিনি "ইসলামে শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতাওয়াল্লীর মতামতের সারসংক্ষেপ এবং এর উপর পর্যালোচনা:

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতাওয়াল্লী মনে করেন যে, সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে সুন্নাত-ই আহাদ যখন স্বতন্ত্র হবে, অর্থাৎ যখন এটি এমন কোনো নতুন বিধান বা মূলনীতি নিয়ে আসবে যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, তখন তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। এটি নিম্নোক্ত দুটি কারণে:

১. সাংবিধানিক বিধানসমূহের গুরুত্ব ও এর সংবেদনশীলতা।
২. সুন্নাত-ই আহাদ অকাট্য বা নিশ্চিত নয়।

ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতাওয়াল্লী সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাত-ই আহাদ গ্রহণ করেন না এবং এই সকল সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাত-ই আহাদ গ্রহণ না করার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন: গুরুত্ব...

সাংবিধানিক বিধানসমূহ এবং সেগুলোর গুরুত্ব; অর্থাৎ: এই গুরুত্ব ও ঝুঁকির কারণে, এগুলো আহাদ সুন্নাহর (একক বর্ণনা) মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া সমীচীন নয়। তিনি আরও বলেন যে, আহাদ সুন্নাহ সুনিশ্চিত নয়।

এরপর অধ্যাপক তার বক্তব্য চালিয়ে গিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং বলেন: নিশ্চয়ই সাংবিধানিক আইন সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ অনেক বেশি গুরুত্ব ও ঝুঁকির দাবি রাখে; কারণ এগুলো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ: এতে শাসনের শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রের বিপরীতে ব্যক্তিদের স্বাধীনতা ও তাদের মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুন্নাহ গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না তা সুনিশ্চিত হয়; অর্থাৎ: মুতাওয়াতির অথবা কমপক্ষে মাশহুর।

সুতরাং এই ধরণের জটিল বিষয়গুলোতে, যা এই পরিমাণ গুরুত্ব ও ঝুঁকি বহন করে, সুন্নাহর প্রসিদ্ধি না থাকাটাই তার বিশুদ্ধ না হওয়ার একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ: তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সত্যিকার অর্থে বর্ণিত না হওয়া।

এটি ডক্টর আবদুল হামিদ মুতাওয়াল্লির বক্তব্যের মূল পাঠ্য, যা নিয়ে আমরা মাননীয় অধ্যাপকের সাথে আলোচনা করতে চাই: সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানগুলো কি শরয়ি বিধান হওয়ার দিক থেকে অন্য সব বিধান থেকে ভিন্ন, যেগুলোর মাধ্যমে দলিল পেশ করা হয়? আর সেগুলোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আহাদ সুন্নাহও অন্তর্ভুক্ত—যতক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তার সম্বন্ধ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়; এভাবে যে, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তার মতো অন্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত তা বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটি 'শায' (বিচ্ছিন্ন) বা এমন কোনো 'ইল্লত' (ত্রুটি) যুক্ত নয় যা তার গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করে।

অর্থাৎ: যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে আহাদ সুন্নাহর মাধ্যমে দলিল পেশ করি, ততক্ষণ আমাদের জন্য সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রেও তা দিয়ে দলিল পেশ করা আবশ্যক এবং তা সাংবিধানিক বিধানের জন্যও একটি উৎস হওয়া উচিত; যতক্ষণ পর্যন্ত তা ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভুল মুখস্থশক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা বর্ণিত হয়। মাননীয় অধ্যাপক যে মত পোষণ করেছেন তা ইসলামী শরীয়াহর ক্ষেত্রে সঠিক নয়, যা বিশেষ আইনের বিধানের ওপর সাধারণ আইনের কোনো বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনা করে না। কারণ যে শরয়ি বিধানের সপক্ষে যে কোনোভাবেই শরয়ি দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ওপরই নির্ভর করা ওয়াজিব।

সপ্তম পাঠ

যে সকল ফকীহ আহাদ সুন্নাহর (একক সূত্রে বর্ণিত হাদিস) উপর আমল করার জন্য বিশেষ শর্তারোপ করেছেন—যেমন আমরা মালিকী ও হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি—তাদের দৃষ্টিতে এই শর্তগুলো অনুপস্থিত থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ঢালাওভাবে বা বিস্তারিতভাবে আহাদ সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করেন। বরং তারা অনেক বিধানের ক্ষেত্রে আহাদ সুন্নাহর মাধ্যমেই দলীল পেশ করেন; কেবল সেই অতি নগণ্য ও বিরল কিছু হাদিস ব্যতিরেকে, যা এই সুন্নাহর উপর আমল করার ক্ষেত্রে তাদের আরোপিত শর্তাবলীর পরিপন্থী।

রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আইনের বিধানসমূহ কি তাদের গুরুত্বের দিক থেকে আকীদার (বিশ্বাস) স্তরে পৌঁছে যায়? যে সম্পর্কে উসূলে ফিকহ ও ফিকহশাস্ত্রের আলেমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আহাদ সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত প্রবল ধারণা (যন) সেগুলোকে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আকীদা প্রমাণের দলীল অকাট্য (ইয়াকিনী) হওয়া আবশ্যক; কারণ এই ক্ষেত্রে ধারণা সত্যের

মোকাবিলায় কোনো কাজে আসে না।

আমরা বিশ্বাস করি যে, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আইনের বিধানগুলো আকীদার স্তরে পৌঁছায় না যে, এগুলোর জন্য আমাদের এমন হাদিসের শর্তারোপ করতে হবে যা অকাট্য জ্ঞান দান করে, যেমন: মুতাওয়াতির হাদিসসমূহ।

তদুপরি আমরা লক্ষ্য করি যে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যিনি শরীয়তের প্রবর্তক এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রান্তে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে দূত, বিচারক ও আমীর প্রেরণের বিষয়টি মুতাওয়াতির (সুপ্রসিদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন) সূত্রে প্রমাণিত। অথচ তারা ব্যক্তি হিসেবে একক (আহাদ) ছিলেন। কেউ বলেনি যে, এই প্রেরণ সঠিক ছিল না। বরং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত, আমীর ও বিচারকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানগুলো মেনে চলতে বাধ্য থাকত। যদি 'খবরে ওয়াহেদ' (একক সংবাদ) বাধ্যতামূলক দলীল না হতো, তবে তারা তা মেনে চলত না।

এছাড়াও ইমাম শাফিঈ তাঁর 'আর-্িসালাহ' গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল গ্রহণের উপযোগিতা উল্লেখ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ সেই বান্দাকে উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল রাখুন, যে আমার কথা শুনেছে, অতঃপর তা মুখস্থ রেখেছে, হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছে এবং তা পৌঁছে দিয়েছে। কেননা অনেক ইলম বহনকারী স্বয়ং ফকীহ (প্রজ্ঞাবান) নন, আবার অনেক ইলম বহনকারী এমন ব্যক্তির কাছে ইলম পৌঁছে দেন যিনি তার চেয়েও বড় ফকীহ।" ইমাম শাফিঈ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন একক ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কথা শোনা, মুখস্থ করা এবং তা পৌঁছে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তখন এটি প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেননি যা প্রাপকের কাছে হুজ্জাত (দলীল) হিসেবে গণ্য হবে না।

৩১৭

পৃষ্ঠা 18

সপ্তম পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

সুতরাং, এর অর্থ হলো এই হাদীসসমূহ — অর্থাৎ আহাদ হাদীসসমূহ — সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ আমাদের নিকট স্পষ্ট করেছেন যে, এগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। রাসূল পাঠানো, প্রশাসক ও বিচারক নিয়োগ এবং এই জাতীয় কার্যাবলি কি সেই সমস্ত মৌলিক সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় যা সম্পর্কে ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতাওয়াল্লী দাবি করেন যে, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল? অতঃপর তিনি কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন না যে, এগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসের ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়, কারণ তা নিশ্চিত বা অকাট্য নয়?

আমরা বলি: রাসূল পাঠানো, শাসক ও বিচারক নিয়োগ এমন সব সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে গণ্য যা ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতাওয়াল্লীর মতের বিপরীত। সুতরাং সাংবিধানিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসের ওপর নির্ভর না করার বা তা গ্রহণ না করার যে মত তিনি ব্যক্ত করেছেন, তাতে তিনি সঠিক ছিলেন না।

আমরা এখানে সেই বিষয়টি স্মরণ করছি বা করিয়ে দিচ্ছি যার দিকে আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি যে, আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন শরঈ বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কেবল প্রবল ধারণাই (গলাবায়ে জান্ন) যথেষ্ট। আর সেক্ষেত্রে এই বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যাতে অকাট্য দলীলের বিরলতা এবং নিশ্চিত জ্ঞানের উৎসের স্বল্পতার কারণে বিধানসমূহ অকার্যকর হয়ে না পড়ে। আলেমগণ কেবল আকিদার ক্ষেত্রে সাব্যস্তকারী দলীল নিশ্চিত (ইয়াকিনী) হওয়ার শর্তারোপ করেছেন; কারণ এই ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজে আসে না — যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি।

আর আকিদা সাব্যস্ত হওয়ার দলীল এমন হতে হবে যা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় (মালুমুম মিনাদ দ্বীন বিদ্দারুরাহ) হিসেবে পরিচিত, যাতে তা অস্বীকার করলে বা সে অনুযায়ী আমল না করলে কুফর সাব্যস্ত হয়। এই কারণেই আলেমগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে: যে ব্যক্তি এমন মুতাওয়াতির সুন্নাহকে অস্বীকার করবে যা অর্থের দিক থেকে অকাট্য, সে মূলত দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অস্বীকার করল এবং ফলশ্রুতিতে তাকে কাফের হিসেবে গণ্য করা হবে; কারণ তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। আর যে ব্যক্তি আহাদ সুন্নাহকে অস্বীকার করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে, সে পাপিষ্ঠ হবে কিন্তু কাফের হবে না; কারণ তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল প্রবল ধারণা প্রদান করে। গ্রহণযোগ্য আলেমদের কেউই ঢালাওভাবে একথা বলেননি যে, আকিদা ব্যতীত অন্যান্য কোনো প্রকার শরঈ বিধানের ভিত্তি হিসেবে আহাদ সুন্নাহ উপযোগী নয়, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালি তাঁর 'আল-মুস্তাসফা' গ্রন্থে যা স্থির করেছেন তা হলো, একক বর্ণনা (খবর-ই ওয়াহিদ) দ্বারা মূল বিষয়সমূহ (উসুল) সাব্যস্ত হয় না। অর্থাৎ দ্বীনের মূলনীতি ও আকিদাহসমূহ; এগুলো কেবল কুরআন বা সুন্নাতে মুতাওয়াতিরাহ-এর অকাট্য দলিল দ্বারাই সাব্যস্ত হয়।

আর এ ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সুন্নাতে আহাদ কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে শরয়ি বিধানের উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এর মধ্যে শরয়ি রাজনীতির বিষয়াবলি অথবা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানসমূহও অন্তর্ভুক্ত।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: ডক্টর আব্দুল হামিদ মুতওয়াল্লি গাজালির বক্তব্যের যে ভুল অর্থ বুঝেছেন তা সঠিক নয়। তিনি বুঝেছেন যে, একক বর্ণনা দ্বারা মূলনীতি সাব্যস্ত হয় না—এর অর্থ হলো সাধারণভাবে শরয়ি বিধানের মূলনীতিসমূহ তথা এর উৎসসমূহ সাব্যস্ত না হওয়া। ফলে ডক্টর মুতওয়াল্লির যুক্তিতে সুন্নাতে আহাদ শরয়ি বিধানের উৎসসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। গাজালির যে বক্তব্যটি তিনি ভুলভাবে বুঝে উদ্ধৃত করেছেন, তা তাকে এ ক্ষেত্রে সাহায্য করে না। এর কারণ প্রথমত ও দ্বিতীয়ত হলো: গাজালি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সুন্নাতে আহাদ দ্বারা প্রচুর দলিল পেশ করেছেন, এমনকি কখনো কখনো তিনি এই সুন্নাহর দুর্বল হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন এবং সেগুলোকে রায়ের (ব্যক্তিগত মতামত) ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে ডক্টর মুতওয়াল্লির এই মতটিও সঠিক নয় যে: সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে আহাদ অনুযায়ী আমল করা জায়েজ নয়; কারণ আবু বকর ও ওমর (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে—তা যদি সাধারণ বা অ-সাংবিধানিক আইনও হতো—একক সাহাবি বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করতেন না, বরং তাঁদের প্রত্যেকেই হাদিসের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য রাবির সাথে অন্য কাউকে সাক্ষী হিসেবে দাবি করতেন। তাই সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও নিশ্চিত হওয়ার এমন সব উপায় অবলম্বন করা স্বাভাবিক ও জরুরি যা সাধারণ বিধানের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে যখন রাসূলুল্লাহ-এর যুগের পর অনেক শতাব্দী গত হয়েছে এবং হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা ও বিকৃতির নানা পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

পৃষ্ঠা 20

শরয়ী রাজনীতি
সপ্তম পাঠ

এটি ডক্টর আব্দুল হামিদের তাঁর ‘মাবাদিউ নিজামিল হুকমি ফিল ইসলাম’ (ইসলামে শাসনব্যবস্থার মূলনীতি) গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য। তিনি এর স্বপক্ষে এই যুক্তি পেশ করেন যে, আমাদের নেতা আবু বকর এবং আমাদের নেতা উমর —আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন— তাঁরা কোনো সাহাবী এককভাবে কোনো হাদিস বর্ণনা করলে তা গ্রহণ করতেন না; বরং তাঁরা অন্য ব্যক্তিদের নিকটও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। সম্ভবত তাঁরা যখন এই হাদিসটি শুনতেন, তখন তিনি (ডক্টর আব্দুল হামিদ) বলতেন: আবু বকর ও উমর —আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন— যেহেতু তাঁরা কোনো হাদিস বর্ণনাকারীর কথা ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতা যাচাই না করে তার ওপর নির্ভর করতেন না এবং তা গ্রহণ করতেন না; সেহেতু তিনি বলেন: আবু বকর ও উমর —আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন— যা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের বলা উচিত যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে, যেমন শাসনের সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের ‘সুন্নাহ আল-আহাদ’ (একক বর্ণনা) গ্রহণ করা উচিত নয়।

এর উত্তরে বলা যায় যে, শ্রদ্ধেয় লেখক যে মত পোষণ করেছেন তা সঠিক নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সম্পর্কে এটি সর্বজনবিদিত যে, যখন তাঁদের নিকট কোনো হাদিস প্রমাণিত হতো, তখন তাঁরা সেটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। তাঁরা ‘খবর আল-ওয়াহিদ’ (একক বর্ণনা) অনুযায়ী আমল করতেন এবং তাঁদের মাঝে এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আর তাঁরা যেসব সংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন বা যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিরতি দিয়েছেন, তা কেবল এমন কিছু বিশেষ কারণে ছিল যা সেই পদক্ষেপকে আবশ্যক করেছিল; যেমন কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয়ের উপস্থিতি অথবা কোনো শর্তের অনুপস্থিতি। এটি এজন্য ছিল না যে তাঁরা মূলত ‘সুন্নাহ আল-আহাদ’-এর ওপর আমল করাকে প্রত্যাখ্যান করতেন, যেমনটি এই লেখক ভুল বুঝেছেন। তিনি ধারণা করেছেন যে, ‘সুন্নাহ আল-আহাদ’ কেবল সেটিই যা মাত্র একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। মূলত এটি একটি সুস্পষ্ট অজ্ঞতা যা ‘সুন্নাহ আল-আহাদ’ সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা না থাকাকেই প্রকাশ করে। হানাফী পরিভাষা অনুযায়ী, ‘সুন্নাহ আল-আহাদ’ হলো সেই সুন্নাহ যাতে ‘তাওয়াতুর’ বা ‘শুহরাত’ (প্রসিদ্ধি)-এর শর্তাবলি পাওয়া যায় না।

পরিশেষে, এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ডক্টর সাহেব ‘সুন্নাহ আল-আহাদ’-এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। এই কারণেই তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মাঝে মাঝে আমাদের নেতা আবু বকর এবং উমর —আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন— যখন কোনো সাহাবী তাঁদের নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন তাঁরা কেবল তাতেই আশ্বস্ত হতেন না; বরং অন্য সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন: “তোমরা কি এই হাদিসটি শুনেছ নাকি শোনোনি?” এই দুই মহান ইমাম কেবল এজন্যই এটি করেছিলেন যাতে এই হাদিসের বিপরীতে কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়। সুতরাং তাঁরা কেবল সেই হাদিসটি যা নির্দেশ করে...

পৃষ্ঠা 21

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
সপ্তম পাঠ

তারা এটি নিশ্চিত করতে চান এবং তারা এই বৈপরীত্য দূর করতে চান। কিন্তু যখন তারা এই হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন, তখন তার অর্থ এই নয় যে, তারা সুন্নাহ আল-আহাদ (একক সূত্রে বর্ণিত সুন্নাহ) গ্রহণ করেন না। কারণ তারা সুন্নাহ আল-আহাদ গ্রহণ করতেন। আর সুন্নাহ আল-আহাদ-এর ক্ষেত্রে এটি আবশ্যক নয় যে তা কেবল একজনই বর্ণনা করবেন, যেমনটি ড. আবদুল হামিদ মুতওয়াল্লী বুঝেছেন। বরং বর্ণনাকারী একজন, দুইজন বা তিনজনও হতে পারে। মূল বিষয় হলো: বর্ণনার সংখ্যাটি মুতাওয়াতির (এমন নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা যা অকাট্য জ্ঞান দান করে) স্তরে পৌঁছায়নি, যে স্তরে সাধারণত মিথ্যার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে বা বাস্তবতা যাকে অসম্ভব বলে গণ্য করে।

তেমনিভাবে সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে সুন্নাহ আল-আহাদ দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ড. মুতওয়াল্লী যে মত পোষণ

করেছেন তা-ও সঠিক নয়। কারণ ইমাম আবু হানিফা একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ গ্রহণ করতেন না—এ কথাটি মূলত প্রসিদ্ধ (মাশহুর) হাদিস ব্যতীত অন্য হাদিস গ্রহণ না করার প্রেক্ষাপটে ছিল, যার কারণ ছিল হাদিস জালিয়াতির ব্যাপক প্রসার। অর্থাৎ, ইমাম বা ড. মুতওয়াল্লী বলছেন: আমরা সুন্নাহ আল-আহাদ গ্রহণ করি না; আর তিনি এর সপক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন যে, ইমাম আবু হানিফা একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ গ্রহণ করতেন না। ড. মুতওয়াল্লী বলছেন যে, যেহেতু ইমাম আবু হানিফা একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ গ্রহণ করতেন না, তাই আমরাও এ ধরনের হাদিস গ্রহণ করি না।

এর প্রত্যুত্তরে আমরাও তাঁর মতের ওপর কিয়াস (তুলনা) করে বলব: প্রথমত, ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে এই বর্ণনাটি—অর্থাৎ তিনি একক সূত্রে বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করতেন না—তা প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে একটি অদ্ভুত বা বিরল বর্ণনা। আলেমদের মধ্যে অন্য কেউ এ কথা বলেননি। কেননা একক সংবাদ (খবরুল ওয়াহিদ) দ্বারা দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে আলেমদের নিকট যা স্বীকৃত তা হলো নিম্নরূপ:

খারেজি এবং মুতাজিলাগণ একক সংবাদের মাধ্যমে দলিল পেশ না করার পক্ষে মত দিয়েছেন; কারণ এটি অকাট্য নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। অন্যদিকে দাউদ আজ-জাহেরি একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ গ্রহণ করার এবং তা একইসাথে জ্ঞান ও আমল উভয়ই প্রদান করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইবনে হাজম এই মতটি বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর ‘আল-আহকাম’ গ্রন্থে এর পক্ষে প্রভূত সমর্থন দিয়েছেন। এই মতটি ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটি অনেক হাদিস বিশারদেরও অভিমত; কারণ যে বিধান আমল করা আবশ্যক করে দেয়, তা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করাকেও আবশ্যক করে।

৩২১

পৃষ্ঠা 22

সপ্তম পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী এবং হাম্বলী আলেমদের মধ্য থেকে জমহুর ফকিহগণ এই মত পোষণ করেছেন যে: খবরে ওয়াহেদ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যদিও এটি কেবল প্রবল ধারণার (যন রাজেহ) ফায়দা দেয়। কারণ, আমল ওয়াজিব হওয়া এবং নিশ্চিত জ্ঞান (ইলম) অর্জিত হওয়ার মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই, এবং ব্যবহারিক (আমলী) বিষয়ে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট।

সুতরাং, আমরা দেখছি যে হানাফী জামাতও সেই জমহুর ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত যারা খবরে ওয়াহেদ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব বলে মনে করেন। এর অর্থ হলো: ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে ড. আব্দুল হামিদ মুতওয়াল্লীর এই উদ্ধৃতি—যে তিনি সুন্নাহে আহাদ গ্রহণ করতেন না—একটি সন্দেহজনক এবং ত্রুটিপূর্ণ উদ্ধৃতি।

অনুরূপভাবে, হানাফী কিতাবসমূহে তাদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো: তারা সুন্নাহকে কুরআনের পর দ্বিতীয় স্তরে স্থান দেন, যা শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস; চাই তা মুতাওয়াতির, মাশহুর কিংবা আহাদ যাই হোক না কেন, যদি তা তাদের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়। কোনো বিষয়ে হাদিস না পাওয়া পর্যন্ত তারা রায় (মতামত) এবং কিয়াসের আশ্রয় নেন না। বরং হানাফীদের সম্পর্কে এটি প্রসিদ্ধ যে, তারা দুর্বল হাদিসকেও রায় এবং কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন। এমনকি তারা সাহাবীর বক্তব্যকেও রায় এবং কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় যার বিধান আহরণের (ইস্তিনবাত) মূলনীতি এমন, তার সম্পর্কে কি এ ধারণা করা যায় যে তিনি সুন্নাহে আহাদকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন, যা ড. মুতওয়াল্লী ভুলভাবে বুঝেছেন? এটি একটি সঠিক বিষয় নয়।

ড. আব্দুল হামিদ মুতওয়াল্লী কর্তৃক উল্লিখিত একটি শেষ সংশয় হলো: 'সহীহ বুখারী' হাদিসের কতিপয় আলেমদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদ, তিনি বুখারীর সংকলিত হাদিসগুলোর মধ্য থেকে চারটি হাদিসের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেননি। একইভাবে অন্যান্য আলেমগণ বুখারীর একশ দশটি হাদিসের সমালোচনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম বুখারীর সংকলিত সকল হাদিসের সাথে একমত হননি, বরং কিছু ক্ষেত্রে তার সাথে মতভেদ করেছেন। আর আলেমগণ মনে করেন: 'সহীহ বুখারী' কেবল প্রবল ধারণারই ফায়দা দেয়।

এই বক্তব্যটিতে এমন সাধারণীকরণ করা হয়েছে যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অধিকন্তু এর কিছু অংশ একেবারেই সঠিক নয়। এর ব্যাখ্যা দুটি দিক থেকে নিম্নরূপ:

সপ্তম পাঠ

প্রথমত: এটি স্বীকৃত যে বুখারি শরীফের হাদিসসমূহ সহিহ; যার মধ্যে কিছু মুতাওয়াতির, কিছু মশহুর এবং কিছু সুন্নতে আহাদ। যদি কোনো কোনো আলেম ইমাম বুখারি কর্তৃক সংকলিত কিছু হাদিসের সমালোচনা করে থাকেন, তবে তার অর্থ এই হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা নয়। বরং এর অর্থ হলো: তারা সুন্নাহর ওপর হুকুম প্রদানের মানদণ্ড এবং এই সনদের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) ব্যাপারে তাদের মতামতের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এটি মূলত 'দাবত' (সংরক্ষণ ও নির্ভুলতা) এবং 'সেহহাত' (বিশুদ্ধতা)-এর মানদণ্ডের ভিন্নতার কারণে ঘটে থাকে, যা হাদিস বিশারদদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারি যেসব শর্তারোপ করেছেন তা ইমাম মুসলিমের শর্তসমূহ থেকে ভিন্ন। আর এই বিষয়গুলো সহিহ বুখারি বা সহিহ মুসলিমের মর্যাদা বিন্দুমাত্র হ্রাস করে না। বরং আলেমগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, হাদিসের বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর হলো ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যে হাদিসের ব্যাপারে একমত হয়েছেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

উস্তাদ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি এই হাদিসসমূহকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন ‘আল-লু’লু ওয়াল মারজান ফীমা ইত্তাফাকা আলাইহিশ শাইখান’। এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসসমূহ মূলত ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যেগুলোর ওপর একমত হয়েছেন সেগুলোর সমষ্টি। আর এই কারণেই এটি বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করছে। এর পরবর্তী স্তরে রয়েছে সেই হাদিস যা ইমাম বুখারি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারপর যা ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এরপর সেই হাদিসসমূহ যা তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ী সঠিক কিন্তু তারা তা কিতাবভুক্ত করেননি।

দ্বিতীয়ত: সহিহ বুখারির ক্ষেত্রে 'জন্ন' (ধারণাপ্রসূত) ও 'কাত' (অকাট্য)-এর মাসআলার বিষয়টি এমন কোনো হুকুম নয় যা খামখেয়ালিভাবে প্রদান করা যায়। কারণ আলেমদের নিকট এটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, সুন্নাহর মধ্য থেকে যা অকাট্য জ্ঞান (ইলমে কাতয়ি) প্রদান করে তা হলো মুতাওয়াতির হাদিস, চাই তা সহিহ বুখারিতে থাকুক বা অন্য কোথাও। আর মশহুর হাদিসের ক্ষেত্রে তা এমন প্রবল ধারণা (জন্ন) প্রদান করে যা চিত্তের প্রশান্তির কাছাকাছি পৌঁছালেও মুতাওয়াতির হাদিসের ন্যায় চূড়ান্ত ইয়াকিনের (নিশ্চয়তার) স্তরে পৌঁছায় না। অন্যদিকে যা কেবল ধারণা (জন্ন) প্রদান করে তা হলো সুন্নতে আহাদ, চাই তা সহিহ বুখারিতে থাকুক বা অন্য কোথাও। যাই হোক, আকিদার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আমলের ক্ষেত্রে তা পালনীয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা আমরা ইতিপূর্বে যেমনটি উল্লেখ করেছি যে, আমল ওয়াজিব হওয়া এবং বিশ্বাসের অকাট্যতার মাঝে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই; বরং এটি যথেষ্ট—

...বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার ধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবল থাকে যতক্ষণ না মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশের বিষয়টি অগ্রগণ্য হয়। সুতরাং অগ্রগণ্য মতের ওপর আমল করা সতর্কতামূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়: ইজমা (ঐক্যমত):

আভিধানিক অর্থে ইজমা হলো: একমত হওয়া। বলা হয়: দলটি অমুক বিষয়ে 'ইজমা' করেছে অর্থাৎ তারা তাতে একমত হয়েছে। এছাড়া এটি দৃঢ় সংকল্প করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়; বলা হয়: অমুক ব্যক্তি অমুক বিষয়ে স্বীয় মতের ওপর 'ইজমা' করেছে, অর্থাৎ সে তার সংকল্প সুদৃঢ় করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমরা তোমাদের কর্মপন্থা ও তোমাদের অংশীদারদের সম্মিলিত করো।" [সূরা ইউনুস: ৭১]

শরঈ পরিভাষায় ইজমার অর্থ হলো: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর কোনো এক যুগে মুসলিম মুজতাহিদগণের কোনো শরঈ বিধানের ওপর একমত হওয়া। আর যে সকল আলিমের ঐক্যমত ইজমার ক্ষেত্রে ধর্তব্য, তাঁরা হলেন সেই সকল মুজতাহিদ যাঁরা মূল উৎসসমূহ হতে বিধান আহরণ করার সক্ষমতা রাখেন।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: সাধারণ জনগণের ঐক্যমত এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ তাঁরা ইজতিহাদ করার যোগ্য নন। আর মুজতাহিদগণ প্রতি যুগে সুপরিচিত ও প্রখ্যাত থাকেন, ফলে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁদের মতামত সম্পর্কে জানা সম্ভব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ইজমা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়; কারণ তাঁরা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একমত হন—

তবে দলীল বা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে তাঁর কথা ও কাজ—তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক—এবং তা সুন্নাহর পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি তাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেন, তবে তাঁদের এই বিরোধিতার কোনো গুরুত্ব নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের মাঝে বিদ্যমান থেকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী বর্ণনা করছেন। আর মুজতাহিদগণের ঐক্যমত অবশ্যই কোনো শরঈ বিধানের ওপর হতে হবে, যাতে যৌক্তিক, ভাষাগত বা অভ্যাসগত বিষয়গুলো এর গণ্ডি থেকে বাদ পড়ে যায়। কারণ এই সংক্রান্ত ঐক্যমতকে ইজমা বলা হয় না।

বর্তমান যুগে কি ইজমা হওয়া সম্ভব?

কিছু আলিম ইজমা হওয়া অসম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যার অর্থ হলো: কোনো এক যুগে কোনো একটি বিধানের ওপর সকল মুজতাহিদের একমত হওয়া; এর কারণ হলো বিভিন্ন জনপদে মুজতাহিদদের বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা...

বিভিন্ন শহর এবং ফকিহদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া তাদের মতামতের ব্যাপারে অবগত হওয়া এবং কে মুজতাহিদ আর কে মুজতাহিদ নন তা জানাকে কঠিন করে তোলে; কারণ ইসলামি প্রধান শহরগুলোর প্রত্যেক অঞ্চলের ফকিহদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। এর ওপর ভিত্তি করে, কোনো মতভেদ্য শারয়ী হুকুমের ব্যাপারে সকল মুজতাহিদদের একমত হওয়া অসম্ভব। তবে জমহুর উলামায়ে কেরাম মনে করেন যে: ইজমা বুদ্ধিগতভাবে সম্ভব এবং এর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়; কারণ উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং ইসলামের অন্যান্য রুকন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। আর ইজমার বিষয়টি কল্পনা করাকে আমরা কীভাবে নাকচ করতে পারি, যেখানে পুরো উম্মত নস (কুরআন-সুন্নাহর পাঠ) দ্বারা ইবাদত করতে আদিষ্ট এবং অকাট্য দলিলের বিরোধিতা করলে শাস্তির সম্মুখীন হবে? ঠিক যেভাবে পানাহারের ব্যাপারে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়, তেমনি দ্বীনের কোনো বিষয়ের ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নয়।

যদি সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহুদিদের বাতিলের ওপর একমত হওয়া সম্ভব হয়, তবে সত্যপন্থীদের হকের ওপর একমত হওয়া কেন সম্ভব হবে না? অর্থাৎ: হকের ওপর। প্রকৃতপক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন তাদের ইজমা: দাদি বা নানি ষষ্ঠাংশ পাবে, যদি সে একা হয় তবে একাই তা পাবে এবং একাধিক হলে তারা তাতে অংশীদার হবে। তাদের আরও ইজমা রয়েছে যেমন: কোনো নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা জায়েজ নেই। আরও ইজমা রয়েছে যে, আপন ভাই-বোন না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। এছাড়া কোনো মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিমকে বিবাহ করা বাতিল হওয়ার ওপর তাদের ইজমা এবং আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা গণনা ও অনুসন্ধান করে শেষ করা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

এই ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি তা হলো: উসূলি দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা সংঘটিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। যদি সাহাবায়ে কেরামের যুগে এই ইজমা হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, তবে তা ছিল তাদের সংখ্যা কম হওয়া, মদিনায় তাদের একত্রিত থাকা এবং তাদের পরিচিতি ও প্রসিদ্ধির কারণে, যা তাদের মতামতের ওপর অবগত হওয়া সহজ করে তুলেছিল। আর উমর (রা.) অতি প্রয়োজন ছাড়া বড় বড় সাহাবী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মদিনা ছেড়ে বিজিত দেশগুলোতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন।

আমরা বলি: যদি এটি সাহাবায়ে কেরামের যুগে সম্ভব হয়েও থাকে, তবে তা তাবেঈদের যুগে এবং তাদের পরবর্তী সময়ে সম্ভব নয়। কারণ উলামা এবং মুজতাহিদগণ বিভিন্ন শহরে এবং বিজিত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেছিলেন।

সপ্তম পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

তাদের অধিক সংখ্যা এবং নিজ নিজ ভূখণ্ডে প্রত্যেকের স্বাধীন ইজতিহাদ করার বিষয়টি ইজতিহাদকে ব্যক্তিগত রূপ দান করেছে।

এখান থেকেই ইজমা বা সর্বসম্মত ঐকমত্য সংঘটিত হওয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর বাস্তবায়ন সহজসাধ্য ছিল না। এ কারণেই ইমাম ইবনে হাম্বল এবং ইমাম শাফিঈও ইজমা পরিভাষার পরিবর্তে "এই বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই" বলাকে প্রাধান্য দিতেন। অর্থাৎ ইমাম শাফিঈ ও ইবনে হাম্বল ইজমাকে "এই বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই" বলে ব্যক্ত করতে পছন্দ করতেন, কিন্তু সরাসরি 'ইজমা' শব্দটি ব্যবহার করতেন না। কেন? সম্ভবত তারা মনে করতেন যে, ইজমা (পূর্ণরূপে) অর্জিত হয়নি।

যারা ইজমার দাবি করে, তাদের তারা মিথ্যাবাদী মনে করেন; কেননা হতে পারে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে এমন 'ফিকহ একাডেমি'র (আল-মাজামিউল ফিকহিয়্যাহ) প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো ফলপ্রসূ হতে পারে, যা

সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত করবে। এই একাডেমিগুলোর নির্দিষ্ট স্থান থাকবে, উপযুক্ত সুযোগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা থাকবে এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর হবে। তারা নির্দিষ্ট সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হবেন এবং তাদের সামনে নতুন নতুন বিষয় ও ঘটনাবলি গবেষণার জন্য এবং সেগুলোর শরয়ি বিধান প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হবে। অতঃপর এই বিধানগুলো রেডিও, ম্যাগাজিন বা সাময়িকীর মাধ্যমে প্রচার করা হবে; যাতে সাধারণ মানুষ সেগুলো জানতে পারে এবং আলেম সমাজ সেগুলোর ওপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। কারণ সমস্ত ফকীহদের পক্ষে এই একাডেমিগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এরপর ফিকহ একাডেমিগুলো তাদের নিয়মিত সদস্য এবং বহিরাগতদের বিভিন্ন মতামতের দিকে লক্ষ্য রাখবে। পরবর্তীতে যদি এই একাডেমিগুলোর মতামত কোনো একটি বিধানের ওপর একমত হয়, তবে সেটাকে 'সম্মিলিত ইজতিহাদ' (আল-ইজতিহাদুল জামায়ি)-এর উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হতে পারে, যা উসুলিগণের বর্ণিত ইজমার কাছাকাছি। আমরা মিসরের 'হায়আতু কিবারিল উলামা' বিলুপ্ত হওয়ার আগে এবং বর্তমানে 'মাজমাউল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ'-এর মধ্যে সেই ধারণার বীজ খুঁজে পাই যা বাস্তবায়নের জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

সপ্তম পাঠ

ইজমার প্রামাণিকতা:

ইজমার প্রামাণিকতার সপক্ষে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ন্যায় দলীল পেশ করা হয়: “আর যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরেছে এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব; আর তা কতই না মন্দ আবাস।” [আন-নিসা: ১১৫]। এটি মুমিনদের পথ অনুসরণ করাকে ওয়াজিব করে এবং তাদের বিরোধিতা করাকে হারাম করে। এক্ষেত্রে এমনটি বলা যাবে না যে: এখানে কেবল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধাচরণ এবং সেই সাথে মুমিনদের পথ ত্যাগ করার কারণেই শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, সুতরাং কেবল একটি ত্যাগ করলে এই হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে না—এমনটি বলা ঠিক হবে না। কারণ দুটি বিষয়ের ওপর শাস্তির হুমকি দেওয়ার অর্থ হলো এই হুমকি প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে অথবা একত্রে প্রযোজ্য হওয়া। শাস্তির এই হুমকি কেবল একটির সাথে নির্দিষ্ট করে অন্যটিকে বাদ দেওয়া জায়েয নয়।

সুন্নাহর মধ্যেও ইজমার প্রামাণিকতার সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: “আমার উম্মত কখনও ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “আল্লাহ এই উম্মতকে ভুলের ওপর একত্রিত করবেন না।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন: “মুসলিমরা যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভালো, আর তারা যা মন্দ মনে করে তা আল্লাহর নিকটও মন্দ।” তিনি আরও বলেছেন: “যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।” তিনি আরও বলেছেন: “যে ব্যক্তি জামাত বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।”

এই বর্ণনাগুলো সাহাবী এবং তাবেয়ীদের যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত ছিল, সালাফ ও খালাফদের (পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী) কেউ এগুলো প্রত্যাখ্যান করেননি। যদিও এগুলোর একক বর্ণনাগুলো মুতাওয়াতির নয়, তবুও সমষ্টিগতভাবে এ থেকে আমাদের নিকট অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় যে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই উম্মতের মর্যাদাকে সুমহান করেছেন এবং ভুল থেকে তাদের সুরক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। অন্য দিক থেকে, এই হাদীসগুলো সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বদা প্রসিদ্ধ ছিল এবং তারা ইজমা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন, আর এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়নি।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, আর তা হলো: ইজমা কি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানাবলির উৎস হতে পারে?

সপ্তম পাঠ
সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (ইসলামি রাজনীতি)

এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে হয় এবং এতে কোনো জটিলতা নেই, যদি আমরা জানি—যেমনটি আমরা একাধিকবার বলেছি—যে, এই বিধানগুলো সাধারণভাবে শরয়ি বিধানেরই অংশ। শরীয়তের উৎসসমূহ, যার মধ্যে ইজমাও অন্তর্ভুক্ত, সেখান থেকে সাধারণভাবে সকল শরয়ি বিধান আহরণ করা হয়; চাই এই বিধানগুলো আইনবিদদের পরিভাষায় সাধারণ আইন হোক কিংবা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আইন হোক। সুতরাং শরীয়তে বিধানসমূহকে আইনের প্রচলিত ধারায় এভাবে শ্রেণিবিভাগ করার কোনো সুযোগ নেই যে: ব্যক্তিগত আইনের বিধান—যা ব্যক্তিদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সরকারি আইনের বিধান—যা ব্যক্তিদের সাথে তাদের শাসনকারী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। স্বভাবতই, শেষোক্ত প্রকারের আইনসমূহ যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সেগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। আর এটিই কাউকে কাউকে এই মত ব্যক্ত করতে প্ররোচিত করেছে যে, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধানসমূহ আহরণের ক্ষেত্রে ইজমা কোনো উৎস হতে পারে না।

কিন্তু ইজমা একটি শরয়ি উৎস হিসেবে সকল প্রকার শরয়ি বিধান প্রমাণের জন্য উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ইমামত (নেতৃত্ব) ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছিলেন, আর এটি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইবনে খালদুন তাঁর 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম নিয়োগ করা একটি ওয়াজিব বা আবশ্যক কাজ, যা শরীয়তে সাহাবা ও তাবেয়ীদের ইজমার মাধ্যমে জানা গেছে। কারণ রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ আবু বকরের বায়আত গ্রহণ করতে এবং তাদের বিষয়াবলির তত্ত্বাবধান তাঁর হাতে সঁপে দিতে ত্বরান্বিত হয়েছিলেন। একইভাবে পরবর্তী প্রতিটি যুগেও তা-ই ঘটেছে এবং কোনো যুগেই মানুষকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়নি। ফলে ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি ইজমা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনকি যদি আমরা সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর ইজমা সংঘটিত হওয়া কঠিন—যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি—তা মেনেও নেই, তবুও উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামত নির্বাচন ও বায়আতের মাধ্যমে অর্জিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য সকল ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (নীতিনির্ধারক)-এর ইজমার প্রয়োজন পড়ে না; বরং এক্ষেত্রে একজনের মতামতই যথেষ্ট হতে পারে অথবা...

তাদের মধ্যে থেকে দুইজনের মাধ্যমে, যেমন আবু বকরের জন্য উমরের অঙ্গীকার এবং উসমানের জন্য আব্দুর রহমান বিন

আউফের চুক্তি। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যম হিসেবে বায়আতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যেমনটি আবু বকরের বায়আতের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তদ্রূপ তারা আবু বকরের যুগে মুরতাদদের (স্বধর্মত্যাগীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। এগুলোর প্রতিটিই ফকীহগণের পরিভাষায় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয় অথবা শরয়ি রাজনীতির মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ সবকিছুই এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, ইজমা (ঐকমত্য) ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিধিবিধানের অন্যতম একটি উৎস।

চতুর্থত: রায়ের (মতামতের) ভিত্তিতে ইজতিহাদ:

এই প্রেক্ষাপটে 'রায়ের ভিত্তিতে ইজতিহাদ' পরিভাষা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন কিছু যা কিয়াসের চেয়েও ব্যাপক; যাতে কিয়াস ছাড়াও ইসতিহসান, মাসালিহে মুরসালাহ এবং উরফ (প্রথা) অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং আমরা এই উৎসগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জানব এবং এরপর স্পষ্ট করব যে, এগুলো কি রাজনৈতিক বিধিবিধানের উৎস হওয়ার যোগ্য কি না?

১. কিয়াস:

অভিধানে কিয়াসের অর্থ হলো পরিমাপ করা। আর শরয়ি পরিভাষায় কিয়াস হলো: কোনো মূল বিষয়ের বিধানকে কোনো শাখা বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা, তাদের উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান কোনো সাধারণ যোগসূত্রের কারণে। বলা হয়েছে: মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে যে বিধান দেওয়া হয়েছে, সেই একই বিধান শাখা বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রদান করা; কারণ উভয়ের মধ্যে এমন একটি 'ইল্লত' বা কারণ বিদ্যমান রয়েছে যা মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে সেই বিধানকে অবধারিত করেছিল। আবার বলা হয়েছে: কোনো একটি জানা বিষয়কে অন্য একটি জানা বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা, তাদের উভয়ের মধ্যকার একটি সাধারণ যোগসূত্রের মাধ্যমে তাদের উভয়ের জন্য কোনো বিধান বা বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা অথবা নাকচ করার ক্ষেত্রে।

এই সকল সংজ্ঞা ও সংজ্ঞায়নগুলোর অর্থ কাছাকাছি। এই সবগুলোর সারকথা হলো এমন কোনো বিষয়ের বিধান বর্ণনা করা যার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, তাকে এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে যার বিধান কিতাব (কুরআন) বা সুন্নাহর স্পষ্ট নস (পাঠ) দ্বারা প্রমাণিত।

সপ্তম পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

অথবা সুন্নাহ; এটি মূলত এমন কোনো বিষয়কে—যার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি—অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করার নাম, যার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে উভয়ের মাঝে বিধানের কারণ বা 'ইল্লত'-এর ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বিদ্যমান থাকে।

কিয়াসের রুকন বা স্তম্ভ চারটি। সেগুলো হলো: ১. মাক্বিস (অনুমেয়): এটি এমন একটি শাখা বিষয় যার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। ২. মাক্বিস আলাইহি (যার ওপর অনুমান করা হয়): এটি এমন একটি মূল বিষয় যার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৩. মূল বিষয়ের বিধান যা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি: যেমন আমাদের কাছে মদ রয়েছে—উদাহরণস্বরূপ—পবিত্র কুরআনে এর হারামের ব্যাপারে দলিল বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ; এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে

পারো।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০]

এই আয়াতটি মদের হারামের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে দলিল প্রদান করেছে। এখন যদি আমাদের কাছে খেজুর থেকে তৈরি এমন কোনো পানীয় (নাবিয) থাকে—উদাহরণস্বরূপ—যা নেশাজাতীয় হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ যা পান করলে মানুষ মাতাল হয়ে পড়ে, তবে এই পানীয়ের বিধান কী হবে? এই নাবিযের বিধান কুরআন বা সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই; বরং মদের বিধানই কেবল স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে কিয়াসের মাধ্যমে আমরা নাবিযকে মদের ওপর তুলনা করব। আর মদের বিধান হলো হারাম। তাই নাবিয যখন নেশাজাতীয় হবে, তখন আমরা একেও হারামের বিধান দেব। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী 'ইল্লত' বা কারণ হলো 'নেশাগ্রস্ত করা'। সুতরাং এখানে আমাদের মূল (আসল) হলো মদ, এবং শাখা (ফারউ) হলো নাবিয। মূলের বিধান হলো হারাম, এবং কারণ (ইল্লত) হলো নেশাগ্রস্ত করা, যা মাক্বিস (শাখা) এবং মাক্বিস আলাইহি (মূল) তথা আসল ও ফারউ—উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

এটিই হলো কিয়াসের মর্মার্থ। তাই—আমরা পূর্বেই যেমন বলেছি—এর রুকন বা স্তম্ভ চারটি: মাক্বিস, মাক্বিস আলাইহি—যা হলো সেই মূল বিষয় যার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, মূল বিষয়ের বিধান যা দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং ইল্লত (কারণ)।

আর 'ইল্লত' বা কারণ হলো তা-ই, যার ওপর ভিত্তি করে মূলে বিধান প্রদান করা হয়েছিল এবং যা শাখাতেও বাস্তবায়িত হয়েছে।

এটি একটি শরয়ী দলীল; অর্থাৎ, কিয়াস হলো ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য শরয়ী দলীল। কারণ (কুরআন ও সুন্নাহর) নসসমূহ সীমাবদ্ধ, কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলি অসীম এবং মানুষের ঘটনাবলি নিত্যনতুন। এ কারণেই শরয়ী উৎস হিসেবে কিয়াসকে বর্জন করা সম্ভব নয়, যা নতুন মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান প্রদান করে এবং ইজতিহাদ বির রা'য়-এর মাধ্যমে সেগুলোকে যথাযথ স্তরে আসীন করে, যা শাখা-প্রশাখাগুলোকে তাদের সামষ্টিক মূলনীতির সাথে সংযুক্ত করে।

এ কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব আবু মুসা আল-আশআরী (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "যে সকল বিষয় কিতাব ও সুন্নাহতে নেই এবং তোমার হৃদয়ে সংশয় সৃষ্টি করে, সেগুলোকে বারবার চিন্তা করো ও বোঝার চেষ্টা করো। অতঃপর সাদৃশ্য ও উদাহরণগুলো চিনে নাও। এরপর উদ্ভূত বিষয়গুলোকে সেগুলোর সমজাতীয় বিষয়গুলোর সাথে তুলনা করো এবং আল্লাহর নিকট যা অধিক প্রিয় ও সত্যের অধিক নিকটবর্তী, সেদিকে ধাবিত হও।"

কিয়াস হলো দীপ্তিময় শরীয়তের উৎসসমূহের মধ্যে চতুর্থ উৎস। প্রথম উৎসসমূহ হলো কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা; এরপর আসে কিয়াসের অবস্থান।

কিয়াস একটি ইজতিহাদী উৎস হওয়ার কারণে—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—তা অন্যান্য মুজতাহিদদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ 'ইল্লত' (কার্যকারণ), যা কিয়াসের ভিত্তি এবং যার ওপর এটি আবর্তিত হয়, তা সকল মুজতাহিদের দৃষ্টিতে অভিন্ন নয়। এ কারণেই ইল্লতের ভিন্নতা মুজতাহিদদের থেকে প্রকাশিত ফিকহি মতপার্থক্যগুলোর ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং সেই হিসেবে কিয়াস একটি ব্যাখ্যামূলক উৎস, যা মুজতাহিদদের বিবেচনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তবে ইসলামি শরীয়তে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানের ক্ষেত্রে কি কিয়াসকে একটি উৎস হিসেবে গণ্য করা হবে?

আমরা বলব: কিয়াস একটি শরয়ী উৎস হিসেবে মুজতাহিদ তখন এর শরণাপন্ন হন, যখন তিনি এমন কোনো শাখাকে (নতুন বিষয়) যার বিধান সম্পর্কে কোনো নস বিদ্যমান নেই, তাকে এমন কোনো মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত করতে চান যার বিধান নস দ্বারা প্রমাণিত; যেন তাদের উভয়ের মাঝে একই 'ইল্লত' বা কারণ বিদ্যমান থাকার দরুন হুকুম প্রয়োগ করা যায়।

সপ্তম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

মুজতাহিদের নিকট হুকুম; ফলে তা সকল প্রকার শরঈ বিধানের উৎস হওয়ার যোগ্যতা রাখে, চাই তা সাংবিধানিক হোক বা অ-সাংবিধানিক।

২. আল-ইস্তিহসান:

ইসলামী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধানের উৎস হিসেবে ইস্তিহসান হলো ইসলামী আইন প্রণয়নের অন্যতম অনুগামী উৎস। এটি কিয়াসেরই একটি প্রকার, আর কখনও কখনও একে প্রচ্ছন্ন কিয়াস বলা হয়।

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: তা হলো কোনো বিষয়ে মুজতাহিদের তার অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রদত্ত হুকুমের ন্যায় ফয়সালা করা থেকে বিরত থাকা এমন কোনো শক্তিশালী কারণের ভিত্তিতে, যা প্রথমটি থেকে সরে আসাকে অপরিহার্য করে।

সুতরাং ইস্তিহসানের ক্ষেত্রে হুকুমটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিপরীতে আসে এমন কোনো বিষয়ের কারণে, যা সেই নিয়মের ওপর অটল থাকার চেয়ে নিয়ম থেকে বের হওয়াকে শরীয়তের অধিক নিকটবর্তী করে দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিয়াসের তুলনায় এর ওপর নির্ভর করা অধিক শক্তিশালী দলিল হিসেবে গণ্য হয়।

ইস্তিহসানকে কোনো কোনো আলিম অস্বীকার করেছেন, যেমন ইমাম শাফিঈ। তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইস্তিহসান করল, সে যেন নতুন আইন রচনা করল"; অর্থাৎ সে আল্লাহ ব্যতিরেকে নিজেকে আইনপ্রণেতা হিসেবে সাব্যস্ত করল। সুতরাং ইমাম শাফিঈ একে দলিলবিহীন প্রবৃত্তি ও মতামতের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের একটি রূপ হিসেবে গণ্য করেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিষয়টি যদি তেমনই হয় তবে তা সকলের নিকট নিন্দনীয়। কিন্তু যা তেমন নয়—বরং যেখানে সাধারণ নিয়ম আঁকড়ে ধরার চেয়ে তা থেকে সরে আসার প্রেক্ষিতটিই অধিক শক্তিশালী—তা একটি প্রশংসনীয় ইজতিহাদ, যাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

ইস্তিহসান দুই ভাগে বিভক্ত:

- **ইস্তিহসানে কিয়াসী:** এর অর্থ হলো—মুজতাহিদ সুস্পষ্ট কিয়াসের দাবি পরিহার করে জনকল্যাণের প্রয়োজনে প্রচ্ছন্ন কিয়াসের দিকে ধাবিত হওয়া।

সিয়াসা শারইয়্যাহ
সপ্তম পাঠ

- **প্রয়োজনীয়তাভিত্তিক ইসতিহসান:** এর অর্থ হলো— সংকীর্ণতা দূর করতে এবং প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে কোনো বিশেষ প্রয়োজন বা জনকল্যাণের স্বার্থে কিয়াসের (সাধারণ যৌক্তিক নিয়ম) পরিপন্থী বিধান গ্রহণ করা। এটি তখন করা হয় যখন সাধারণ কিয়াসী নিয়মাবলির প্রয়োগ মানুষকে সংকীর্ণতা ও কষ্টের সম্মুখীন করে।

এর উদাহরণ হলো: আমানতদার বা গচ্ছিত রাখা মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তির হাতে যদি কোনো পণ্য অবহেলা ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। ধার গ্রহণকারী, ভাড়াটিয়া এবং শ্রমিকের বিধানও অনুরূপ। তবে হানাফি ফকীহগণ 'আজিরে খাস' (একান্ত শ্রমিক) এবং 'আজিরে মুশতাক' (সাধারণ শ্রমিক)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একান্ত শ্রমিক হলো সেই ব্যক্তি, যে কেবল একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাজ করে। আর সাধারণ শ্রমিক হলো সে, যে বহু সংখ্যক মানুষের কাজ করে থাকে।

আমরা বলি: হানাফিগণ একান্ত শ্রমিক এবং সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং সাধারণ শ্রমিক যেমন— রংমিস্ত্রি, রুটি বিক্রেতা, দর্জি এবং তাদের ন্যায় অন্যদের ক্ষেত্রে তাদের হাতে থাকা মালের জন্য তাদেরকে জামিনদার (ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য) সাব্যস্ত করেছেন। কেন?

যদিও এটি এই মূলনীতির পরিপন্থী যে, ভাড়াটিয়া এবং শ্রমিক কেবল আমানতদার মাত্র, তবুও তারা ইসতিহসানের ভিত্তিতে এই মূলনীতির বিরোধিতা করেছেন; যাতে শ্রমিক তার কাজে অবহেলা না করে এবং এর ফলে পণ্যের ক্ষতি না হয়। তবে ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি যদি এমন কোনো কারণে হয় যাতে শ্রমিকের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং যা থেকে সতর্ক থাকা সম্ভব ছিল না— যেমন অগ্নিকাণ্ড বা অনুরূপ কোনো দুর্ঘটনা— তবে সেক্ষেত্রে সে দায়ী হবে না।

আমাদের উপস্থাপিত অর্থ অনুযায়ী যখন এটি সাব্যস্ত হলো যে ইসতিহসান একটি গ্রহণযোগ্য শরয়ী উৎস, তখন দেখা যায় এটি এক প্রকার জনকল্যাণ বা মাসলাহাতকে ধারণ করে। কারণ অনেক সময় সাধারণ কিয়াসী নিয়মাবলির প্রয়োগ কিছু জনকল্যাণ নষ্ট করে অথবা নির্ধারিত কিছু শরয়ী মূলনীতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন এবং স্বীকৃত জনকল্যাণসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইসতিহসান গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ইসতিহসানের মাধ্যমে গৃহীত বিধানটি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ের হোক বা অন্য কোনো পর্যায়ের, তাতে কোনো তফাৎ নেই। কারণ শরীয়ত—যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—একটি শরয়ী বিধান এবং অপর একটি শরয়ী বিধানের মধ্যে এই জাতীয় কোনো পার্থক্য চেনে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই উৎসটি দলিল হিসেবে পেশ করার এবং তা থেকে বিধান আহরণ করার যোগ্য হবে, ততক্ষণ তা বিধানগত দিক থেকে সমান হিসেবে গণ্য হবে...

তা সকল বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বরং আমরা লক্ষ্য করি যে: রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে 'ইস্তিহসান'-এর ওপর নির্ভর করা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত জনস্বার্থ বা মাসলাহাতসমূহ বিবেচনার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী হতে পারে। কখনও কখনও কিয়াস বা তুলনামূলক নিয়ম প্রয়োগের ফলে এমন কিছু স্বীকৃত জনস্বার্থ নষ্ট হতে পারে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. মাসালিহে মুরসালাহ (অনির্ধারিত জনস্বার্থ):

মাসলাহাত বা জনস্বার্থ বলতে উপকার লাভ করা অথবা অপকার বা ক্ষতি প্রতিহত করাকে বোঝায়। এটি তিন প্রকার:

এক প্রকার হলো যার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে শরীয়ত সাক্ষ্য দিয়েছে, যা 'মাসালিহে মু'তাবারাহ' (স্বীকৃত জনস্বার্থ) হিসেবে পরিচিত। এটি হলো নস (মূল পাঠ) বা ইজমা (ঐক্যমত)-এর যৌক্তিক অর্থ থেকে বিধান গ্রহণ করা। দ্বিতীয় প্রকার হলো যার অসারতার পক্ষে শরীয়ত সাক্ষ্য দিয়েছে, যা 'মাসালিহে মুলগাহ' (বাতিলকৃত জনস্বার্থ) হিসেবে পরিচিত। যেমন: রমজান মাসে দিনের বেলা সহবাস করার কারণে রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ওপর রোজা রাখা বাধ্যতামূলক করা; কারণ দাস মুক্ত করা তাদের জন্য সহজ কাজ, ফলে তারা এর দ্বারা পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হবে না। অথচ কাফফারার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে পাপাচার থেকে বিরত রাখার জন্যই। এটি একটি বাতিল জনস্বার্থ; কারণ তা নস বা সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধী। এর অর্থ হলো: যারা এই মত পোষণ করেছেন—অথবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ—তারা মনে করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি সম্পদশালী হয় এবং রমজানের দিনে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে তারা বলেন: তার ওপর কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব। আর এখানে কাফফারা হলো ক্রমানুসারী। কাফফারা শুরু হয় দাস মুক্ত করার মাধ্যমে। তখন কিছু ফকীহ বললেন: যদি আমরা এই ধনী ব্যক্তিকে দাস মুক্ত করতে বাধ্য করি, আর তার কাছে অনেক দাস থাকে, তবে সে এর দ্বারা নিবৃত্ত হবে না। তাই তারা বলেছেন: জনস্বার্থের দাবি হলো তাকে রোজা রাখতে বাধ্য করা যাতে সে শাস্তির তীব্রতা বেশি অনুভব করতে পারে, দাস মুক্তির চেয়ে যা তার জন্য খুব একটা কষ্টকর নয়। এই যে জনস্বার্থের দিকে তারা লক্ষ্য করেছেন, তা মূলত 'মাসaliহে মুলগাহ' বা বাতিলকৃত স্বার্থ যা শরীয়ত গণ্য করে না। কেন শরীয়ত একে গণ্য করে না? কারণ তা নস বা মূল পাঠের সাথে সাংঘর্ষিক। নস স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এই কাফফারাগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো দাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তি কাফফারা ওয়াজিবকারী কাজ—অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস—সম্পাদন করেছে, সে ধনী নাকি দরিদ্র শরীয়ত তা দেখেনি। সুতরাং ওই সকল ফকীহ যে জনস্বার্থের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তা বাতিল বলে গণ্য, শরীয়তে এর কোনো গুরুত্ব নেই; কারণ তা সরাসরি নসের পরিপন্থী।

আর তৃতীয় বিভাগ হলো সেটি, যার সপক্ষে বা বিপক্ষে শরয়ি বিধানদাতার কোনো সাক্ষ্য নেই। আর এটিই ‘আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ’ (অবারিত জনস্বার্থ) হিসেবে পরিচিত। এটি এমন এক প্রকার জনস্বার্থ যা শরয়ি বিধানদাতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও একে গ্রহণ বা বর্জনের সপক্ষে কোনো বিশেষ মূলনীতির সাক্ষ্য নেই।

ইমাম মালিক —আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই প্রকার জনস্বার্থের ঝাণ্ডা বহন করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে ‘আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ’ বিশেষভাবে সাংবিধানিক মূলনীতিসমূহের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হয়; কারণ এই সব নিয়মের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই কোনো শরয়ি নস (দলিল) বর্ণিত হয়নি। ফলে মুজতাহিদের সামনে জনস্বার্থের দ্বার

উন্মুক্ত থাকে, যাতে তিনি সেই জনস্বার্থের দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এটি আইনবিদদের নিকট পরিচিত 'প্রাকৃতিক আইন' (Natural Law) এবং ন্যায়বিচারের সেই সব নিয়মাবলীর কাছাকাছি, যার ওপর ভিত্তি করে মানবরচিত আইনের ব্যাখ্যাকারগণ এমন সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন যেগুলোর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি।

সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এই জনস্বার্থসমূহ গ্রহণের বৈধতার একটি প্রমাণ হলো ইবনে খালদুন তাঁর 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব জনস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে সর্বপ্রথম নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগকে পৃথক করেছিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রা.)-এর যুগে নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে কোনো পৃথকীকরণ ছিল না।

উমর ইবনুল খাত্তাব এটি করেছিলেন অর্থাৎ: তিনি নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করেছিলেন জনস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে; কারণ ইমাম বা শাসকের নির্বাহী ব্যস্ততা এত বেশি ছিল যে, তার পক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল না।

ইবনে খালদুন বলেন: আর বিচার বিভাগ হলো খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত একটি দায়িত্ব; কারণ এটি হলো মানুষের মধ্যকার দাবি-দাওয়া ও বিবাদ নিরসনের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করার একটি পদ। তবে এটি কিতাব ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত শাখা বিধানসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাই এটি খিলাফতের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

সপ্তম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

...এবং এর সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খলিফাগণ নিজেরাই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং বিচারকার্য অন্য কারও হাতে ন্যস্ত করতেন না। সর্বপ্রথম উমর ইবনুল খাত্তাব বিচারকার্য অন্যের কাছে হস্তান্তর করেন এবং এ বিষয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তিনি মদিনায় তাঁর সাথে আবু দারদা-কে নিয়োগ দেন, বসরায় শুরাইহ-কে নিয়োগ দেন এবং কুফায় আবু মুসা আল-আশআরী-কে নিয়োগ দেন। তিনি তাঁর (আবু মুসা আল-আশআরীর) উদ্দেশ্যে সেই বিখ্যাত পত্রটি লিখেছিলেন, যার ওপর বিচারব্যবস্থার বিধানসমূহ আবর্তিত হয়।

ইবনে খালদুন অন্য এক স্থানে বলেন: খলিফাগণ বিচারকার্য অন্যের ওপর অর্পণ করতেন, যদিও এটি তাঁদের দায়িত্বের সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল। কারণ তাঁরা সাধারণ রাজনীতি পরিচালনা, জিহাদ, বিজয় অভিযান, সীমান্ত রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সুরক্ষার মতো অসংখ্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাই নিজেদের কাজের চাপ কমাতে তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা থেকে উদ্ধৃত এই কথার অর্থ আমাদের সামনে এটিই স্পষ্ট করে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে যে পৃথকীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রে অব্যাহত থাকে। ফলে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব এটি করেছিলেন—যেমনটি আমরা বলেছি—কারণ জনকল্যাণ বা মাসলাহাত এর দাবি করছিল।

মানুষের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন যারা কেবল এই কাজেই নিবেদিত থাকবেন। কারণ খলিফার পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব এবং বিচারকার্যের দায়িত্ব—উভয়টি পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই আমাদের নেতা উমর উপলব্ধি করেছিলেন যে, খিলাফত ও বিচারকার্য পরিচালনার মধ্যে পৃথকীকরণ করা জনকল্যাণের দাবি। আর এটিই আমরা 'মাসালিহে মুরসালাহ' (অবিবেচিত জনকল্যাণ) থেকে গ্রহণ করি।

সুতরাং, 'মাসালিহে মুরসালাহ' গ্রহণ করার মাধ্যমে মূলত ইসলামী সমাজের কল্যাণ অর্জিত হয় এবং এটি রাজনৈতিক বিধানাবলীর

আওতাভুক্ত।

পঞ্চম: উরফ (প্রথা):

উরফ বা প্রথা বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যা কোনো বিষয়ে মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং যার ওপর তাদের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এটি 'আদাত' বা অভ্যাস থেকে ভিন্ন। কারণ 'আদাত' হলো 'উরফ'-এর চেয়েও ব্যাপকতর; কেননা বারবার ঘটে এমন প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে 'আদাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়...

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থেকে হতে পারে, পক্ষান্তরে উরফ (প্রথা) হলো কথা বা কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভ্যাস। এটি অধিকাংশ মানুষের মাঝে প্রচলিত একটি প্রথা এবং শারঈ দলিলের (নস) অনুপস্থিতিতে এটি ইসলামী ফিকহের অন্যতম একটি মূলনীতি।

আলেমদের নিকট, বিশেষ করে মালিকি ও হানাফি মাযহাবের আলেমদের নিকট এটি স্বীকৃত যে: উরফ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, তা নস বা অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার মতোই।

শায়খ আবু যাহরা বলেন: সম্ভবত এর অর্থ হলো— উরফ দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়টি এমন এক প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল যা নসের মতোই নির্ভরযোগ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নস পাওয়া না যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ নস অনুপস্থিত থাকবে, ততক্ষণই এটি কার্যকর হবে। কিন্তু উরফ যদি কুরআন বা সুন্নাহর কোনো নসের পরিপন্থী হয়, তবে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন কোনো সময় মানুষ যদি মদ পান, ব্যভিচার, সুদ গ্রহণ বা এই জাতীয় কোনো হারামে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে তা হবে একটি ভ্রষ্ট প্রথা (উরফে ফাসেদ)। একে গ্রহণ করার অর্থ হলো শরীয়তের দলিলসমূহকে উপেক্ষা করা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা; আর এগুলো হলো এমন সব অনিষ্ট, যা দূর করার জন্যই যাবতীয় শরীয়ত প্রেরিত হয়েছে।

এর ওপর ভিত্তি করে উরফ দুই প্রকার:

সঠিক প্রথা (উরফে সহীহ): যা শারঈ কোনো নসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। নসের অনুপস্থিতিতে এটি গ্রহণ করা হবে।
ভ্রান্ত প্রথা (উরফে ফাসেদ): এর দিকে ধাবিত হওয়া যাবে না; এটি এমন যা ইসলামী শরীয়তের কোনো অকাট্য নসের পরিপন্থী।

শারঈ দলিল না থাকার অবস্থায় মূলনীতি হিসেবে উরফ অনুযায়ী আমল করার শর্তাবলি নিম্নরূপ:

প্রথম শর্ত: উরফটি নিরবচ্ছিন্ন ও প্রভাবশালী হতে হবে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ এর ওপর আমল করবে। যদি বিষয়টি এমন না হয়, তবে তা নিরবচ্ছিন্ন হিসেবে গণ্য হবে না। তবে উরফটি সাধারণ হোক বা বিশেষ, মানুষের অধিকাংশের মধ্যে এর প্রচলন থাকাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় শর্ত: যে কার্যাবলি বা আচরণের ক্ষেত্রে উরফকে বিচারক হিসেবে মানা হবে, সেই আচরণের উৎপত্তির সময় উরফটি বিদ্যমান থাকতে হবে। অর্থাৎ তা উক্ত কাজের আগে থেকে বিদ্যমান হতে হবে অথবা তার সমসাময়িক হতে হবে। পক্ষান্তরে কোনো চুক্তি বা আচরণের পরে যদি উরফের উদ্ভব ঘটে, তবে সেই ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ

সপ্তম পাঠ

তৃতীয় শর্ত: প্রথা (উরফ)-এর বিপরীতে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা (তাসরীহ) না থাকা। যদি চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় কোনো নির্দিষ্ট পন্থায় লেনদেন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাদের সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হবে এবং তা উরফের ওপর প্রাধান্য পাবে; কারণ চুক্তি হলো চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের জন্য একটি বিধান। যেহেতু তারা —যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি— একটি নির্দিষ্ট পন্থায় তাদের ইচ্ছা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে, তাই স্পষ্ট ঘোষণার বিপরীতে পরোক্ষ ইঙ্গিতের (দালালাহ) কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

চতুর্থ শর্ত: উরফের ওপর আমল করার দ্বারা শরীয়তের কোনো অকাট্য দলীল (নস কাতয়ী)-এর বিরোধিতা যেন না হয়। কারণ, উরফের মাধ্যমে শরীয়তের নসসমূহের বিরোধিতা করার কোনো অবকাশ নেই; কেননা এমতাবস্থায় তা ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ/পরিত্যজ্য) বলে গণ্য হবে এবং তা বিবেচনায় নেওয়া হবে না।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট এটি সংক্ষেপে স্পষ্ট হলো যে: যখন কোনো বিষয়ে কোনো নস (শরয়ী পাঠ) পাওয়া যায় না, তখন পূর্বোক্ত শর্তাবলির আলোকে সেই বিষয়ে উরফ বা সামাজিক প্রথার মাধ্যমে ফয়সালা করা সম্ভব। এই কারণেই, যে ফকীহ ফতোয়া প্রদানের জন্য অগ্রসর হবেন, তার জন্য আবশ্যক হলো উরফ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা, যাতে প্রয়োজন হলে তিনি সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিতে পারেন।

শরীয়াহভিত্তিক রাজনীতি **অষ্টম পাঠ**

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা

পাঠের বিষয়বস্তুসমূহ

প্রথম বিষয় : আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মূলনীতি ৩৪১

দ্বিতীয় বিষয় : পরামর্শের (শুরা) মূলনীতি ৩৪৫

""

শরয়ি রাজনীতি

অষ্টম পাঠ

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নীতি

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি রয়েছে যার ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কোনো বিষয়ের মূলনীতি বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা ছাড়া সেই বিষয়টি অস্তিত্ব লাভ করে না; তাই এই মূলনীতিগুলোর প্রতিটি বিদ্যমান থাকা এবং বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য।

ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে সকল মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো: আল্লাহর সার্বভৌমত্বের

(হাকিমিয়াহ) নীতি।

ইসলামী ব্যবস্থার একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো যে, সমগ্র মহাবিশ্ব—তথা এতে যা কিছু এবং যারা আছে—সবই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন। যেমনটি তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন: **"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"** (সূরা আল-হাদিদ: ২)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: **"আর বলুন: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই।"** (সূরা আল-ইসরা: ১১১)।

মহান আল্লাহ যখন একমাত্র মালিক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তখন তিনি আমাদের জন্য যে দ্বীন প্রবর্তন করেছেন সে অনুযায়ী একমাত্র তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কারণ এটি একটি স্ববিরোধিতা যে, মালিক তাঁর মালিকানাধীন জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব করবেন না। সুতরাং বিধান দান বা আইন প্রণয়ন—যা মূলত পরীক্ষা ও যাচাই হিসেবে সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করারই নামান্তর—তা উলুহিয়াত (ইলাহ হওয়া) এবং মালিকানারই অনিবার্য দাবি। অতএব, আল্লাহর রাজ্যে একমাত্র তিনিই কোনো কিছুকে হালাল (বৈধ) বা হারাম (অবৈধ) করার অধিকার রাখেন। তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমেই এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের মাধ্যমে পৌঁছেছে। মহান আল্লাহ বলেন: **"আপনার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি যার কাছে আমি এই প্রত্যাদেশ (ওহী) করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।'"** (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫)।

যেমনটি সবার জানা: ইসলামে আকিদার মূল স্তম্ভ হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই'। এর অর্থ হলো—যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি—এই মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই—এতে যা কিছু এবং যারা আছে, যা আমাদের জ্ঞানে আছে আর যা আমাদের জ্ঞানের অতীত—একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এগুলোর স্রষ্টা নেই।

এর ভিত্তিতে বলা যায়: মহাবিশ্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি সত্যের সাথে ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য। মহাবিশ্বে আল্লাহর মালিকানাকে মেনে নিয়ে তাঁর একক শাসন ক্ষমতাকে অস্বীকার করার মধ্যে—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—এক ধরনের স্ববিরোধিতা বিদ্যমান।

মরহুম অধ্যাপক 'সাঈদ কুতুব' এই বিষয়টি চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন: বাস্তবতার বিচারে আমরা দেখি যে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে কেবল প্রতিমা ও মূর্তিকে শরিক করত না, বরং তারা জ্বিন, ফেরেশতা এবং মানুষকেও তাঁর সাথে শরিক করত। তারা মানুষকে কেবল এই দিক থেকে শরিক সাব্যস্ত করত যে, তারা সমাজ ও ব্যক্তির জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল; ফলে তারা তাদের জন্য আইন তৈরি করত, প্রথা নির্ধারণ করত এবং তাদের বিবাদসমূহ নিজেদের খেয়ালখুশি ও প্রথা অনুযায়ী মীমাংসা করত। ইসলাম একে শিরক হিসেবে গণ্য করে এবং মানুষের বিষয়ে মানুষকে ফয়সালাকারী বা বিচারক বানানোকে তাদের উপাস্য বানানো এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সমকক্ষ সাব্যস্ত করা মনে করে। আল্লাহ তাআলা মূর্তি ও প্রতিমার সামনে সেজদা করতে যেভাবে নিষেধ করেছেন, এটি থেকেও সেভাবে নিষেধ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়টিই সমান—আল্লাহর সাথে শিরক এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অংশীদার হিসেবে আহ্বান করা।

পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী উম্মতদের এই কারণে নিন্দা জানিয়েছে যে, তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন: **“তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা কেবল এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য**

কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি অতি পবিত্র।" (আত-তাওবাহ: ৩১)।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে এর অর্থ হলো: তারা তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ পাপাচার এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা ও যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ক্ষেত্রে তারা তাদের আনুগত্য করত, ঠিক যেমন রবদের আদেশ আনুগত্যের সাথে পালন করা হয়।

আধুনিক যুগে আমরা দেখতে পাই যে, মানবরচিত আইনগুলো এর অনুসারী ও সমর্থকদের নিকট ঠিক সেই অবস্থান দখল করে নিয়েছে যা এককালে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতকৃত মূর্তি ও উপাস্যদের ছিল। তাদের নিকট এই আইনগুলো ধর্মীয় বাণীর সমতুল্য, এমনকি কখনো কখনো এগুলো তার চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা পায়।

শরয়ী রাজনীতি
অষ্টম পাঠ

এটি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য বিধান প্রণয়নের অধিকারের স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের ইসলামী বা প্রাচ্যীয় সমাজে কাম্য নয়; কেবল জীবনের সেই সকল জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্র ব্যতীত যে বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতা (আল্লাহ) গ্রহণ বা বর্জন—কোনোটিই ব্যক্ত করেননি। পক্ষান্তরে, শরীয়ত প্রণেতা যা সাব্যস্ত করেছেন, তাই সত্য যা অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং আমরা তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করব না। একইভাবে, তিনি যা বাতিল করেছেন তা আমাদের বর্জন করতে হবে, যদিও দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তা করে থাকে।

যদি মানুষ তাদের বাতিলের পক্ষ সমর্থন করে এবং তাতে আনন্দিত হয়, তবে আমাদের জন্য কি সেই সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং তার প্রতিরক্ষা করা ওয়াজিব নয় যা মহান আল্লাহর বিধান?!

পবিত্র কুরআনে ইসলামী সমাজে, বরং সমগ্র মহাবিশ্বে মহান আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের (হাকামিয়্যাহ) বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সূরা আল-মায়িদায় আয়াতগুলো শেষ হয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির" [আল-মায়িদা: ৪৪]। অতঃপর: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই যালিম" [আল-মায়িদা: ৪৫]। এরপর: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক" [আল-মায়িদা: ৪৭]।

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মহান আল্লাহর বাণী: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির", "যালিম" এবং "ফাসিক"-এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে বিচার করাকে অস্বীকার করল, সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করল কিন্তু তদনুযায়ী বিচার করল না, সে যালিম ও ফাসিক। আর এটি এমন কুফরী নয় যা ধর্ম (মিল্লাত) থেকে বহিষ্কার করে দেয়, বরং এটি কুফরীর চেয়ে নিম্নস্তরের কুফরী, যুলুমের চেয়ে নিম্নস্তরের যুলুম এবং ফাসেকীর চেয়ে নিম্নস্তরের ফাসেকী।"

সুতরাং আমাদের নিকট এটি স্পষ্ট হয় যে: ইসলামী ব্যবস্থা মহান আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের (হাকামিয়্যাহ) অধিকারের স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে অধিকারে কেউ তাঁর শরীক নয়। এটি স্বাভাবিকভাবেই সমাজগুলোর স্থিতিশীলতা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুগত হওয়ার দিকে নিয়ে যায় যে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে; আর যে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান নেই, সে ক্ষেত্রে ওহীর মূলনীতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়।

পৃষ্ঠা 44

অষ্টম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

কিন্তু যখন এই মূলনীতিটি খণ্ডিত হয় এবং সমাজে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন মানুষের বিবেক ও ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আধিপত্য বজায় থাকে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব থাকে অন্য কারও হাতে। আবার যখন পরকালের প্রতিফলের ক্ষেত্রে আধিপত্য আল্লাহর জন্য থাকে, অথচ দুনিয়ার দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ক্ষমতা থাকে অন্যের হাতে; তখন মানবাত্মা ও সমাজ দুটি ভিন্ন কর্তৃত্ব এবং দুটি ভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাঝে পড়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। আর তখনই মানবজীবনে সেই বিপর্যয় দেখা দেয় যার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান সত্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।" (আল-আম্বিয়া: ২২)। তিনি আরও বলেছেন: "আর সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুগামী হতো, তবে আসমানসমূহ, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সব বিপর্যয়গ্রস্ত হতো।" (আল-মুমিনুন: ৭১)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "অতঃপর আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং আপনি তা অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।" (আল-জাসিয়া: ১৮)।

যদি মুসলমানরা তাদের সমাজে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করত, তবে এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত রাষ্ট্রসমূহে শরিয়তের বিধিবিধান বা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান নিশ্চিত হতো—শাসক এবং শাসিত উভয় পক্ষের মাধ্যমেই। কারণ মহান আল্লাহর বিধানের সামনে সবাই সমান; প্রত্যেকেই তা পালন করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করে ও শাস্তিকে ভয় পায়। তারা সর্বদা নিজ নিজ বিবেকের ওপর নজরদারি রাখে; কারণ আল্লাহ তাদের দেখছেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন কে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে সংশোধনকারী।

এটি স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রে আইনের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ফুটিয়ে তোলে; কারণ যেকোনো শরিয়ত বা আইনের গুরুত্ব পরিমাপ করা হয় মানুষের অন্তরে সেটির প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার মাত্রা দ্বারা। এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে কোনো মানবরচিত আইন ইসলামি শরিয়তের মানে পৌঁছাতে পারেনি।

তাছাড়া সার্বভৌমত্বের অধিকারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একত্ব ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পদ্ধতিগুলোর স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়—যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কারণ বিভিন্ন প্রকারের সরকার পদ্ধতি, যেমন প্রজাতন্ত্র বা রাজতন্ত্র, সর্বদা সেই চিরন্তন দীনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে যা কখনো পরিবর্তিত বা রদবদল হয় না। এই দীনের ওপর প্রত্যেক শাসক বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই দীনের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয়।

পৃষ্ঠা 45

যখন উম্মাহ জানতে পারে যে, সরকারের রূপ পরিবর্তন তার আইন ও ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; কারণ এই আইন ও ব্যবস্থাগুলো সরকারের ঊর্ধ্বে এবং ব্যক্তিদেরও ঊর্ধ্বে, আর সবার জন্যই এগুলোকে সম্মান করা আবশ্যক; যখন উম্মাহ এ কথা জানতে পারে, তখন সে জীবনের কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে, সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে যে উম্মাহর বিষয়াবলী এর বিপরীত কোনো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সে উদ্বেগ, অস্থিরতা, বিভ্রান্তি এবং সরকারের পরিবর্তনের আশঙ্কায় জীবন অতিবাহিত করে, যাদের ন্যায়বিচার ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তাদের দলগত পরিচয় ও খেয়ালখুশির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এটিই হলো ইসলামের শাসনব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মাবলির প্রথম নিয়ম, আর তা হলো মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নিয়ম।

পরামর্শের (শুরা) নিয়ম

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে দ্বিতীয় নিয়মের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তা হলো পরামর্শের (শুরা) নিয়ম। পরামর্শকে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি শরিয়তের অন্যতম মূলনীতি এবং এর অকাট্য বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে, এটি কেবল ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক নিয়ম হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সেই সাধারণ কাঠামো ও পরিধিকেও উপস্থাপন করে, যার সীমানার মধ্যে থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের সমস্ত শাসন বিভাগকে—তা আইনবিভাগ হোক, নির্বাহী বিভাগ হোক কিংবা বিচার বিভাগ হোক—কাজ করতে হয়।

এর মাধ্যমে এটি মতের একমুখিতা বা স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিরোধ করে, যার ফলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং উম্মাহর ঐক্য অর্জিত হয় ও এর সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। ইসলামি সাংবিধানিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে পরামর্শ উম্মাহকে তার জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলো পরিচালনার অধিকার দান করে এবং এটি অন্যতম মৌলিক নিশ্চয়তা হিসেবে কাজ করে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

...যা আইনের লঙ্ঘন অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; কারণ শাসক কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তা যথাযথ গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত, জনস্বার্থ অনুসন্ধান এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে বাস্তবায়নের পর্যায়ে উপনীত হবে না।

এই অর্থে এটি এমন এক মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য যা ইসলামি বিধানদাতা সকল মুসলিমের জন্য সুনিশ্চিত করেছেন, যা ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমদের ভোগকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতাগুলোর মধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। তদুপরি, ইসলামি শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী উম্মাহর সাধারণ বিষয়াবলি পরিচালনায় শুরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা উম্মাহর মৌলিক ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করে।

আমরা শুরা বা পরামর্শের বিষয়ে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব:

শুরা ওয়াজিব হওয়ার বৈধতার ভিত্তি:

শুরার মূলনীতির আবশ্যকতা ইসলামি শরিয়তের উৎসসমূহ থেকে গৃহীত। পবিত্র কুরআন এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বহু বিষয়ে একে নিজের জন্য কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং খুলাফায়ে রাশিদিন বহু বিষয়ে এর ওপর আমল করেছেন এবং একে অনুসরণ করেছেন।

নিম্নে আমরা ইসলামি শরিয়তের প্রতিটি দলিল আলোচনা করব, যা শুরার প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং ইসলামি উম্মাহর ওপর একে আবশ্যক করেছে:

প্রথম দলিল: পবিত্র কুরআন:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যখন কোনো সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।” (আলে ইমরান: ১৫৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “এবং যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে এবং যাদের কার্যাবলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।” (আশ-শুরা: ৩৮)

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
অষ্টম পাঠ

কিছু ফকিহ এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে: মহান আল্লাহর কিতাবে একটি সূরা থাকা, যা হলো সূরা আশ-শুরা এবং যা এই মূলনীতির নামেই নামকরণ করা হয়েছে, আর পরামর্শকে মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাব্যস্ত করা, অতঃপর অন্য একটি সূরায় স্পষ্টভাবে এর নির্দেশ প্রদান করা—নিশ্চয়ই তা পরামর্শের (শুরা) প্রতি শরিয়তদাতার গুরুত্বারোপের প্রমাণ। তিনি একে ইসলামের শাসনব্যবস্থার এবং ইসলামি বিষয়াবলি পরিচালনার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

এই মতটি এও ব্যক্ত করে যে, প্রথম আয়াতের প্রমাণ: "এবং তুমি কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো" তা পরামর্শ প্রদান ও তা ব্যবহারের আহ্বানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আয়াতের চেয়েও অধিক শক্তিশালী; দ্বিতীয় আয়াতটি হলো: "এবং তাদের কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়"। কারণ প্রথম আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি একটি নির্দেশ, যেখানে দ্বিতীয় আয়াতটি কেবল মুমিনদের প্রশংসনীয় গুণাবলির একটি হিসেবে পরামর্শের কথা উল্লেখ করে।

শেখ রশিদ রিদা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহ মনে করেন: সূরা আল-ইমরানে আরেকটি আয়াত রয়েছে যা পরামর্শের আবশ্যকতা এবং এর ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা কায়েম করার ক্ষেত্রে একই সূরার "এবং তুমি কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো" আয়াতের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। সেই আয়াতটি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম।" [আল-ইমরান: ১০৪]।

ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহ মনে করেন, এই আয়াতের প্রমাণের শক্তি সূরা আশ-শুরা-তে বর্ণিত আয়াত: "এবং তাদের কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" এর চেয়েও বেশি। কারণ শেষোক্ত আয়াতটি অর্থাৎ মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তাদের কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়"—এর অর্থ হলো পরামর্শ কেবল একটি বিশেষ দলের অবস্থার বর্ণনামূলক বর্ণনা, যা আল্লাহর নিকট প্রশংসনীয় হওয়ার চেয়েও এটি নির্দেশ করে যে বিষয়টি স্বয়ং প্রশংসিত। এছাড়া এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী "এবং তুমি কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো" এর প্রমাণের চেয়েও শক্তিশালী; কারণ শেষোক্ত আয়াতের অর্থ হলো রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর পরামর্শ করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি এমন কোনো পক্ষ না থাকে যারা এই ওয়াজিব পালনের নিশ্চয়তা দেবে, তবে তিনি যদি তা বর্জন করেন এবং শরিয়তদাতার নির্দেশ পালন না করেন তবে কী ঘটবে? যেখানে এই আয়াতটি, যা...

৩৪৭

পৃষ্ঠা 48

শরয়ী রাজনীতি
অষ্টম পাঠ

আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।"
আমরা বলি: এই আয়াতটি যদিও মানুষের মধ্যে এমন একটি একনিষ্ঠ ও শক্তিশালী দল থাকা আবশ্যক করে যারা কল্যাণের দাওয়াত প্রদান এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করবে, তবে এই আবশ্যকতা শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্য নিশ্চিতভাবে একটি সাধারণ ও বাধ্যতামূলক বিধান।

দ্বিতীয় দলিল: সুন্নাহ-এ-নববী:

এই মূলনীতিটি—অর্থাৎ শূরার (পরামর্শের) মূলনীতি—প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতি এবং পবিত্র আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ: "এবং আপনি কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন" এর প্রতি তাঁর আনুগত্যের মাত্রা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এটি আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করতেন তার সীমা নির্ধারণ করা।

আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পরামর্শ করা অপরিহার্য হয়ে থাকে, তবে এই প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র বা পরিধি স্পষ্ট করা জরুরি হয়ে পড়ে।

এই বিষয়টি বর্ণনার গুরুত্ব এখানে যে, যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পরামর্শ করা অনিবার্য হয়, তবে তাঁর পরবর্তী খলিফা ও শাসকদের জন্য এটি আরও জোরালোভাবে একটি অনিবার্য কর্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করার নিমিত্তে নবুওয়াতের যুগে ঘটে যাওয়া কিছু নজির উল্লেখ করা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে এই কর্তব্যের ক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারিত হতে পারে। আমরা দেখতে পাব যে, এই নজিরগুলো প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআনে যে সকল বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ (নস) অবতীর্ণ হয়নি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রতিটি বিষয়ে শূরার ভিত্তিতে আমল করতেন।

আমরা প্রথমে নবুওয়াতের যুগের কিছু নজির স্পষ্ট করব, এরপর পরামর্শের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের মাত্রা ও সেই প্রতিশ্রুতির পরিধি নিয়ে আলোচনা করব। পরিশেষে, পরামর্শ সভার সদস্যরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তা অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের মাত্রাটি স্পষ্ট করব।

পৃষ্ঠা 49

শরয়ী রাজনীতি
অষ্টম পাঠ

প্রথমত: নবুওয়াতের যুগে শুরার (পরামর্শ) দৃষ্টান্তসমূহ:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কুরাইশদের তাদের কাফেলা রক্ষার্থে বের হওয়ার খবর পেলেন, তখন তিনি মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন। কুরাইশরা যে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করেছে, সে সম্পর্কে তিনি তাদের অবহিত করলেন। তখন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) দাঁড়িয়ে সুন্দর বক্তব্য দিলেন, এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-ও অনুরূপ বক্তব্য দিলেন। এরপর মিকদাদ ইবনুল আমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়েছেন তা পালনে অগ্রসর হোন, আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে তা বলব না যা বনী ইসরাঈল মুসাকে বলেছিল: 'তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকব' (আল-মায়েদাহ: ২৪)। বরং আপনি ও আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সাথে যুদ্ধ করব। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে বার্ক আল-গিমাদ পর্যন্তও যান, তবে সেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা আপনার সাথে থেকে লড়াই করে যাব।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রশংসা করলেন এবং তার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসারদের মতামত জানতে চেয়ে বললেন: "হে লোকসকল! আমাকে পরামর্শ দাও।" তখন সা'দ ইবনে মুআয (রা.) বললেন: "আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে আপনি আমাদের উদ্দেশ্য করেই বলছেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তখন সা'দ বললেন: "আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি এবং এর ওপর আপনাকে শোনা ও আনুগত্য করার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা ইচ্ছা করেন সেদিকে অগ্রসর হোন, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে এই সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে এতে ঝাঁপিয়ে পড়ব; আমাদের একজন লোকও পিছপা হবে না।"

এভাবেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সাথে পরামর্শ করতেন। যখন তিনি দেখলেন যে তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েছেন, তখন তিনি আল্লাহর বরকতের ওপর ভরসা করে অগ্রসর হলেন।

বদর যুদ্ধের সময়ও, যখন কুরাইশ বাহিনী উপত্যকার দূরবর্তী প্রান্তে অবতরণ করল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের নিকটতম পানির নহরের কাছে পৌঁছে সেখানে অবতরণ করলেন, তখন হুবাব ইবনে মুনযির (রা.) এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এই স্থানটি দেখেছেন? আল্লাহ কি আপনাকে এই স্থানেই অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমাদের পক্ষে এর সামনে বা পেছনে যাওয়া সম্ভব নয়? নাকি এটি কেবলই ব্যক্তিগত অভিমত, যুদ্ধ এবং কৌশল?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "বরং এটি কেবলই ব্যক্তিগত অভিমত, যুদ্ধ এবং কৌশল।"

অষ্টম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

যুদ্ধ এবং সমরকৌশলের বিষয়। তখন আল-হুবাব বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো (অবস্থানের জন্য) উপযুক্ত স্থান নয়। সুতরাং আপনি আমাদের নিয়ে অগ্রসর হোন যেন আমরা শত্রুবাহিনীর সবচেয়ে নিকটবর্তী পানির আধারটির কাছে পৌঁছাতে পারি এবং সেখানে তাবু ফেলি। অতঃপর তার পেছনের অবশিষ্ট পানির উৎসগুলো আমরা বন্ধ করে দেব এবং সেখানে একটি হাউজ নির্মাণ করে তা পানিতে পূর্ণ করব। এরপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব; ফলে আমরা পানি পান করতে পারব কিন্তু তারা পারবে না। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন: "তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আল-হুবাব যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী কাজ করলেন।

ইবনে সা'দ এই বর্ণনায় আরও যুক্ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহি অবতীর্ণ হয়ে বলল: "মতামত সেটিই যা আল-হুবাব ইবনে মুনযির নির্দেশ করেছেন।" এই বর্ণনা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে: রাসূলুল্লাহ (সা.) পরামর্শ করতেন এবং পরামর্শদাতাদের মত অনুযায়ী আমল করতেন।

উহুদ যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর দেখা একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করার পর—যা পরবর্তী ঘটনাবলির পূর্বাভাস দিচ্ছিল—বললেন: "তোমরা যদি উপযুক্ত মনে করো তবে মদিনাতেই অবস্থান করো এবং তারা যেখানে ছাউনি ফেলেছে সেখানেই তাদের থাকতে দাও। তারা যদি সেখানে অবস্থান করে তবে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় থাকবে। আর তারা যদি মদিনায় আমাদের ওপর চড়াও হয়, তবে আমরা মদিনার ভেতরেই তাদের সাথে লড়াই করব।" এতে মুসলিমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। প্রথম দল শাহাদাতের অন্বেষায় মদিনার বাইরে গিয়ে কুরাইশদের মোকাবিলা করাকে পছন্দ করল; কারণ তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে শত্রুর মোকাবিলা করার সুযোগ পাননি। অন্য দলটি মদিনার বাইরে না গিয়ে মদিনাতেই অবস্থান করার পক্ষপাতী ছিল, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরও অভিমত ছিল। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার পক্ষে মত দিচ্ছেন, তখন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই গ্রহণ করলেন।

এরপর যখন তারা বুঝতে পারল যে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বাইরে বের হওয়ার জন্য এক প্রকার বাধ্য করেছে, তখন তারা তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "কোনো নবীর জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তিনি একবার যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তা খুলে ফেলবেন।"

উহুদ যুদ্ধে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে: যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.) মনে করতেন যে মুসলিমদের জন্য মদিনায় অবস্থান করাই ছিল কল্যাণকর—যেমনটি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—যাতে তারা সংখ্যা ও যুদ্ধ-সরঞ্জামে অনেক শক্তিশালী কুরাইশদের মোকাবিলা করার জন্য উন্মুক্ত ময়দানে বের না হয়ে বরং মদিনায় অবস্থান নেয় এবং আক্রান্ত হলে তা প্রতিরক্ষা করে; কিন্তু যেহেতু...

আসি-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
অষ্টম পাঠ

অধিকাংশ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দেখেছিলেন তার পরিপন্থী মত পোষণ করেন এবং অল্প সংখ্যক

লোক তাঁর মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ওপরই অটল থাকেন।

এই ঘটনা থেকে এটিও পরিস্ফুট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত তাদের বিপরীত ছিল; কেননা তিনি মনে করেছিলেন যে, মদীনায় অবস্থান করা এবং এর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করাই ছিল শ্রেয়। এটি ইসলামে শুরার বা পরামর্শের নীতিকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়।

নবুওয়াতের যুগে ইতিপূর্বে সংঘটিত একটি ঘটনা শুরার বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মপদ্ধতির অকাট্য প্রমাণ পেশ করে। ইমাম বুখারী ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো: হাওয়াজিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ধন-সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেওয়ার আবেদন জানায়; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং তাদের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদের অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তারা যখন তাঁর নিকট এসে উক্ত বিষয়গুলো ফেরত দেওয়ার প্রার্থনা করল, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "আমার সাথে তোমরা যাদের দেখছো (তারাও আছে)।" অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বোঝাতে চাইলেন: "আমার সাথে সাহাবীগণ রয়েছেন এবং আমি এই বিষয়ে তাদের অভিমত গ্রহণ করেছি। তাদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে আমি কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত দিতে পারি না।" তিনি তাদের বললেন: "আমার সাথে তোমরা যাদের দেখছো (তারাও আছে), আর সত্য কথাটিই আমার নিকট অধিক প্রিয়। অতএব তোমরা দুটি দলের যেকোনো একটিকে বেছে নাও: হয় যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদ।"

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বললেন: "তোমরা বন্দী এবং সম্পদ উভয়টি একত্রে পাবে না; বরং হয় বন্দী অথবা সম্পদ—যেকোনো একটিকে গ্রহণ করো।" তিনি তাদের বললেন: "আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন দশ রাতেরও বেশি সময় তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই প্রকারের প্রাপ্তির যেকোনো একটিকেই ফেরত দেবেন, তখন তারা যুদ্ধবন্দীদের বেছে নিল। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন: "অতঃপর, তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে ফিরে এসেছে এবং আমি তাদের যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সানন্দে এটি করতে চাও, তারা তা করো।" অর্থাৎ: তোমাদের মধ্যে যারা নিজের অধিকারে থাকা যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেওয়া পছন্দ করো, তারা তা প্রদান করো—অর্থাৎ তাদের কাছে তা অর্পণ করো—আর এর প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ হতে মিলবে। (আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজের অংশটি রেখে দিতে চাও যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের নিকট প্রথম যে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাঠাবেন তা থেকে আমরা তোমাদের পাওনা মিটিয়ে দিই, সে তা-ও করতে পারো)।

অর্থাৎ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বলেছিলেন: "যাদের নিকট যুদ্ধবন্দীদের কেউ আছে, তারা যদি তাদের এই কওমের নিকট—অর্থাৎ ইয়াহূদীদের নিকট—বিনিময়হীনভাবে ফিরিয়ে দিতে চায়, তবে সে যেন তা করে। আর যার কাছে যুদ্ধবন্দীদের কেউ আছে কিন্তু বিনিময় ছাড়া ফিরিয়ে দিতে চায় না, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়; অচিরেই আল্লাহ যখন আমাদের অনুগ্রহ করবেন, তখন আমরা তাকে এর বিনিময় প্রদান করব।" অর্থাৎ: যখন আল্লাহ আমাদের সম্পদ দান করবেন। তখন লোকেরা বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এতে সন্তুষ্ট হয়েছি।"

অর্থাৎ: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কথার সাথে একমত হয়েছি এবং আমরা বিনিময় ছাড়াই এই যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেব। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমাদের মধ্যে কারা এতে অনুমতি দিয়েছ আর কারা দাওনি তা আমরা জানি না।" অর্থাৎ: তিনি যেন তাদের বলছিলেন: আমি নিশ্চিত নই যে কে অনুমতি দিয়েছে ও সন্তুষ্ট হয়েছে, আর কে

অনুমতি দেয়নি ও সন্তুষ্ট হয়নি। "তাই তোমরা ফিরে যাও, যতক্ষণ না তোমাদের প্রতিনিধিগণ তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট পৌঁছে দেন।"

এই ঘটনাটি একদিকে স্পষ্ট করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। অন্যদিকে এটি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ দেয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী থেকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়: "যতক্ষণ না তোমাদের প্রতিনিধিগণ তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট পৌঁছে দেন।" অর্থাৎ: এমন লোক যাদেরকে তোমরা নির্বাচন করবে এবং তারা আমাদের কাছে তোমাদের সিদ্ধান্ত পৌঁছে দেবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যা সকল মুসলিমের সাথে সংশ্লিষ্ট তাতে পরামর্শ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেমনটি ঘটেছিল যখন তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের নিকট উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে পরামর্শ চেয়েছিলেন—যখন অপবাদকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা। বিষয়টি 'ইফক' বা অপবাদের প্রসিদ্ধ ঘটনা হিসেবে পরিচিত। এ ধরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে একাকী কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, বরং বিষয়টি মুমিনদের সামনে পেশ করেছিলেন যাতে তাদের মতামত নেওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতা প্রমাণ করে।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

অষ্টম পাঠ

অনুরূপভাবে রাসূল (সা.) শুরার (পরামর্শ) প্রশংসা করতেন এবং মুসলমানদের তা বাস্তবায়নে উৎসাহিত করতেন। তিনি অধিকাংশ বিষয়েই মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করতেন, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আবু হুরায়রা (রা.) এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন: "আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর চেয়ে তাঁর সাহাবীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আর কাউকে দেখিনি।"

ফকিহগণ পরামর্শ সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: "যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতদার।" আরও বর্ণিত হয়েছে: "যখন তোমাদের শাসকরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে, তোমাদের ধনীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, তখন জমিনের উপরিভাগ তোমাদের জন্য এর অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা উত্তম হবে।" তিনি আরও বলেছেন: "কোনো জাতি যখনই পরামর্শ করেছে, তখনই তারা তাদের কার্যাবলীর সঠিক পথের দিশা পেয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন: "যে পরামর্শ করে সে অনুতপ্ত হয় না, আর যে ইস্তিখারা করে সে ব্যর্থ হয় না।" আরও বলেছেন: "পরামর্শ হলো অনুশোচনা থেকে সুরক্ষাপ্রাচীর এবং নিন্দা থেকে নিরাপত্তা।" আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে এবং সে বিষয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে, আল্লাহ তাকে তার কাজের সবচেয়ে সঠিক বিষয়ের দিকে তাওফিক দান করেন।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর বুদ্ধিমত্তার মূল হলো মানুষের সাথে হৃদ্যতা বজায় রাখা।" আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের মতামতের ওপর অটল থাকে সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, আর পরামর্শ করার পর কেউ ধ্বংস হয় না।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "কোনো মানুষই পরামর্শ থেকে অমুখাপেক্ষী নয়।" আরও বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পরামর্শ থেকে অমুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ একে আমার উম্মতের জন্য রহমত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যে পরামর্শ করবে সে সঠিক পথ হারাবে না, আর যে তা বর্জন করবে সে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে না।"

শায়খ রশীদ রিযা এর ওপর মন্তব্য করে বলেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এটি বিধিবদ্ধ করেছেন যাতে জনকল্যাণের সঠিক পথটি

অর্জিত হয় এবং অনিষ্টতা প্রতিরোধ করা যায়; কারণ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতিই হলো বিপর্যয় ও ভ্রষ্টতা। রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমাদের কাজের ক্ষেত্রে পরামর্শের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"

পার্থিব অনেক বিষয়েই রাসূল (সা.) মুসলমানদের মতামতের দিকে ফিরে যেতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়ে অধিক অবগত।" তাঁর বাণী: "যা তোমাদের দ্বীন সংক্রান্ত বিষয় তা আমার কাছে সোপর্দ করো, আর যা তোমাদের দুনিয়াবি বিষয় সে সম্পর্কে তোমরাই অধিক অবগত।" এই কারণেই রাসূল (সা.) দুনিয়াবি বিষয়ে সাহাবীদের মতামতের অনুসরণ করতেন।

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (ইসলামী রাষ্ট্রনীতি)

অষ্টম পাঠ

নবুওয়াতের যুগে সংঘটিত এই পূর্ববর্তী নজিরগুলো পর্যালোচনার পর, এখন আমরা শুরা (পরামর্শ) সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তরে আসব। প্রশ্নটি ছিল: রাসূলুল্লাহ (সা.) কি তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য ছিলেন?

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শুরা পালনের বাধ্যবাধকতার পরিধি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ফকীহগণের মতপার্থক্য:

প্রথম মত: একটি অভিমত হলো যে, এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সামনে উদ্ভূত বিষয়গুলোতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতে আইনত বাধ্য ছিলেন না। এই মত অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য এই নির্দেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক হিসেবে নয়, বরং তা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় হিসেবে ছিল; যা ছিল মূলত মুসলমানদের মনতুষ্টির জন্য এবং তাঁদের হৃদয়ের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। এছাড়া এর মাধ্যমে তাঁদের প্রতি মমতা প্রকাশ পেত এবং তাঁদের অন্তরের ক্ষোভ দূর হতো। তদুপরি, এটি ছিল তাঁদের প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদর্শন এবং দ্বীনের প্রতি তাঁদের অনুরাগকে দৃঢ় করার একটি মাধ্যম। যদিও মহান আল্লাহ তাঁর বিষয়াবলি পরিচালনা ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তাঁকে এই পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছিলেন।

অপর একটি পক্ষ মনে করে যে, পবিত্র আয়াতে বর্ণিত নির্দেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যিকতা বুঝাতে এসেছে। বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি, সেক্ষেত্রে মুসলমানদের কাছে এমন কিছু (পরামর্শ বা অভিজ্ঞতা) থাকতে পারে যা উপকারী। ফলে তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। এই মত অনুসারে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। আমরা ইতিপূর্বে নবুওয়াতের যুগে সংঘটিত যেসব নজিরের প্রতি ইঙ্গিত করেছি, তা থেকে আমরা নিশ্চিত করেছি যে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরামর্শদাতাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের বাইরে যেতেন না।

যদি আমরা এই ওয়াজিব বা আবশ্যিকতার পরিধি বিবেচনা করি, তবে এই ওয়াজিবের পরিধি কতটুকু? অর্থাৎ নবী (সা.) কি সব বিষয়েই তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন—চাই তা ধর্মীয় বিষয় হোক বা জাগতিক, যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত বিষয় হোক বা অর্থনৈতিক, নাকি অন্য কিছু?

এটিই ‘এই ওয়াজিবের পরিধি’ (নিত্বাক আল-ওয়াজিব) হিসেবে পরিচিত।

পৃষ্ঠা 55

শারঈ রাজনীতি
অষ্টম পাঠ

আমরা বলি: এই ওয়াজিবের পরিধি—যা হলো পরামর্শের (শুরা) ওয়াজিব—তা হচ্ছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে যাতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একদল বিশেষজ্ঞ অভিমত দিয়েছেন যে, এটি কেবল যুদ্ধবিগ্রহের মতো পার্থিব বিষয়াবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে দ্বীনি বিষয়সমূহ পরামর্শের পরিধির বাইরে। এমনকি যেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হয়নি, সেসব বিষয়েও তিনি মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য ছিলেন না। কেননা এই সকল বিষয়ের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিধান, চাই তা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ কিংবা হারাম—সব প্রকারের ক্ষেত্রেই। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দ্বীনি বিধানসমূহের ক্ষেত্রে পরামর্শ করতে বাধ্য ছিলেন না; কারণ এসবের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ওহির মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এই কারণেই কোনো কোনো ফকিহ সূরা আশ-শুরার আয়াত: "এবং তাদের কার্যাবলি তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" (আশ-শুরা: ৩৮) এবং সূরা আলে ইমরানের আয়াত: "এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন" (আলে ইমরান: ১৫৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এখানে ‘কাজ’ বা ‘বিষয়’ বলতে ওইসব পার্থিব বিষয় উদ্দেশ্য যা শাসকরা সাধারণত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন; বিশুদ্ধ দ্বীনি বিষয় নয়, যার ভিত্তি হলো ওহি, মানুষের মতামত নয়।

কেননা যদি আকাইদ (বিশ্বাস), ইবাদত এবং হালাল-হারামের মতো দ্বীনি বিষয়গুলো পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো, তবে দ্বীন হতো মানুষের তৈরি বিষয়। আর এটি অসম্ভব ও বাতিল। বরং দ্বীন হলো খোদাপ্রদত্ত বিষয়, যেখানে নবী (সা.)-এর যুগে বা তাঁর পরবর্তী সময়ে কারও নিজস্ব মতামতের কোনো সুযোগ নেই। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে নিজেদের মতামত পেশ করতেন না যতক্ষণ না তাঁরা নিশ্চিত হতেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়টি এমন যার ওপর কোনো ওহি নাজিল হয়নি। বদর যুদ্ধের দিন নবী (সা.) ও হুবাব ইবনুল মুনজির (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়। হুবাব (রা.) নবী (সা.)-কে একটি স্থানে অবস্থান নিতে দেখে বলেছিলেন: "এটি কি এমন কোনো স্থান যেখানে আল্লাহ আপনাকে নামিয়েছেন, ফলে আমাদের তাতে অগ্রগামী হওয়া বা পশ্চাদপসরণ করার কোনো অধিকার নেই? নাকি এটি কেবল ব্যক্তিগত মতামত, যুদ্ধকৌশল ও রণকৌশল?"

হুবাব ইবনুল মুনজির (রা.)-এর কথার অর্থ হলো: যদি আল্লাহ আপনাকে এই স্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দিতেন, তবে আমাদের কোনো মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকত না। কিন্তু যদি বিষয়টি পার্থিব বা যুদ্ধ সংক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে আমরা মতামত ব্যক্ত করছি...

পৃষ্ঠা 56

আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ — অষ্টম পাঠ

আমাদের অভিমত হলো, এর অর্থ হচ্ছে সাহাবীগণ ধর্মীয় বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করতেন না এবং তারা প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করতেন যে, বিষয়টি কি দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত নাকি দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে। যদি তা

দ্বীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতো তবে তারা কোনো মতামত দিতেন না। পক্ষান্তরে যদি তা দুনিয়াবী বা পার্থিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতো, যেমন যুদ্ধ—তবে তারা সে বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করতেন। যারা এই মত পোষণ করেন তাদের মতে, ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ গ্রহণ করা কোনো বিধান বা বাধ্যবাধকতা আরোপের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল কেবল মুসলমানদের মনস্তুষ্টির জন্য। আর এটি এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, দ্বীনি বা ধর্মীয় বিষয়ের মূল উৎস হলো ওহী।

অর্থাৎ: আমরা যদি বলি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কেবল দুনিয়াবী বিষয়েই পরামর্শ করতেন, তবে তিনি তাদের কিছু দ্বীনি বিষয়েও ইঙ্গিত করতেন অথবা কিছু দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন; এটি কোনো আবশ্যিক বিষয় ছিল না, বরং তা ছিল নিছক মনস্তুষ্টির জন্য।

এটি হলো প্রথম অভিমত, যা বলে যে পরামর্শ বা মাশওয়ারা ধর্মীয় বিষয়ে হয় না, বরং তা কেবল দুনিয়াবী বিষয়েই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অভিমত: অন্য কেউ কেউ মনে করেন যে, পরামর্শের পরিধি পার্থিব বা দুনিয়াবী বিষয়ের পাশাপাশি এমন সব দ্বীনি বা ধর্মীয় বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে যে বিষয়ে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতেন, তবে ওহী তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিত। এই পরামর্শের অর্থ এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের মুখাপেক্ষী ছিলেন; বরং এটি ছিল শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে পরামর্শের বা শুরার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি একটি দিকনির্দেশনা, যেন উম্মত পরবর্তী সময়ে এর অনুসরণ করে।

এটি হলো দ্বিতীয় অভিমত।

আমরা মনে করি যে, যে দৃষ্টিভঙ্গিটি শুরা বা পরামর্শকে বাধ্যতামূলক মনে করে এবং দুনিয়াবী বা পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্র নির্ধারণ করে—যেখানে কোনো অকাট্য দলিল (নস) আসেনি—সেটিই আমাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রগণ্য মত। কারণ ধর্মীয় বিষয়গুলো পরামর্শের গণ্ডির বাইরে; যেহেতু সেগুলোর ভিত্তি ও উৎস হলো ওহী, তা সরাসরি কিতাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহী হোক অথবা সুন্নাহর মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহী হোক।

শরয়ি শাসননীতি
অষ্টম পাঠ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জন্য যে সকল বিধান (আহকাম) প্রবর্তন করেছেন তাতে (অন্যদের) কোনো পরোক্ষ ভূমিকা নেই; কারণ সকল সৃষ্টির জন্য তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব, তারা তা পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক। আর যে বিষয়গুলো এই গণ্ডির বাইরে, সেগুলোতে মুসলমানদের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার প্রদান করা বৈধ। এই কারণেই আমরা কিছু মুফাসসিরকে দেখতে পাই যে তাঁরা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন: "এবং কিছু কিছু বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন; অতঃপর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।" তবে জমহুর (অধিকাংশ আলেম) এই অতিরিক্ত অংশটি গ্রহণ করেন না; তবে তাঁরা মনে করেন যে, এখানে নির্দেশটি ব্যাপক অর্থে আসেনি, বরং তা কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন বিষয়টি হালাল ও হারামের বিশ্লেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যুক্তি, বুদ্ধি এবং ইসলামী শরিয়তের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

নবী ﷺ-এর যুগে যেসকল বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছিল তা এই মতকেই সমর্থন করে, কারণ সেগুলো ছিল যুদ্ধবিগ্রহ এবং মানুষের মাঝে প্রচলিত প্রাত্যহিক লেনদেনের মতো পার্থিব বিষয়াবলি।

পরামর্শকারীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তা অনুসরণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দায়বদ্ধতার সীমা:

আমরা যদি বলি যে, নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন; তবে তাঁরা যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট মতের ওপর একমত হতেন, তবে কি তাঁর জন্য সেই মতটি গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল? নাকি তাঁর জন্য নিজের দেখা মত অনুযায়ী চলার মাধ্যমে তাঁদের বিরোধিতা করার অধিকার ছিল?

আমরা বলব: ফকিহগণ এই প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তরে একমত হতে পারেননি। আর কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারার কারণ হলো মহান আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের মতপার্থক্য: **"অতঃপর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।"** [আলে ইমরান: ১৫৯]। এই মতপার্থক্য মূলত দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে:

প্রথমত: আয়াতে বর্ণিত নির্দেশটি কেবল পরামর্শ গ্রহণের আবশ্যকতাকে নির্দেশ করে। সুতরাং নবী ﷺ যখন কোনো বিষয়ে পরামর্শের কাজ শেষ করে সংকল্প করতেন, তখন তাঁর জন্য সেই পথে এগিয়ে যাওয়া এবং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা বৈধ ছিল। অর্থাৎ পরামর্শের বিষয়টি প্রারম্ভিক পর্যায়ে ওয়াজিব ছিল, চূড়ান্ত পর্যায়ে নয়। এর অর্থ হলো: তিনি শুরুতে পরামর্শ করতেন ঠিকই, কিন্তু পরামর্শের ফলাফল নবী ﷺ-এর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না।

দ্বিতীয়ত: অন্যদিকে অপর একটি মত এই যে, পরামর্শ (শুরা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক। এর অর্থ হলো, পার্থিব কোনো বিষয়ে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন পরামর্শ করা ওয়াজিব; আর যে বিষয়ে কোনো ওহি অবতীর্ণ হয়নি, সে বিষয়ে পরামর্শ ব্যতীত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। পরামর্শকারীগণ যখন কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তখন সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এর সপক্ষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণীটি দলিল হিসেবে পেশ করা হয় যা তিনি আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "যদি তোমরা কোনো পরামর্শে একমত হও, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না।" এছাড়া আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'আযম' (দৃঢ় সংকল্প) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ এবং এরপর তাদের অনুসরণ করা।"

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, যারা বলেন পরামর্শ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক—অর্থাৎ পরামর্শকারীগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব—তাদের এই অভিমতটিই গ্রহণীয় হওয়ার অধিক উপযুক্ত এবং অগ্রগণ্য। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি নবুওয়াতের যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল থেকে মুক্ত (মাসুম) এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র ছিলেন। ফলে তিনি যদি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, এমনকি তা যদি পরামর্শকারীগণের সিদ্ধান্তের পরিপন্থীও হতো, তবুও তাঁর সিদ্ধান্তই হতো সঠিক। আর যদি তা না-ও হতো, তবে ওহি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। কিন্তু নবুওয়াতের যুগের অবসান এবং ওহি বন্ধ হওয়ার পর যদি বলা হয় যে, পরামর্শ শুরুতে ওয়াজিব হলেও শেষে তা বাধ্যতামূলক নয়, যাতে শাসক চাইলে পরামর্শকারীগণের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করতে পারেন—তবে আমরা বলব: এই মতটি আমরা গ্রহণ করি না। কারণ এটি একদিক থেকে শুরা বা পরামর্শকে কেবল একটি লৌকিক ও কাল্পনিক বিষয়ে পরিণত করে; এর ফলে শাসক কেবল পরামর্শ করার মাধ্যমেই তার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বিবেচিত হবে, যদিও তিনি উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপরীতে আগে থেকেই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাকেন।

অন্যদিকে, এই অভিমতটি স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত করে, যার চূড়ান্ত পরিণতি দাঁড়ায় পরামর্শ সভার সদস্যদের

মতামতের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব না দেওয়া। অথচ তারা হলেন...

শরয়ী রাজনীতি
অষ্টম পাঠ

উম্মাহর আলেমগণ এবং 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ' এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামী শরীয়াহ কোনোভাবেই একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারকে সমর্থন করে না। একজন শাসক এমন তাগুত হবে যে মানুষের ওপর বড়ত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে চাইবে—তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বরং শাসকের জন্য আবশ্যক হলো ইজতিহাদ করার যোগ্য ব্যক্তিবর্গ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার অনুগত হওয়া এবং তাদের মতামতের কাছে নতি স্বীকার করা।

এই বিষয়টি আলী (রা.) থেকে বর্ণিত নবি (সা.)-এর একটি হাদিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেন: ((আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সামনে যদি এমন কোনো বিষয়ের উদ্ভব হয় যার সমাধান কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি এবং আপনার সুন্নাহতেও তা অতিবাহিত হয়নি? তিনি বললেন: তোমরা মুমিনদের মধ্য থেকে ইবাদতকারী—অথবা বলেছেন: আলেমদের—একত্রিত করো এবং বিষয়টিকে তোমাদের মাঝে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করো। কেবল একজনের মতামতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না।)) কারণ পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তবে তা পরামর্শের প্রয়োগ ও এর ওপর আমল করার বিষয়টিকে সংকীর্ণ করে ফেলে, যা এই সামগ্রিক ওয়াজিব (আবশ্যকীয় বিধান) বিলুপ্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পরামর্শের প্রয়োগ:

নবুওয়াত পরবর্তী যুগের এই মূলনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু ফকীহ পরামর্শের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন এবং এমন প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ করাকে আবশ্যক করেছেন যে বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তবে আকিদা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিষয়সমূহ এর বহির্ভূত রাখা হয়েছে; কারণ এ বিষয়ক দলীলসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত এবং এতে পরামর্শের কোনো সুযোগ নেই।

এই বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়, চাই তা যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত অন্য কোনো বিষয় হোক—যদি তা শরয়ী বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরামর্শ করা আবশ্যক। এটি মূলত আমাদের ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা সেই মতামতের ওপর ভিত্তি করে যা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর যুগে কার্যকর ছিল। সাহাবীগণের যুগে সংঘটিত ঘটনাবলিও এই মতের সপক্ষে প্রমাণ দেয়। তারা খিলাফতের বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন, মুরতাদদের বিষয়ে কী করা হবে তা নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন, দাদার অংশ ও তার মিরাস নিয়ে এবং মদ্যপানের দণ্ড ও তার পরিমাণ নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন। এছাড়া যুদ্ধের বিষয়াবলি ও অন্যান্য বিষয়েও তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

শরয়ী রাজনীতি

অষ্টম পাঠ

আবু বকর (রা.)-এর নিকট যখন কোনো সমস্যা উপস্থাপন করা হতো, তখন তিনি এর বিধান অনুসন্ধান করতেন। প্রথমে তিনি পবিত্র কুরআনে তালাশ করতেন; যদি সেখানে ফয়সালা করার মতো কিছু পেতেন, তবে তা দিয়েই বিচার করতেন। আর যদি কুরআনে সেই বিষয়ের কোনো বিধান না থাকতো, তবে তিনি সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। সেখানে কোনো সমাধান পেলে তা দিয়েই ফয়সালা করতেন। কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও বিধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতেন: "আপনারা কি জানেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) এই বিষয়ে কোনো ফয়সালা করেছেন?" যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ নবী (সা.)-এর কোনো ফয়সালার কথা জানাতো, তবে তিনি তা দিয়ে ফয়সালা করতেন। অন্যথায় তিনি লোকজনকে একত্র করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন; তারা কোনো মতের ওপর ঐক্যমতে পৌঁছালে তিনি সেই অনুযায়ী ফয়সালা করতেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তবে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি আবু বকর (রা.) যে নীতি অবলম্বন করতেন তাও পালন করতেন। যদি তিনি এই উৎসগুলোতে কোনো বিধান না পেতেন, তবে পরামর্শদানকারীদের সাথে আলোচনা করতেন এবং তারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তা অনুসরণ করতেন। তিনি কোনো বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকৃতি জানাতেন। যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর সামনে আসতো, তিনি প্রবীণ সাহাবী ও আহলে বদরদের একত্র করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন।

উসমান (রা.)-ও এই পদ্ধতির ওপর চলেছেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর শুরার (পরামর্শের) গুরুত্ব ও মর্যাদা অটুট ছিল। পরবর্তীতে খলীফা উসমান (রা.)-এর শাসনামলে যখন বনু উমাইয়ারা শাসনকার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তখন এই আবশ্যিক বিষয়টি পালনে অবহেলা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিই শেষ পর্যন্ত তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত গড়ায়। উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর এবং সাধারণ মানুষের বায়আতের মাধ্যমে আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর শুরার সেই হৃত মর্যাদা পুনরায় ফিরে আসে এবং তিনি এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

আহলে শুরা (পরামর্শ সভার সদস্য) নির্ধারণ এবং তাদের মধ্যে যেসব শর্ত থাকা আবশ্যক:

আহলে শুরার সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ফকীহগণ যখন আহলে শুরা এবং উম্মাহর নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন এই শর্তগুলো বর্ণনা করেছেন। সেসব শর্তের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিম্নরূপ:

ইসলামি রাজনীতি

অষ্টম পাঠ

প্রথম শর্ত: ইসলাম: এটি একটি অনিবার্য শর্ত; কারণ ইসলামি রাষ্ট্র আকিদাগত ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিজগত সম্পর্কে শরিয়তপ্রদাতার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে বা রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণে এমন কারো অংশগ্রহণ বৈধ নয়, যে ইসলামে

বিশ্বাস করে না। এই শর্তটি সর্বসম্মত এবং এটি ইসলামি রাষ্ট্রের জনশৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় শর্ত: আকল (বুদ্ধিমত্তা): এটি সকল শরয়ী বিধানের জন্য একটি স্বতঃসিদ্ধ শর্ত। তেমনিভাবে এটি সকল সাধারণ ও বিশেষ পদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

তৃতীয় শর্ত: লিঙ্গ: অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন যে, 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যক। শুরার সদস্যরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা বিষয়টি এমন মনে করি না; কারণ এই নিষেধাজ্ঞা কেবল খিলাফতের পদের জন্য সীমাবদ্ধ, অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক নয়।

চতুর্থ শর্ত: ইলম (জ্ঞান): এর অর্থ হলো শুরার সদস্যদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্তরের জ্ঞান থাকতে হবে যা তাদের পরামর্শ সভার সদস্য হওয়ার যোগ্য করে তুলবে এবং আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা তাদের থাকবে।

পঞ্চম শর্ত: সঠিক প্রজ্ঞা ও হিকমত: ইলমের পাশাপাশি শুরার সদস্যদের অবশ্যই সঠিক মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও হিকমত থাকতে হবে; যাতে তারা তাদের বিচারবুদ্ধি ও হিকমতের মাধ্যমে এমন উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যা শরিয়তপ্রদাতার উদ্দেশ্য এবং ইসলামি সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ষষ্ঠ শর্ত: আদল (ন্যায়পরায়ণতা): এর দ্বারা তাকওয়া, পরহেজগারি, সততা ও আমানতদারি রক্ষা করা এবং ইসলামের নিদর্শনাবলি ও লক্ষ্যসমূহ আঁকড়ে থাকাকে বোঝায়। এজন্যই ইমাম কুরতুবি সুফিয়ান সাওরি থেকে শুরার সদস্যদের মধ্যে তাকওয়া ও নিরাপত্তার আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। তবে লক্ষ্যণীয় যে, শুরার আবশ্যকতা সাব্যস্ত করার অর্থ এই নয় যে, বিষয়ের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, প্রতিটি মাসআলায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর সকলের সাথে পরামর্শ করতে হবে। বরং উপস্থাপিত বিষয়ে কেবল সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা আবশ্যক, যা ইমাম কুরতুবি স্পষ্ট করেছেন।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

অষ্টম পাঠ

যেখানে তিনি এমন একটি অভিমত ব্যক্ত করেন যার সারকথা হলো: শাসকদের জন্য আবশ্যক হলো তারা যা জানেন না সে বিষয়ে আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করা, এবং দ্বীনি বিষয়ের যা তাদের নিকট অস্পষ্ট মনে হয় সে ব্যাপারেও; আর সামরিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ এবং প্রশাসনিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া।

কুরতুবী বলেন: শাসকদের জন্য ওয়াজিব হলো তারা যা জানেন না সে বিষয়ে আলেমদের সাথে পরামর্শ করা এবং দ্বীনি বিষয়ের যা তাদের নিকট অস্পষ্ট মনে হয় সে ব্যাপারেও; আর যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গের সাথে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে এবং দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের বিষয়ে লেখক (সচিব), উজির ও কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করা। কুরতুবী আরও সাব্যস্ত করেন যে, পার্থিব বিষয়ে পরামর্শদাতার গুণাবলী এই যে, তাকে বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ এবং পরামর্শপ্রার্থীর প্রতি হিতৈষী হতে হবে; যেমন তাকে ফতোয়া প্রদানকারী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ফকীহগণ এমন মজলিসের সহায়তা নিতেন যাতে ফিকহ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ আলেম ও বিশেষজ্ঞগণ অন্তর্ভুক্ত থাকতেন।

পক্ষান্তরে যদি পরামর্শের বিষয়টি সকল মুসলমানের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তাতে কোনো বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতা বা বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন না হয়, তবে সকল মুসলমানের অভিমত গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। পরামর্শদাতার পরিধি ততটাই বিস্তৃত হয় যতটা শুরার বিষয়বস্তু মুসলমানদের কোনো মৌলিক স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এই অভিমতটি উমর-এর অনুসৃত

পদ্ধতির মাধ্যমে সমর্থন পায়, যখন তিনি ইরাক ও শামের ভূমি থেকে আল্লাহ মুসলমানদের যা ফায় (লব্ধ সম্পদ) হিসেবে দান করেছিলেন তা বণ্টনের ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো: শুরা সদস্যদের জন্য কি ইসলাম শর্ত?

শুরা সদস্যদের মধ্যে যে সকল শর্ত থাকা আবশ্যক তা আমরা ইতোপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে: এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর জন্য ইসলাম একটি অপরিহার্য শর্ত যা থাকা আবশ্যক, যেমন এটি সর্বসাধারণের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী প্রত্যেকের জন্য একটি অনিবার্য শর্ত।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ
অষ্টম পাঠ

ইসলামি রাষ্ট্রে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যেখানে বিদেশি বা বহিরাগত অভিজ্ঞতার সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়; তবে কি এটি ইসলামি আইনের নিয়মাবলি লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে?

এখানে আমাদের দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক:

প্রথম বিষয়: আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। আহলুশ শুরার (পরামর্শ সভা) সদস্যদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের শর্তটি একটি অপরিহার্য ও অবধারিত শর্ত, যা বিদ্যমান থাকা জরুরি। কারণ এই শর্তটি ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক শাসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাই শুরার সেই পরিধিতে অমুসলিমদের অংশগ্রহণের অবকাশ নেই যার উদ্দেশ্য হলো আইনি নীতিমালা প্রণয়ন করা। এটি মূলত সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনো অকাট্য বিধান (নস) নেই; কারণ নস বিদ্যমান থাকলে সেখানে নতুন গবেষণার (ইজতিহাদ) সুযোগ নেই। ফলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত শুরার ক্ষেত্র থেকে অমুসলিমদের বাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিষয়: অন্যদিকে বাস্তবায়ন বা নির্বাহী ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিশুদ্ধ কারিগরি বিষয়াবলিতে অমুসলিমদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের মতে এটি ইসলামের নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং ইসলামি সমাজের কল্যাণের সাথে সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা ইসলামি রাষ্ট্রের সাধারণ কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং অমুসলিমদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করাকে আমরা একটি বৈধ বিষয় মনে করলেও তা বাধ্যতামূলক রূপ পরিগ্রহ করবে না—অর্থাৎ সেই অনুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য হবে না। কারণ এটি মেনে নিলে অমুসলিমদের মুসলিমদের ওপর সাধারণ কর্তৃত্বের অধিকার প্রদান করা হয়, যা বিধানদাতার অকাট্য দলিলে নিষিদ্ধ; যেহেতু এটি ইসলামি রাষ্ট্রের সামগ্রিক শৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং এটি একটি বিবেচনামূলক বিষয় যা উপযোগিতা এবং মুসলিম উম্মাহর সাধারণ স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে।

শুরার বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের পদ্ধতি এবং আহলুশ শুরার সদস্যদের নির্বাচনের উপায়:

ইসলামি বিধানদাতা শুরার যে বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছেন তা কীভাবে প্রয়োগ করা হবে—সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের এই নীতির আবশ্যকতা, অনিবার্যতা ও নিশ্চয়তা এবং এর পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে...

অষ্টম পাঠ

সিয়াসা শরইয়্যাহ (ইসলামী শাসননীতি)

বাস্তবায়ন: আমাদের অবশ্যই মূলনীতি এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। ইসলাম যেহেতু শূরা বা পরামর্শকে আবশ্যক করেছে এবং এই আবশ্যিকতার প্রেক্ষিতে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মাহর অধিকার নিশ্চিত করেছে; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ তা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন; উপরন্তু একে যেহেতু তাঁর শরীয়ত ও বিধানের প্রতি অনুগত মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে—সেহেতু এই বিষয়টি কোনোভাবেই এমন কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না যার ফলে মূলনীতি এবং এর প্রয়োগরীতির মধ্যে গোলমাল পেকে যায়। এই বিধিটি মূলত একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি ঘোষণা করে, যা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। পক্ষান্তরে, এই মূলনীতি কার্যকর করার ফলে উদ্ভূত বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও প্রয়োগের রূপরেখা ভিন্ন বিষয়। ইসলামী শরীয়ত শূরা বা পরামর্শের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত খুঁটিনাটি বর্ণনা করা এড়িয়ে গেছে। শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব ও এর উপযোগিতার দাবীই হচ্ছে এমন পথ অবলম্বন করা, যাতে এটি কাল ও পাত্রের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সকল বিবর্তনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

কেননা, প্রয়োগের রূপরেখাগুলো সমাজের পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইসলামী শরীয়ত যদি প্রয়োগের রূপরেখা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পথ অনুসরণ করত, তবে গবেষকদের নিকট এটি স্থবির হিসেবে প্রতীয়মান হতো, যা সমাজের বিবর্তনের মুখে টিকে থাকতে সক্ষম হতো না। তাছাড়া, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো নিয়ম বা পদ্ধতি সম্পর্কে এমনটি বলা যায় না যে, তা সর্বকালের জন্য উপযোগী। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সহজ-সরল পরিবেশের জন্য যা উপযুক্ত ছিল, ইসলামের বিস্তৃতি ও বিবর্তনের পর এবং সূচনালগ্নের মুসলমানদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতি ও অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পর তা প্রয়োগের উপযোগী থাকা সম্ভব নয়। এই কারণেই পবিত্র কুরআন কেবল এই মূলনীতির আবশ্যকতা ও অনিবার্যতার—অর্থাৎ শূরার মূলনীতির—অকাট্য বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁর যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শূরার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী নির্ধারণ করে দিতেন, তবে মুসলমানরা তাকেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিত এবং প্রত্যেক যুগে ও স্থানে তা পালনের চেষ্টা করত, অথচ বিষয়টি দ্বীনের (আবশ্যকীয় ইবাদত সংক্রান্ত) কোনো বিষয় নয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে শূরার মূলনীতির বিস্তারিত বিবরণ উম্মতের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অধিকতর সঠিক কাজ, যাতে তারা প্রত্যেক অবস্থায় নিজেদের জন্য যা উপযুক্ত ও কল্যাণকর তা নির্ধারণ করে নিতে পারে।

আশ-শারইয়্যাহ (ইসলামী শাসননীতি)

অষ্টম পাঠ

আর এর পথ বা উপায়টি কেবল শুরা বা পরামর্শের মূলনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। শুরার বাহ্যিক রূপ এবং বিস্তারিত

খুঁটিনাটি বিষয়ে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তা যুগ ও সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বদা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে শর্ত হলো তা যেন শুরার মূল স্তম্ভের কোনো ক্ষতি না করে। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ এই ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো নিয়ে এসেছে তা অপরিবর্তনীয়; কেননা সেগুলো এমন সাধারণ নীতি ও প্রশস্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ যা সময় বা স্থানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না।

এই কারণে, ইসলামী শরীআতকে এই অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা যে—এটি শুরার প্রয়োগ ও পদ্ধতির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিস্তারিত কাঠামো নির্ধারণ করেনি—মূলত ইসলামী ব্যবস্থার প্রকৃতি ও এর বাস্তবতা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা উন্মোচন করে। কেননা মূলনীতি এবং সেই নীতি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সকল মানুষের জন্য এক শাশ্বত আহ্বান এবং চিরন্তন বাণীরূপে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। তাই লেনদেন এবং সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীআত কেবল কিছু অপরিবর্তনীয় সামগ্রিক নীতিমালা এবং ব্যাপক মূলনীতি প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক ও অনিবার্য ছিল। কিন্তু বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিমালাগুলো সমাজের প্রতিটি নতুন বিবর্তন বা উন্নয়নের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ রাখে। সুতরাং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির ওপর সীমাবদ্ধ নয় যা থেকে কখনোই বিচ্যুত হওয়া যাবে না; বরং এটি এমন সাধারণ নিয়ম ও প্রশস্ত নীতি প্রদান করে যা সর্বদা সমাজের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাজ পরিচালনার জন্য বিধানদাতার নির্ধারিত শিক্ষাগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করি।

বিধানদাতা (আল্লাহ) কেবল সামগ্রিক নিয়মের আকারে কিছু সাধারণ নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমেই ক্ষান্ত হয়েছেন যা বিস্তারিত নয়; যাতে পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এই সকল খুঁটিনাটি বিষয় ও প্রয়োগিক পদ্ধতির জালে আবদ্ধ হয়ে না পড়ে। বরং বিধানদাতা একে উম্মাহর ইচ্ছাধীন রেখেছেন যাতে তারা সময় ও স্থানের চাহিদা অনুযায়ী তাদের জন্য যা উপযুক্ত তা নির্ধারণে স্বাধীন থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরীআতের অঙ্কিত নিয়ম ও বিধানের সীমানার মধ্যে অবস্থান করে।

৩৬৫

পৃষ্ঠা 66

অষ্টম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

এই ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে দুটি বিষয় সামনে আসে:

প্রথম বিষয়: সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা যেসব নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন—যার মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত—তা এমন কোনো স্থবির ছাঁচে ঢালা নয় যা কেবল একটি পদ্ধতিতেই বাস্তবায়নযোগ্য। বরং বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, এবং তা পরিবর্তন বা পরিমার্জনের কোনো সুযোগ নেই। তবে বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও প্রয়োগের ধরন পরিবর্তন এবং বিবর্তনের উপযোগী। প্রতিটি প্রজন্মের দায়িত্ব হলো লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা এবং তারপর পরিবেশের পরিস্থিতি ও যুগের প্রয়োজনের আলোকে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত সকল মাধ্যম থেকে উপকৃত হতে হবে, যার দিগন্ত উন্মোচনের নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের দিয়েছেন। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। যেকোনো সময়ের যেকোনো প্রজন্ম সর্বদা দেখবে যে, শরীয়তের মূল পাঠসমূহ (নসূস) নতুন নতুন প্রয়োজন ও বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট ব্যাপকতা রাখে।

দ্বিতীয় বিষয়: শরীয়ত যেসব সামগ্রিক নীতিমালা ও ব্যাপক মূলনীতি নিয়ে এসেছে, সেগুলো বাধ্যতামূলক আবশ্যকতা এবং সুনির্দিষ্ট কর্তব্য হিসেবে অপরিবর্তিত থাকে। এগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক এবং কোনো অবস্থাতেই এগুলোর বাইরে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ এগুলো ইসলামী ব্যবস্থার সাধারণ কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে, যা কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর গ্রহণ করে না।

অতএব, মূলনীতি অপরিবর্তনীয় এবং এতে কারও নিজস্ব মতামতের অবকাশ নেই, এমনকি উম্মাহরও তা পরিবর্তন করার

অধিকার নেই। তবে বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও প্রয়োগের রূপগুলো পরিবর্তনশীল ও বিবর্তনযোগ্য, যা মূল বিষয়ের কোনো বিরোধিতা করে না কিংবা এতে নতুন কিছু যোগ করে না। জনকল্যাণের প্রয়োজনে যেকোনো সময় উম্মাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তারা বিদ্যমান পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করবে।

এখন আমাদের সামনে অবশিষ্ট কাজ হলো, মূলনীতি এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের যে প্রয়োজনীয়তা আমরা স্পষ্ট করেছি, তার আলোকে আহলুশ শূরা (পরামর্শ সভার সদস্য) নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা। কেননা শূরা উম্মাহর এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে যে...

অষ্টম পাঠ

শাসনে অংশগ্রহণ, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর পরিচালনা এবং সেই মূলনীতি নির্ধারণের মাধ্যমে সমাজের দুই পক্ষ—একদিকে শাসক এবং অন্যদিকে শাসিত—এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর পরিচালনায় পুরো জনগণেরই অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, কিন্তু তা মূলত দুটি কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়:

প্রথমত: ইসলাম কেবল সংখ্যার আধিক্যের প্রতি গুরুত্ব দেয় না; বরং গুরুত্ব দেয় ঈমানের শক্তি, তাকওয়া, জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ইসলামি আইনের ওপর পারদর্শিতার ওপর। ফলস্বরূপ, স্বল্প সংখ্যক আলেমের মতামত এক বিশাল অজ্ঞ জনগোষ্ঠীর মতামতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। আর এর সপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে দলিল গ্রহণ করা হয়: "বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য আপনাকে বিস্মিত করে।" [আল-মায়িদাহ: ১০০]। আস-সারখাসি উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান মনে করেন, অধিকাংশ মতামতের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই অগ্রাধিকার (তারজীহ) নির্ধারিত হবে। তবে সারখাসি, মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের এই মতের বিরোধিতা করে বলেন: এটি আমাদের ফকিহগণের নিকট অগ্রাধিকার নির্ধারণের যে সুস্পষ্ট মাজহাব রয়েছে তার পরিপন্থী। কারণ, সংখ্যাধিক্যের আধিক্য দ্বারা অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হয় না। মহান আল্লাহর বাণীর বাহ্যিক অর্থও এর ওপরই প্রমাণ পেশ করে: "তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা ব্যতীত।" [হুদ: ১১]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।" [গাফির: ৫৭]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন, অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়।" [ইউসুফ: ১০৩]।

দ্বিতীয়ত: বাস্তবিকভাবে প্রতিটি বিষয়ে সকল মুসলমানের অংশগ্রহণ করা অসম্ভব, এমনকি প্রথম কারণটিকে আমরা যদি বিবেচনায় না-ও নেই। কারণ, জাগতিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং পরামর্শ করতে পুরো জাতিকে এক জায়গায় একত্রিত করা অসম্ভব। ইবনে হাযম যখন সেই মতের বিরোধিতা করেছিলেন—যেটিতে খলিফা নির্বাচনের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, ইসলামি বিশ্বের সকল প্রান্তের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ (ফাযালাউল উম্মাহ) সকলে মিলে সেই নির্বাচন সম্পন্ন করবেন—তখন তিনি এই বিষয়টিই উদ্দেশ্য করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে, এটি সাধ্যাতীত বিষয়ের বাধ্যবাধকতা প্রদান করা, যা সাধ্যের বাইরে। আর এই ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের এক শতাংশকেও একত্রিত করার পূর্বেই মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় বিষয়াদি ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যদিকে, আমরা যদি মেনেও নেই যে...

অষ্টম পাঠ
শারঈ রাজনীতি
পুরো জনসমষ্টিকে এক ময়দানে সমবেত করা অসম্ভব হওয়ার কারণে, যদি তা সম্ভবও হতো, তবুও জনসমষ্টির মতামতের ভিন্নতা এবং ঝোঁকের বৈচিত্র্যের ফলে কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। এছাড়া বিষয়টি এমন কোনো নিছক কারিগরি বিষয়ের সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে যা অধিকাংশ মানুষের কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে। আর তাই এসব কারণে তাদের সবার কাছে ফিরে যাওয়া নিরর্থক; ফলে পরামর্শ সভা (আহলুশ শুরা) গঠনে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা তাদের নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হয়।

নবুওয়াতের যুগে সংঘটিত পূর্ববর্তী ঘটনাবলি পর্যালোচনার সময় আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছি যে, কীভাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের তাদের নেতাদের কাছে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন—অর্থাৎ যারা তাদের কাছে পরিচিত—যাতে তারা বিষয়টি তাঁর কাছে পেশ করতে পারে। যেমনটি আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত বর্ণনায় উল্লেখ করেছি। আর পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচনে পুরো জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য; কারণ আল্লাহর বাণী: "তাদের কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" সমগ্র সমাজকে নির্দেশ করে। শরীয়ত প্রণেতা অন্যদের বাদ দিয়ে সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীকে পরামর্শের দাবি পূরণের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। এখানে সুপরিচিত বিষয়টি হলো মুসলমানদের কাজ যা তাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। অতএব, প্রত্যেক মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, সে পুরুষ হোক বা নারী, যাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান তাদের পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা ভোট প্রদান এবং মতামত প্রকাশের অধিকারে সকল মুসলিম সমান।

শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় বিষয়ের ন্যায় পরামর্শ করাও আবশ্যক। এতে গোত্রপ্রীতি বা কোনো মতের প্রতি অন্ধভক্তির কোনো অবকাশ নেই—তবে কেউ যদি একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে সেটিই সঠিক মত। এছাড়া সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করা অপরিহার্য এবং জামাআত যেখানে অবস্থান করে সেখানে অবস্থান করা জরুরি। পরামর্শ সভায় (মজলিসে শুরা) দলপ্রীতি বা উপদলীয় কোন্দলের কোনো স্থান নেই; কারণ ইসলাম পরামর্শ সভার সদস্যদের দলাদলি করতে এবং ভুল মতের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে নিজ নিজ দলের পক্ষ নিতে নিষেধ করে। বরং ইসলামী ব্যবস্থার দাবি হলো, তারা সত্যের (হক) সাথে আবর্তিত হবে সত্য যেখানেই থাকুক এবং তা থেকে বিচ্যুত হবে না। কোনো ব্যক্তির কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তার মতটি সঠিক নয় এবং তা সত্যের পরিপন্থী, তখন তার নিজের মত পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আর মজলিসে শুরা যদি এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে তার ওপর কোনো দোষারোপ নেই যদি...

অষ্টম পাঠ

সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসা যায় যদি পরবর্তীতে স্পষ্ট হয় যে সেই মতটি ভুল ছিল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুসরণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় যদি তা কোনো স্পষ্ট প্রমাণ (নস) কিংবা শরীয়তের কোনো সামগ্রিক মূলনীতির পরিপন্থী হয়, অথবা বৈধতার কোনো প্রমাণের বিরোধী হয়, তবে এই বিষয়ে ইসলামী শরয়ি বিধানসমূহ যা নির্ধারণ করেছে সে অনুযায়ী হতে হবে।

পরামর্শ সভার সদস্যদের (আহলুশ শুরা) মত পালনের বাধ্যবাধকতার সীমা এবং এ বিষয়ে ফকীহগণের মতামতের বর্ণনা:

ইসলামী শরীয়তে পরামর্শ (শুরা) শাসক ও শাসিত—উভয়ের জন্যই এক অপরিহার্য কর্তব্য। ফলে এটি উম্মতের আলেম সমাজকে—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি—রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করে, যেসব বিষয়ে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। আর এই অর্থে তা জনক্ষমতার দায়বদ্ধতাকে উন্নত করে।

নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

শাসক ও শাসিত—উভয়ের জন্যই পরামর্শ করা ওয়াজিব। তাই পরামর্শ করার বাধ্যবাধকতা কেবল খলিফা কিংবা অন্যান্য প্রশাসক ও শাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মুসলমানই এতে দায়বদ্ধ। এটি একদিকে যেমন তাদের মৌলিক অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, তেমনি অন্যদিকে এটি তাদের স্কন্ধে অর্পিত দায়িত্বাবলির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, সে যেন তাকে পরামর্শ দেয়।" এবং তাঁর বাণী: "এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের অন্যতম অধিকার হলো—যখন সে তার কাছে সদুপদেশ চাইবে, তখন সে যেন তাকে সদুপদেশ দেয়।"

পাশাপাশি বিধানদাতা (আল্লাহ) তাঁর রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিনদের জন্য এটিকে একটি আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এই মুমিনগণ তারা যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাঁর দ্বীনের রুকনসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের কাজসমূহ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। ফলে বিধানদাতা তাদের প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে, তারা কোনো বিষয়ে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না; বরং যে বিষয়ে তারা ঐকমত্য পোষণ করে না তাতে অগ্রসর হয় না। এর মাধ্যমে বিধানদাতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই দ্বীনের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত, যেমন...

অষ্টম পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (শরিয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)

এই ওয়াজিব বা কর্তব্য অন্য দিক থেকে খলিফা এবং অন্যান্য শাসক ও গভর্নরদের ওপরও বর্তায়। মহান আল্লাহর এই পবিত্র আয়াতটি এরই প্রমাণ দেয়: "আর গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.), যিনি কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত একজন নিষ্পাপ (মাসুম) নবী এবং সকল ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে, তাঁকে যদি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরামর্শ করার আদেশ দেওয়া হয়, তবে তাঁর পরবর্তী শাসকদের জন্য এই কর্তব্য পালন করা আরও বেশি অগ্রগণ্য। তাদের জন্য এই প্রতিশ্রুতি আরও জোরালো এবং কঠোর; কারণ তাদের মধ্যে কোনো নির্ভুলতা (মাসুমিয়াত) নেই এবং তাদের ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ কারণেই ফকিহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পরামর্শ করার জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশটি তাঁর পক্ষ থেকে সাহাবীদের মতামতের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে ছিল না। বরং তিনি চেয়েছিলেন পরামর্শের যে মর্যাদা ও ফযিলত রয়েছে তা উম্মতকে শিক্ষা দিতে এবং যাতে তাঁর পরবর্তী উম্মত তাঁর অনুসরণ করতে পারে। তবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে শুরার এই পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি যেন ইসলামি শরিয়তের কোনো অকাট্য দলিল (নস) বা এর কোনো সামগ্রিক মূলনীতির পরিপন্থী না হয়। এমন ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে; অর্থাৎ শরিয়তে বর্ণিত কোনো মূলনীতির লঙ্ঘন ঘটলে তার কোনো আইনি কার্যকারিতা থাকবে না। সুতরাং যেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট অকাট্য দলিল বা সামগ্রিক মূলনীতি বিদ্যমান, সেখানে কোনো রায় বা

পরামর্শের মাধ্যমে তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়।

শুরা বা পরামর্শের আবশ্যকতা বাস্তবায়নে ইসলামি উম্মাহর ভূমিকা:

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পরামর্শ বা শুরা শাসক এবং শাসিত বা প্রজা উভয়ের ওপর সমানভাবে ওয়াজিব। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এই অর্থে শুরা উম্মাহর আলেম ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সমাধানকারী ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তি) মুজতাহিদদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। এটি তাদের উম্মাহর আইন বিভাগীয়, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগীয় সকল বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ করে দেয়। ফলে ইসলামি উম্মাহ যখন তার মুজতাহিদ এবং আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ আলেমদের মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করে, তখন তারা কেবল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে খলিফাকে পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তারা প্রধান ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। যখন এই ব্যক্তিবর্গ কোনো ব্যবহারিক বিধানের ওপর ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেন, তখন তা অনুসরণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে যায়।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

অষ্টম পাঠ

এটি জনসাধারণের কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োগযোগ্য এবং বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা ক্ষমতার চর্চা করেন, তাদের কেউ উম্মাহর সাথে এই আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে একজন মুজতাহিদ হয় এবং তার মধ্যে ইজতিহাদের বিশেষ শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে।

বাস্তবায়ন বা নির্বাহী ক্ষেত্রের ব্যাপারে বলতে গেলে, ইসলামি উম্মাহরও অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপর কর্তব্য হলো তারা যে সকল পদক্ষেপ নিতে চায়, সে ব্যাপারে শাসক কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। এজন্যই বিধানদাতা আল্লাহ পরামর্শকে (শুরা) তাঁর বার্তার প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের একটি গুণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যারা নিজেদের মতামতের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে না। অতএব, প্রজ্ঞাবান বিধানদাতা মুমিনদের মাঝে এই গুণের প্রশংসা করেছেন। আর বিধানদাতার পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ের প্রশংসা করার অর্থ হলো: এটি এমন এক আবশ্যকীয় বিষয় যা ইসলামি রাষ্ট্রে নিশ্চিত করা জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, তাদের যাবতীয় কার্যাবলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" [সূরা আশ-শুরা: ৩৮]। এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তাদের অর্পিত ক্ষমতা ও এখতিয়ারভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে তা মেনে চলতে বাধ্য। আর এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত বা খিলাফতের দাবি অনুযায়ী।

আমরা বলি: এই নির্বাহী কর্তৃপক্ষ উম্মাহর নিকট থেকে (যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে চূড়ান্তভাবে বাধ্য। আর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপর কর্তব্য হলো মতামত ব্যক্ত করা এবং ইসলামি উম্মাহর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা। অর্থাৎ: যারা পরামর্শ প্রদান করেন, তাদের ওপর এই পরামর্শ প্রদান করা ওয়াজিব। সুতরাং এটি একটি দায়বদ্ধতা যা তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে।

যেহেতু পরামর্শ করা খলিফা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য শাসকদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত, তাই কোনো কোনো ফকিহ এই মত পোষণ করেছেন যে, যে শাসক বা ওয়ালি নিজের মতামতের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি করে এবং পরামর্শ

গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। এমনকি এই মতটি এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে...

এই অবস্থায় অপসারণ বা বরখাস্তের বিষয়টি সর্বসম্মত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। যখন আমরা শুরা (পরামর্শ) এবং জনকর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করি, তখন আমরা বলি: আমরা ইতিপূর্বে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উম্মাহ যে ভূমিকা পালন করে, সেখানে উম্মাহর মুজতাহিদগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, জনকর্তৃপক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য। জনকর্তৃপক্ষের কোনো সদস্যের এই অধিকারে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, যদি না তিনি নিজে একজন মুজতাহিদ হন এবং তিনি ও উম্মাহর অন্যান্য মুজতাহিদগণ কোনো শরয়ী বিধানের ব্যাপারে একমত হন।

অতএব, ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী আইন প্রণয়নে উম্মাহর ভূমিকা কেবল শাসকের একার নয়। তার জন্য এতে স্বৈরাচারী হওয়া বা একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই; বরং এটি উম্মাহর অধিকার, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত সীমারেখা ও অবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

অন্যদিকে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে হোক কিংবা পরামর্শদাতারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা প্রয়োগের পর্যায়ে হোক—জনকর্তৃপক্ষের জন্য এই কর্তব্য পালন করা অনিবার্য। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়ে থাকে। ইমাম কুরতুবী হাসান (বসরী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যখনই কোনো জাতি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে তাদের সামনে উপস্থিত সর্বোত্তম বিষয়ের দিকে হেদায়েত দান করেন।" সুতরাং উম্মাহ যখন শুরার নীতি মেনে চলবে এবং সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিয়তকে খাঁটি করবে—আর যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে এবং সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে এটিই পরামর্শকারীদের মূল লক্ষ্য হয়—তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের পদক্ষেপসমূহকে সুদৃঢ় করবেন, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবেন এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে তাওফিক দান করবেন। কারণ ফকীহ ও আলেমদের সাথে পরামর্শ করা বিপদমুক্ত থাকার অধিকতর উপযোগী।

উম্মাহকে যদি এই অধিকার না দেওয়া হয় এবং জনকর্তৃপক্ষের কোনো সদস্য এতে একাধিপত্য বিস্তার করে, তবে উম্মাহর ওপর যে বিপদ আপতিত হবে তা নিশ্চিত এবং এটি একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমরা মনে করি, যে অভিমতটি বলে যে—যে শাসক উম্মাহকে এই অধিকার (অর্থাৎ শুরার অধিকার) থেকে বঞ্চিত করে, তা মেনে চলে না এবং নিজের মতামতে অটল থেকে স্বৈরাচারী আচরণ করে, তাকে অপসারণ করা আবশ্যক; আর এটিই সঠিক অভিমত।

অতএব, শুরাকে (পরামর্শ) সেই মৌলিক নিশ্চয়তা বা জামানতসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় যা শরিয়ত নির্ধারণ করেছে; যাতে এর শরয়ী নীতিমালা লঙ্ঘিত না হয়, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং শরিয়ত কর্তৃক লক্ষ্যভুক্ত ও কাম্য মৌলিক জনস্বার্থ থেকে বিচ্যুতি রোধ করা যায়।

শুরা সদস্য এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনীয় শর্তাবলি:

একদিকে নবুওয়াতের যুগে এবং অন্যদিকে প্রথম খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই মূলনীতির প্রয়োগকে স্পষ্টকারী নজিরসমূহ বিন্দুমাত্র সন্দেহাতীতভাবে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শুরার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমল করা অপরিহার্য এবং এর বিরোধিতা করা জায়েয নয়। আর যে বিরল ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মতামতের ভিত্তিতে আমল করা হয়েছে, সেখানে তার পেছনে গুরুতর ও জোরালো কোনো কারণ বিদ্যমান ছিল যা সেটিকে বৈধতা দেয়। যেমনটি প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)-এর যুগে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ঘটেছিল; তিনি এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ছিল তাদের সাথে যুদ্ধ না করা। কিন্তু তাঁর (রা.) মত ছিল এর বিপরীত; কারণ তারা এমন এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়েছিল যা ছাড়া ইসলামের শর্ত পূর্ণ হয় না, আর তা হলো তাদের জাকাত অস্বীকার করা এবং তা আদায় না করা। পরবর্তী ঘটনাবলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সঠিকতাকে নিশ্চিত করে। এমনকি আবু বকর (রা.)-এর বিরোধীদের মধ্য থেকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আবু বকরের বিরোধিতা করার ভুল স্বীকার করেছিলেন।

সুতরাং খলিফা এবং সাধারণ শাসনকর্তৃপক্ষের অন্যান্য সদস্যগণ সাধারণ নীতি হিসেবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত পরামর্শের ফলাফল অনুসরণ করতে বাধ্য, যতক্ষণ না এমন কোনো গুরুতর ও জোরালো কারণ পাওয়া যায় যা এই পরামর্শের ফলাফল থেকে সরে আসাকে অপরিহার্য করে তোলে। আর খলিফাই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই বিচ্যুতি বা সরে আসার কারণ নির্ধারণ করবেন। পাশাপাশি তিনিই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপরীতে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের ফলাফল ও দায়ভার বহন করবেন। অন্যদিকে তিনি সংখ্যালঘুর মতামত অনুসরণ করতেও বাধ্য নন, যদি না তাঁর কাছে এমন জোরালো যুক্তি থাকে যে সংখ্যালঘুর মতামতই ইসলামী সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ।

যদি খলিফা সংখ্যালঘু মতামতের ভিত্তিতে কাজ করেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরোধিতা করার দায়ভারও তাকে একাই বহন করতে হবে, যদি পরবর্তীতে এটি স্পষ্ট হয় যে সেই মতামত অনুসরণে তিনি ভুল করেছিলেন। আর খলিফা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তবে পরবর্তীতে সেই মতামতটি সঠিক না বলে প্রমাণিত হলেও তিনি দায়ী থাকবেন না। কারণ এক্ষেত্রে ভুলের দায়ভার খলিফা বহন করেন না, বরং সমগ্র উম্মাহ তা বহন করে। যদি তারা—অর্থাৎ শূরা বা পরামর্শ সভার সদস্যরা—ভুল করেন, তবে তারাই ভুলকারী; আর তারা যদি সঠিক হন, তবে তারাই সঠিক পথের অনুসারী। যুক্তির দাবি হলো—খলিফা বা সরকারি ক্ষমতার অধিকারী অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে শূরা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভুলের দায়ভার গ্রহণ করা সমীচীন নয়। অথচ শূরা সদস্যরা তাদের যোগ্যতার শর্তানুযায়ী উম্মাহর আলেম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে একটি মতামত উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেন: "যখনই কোনো বিষয় আমাকে দ্বিধান্বিত করেছে এবং আমি আমার কওমের সাথে পরামর্শ করে তাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করেছি, তখন আমি কখনো ভুল করিনি। কারণ যদি আমি সঠিক হই তবে তারা সঠিক ছিল, আর যদি ভুল হয় তবে তারা ভুল করেছিল।" ইমাম কুরতুবী অন্য এক স্থানে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুইন বলেছিল: "আমার কওম প্রতারিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কখনো প্রতারিত হইনি।" জিজ্ঞাসা করা হলো: "তা কীভাবে?" সে বলল: "আমি তাদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করি না।" এ কারণেই বলা

হয়েছে: পরামর্শের মাধ্যমে ভুল করা একক সিদ্ধান্ত ও স্বৈরাচারী উপায়ে সঠিক হওয়ার চেয়েও উত্তম। পরামর্শের ফলাফলের প্রতি খলিফার দায়বদ্ধতা যেমন তার নিজের ওপর থেকে দায়ভার লাঘব করে, তেমনি এটি উম্মাহকে সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে এবং ভবিষ্যতে সেই ভুল সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। এটি শাসকের একক মতামতের ভিত্তিতে কাজ করার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, যদিও সেই মতামত সঠিক হয়ে থাকে। কারণ কেবল শাসকের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া স্বৈরাচার ও কর্তৃত্ববাদের পথ প্রশস্ত করে, যা ইসলামি ফিকহ সমর্থন করে না। তাছাড়া উম্মাহর এভাবে ভুল করা অত্যন্ত বিরল ঘটনা, যা খুব কমই ঘটে থাকে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মাহ ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।" তিনি আরও বলেছেন: "মুসলমানরা যা উত্তম মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম।" তিনি আরও বলেছেন: "তোমরা বৃহত্তর জনসমষ্টিকে (সাওয়াদে আজম) অনুসরণ করো" এবং তিনি বলেছেন: "তোমরা জামাআত ও সাধারণ জনগণের সাথে থাকো।"

অতএব, উম্মাহর আলেম ও ফকিহদের মতামতের প্রতি দায়বদ্ধতা অধিকাংশ বিষয়ে সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করে।

শুরা এবং জাতির সার্বভৌমত্বের মূলনীতি:

আধুনিক যুগের কিছু আলেম মনে করেন যে, ইসলামে শুরার মূলনীতি জাতির সার্বভৌমত্বের ধারণা গ্রহণ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। তারা তাদের এই মতের সপক্ষে কিছু দলিলের ওপর নির্ভর করেন, যেমনটি তারা পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতের ওপরও নির্ভর করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই আয়াতগুলোর অর্থ থেকে এমন কিছু বিষয় উদ্ভাবন করা সম্ভব যা তাদের মতকে সমর্থন করে। নিম্নে আমরা তারা যেসব বিভিন্ন দলিলের ওপর নির্ভর করেন তা উল্লেখ করব, অতঃপর তার ওপর মন্তব্য ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তার জবাব প্রদান করব:

১. তারা যেসব বিভিন্ন দলিলের ওপর নির্ভর করেন:

প্রথমত: সেই আলেমগণ বলেন: ইসলামে জাতিকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রকৃত অধিকারের অধিকারী বিবেচনা করা হয়। অনুরূপভাবে, তারা যদি জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করেন তবে তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করার অধিকারও জাতির রয়েছে। এর অর্থ হলো: রাষ্ট্রপ্রধান কেবল জাতির কাছ থেকেই তার কর্তৃত্ব লাভ করেন; ফলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস ও সার্বভৌমত্বের মালিক। জাতি এবং তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যকার সম্পর্কটি হলো একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক, অর্থাৎ: এটি সামাজিক চুক্তির ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এখানে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের শপথ বা বায়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতির প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে এই চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' মূলত সার্বভৌম জাতিরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: এই আলেমগণ পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এবং মহানবীর কিছু হাদীসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন। তারা মনে করেন যে, এগুলো থেকে এ কথার প্রমাণ উদ্ভাবন করা সম্ভব যে, ইসলাম জাতির সার্বভৌমত্বের মূলনীতি গ্রহণ করে। সেই আয়াতসমূহের মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীটি অন্যতম: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।" [আন-নিসা: ১৩৫]। যেন মহান আল্লাহ এই আয়াতে জাতিকে সম্বোধন করছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও।" এবং মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা

করো, আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না..."

৩৭৫

পৃষ্ঠা 76

অষ্টম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

“...এবং সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।” [আল-মায়িদাহ: ২]। তারা এই আয়াতসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল মুসলিমকে সম্বোধন করেছেন এবং তারা এ থেকে এই সারসংক্ষেপ লাভ করেন যে, উম্মাহই হলো ক্ষমতার মূল ভিত্তি—যেমনটি তারা বলে থাকেন।

এই আয়াত দুটির পাশাপাশি পবিত্র কুরআনে আরও অনেক আয়াত পাওয়া যায় যেখানে সম্বোধন একইভাবে ইসলামী উম্মাহর প্রতি নিবদ্ধ। যা থেকে আমরা এ বিষয়ে প্রমাণ পাই যে, এই উম্মাহই মহান আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং জনস্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বহনকারী। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহকেই সার্বভৌমত্বের উৎস এবং ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশিষ্ট পণ্ডিত আবুল আলা মওদুদী ইসলামের পরামর্শের (শুরা) নীতি এবং উম্মাহর সার্বভৌমত্বের নীতির মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন: উম্মাহর সার্বভৌমত্ব হলো সেটিই যা ইসলাম আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে: **“এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।”** [আল-ইমরান: ১৫৯] এবং মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে: **“এবং তাদের কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।”** [আশ-শূরা: ৩৮]। এটি এমন একটি নীতি যেখানে দীর্ঘ সংগ্রামের পর মানবজাতি উপনীত হতে পেরেছে। অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এই নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকা আবশ্যক। মাওলানা মওদুদী আরও বলেন: মুসলিম রাষ্ট্রে জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত শাসকের পাশাপাশি তদারকি সংস্থা হিসেবে পার্লামেন্টের উপস্থিতি উম্মাহর সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করে।

আর পবিত্র হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে তারা—অর্থাৎ যারা শুরা এবং উম্মাহর সার্বভৌমত্বের নীতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন—এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীটি উল্লেখ করেন: **“আমার উম্মাহ কোনো ভ্রান্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।”** তাদের মতে, এই হাদীসে শরীফ এটিই নির্দেশ করে যে, ইসলামী উম্মাহ যখন কোনো নির্দিষ্ট মতের ওপর একমত হয়, তখন সেটিই সঠিক এবং তা গ্রহণ করা আবশ্যক; কারণ তা সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অধিকারীর পক্ষ থেকে অর্থাৎ উম্মাহর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৩৭৬

পৃষ্ঠা 77

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

২. শূরাকে জাতির সার্বভৌমত্বের নীতির সাথে যুক্তকারী এই মতামতের খণ্ডন:

ইসলাম যে শূরা নীতি প্রদান করেছে এবং আধুনিক সাংবিধানিক আইনশাস্ত্রে পরিচিত জাতির সার্বভৌমত্বের নীতি বা তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টাটি একটি অত্যন্ত জটিল ফিকহি সমস্যা সৃষ্টির অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, যারা উল্লিখিত দুই নীতির মধ্যে সমন্বয়ের এই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তারা হলেন সেইসব আলেম যারা অন্ধ অনুকরণের (তাকলিদ) নেশায় মত্ত এবং পশ্চিমা আলেম ও আইনবিদদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা রাখেন। একইভাবে ঐ আলেমদের মাঝে এই ভীতিও কাজ করে যে, ইসলামি ফিকহি চিন্তাধারায় প্রাচীন বা আধুনিক কোনো রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক তত্ত্বের অস্তিত্ব নেই; ফলে তারা যেন এর মাধ্যমে পশ্চিমা আইনবিদদের পক্ষ থেকে আসা পরিভাষাগুলোর সাথে তাল মেলাতে চান।

তবে এই দুই নীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে বের করার এই প্রচেষ্টাটি বাস্তবে কোনো সঠিক তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

আর এর সপক্ষে ইতিপূর্বে প্রদত্ত যুক্তিগুলোর জবাব নিম্নরূপভাবে দেওয়া যেতে পারে:

প্রথমত: জাতির সার্বভৌমত্বের নীতিটি হলো একটি আধুনিক তত্ত্বের ফসল, যার উৎপত্তি ফ্রান্সে। ফরাসি চিন্তাবিদ ফিলিপ্পো সর্বপ্রথম জাতির সার্বভৌমত্বের ধারণা সম্পর্কে কথা বলেন এবং তা ছিল ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে, যখন তিনি ফরাসি বিপ্লব-পূর্ববর্তী সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদের সামনে বক্তব্য রাখছিলেন। এটি ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা অষ্টম চার্লসের অভিভাবকত্বের বিষয়টি পর্যালোচনার সময়। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, ফরাসি জনগণই হলো সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক এবং তারাই রাজাকে এই অধিকার দান করেন। সুতরাং যতক্ষণ রাজা নাবালক থাকবেন, ততক্ষণ ফরাসি জনগণ বা প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদের এই অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ের ফরাসি রাজপুত্ররা মনে করতেন যে, অভিভাবকত্ব নির্ধারণের অধিকার কেবল তাদেরই।

ফরাসি জনগণের তুলনায় রাজা ছিলেন ক্ষমতাহীন। আর যখন ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হলো, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র জাতির। সুতরাং সেই মতবাদের শেকড়কে ইসলামের বিধি-বিধান এবং প্রাচীন ইসলামি চিন্তাধারার দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা সঠিক কোনো অভিমত নয়। কারণ আমরা প্রাচীন ফকিহ এবং ইসলামি চিন্তাবিদদের লেখনীতে জাতির সার্বভৌমত্ব মতবাদের কোনো ইঙ্গিত পাই না, কিংবা এর ধারণা বা ফলাফলের ওপর নির্ভর করার কোনো প্রমাণও পাই না। তেমনি আমরা তাদের নিকট শূরার (পরামর্শ) মূলনীতি এবং জাতির সার্বভৌমত্ব নীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এমন কোনো প্রচেষ্টাও খুঁজে পাই না, যা আমাদের বর্তমান যুগের আধুনিক আলেমগণ করেছেন।

বাস্তবতা এই যে, জাতির সার্বভৌমত্ব নীতির আধুনিক ধারণাটি ১৭৮৯ সালের ২৬শে আগস্ট জাতীয় পরিষদ কর্তৃক জারিকৃত ফরাসি মানবাধিকার ঘোষণার মাধ্যমেই কেবল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই ঘোষণার তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিই হলো সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং আধার। জাতির সার্বভৌমত্বের এই নীতিটি ১৭৯১ সালের সংবিধানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৭৯৫ সালের সংবিধানেও তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এভাবেই ফরাসি বিপ্লব জাতির সার্বভৌমত্ব মতবাদকে একটি

সাধারণ সাংবিধানিক নীতিতে পরিণত করেছে, যা অধিকাংশ রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামে ‘উম্মাহ’ বা জাতির ধারণা আধুনিক সাংবিধানিক আইনের জাতির ধারণা থেকে অনেক ভিন্ন। আধুনিক আইন যেখানে জাতিকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী একদল জনসমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যাদের সদস্যদের মধ্যে একত্রে বসবাসের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে; সেখানে আমরা দেখতে পাই যে ইসলামে ‘উম্মাহ’ শব্দের অন্য একটি তাৎপর্য রয়েছে যা উক্ত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। কখনও কখনও ‘উম্মাহ’ শব্দ দ্বারা কেবল কতিপয় ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, সকল ব্যক্তিকে নয়। এটি মহান আল্লাহর বাণী থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়: "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।" [আলে ইমরান: ১০৪]। এখানে আমরা দেখতে পাই যে মহান আল্লাহর বাণী:

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল যেন থাকে" - এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উম্মাহ বলতে সকল মুসলিম ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, বরং "তোমাদের মধ্য থেকে" শব্দটির উপস্থিতির কারণে সম্বোধনটি কেবল তাদের মধ্য থেকে একটি বিশেষ দলের দিকে নিবদ্ধ করা হয়েছে।

মুফাসসির উলামায়ে কিরামের নিকট অগ্রগণ্য মত হলো, আল্লাহ যে উম্মাহর নিকট কল্যাণের দিকে আহ্বান করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার প্রত্যাশা করেছেন, তারা হলো মুমিনদের জামাত। এটা স্পষ্ট যে, এই অর্থে উম্মাহ—অর্থাৎ জনসমষ্টির একটি অংশ হিসেবে—আধুনিক আইনতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিভাষায় পরিচিত 'উম্মাহর সার্বভৌমত্ব' মতবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এমনকি একদল আলিম ইসলাম শুরার ভিত্তিতে উম্মাহর সার্বভৌমত্ব নীতি গ্রহণ করে বলে যে আয়াতটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেটি হলো আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়" [আন-নিসা: ১৩৫]; এখানেও আমরা দেখি যে, এই আয়াতে সম্বোধনটি কেবল মুমিনদের প্রতি করা হয়েছে, যারা মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ, প্রচলিত অর্থে উম্মাহর সকল ব্যক্তি নয়।

শুরা এবং উম্মাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এই মতবাদের অন্যতম খণ্ডন হলো: উম্মাহর সার্বভৌমত্ব নীতি থেকে উদ্ভূত ফলাফলের ক্ষেত্রেও আমরা এই বিষয়ে ইসলামি চিন্তা ও সাংবিধানিক চিন্তার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাই। এই নীতির অন্যতম ফলাফল হলো, জাতির ইচ্ছাই হবে সাধারণ কর্তৃপক্ষ বা সার্বভৌমত্ব যার উপরে অন্য কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই এবং সেই সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ হলো আইন, যা উম্মাহর সার্বভৌমত্বকে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা একে কীভাবে প্রয়োগ করব? ইসলামে কি আইনপ্রণয়ন অধিকাংশ সদস্যের মর্জির বহিঃপ্রকাশ হওয়া সম্ভব, নাকি বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত? বরং আইনপ্রণয়ন সর্বপ্রথম ইসলামের বিধানসমূহকেই ব্যক্ত করে এবং এই বিধানগুলোই সার্বভৌমত্ব বা উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

অষ্টম পাঠ
শরয়ি রাজনীতি

তাই আমরা দেখতে পাই যে, এটি সত্যিই বিস্ময়কর মনে হয় যখন আমাদের কিছু আলেম ও চিন্তাবিদ ইসলামের পতাকাতলে এমন একটি তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন যা ইসলামের জন্য সম্পূর্ণ বিজাতীয়। অথচ একই সময়ে আমরা দেখি যে, এদেশের এবং পাশ্চাত্যের কিছু প্রথিতযশা সাংবিধানিক আইনবিদ সেই তত্ত্বটির—অর্থাৎ জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের—বিরোধিতা করছেন। তারা মনে করেন যে, যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে এই তত্ত্বটির উদ্ভব হয়েছিল তা এখন ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগে আমাদের আর এর কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া অনেকের ধারণার বিপরীতে এটি স্বাধীনতার জন্য একটি হুমকি হিসেবেও বিবেচিত হয়।

সারকথা হলো: যেহেতু ইসলামে পরামর্শের মূলনীতি এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের মূলনীতি বা তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় করা সঠিক নয়, তাই ইসলাম এই বিষয়টি বা সমস্যাটি উত্থাপন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। কারণ এই সমস্যাটি উত্থাপন করলে ইসলামি চিন্তাধারার কোনো সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, বরং এটি এমন একটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে যা থেকে বিমুক্ত থাকাই ইসলামি চিন্তাধারার জন্য শ্রেয়।

পরামর্শের মূলনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা:

একটি মত প্রচলিত আছে যে: ইসলামে পরামর্শের মূলনীতির মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ, এই মতানুসারে পরামর্শের মূলনীতির দাবি হলো সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হওয়া। কিছু আলেম এই মত পোষণ করেন যে, ইসলামে পরামর্শের মূলনীতি সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তারা কিছু যুক্তি ও প্রমাণ এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহর হাদীসের ওপর নির্ভর করেন। আমরা এই মতটি এর স্বপক্ষে উপস্থাপিত প্রমাণাদিসহ আলোচনা করার পর এর জবাব প্রদান করব।

মহান উস্তাদ আবুল আলা মওদুদী নির্বাচনের অধিকার এবং প্রার্থী হওয়ার অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

অষ্টম পাঠ

শারয়ী রাজনীতি

নির্বাচনের অধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা সম্পর্কে অভিমত হলো, দেশের লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি নাগরিকের প্রত্যেকেই এর অধিকারী। এই যোগ্যতার জন্য তিনি এমন কোনো শর্ত আরোপ করেন না যা সাধারণ নির্বাচনের নীতি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সংবিধানের কিছু ব্যবহারিক ধারা সেই যোগ্যতার মানদণ্ড ও শর্তাবলি বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শুরার (পরামর্শ) নির্দেশ: "আর তুমি কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করো" এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: "তাদের কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়", তেমনিভাবে এই আয়াতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখো" [আলে ইমরান: ১১০]। এরপর মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর এরাই হলো সফলকাম" [আলে ইমরান: ১০৪]। তাঁরা মনে করেন যে, এই সব আয়াত থেকে এই প্রমাণ গ্রহণ করা সম্ভব যে, ইসলাম যখন শুরার নীতি নির্ধারণ করেছে, তখন এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে। কেননা মহান আল্লাহর এই সব আয়াত এবং এর অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের সম্বোধন সমগ্র উম্মতের প্রতি নির্দেশিত। সুতরাং শুরা বা পরামর্শ হলো উম্মতের সকল ব্যক্তির মাঝে; কারণ আল্লাহ তাআলার বাণী: "তাদের কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিষয়টি উম্মতের সকল ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট।

কিন্তু আমরা এই মতের খণ্ডন করি এবং আমাদের অভিমত হলো: এটি এমন একটি মত যা সঠিকতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে, আর তার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

প্রথমত: আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তাআলার শুরার নির্দেশটি অপরিহার্যভাবে উম্মতের সকল ব্যক্তি বা সকল মুসলিমের সাথে পরামর্শ করাকে আবশ্যক করে না। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদুন নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতেন। কেননা মানুষ সাধারণত সঠিক মতামত প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিদের সাথেই পরামর্শ করে থাকে। পবিত্র কুরআনে বারবার এমন সব আয়াত এসেছে যা ব্যক্ত করে যে, সঠিক মতামত, শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান অধিকাংশ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়...

সাধারণীকরণের ভিত্তিতে; সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত নেওয়া সঠিক নয়। বরং প্রজ্ঞা ও দলিলের আলোকে পরামর্শের (শূরা) ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহর বাণী এর প্রমাণ: “আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভয়ের কোনো সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি তা রাসুলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যকার উলুল আমরের (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গের) কাছে পেশ করত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধানকারী তারা বিষয়টি অবশ্যই অনুধাবন করতে পারত।” [আন-নিসা: ৮৩]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?” [আয-যুমার: ৯]।

দ্বিতীয়ত: তাদের ওপর পাল্টা জবাব হিসেবে আমরা আরও বলি যে: উস্তাদ মওদুদী ও অন্যান্যরা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে যে দলিল পেশ করেছেন: “আর তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই হলো সফলকাম।” — সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণের

ক্ষেত্রে তাদের এই দলিলের ব্যবহার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং মুফাসসিরগণ এর দ্বারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা এর বিপরীত। তাই এ জাতীয় দলিল পেশকারীদের আমরা বলব: মুতাজিলাদের মতবাদ পাঁচটি মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত; যার অন্যতম হলো: সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ। তাসত্ত্বেও আমরা দেখি না যে, এই মুতাজিলাগণও উক্ত আয়াতের এমন কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব করে দেয়। এর প্রমাণ হলো, আমরা তাদের বড় একজন আলেম—যিনি ইমাম যামাখশারী—তাঁকে দেখতে পাই যে তিনি এই আয়াতের এমন এক ব্যাখ্যা করেছেন যা সেই অর্থ থেকে সম্পূর্ণ দূরে, যার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিকে ওয়াজিব করার সপক্ষে দলিল দেওয়া হয়। তিনি বলেন: নিশ্চয়ই অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ফরজে কিফায়া, ফরজে আইন নয়। কেননা এটি কেবল তার জন্যই শোভা পায় যে জানে যে কীভাবে আদেশটি সাজাতে হবে এবং কীভাবে তা সরাসরি প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা ব্যাপকতার কোনো অর্থ প্রদান করে না; বরং তা এক প্রকার অনির্দিষ্টতা ও সাধারণতার ঊর্ধ্বে। সুতরাং যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের মধ্য থেকে"। এখানে 'মধ্য থেকে' কথাটির অর্থ হলো কতিপয় ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী; এর অর্থ সমগ্র উম্মাহ বা সকল মানুষ নয়। যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা সকল মানুষের ওপর ওয়াজিব হোক, তবে তিনি সেভাবেই তা উল্লেখ করতেন।

আর যদি সকলেই সৎকাজের আদেশ দেয় এবং সকলেই অসৎকাজে নিষেধ করে, তবে কাকে আদেশ করা হবে এবং কে-ই বা নিবৃত্ত হবে? আমরা ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকি-র কাছেও অনুরূপ মত দেখতে পাই। তিনি এই একই আয়াতের তাফসীরে বলেন: সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্বটি প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াজিব হিসেবে গণ্য। তবে এই আয়াতে যাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা হলেন বিশেষ স্তরের সাহাবীগণ এবং বিশেষ স্তরের বর্ণনাকারীগণ, অর্থাৎ: মুজতাহিদ এবং আলেমগণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু জ্ঞানতাপস যে মত পোষণ করেন তা ভুল—অর্থাৎ ইসলাম সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করে, এই বিবেচনায় যে এটি ইসলামের ধার্যকৃত শূরা (পরামর্শ) নীতির অন্যতম দাবি বা ফলাফল। এখানে এটি লক্ষ্য করা জরুরি যে, যদি কুরআন বা সুন্নাহতে সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে, তবে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে জনকল্যাণের (মাসলাহাহ) প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো বাধাও নেই। কারণ সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এবং যে পদ্ধতিতে শূরা সম্পন্ন হবে, তা এমন বিষয় যা জাতির সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। আর মানুষের জন্য প্রজ্ঞা ও সহজীকরণের বিষয় হলো এই যে, ইসলাম শূরার নীতি নির্ধারণ করার পর প্রতিটি জাতির জন্য তাদের অবস্থার সাথে মানানসই এবং জনকল্যাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে।

অতএব, আমরা যে মতের বিরোধিতা করছি—যা সব সময় এবং সব স্থানে সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করে—এবং আমরা যে মতটি উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ মুসলিমরা যদি এতে তাদের কল্যাণ দেখে তবে এই ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো বাধা নেই—এই দুইয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

কেননা, আমরা যে (বিরুদ্ধ) মতটি উপস্থাপন করেছি তা সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটি ধর্মীয় আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত করে; পক্ষান্তরে আমরা যা সমর্থন করি তা হলো এই ব্যবস্থাকে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা।

এর মাধ্যমে ইসলামী শরীআত থেকে স্থবিরতার বৈশিষ্ট্য দূর হয় এবং এর সেই মূল সত্তা প্রকাশিত হয় যা লেনদেন ও পার্থিব

বিষয়ের (মুয়ামালাত) ক্ষেত্রে নমনীয়তা, যুগের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং জনকল্যাণ রক্ষার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

অষ্টম পাঠ - ইসলামি শাসননীতি

পরিশেষে, আমরা যদি সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান করি, তবে দেখতে পাব যে, ইসলামের ‘শুরা’ বা পরামর্শ পদ্ধতির সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যবস্থা হলো সেই নির্বাচন ব্যবস্থা যাকে ‘নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন’ বলা হয়, সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি নয়। সাংবিধানিক ও ইসলামি বিষয়ে একদল আলেম ও গবেষক এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন। মহান অধ্যাপক ‘বার্থেলেমি’ মনে করেন যে, জাতির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ওপর অর্পণ করা নাগরিকদের মধ্যে সমতা নীতির পরিপন্থী নয়। বরং এটি এরিস্টটলের সেই বিখ্যাত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তিনি বলেন: "সমতা হলো দুটি অসম বস্তুকে সমান অবস্থানে না রাখা।"

আমরা ইসলামে শুরার আলোচনায় দেখেছি যে, পরামর্শ সভার সদস্যদের (আহলে শুরা) নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের গুণাবলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের সংখ্যাকে নয়। অধিক সংখ্যা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানেই নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব নয়। যেমনটি মহান অধ্যাপক আবুল আ'লা মওদুদী বলেন: "ইসলাম সংখ্যাধিক্যকে সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করে না।" আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনি বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য আপনাকে মুগ্ধ করে।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ১০০]। বরং এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআন আমাদের সর্বদা সংখ্যাধিক্যের মতামতের ব্যাপারে সতর্ক করে, কারণ তা সবসময় সঠিক হয় না; বরং তা বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আপনি যদি জমিনের অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে।" [সূরা আল-আনআম: ১১৬]

তবে লক্ষ্যণীয় যে, রাজনৈতিক অধিকার যেমন ভোটাধিকার চর্চার ক্ষেত্রে ইসলাম স্বীকৃত একমাত্র শর্ত হলো ‘যোগ্যতা’ বা ‘দক্ষতা’। বংশমর্যাদা, পেশা বা সম্পদের মতো অন্য যেকোনো শর্ত থেকে এটি সম্পূর্ণ মুক্ত।

শরয়ী রাজনীতি
নবম পাঠ

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালার অনুবৃত্তি

পাঠের বিষয়বস্তু

প্রথম উপাদান : ন্যায়বিচার ৩৮৭
দ্বিতীয় উপাদান : শাসকদের দায়বদ্ধতা ৩৯৬
তৃতীয় উপাদান : অধিকার ও স্বাধীনতা ৪০৭

""

শরয়ি রাজনীতি

নবম পাঠ

ন্যায়বিচার

আমরা ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহের মধ্য হতে অন্য একটি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করব, আর তা হলো ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার হলো সবকিছুর শৃঙ্খলা। যদি পার্থিব বিষয়াদি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা টিকে থাকে; যদিও পরকালে এর প্রবর্তকের কোনো অংশ না থাকে। আর যখন তা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তখন তা টিকে থাকে না; যদিও এর প্রবর্তকের এমন ঈমান থাকে যার প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর এই বাণীতে সতর্ক করেছেন: "আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" [আন-নিসা: ৫৮]। এই পাঠটি মহান আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিম শাসক ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটি এমন একটি বর্ণনা যা মেনে চলা আবশ্যক এবং ইসলামের বিচারিক ও রাজনৈতিক সকল দিক এতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা থেকে বিচ্যুত হওয়া বা যা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়।

এজন্য অনেক আয়াতে ন্যায়বিচারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যার মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।" [আন-নাহল: ৯০]। এবং তাঁর বাণী: "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করো, এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" [আল-মায়িদাহ: ৮]। এর মর্মার্থ হলো, বিচারক সকল মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করতে আদিষ্ট; চাই সে শক্তিশালী হোক বা দুর্বল, ধনী হোক বা দরিদ্র, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, এবং বন্ধু হোক বা শত্রু। জাতি ও সমাজের জীবনধারা সঠিক রাখার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন যদিও তা কাফের হয়, আর তিনি জালিম রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখেন না যদিও তা মুসলিম হয়।" আরও বলা হয়: "দুনিয়া ন্যায়বিচার ও কুফরির সাথে টিকে থাকে, কিন্তু জুলুম ও ইসলামের সাথে

টিকে থাকে না।"

যখন আমরা এটি অনুধাবন করব, তখন আমরা নিশ্চিত হব যে রাষ্ট্রসমূহের উপর আপতিত বহু অনিষ্টের মূলে রয়েছে জুলুমের ব্যাধি। যা অধিকার খর্ব হওয়া, শাসক ও শাসিতের মধ্যে আস্থার অভাব এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত নেতিবাচক সামাজিক উপসর্গ ও ব্যাধিসমূহ যেমন ঘুষের প্রসারের দিকে ধাবিত করে।

নবম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

...এবং আমানতের খিয়ানত করা, প্রজাদের স্বার্থ নিয়ে ব্যবসা করা এবং মানুষের মনে হতাশা ও নিরাশার আধিপত্য বিস্তার করা। এটি সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করতে পারে এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়া ও একই দ্বীন ও স্বদেশের সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ন্যায়বিচারের অন্যতম প্রধান বহিঃপ্রকাশ হলো শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রয়োগ। এটি ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ। যদি রাষ্ট্র তার নীতিতে এটি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করে, তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, খুব সহজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে এই রাষ্ট্রটি তার রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে একটি ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র। কারণ, ইমাম এবং জনগণের একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার জারি রাখার প্রতিশ্রুতি হলো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিম্নতর পর্যায়গুলোতেও ন্যায়বিচার বিদ্যমান থাকার এক স্পষ্ট প্রমাণ।

ইসলামি কর্মপদ্ধতির উচ্চ ও নিম্ন উভয় স্তরেই ন্যায়বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ওপর এটি প্রয়োগ করার চেয়ে বড় কোনো দলিল আর হতে পারে না। বর্ণিত আছে যে: ((তিনি তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় ফযল বিন আব্বাস এবং আলী বিন আবু তালিবের মধ্যবর্তী হয়ে বের হলেন এবং মিম্বারে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনি বললেন: হে লোকসকল! আমি যদি কারো পিঠে বেত্রাঘাত করে থাকি, তবে এই যে আমার পিঠ, সে যেন তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর আমি যদি কারো সম্মানহানি করে থাকি, তবে এই যে আমার সম্মান, সে যেন তার প্রতিশোধ নেয়। আর আমি যদি কারো সম্পদ গ্রহণ করে থাকি, তবে এই যে আমার সম্পদ, সে যেন তা থেকে গ্রহণ করে। আর সে যেন আমার পক্ষ থেকে কোনো শত্রুতার আশঙ্কা না করে, কারণ এটি আমার স্বভাব নয়। জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার নিকট থেকে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়, যাতে আমি আমার রবের সাথে পবিত্র চিত্তে সাক্ষাৎ করতে পারি। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নামলেন এবং যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর পুনরায় মিম্বারে ফিরে গিয়ে তাঁর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।)) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীর বিশ্লেষণ এবং এতে বিদ্যমান ন্যায়বিচারের দিকগুলোর বর্ণনা আপনাকে দেখিয়ে দেয় যে, ন্যায়বিচার হলো একটি সামগ্রিক বিষয়; এটি শাসক ও তাঁর জনগণের কোনো একজন সদস্যের সম্পর্কের কোনো বিশেষ দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ন্যায়বিচার নিম্নলিখিত দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে:

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
নবম পাঠ

১. শারীরিক দণ্ডবিধি; এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীতে সুস্পষ্ট: "আমি যার পিঠে চাবুক মেরেছি, এই তো আমার পিঠ, সে যেন তা থেকে প্রতিশোধ (কিসাস) গ্রহণ করে।"

২. মান-সম্মান ও মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধি; এটি নবী ﷺ-এর এই বাণী থেকে গৃহীত: "আমি যার সম্মানে আঘাত করেছি, এই তো আমার সম্মান, সে যেন তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

৩. আর্থিক দণ্ডবিধি; এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী থেকে প্রমাণিত: "আমি যার ধন-সম্পদ গ্রহণ করেছি, এই তো আমার সম্পদ, সে যেন তা থেকে তার অংশ নিয়ে নেয়।"

এরপর আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী থেকে ন্যায়বিচারের কর্তব্য পালনে আনুগত্যের সর্বোচ্চ শিখর উপলব্ধি করতে পারবেন। এটি তাঁর এই বাণীতে মূর্ত হয়ে ওঠে: "জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যে আমার নিকট তার কোনো পাওনা থাকলে তা আদায় করে নেয়, অথবা আমাকে দায়মুক্ত করে দেয়; যাতে আমি পবিত্র মনে আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি।" এটি মানুষকে সুনিশ্চিত করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের তাদের অধিকার আদায় করে নেওয়ার অথবা যদি তাদের মন সায় দেয় তবে তা ক্ষমা করে দেওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

শাসক ও শাসিতের মাঝে ন্যায়বিচার যে সুউচ্চ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে মুসলিম খলিফাগণ তাদের প্রজাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক আগ্রহী ছিলেন। তারা কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং মানুষের মনের সেই কুমন্ত্রণার বিপরীতে গিয়ে ন্যায়বিচারের অন্বেষণ করতেন যা মানুষকে তার অপছন্দের ব্যক্তির প্রতি অবিচার করতে এবং পছন্দের ব্যক্তির প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী হতে প্ররোচিত করে; অথচ এ উভয়টিই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আমরা তাদের জীবনচরিতে এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ন্যায়বিচার অন্বেষণ এবং তাতে অটল থাকার ক্ষেত্রে তাদের যে সঞ্চয় ছিল, তা অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত ভাণ্ডারকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবু মারইয়াম আস-সালুলিকে—যিনি উমরের ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাবকে হত্যা করেছিলেন—বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি না।" তখন সেই ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল: "এটি কি আমাকে আমার কোনো পাওনা (অধিকার) থেকে বঞ্চিত করবে?" অর্থাৎ: আপনার আমাকে ভালো না বাসা কি আমার সেই অধিকারগুলো লাভে বাধা হবে যা ইসলাম আমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে? তিনি বললেন: "না; অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার ঘৃণা এবং ভালোবাসা না থাকা তোমাকে (তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা) বুঝায় না, না।"

ইসলাম আপনার জন্য যে অধিকারগুলো নির্ধারণ করেছে তাতে এটি বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলবে না। তখন লোকটি তাকে বললেন: "তাহলে তো কোনো ক্ষতি নেই, কারণ কেবল মহিলারাই ভালোবাসার অভাবের জন্য আক্ষেপ করে।" এই কাহিনীতে আমরা দেখি যে, শাসক তাঁর ভাইয়ের হত্যার কারণে শোকাহত এবং অত্যন্ত বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও, লোকটি সেসবের তোয়াক্কাই করেনি। সে ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিল। শাসক সর্বদা ন্যায়বিচারের সামনে এমনভাবে দণ্ডায়মান থাকেন যেন তিনি তাঁর মেহরাবে কোনো ইবাদতকারী, যে তার আদেশ পালনে সচেষ্ট। যখন খলিফা—যার হাতে সকল ক্ষমতা—লোকটির সামনে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন যে তিনি তাকে ঘৃণা করেন, তখন সেই ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে খলিফাকে উত্তর দিতে দ্বিধা করেননি। তিনি জানতেন যে, ন্যায়বিচারের ফয়সালা খলিফার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির চেয়েও তার জন্য অধিকতর সুরক্ষাকবচ। তাই তার উত্তর ছিল অত্যন্ত সহজ: "কোনো ক্ষতি নেই", অর্থাৎ: এতে ভয়ের কিছু নেই। আর এমন প্রজাদের কী-ই বা ক্ষতি হতে পারে যারা সত্যের পথ চেনে, এবং এমন একজন শাসক যে তা বাস্তবায়নে ও তা মেনে চলায় মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী?

সামাজিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য মানুষ যে সকল আইন-কানুন প্রণয়ন করে, তার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ন্যায়বিচারকে গণ্য করা হয়। এটি একটি মূল প্রজ্ঞা যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আইন আবর্তিত হয়; তাই বলা হয় যে, যেকোনো আইনকে অবশ্যই ন্যায়বিচারের কোনো না কোনো ভিত্তির ওপর নির্ভর করতে হবে।

আমরা দেখি যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে 'ন্যায়বিচার বিভাগ' বলা হয়। আদালতকে 'ন্যায়বিচারের আবাস' বলা হয়, এবং 'আইন মন্ত্রী' না বলে 'ন্যায়বিচার মন্ত্রী' বলা হয়। যদিও আদালত আইন প্রয়োগ করে, তবুও এর লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এখান থেকে বোঝা যায় যে, আইন মূলত ন্যায়বিচার অর্জনের একটি মাধ্যম মাত্র। কোনো কারণে যদি আইনি প্রয়োগ ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হয়, তবে বিচারককে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে যাতে আইনি দণ্ডের কঠোরতা কমানো যায়, অথবা এর অসম্পূর্ণতা দূর করা যায়, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বাতিল করে এমন সমাধান প্রদান করা যায় যা ন্যায়বিচারের সাথে সংগতিপূর্ণ।

মনুষ্যরচিত আইনের তুলনায় ইসলামি শরিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। এখানে ন্যায়বিচার এমন একটি লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত যা রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না, পার্থিব স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং প্রভাবিত হয় না...

শাসকদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি; কারণ মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায়বিচারের বিষয়টিকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং তাদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও তা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণে ন্যায়বিচার সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলোতে কুরআনিক অলৌকিকত্ব প্রস্ফুটিত হয়। কুরআন ন্যায়বিচারকে একটি পবিত্র মূল্যবোধে পরিণত করেছে, যে পর্যায়ে পৌঁছানো সর্বদা আবশ্যক, চাই এর ফলে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকুক না কেন।

এ প্রসঙ্গে শায়খ আবু জাহরা বলেন: ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়বিচার। অর্থাৎ ইসলাম যেসব বৈশিষ্ট্যে ভূষিত তার মাঝে ন্যায়বিচার অন্যতম। যে কোনো সামাজিক বিন্যাস যদি ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তার সাংগঠনিক শক্তি যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। কেননা ন্যায়বিচারই হলো ভিত্তি, এটিই শৃঙ্খলা এবং যে কোনো কাঠামোর সঠিক বিন্যাস। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে পূর্ণ ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করবেন। তিনি কোনো কিছুই হিসাব ছাড়া ছেড়ে দেবেন না। তিনি সৎকর্মশীলকে পুরস্কৃত করবেন এবং অপরাধীকে ইনসাফের সাথে শাস্তি দেবেন। মহান আল্লাহর বাণী: “আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। যদি তা সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।” [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭]

তিনি আরও বলেন: “অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তা দেখবে।” [সূরা আজ-জিলজাল: ৭, ৮]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে এবং তাঁর বান্দাদেরকে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে অবিচল থাকো। কোনো কওমের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করো, এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৮]

তিনি আরও বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।” [সূরা আন-নাহল: ৯০]

যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করো ইনসাফের সাথে। আমি কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেই না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ করবে, যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।” [সূরা আল-আনআম: ১৫২]

এভাবেই পূর্ববর্তী আয়াতগুলো ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে একটি মহৎ নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে প্রকাশ করে, যা জীবনে, লেনদেনে এবং সাধারণভাবে বিধিবিধান আহরণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা আবশ্যক। মহান সত্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিবাদ-বিসংবাদ ও বিচারিক কার্যক্রমে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। অন্যান্য আরও অনেক আয়াতে এর উদাহরণ রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করবে।" [আন-নিসা: ৫৮]। তিনি আরও বলেন: "আর যদি আপনি বিচার করেন, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করুন; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।" [আল-মায়িদাহ: ৪২]।

আর ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেন: "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।" [আল-মুমতাহিনা: ৮]।

কুরআনে ন্যায়বিচারের স্বরূপ:

বাস্তবতা হলো, কুরআনুল কারীমে ন্যায়বিচার এবং যেকোনো আইনব্যবস্থায় তা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সীমাবদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমরা যদি বলি যে, মানুষের জীবনধারা নির্ধারণকারী এবং পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার

পথ প্রদর্শনকারী সমস্ত পবিত্র আয়াতই ন্যায়বিচারের সাথে সম্পৃক্ত এবং একে একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তবে তাতে কোনো অতিরঞ্জন হবে না।

তাই আমরা লেনদেনের কিছু রূপের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ এ জাতীয় আয়াতগুলোর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি:

১. সামাজিক ন্যায়বিচার:

ন্যায়বিচারকে বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার এবং ক্ষতিপূরণমূলক বা বিনিময়মূলক ন্যায়বিচারের মধ্যে ভাগ করা হয়। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিভাজনগুলোর মধ্যে এই বিভাজনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামনে রয়েছে বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার এবং ক্ষতিপূরণমূলক বা বিনিময়মূলক ন্যায়বিচার। প্রথম রূপটি পদমর্যাদা ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং যা কিছু...

সংবিধান যাদের স্বীকৃতি দেয় তাদের মধ্যে এটি বণ্টন করা সম্ভব। সুতরাং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যেভাবে এক ধরণের আনুপাতিক বণ্টন হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমনি সকল নাগরিকের সামর্থ্য, সক্ষমতা এবং সমাজের দায়ভার বহনে তাদের অবদানের মাত্রা অনুযায়ী তাদের ওপর দায়-দায়িত্ব অর্পণ করাও জরুরি।

আমরা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের এই রূপটির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: "আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা কিছু 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, রাসুলের আত্মীয়-স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য; যাতে তা তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত না হয়। রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" [আল-হাশর: ৭]। এই আয়াতের ভিত্তিতেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বিজিত ভূমিগুলো বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করা বন্ধ করেছিলেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যখন ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হলো এবং এতে অনেকগুলো নতুন নতুন অঞ্চল যুক্ত হলো, তখন উমর (রা.) সাহাবীদের সাথে ভূমি ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। অর্থাৎ মুসলিমদের দ্বারা বিজিত ভূমির ক্ষেত্রে—অধিকাংশের ঝোঁক ছিল গনিমতের আয়াতের বিধান অনুযায়ী সেগুলো বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার দিকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর জেনে রেখো, তোমরা গনিমত হিসেবে যা কিছু লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য।" [আল-আনফাল: ৪১]

গনিমতের এই আয়াতের মর্মার্থ হলো: এক-পঞ্চমাংশ হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য, আর বাকি চার-পঞ্চমাংশ হবে যোদ্ধাদের জন্য। এটিই হলো গনিমতের আয়াত। আমরা বলি: অধিকাংশের রায় ছিল এই ভূমিগুলো আমাদের উল্লিখিত গনিমতের আয়াত অনুযায়ী বিজয়ীদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হোক। কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যে মতটি গ্রহণ করেছিলেন—অর্থাৎ তিনি মনে করতেন যে, এই ভূমিগুলো বিজয়ী বা যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন না করে বরং তা এর আদি মালিকদের হাতেই রেখে দেওয়া উচিত এবং তারা তা থেকে ‘খরাজ’ (ভূমি কর) প্রদান করবে; যাতে তা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য একটি স্থায়ী আর্থিক উৎস হয় এবং আমরা ইতিপূর্বে যে সাধারণ ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেছি তা এই উৎস থেকে মেটানো সম্ভব হয়। তিনি ভূমি বণ্টন করতে অস্বীকৃতি জানান এবং একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেন যার সারকথা হলো—ভূমি এর মালিকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের ওপর খরাজ ধার্য

করা, যাতে সকল মুসলিমের জন্য সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

নবম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

এই পাঠ থেকে বোঝা যায় যে এর অর্থ হলো: ইসলামী উম্মাহর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া, যা দাবি করে যে একদল মানুষের মাঝে ভূমির মালিকানা কুক্ষিগত থাকবে না; কারণ সেটি ইনসাফের পরিপন্থী এবং কুরআনের এই বাণীরও বিপরীত: "যাতে তা তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না হয়।" এবং কুরআনের সেই পাঠের পরিপূরক যা ওই আয়াতে বিভিন্ন শ্রেণির পাওনাদারদের বর্ণনার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে: "আর যারা তাদের পরে এসেছে।" [আল-হাশর: ১০]

ওমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে যুক্তি দিতে শুরু করলেন। তাঁর মত ছিল—ভূমিগুলো তাদের মালিকদের হাতেই থাকবে এবং আমরা যেমনটি বলেছি, তার ওপর 'খারাজ' (ভূমি কর) ধার্য করা হবে। তিনি তাঁর মতের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বললেন: "তোমরা কি এই সীমান্ত এলাকাগুলোর কথা ভেবে দেখেছ? এগুলো পাহারায় নিয়োজিত রাখার জন্য অবশ্যই লোকবলের প্রয়োজন।" অর্থাৎ—সেই সব স্থান যেখানে সৈন্যরা ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকে। "তোমরা কি সিরিয়া, মিসর ও কুফার মতো এই বড় শহরগুলোর কথা ভেবে দেখেছ? এগুলো অবশ্যই সেনাবাহিনী দিয়ে পূর্ণ রাখতে হবে এবং তাদের নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। যদি এই ভূমিগুলো বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে এদের কোত্থেকে দেওয়া হবে?" অর্থাৎ—যদি তা গনীমত লাভকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

এভাবেই ওমর ইবনুল খাত্তাব বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের নিয়ম বা বর্তমানে যাকে "সামাজিক ন্যায়বিচার" বলা হয়, তা কার্যকর করেছিলেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন সম্পদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন যা তাদের অভাবীদের জন্য, জনকল্যাণমূলক কাজে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হবে। তিনি এই জনস্বার্থকে মুষ্টিমেয় যোদ্ধা, বিজেতা ও তাদের সন্তানদের স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন; অন্যথায় এই ভূমির সমস্ত আয় কেবল তাদের কাছেই চলে যেত এবং বাকি মুসলিমরা তা থেকে বঞ্চিত হতো। এ থেকে বলা যায় যে, আমরা এমন এক অকাট্য বিধানের সম্মুখীন, যা নির্ধারণ করে দেয় যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে সকল মানুষের উপকৃত হওয়া আবশ্যক; কেবল তারাই নয় যারা সম্পদ অর্জনের সময় উপস্থিত ছিল, বরং যারা তাদের পরে আসবে তারাও। বর্তমানে কি এমন কোনো মানবরচিত আইনের কল্পনা করা সম্ভব যা এই উচ্চতর অর্থ বহন করে?

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমরা তা মনে করি না। আমরা এখানে এমন এক প্রয়োগ দেখতে পাই যা প্রাথমিক যুগের এক প্রখর মেধা এবং ইসলামী শরীয়তের প্রজ্ঞার গভীরে প্রবেশের ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। এটি এমন এক সময়ের কথা যখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না; বরং তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পবিত্র কুরআনের মাদরাসা।

২. ক্ষতিপূরণমূলক বা বিনিময়গত ইনসাফ:

এটি ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কগুলোতে একটি সংশোধনমূলক ভূমিকা পালন করে এবং দাবি করে যে, চুক্তি ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে কেউ যেন তার প্রাপ্যর চেয়ে বেশি গ্রহণ না করে। আর এর ওপর ভিত্তি করেই চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রূপ লাভ করেছে।

আমরা এই উদ্দেশ্যটি পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যেও অলৌকিকভাবে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। পবিত্র কুরআন লেনদেনের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের শোষণকে নিষিদ্ধ করে এবং চুক্তিগুলো ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে অপরিহার্য করে। লেনদেনের সুস্থতা এবং এর পক্ষগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা রয়েছে, অন্য কোনো আইনের প্রচেষ্টায় তার নজির মেলে না। আমরা এ বিষয়ে ইসলামি বিধানাবলির ওপর দীর্ঘ আলোকপাত করব না, বরং কুরআনে সুদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব।

আল্লাহ তাআলা বলেন: **"যারা সুদ খায়, তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়। তা এ জন্য যে, তারা বলে, 'কেনাবেচা তো সুদের মতোই'। অথচ আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, অতঃপর সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আর যারা পুনরায় (সুদ গ্রহণ) করবে, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"** [সূরা আল-বাকারা: ২৭৫]

আল্লাহ তাআলা সুদখোরদের কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেন: **"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা বর্জন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।"** [সূরা আল-বাকারা: ২৭৮-২৭৯]

পবিত্র কুরআন এ ক্ষেত্রে মানুষকে দায়িত্বশীলতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। কোনো ওজরের কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হলে সেখানে অর্থ থেকে অর্থ উৎপাদনের পথ বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ বলেন: **"আর যদি সে (ঋণগ্রহীতা) অস্বচ্ছল হয়, তবে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত। আর যদি তোমরা সদকা (ক্ষমা) করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।"** [সূরা আল-বাকারা: ২৮০-২৮১]

নবম পাঠ

এর অর্থ হলো, ইসলাম যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করে তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—শাসনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার। ইসলাম লেনদেনকারীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। এ কারণে যারা সুদের কারবার করে তাদের মাঝে কোনো ইনসাফ নেই; কেননা সুদখোর অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে। সে যা গ্রহণ করে বা যা প্রদান করে তাতে কোনো ইনসাফ নেই। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনীতি কিংবা শাসন—উভয় ক্ষেত্রেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।

শাসকদের দায়িত্ব

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্যান্য সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে "দায়বদ্ধতা" বা "জবাবদিহিতা"র নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। ইসলামে এমন কেউ নেই যাকে এই দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে রাখা যেতে পারে। কেননা দায়বদ্ধতা না থাকার অর্থ হলো সেই ব্যক্তি কোনো বিশেষ পবিত্র মর্যাদার অধিকারী অথবা তিনি মাসুম বা নিষ্পাপ; অথচ ইসলামে নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ এই মর্যাদার অধিকারী নন।

প্রত্যেক মুসলিম তার প্রতিটি আচরণ ও কর্মের জন্য দায়ী, চাই তা ইসলামী শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রত্যেক মুকাল্লাফের ওপর অর্পিত ফরয ইবাদত সংক্রান্ত হোক, অথবা নিজের সত্তা বা অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। সকল অবস্থাতেই একজন মুসলিম পরকালে মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য হওয়ার পাশাপাশি একদিকে তার বিবেকের কাছে এবং অন্যদিকে ইসলামী সমাজের কাছেও দায়বদ্ধ।

আমরা যদিও এই মূলনীতির ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শাইখ আহমদ হুরেইদির সাথে একমত—কেননা এটি ইসলামী ফিকহের একটি অকাট্য নীতি—তবুও আমরা তার এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারছি না যে, "ব্যক্তির দায়বদ্ধতা কখনো নিজের সামনে, কখনো তার রবের সামনে এবং কখনো মানুষ ও সমাজের সামনে পরিলক্ষিত হয়।" কারণ এই উক্তিটি এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেবল নিজের কাছেই দায়বদ্ধ হতে পারে।

...এবং তাঁর বিবেক, কিংবা সমাজের নিকট। আর মহান আল্লাহর নিকট সে দায়বদ্ধ হবে না—এমনটি আমরা গ্রহণ করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, শাইখ এর বিরোধিতা করেন না; কারণ দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা প্রথমত এবং সবকিছুর আগে সকল অবস্থাতেই মহান আল্লাহর নিকট নির্ধারিত হয়।

দায়বদ্ধতার বৈধতার ভিত্তি:

ইসলামি শরীয়তের উৎসসমূহ দায়বদ্ধতার মূলনীতির প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যাপকতার প্রতি নির্দেশ করেছে; যাতে তা সকল কর্মকাণ্ড এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সম্বোধিত সকল পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে, চাই সে শাসক হোক বা শাসিত—উভয়ই সমান। আর এটি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

ইসলামে দায়বদ্ধতার বৈধতার ভিত্তি ইসলামি শরীয়তের উৎসসমূহে একটি মজবুত প্রাসাদের ন্যায় 'শুরা' বা পরামর্শের মূলনীতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে; যার ওপর কেবল ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, বরং সমগ্র ইসলামি জীবন ব্যবস্থাই দণ্ডায়মান। এটি

পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ, সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বাস্তব প্রয়োগ এবং উম্মাহর আলেমদের ঐকমত্য হতে সুস্পষ্ট।

ক. পবিত্র কুরআনে: মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ নেক আমল করলে সে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ বদ আমল করলে সে তা দেখতে পাবে।" [আয-যিলযাল: ৭, ৮]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর যদি তা সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।" [আল-আম্বিয়া: ৪৭]। সুবহানাহু (পবিত্র মহান আল্লাহ) বলেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।" [আল-মুদ্দাসসির: ৩৮]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও খিয়ানত করো না।" [আল-আনফাল: ২৭]। তিনি আরও বলেন: "যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের প্রতিফল দেওয়া হয়, আর তাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।" [আল-জাসিয়া: ২২]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর তুমি বলো, তোমরা আমল করতে থাকো, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও।"

৩৯৭

নবম পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

“এবং তোমাদেরকে অচিরেই অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের পরিজ্ঞাত আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।” [আত-তাওবা: ১০৫]
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দায়বদ্ধ।” [আত-তুর: ২১] এবং তিনি বলেন: “যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত ভালো কাজগুলো সামনে উপস্থিত পাবে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তাও; সে কামনা করবে যদি তার এবং সেই মন্দ কর্মের মধ্যে এক সুদীর্ঘ ব্যবধান থাকত!” [আলে ইমরান: ৩০]

এই সমস্ত আয়াত অকাট্য দলিলের মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার মূলনীতি নির্ধারণ করে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত হয়।

খ. এবং সুন্নাতে নববী হতে উল্লেখ্য: উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:
“সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, জনগণের শাসক একজন রাখাল এবং তিনি তাঁর অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের জন্য রাখাল এবং সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক এবং সে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।”
এর ওপর ভিত্তি করে, ইসলামে এমন কেউ নেই যে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে থাকতে পারে; বরং ক্ষমতার সমান্তরালে দায়িত্বশীলতার স্তর বিন্যস্ত করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মনিবের সম্পদের ক্ষেত্রে গোলামের দায়বদ্ধতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরও রয়েছে বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী ﷺ যা বলেছিলেন:
“হে লোকসকল! তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদ তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমাদের জন্য তেমনি পবিত্র ও হারাম, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন এবং তোমাদের এই মাসটি। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি তো (বাণী) পৌঁছে দিয়েছি। অতএব, যার কাছে কোনো আমানত গচ্ছিত আছে, সে যেন তা আমানতকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়।”

আরও ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন:

নবী ﷺ তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর কক্ষ থেকে ফজল ইবনে আব্বাস এবং আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর মাঝে ভর দিয়ে বের হলেন। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য সালাত আদায় করলেন এবং তাঁদের জন্য অনেক দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন: “হে লোকসকল! আমি যদি কারো পিঠে চাবুক মেরে থাকি, তবে এই যে আমার পিঠ, সে যেন তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর আমি যদি কারো সম্পদ গ্রহণ করে থাকি, তবে এই যে আমার সম্পদ, সে যেন তা থেকে গ্রহণ করে নেয়; এবং সে যেন ভয় না পায়...”

"...আমার পক্ষ থেকে কোনো বিদ্বেষ নেই, কারণ তা আমার স্বভাবজাত নয়। জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যে আমার নিকট থেকে নিজের প্রাপ্য হক (অধিকার) বুঝে নিয়েছে—যদি তার কোনো পাওনা থাকে—অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জবাবদিহিতার মূলনীতিটি ইসলামি ফিকহে কেবল একটি তাত্ত্বিক বিষয় ছিল না। বরং অন্যান্য আইনি বিধানের ন্যায় এটিও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ—যিনি ছিলেন প্রেরিত নবী, নিষ্পাপ এবং ভুল-ভ্রান্তি ও খেয়ালখুশি থেকে মুক্ত—তিনিও কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। ইবনে সা'দ বর্ণিত একটি ঘটনায় দেখা যায়: রাসুলুল্লাহ ﷺ মেসওয়াকের একটি কাঠি দিয়ে সাওয়াদ ইবনে গাযিয়াহ-কে খোঁচা দিয়েছিলেন, যা তাঁর পেটে দাগ ফেলে দেয়। তখন সাওয়াদ কিসাস দাবি করেন—অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যেভাবে আঘাত করেছেন তিনিও সেভাবে কিসাস নিতে চান। আনসারগণ যখন সাওয়াদের এই দাবির প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ দ্রুত বলে উঠলেন: "এক মানুষের উপর অন্য মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" এরপর যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র দেহ উন্মুক্ত করলেন যেন তিনি (সাওয়াদ) কিসাস নিতে পারেন, তখন সাওয়াদ বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! আমি এটি ছেড়ে দিচ্ছি যাতে কিয়ামতের দিন এটি আপনার নিকট আমার জন্য সুপারিশের কারণ হয়।"

গ. খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জবাবদিহিতার নজিরসমূহ: পূর্ববর্তী ঘটনাবলি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, প্রথম দিকের খলিফাগণ এই মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার ফলে উদ্ভূত প্রতিটি বিষয়ে নিজেদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা স্বীকার করতেন।

শাসকের জবাবদিহিতার এই মূলনীতিটি তারা কীভাবে নিশ্চিত করেছিলেন, তা বোঝার জন্য আমরা এই বিষয়ে প্রথম দিকের খলিফাদের কর্মপন্থা সংক্ষেপে তুলে ধরব।

আবু বকর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন: "আমি যতক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো। কিন্তু আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।" এর মাধ্যমে তিনি যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন: "স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" তিনি আরও বলেন: "যদি তোমরা আমাকে সঠিক পথে চলতে দেখো তবে আমার অনুসরণ করো, আর যদি আমি পথভ্রষ্ট হই তবে আমাকে সোজা (সংশোধন) করে দিও।" খলিফাকে সংশোধন করার বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হিসেবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায় না, যতক্ষণ না ইসলামি ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার মূলনীতিটি স্বীয় স্থান সুনিশ্চিত করে নেয়।

নবম পাঠ

সংশোধন কেবল তখনই বাস্তবায়িত হয় যখন খলিফা দায়বদ্ধ থাকেন এবং তাকে আইনের শাসনের অনুগত হওয়া আবশ্যক। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মনে করতেন যে, তিনি কেবল নিজের ব্যক্তিগত আচরণের জন্যই দায়ী নন, বরং তার কর্মচারী ও গভর্নরদের আচরণের জন্যও দায়ী। শাসকের দায়িত্ব সম্পর্কে ওমরের (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তার কর্মপদ্ধতিতে দায়িত্বের পরিধি সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, স্থান ও ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমরা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে এমন কোনো শাসক দেখি না যিনি ওমর (রা.) যেভাবে দায়িত্বকে চিত্রায়িত করেছেন সেভাবে করেছেন। তার থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছিলেন: "আমার কোনো কর্মচারী যদি কারো ওপর জুলুম করে এবং সেই জুলুমের খবর আমার কাছে পৌঁছায় অথচ আমি তার প্রতিকার না করি, তবে আমিই সেই জুলুমকারী হিসেবে গণ্য হব।" যেহেতু তিনি নিজেকে তার কর্মচারী ও গভর্নরদের জন্য দায়ী মনে করতেন, তাই তিনি গভর্নর নির্বাচনে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কোনো কাজের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে নির্বাচন করতেন না যতক্ষণ না তার মধ্যে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পাওয়া যেত এবং তার আমানতদারি ও পরহেজগারির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত। এজন্য তিনি অনেক বিষয় নিজে সরাসরি তদারকি করতেন। আর বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের যেসব সমস্যা সরাসরি তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হতো না, সেগুলোর জন্য তিনি সামর্থ্যবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতেন। তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: "যে আমাদের সামনে থাকবে, আমরা নিজেই তার তদারকি করব—তিনি এখানে কর্মচারীদের কথা বলছেন—আর যে আমাদের থেকে দূরে থাকবে, তার ওপর আমরা সামর্থ্যবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করব। আল্লাহর কসম! তোমাদের কোনো বিষয় আমার সামনে উপস্থিত হলে আমি ছাড়া অন্য কেউ তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না, আর যা আমার অগোচরে থাকবে সে বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ও আমানতদারির পরিচয় দেব। যদি তারা ভালো কাজ করে তবে আমি তাদের সাথে অবশ্যই উত্তম আচরণ করব, আর যদি তারা মন্দ কাজ করে তবে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দেব।"

তিনি তার কর্মচারীদের সম্পর্কে যেন শপথ করে বলছেন: যদি তারা ভালো কাজ করে, অর্থাৎ প্রজাদের সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তাদের সাথে কোমলতা, দয়া ও ন্যায়ের সাথে আচরণ করে, তবে আমি অবশ্যই তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব। আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে তবে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দেব। যেহেতু তিনি তার কর্মচারীদের জন্য দায়ী ছিলেন, তাই তিনি তাদের আচরণের ওপর কড়া নজরদারি ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি তাদের কাছে পাঠানো বিভিন্ন চিঠিপত্রে অথবা হজের মৌসুমে আয়োজিত বার্ষিক সভাগুলোতে জোর দিয়ে বলতেন: "সাবধান! তোমরা মুসলমানদের প্রহার করো না, অন্যথায় তাদের লাঞ্ছিত করবে; আর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না।"

নবম পাঠ

...তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করো না এবং তাদের ওপর জবরদস্তি করো না, পাছে তারা ফিতনায় নিপতিত হয়। যে ব্যক্তিই এই মূলনীতির বিরোধিতা করবে, তাকে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে।

ইবনে সাদ আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর (রা.)-কে বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি মনে করেন যে, যদি কোনো প্রশাসক তার প্রজাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে কি আপনি তার থেকে প্রতিশোধ (কিসাস) গ্রহণ করবেন?" উমর (রা.) বললেন: "কেন আমি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব না! অথচ আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজের সত্তা থেকে প্রতিশোধ দিতে দেখেছি।" এই বর্ণনা থেকে যা অনুধাবন করা যায় তা হলো, শরিয়তের বিধান লঙ্ঘনের ফলে যে শাসন বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তার জন্য কোনো দায়বদ্ধতা নেই। বরং দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা তখন তৈরি হয়, যখন কোনো প্রশাসক কোনো প্রজাকে সংগত কারণ ব্যতীত শাস্তি প্রদান করেন—অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়াই—অথবা এই শাসনে প্রশাসক তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, যেমন সংঘটিত অপরাধ এবং শাস্তির পদ্ধতির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া। এই উভয় ক্ষেত্রে একে শাসন বা সংশোধন বলা হবে না, বরং এটি জুলুম হিসেবে গণ্য হবে যা শরিয়ত অনুমোদন করে না। এমতাবস্থায় এর বিপরীতে কিসাস গ্রহণ করা আবশ্যক, যা ইবনে সাদ বর্ণিত গল্পের অবশিষ্টাংশ থেকে স্পষ্ট হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মৌসুমের সময়—অর্থাৎ হজের মৌসুমে—সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিতেন। যখন তাঁরা একত্রিত হতেন, তখন তিনি বলতেন: "হে লোকসকল! আমি আমার কর্মকর্তাদের তোমাদের কাছে এজন্য পাঠাইনি যে তারা তোমাদের শরীরে আঘাত করবে কিংবা তোমাদের সম্পদ হরণ করবে। বরং আমি তাদের পাঠিয়েছি যাতে তারা তোমাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে এবং তোমাদের প্রাপ্ত সম্পদ তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে। সুতরাং যার সাথে এর ব্যতিক্রম কিছু করা হয়েছে, সে যেন দাঁড়ায়।" তখন একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ দাঁড়ালো না। সে বলল: "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনার অমুক কর্মকর্তা—অর্থাৎ আমর ইবনুল আস—আমাকে একশত চাবুক মেরেছেন।" উমর (রা.) বললেন: "হে আমর! তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ?" যখন উমর (রা.) নিশ্চিত হলেন যে তিনি তাকে কোনো সংগত কারণ ছাড়াই প্রহার করেছেন, তখন তিনি সেই লোকটিকে বললেন: "দাঁড়াও এবং তার থেকে কিসাস গ্রহণ করো।" অর্থাৎ আমর ইবনুল আসের থেকে প্রতিশোধ নাও। তখন আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি যদি এটি করেন তবে এটি আপনার প্রশাসনের ওপর ভারী হবে এবং আপনার পরবর্তীকালে এটি একটি রীতিতে পরিণত হবে।" উমর (রা.) বললেন: "কেন আমি কিসাস নিতে দেব না, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজের সত্তা থেকে কিসাস দিতে দেখেছি?" তখন আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন: "তবে আমাদের সুযোগ দিন, আমরা তাকে সন্তুষ্ট করি।" তিনি বললেন: "তোমরা তাকে সন্তুষ্ট করো।" অতঃপর তিনি প্রতিটি চাবুকের বিনিময়ে দুই দিনার করে মোট দুইশত দিনারের বিনিময়ে তাকে সন্তুষ্ট করলেন।

এভাবেই উমর (রা.) তাঁর কর্মচারীদের সাথে আচরণে ও তাদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, এমনকি তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে এমন একজন ব্যক্তি হতে যাকে প্রজাদের কেউ বলবে: 'আপনি গভর্নর আমর ইবনুল আসের নিকট থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করুন'। এটি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) প্রজাদের সাথে যে পর্যায়ের ইনসাফ বা ন্যায়বিচার বজায় রাখতেন তারই প্রমাণ বহন করে। উমর (রা.) প্রশাসকদের কর্মকাণ্ডের দায়বদ্ধতার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং তিনি মনে করতেন যে, তাঁর শাসনামল জুড়ে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি নিজেই দায়ী।

তিনি মনে করতেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়ের জন্য তিনি দায়বদ্ধ; এই কারণেই তিনি উটেরও খোঁজখবর নিতেন এবং বলতেন: "আমি তোমার অবস্থার জন্য জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয় করছি।" তিনি আরও বলতেন: "ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি উটও হারিয়ে যায়, তবে আমি ভয় করি যে আল্লাহ আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন; কারণ রাষ্ট্র তার জন্য পথ সুগম করে

দেয়নি।" সুতরাং তিনি একটি উট হারিয়ে যাওয়ারও ভয় করতেন, যার জন্য তিনি আল্লাহর নিকট দায়ী হবেন।

উমর (রা.)-এর অবস্থান যদি এমন হয়, তবে তার বিপরীতে শাসিতদেরও একটি অবস্থান ছিল। তারা মনে করত যে, খলিফা প্রজাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও আচরণের জন্যও দায়বদ্ধ।
ইবনুল জাউযী বর্ণনা করেন: উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর প্রথম খুতবায় বলেছিলেন: "যদি তোমরা আমার মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখো, তবে আমাকে সোজা করে দিও।" তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন উমরকে উত্তর দিয়ে বলেন: "আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনার মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখতাম, তবে তলোয়ারের ধার দিয়ে আপনাকে সোজা করে দিতাম।" উমর এই উত্তর শুনে বলেন: "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রেখেছেন যে উমরকে তলোয়ারের ধার দিয়ে সোজা করবে।"

একজন মুসলিম নাগরিক খলিফার দায়িত্বের সীমা ও পরিধি সম্পর্কে ইসলামের এমন এক নিগূঢ় উপলব্ধির চিত্র অঙ্কন করেন যা অতীত বা বর্তমানের কোনো মানবরচিত আইনে (تشريع وضعي) দেখা যায় না। বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এক রাতে এক বেদুইন নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে চুলার ওপর পানিভর্তি একটি পাত্র বসিয়ে তার ছোট বাচ্চাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। পাত্রটিতে শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কারণ সন্তানদের খাওয়ানোর মতো কোনো খাদ্য তার কাছে ছিল না। সে আগুনের উনুনে তাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। যখন আমাদের নেতা উমর (রা.) তার নিকটবর্তী হলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে নারী! তুমি কী করছ? আর বাচ্চারা কেন এভাবে চিৎকার করছে (অর্থাৎ কাঁদছে)?" সে উত্তর দিল যে, তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে—অর্থাৎ:

তারা প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে কাঁদছিল। আর তিনি (মহিলাটি) তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—অর্থাৎ তাদের সাথে একপ্রকার ছলনা করছিলেন যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে; তারা মনে করছিল যে তিনি তাদের জন্য কিছু রান্না করছেন, অথচ হাঁড়িতে পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না—ফলে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। তখন তাঁকে (মহিলাটিকে) বলা হলো: আপনি উমরের কাছে গেলেন না কেন? অথচ তিনি জানতেন না যে বক্তাই স্বয়ং উমর। মহিলাটি বললেন: আমাদের এবং তাঁর মাঝে আল্লাহ আছেন। এতে উমর ভীষণ আতঙ্কিত হলেন এবং প্রবল ভয় ও দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করল। তিনি তাকে বললেন: উমর আপনাদের ব্যাপারে কী জানবেন? অর্থাৎ আপনারা যে অবস্থায় আছেন সে সম্পর্কে উমর কীভাবে জানবেন? তিনি (মহিলাটি) বললেন: তিনি আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর আমাদের ব্যাপারে গাফিলতি করবেন?!

এই গল্পটি তার সহজ-সরলতায় প্রথম যুগের মুসলিমদের অবস্থা চিত্রায়িত করে, তা তারা শাসক হোন কিংবা শাসিত। আর উমর (রা.) নিজেকে অন্য সকল গভর্নর ও শাসকদের তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতেন। ইসলামি সমাজের সদস্যদের কাছে উমর (রা.) এবং তাঁর পরিবারের জন্য এটি আবশ্যক ছিল যে, তাঁরা যেন তাঁদের জন্য আদর্শ হন। এ কারণেই তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য দণ্ড দ্বিগুণ করে দিতেন যদি তাঁরা শরয়ি আদেশ-নিষেধ কিংবা উমর (রা.) প্রজাদের জন্য যা নির্দেশ দিতেন তার অন্যথা করতেন। এই প্রসঙ্গে উমর (রা.) বলতেন: "আমি যা নিষেধ করেছি তোমরা তা শুনেছ। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন আমার নিষিদ্ধ কোনো কাজ না করে, অন্যথায় আমি তার জন্য দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা করব।"

আর উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর যুগে, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত পথচলা, সততা, আমানতদারি, তাকওয়া এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুসলিমদের জন্য তাঁর ত্যাগ অনস্বীকার্য ছিল, তবুও তিনি শহীদ হয়েছিলেন; কারণ বিদ্রোহী জনতা মনে করেছিল—যা ছিল জুলুম ও মিথ্যাচার—যে, মুসলিমদের ওপর বনু উমাইয়্যার আধিপত্যের জন্য তিনিই দায়ী। কারণ তিনি তাদের অধিকার প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিয়োগ দিয়েছেন—এই জাতীয় আরও কিছু অভিযোগকে সেই অত্যাচারীরা পুঁজি করেছিল যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত তাঁর শাহাদাতের কারণ হয়েছিল। আর এই কারণগুলো আমাদের নেতা ও মাওলা উসমান (রা.)-এর পরহেজগারি, তাকওয়া এবং আমানতদারির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কোনো

সংশয় তৈরি করে না।

...এবং তাঁর সততা, ইখলাস ও জিহাদ; তিনি তো সেই লজ্জাশীল ব্যক্তি যাঁর থেকে ফেরেশতারাও লজ্জা পেতেন। উসমান (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে মহান ভূমিকা পালন করেছেন, তা—এক মুহূর্তের জন্যও—কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়, যার সারকথা হলো: খলিফা তাঁর বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর, কর্মচারী এবং প্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী। এর পাশাপাশি তিনি (রা.) তাঁকে জবাবদিহি করার ব্যাপারে মুসলমানদের অধিকার অস্বীকার করেননি। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমরা যদি আল্লাহর কিতাবে পাও যে আমার পা শিকলে বেঁধে রাখা উচিত, তবে তোমরা তা-ই করো।"

আলী (রা.)-ও মনে করতেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত সবকিছুর জন্য খলিফা দায়ী থাকবেন। ইবনে হাজম হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে: উমর (রা.) জনৈক এক মহিলার নিকট লোক পাঠালেন যার নিকট কিছু মানুষ আসা-যাওয়া করত। মহিলাটি তা অপছন্দ করল। তাকে বলা হলো: উমরের ডাকে সাড়া দাও। সে বলল: হায় আক্ষেপ! উমরের সাথে আমার কী প্রয়োজন? পথে যেতে যেতে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তার প্রসব বেদনা শুরু হলো। সে একটি ঘরে প্রবেশ করল এবং সন্তান প্রসব করল। নবজাতকটি একবার চিৎকার দিয়ে মারা গেল।

অর্থাৎ: সে যখন জানতে পারল যে তাকে উমর ইবনুল খাত্তাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তখন সে ভীত হয়ে পড়েছিল। এই আতঙ্কই তার অকাল প্রসবের কারণ হয়েছিল; যার ফলে সে সন্তান প্রসব করে এবং শিশুটি মারা যায়। উমর (রা.) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, মহিলার এই আতঙ্কের কারণে শিশুটি মারা যাওয়ার ঘটনায় তাঁর অবস্থান কী হবে। তাদের কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন যে আপনার ওপর কোনো দায় নেই। অর্থাৎ তাদের কেউ বললেন: হে আমিরুল মুমিনিন, এ কারণে আপনার ওপর কিছু বর্তাবে না, আপনি তো কেবল একজন শাসক ও শাসনকর্তা।

বর্ণনাকারী বলেন: আলী—অর্থাৎ আলী ইবনে আবি তালিব—চুপ ছিলেন। উমর তাঁর দিকে ফিরে বললেন: "আপনি কী বলেন?" তিনি বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন, তারা যদি নিজেদের রায় অনুযায়ী বলে থাকে—অর্থাৎ যারা আপনাকে বলেছে যে আপনার কোনো দায় নেই—তবে তারা ভুল বলেছে। আর তারা যদি আপনার মনতুষ্টির জন্য বলে থাকে, তবে তারা আপনাকে সঠিক নসিহত করেনি। আমি মনে করি, এর রক্তপণ (দিয়াত) আপনার ওপরই বর্তাবে; কারণ আপনিই তাকে আতঙ্কিত করেছেন এবং আপনার কারণেই তার সন্তানটি মারা গেছে।" অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন...

আলী-কে কুরাইশদের মধ্যে 'আকল' বণ্টন করতে হবে - অর্থাৎ: এই সন্তানের রক্তপণ কুরাইশদের ওপর বর্তাবে - আর উমর ইবনুল খাত্তাব-এর পক্ষ থেকে তারাই হলো রক্তপণ প্রদানকারী (আকিলাহ্)।

এই ঘটনার ক্ষেত্রে খলিফার দায়বদ্ধতা নিয়ে আমাদের মতামত যা-ই হোক না কেন, এটি অকাট্যভাবে প্রকাশ করে যে, আলী মনে করতেন যে খলিফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চর্চাসংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে দায়বদ্ধ।

কুরআন, সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বাস্তব প্রয়োগ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, খলিফা দায়বদ্ধ:

প্রথমত: একজন সাধারণ মুসলিম হিসেবে; এবং এই ক্ষেত্রে তার দায়বদ্ধতা ঠিক অন্য সাধারণ মুসলিমদের মতোই সমান।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আবশ্যকতা পূরণে তার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি দায়বদ্ধ।

তৃতীয়ত: নির্বাহী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ও অধিকারী হিসেবে তিনি দায়বদ্ধ, এবং অন্য সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা যেহেতু তার সাধারণ শাসনকর্তৃত্ব থেকেই উৎসারিত, তাই এটি দাবি করে যে, তিনি ইসলামী ভূখণ্ডের সকল অঞ্চলের তার গভর্নর, উজির এবং প্রতিনিধিদের সকল কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে খলিফা ও অন্যান্য শাসকদের ক্ষমতা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সুনির্ধারিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ যদি ইসলামি আইন লঙ্ঘন করেন, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, কিংবা মুসলিম সমাজের জনকল্যাণ থেকে বিচ্যুত হন; তবে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য একদিকে যেমন আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন, তেমনি অন্যদিকে আইন ও ইসলামি জনমতের কাছেও দায়বদ্ধ থাকবেন। আর এ কারণেই দায়বদ্ধতার নীতিমালা খলিফা ও অন্যান্য শাসকদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য, ঠিক যেমন তা অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য হয়।

এর কারণ হলো ইসলামে নেতৃত্ব একটি আমানত, আর প্রত্যেক আমানতদার ব্যক্তি তার উপর অর্পিত আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তাই খলিফা উম্মাহর যে সকল অধিকারের আমানত লাভ করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি দায়ী। তবে খলিফার দায়িত্বের পরিধি ও ব্যাপ্তি সকল সাধারণ ব্যক্তির দায়িত্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত; কারণ এই দায়িত্ব অত্যন্ত ভারী, যা তার কাঁধে অর্পিত বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহের গুরুত্ব অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমনকি এতে সকল মুসলিমের জন্য মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্বও অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই বিভিন্ন নস (শরয়ি দলিল) নিশ্চিত করেছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচাইতে কঠিন আজাব ভোগ করবে জালেম ইমাম। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য মুসলিমদের প্রতি জারিকৃত আদেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে সাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন: ওমর যখন মানুষকে কোনো বিষয়ে নিষেধ করতে চাইতেন, তখন তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন: "আমি যেন জানতে না পারি যে, আমি যা থেকে নিষেধ করেছি তোমাদের কেউ তাতে লিপ্ত হয়েছে, অন্যথায় আমি তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেব।" ওমর এমনটি করতেন কারণ তিনি মনে করতেন

যে, খলিফাই হচ্ছেন সকল মুসলিমের জন্য উত্তম আদর্শ। আর খলিফা ও তাঁর পরিবার যদি আইনকে সম্মান করার এবং তার প্রতি অনুগত হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী না হন, তবে এটি সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে আইনের বিধিবিধানকে অবজ্ঞা করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটি তাঁর এই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পথে থাকবে যতক্ষণ তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শকগণ সঠিক পথে সুদৃঢ় থাকবেন।" এবং তাঁর এই উক্তি: "প্রজারা ইমামের প্রতি তেমনই আচরণ করবে, যেমন আচরণ ইমাম আল্লাহর প্রতি করবেন। ইমাম যখন যথেচ্ছ বিচরণ করবেন, প্রজারাও তখন যথেচ্ছ বিচরণ করবে।" অর্থাৎ, ইমাম যখন আল্লাহর আনুগত্য করবেন, প্রজারাও তাঁর আনুগত্য করবে; আর তিনি যখন আল্লাহর অবাধ্য হবেন, প্রজারাও তাঁর অবাধ্য হবে। সুতরাং ইমামের সততা, আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের মাত্রার ওপরই প্রজাদের অবস্থা নির্ভর করে। এই কারণে ইসলামি শরিয়াহ শাসকদের দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছে; কেননা শাসকের পক্ষ থেকে আইনকে সম্মান না করা এবং তা লঙ্ঘন করার দুঃসাহস রাষ্ট্রের সকল বিভাগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, দেশে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয় এবং প্রজাদের আইনের আনুগত্য থেকে বিমুখ করে তোলে।

নবম পাঠ

শারয়ি রাজনীতি

অধিকার ও স্বাধীনতা

ইসলামি ব্যবস্থায় অধিকার ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত ভূমিকা:

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা এবং তাদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। এটি একগুচ্ছ ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা নির্ধারণের মাধ্যমে করা হয়, যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হিসেবে গণ্য হয়। রাষ্ট্রের জন্য এগুলো লঙ্ঘন করা বা অতিক্রম করা বৈধ নয়; অন্যথায় রাষ্ট্রটি স্বৈরাচারী এবং অবৈধ বা অসাংবিধানিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হবে।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই পরিচিতি পেয়েছে। তখন 'মানবাধিকারের ঘোষণা' নামক একটি দলিল জারি করা হয়েছিল এবং সেখানে মানুষের সহজাত অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই অধিকারসমূহ একজন মানুষ হওয়ার কারণেই তার জন্য সাব্যস্ত হয় এবং এগুলো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। অতএব, আমরা যেমনটি উল্লেখ করেছি— রাষ্ট্রগুলোর জন্য এই অধিকারসমূহ লঙ্ঘন বা অতিক্রম করা বৈধ নয়।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে তাদের অনুসৃত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত শাসনব্যবস্থার ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে এই অধিকারগুলো নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা হয়:

- প্রথাগত ব্যক্তিগত অধিকার, যা মানুষকে কেবল একজন স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়।

- অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, যা ব্যক্তিদের জন্য একটি সুসংগঠিত সমাজের সদস্য হিসেবে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অবশ্যই এই অধিকারগুলো রক্ষায় ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। রাষ্ট্র কেবল সেই নেতিবাচক প্রতিশ্রুতির ওপর ক্ষান্ত থাকবে না, যা তার কর্মকাণ্ডকে শুধুমাত্র জাতি রক্ষা, দেশ রক্ষা এবং ব্যক্তিদের স্বার্থকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।

পৃষ্ঠা 108

শরয়ী রাজনীতি
নবম পাঠ

ব্যক্তিগত চিন্তাধারায় স্বাধীনতার যে ধারণা একদল দার্শনিক যেমন "জাঁ-জ্যাক রুসো", "জন লক" এবং "ভলতেয়ার" প্রমুখ প্রচার করেছেন, তা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিদ্যমান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরেছিলেন "কার্ল মার্কস" এবং তাঁর পথ অনুসরণকারীগণ। কারণ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অনুসারীদের দৃষ্টিতে, স্বাধীনতা কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজেই নিশ্চিত করা সম্ভব যা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অগ্রপথিকদের উপস্থাপিত সেই তত্ত্বগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হয়েছিল।

পক্ষান্তরে, ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকারসমূহ একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর নির্ধারিত হয়, যার মূলকথা হলো: সকল মানুষই মহান স্রষ্টা কর্তৃক সম্মানিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" [আল-ইসরা: ৭০]। তারা সবাই, শাসক হোক বা শাসিত, আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্যই সৃজিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আমি জীন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [আয-যারিয়াত: ৫৬]। আর ইবাদত বলতে আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা এবং মহান আল্লাহ তাঁর শরিয়তে যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন সেই অনুযায়ী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিষয়াদি সংজ্ঞায়িত করাকে বোঝায়।

সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক অধিকার ও স্বাধীনতার ভিত্তি হলো আকীদা এবং এর পদ্ধতি হলো শরিয়ত। এগুলো সেই স্রষ্টার পক্ষ থেকে বিশেষ দান যিনি মানবজাতিকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর বহু সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এর মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ের লক্ষ্যকে অভিন্ন করেছে; আর তা হলো আল্লাহর ইবাদত এবং অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাঁর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্বের অনুগত হওয়া। ফলে ইসলামী ব্যবস্থায় কোনো প্রকার অধিকারের ওপর কোনো সীমালঙ্ঘন দেখা যায় না। সেখানে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত, তবে তা সামষ্টিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে নয়। তেমনিভাবে এর বিপরীতটিও সত্য, তবে তা এমন কোনো স্বৈরাচার বা অন্যায় অবিচারের মাধ্যমে নয় যা ব্যক্তির স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে। সুতরাং সেখানে জনস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য বিদ্যমান যাতে একটি স্বার্থ অন্যটির ওপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার না করে।

পৃষ্ঠা 109

শরয়ি রাজনীতি

এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখ করা আবশ্যক তা হলো, ইসলামি ব্যবস্থায় অধিকার ও স্বাধীনতা সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত বা নিরঙ্কুশ নয়। বরং আমরা ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে যে ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করেছি, তার পাশাপাশি—ফিকহি মূলনীতি অনুযায়ী—বৃহত্তর ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে সর্বদা ক্ষুদ্রতর ক্ষতি সহ্য করে নেওয়া আবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ: বিধানদাতা (শারেই) যদি ব্যক্তিদের মালিকানার অধিকার প্রদান করেন, তবে তিনি সেটিকে একটি শরয়ি কারণ থেকে উদ্ভূত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করেছেন। যেমন মুবাহ বা বৈধ বস্তু হস্তগত করা, অথবা বিভিন্ন চুক্তি ও লেনদেন: যেমন ক্রয়-বিক্রয়, দান, অসিয়ত, ইজারা, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি। তবে শর্ত হলো, এই চুক্তিগুলো বিধানদাতার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের রুকন ও শর্তাবলি পরিপূর্ণ করতে হবে। আবার মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রেও অর্জিত হতে পারে; যা এক্ষেত্রে বিধানদাতার হুকুমে একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা এবং এটি উত্তরাধিকারী বা মৃত ব্যক্তি—কারো ইচ্ছাধীন নয়।

অনুরূপভাবে ইসলাম সম্পদ বিনিয়োগ ও তা বৃদ্ধির এমন পন্থা নির্ধারণ করেছে যা সমাজকে সুদের কলঙ্ক থেকে মুক্ত রাখে অথবা মাদক, মদ ও এই জাতীয় হারাম জিনিসের ব্যবসার মাধ্যমে অবৈধ উপার্জনের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করে; যে বিষয়গুলো আধুনিক সমাজগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যারা মুখে স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়ায় অথচ বাস্তবের স্বাধীনতার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

তেমনিভাবে বিধানদাতা সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতা না করার অনুমতি দিয়েছেন এবং ব্যয় যেন স্বীকৃত শরয়ি খাতসমূহে হয় সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামি ব্যবস্থায় জনস্বার্থে—যেমন সাধারণ রাস্তা প্রশস্ত করা বা নদী খনন করা ইত্যাদি প্রয়োজনে—ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা বৈধ। অনুরূপভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য মালিকের ওপর জোরপূর্বক তার সম্পদ বিক্রয় করাও বৈধ।

সুতরাং এগুলো সবই ব্যক্তির মালিকানা স্বত্বের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ; যাতে অধিকারটি বিধানদাতার নির্ধারিত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা যেন স্বৈরাচার, সীমা লঙ্ঘন কিংবা অন্যদের ক্ষতি করার মাধ্যম না হয়।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

এই বিভাজনের পর আমরা মনে করি এটি সমীচীন হবে যে, আমরা সেই বিভাজনটি অনুসরণ করি যা আইনবিদগণ অধিকারের তালিকা নির্ধারণে এবং সেগুলোকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক হিসেবে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে অবলম্বন করেন; আর এটি করা হয়েছে তুলনামূলক আলোচনার পথ সহজ করার স্বার্থে।

তাই আমরা এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব:

প্রথমত: ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার বিশেষ তালিকা:

আধুনিক সাংবিধানিক আইনশাস্ত্র অনুযায়ী এই অধিকার ও স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা:

এই ধরণের স্বাধীনতাকে একজন ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি মনে করা হয় যা তার ভোগ করা উচিত; কারণ এটি তার মানবিক মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত যা মহান সৃষ্টিকর্তা তার জন্য নিশ্চিত করেছেন। সাংবিধানিক আইনশাস্ত্রে এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

ক. চলাফেরার স্বাধীনতা:

এর অর্থ হলো একজন ব্যক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে, দেশ ত্যাগ করতে এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসতে স্বাধীন হবে এবং এ বিষয়ে তার স্বাধীনতার ওপর কোনো বিধি-নিষেধ থাকবে না, তবে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও আইনের প্রয়োজনে যা করা হয় তা স্বতন্ত্র। এটি ব্যক্তিদের একটি অধিকার যা ইসলামী ব্যবস্থা স্বীকৃতি দিয়েছে, যা মানুষকে জীবিকা অন্বেষণে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জমিনে বিচরণ ও তার পথে পথে চলার আহ্বান জানায়। খুলাফায়ে রাশিদীনের খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রবীণ সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মদীনা ত্যাগে বাধা দিতেন; যাতে করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাদের সাথে পরামর্শ করা সহজ হয়। যদি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করেন, তবে এটি চলাফেরার স্বাধীনতার এক প্রকার সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য হয়। যাই হোক, জমিনে প্রচেষ্টার স্বাধীনতা যেহেতু একটি ব্যক্তিগত অধিকার, তাই এটি কোনোভাবেই ব্যাহত করা সমীচীন নয় এবং আবশ্যকও নয়—

...ব্যক্তির স্বাধীনতা কেবল তার চেয়ে উচ্চতর কোনো কল্যাণের স্বার্থেই সীমাবদ্ধ করা যাবে। তবে বর্তমান বিশ্বে যেমনটি দেখা যায় যে, কেবল ব্যক্তির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় তাকে সীমাবদ্ধ করা, এটি এমন এক কাজ যা ইসলামি ব্যবস্থা সমর্থন করে না। কেননা ইসলামি ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয়তাকে সর্বদা তার যথার্থ প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা হয়।

খ. নিরাপত্তার অধিকার:

সাংবিধানিক ফিকহ শাস্ত্রে এই অধিকারের অর্থ হলো: আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত এবং আইনে বর্ণিত সকল পদক্ষেপ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, আটক বা কারারুদ্ধ করা বৈধ নয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও দায়মুক্তি নিশ্চিত হয়—অর্থাৎ যেকোনো প্রকার আক্রমণ থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদান করা। ইসলামি ব্যবস্থায় মূলত কোনো মানুষকে গ্রেপ্তার করা, ভীত-সন্ত্রস্ত করা বা কারারুদ্ধ করা বৈধ নয়, যদি না তার পেছনে এমন কোনো শরয়ি কারণ থাকে যা এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণকে অনিবার্য করে তোলে। ইসলামে শাস্তির ক্ষেত্রটি প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত সংকুচিত; তাই সুস্পষ্ট আইনি ঘোষণা ব্যতীত কোনো কাজকে অপরাধ সাব্যস্ত করা যায় না এবং তার জন্য কোনো শাস্তিও প্রদান করা যায় না। কেবল ব্যক্তিগত মত বা গবেষণার ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারিত হয় না; কারণ এটি সুপরিচিত যে, সন্দেহের উপস্থিতিতে নির্ধারিত দণ্ডবিধি রহিত হয়ে যায়। আর মানুষের মৌলিক অবস্থা হলো নির্দোষ হওয়া, যতক্ষণ না এর বিপরীতে কিছু প্রমাণিত হয়। এ কারণেই ইসলামি ব্যবস্থা মানুষের নিরাপত্তার অধিকারের ওপর যেকোনো প্রকার হস্তক্ষেপকে—তা তার শরীরের ওপর হোক বা তার জনজীবনে হোক—এক ধরণের জুলুম হিসেবে গণ্য করে এবং এর জন্য কঠোরতম শাস্তির হুঁশিয়ারি প্রদান করে।

মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে, যে কোনো মানুষকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করে, তাকে এমন এক অপরাধী হিসেবে গণ্য করেছেন যেন সে সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কোনো মানুষের প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই পুনর্জীবন দান করল। আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আর

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করাকে অলঙ্ঘনীয় সাব্যস্ত করেছেন। বিদায় হজের ভাষণে তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য তেমনি পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, যেমন তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে এবং তোমাদের এই শহরে পবিত্র। শোনো! আমি কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।"

গ. বাসগৃহের পবিত্রতা:

এর অর্থ হলো, আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে এবং বিশেষ কিছু জরুরি অবস্থা ছাড়া কোনো ব্যক্তির বাসগৃহে অনধিকার প্রবেশ করা বা তল্লাশি চালানো বৈধ নয়। বাসগৃহ বলতে সেই স্থানকে বোঝানো হয় যেখানে...

নবম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ব্যক্তি তাতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাই ব্যক্তিগত বাসস্থানের এমন এক পবিত্রতা ও মর্যাদা রয়েছে যা জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত লঙ্ঘন করা জায়েয নয়। এটি বলা বাহুল্য যে, এই অধিকারটি মহান আল্লাহর বাণীতে সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেন: “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং তার বাসিন্দাদের সালাম দাও। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, তবে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয় ‘ফিরে যাও’, তবে তোমরা ফিরে যাবে; এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।” [আন-নূর: ২৭-২৮]

এই মহান বাণীর মাধ্যমে বাসস্থানের পবিত্রতা ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে; যার ফলে কোনো ব্যক্তির জন্য তার নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করা জায়েয নয়। বরং তাকে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দিতে হবে। কারো বাসস্থানে তার অনুপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা জায়েয নয়। আর যখন প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাবে না, তখন ফিরে যাওয়া আবশ্যক; যা মহান আল্লাহর নিকট অধিকতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তিনি অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত যে, কে বাসস্থানের মর্যাদা রক্ষা করতে চায় আর কার মনে তা লঙ্ঘন করার কিংবা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় দেখার ইচ্ছা রয়েছে।

ঘ. পত্রালাপের গোপনীয়তা:

এর অর্থ হলো ব্যক্তিদের মধ্যকার চিঠিপত্রের গোপনীয়তা বাজেয়াপ্ত করা বা তা নষ্ট করা জায়েয নয়। কারণ এতে পত্রের মালিকানা স্বত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়; যা চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। ইসলামি ব্যবস্থায় চিঠিপত্রের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা জায়েয নয়; যেহেতু তা তার মালিকের সম্পদ। তাই এতে হস্তক্ষেপ করা অন্যের অধিকার হরণ করার নামান্তর, যা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকারীর অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত বৈধ নয়। তদুপরি, একটি চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত তা গচ্ছিত সম্পদ (ওয়াদিয়াহ) হিসেবে গণ্য হয়।

এটি সর্বজনবিদিত যে, গচ্ছিত সম্পদ (ওয়াদিয়াহ) একটি আমানত। আর মহান আল্লাহ আমানত তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার পক্ষে তাতে হস্তক্ষেপ করা বা নিজ খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার করা জায়েয নয়। কারণ এতে গোয়েন্দাগিরি এবং অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় অনুসন্ধানের শামিল রয়েছে, যা থেকে শরীয়ত

আমাদের নিষেধ করেছে এবং সতর্ক করেছে।

শরিয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
নবম পাঠ

যাই হোক, আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই স্বাধীনতাগুলো কোনোভাবেই সমাজের সাধারণ স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করা বৈধ নয়। সুতরাং এটি স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্র সমাজের কল্যাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার অধিকার রাখে। বিশেষ করে যখন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের বিশ্বস্ততা নষ্ট হয় এবং বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে; এমন পরিস্থিতিতে ন্যায়পরায়ণ শরিয়াহ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বিধিনিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা রাখে যা বিপদ প্রতিরোধ করবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করবে।

২. চিন্তার স্বাধীনতা:

আধুনিক সাংবিধানিক চিন্তাধারায় এই স্বাধীনতা দ্বারা বোঝানো হয়:
- বিশ্বাসের স্বাধীনতা।
- মতপ্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতা।
- শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা।

ইসলামী ব্যবস্থায় চিন্তার স্বাধীনতা তার বিভিন্ন অনুষঙ্গসহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক স্বাধীনতা হিসেবে গণ্য করা হয়, যার ওপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল—যেমনটি স্রষ্টা (তাঁর মহিমা উচ্চ হোক) মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাগুলো—যা নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে—যদি মানুষের বস্তুগত দিককে সুরক্ষা প্রদান করে, তবে চিন্তার স্বাধীনতা তার আধ্যাত্মিক বা অবস্তুগত দিকগুলোকে সুরক্ষা দেয়। আর মানুষের জন্য বস্তুগত দিকের তুলনায় এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই মহান আল্লাহর কিতাবে এমন স্পষ্ট আয়াতসমূহ এসেছে যা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তাকে তার বিবেক ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুই জন করে অথবা একা একা দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর চিন্তা করো।" [সাবা: ৪৬]।

এবং মহান আল্লাহ বলেন: "আর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সব নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।" [আল-জাসিয়া: ১৩]।

মহান আল্লাহ বলেন: "বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করবে না?" [আল-আন'আম: ৫০] ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আরও অনেক আয়াতে মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় রাখা, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ এবং গোঁড়ামির নিন্দা করা হয়েছে। আমাদের পূর্বসূরি মুসলিম সম্প্রদায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা চর্চা করেছেন; যার ফলে তাদের সেই সকল উপকারী ও ফলপ্রসূ জ্ঞানের নির্যাস আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সম্ভবত এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাবসমূহ, যা ইস্তিনবাতের (বিধান আহরণ) ক্ষেত্রে মাযহাবের ইমামগণের স্বীকৃত মূলনীতি ও নিয়মানুযায়ী ইসলামী ফিকহে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধুনিক সাংবিধানিক আইনশাস্ত্রে অনুসৃত বিভাজন অনুযায়ী আমরা এই বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করব, যাতে এই বিষয়ে ইসলামী ব্যবস্থায় কী নির্দেশিত হয়েছে তা আমরা জানতে পারি:

ক. বিশ্বাসের স্বাধীনতা:

মানবরচিত সাংবিধানিক আইনশাস্ত্রে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—ব্যক্তির নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোনো ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ করার স্বাধীনতা, আবার কোনো ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ না করার স্বাধীনতা। গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে সেই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা, কোনো ধর্মেই বিশ্বাস না রাখার স্বাধীনতা এবং তার ওপর কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম চাপিয়ে না দেওয়া কিংবা বাহ্যিক কোনো আচার পালন বা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় অংশগ্রহণে বাধ্য না করার স্বাধীনতা এবং নিজের ধর্ম পরিবর্তন করার স্বাধীনতা। এই সবকিছুই জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার পরিধির ভেতরে—এটি হলো মানবরচিত আইন এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা।

বাস্তবে মানবসভ্যতা অতি নিকট অতীতেই কেবল এই স্বাধীনতা লাভের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছে। এর আগে প্রায়শই ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোনো আকিদাহ বা বিশ্বাস গ্রহণে বাধ্য করা হতো। এমনকি আজও আমরা দেখতে পাই যে, সমসাময়িক অনেক দেশেই বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিদ্যমান নেই; যেখানে বহু মানুষকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় অথবা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা প্রদান করা হয়। তারা যে বিশ্বাস পোষণ করে, তা লালন করার কারণে তারা চরম সহিংসতা ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সূচনালগ্ন থেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা বা আকিদাহর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।" [আল-বাকারা: ২৫৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন: "তবে কি তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে

যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়?" [ইউনুস: ৯৯]

শাওকানি তাঁর তাফসিরে বলেছেন: অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, এটা তোমার সামর্থ্যের মধ্যে নেই এবং তোমার ক্ষমতার আওতাধীন নয়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে এবং তাঁর মনের সেই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে যা সবার সংশোধনের আকাঙ্ক্ষার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ যদি সবার সংশোধন হতো, তবে তা প্রকৃত সংশোধন হতো না, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জানা কোনো এক হিকমতের কারণে তা বিশৃঙ্খলার অধিক নিকটবর্তী হতো। সুতরাং ইসলামে কারো আকিদাহ পরিবর্তন করতে এবং তার পরিবর্তে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনো জবরদস্তি নেই। তবে বাস্তবে ইসলামে দীনের দিকে আহ্বানের নির্দেশ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।" [আন-নাহল: ১২৫]

কিন্তু দাওয়াত বা আহ্বান এক জিনিস আর দীনে প্রবেশের জন্য জবরদস্তি করা অন্য জিনিস। ইসলামে এটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, আমরা তাদের এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকে তাদের মতো করে ছেড়ে দেব। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদের আকিদাহ ও ইবাদতের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। ইসলামি ব্যবস্থায় আকিদাহর স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধের বৈধতা স্বীকৃত; কারণ মুশরিকরা মুসলিমদের জন্য ওঁত পেতে থাকত, ফলে তারা মুসলিমদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বাধা প্রদান করত এবং এই কারণে তাদের ওপর নির্যাতন চালাত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হলো; কারণ তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম। তাদের এমনভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে যে, কেবল তারা বলেছিল: 'আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।" [আল-হাজ্জ: ৩৯-৪০]

আর যদি আমরা ইসলামি রাষ্ট্রের আশ্রয়ে বসবাসকারী অমুসলিম বা জিম্মিদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই, তবে দেখতে পাব যে, তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করা হতো যেখানে কোনো নির্যাতন বা জবরদস্তি ছিল না, এবং প্রায়শই...

নবম পাঠ

মুসলিম খলিফারা অনেক বিষয়ে তাদের (অমুসলিমদের) নিজেদের নিকটবর্তী করতেন, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং রাষ্ট্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োজিত করতেন। এমনকি খলিফা হারুনুর রশীদ সমস্ত বিদ্যালয়কে "ইউহান্না বিন মাসাওয়াইহ"-এর তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। এটি এই কথারই প্রমাণ যে, তাদের সাথে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করা হতো। এর প্রেক্ষিতে, অমুসলিমদের ওপর মাঝে মাঝে যে নিপীড়ন বা অনুদার আচরণের উদাহরণ পাওয়া যায়, তা ইসলামের বিধানের লঙ্ঘন এবং তা থেকে বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য। এটি মূলত ধর্মীয় নয় বরং রাজনৈতিক কারণে হয়ে থাকে; কারণ খ্রিস্টান ইউরোপ নিজেই সেই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষোভ উসকে দিয়েছিল, যা তারা ক্রুশের পতাকাতলে সংগঠিত করেছিল এবং যার মাধ্যমে মুসলমানদের মর্যাদা ও পবিত্র স্থানসমূহের পবিত্রতা নষ্ট করেছিল।

এই পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন, আর তা হলো ইসলাম ত্যাগ করাকে (ইরতিদাদ) অপরাধ সাব্যস্ত করা এবং এর জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা; যা ইসলামের কিছু শত্রুকে তার বিরুদ্ধে গোঁড়ামির অভিযোগ তুলতে প্ররোচিত করেছে:

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি—যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। কিন্তু যখন কিছু লোক প্রতারণামূলকভাবে দ্বীনে প্রবেশ করে এবং ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে তা ত্যাগ করে, তখন ইসলামের কাছে কী প্রত্যাশা করা যায়? ইসলাম তাদের হাত টেনে ধরা (প্রতিহত করা) ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে? অন্যথায়, আমরা দেখেছি যে ইসলাম তার রাষ্ট্রে জিম্মি এবং অন্যান্যদের জন্য—যারা মুসলমানদের আশ্রয়ে বসবাস করতে চায়—চমৎকার পর্যায়ের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়; যাতে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব ঠিক মুসলমানদের মতোই হয়ে থাকে। তাহলে কেন তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করে এবং পুনরায় তা ত্যাগ করে?! যুক্তি স্বাভাবিকভাবেই বলে যে, এর পেছনের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা এবং তাদের রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষতি সাধন করা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“আর আহলে কিতাবদের একদল বলল, দিনের শুরুতে সেই বিষয়ের ওপর ঈমান আনো যা মুমিনদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং দিনের শেষে তা অস্বীকার করো, যাতে তারা (নিজেদের ধর্ম থেকে) ফিরে যায়।” [আলে ইমরান: ৭২]

পৃষ্ঠা 117

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
নবম পাঠ

ইবনে আব্বাস এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন: "তারা দিনের শুরুতে তাদের সাথে থাকত, তাদের সাথে বসত এবং তাদের সাথে কথা বলত; অতঃপর যখন সন্ধ্যা হতো এবং সালাতের সময় উপস্থিত হতো, তখন তারা তা অস্বীকার করত এবং তাকে বর্জন করত।"

তবে কি ইসলাম হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এবং তার শত্রুদের সেই আকিদাহগত স্বাধীনতার নামে সুযোগ দেবে যা সে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, অথচ তারা তার অপব্যবহার করছে?

সে কি তাদের এই সুযোগ দেবে: তাকে কলঙ্কিত করার, তার আকিদাহকে অবমাননা করার, তার শরীয়তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার এবং তার অনুসারীদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার?!

এজন্যই ইসলামী ব্যবস্থায় মুরতাদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, আর তা হলো তাওবাহ করার সুযোগ দেওয়ার পর মৃত্যুদণ্ড; যাতে এর ফলে মুসলিম জামাআতের যে ক্ষতি হয় তা প্রতিহত করা যায়। ইসলামী ব্যবস্থায় এই শাস্তি এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন মুরতাদ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এমন একটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যা সে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নিজের ওপর আরোপ করেছিল এবং সে রাষ্ট্রের আকিদাহ ও ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করে; তাই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমনটি আসমানী এবং মানবরচিত উভয় আইনেই স্বীকৃত। ইসলামের শত্রুরা যদি মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামির দায়ে অভিযুক্ত করে, তবে সংরক্ষিত ও অকাট্য ইতিহাস আমাদের নিশ্চিতভাবে প্রমাণ দেয় যে, অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ পেত এবং তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হতো। ফলে তাদের ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা সংরক্ষিত ছিল। পক্ষান্তরে সেই সময়ে আন্দালুসে খ্রিস্টান ইউরোপ মুসলমানদের বিভিন্ন ধরণের যাতনা দিচ্ছিল এবং জঘন্যতম নিপীড়নের মাধ্যমে তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করছিল এবং যারা তা প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের ওপর অটল থাকত তাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করত। এমনকি খ্রিস্টানদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের চাবুকের তলায় আন্দালুস দেশ অতি অল্প সময়ে পরিবর্তিত হয়ে একটি খ্রিস্টান দেশে পরিণত হয় যেখানে কোনো মুসলিম অবশিষ্ট ছিল না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাউকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার অথবা আকিদাহর কারণে কাউকে নিপীড়ন করার ঘটনা কখনোই ঘটেনি। আর তা ঘটবেই বা কীভাবে যখন মহান আল্লাহ বলেন: **“দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।”**

দীন [আল-বাকারা: ২৫৬] প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেন: অর্থাৎ কাউকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশের জন্য বাধ্য করো না; কেননা এটি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং এর প্রমাণ ও দলিলসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল। কাউকে এতে প্রবেশের জন্য বাধ্য করার প্রয়োজন নেই, বরং আল্লাহ যাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত দিয়েছেন, যার বক্ষ উন্মোচিত করেছেন এবং যার অন্তর্দৃষ্টিকে আলোকিত করেছেন, সে স্বয়ং সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এতে প্রবেশ করেছে। আর আল্লাহ যার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন এবং যার শ্রবণ ও দর্শনের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাকে জোরপূর্বক ও বাধ্য করে ধর্মে প্রবেশ করানো কোনো উপকারে আসবে না।

কিছু মুফাসসির বলেছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ঈমানের বিষয়টি বাধ্যবাধকতা ও জবরদস্তির ওপর রাখেননি, বরং সক্ষমতা ও পছন্দের ওপর রেখেছেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন, তবে জমিনে যারা আছে তারা সবাই একত্রে ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়?" [ইউনুস: ৯৯]। অর্থাৎ: তিনি চাইলে তাদের ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি বরং বিষয়টি ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করেছেন।

খ. চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা:

ইসলামী ব্যবস্থায় এটি সুনিশ্চিত যে, অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধি (আকল); এই কারণেই আমরা পবিত্র কুরআনকে দেখি যে তা মানুষকে প্রতিনিয়ত বুদ্ধি ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করে; যাতে তা তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। কুরআনের আয়াতসমূহে প্রায়ই এই শব্দগুলো দেখা যায়: "তারা অনুধাবন করে" [হজ্জ: ৪৬], "তারা চিন্তা-গবেষণা করে" [আল ইমরান: ১৯১], "তারা জানে" [মায়িদা: ১০৪], "তারা গভীরভাবে চিন্তা করে" [মুহাম্মদ: ২৪], "তারা বোঝে" [ফাতহ: ১৫], "নিশ্চয়ই এটি বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ" [যুমার: ২১]।

এর মাধ্যমে কুরআন মূলত সর্বদা মানুষের জীবনকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যা গভীর পর্যবেক্ষণ, তত্ত্ব উদ্ঘাটন এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহর সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে চিন্তার ওপর নির্ভরশীল। তাই মানুষের চিন্তা করার স্বাধীনতা ইসলামে তার সূচনালগ্ন থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দ্বীন ও শরীয়তের বেষ্টনীকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এটি সত্য যে, এই অধিকার হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মানুষের জন্য সর্বদা সুনিশ্চিত ছিল, যদিও পরবর্তীতে তা বাধার সম্মুখীন হয়েছে...

...বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন, বিশেষ করে আব্বাসীয় যুগে; যেখানে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে কুরআন সৃষ্টির মাসআলায় আল-মামুনের বিরোধিতা করার কারণে নিপীড়ন করা হয়েছিল। ইমাম মালিককে আবু জাফর আল-মনসুরের আমলে নিপীড়ন করা হয়েছিল; তার ফতোয়ার কারণে যে, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ নয়। ইমাম আবু হানিফাকে নিপীড়ন করা হয়েছিল বিচারকের পদ গ্রহণ না করার কারণে। এছাড়াও ইবনে রুশদ, ইবনে হাযম এবং অন্যান্যদেরও নিপীড়ন করা হয়েছিল।

যাইহোক, যে কোনো অবস্থাতেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক নিপীড়ন ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে না। বরং এটি ছিল এক ভ্রান্ত বাস্তবতা, যা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে করা হয়েছিল। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ বা দলীল হতে পারে না।

ইসলামি ব্যবস্থায় চিন্তার স্বাধীনতা যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, বিশেষ করে ফিকহী ক্ষেত্রে, তার মধ্যে অন্যতম হলো: ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ করা এবং আলেমদের এটি চর্চা করা থেকে বিরত রাখা। এটি ছিল ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর পর ইসলামি চিন্তাধারার স্থবিরতার যুগের একটি সূচনা স্বরূপ; যেখানে আলেম ও ফকিহদের কাজ কেবল পূর্ববর্তীদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, তাখরিজ (মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান বের করা) এবং সেগুলোর ওপর টীকা রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা নব্য উদ্ভাবিত ঘটনাবলীর বিধান উদ্ঘাটনের জন্য নিজেদেরকে গবেষণা ও পর্যালোচনার শ্রমে নিয়োজিত করতেন না। অথচ বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা চর্চা করা সমীচীন, বিশেষ করে ফিকহী ক্ষেত্রে তাদের জন্য যারা এতে সক্ষম; যাতে ইসলামি চিন্তাধারা আধুনিক বিবর্তিত ঘটনাবলীর সাথে তাল মেলাতে পারে। তবে অবশ্যই সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে, যার মধ্যে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য স্বীকৃত শরয়ী শর্তসমূহ বিদ্যমান আছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যেন ইজতিহাদে প্রবৃত্ত না হন। যাতে মূর্খদের জন্য শরীয়তের বিধানাবলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পথ উন্মুক্ত না হয়।

তবে ইসলামি ব্যবস্থায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য কল্যাণকামনা (নসিহত), যেমনটি সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে: ((দীন হলো কল্যাণকামনা। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য))।

কিন্তু শাসকদের নিছক অপদস্থ করা, তাদের সাথে অসদাচরণ করা, তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার মতো অসৎ উদ্দেশ্যে মতপ্রকাশ করা... এবং এ জাতীয় অন্যান্য অসৎ উদ্দেশ্য যা

এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা হয় না, উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কল্যাণও চাওয়া হয় না এবং জনস্বার্থও হাসিল হয় না; বরং এটি দ্বীনের কোনো বিষয় নয়। এটি মূলত মানুষের সম্মানহানি করা, যা দ্বীন হারাম করেছে এবং এ বিষয়ে সতর্ক করেছে।

একইভাবে যেখানে মতভেদের সুযোগ রয়েছে, সেখানে ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি সর্বদা নমনীয়তা প্রদর্শন ও অজুহাত তালাশ করা আবশ্যক; কারণ বিষয়টি ইজতিহাদি হওয়া পর্যন্ত আমাদের মতামত তার মতামতের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। এর ভিত্তিতে, মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিগত মতামত ও বিশ্বাসের অনুসরণে বাধ্য করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরয়ি বিধান ব্যতীত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং শরয়ি বিধানের পরিপন্থী হলে কোনো ব্যক্তিই নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত; কারণ এটি এমন এক বিচ্যুতি যেখানে অনেক সময় মানুষ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আরও আবশ্যক হলো, মানুষ যখন তার মতামত প্রকাশ করবে তখন যেন সর্বদা ইসলামের শিষ্টাচার ও আদব বজায় রাখে। নিজের

মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সে অন্যের মান-সম্মান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না, গালি দেবে না বা কারো ওপর দোষারোপ করবে না। মানুষ ততক্ষণই স্বাধীন যতক্ষণ তার স্বাধীনতা অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণ না হয়। স্বাধীনতা হওয়া উচিত গঠনমূলক, যাতে তার সুফল পাওয়া যায় এবং বিষয়গুলো বিশৃঙ্খল না হয়।

গ. শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতা:

আধুনিক সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ফিকহশাস্ত্রে এই স্বাধীনতার অর্থ হলো: অন্যকে জ্ঞান দান করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার, শিক্ষা লাভ করার অধিকার এবং নিজের পছন্দমতো শিক্ষক নির্বাচন করার অধিকার। ইসলামি ব্যবস্থায় ইসলাম জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করেছে, এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং এর দিকে আহ্বান জানিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: “বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?” [সূরা যুমার: ৯]

মুফাসসিরগণ বলেন: অর্থাৎ যারা জানে যে, আল্লাহ পুনরুত্থান, প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য, আর যারা তা জানে না। অথবা যারা জানে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের প্রতি কী অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা তা জানে না। অথবা এর উদ্দেশ্য হলো আলেম ও জাহেল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই অবগত যে, জ্ঞান ও মূর্খতার মাঝে কোনো সমতা নেই এবং আলেম ও জাহেল কখনো সমান নয়।

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
নবম পাঠ

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই (আলেম) তাঁকে ভয় করে" [ফাতির: ২৮]। এর অর্থ হলো: তাঁর মহান গুণাবলী এবং সুন্দর কার্যাবলী সম্পর্কে যারা অবগত, তারাই আল্লাহকে অদৃশ্যে ভয় করে। সুতরাং আলেমরাই হলেন আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় পোষণকারী এবং তাঁর ক্ষমতাকে মহিমান্বিতকারী ব্যক্তি।

সুন্নাহর মধ্যেও এমন বিষয় রয়েছে যা একে সমর্থন করে; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" তিনি আরও বলেছেন: "একজন আবেদের ওপর একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব হলো সমস্ত তারকারাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়।"

ইসলাম কখনো কখনো জ্ঞানার্জনকে শরীয়াহগতভাবে আবশ্যক করেছে, এটি কেবল কোনো সাধারণ অধিকার নয় যা মানুষ চাইলেই ত্যাগ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যেন তারা বেঁচে থাকতে পারে" [আত-তাওবাহ: ১২২]।

কিছু মুফাসসির এই মত পোষণ করেছেন যে, এই আয়াতটি জিহাদের অবশিষ্ট বিধানাবলির অংশ নয়, বরং এটি জ্ঞান অন্বেষণ এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র বিধান। আল্লাহ তাআলা একে জিহাদের জন্য বের হওয়া ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, ফলে সফর দুই প্রকার হয়:

প্রথম: জিহাদের সফর।
দ্বিতীয়: জ্ঞান অন্বেষণের সফর।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সফরের আবশ্যকতা তখনই দেখা দেয়, যখন ছাত্র নিজ জনপদে সফর করা

ছাড়াই এমন কাউকে পায় না যার কাছ থেকে সে শিখতে পারে। আর ফিকহ হলো মূলত শরীয়তের বিধানাবলির জ্ঞান।

৩. সমাবেশের স্বাধীনতা:

রাজনৈতিক ফিকহ এবং প্রচলিত সাংবিধানিক আইনে এই স্বাধীনতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:
- সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা।

- এবং সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা।

জনসভার স্বাধীনতা বলতে বোঝায়: কোনো স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একত্রিত হওয়ার ব্যক্তিবর্গের অধিকার; যাতে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, চাই তা ভাষণ, সেমিনার, বক্তৃতা বা তর্কমূলক আলোচনার আকারে হোক... ইত্যাদি।

আর সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা বলতে বোঝায়: এমন সুসংগঠিত দল গঠন করা যাদের স্থায়ী অস্তিত্ব থাকবে, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালিত হবে এবং যার কার্যক্রম পূর্বনির্ধারিত থাকবে। এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত হলো, কোনো ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো সংগঠনে যোগদান করতে পারবে—যতক্ষণ তার উদ্দেশ্য সঠিক থাকে। আর কাউকে নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনে যোগ দিতে বাধ্য করা বৈধ নয়। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি ব্যবস্থায় ব্যক্তিদের এই সকল স্বাধীনতা প্রদানে কোনো বাধা নেই, যতক্ষণ না এর লক্ষ্য জনশৃঙ্খলার পরিপন্থী হয়; কারণ তখন তা শরীয়তের কোনো অকাট্য পাঠ (নস) বা শরীয়তের কোনো সামগ্রিক মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে। সুতরাং যদি জমায়েতটি কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে হয়, যেমন— জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ বা জামাতে নামাজ আদায় করা... ইত্যাদি; তবে তা যে উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের হুকুম লাভ করবে। আর যদি জমায়েতটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অনভিপ্রেত কোনো উদ্দেশ্যে হয়, যেমন— জুয়া খেলা বা মন্দের ওপর একতাবদ্ধ হওয়া... ইত্যাদি; তবে তা হারাম হবে; কারণ এটি ইসলামি জনশৃঙ্খলার পরিপন্থী—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি।

৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:

সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কর্ম ও উপার্জনের স্বাধীনতা এবং মালিকানার স্বাধীনতা। মানুষের জন্য এই স্বাধীনতাগুলো এজন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সে তার পূর্ণ প্রচেষ্টা ও শক্তি দিয়ে গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ কাজে লিপ্ত হতে পারে, যার সুফল তার নিজের এবং সে যে সমাজে বসবাস করে তার ওপর ফিরে আসে:

ক. কাজ ও উপার্জনের স্বাধীনতা:

ইসলাম কর্মের ধর্ম; এটি মানুষকে কর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। বৈধতার কাঠামোর মধ্যে থাকা পর্যন্ত ইসলাম এক কাজ ও অন্য কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। মহান আল্লাহ বলেন: "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তার দিগন্তসমূহে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে ভক্ষণ করো। আর তাঁরই কাছে পুনরুত্থান।" [আল-মুলক: ১৫]।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি জমিনকে তাদের জন্য সহজ ও কোমল করেছেন যাতে তারা সেখানে স্থিতি লাভ করতে পারে। তিনি একে রুক্ষ করেননি, যার ফলে সেখানে অবস্থান করা বা চলাফেরা করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ত। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করার আদেশকে বৈধতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেছেন; যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে আহার করতে পারে যা তিনি তাদের জন্য জমিনে সৃষ্টি করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিশ্রমী মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।" তিনি আরও বলেছেন: "মানুষ নিজ হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম আহার আর কখনো গ্রহণ করেনি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর নিজের হাতের কামাই থেকে আহার করতেন।" তাঁর (সা.) আরও বাণী: "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে রাত অতিবাহিত করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় রাত কাটায়।" তাঁর (সা.) আরেকটি বাণী হলো: "মানুষকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের মাধ্যমে রিযিক দান করেন।"

ইসলাম যেহেতু মানুষকে এভাবে কাজ করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তাই এটি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপযোগী কাজ বেছে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে; কারণ এ ক্ষেত্রে মানুষের সক্ষমতা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যা একজনের জন্য উপযুক্ত তা অন্যজনের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমন কাজ বেছে নেওয়া জায়েজ যা তার জন্য উপকারী হয়। আর স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের জন্য এটি বৈধ যে, সমাজে জনস্বার্থ রক্ষার্থে ব্যক্তির কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা। ফলে রাষ্ট্র মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু ফসল চাষের জন্য কৃষিখাতকে সুসংগঠিত করতে পারে, যার ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি গতিশীল হয় অথবা জাতি তার খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে... ইত্যাদি। একইভাবে জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ফসল উৎপাদন নিষিদ্ধ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে, যেমন—গাঁজা, ক্বাত... ইত্যাদি চাষ করা। রাষ্ট্র একইভাবে শিল্প ও বাণিজ্যকেও সুসংগঠিত করতে পারে। শুধু এটাই নয়, বরং রাষ্ট্রের ওপর...

ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা, তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের উপকরণসমূহ সহজ করে দেওয়া, বেকারত্ব দূর করা এবং তাদের অনিষ্ট থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

খ. মালিকানার স্বাধীনতা:

আমরা একদিকে দেখতে পাই যে, ব্যক্তিবাদী মতাদর্শ ব্যক্তিগত মালিকানাকে অবাধ স্বাধীনতা দেয় এবং মালিককে তার সম্পত্তিতে কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়, যদিও তা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এটি মালিকানা স্বত্ব তার অধিকারীকে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করে তার ওপর ভিত্তি করে। অপরদিকে, আমরা এর বিপরীতে দেখতে পাই সামষ্টিক মতাদর্শ, যা ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয় এবং সম্পদের ব্যবস্থাপককে রাষ্ট্রের একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে গণ্য করে, যে তার মক্কেলের পক্ষে প্রতিনিধির মতো কাজ করে।

পক্ষান্তরে ইসলামি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সামষ্টিক মালিকানার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। কারণ ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানাকে সাব্যস্ত করেছে এবং তার সুস্পষ্ট ভাষ্যের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে সমাজের স্বার্থে এর ওপর কিছু বিধি-নিষেধ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানাকে এমনভাবে বৃদ্ধি করার অনুমতি নেই যা সামষ্টিক স্বার্থের ক্ষতি করে, যেমন: মজুতদারি, প্রতারণা, শোষণ... এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা ইসলাম হারাম করেছে। এগুলোকে এমন সব সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যা মালিকের তার সম্পত্তিতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে সীমিত করতে পারে। এছাড়া ধনীদের সম্পদে অভাবীদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য অধিকার তো রয়েছেই।

ইসলাম কর্তৃক ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতির বিষয়টি দ্বীনের অপরিহার্য ও সর্বজনবিদিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। এটি পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং সম্মানীয় হাদিসসমূহে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যেখানে মালিকানাকে মানুষের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চাইবেন না।" [মুহাম্মাদ: ৩৬]। এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে— যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য।" [আল-মাআরিজ: ২৪-২৫]

নবম পাঠ

শরয়ী রাজনীতি

সুন্নাহর মধ্যে বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী রয়েছে: "জেনে রেখো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য হারাম (সম্মানিত), যেমন হারাম তোমাদের এই দিনটি, তোমাদের এই শহরে; যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান, তোমাদের নিকটবর্তীরা যেন দূরবর্তীদের কাছে (এ বাণী) পৌঁছে দেয়।"

আর সামষ্টিক মালিকানার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আমরা এর সবচেয়ে স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই মাসজিদগুলোর ক্ষেত্রে। কারণ পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো মহান আল্লাহর মালিকানাধীন: "আর নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য।" [আল-জিন: ১৮] ।

আর আল্লাহর দিকে মালিকানার এই সম্বন্ধের অর্থ হলো এগুলো মুসলিম জামাআতের মালিকানাধীন, যেখানে তারা তাদের ইবাদত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

তেমনিভাবে সামষ্টিক মালিকানার অর্থ ওয়াকফ ব্যবস্থায়ও প্রকাশ পায়, যা মুসলিমদের জন্য একটি বিশেষ নৈকট্য লাভের মাধ্যম। সেখানে মূল সম্পদ আল্লাহর মালিকানায়—অর্থাৎ মুসলিম জামাআতের জন্য—আটকে রাখা হয় এবং যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তাদের অধিকার শুধুমাত্র এর লভ্যাংশ বা ফল আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, মূল ওয়াকফকৃত সম্পদে কোনো প্রকার

মালিকানাসুলভ হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের থাকে না।

সামষ্টিক মালিকানার অর্থ আরও ফুটে ওঠে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিমদের ওইসব ঘোড়ার জন্য যে ভূমি সংরক্ষিত করেছিলেন তার মাধ্যমে, যেগুলোর ওপর সওয়ার হয়ে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধে যেতেন। আর মানুষের মাঝে বন্টন করার পূর্বে 'ফাই' ও গণিমতের মালের অবস্থাও ঠিক এমনই।

আর ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি-নিষেধের লক্ষ্য হলো এর সামাজিক ভূমিকা পালন নিশ্চিত করা, যাতে এর মালিক উপকৃত হয় এবং অন্যদের কোনো ক্ষতি না হয়। ইসলামী শরীয়ত এই সকল সীমাবদ্ধতার বিধান দিয়েছে। শরীয়ত যদিও মালিকানার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, তবে এই অধিকার নিরঙ্কুশ নয়; বরং এটি কিছু শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই শর্তগুলোর উদ্দেশ্য হলো মালিক যেন শরয়ী সীমানা অতিক্রম না করে এবং তার সকল কর্মকাণ্ড যেন শরয়ী সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়।

শরয়ী রাজনীতি / নবম পাঠ
দ্বিতীয়ত: এই ব্যবস্থায় সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা:

আমরা এখন ইসলামি ব্যবস্থায় সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা বলি:

আঠারো শতকের শেষে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটার পর এবং বিশাল পুঁজিবাদের উত্থান, বড় বড় প্রকল্প প্রতিষ্ঠা এবং মালিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য প্রকট হওয়ার পর, আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য এটি আবশ্যক হয়ে পড়ে যে তারা হস্তক্ষেপ করবে; যাতে মালিক ও নিয়োগকর্তাদের বিপরীতে শ্রমিক ও দুর্বলদের অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল এই শ্রমিকদের জন্য একটি সম্মানজনক জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা, বিশেষ করে তাদের অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং বেকারত্বের সময়ে। আধুনিক সংবিধানগুলো এই অধিকারের সমষ্টিকে "সামাজিক অধিকার" নামে অভিহিত করে।

আর ইসলামের শুরু থেকেই ইসলামি শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে এই অধিকারসমূহ বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে, যা আধুনিক সংবিধানগুলো জানার শত শত বছর পূর্বেই হয়েছে। এর কারণ হলো, ইসলামি শরীয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান, যা ঘটনাপ্রবাহ ও নতুন পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলে। তাই আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকেই এটি এমন সব বিধান দিয়ে আসছে যার দিকে আজ মানবজাতি পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামি ব্যবস্থায় সামাজিক অধিকারের তালিকাটি এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সকল মুমিন একটি দেহের ন্যায়। তাই তাদের সমাজ হতে হবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সহানুভূতিশীল, পরস্পরকে ভালোবাসায় সিক্ত ও দয়াময়। যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিরাজ করবে এবং তা নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এর সদস্যদের মধ্যে ঈমানী বন্ধন সুদৃঢ় থাকবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে: যে অসুস্থ হয়, ক্ষুধার্ত থাকে, বস্ত্রহীন থাকে, কাজ করতে অক্ষম হয় অথবা যার উপর কোন প্রকার অর্থনৈতিক বা সামাজিক জুলুম হয়; সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, যতক্ষণ পর্যন্ত সে একজন মানুষ হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

নিম্নে আমরা ইসলামি ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রগুলো বাস্তবায়নকারী কিছু নমুনা উল্লেখ করব:

---

১. ব্যক্তিবর্গের জন্য রাষ্ট্রের জিম্মাদারি:

এর অর্থ হলো, অভাব বা অসুস্থতার সময় একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ নিরাপত্তা বা গ্যারান্টি লাভ করবে। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় ধ্বংস হবে না যে, অন্যরা তার দিকে তাকিয়ে দেখছে অথচ তারা তার প্রয়োজন ও অভাব সম্পর্কে অবগত। কারণ এটি সেই শরয়ি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী যা মুমিনদেরকে একটি দেহের ন্যায় গণ্য করে—যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—এবং যা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।” [আল-মায়িদাহ: ২]

মহান আল্লাহ ‘সূরা আল-বাকারাহ’-তে পুণ্যের অর্থের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: “পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; বরং পুণ্য হলো তার যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনল এবং সম্পদ দান করল তাঁর প্রতি ভালোবাসায় নিকটাত্মীয়দের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের, মুসাফিরদের, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসমুক্তির জন্য; আর সালাত কায়েম করল ও জাকাত প্রদান করল...” [আল-বাকারাহ: ১৭৭]

আল্লাহ তাআলা জাকাত প্রদানের আলোচনার পূর্বে সম্পদ দান করার কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের দানটি ছিল নফল বা ঐচ্ছিক সদকার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এটি সর্বজনবিদিত যে, জাকাত ইসলামের একটি রোকন বা স্তম্ভ; যার মাধ্যমে অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণ এবং নিঃস্বদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করা হয়। যদি সকল মানুষ তাদের ওপর অর্পিত জাকাত যথাযথভাবে আদায় করত, তবে মুসলিম সমাজে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কষ্ট পাওয়া বা অভাব ও দারিদ্র্যের আগুনে দগ্ধ হওয়ার মতো কেউ থাকত না। তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় আরও দান করত এবং পুণ্য অর্জনে ব্রতী হতো, তবে সেই সমাজব্যবস্থা কতই না উন্নত হতো!

সুন্নাহতেও এই মর্মার্থকে সুসংহত করার জন্য এবং মুসলমানদের একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক দলিল রয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ-এর বাণী: “বিধবার দেখাশোনা এবং অভাবগ্রস্তের উপকারের জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য অথবা রাতে ইবাদতকারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মতো।” এবং তাঁর বাণী: “যার অতিরিক্ত বাহন রয়েছে সে যেন তাকে দেয় যার কোনো বাহন নেই, আর যার অতিরিক্ত পাথেয় বা খাদ্যসামগ্রী রয়েছে সে যেন তাকে দেয় যার কোনো পাথেয় নেই।”

যদি মুসলিম সমাজে ইসলামি শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য এটাই হয়, তবে উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ। কেননা ইসলামে রাষ্ট্র উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করে। অতএব, শরীয়ত যে বিষয়গুলোর প্রতি নির্দেশনা দিয়েছে, যেমন সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও সহমর্মিতার আবশ্যকতা—যা একটি দেহের ন্যায় হওয়া উচিত—তা পালন করা রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক।

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র যখন ব্যক্তিদের এই অধিকার নিশ্চিত করে, তখন তাকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যেন তা ভবঘুরেপনা, অলসতা বা ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত না করে। বরং যারা কর্মক্ষম, তাদের জন্য রাষ্ট্রের সর্বদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত; কারণ কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদের বায়তুল মালের ওপর নির্ভরশীল করে রাখার চেয়ে এটিই উত্তম। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বার্ধক্য, অক্ষমতা বা অসুস্থতার কারণে নিজের প্রয়োজন মেটাতে অপারগ হয়, তবে এমতাবস্থায় তাকে সহায়তা করা এবং তার জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব। এই ব্যয়ভার বহন করবে হয় তার সেই আত্মীয়স্বজন যাদের ওপর শরীয়তগতভাবে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত, অথবা মুসলিমদের বায়তুল মাল। আর দরিদ্রদের জন্য জাকাতের মাল থেকে ব্যয় করা বৈধ। যদি এই সবকিছুতে দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণ না হয়, তবে কোনো কোনো ফকিহ মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক এলাকার ধনীদের ওপর তাদের এলাকার দরিদ্রদের দায়িত্ব নেওয়া ওয়াজিব এবং জাকাত দিয়ে যদি সংকুলান না হয় তবে শাসক তাদের এ কাজে বাধ্য করবেন। ফলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী পোশাক এবং এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে যা তাদের বৃষ্টি, গ্রীষ্মের দাবদাহ, রোদ এবং রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম কীভাবে ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামাজিক অধিকার ভোগের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছে, বিশেষ করে অক্ষমতা ও অভাবের ক্ষেত্রে। এর মাধ্যমে ইসলামি ব্যবস্থায় এই অধিকারটি মানবসৃষ্ট আইনের বিধানগুলোর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করেছে, যা কেবল কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—অথচ সাংবিধানিক আইনের ফিকহশাস্ত্রে এটিকেই সামাজিক অধিকারের শিখর মনে করা হয়।

---

২. শাসকদের ওপর নজরদারিতে উম্মাহর কর্তৃত্ব:

ইসলামী শরিয়াহ কেবল কিছু মূল পাঠ (নসুস) বা শুরার (পরামর্শ) নীতি নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয়নি—যা ইসলামী রাষ্ট্রের উম্মাহ ভোগ করে এবং যার প্রতি তারা দায়বদ্ধ থাকে—যাতে শাসনকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, অথবা ইসলামী সমাজের জনকল্যাণ থেকে বিচ্যুত না হয় কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে। বরং শরিয়াহ এমন আরেকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা গুরুত্ব, প্রভাব এবং তার নিশ্চয়তার আবশ্যকতা কোনো অংশেই শুরা নীতির চেয়ে কম নয়। আর এই নীতিটি হলো—শাসকদের কর্মকাণ্ড ও আচরণের ওপর নজরদারি করার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর অধিকার।

আমরা ইতিপূর্বে জনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতার পরিধিতে দেখেছি যে, তাদের ব্যাপক বিবেচনামূলক ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতার প্রয়োগ ইতিপূর্বে নির্ধারিত যেকোনো আইনি নীতির প্রভাব ও কার্যকারিতা ধূলিসাৎ করে দিতে পারে—যার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার স্বৈরাচার সীমিত করা অথবা ইসলামী আইন লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা—যদি না এই নীতির পাশাপাশি শাসনকারী সংস্থা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফার বিভিন্ন ক্ষমতার ওপর একটি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি বিদ্যমান থাকে।

নজরদারির মূল লক্ষ্য হলো ইসলামী শরিয়াহর বিধান এবং এর সাধারণ শিষ্টাচারের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করা ও রক্ষা করা। অর্থাৎ, ইসলামী শরিয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা; তা শাসক বা শাসিত—উভয় পক্ষের

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, এটি একদিকে উম্মাহ এবং অন্যদিকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক আবশ্যিক দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ফকিহগণ 'আল-হিসবাহ' পরিভাষার অধীনে এই নজরদারি সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন এবং যিনি এই নজরদারি কার্য পরিচালনা করেন তাকে 'মুহতাসিব' নামে অভিহিত করেছেন; তিনি জনকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হতে পারেন, অথবা সাধারণ মুসলিমদের কোনো একজন ব্যক্তি হতে পারেন, কিংবা সামগ্রিকভাবে মুসলিম জামাতও হতে পারে।

""

শরয়ী রাজনীতি — দশম পাঠ

ইমামত

পাঠের উপাদানসমূহ

প্রথম উপাদান: ইসলামী উম্মাহর নিকট শাসকের দায়বদ্ধতা "দায়বদ্ধতার বৈধতা" ৪৩৩

দ্বিতীয় উপাদান: ইসলাম-পূর্ব আরবদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, অতঃপর ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামতের বর্ণনা ৪৪৫

তৃতীয় উপাদান: খিলাফত, আমীরুল মুমিনীন এবং ইমাম-এর অর্থসমূহ ৪৬০

""

দশম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরীয়াহভিত্তিক রাজনীতি)

ইসলামি উম্মাহর সামনে শাসকের দায়বদ্ধতা: "দায়বদ্ধতার বৈধতা"

ইসলামি ফিকহের বিভিন্ন দলীলসমূহ উম্মাহর দায়িত্ব এবং শাসকদের ওপর তাদের তদারকি করার কর্তৃত্বের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করেছে। পাশাপাশি এই বাধ্যবাধকতার আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রথম যুগের খুলাফায়ে রাশিদুনের আমলের বাস্তব প্রয়োগ এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে। এসকল দলীল ও প্রয়োগসমূহ থেকে আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে:

শাসকদের তদারকি করার ক্ষেত্রে উম্মাহর যে অধিকার রয়েছে, তা এমন কোনো সাধারণ অধিকার নয় যে ইসলামি উম্মাহ ইচ্ছা করলে তা পালন করবে আর ইচ্ছা করলে করবে না। এমনকি এটি এমন কোনো মুস্তাহাব বিষয়ও নয় যা পালন করা ভালো কিন্তু বর্জন করা যায়; বরং এটি একটি অপরিহার্য ফরয। অর্থাৎ, শাসন কর্তৃপক্ষের তদারকি করা মূলত ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অপরিহার্য ফরয। ইসলামি উম্মাহর জন্য এই দায়িত্ব বর্জন করা বা এতে শিথিলতা প্রদর্শন করার কোনো অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনে আমরা এর প্রমাণ বা ভিত্তি খুঁজে পাই। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম।" [আলে ইমরান: ১০৪]

মহান আল্লাহ লুকমানের জবানিতে বলেন: "হে বৎস, সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এটি একটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" [লুকমান: ১৭]

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো।" [আলে ইমরান: ১১০]

পবিত্র সত্তা আল্লাহ বলেন: "তারা সবাই সমান নয়; আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে যারা (হকের ওপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদাবনত হয়। তারা আল্লাহর ওপর ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয়; তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।" [আলে ইমরান: ১১৩-১১৪]

শরয়ী রাজনীতি

দশম পাঠ

“তারা যে কোনো সৎকাজ করুক না কেন, তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে না এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।” [আলে ইমরান: ১১৫]

[১১৩-১১৫]

এ ছাড়াও আমরা যদি সুন্নাহর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখতে পাব যে, ফকিহগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন যা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে আবশ্যক করে। এর মধ্যে তাঁর এই বাণীটি অন্যতম: “যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, সে যমীনে আল্লাহর খলিফা, তাঁর রাসূলের খলিফা এবং তাঁর কিতাবের খলিফা।”

এবং তাঁর বাণী: “হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন: তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে, অন্যথায় তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।”

এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখে, তবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে তার জিহ্বা দিয়ে (প্রতিবাদ করে)। আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তবে তার অন্তর দিয়ে (তা ঘৃণা করে); আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।”

এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ সাধারণ মানুষের পাপের কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে এবং তা প্রতিহত করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা তা প্রতিহত না করে।”

ফকিহগণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনের আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত করেননি।

কুরআন ও সুন্নাহর যে সকল অকাট্য দলিল বা পাঠ্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে ওয়াজিব করেছে এবং যা আমরা উল্লেখ করেছি; যার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড তদারকি করার ক্ষেত্রে উম্মাহর কর্তৃত্ব বা অধিকারের বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়, তার পাশাপাশি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বাস্তব প্রয়োগও এই দিকটি নিশ্চিত করেছে:

যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ওপর উম্মাহর তদারকি করার এবং তাঁকে জবাবদিহি করার অধিকারকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “হে লোকসকল! আমাকে তোমাদের ওপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই...”

শরয়ী রাজনীতি
দশম পাঠ

"যদি তোমরা আমাকে সত্যের ওপর পাও তবে আমাকে সাহায্য করো, আর যদি আমাকে বাতিলের ওপর পাও তবে আমাকে সংশোধন করো। যতক্ষণ আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো, আর আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তবে তোমাদের ওপর আমার আনুগত্যের কোনো আবশ্যকতা নেই।"

তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন: "আমি কেবল একজন অনুসারী, নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই। সুতরাং আমি যদি সঠিক পথে চলি তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আর যদি আমি বিপথগামী হই তবে আমাকে সোজা করে দিও।"

খলিফা যদি সত্য থেকে বিচ্যুত হন বা ইসলামি আইন লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁর ওপর উম্মাহর নজরদারি করার যে নীতি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গ্রহণ করেছিলেন, ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও তেমনি একই পথ অনুসরণ করেছেন। তিনি নিজের ওপর উম্মাহর নজরদারি করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "জেনে রাখো, যদি তোমরা আমার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখো তবে আমাকে সোজা করে দিও।" তখন একজন মুসলিম তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন: "আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতাম, তবে আমাদের তরবারি দিয়ে আপনাকে সোজা করে দিতাম।" তখন ওমর এই বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মুসলিমদের মাঝে এমন লোক রেখেছেন যে ওমরকে তরবারির ধার দিয়ে সোজা করে দিবে।"

তেমনিভাবে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাসকদের ওপর নজরদারি করতে উম্মাহকে উৎসাহিত করতেন। তিনি ব্যক্ত করেন যে, তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে তাঁর ত্রুটিগুলো তাঁর কাছে তুলে ধরে। একদা একজন মুসলিম তাঁকে বলেছিলেন: "হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহকে ভয় করুন।" মজলিশে উপস্থিত একজন ব্যক্তি যখন সেই মহান ও ন্যায়পরায়ণ খলিফার প্রতি বলা লোকটির কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন: "তুমি কি আমিরুল মুমিনিনকে বলছ—আল্লাহকে ভয় করুন?!" তখন ওমর সেই ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বললেন: "হ্যাঁ, সে খুব ভালো কথা বলেছে; তোমাদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই যদি তোমরা এটি না বলো, আর আমাদের মাঝেও কোনো কল্যাণ নেই যদি আমরা তা না শুনি।" ওমর নিজেকে সাধারণ প্রজাদের মতোই মনে করতেন, কেবল পার্থক্য ছিল তাঁর দায়িত্বের বিশালতায় এবং তাঁর ওপর অর্পিত বোঝার গুরুত্বে। প্রজাদের মধ্য থেকে কেউ যখন কোনো বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলত অথবা ওমর এমন কোনো পথ অবলম্বন করতেন যা কারো কাছে শরিয়ত বিরোধী বলে মনে হতো, তখন তিনি সাধারণ মুসলিমদের যেকোনো সমালোচনা বা জবাবদিহিতার জন্য নিজের বক্ষ প্রশস্ত রাখতেন।

বর্ণিত আছে যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট ইয়ামান থেকে কিছু চাদর (এক প্রকার পোশাক) আসলো। তিনি তা মুসলিমদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন এবং প্রত্যেক মুসলিম একটি করে চাদর পেল। আর তিনি গ্রহণ করলেন...

উমরও (রা.) এই চাদরগুলো থেকে অন্য যে কোনো মুসলমানের ন্যায় নিজের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যখন উমর তার কামিস পরিধান করলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে মানুষকে জিহাদের প্রতি আহ্বান জানালেন ও তাদের কাছে আনুগত্য ও শোনার দাবি করলেন, তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "শোনাও হবে না এবং আনুগত্যও হবে না।" উমর বললেন: "তা কেন?" সে বলল: "কারণ আপনি আমাদের ওপর নিজেকে প্রাধান্য দিয়েছেন।" উমর বললেন: "আমি কোন বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছি?" সে বলল: "ইয়ামেনি চাদরগুলো—অর্থাৎ আমাদের নিকট আসা সেই পোশাকগুলো যা আপনি বণ্টন করেছিলেন—যখন আপনি তা বণ্টন করেছিলেন তখন প্রত্যেক মুসলমান একটি করে চাদর পেয়েছিল। তেমনিভাবে আপনিও আমাদের মতো একটি চাদরই পেয়েছিলেন। কিন্তু একটি চাদর দিয়ে আপনার ন্যায় একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ পোশাক হওয়া সম্ভব নয়, অথচ আমরা আপনাকে দেখছি একটি পূর্ণাঙ্গ কামিস তৈরি করেছেন। আপনি দীর্ঘকায় মানুষ, তাই আপনি যদি নিজের অংশের চেয়ে বেশি না নিতেন তবে আপনার জন্য পূর্ণাঙ্গ কামিস হতো না।"

অর্থাৎ এই ব্যক্তিটি উমর ইবনুল খাত্তাবের ওপর আপত্তি উত্থাপন করছিলেন এবং তাকে বলছিলেন: আপনি আমাদের মতোই একটি চাদর নিয়েছেন এবং প্রত্যেকের মাঝে একটি করে বণ্টন করেছেন। স্বাভাবিকভাবে আপনার গৃহীত অংশটি আপনার জন্য পর্যাপ্ত হওয়ার কথা নয়, তবে আপনি এখন এটি পরিধান করলেন কীভাবে? এর অর্থ হলো আপনি আমাদের চেয়ে বেশি অংশ নিয়েছেন। সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন হয়েও তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবকে এ বিষয়ে অভিযুক্ত করলেন।

তখন উমর তার পুত্র আবদুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন: "হে আবদুল্লাহ, তার কথার জবাব দাও।" অর্থাৎ, যে আমাকে অভিযুক্ত করছে যে আমি সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে বেশি কাপড় নিয়েছি, তাকে উত্তর দাও।

তখন আবদুল্লাহ দাঁড়িয়ে বললেন: "আমিরুল মুমিনীন উমর যখন চাদরটি দিয়ে জামা তৈরি করতে চাইলেন তখন তা অপর্যাপ্ত ছিল, তাই আমি তাকে আমার চাদর থেকে অংশ দিয়েছি যা দিয়ে তিনি এটি পূর্ণ করেছেন।" অর্থাৎ আমি আমার পিতাকে আমার প্রাপ্য চাদরের অংশ দিয়েছিলাম; যার ফলে এটি তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কামিসে পরিণত হয়েছে। তখন সেই ব্যক্তি বলল: "এখন শোনা ও আনুগত্য করা হবে।"

সুতরাং মুসলমানরা জবাবদিহিতার সকল পদ্ধতি চর্চা করেছেন। উসমান নিজেই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিকার স্বীকার করেছেন—যেমনটি আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি। উম্মাহর আলেমদের পক্ষ থেকে এই জবাবদিহিতা কার্যকর করার ফলেই তাদের অনেককে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড মূলত তাদের ওপর অর্পিত জবাবদিহিতার ওয়াজিব দায়িত্ব পালন, তাদের প্রদত্ত বক্তব্য এবং শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক শাসকগোষ্ঠীর ওপর নজরদারির যে অপরিহার্য দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতি ছিল।

আমরা বলি: মুসলিমগণ এই তদারকি (রকাবাহ) বা নজরদারির দায়িত্ব পালনে কখনও পিছপা হননি, যদিও এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই তদারকির কারণে এবং শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য শাসকদের বিরোধিতা করার ফলে তাদের কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং কাউকে প্রহার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই তদারকি চর্চা থেকে বিরত থাকেননি; এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, এই তদারকি মূলত তাদের ওপর অর্পিত

অন্যতম আবশ্যিক কর্তব্য।

যিনি এই তদারকি করবেন তার শর্তাবলী:

আমরা যদি বলি যে, এই তদারকি মুসলিমদের ওপর একটি আবশ্যিক কর্তব্য, তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়: যিনি এই তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন তার জন্য কি কোনো শর্ত রয়েছে?
হ্যাঁ; যিনি এই তদারকি করবেন তার মধ্যে অবশ্যই কিছু শর্ত থাকতে হবে। ফকীহগণ 'মুহতাসিব' বা তদারককারীর জন্য বেশ কিছু শর্তারোপ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথম শর্ত: ইসলাম:
অর্থাৎ তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। এই ফরয বা আবশ্যিক কর্তব্যটি মূলত সেই সকল ধর্মীয় ফরযের অন্তর্ভুক্ত যা শরীয়ত প্রণেতা মুসলিমদের ওপর আবশ্যক করেছেন; যার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের নিদর্শনসমূহকে সমুন্নত করা, এর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করা। অতএব, কোনো অমুসলিমের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা বৈধ নয়। অর্থাৎ তদারকির এই আবশ্যিক কর্তব্যটি ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। আর যেহেতু এটি ইসলামের একটি নিদর্শন, তাই এটি সর্বজনবিদিত যে, একজন মুসলিম ব্যতীত অন্য কেউ এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং এই নিদর্শনসমূহ রক্ষা করতে পারে না। এই কারণেই মুহতাসিব বা তদারককারীর জন্য মুসলিম হওয়া শর্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত: প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়া:
তদারকির দায়িত্ব পালনকারীর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক এবং বুদ্ধিমান হওয়ার গুণাবলী থাকা অপরিহার্য। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ শর্ত; কারণ যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা যার বুদ্ধি নেই, তাদের ওপর কোনো আদেশ বা নিষেধ কার্যকর হয় না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
((কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে...

তিন ব্যক্তি থেকে (হিসাব সংরক্ষণের) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে—তাদের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন: শিশু যতক্ষণ না সে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায় বা স্বপ্নদোষ হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।

সুতরাং তারা দায়বদ্ধ নন; আর এই কারণেই তাদের ওপর তদারকির আদেশ প্রদানের বিষয়টি ওয়াজিব বা আবশ্যক হিসেবে বর্তায় না।

তৃতীয় শর্ত: ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ):

ন্যায়পরায়ণতার শর্তটি এমন একটি বিষয় যার প্রকৃতি সম্পর্কে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, সৎকাজের আদেশ প্রদানকারী এবং অসৎকাজের নিষেধকারীর মধ্যে এই গুণটি থাকা আবশ্যক। তাই মুহতাসিব বা যিনি তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন, তাকে অবশ্যই এমন সব বিষয় থেকে মুক্ত থাকতে হবে যা শরিয়ত প্রণেতা নিষেধ করেছেন এবং শরিয়ত যা থেকে পবিত্র থাকতে বলেছে তাতে তিনি লিপ্ত হতে পারবেন না। আর কুরআন ও সুন্নাহর দলিলসমূহ একথাই নির্দেশ করে। কুরআনের যে সকল নস (স্পষ্ট বাণী) এটিকে আবশ্যক করে, তার মধ্যে মহান আল্লাহর এই

বাণীটি অন্যতম: **“তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তবে কি তোমরা অনুধাবন করো না?”** [আল-বাকারা: ৪৪]

এবং মহান আল্লাহর বাণী: **“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অসন্তোষজনক।”** [আস-সাফ: ২-৩]

এই আয়াতগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, যিনি তদারকি বা মুহতাসিবের দায়িত্ব পালন করবেন, তাকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; অর্থাৎ তিনি যেন নিজে সেই মন্দ কাজে লিপ্ত না থাকেন যা থেকে তিনি অন্যদের নিষেধ করতে চান।

পক্ষান্তরে আলেমদের দ্বিতীয় ধারাটি এই শর্তটি থাকা আবশ্যক মনে করেন না। ফলে কিছু ফকিহ মুহতাসিবের জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়াকে শর্ত হিসেবে ধরেন না। ইমাম আল-গাযালী রহ. নিশ্চিত করেছেন যে, তারা (প্রথম পক্ষ) যা উল্লেখ করেছেন তা নিছক কল্পনাপ্রসূত। কেননা পাপাচারী (ফাসেক) ব্যক্তিরও এই ওয়াজিব দায়িত্বটি পালনের অধিকার রয়েছে; কারণ তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং ফাসেক ব্যক্তি কর্তৃক এই দায়িত্ব পালনের বৈধতা না দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন তাকে অবশ্যই গুনাহ থেকে নিষ্পাপ (মাসুম) হতে হবে। আর যদি এই কথা গ্রহণ করা হয়, তবে তা সেই ইজমার (ঐক্যমত্য) পরিপন্থী হবে যেখানে বলা হয়েছে যে (নবীগণ ব্যতীত আর) কেউ মাসুম নয়। কারণ সাহাবায়ে কেরামও মাসুম ছিলেন না, যেমনটি নবীদের মাসুম হওয়ার বিষয়টি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তদুপরি, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সংক্রান্ত সাধারণ নসসমূহ ফাসেক ও ন্যায়পরায়ণ নির্বিশেষে সকলের ওপরই তা আবশ্যক করে।

এই মতের সমর্থকদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী অন্যতম। তিনি তাঁর ‘ইহয়াউ উলুমিদ দীন’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তদারকির দায়িত্ব বা ‘মুহতাসিব’ (ধর্মীয় পরিদর্শক) হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) থাকা শর্ত নয়। কেন? তিনি বলেন, যে সকল শরয়ী প্রমাণাদি মুসলমানদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার নির্দেশ দেয়, সেগুলো সাধারণভাবে অবতীর্ণ হয়েছে; পাপাচারী ও পাপাচারহীন কিংবা ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়পরায়ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া, আমরা যদি এতে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত করি, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে যে আমরা তাকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত বা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত করছি, যা কেউ কখনো বলেনি।

কিছু ফকিহও (আইনবিদ) এই মতের দিকে গিয়েছেন। তারা মনে করেন, মুহতাসিবের জন্য সর্বদা নিখুঁত হওয়া, যা আদেশ করছেন তা সর্বদা নিজে পালন করা এবং যা থেকে নিষেধ করছেন তা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা শর্ত নয়। বরং তার ওপর আদেশ প্রদান করা আবশ্যক, এমনকি সে নিজে সেই আদেশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি করলেও। এমতাবস্থায় মুহতাসিবের ওপর দুটি বিষয় ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়:

প্রথমত: নিজেকে প্রথমে সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
দ্বিতীয়ত: অন্যদেরকেও অনুরূপ আদেশ দেওয়া এবং নিষেধ করা।

যদি কেউ এর একটি পালনে ত্রুটি করে, তবে সে কারণে অন্য ওয়াজিব দায়িত্বটি বর্জন করা সংগত নয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক—অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা শর্ত না হওয়া। কারণ এর স্বপক্ষে দলিলসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ন্যায়পরায়ণতা শর্তকারীদের দলিলসমূহ দুর্বল। এই মতাবলম্বীরা আরও বলেন যে, প্রথম পক্ষের পেশকৃত

দলিলসমূহ পাপাচারী ব্যক্তির সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার অবৈধতার ওপর শক্তিশালী প্রমাণ হতে পারে না। কারণ প্রথম আয়াত: "তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদের কথা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তবে কি তোমরা বুঝো না?"—এই আয়াতে তাদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কাজটিকে নিন্দা করা হয়নি, বরং তাদের নিজেদের আমল বর্জন করাকে নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আয়াতটি পাপাচারী ব্যক্তির আদেশ-নিষেধ করার পথে সরাসরি কোনো বাধা নয়। একইভাবে দ্বিতীয় আয়াতটিও: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা যা করো না তা বলো।"

দশম পাঠ: শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি

{তোমরা যা করো}: তিনি বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি; এর দ্বারা অন্যকে আদেশ করা এবং নিজে আমল পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য নয়।

আমরা সেই মতটি গ্রহণ করি না যা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং তদারকির দায়িত্ব পালনকারীর জন্য ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করে না। যারা এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করেন, তাদের সেই মতটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ:

প্রথমত: ইমাম আল-গাযালী ফাসিক ব্যক্তিকে এই অধিকার প্রদান না করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন; কারণ একে নিষেধ করার অর্থ হলো এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য নিষ্পাপ হওয়ার শর্তারোপ করা। অর্থাৎ, ইমাম আল-গাযালী যখন বলেছেন: "ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয়", তখন তিনি এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে, আমরা যদি ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করি, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় যে আমরা তার নিষ্পাপ হওয়ার শর্ত দিচ্ছি, অথচ এ কথা কেউ বলেনি। আমরা মনে করি যে এটি সঠিক নয়; কারণ ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করার অর্থ মোটেও এটি নয় যে, সৎকাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজের নিষেধকারীকে ভুল থেকে নিষ্পাপ হতে হবে। কেননা ভুল থেকে নিষ্পাপ থাকা এক বিষয় এবং ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করা ভিন্ন বিষয়। যারা ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করেন, তাদের কেউ এ কথা বলেননি যে, এই দায়িত্ব পালনকারীকে অবশ্যই ভুল থেকে নিষ্পাপ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: আমরা যদি ফাসিক ব্যক্তিকে এই অধিকার প্রদান করি—অর্থাৎ মানুষের ওপর এবং শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর তদারকি করার অধিকার—যাতে সে তার মতো অন্যদের সৎকাজের আদেশ দিতে পারে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে পারে; তবে আমাদের দৃষ্টিতে এটি এই দায়িত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেবে। কেননা, যদি এই ব্যক্তি এমন কোনো ভালো কাজের আদেশ দেয় যা সে নিজে পালন করে না, অথবা এমন কোনো মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে যাতে সে নিজে লিপ্ত এবং তা থেকে বিরত নয়; তবে এমতাবস্থায় উভয়েরই—অর্থাৎ তদারককারী এবং যার ওপর তদারকি করা হচ্ছে—একে অপরের ওপর সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকার তৈরি হবে (যদি আমরা এই মতটি মেনে নিই)। ফলে একই সময়ে প্রত্যেকেই তদারককারী এবং তদারকিযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। অথচ অন্যের ওপর এই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার আগে প্রত্যেকের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো, শরীয়ত প্রণেতা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে প্রথমে নিজেকে বিরত রাখা এবং তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলা; যাতে সে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

এর অর্থ এই নয় যে আমরা বলছি যে মুহতাসিবকে (তদারককারী) সম্পূর্ণরূপে ভুল থেকে মুক্ত হতে হবে; কারণ এটি হওয়া অসম্ভব; কেননা মানুষ মাত্রই মানুষ, আর প্রতিটি মানুষই ভুলের সম্মুখীন হয়। তবে আমরা বলি—যেমনটি কেউ কেউ স্থির করেছেন—মুহতাসিবকে অবশ্যই নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করতে হবে এবং তা করা থেকে পবিত্র থাকতে হবে; যাতে অন্যের জন্য তার ওপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার তৈরি না হয়।

ইমাম গাজালীর ওপর এই আপত্তির সারসংক্ষেপ, যিনি ন্যায়পরায়ণতাকে (আদালত) শর্ত করেন না:

যদি আমরা কোনো ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব—যা হলো তদারকি—পালন করার অনুমতি দেই, তবে সে একই সাথে কীভাবে মুহতাসিব (হিসাব গ্রহণকারী) এবং যার হিসাব নেওয়া হচ্ছে (মুহতাসিব আলাইহি) উভয়ই হতে পারে? আর অন্যরা তাকে কীভাবে অনুসরণ করবে? কবি বলেন:

তুমি অন্যকে কোনো চরিত্রের ব্যাপারে নিষেধ করো না অথচ তুমি নিজেই তা করো; তুমি যদি তা করো তবে তা হবে তোমার জন্য এক বড় লজ্জার বিষয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই দ্বীনের বিধানসমূহ মেনে না চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করছে তার ওপর তার দাওয়াতের কী প্রভাব পড়বে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তাকে অনুসরণ করা হবে না, এবং এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা যখন তাকে এই তদারকি করার সিদ্ধান্ত দেব, তখন তা হবে সম্পূর্ণ নিরর্থক।

তৃতীয়ত: ফাসেক ব্যক্তিকে এই অধিকার বা অন্যের ওপর সেই ক্ষমতা প্রদানের জন্য দলিলসমূহের (নুসুস) ব্যাপকতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা এটিকে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এই ওয়াজিবটি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সকল ওয়াজিবের মতোই নির্দিষ্ট শর্ত ও রুকন (স্তম্ভ) বিশিষ্ট। আমাদের দৃষ্টিতে এর অন্যতম শর্ত হলো ব্যক্তিকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ (আদল) হতে হবে। সুতরাং যদি কোনো মূলনীতির শর্ত ও রুকনসমূহ পূর্ণ হয়, তবে তা সেই ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে যার মধ্যে শর্তগুলো পাওয়া যাবে। একইভাবে যার মধ্যে এই শর্ত ও রুকনসমূহ পাওয়া যাবে না সে এর প্রয়োগের আওতা থেকে বের হয়ে যাবে; এতে করে মূলনীতিটি সার্বজনীন হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না।

চতুর্থত: এই ওয়াজিবটির মধ্যে—যার দ্বারা আমরা তদারকি বা পর্যবেক্ষণ বোঝাচ্ছি—অন্যের ওপর কর্তৃত্বের (ওয়ালায়াত) অর্থ নিহিত আছে। আর অন্য যেকোনো কর্তৃত্বের মতোই এটি পালনকারীর জন্য শর্ত হলো তাকে ন্যায়পরায়ণ (আদল) হতে হবে। শাফেয়ী ফকীহগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছেন তাদের মতে ফাসেকের কোনো কর্তৃত্বের অধিকার নেই। সুতরাং আমরা কীভাবে তাকে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারি যখন সে নিজেই এমন এক অবস্থানে আছে যেখানে অন্যের জন্য তার ওপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সংগত?!

পঞ্চমতঃ একইভাবে, আমরা সেই সব নস-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করি না, যা ন্যায়পরায়ণতার শর্ত আরোপকারীরা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তারা মনে করেন যে, শাস্তি ছিল সৎকাজের আদেশ বর্জন এবং অসৎকাজে লিপ্ত হওয়ার ফল, তাদের সেই কাজ সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনা না করেই। কারণ—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে জোর দিয়ে বলেছি—আমরা কোনোভাবেই স্বীকার করি না যে, সেই ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া হবে যে তা রক্ষা করে না। অথবা এমন ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব দেওয়া হবে যার ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা ওয়াজিব। আর আমরা এমন ব্যক্তিকে আইন প্রয়োগের জিম্মাদার হিসেবে অনুমোদন দিতে পারি না, যে নিজেই আইন লঙ্ঘন করে এবং তা ভঙ্গ করে।

ষষ্ঠতঃ আর এই কর্তব্যকে শরীয়ত প্রণেতা ঈমানের সাথে যুক্ত করেছেন। বরং এর গুরুত্ব এবং উম্মাহর মধ্যে এর সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কারণে একে ঈমানের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তাই এই ওয়াজিব—অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ—কে আল্লাহ তাআলা ঈমানের পূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং একে সেইসব মুমিনদের গুণাবলি হিসেবে গণ্য করেছেন যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তেমনিভাবে এটিই এই উম্মতকে অন্যান্য অনৈসলামিক উম্মত থেকে পৃথক করার মতো একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব, এই সবকিছুর দাবি হলো—যিনি এই অধিকারটি চর্চা করবেন, তাকে শরীয়ত প্রণেতার আদেশ পালনকারী এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ ইসলাম একটি অবিভাজ্য সত্তা। যে ব্যক্তি কোনো কাজ থেকে নিষেধ করবে, তার জন্য সবার আগে নিজেকে তা থেকে নিষেধ করা এবং তা থেকে বিরত থাকা অধিকতর কাম্য। অন্যকে আদেশ করার আগে নিজের মাধ্যমে সেই আদেশ শুরু করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ শর্ত: সক্ষমতা:

যিনি তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন, তার জন্য শর্ত হলো এই ওয়াজিব পালনের সামর্থ্য ও সক্ষমতা থাকতে হবে। এটি এমনভাবে হতে হবে যা তার নিজের জান, মাল বা পরিবারের ওপর বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ডেকে না আনে। হাদীস শরীফে এই ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে মানুষের সক্ষমতার পরিধি এবং মানুষের সক্ষমতার বাইরে না যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখে, তবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়; যদি সে সক্ষম না হয়, তবে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে); আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তবে যেন তার অন্তর দিয়ে (ঘৃণা করে), আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"

সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া হাত দিয়ে কোনো অন্যায় প্রতিহত করতে সক্ষম নয়, তার সামনে এই ওয়াজিবটি পালনের উপায় হলো মৌখিক প্রতিবাদ। আর যার শেষ উপায়ের মাধ্যমেও প্রতিবাদ করার সক্ষমতা নেই, তার ওপর হাত বা [মুখ দিয়ে...] কোনো হিসবাহ বা জবাবদিহিতা বর্তাবে না।

জিহ্বা; যেহেতু সে এ দুটির (হাত ও জিহ্বা) মাধ্যমে তা সম্পাদন করতে অক্ষম। আর যে ব্যক্তি কোনো কাজ সম্পাদনে অক্ষম, সে সেই অক্ষমতার কারণে তা পালনে দায়বদ্ধ নয়। তবে তার সামনে অন্য একটি উপায় অবশিষ্ট থাকে, তা হলো অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ করা।

এটি সর্বদা এবং চিরকাল মানুষের সাধ্য ও সক্ষমতার আওতাভুক্ত; কারণ এটি মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)-এর অনুভূতি ও হৃদয়ের সাথে জড়িত। আর অন্তরের অস্থিরতা এবং যা কিছু হৃদয় ও বিবেকের ভেতর সঞ্চালিত হয়, তার ওপর কোনো কর্তৃপক্ষের কোনো কর্তৃত্ব নেই।

পঞ্চম শর্ত: জ্ঞান:

জ্ঞানের শর্তটি ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে সেই কাজের ওপর। যদি কাজটি শরঈ বিধানের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিরোধী হয়, তবে উক্ত বিধান লঙ্ঘনের বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য এই দায়িত্ব পালনকারীর মধ্যে মুজতাহিদ হওয়ার গুণ থাকা আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে, যদি বিষয়টি সূক্ষ্ম কর্মের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইজতিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে সেই আইন বা বিধান ভঙ্গের বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। এ কথার অর্থ হলো: যিনি তদারকি (হিসবাহ) করবেন, তাঁর জন্য কি আলেম বা মুজতাহিদ হওয়া শর্ত, না কি নয়?

আমরা বলি: এটি নির্ভর করে শরঈ বিধান লঙ্ঘনের প্রকারভেদের ওপর। যদি সেই লঙ্ঘনটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়, তবে এই ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো যে ইজতিহাদ শর্ত নয়। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যার জন্য ফিকহী জ্ঞানের প্রয়োজন এবং যা মতভেদপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তবে সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানের (ইলম) প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং, কাজটি যদি প্রথম প্রকারের অর্থাৎ স্পষ্ট হয়, তবে তা অস্বীকার ও প্রতিরোধ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। ফলে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল মুসলিমের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। আর এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো শর্তের প্রয়োজন হবে না—কেবল ইসলাম, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং সক্ষমতা ছাড়া; চাই সেই ব্যক্তি ইমাম হোন, অথবা বিচারক, অথবা ফকিহ, কিংবা সাধারণ মুসলিমদের মধ্য হতে কেউ একজন হোন।

৪৪৩

পৃষ্ঠা 144

দশম পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

তবে বিষয়টি যদি এমন হয় যে, কোনো কাজ আইনের পরিপন্থী কি না তা জানার জন্য ইজতিহাদের শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক—যেহেতু সেটি কথা ও কাজের সূক্ষ্ম রহস্যের অন্তর্ভুক্ত—তবে সাধারণ জনগণের সেই কাজের ওপর তদারকি করার বা তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো অধিকার নেই। কারণ, তারা হয়তো কোনো কাজকে প্রত্যাখ্যান করবে অথচ বিষয়টি হতে পারে তার বিপরীত। বরং এই অধিকার কেবল সেই সকল ফকীহ বা ফিকহবিশারদদের দেওয়া হয় যারা শরিয়তের নস (মূল পাঠ) এবং বিধানদাতার (শারী‘) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আর তাদের এই আপত্তির এখতিয়ারও আবার নির্ভর করে বিষয়টি নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট হুকুমের ওপর ঐকমত্য (ইজমা) হয়েছে কি না, অথবা বিষয়টি ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্যপূর্ণ কি না তার ওপর।

ষষ্ঠ শর্ত: সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ:

ইসলামি ফিকহে এই শর্তটি এমন সব শর্তের অন্তর্ভুক্ত যার ওপর সকল মতামত একমত নয়। একদল আলিমের অভিমত হলো যে, সরকারি কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তদারকি বা নজরদারির ক্ষমতা চর্চা করা জায়েজ নয়। যারা এই মত পোষণ করেন তাদের দলিল হলো, এই অধিকার প্রয়োগ করা শাসিত ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার দাবি রাখে। তাই সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা পর্যন্ত কোনো মুসলিমকে এই অধিকার দেওয়া বা তার ওপর এই দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা বৈধ নয়। আর সরকারি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি আবশ্যক হওয়ার একটি দিক হলো, মুসলিমের ওপর অমুসলিমের এই দায়িত্ব পালন করার অবৈধতা, যদিও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি অধিকার।

ইমাম গাজালী যারা এই শর্তারোপ করেছেন তাদের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি একে একটি অসার শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করার পর বলেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর নসসমূহ (মূল পাঠ) নির্দেশ করে যে, যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ দেখল অথচ তা প্রতিবাদ না করে চুপ থাকল, সে এমন এক আবশ্যিক কর্তব্য (ওয়াজিব) লঙ্ঘন করল যা নসসমূহ তার ওপর অবধারিত করেছে; যেখানেই এবং যেভাবেই সে তা দেখুক না কেন। অতএব, এই শর্তারোপ করা এমন এক মনগড়া কথা যার শরিয়তে কোনো ভিত্তি নেই।

অন্যদিকে, অমুসলিমদের এই অধিকার প্রদান না করা বা তাদের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন না করার বিষয়টি এই কারণে যে, একজন অমুসলিমের জন্য কোনো মুসলিমের ওপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব চর্চা করা বৈধ নয়...

পাশাপাশি একজন মুসলিম এই অধিকার ভোগ করেন এবং মুসলিম হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করা তার জন্য অপরিহার্য। ফলে তিনি শরয়ি বিধানদাতা এবং দ্বীনের পক্ষ থেকে এই সম্মান লাভের অধিকারী হয়েছেন; কেননা এটি ধর্মীয় ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যে কোনো ধর্মীয় ওয়াজিবের ন্যায় এর আঞ্জাম দেওয়া কেবল রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্যদের জন্য নয়; কারণ এতে মুসলিমদের ওপর কর্তৃত্বের বিষয় রয়েছে।

ইসলাম-পূর্ব আরবদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা, অতঃপর ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামতের বর্ণনা

১. ইসলাম-পূর্ব আরবদের শাসনব্যবস্থা:

ইসলাম-পূর্ব আরবদের মাঝে বর্তমানকালে আমরা সরকার বলতে যা বুঝি, সেই অর্থে কোনো সরকার ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কোনো সুসংগঠিত প্রশাসন ছিল না যার কর্তৃত্বের অধীনে মানুষ অনুগত থাকবে এবং যা মানুষের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে ও একে অপরের ওপর জুলুম-অত্যাচার রোধে কাজ করবে। বরং তারা ছিল যাযাবর অথবা আধা-যাযাবর যারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। প্রতিটি গোত্রের সদস্যদের রক্ত সম্পর্ক বা বংশীয় বন্ধন একত্রিত করে রাখত, যা আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী প্রত্যেক আরবের কাছে ছিল অতি পবিত্র। এই বন্ধন—অর্থাৎ রক্ত সম্পর্ক—যা বিদ্যমান থাকলে, তা বাস্তবে হোক কিংবা তাদের ধারণাপ্রসূত হোক, তারা নিজেদের একটি সুসংহত একক হিসেবে গণ্য করত, যা গোত্রের সদস্যদের জন্য তার ছত্রছায়ায় পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। এটি গোত্রের প্রতিটি সদস্যকে বিপদে গোত্রকে ডাকার অধিকার প্রদান করত এবং গোত্র তাকে রক্ষা করতে বাধ্য থাকত। তেমনিভাবে সদস্যের ওপরও গোত্রের প্রথা ও ধর্মের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল। গোত্রগুলো তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অন্যান্য গোত্রের সাথে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত থাকত। ফলে তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে অথবা অন্য কোনো পক্ষের ওপর আক্রমণ চালাতে কিংবা এই জাতীয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অন্যদের সাথে মৈত্রীর চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হতো। আর যখন গোত্রসমূহ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পরস্পর জোটবদ্ধ হতো এবং তাদের সকলের জন্য একজন নেতার প্রয়োজন হতো, তখন তারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে লটারি করত। অর্থাৎ, যারা নেতৃত্বের যোগ্য তাদের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা করা হতো; যার নাম লটারিতে উঠত সেই তাদের নেতা নির্বাচিত হতো।

দশম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ (ইসলামি রাজনীতি)

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের মাঝে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের একাংশ নজদ ও হিজাজের প্রান্তবর্তী মরু অঞ্চলসমূহে বেদুঈনদের সাথে বসবাস করত। সেখানে গোত্রই ছিল ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক একক, যার সদস্যরা রক্ত এবং গোত্রীয় আভিজাত্যের (আসাবিয়্যাহ) বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তারা কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের অনুগত ছিল না, এমনকি গোত্র প্রধানের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও এমনটি ছিল। গোত্রের যে কোনো ব্যক্তি চাইলে প্রধানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারত। সেক্ষেত্রে তাকে কেবল নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করতে হতো, যদি তার তা থাকত; অথবা সে যদি কোনো আশঙ্কার সম্মুখীন হতো, তবে পুরো গোত্র ত্যাগ করে অন্য কোনো গোত্রে আশ্রয় নিত। তাদের কাছে গোত্র প্রধানের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব কেবল একটি সাধারণ প্রতীকি ধারণা ছিল, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা গ্রহণ করত। বরং গোত্রের অধিকাংশ লোক কোনো বিষয়ে একমত হলেও তা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের ছিল। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোনো কোনো গোত্রে প্রধানদের শাসন ছিল এক প্রকারের স্বৈরশাসন ও জুলুম। তারা মানুষকে এতটাই লাঞ্ছিত করত যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রচারিত নতুন আসমানি দ্বীনের আবির্ভাব ছাড়া সেই লাঞ্ছনার অবসান ঘটেনি।

গোত্রগুলোকে যেহেতু স্বাধীন একক হিসেবে গণ্য করা হতো, তাই দেশটি বিভিন্ন প্রভাব বলয়ে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চল সেই গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকত যারা সেখানে প্রভাবশালী ছিল। গোত্রের সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন প্রধান নিযুক্ত হতেন, যাঁর ওপর তারা বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নির্ভর করত। এই যুদ্ধগুলো অন্য গোত্রের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন অথবা নিজের ছিনিয়ে নেওয়া অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সংঘটিত হতো।

গোত্র প্রধান নির্বাচনের জন্য বিশেষ কিছু শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক ছিল। যেমন—প্রচুর ধন-সম্পদ, ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বীরত্ব, সঠিক দূরদর্শিতা ও বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার কারণে গোত্রীয় সদস্যদের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া। গোত্র প্রধান বা শাইখ নির্বাচন বর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মতো ছিল না। বরং কারও মাঝে যদি সেই সব গুণাবলি ও শর্তের সমাবেশ ঘটত যা তারা তাদের নেতার মাঝে সর্বদা কাম্য মনে করত, তবে তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হতো।

দশম পাঠ

শরয়ী রাজনীতি

গোত্রপ্রধানের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাদের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। যখন কোনো গোত্র বিশাল হয়ে যেত এবং এর অনেক শাখা-প্রশাখা তৈরি হতো, তখন প্রতিটি শাখা পৃথক জীবন ও স্বাধীন অস্তিত্ব ভোগ করত। অত্যন্ত বিপজ্জনক কোনো অভিযান পরিচালনা বা গোত্র রক্ষার জন্য যৌথভাবে আত্মরক্ষার মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া তারা ঐক্যবদ্ধ হতো না।

একটি পরিবারেই একাধিক নেতৃত্ব থাকতে পারত যদি সেখানে আধিপত্য ও গোত্রপ্রীতির (আসাবিয়্যাহ) কারণগুলো বিদ্যমান থাকত। এভাবে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি অপর একজন শক্তিশালী ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করত এবং নিজ গোত্রের লোকদের ওপর কর্তৃত্ব করত। অনেক সময় গোত্রপ্রধানের নাতি মর্যাদা, অবস্থান ও প্রতাপের দিক থেকে তার পিতার সমান হতে পারত, তখন সে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে নেতৃত্বের আসনে বসতে পারত। তবে একই পরিবারের তিন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে

নেতৃত্ব ও প্রধানের দায়িত্ব লাভ করা খুব কমই ঘটত।

গোত্রপ্রধানকে সহায়তা করার জন্য 'মাশয়াখাতুল কাবিলা' (গোত্রীয় পরিষদ) নামক একটি পরিষদ থাকত, যা গোত্রের জনমতের প্রতিনিধিত্ব করত। এই পরিষদের সদস্যদের এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হতো যারা প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারী এবং যাদের নিয়ে গোত্র গর্ব করত। এই সদস্যদের মধ্যে গোত্রের কবিও থাকতেন, যার ওপর গোত্র তাদের গুণাবলী প্রচার এবং বীরত্বগাথা গাওয়ার জন্য নির্ভর করত। এই পরিষদে গোত্রের বিচারকগণও থাকতেন যারা ছিলেন মর্যাদাবান এবং মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতা, আমানতদারি, অভিজ্ঞতা, সঠিক সিদ্ধান্ত ও জ্যেষ্ঠতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বংশপরম্পরা, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং রক্তপাত সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতার জন্য তারা মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। এই বিচারকগণ কোনো লিখিত আইন বা পরিচিত নিয়মের ভিত্তিতে বিচার করতেন না, বরং তারা তাদের প্রথা ও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করতেন যা কখনো তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল, আবার কখনো ইয়াহুদীদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছেছিল।

প্রথা ও ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই জাহেলী আইনের কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তি ছিল না এবং বিবাদমান পক্ষগুলো এই আইনের কাছে বিচার চাইতে বা এর রায় মেনে নিতে বাধ্য ছিল না। তারা যদি বিচার চাইত তবে ভালো, নতুবা নয়; আর রায় প্রদান করা হলে ব্যক্তি চাইলে তা মান্য করত।

এই পরিষদে এমন সাহসী বীরদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হতো যারা অশ্বারোহণে পারদর্শী বা বীরত্বের জন্য খ্যাত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি যেমন গণক ও জ্যোতিষীরাও এতে থাকতেন। এর পাশাপাশি উপগোত্রগুলোর প্রধান এবং বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে জীবন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী ব্যক্তিরাও এই পরিষদের অংশ ছিলেন। তারা সবাই মিলে প্রতিনিধিত্ব করতেন...

দশম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

গোত্রীয় প্রবীণ পরিষদ, যার ওপর গোত্রপ্রধান গোত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্ভর করেন। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি চুক্তি সম্পাদন কিংবা গোত্রের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা ব্যতীত।

গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা কোনো বিধিবদ্ধ আইনি পাঠের মাধ্যমে পরিচালিত হতো না, যা বর্তমান সময়ের আইনের মতো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল করে। বরং সেখানকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো প্রবৃত্তি ও স্বভাবজাত প্রেরণার নির্দেশনায়। তারা এমন এক ব্যবস্থার ওপর সন্তুষ্ট ছিল যা তাদের সরল চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে তা এমন এক রীতিনীতিতে (প্রথা) পরিণত হয়েছিল যা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। এ বিষয়টি নজদ ও হিজাজের প্রান্তিক মরুভূমিতে বসবাসকারী আরবদের জন্য যেমন সত্য ছিল, তেমনি সেই সমস্ত আরবদের জন্যও প্রযোজ্য ছিল যারা কিছুটা সভ্যতার ছোঁয়া পেয়েছিল এবং মক্কা ও মদীনার মতো শহরগুলোতে বসবাস করত কিংবা আরব উপদ্বীপের প্রান্তসীমায় অবস্থিত দক্ষিণের ইয়ামেন রাজ্য, উত্তর-পূর্বের হীরা রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিমের গাসসানি রাষ্ট্রের মতো জনপদে বসবাস করত।

প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব বিশেষ রীতিনীতি ও ঐতিহ্য ছিল যা অনেক সময় অন্যান্য গোত্রের রীতিনীতি থেকে ভিন্ন হতো, আবার কখনও বা তাতে কম-বেশি মিল থাকত। আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগে গোত্রীয় শাসনের মাঝে একটি মাত্র রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল যা প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারেনি; সেটি হলো ‘কিন্দা’ রাজ্য। হীরা রাজ্যের রাজারা এটি ধ্বংস করেছিলেন এবং মুআল্লাকাহর অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়েস এই রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আমরা যদি আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগ ছেড়ে হিজাজের দিকে অগ্রসর হই, তবে সেখানে বিশেষ রাজনৈতিক জীবনসম্পন্ন কিছু শহর দেখতে পাব। হিজাজের প্রতিটি শহর স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে শাসন করত এবং একে অপরের থেকে পূর্ণ স্বাধীন ছিল। মক্কা, মদীনা ও তায়েফের অবস্থা এমনই ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি শহর গোত্রীয় চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এবং এই চেতনা সেখানে পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখত। এমনকি শহরে বসবাস করা সত্ত্বেও কোনো আরব ব্যক্তি শহরের সাথে নিজের পরিচয় সম্পৃক্ত করত না, বরং সে কেবল নিজের গোত্রের সাথেই নিজের পরিচয় দিত। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে আরবরা শহরের সাথে নিজেদের পরিচয় সম্পৃক্ত করার বিষয়টি জানত না।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দশম পাঠ
মক্কা—হিজাজের শহরগুলোর মধ্যে যার মর্যাদা ছিল অনন্য—সেখানে কোনো রাজতন্ত্র ছিল না। বরং সেখানকার শাসনব্যবস্থা বড় বড় পরিবারের বেশ কয়েকজন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত ছিল, যারা জনকল্যাণমূলক কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল যে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাকে 'কাওমের সরদার' বা গোত্রপ্রধান উপাধি দেওয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ—অর্থাৎ বয়সের দিক থেকে বড়—ছিলেন আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব।

ইয়াসরিবে (মদিনা) আউস ও খাযরাজ নামক দুটি দলের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ চলত। তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ ও বাদানুবাদ চলেছিল, অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শাসনক্ষমতা তাদের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তিত হবে। ফলে এক বছর একটি গোত্র বা পাড়ার একজন নেতা শহর শাসন করবেন এবং পরবর্তী বছর অন্য গোত্র বা পাড়ার নেতাদের মধ্য থেকে একজন শাসক নিযুক্ত হবেন।

আরব উপদ্বীপের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। আমরা দক্ষিণে ইয়ামেনের রাজ্যগুলো দেখতে পাই, যেমন সাবা রাজ্য; যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ আসার পর এবং নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে এর রাণী বিলকীসের কাহিনী বর্ণিত হওয়ার পর থেকে।

লক্ষণীয় যে, ইয়ামেনে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যা হিজাজের শহরগুলোতে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। আমরা যখন দেখি যে হিজাজের শহরগুলোতে কোনো রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, তখন দেখি যে ইয়ামেনে স্পষ্ট অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিজাজের শহরগুলোর মধ্যে এমন কোনো সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বন্ধন ছিল না যা তাদের একটি একক ব্যবস্থার অধীনে আসতে বাধ্য করত, যেমনটি ইয়ামেনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ইয়ামেনে এমন অর্থনৈতিক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল যার জন্য কিছু সাধারণ নিয়মনীতির প্রয়োজন ছিল যা সবাই শ্রদ্ধা করবে এবং পারস্পরিক শাসনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবে। তদুপরি, ইয়ামেন আবিসিনীয় ও পারস্যের উপনিবেশবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। আর উপনিবেশবাদীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে পুরো দেশের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তাই আবিসিনীয় ও পারসিকরা দেশের জন্য এমন একজন শাসক নিযুক্ত করত যার অধীনে পুরো দেশ বলপূর্বক অনুগত থাকতে বাধ্য হতো, যদি তারা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টির সাথে বশ্যতা স্বীকার না করত। হিজাজ ইয়ামেনের মতো এমন উপনিবেশবাদের কবলে পড়েনি।

দশম পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

এই সমস্ত কিছু থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আরব উপদ্বীপে গোত্রীয় চিন্তাধারাই ছিল প্রভাবশালী এবং এটিই ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি। ইসলাম-পূর্ব আরব ভূখণ্ডে এমন কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না যা দেশ নিয়ন্ত্রণ করত, আইনের দিককে শক্তিশালী করত এবং দেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করত। সেখানে আইনের সুরক্ষায় কোনো বিশেষ শক্তি নিয়োজিত ছিল না; বরং যার হক বা অধিকার থাকত, তাকে তার গোত্রীয় প্রভাব ও শক্তির মাধ্যমেই তা ছিনিয়ে নিতে হতো।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের আবির্ভাব ছিল আরব উপদ্বীপে বিরাজমান স্বৈরশাসন, আধিপত্য ও বিশৃঙ্খলার যুগের অবসানের এক ঘোষণা। সাধারণ মানুষের ওপর ইসলামের অবদান ছিল সর্বোচ্চ। ইসলাম তাদেরকে জুলুম ও স্বৈরাচারী জীবন থেকে উদ্ধার করেছে এবং শাসিতদের ওপর শাসকদের নিরঙ্কুশ ও যথেচ্ছ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছে।

ইসলাম-পূর্ব আরব উপদ্বীপে এমন সব জুলুম ও স্বৈরাচারের রূপ দেখা গিয়েছিল, যা বিশ্বের অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত কুখ্যাত জুলুমের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। মরুচারী ও নগরবাসী কিছু গোত্রের ওপর এমন সব নেতারা কর্তৃত্ব করত, যারা অন্যদের অপদস্থ করার ক্ষমতার মাপকাঠিতেই নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা পরিমাপ করত। সম্ভবত ইতিহাস ও প্রবাদের গ্রন্থগুলো জাহেলি যুগের কিছু আরব স্বৈরশাসকের অবস্থার যথাযথ বর্ণনা প্রদান করে।

যেমন একটি প্রবাদের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে: "আউফের উপত্যকায় কোনো স্বাধীন মানুষ নেই।" এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, সে (আউফ) তার উপত্যকায় পদার্পণকারী সবাইকে দমন করে রাখত। ফলে সেখানকার সবাই তার আনুগত্যের কারণে তার দাসের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাদের কারো কারো অহমিকা ও জুলুম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সে নির্দেশ দিয়েছিল যে, কোনো তরুণীকে তার স্বামীর ঘরে পাঠানোর আগে যেন প্রথমে তার কাছে পাঠানো হয়।

সুতরাং এই মানুষগুলোকে অধঃপতনের চরম গহ্বর থেকে এক প্রকার উন্নত জীবন এবং মর্যাদার এক প্রশস্ত দিগন্তের দিকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সুস্পষ্ট। মুহাম্মাদ ﷺ যে নতুন দ্বীনের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তার আবির্ভাব ব্যতীত তারা কখনোই এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারত না।

শরয়ী রাজনীতি

দশম পাঠ

২. ইমামত একটি ফিকহশাস্ত্রীয় বিষয়:

আল-ইমামাহ আল-উজমা (মহা-ইমামত) কি একটি ফিকহশাস্ত্রীয় বিষয়, নাকি এটি ইলমুল কালামের (ধর্মতত্ত্বের) আলোচনার বিষয়? অন্য কথায়: এটি কি আকিদা বা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, নাকি ফিকহ শাস্ত্রের ন্যায় আমলি আহকাম বা ব্যবহারিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত?

এটি এমন একটি মাসআলা যা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল-ইমামাহ আল-উজমা বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয় যা মুসলিম উম্মাহর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এই মতবিরোধ কখনো কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মুসলিমদের উভয় পক্ষের হাতে তরবারি উত্তোলিত হয়েছে। সম্ভবত ইসলামি দলগুলোর বড় বড় ইতিহাসবিদদের একজনকে এটিই বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে: "উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে বড় মতবিরোধ হলো ইমামতের মতবিরোধ; কেননা ইসলামে কোনো ধর্মীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এমনভাবে তরবারি কোষমুক্ত করা হয়নি, যেমনটি সকল যুগে ইমামতের বিষয়ে করা হয়েছে।" এটি ‘আল-মিলাল ওয়ান নিহাল’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠায় শাহরাস্তানির অভিমত।

অর্থাৎ: মনে হচ্ছে ইমামত এমন একটি বিষয় যার জন্য সর্বাধিক তরবারি কোষমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, শাহরাস্তানির এই বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে, কারণ তিনি তার সিদ্ধান্তকে সকল যুগের ওপর সাধারণীকরণ করেছেন। তিনি বলছেন: ইসলামে কোনো ধর্মীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এমনভাবে তরবারি কোষমুক্ত করা হয়নি, যেমনটি সকল যুগে ইমামতের বিষয়ে করা হয়েছে। সুতরাং তিনি সকল যুগের ওপর তার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে অকাট্যভাবে বলেছেন যে, ইমামতের কারণে সৃষ্ট বিরোধই ছিল সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ মতবিরোধ।

আমরা এর উত্তরে বলি: আবু বকর, উমর ও উসমানের সময়ে উম্মাহর সদস্যদের মাঝে ইমামতের বিষয়ে তরবারি বা তরবারি ছাড়া কোনো মতবিরোধ ছিল না। আবু বকরের যুগে মুসলিম এবং মুরতাদ ও জাকাত অস্বীকারকারীদের মধ্যে তরবারির লড়াই ছাড়া দ্বীনের অন্য কোনো বিষয়ে তাদের সময়ে তরবারি কোষমুক্ত করা হয়নি। আর আবু বকরকে মুসলিমদের খলিফা হিসেবে বায়আত প্রদানের পূর্বে সাকিফাহর দিনে যা ঘটেছিল, তাকে দুই পক্ষের মাঝে কোনো সশস্ত্র বা নিরস্ত্র লড়াই হিসেবে গণ্য করা যায় না; বরং তা ছিল দুটি দলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক, যেখানে উভয় পক্ষই এমন মতামত পোষণ করছিল যা প্রকাশ করা তারা আবশ্যক মনে করেছিল। অতঃপর যখন তারা দেখল...

এর একটি হলো, অপর পক্ষ স্বেচ্ছায় তা মেনে নিয়েছিল এবং পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যাওয়া প্রতিটি জাতির অনুরূপ প্রতিটি পরিস্থিতিতে এমনটি ঘটে থাকে।

উমরের খিলাফতকালেও কোনো অস্ত্র তোলা হয়নি। আর উসমানের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র তোলা হয়েছিল এবং যা তাঁর শাহাদাতের কারণ হয়েছিল, তার চালিকাশক্তি খিলাফত নিয়ে কোনো বিবাদ ছিল না; বরং তারা ছিল এমন কিছু লোক যারা তাঁর প্রতি আরোপিত কিছু বিষয়ে তাঁকে ভুল মনে করেছিল। এমনকি আলী ইবনে আবি তালিব এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা কেউ কেউ যেমন ধারণা করে তেমন ছিল না। তা ইমামত বা নেতৃত্বের প্রশ্নে কোনো সশস্ত্র বিরোধ ছিল না। কেননা জিমাল, সিফফীন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা এই দাবি করেনি যে তারা অন্য কারো ইমামত বা নেতৃত্বে বিশ্বাসী বলে যুদ্ধ করছে।

আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরাম এবং আলেমদের মধ্য থেকে যারা এই যুদ্ধগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাদের অনেকেই যা ঘটেছিল তাকে মুসলিমদের ওপর নেমে আসা একটি ফিতনা হিসেবে গণ্য করেন। এমনকি যারা সে সময়ে ছিলেন তাদের কেউ কেউ নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন এবং কোনো পক্ষেই যুদ্ধ করেননি।

সুতরাং আলী এবং অন্যদের মধ্যে যুদ্ধ ছিল ন্যায়নিষ্ঠ পক্ষ এবং বিদ্রোহী পক্ষের মধ্যকার লড়াই। এটি কোনো ধর্মীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় মূলনীতির বিরোধের কারণে প্রথম যে তলোয়ারটি কোষমুক্ত হয়েছিল, তা ছিল খারেজিদের তলোয়ার। তাদের যুদ্ধ ছিল অন্যতম বড় যুদ্ধ এবং তারাই এমন সব নতুন মতবাদের উদ্ভাবন করেছিল যাতে তারা সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছিল এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করেছিল।

সুতরাং আলী এবং যারা তাঁর ইমামত অস্বীকার করে তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি। আর আলীর খিলাফতের দিনগুলোতে কেউ এ কথা বলেছিল বলে প্রমাণিত নয় যে, তিনি তাঁর চেয়ে খিলাফতের বেশি হকদার। বরং উসমানের শাহাদাতের পর আলী (রা.)-এর মর্যাদা এবং খিলাফতের দায়িত্ব লাভের যোগ্যতার ব্যাপারে উম্মত স্বীকৃতি প্রদানকারী ছিল।

মদিনার অনেক মুসলমান যখন আলীর কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে, তালহা এবং জুবায়েরের কাছে কেউ বায়আত গ্রহণ করেনি এবং তাঁরাও কারো কাছে বায়আত চাননি। অর্থাৎ, যদি তালহা এবং জুবায়ের সেই ঘটনা বা বিরোধে আলীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকেন, তবে তাদের ও আলীর মধ্যে সংঘটিত সেই বিরোধের কারণ এটি ছিল না যে...

তারা দাবি করে যে, তারা খিলাফতের অধিক হকদার, বরং এটি ছিল অন্যান্য বিষয়ের কারণে। আর আমরা যে বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছি তা একথাই প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের আপোসে যুদ্ধ করার কারণ ইমামত ছিল না। এই কারণে একে আকীদার অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না; বরং এটি ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত ব্যবহারিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হয়।

আশ-শাহরাস্তানির বক্তব্যে অতিরঞ্জন থাকা সত্ত্বেও—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি—তা একথার পথে অন্তরায় নয় যে,

রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব বা মহান ইমামত উম্মাহর জনসাধারণের নিকট থেকে এমন গুরুত্ব লাভ করেছে যা খুব কম বিষয়ের ভাগ্যেই জোটে। এই গুরুত্বের মাত্রা কোনো কোনো সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে—যেমনটি আমরা বলেছি—তা মুসলমানদের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং উম্মাহর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। কোনো কোনো সময় এই ক্ষেত্রে তলোয়ার তার ভূমিকা রেখেছে, আবার সবক্ষেত্রেই জিহ্বা ও কলম নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে মহান ইমামত বা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বিষয়টি এমন এক গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়েছে যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যুগে ইসলামী রাজনৈতিক গবেষণাসমূহ আবর্তিত হয়েছে। এটি এমন এক অক্ষে পরিণত হয়েছে যা থেকে এই বিপজ্জনক অঙ্গনে গবেষকদের চিন্তাধারা বিচ্যুত হয় না।

শিয়ারা মহান ইমামত সম্পর্কে গ্রন্থ রচনাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ময়দানে মহান ইমামত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছে, যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন আলীর অনুসারীগণ। পরবর্তীতে অন্যরা এতে তাদের গবেষণা ও চিন্তার ফলাফল যুক্ত করেছেন। মহান ইমামত সংক্রান্ত মতাদর্শগুলো প্রথম দিকে মৌখিকভাবে বর্ণিত হতো যা কোনো কোনো সময় বিতর্কের রূপ নিত অথবা আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে আদান-প্রদানকৃত পত্রাবলির আকার ধারণ করত, কিংবা কোনো কোনো সময় তা সাধারণ পাঠদান হিসেবে চলত। কিন্তু প্রথম আব্বাসীয় যুগের আগে সুসংগঠিতভাবে গ্রন্থ সংকলন ও রচনার প্রকাশ ঘটেনি।

মূলত শিয়াদের মধ্যে মহান ইমামত সম্পর্কে সুসংগঠিত জ্ঞানতাত্ত্বিক লেখনীর উদ্ভব হয়েছিল তাদের সাথে খারিজী, মুতাযিলা এবং আহলে সুন্নাতের বিরোধের ফলস্বরূপ। যেহেতু এই যুগটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির কাল, তাই সেখানে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

দশম পাঠ

বিতর্ক ও বাদানুবাদ; মুতাজিলা ও খাওয়ারিজদের মতো অন্যান্য দলগুলো শিয়াদের সাথে এমন এক ইলমী বাদানুবাদে লিপ্ত হতে শুরু করেছিল যার মাধ্যমে তারা শিয়াদের উত্থাপিত বিষয়গুলোর জবাব দিত। এর ফলে একটি উর্বর বুদ্ধিবৃত্তিক ফসল তৈরি হয়েছিল যা মুসলমানদের বিদ্যমান জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হয়।

যখন শিয়া এবং খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতো অন্যদের মধ্যে এই বিতর্ক চলছিল, তখন ইলমুল কালামের আবর্তিত বিষয়াদি সংক্রান্ত বাদানুবাদ থেকে দূরে থাকা অন্য একটি দল ছিল। তারা হলো মুহাদ্দিসীন বা আহলুস সুন্নাহর জামাত, যারা ইলমুল কালামের বিষয়গুলোতে লিপ্ত হতে অপছন্দ করতেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ফিকহী বিধান আহরণে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। একারণেই ইমামতে উজমা (মহা-নেতৃত্ব) সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাহর গবেষণা অন্যান্য দলগুলোর গবেষণার তুলনায় বিলম্বে বা পরবর্তী সময়ে এসেছে।

শিয়াদের মোকাবিলায় প্রথমত মুতাজিলারাই অগ্রণী ছিল যারা আহলুস সুন্নাহর জন্য পথ সুগম করেছিল, যারা পরবর্তীতে এই নতুন ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখতে শুরু করে। যেহেতু শিয়ারাই প্রথম ইমামতে উজমা সম্পর্কে আলোচনা করেছিল—যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি—তাই তারা এ সংক্রান্ত তাদের গবেষণাকে ইলমুল কালামের অন্তর্ভুক্ত করেছিল; কারণ তারা দাবি করে যে, ইমামগণের প্রতি ঈমান আনা ঈমানেরই অংশ এবং কোনো ব্যক্তি ইমামের প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত মুমিন হতে পারে না। তাদের এই প্রভাব বিস্তারকারী ধারণাটিই তাদের ইমামত সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং ইলমুল কালামের মধ্যে তা নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যা সঠিক পরিভাষায় বলতে গেলে তাওহীদেরই জ্ঞান।

সুতরাং তারা একে আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং একে শাখা বিধান (ফুরু) হিসেবে নয় বরং আকীদা হিসেবে গবেষণা করেছে।

এমনকি তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতকে কেবল তাদের ইমামদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলে: "আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর আহলে বাইতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন—তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—এবং তারা না থাকলে আল্লাহ আসমান ও জমিন, জান্নাত ও জাহান্নাম, আদম ও হাওয়া, ফেরেশতা এবং তাঁর সৃষ্টি করা অন্য কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না, তাদের সকলের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।" তাদের কেউ কেউ আরও বলে: "কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইমামগণকে—তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—এবং তার যামানার ইমামকে চিনতে পারে।"

শারয়ি রাজনীতি
দশম পাঠ

এ জাতীয় অন্যান্য বক্তব্যসমূহ যা নির্দেশ করে যে, তারা ইমামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে বরকতময় ও সুমহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে; এ সব কিছুই আমাদের নির্দেশ করে যে, শিয়াগণ তাদের ইমামত ও ইমামগণের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

শিয়াদের এই দাবিতে উম্মতের ঐকমত্য (ইজমা) থেকে স্পষ্ট বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও—যে ইমামত ঈমানের অন্যতম মূল ভিত্তি—কেননা ইসলাম ধর্মে এটি সুবিদিত যে, কোনো কাফের যদি বিশ্বাস স্থাপন করে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, আর এই কালিমার দাবিগুলো পূরণ করে, তবে সে এর মাধ্যমেই মুমিন হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী একে সমর্থন করে: "আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। যখন তারা তা করবে, তখন ইসলামের হক ব্যতীত তারা আমার থেকে নিজেদের রক্ত ও ধন-সম্পদ নিরাপদ করে নেবে।"

এই হাদিসে নবী ﷺ ইমামগণের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো, তাদের বন্দি করো, তাদের অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকো। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" [আত-তাওবা: ৫]। এতেও তিনি ইমামগণের প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" [আত-তাওবা: ১১]। এ সবকিছুর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই ইমামতের কথা উল্লেখ করেননি।

ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের বর্ণনায় বর্ণিত ‘মুত্তাফাকুন আলাইহি’ হাদিসে ঈমানের রুকনগুলোর মধ্যেও ইমামতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। জিবরাঈল (আ.) এক মরুবাসীর বেশে নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন: "ইসলাম হলো তুমি এই সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ করবে।" এতে তিনি ইমামের কথা উল্লেখ করেননি। "আর ঈমান হলো তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি।" এতেও তিনি ইমামের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেছিলেন: "ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।" এটি একটি মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

পৃষ্ঠা 6

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দশম পাঠ

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যা মুমিনদের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এবং ইমামতের সামান্যতম ইঙ্গিত ছাড়াই তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবে বর্ণনা করে। এর অর্থ হলো, ইমামত ঈমানের কোনো অংশ নয়, যেমনটি শিয়ারা মনে করে থাকে। মহান আল্লাহর এই বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন: "মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণে কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই মূলত প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।" [আল-আনফাল: ২-৪]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইমামতের প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করেননি। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; তারাই সত্যবাদী।" [আল-হুজুরাত: ১৫] এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন: "পূণ্য শুধু পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর নাম নয়; বরং পুণ্য হলো যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনল এবং সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও তা নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, যাঞ্চাকারী এবং দাসমুক্তির জন্য ব্যয় করল; আর যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে আর অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" [আল-বাকারা: ১৭৭]

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আলিফ-লাম-মীম। এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনে এবং তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম।" [আল-বাকারা: ১-৫]

অতএব, উল্লিখিত এই সকল আয়াতে, যেখানে সত্য মহান আল্লাহ মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি এই গুণগুলোর মধ্যে এটি উল্লেখ করেননি যে তারা ইমামতের প্রতি ঈমান রাখে এবং ইমামত ঈমানের একটি রুকন বা স্তম্ভ।

৪৫৬

পৃষ্ঠা 7

শারঈ রাজনীতি
দশম পাঠ

শিয়াদের দাবির সপক্ষে যে বিষয়গুলো সংশয় হিসেবে থাকতে পারে—অর্থাৎ যারা মনে করে ইমামত বা নেতৃত্ব ঈমানের একটি শর্ত—তাদের এই দাবির সপক্ষে আমরা এমন কোনো সংশয় খুঁজে পাই না, কেবল সেই হাদিসটি ছাড়া যা তারা রাসূলুল্লাহর দিকে

সম্বন্ধ করে থাকে। আর তা হলো: "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার সময়ের ইমামকে চিনল না, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।" আলিমগণ এই হাদিসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের কেউ কেউ এর প্রতিবাদে বলেন: কে এই হাদিসটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন? অর্থাৎ এর বর্ণনাকারী কে? আর কোনো বর্ণনাকারী ছাড়া হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় না। এই হাদিসের সনদ বা সূত্র কোথায়?

নবী থেকে কোনো বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে, যদি না সেই পথ স্পষ্ট করা হয় যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে নবী তা বলেছেন? অর্থাৎ নবী থেকে কোনো হাদিস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না আমরা সেই সনদ ও পথ স্পষ্ট করি যা আমাদের নিকট এই হাদিসটি পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং যখন এই সনদটি বর্ণিত হবে না, তখন এই হাদিসটি ধর্তব্য হবে না। এটি তো তখন হতো যদি হাদিস বিশারদদের নিকট এর অবস্থা অজ্ঞাত থাকত; কিন্তু এই হাদিসটি তো এই শব্দে মোটেও পরিচিত নয়।

অতএব আলিমগণ, এবং তাদের অগ্রভাগে ইবনে তাইমিয়্যাহ এই হাদিসটি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। প্রথমত তিনি বলেন যে, এর কোনো সনদ নেই। এই হাদিসের বর্ণনাকারীরা কোথায়? আর যতক্ষণ এর কোনো বর্ণনাকারী নেই, ততক্ষণ এই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তিনি বলেন যে, হাদিসটি হাদিস বিশারদদের নিকট একেবারেই পরিচিত নয়। তবে এর কাছাকাছি অন্য একটি হাদিস হতে পারে যা নবী বলেছেন: "যে ব্যক্তি আনুগত্যের **হাত** সরিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কোনো দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে তার গলায় কারো আনুগত্যের বাইয়াত নেই, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।"

সুতরাং এই হাদিসটি একথার প্রমাণ দেয় না যে, ইমামত ইসলামের স্তম্ভসমূহের একটি। বরং নবী এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন যে, মুসলিমের জন্য ইমামের আনুগত্য করা বা শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শাসক কোনো পাপের আদেশ না দেয়। কারণ নবী বলেছেন: "সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"

এরপর যদি শাসক জালিমও হয়ে যায়, তবে নবী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও আমাদের নিষেধ করেছেন, যদি বিদ্রোহের ফলে তার ক্ষমতায় থাকার চেয়ে বড় কোনো ফিতনা বা অনিষ্টের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটিই এই হাদিসের মর্মার্থ।

৪৫৭

পৃষ্ঠা ৪

দশম পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

ইমামত এবং একে ইলমুত তাওহিদ ও ইলমুল কালামের আলোচ্য বিষয় অথবা ফুরুআতের (শাখা বিষয়) আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করার সাথে এই হাদিসের কোনো সম্পর্কই নেই। অতএব, এই হাদিসটি নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোনোভাবেই একথার প্রমাণ বহন করে না যে, ইমামত বা ইমামতের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

আমরা বলি: উম্মতে মুসলিমার ইজমা (ঐক্যমত) থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ‘ইমামতে উযমা’ (মহা-নেতৃত্ব) ঈমানের অংশ—তাদের এই দাবির অসারতা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কেবল এতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা এর সাথে বিদআত যোগ করেছে এবং নানা প্রকারের ভ্রষ্টতা প্রকাশ করেছে। শিয়ারা ইমামত বিষয়ক তাদের রচনাবলী ও গবেষণায় বিভিন্ন ধরণের বিদআত ও বিচ্যুতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে; যেমন ইমামগণের নিষ্পাপ হওয়ার দাবি করা এবং প্রথম তিন খলিফা: আবু বকর, উমর ও উসমানের নিন্দা করা। এই নিন্দা ও কুৎসা রটনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা গোপন করার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছে। এমনকি তারা অন্যান্য সকল সাহাবী এবং তাদের মতের সাথে যারা ঐকমত্য পোষণ করেনি, তাদের সবার সমালোচনা ও নিন্দা করেছে।

এটা স্বাভাবিক ছিল যে, আহলে সুন্নাহসহ অন্যান্য মুসলিম দলগুলো তাদের গবেষণার ময়দানে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেবে। তারা

যেহেতু ইলমুল কালামের মধ্যে এই বিষয়টি আলোচনা করেছে, তাই আলিমগণের জন্য ইলমুল কালামের ময়দানেই তাদের মতবাদের প্রতিউত্তর দেওয়া অধিকতর সংগত ও কার্যকর ছিল।

কাজেই এটি স্বাভাবিক ছিল যে, আহলে সুন্নাহ ও অন্যান্য মুসলিম দলসমূহ তাদের গবেষণার স্থানেই তাদের প্রতিউত্তর দেবে এবং যে বিদ্যায় তারা তাদের ভ্রষ্টতাগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে, সেই বিদ্যাতেই তাদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে; যাতে তাদের দাবি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা আলিমদের দেওয়া জবাবসমূহ জানতে পারে, বিশেষ করে যেহেতু তারা দাবি করেছে যে, এই ভ্রষ্টতা আকীদার অন্যতম মূল ভিত্তি।

প্রকৃত সত্য হলো, ইমামত সংক্রান্ত আলোচনা আকীদার মূল স্তম্ভসমূহের কোনো অংশই নয় যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বরং তা ইসলামি শরীয়াহর শাখাগত বিষয়সমূহের একটি শাখা মাত্র। রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামের পদটি 'ফরযে কিফায়া' সমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, যা কেউ পালন করলে অবশিষ্টদের পক্ষ থেকে আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়।

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দশম পাঠ

উসূলুদ্দীন (দীনের মূলনীতিসমূহ) এই পর্যায়ের বিষয় নয়; বরং এগুলো ঐসব ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো মুকাল্লাফ (শরিয়তের বিধান পালনে দায়বদ্ধ ব্যক্তি) থেকে রহিত হয় না। বরং আমরা দেখি যে, উলামায়ে কিরাম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন যে, ইমামতের (নেতৃত্ব) মাসআলাগুলোতে নিমগ্ন হওয়া থেকে দূরে থাকা একজন ব্যক্তির দীনের নিরাপত্তার জন্য তাতে নিমগ্ন হওয়ার চেয়ে অধিক শ্রেয়। এর অর্থ হলো, ইমামত আকিদার মূল রোকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা ফুরু বা শাখাগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি আমরা বলেছি।

আমরা দেখতে পাই যে, আলিমগণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে, ইমামত সংক্রান্ত আলোচনার স্বাভাবিক স্থান ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব) নয়, বরং এর স্বাভাবিক স্থান হলো ইলমুল ফিকহ (শরিয়তি বিধান শাস্ত্র)।

তাদের কেউ কেউ বলেন: "এতে কোনো বিতর্ক নেই যে, ইমামত সংক্রান্ত আলোচনা ফুরু বা শাখা-প্রশাখার জ্ঞানের সাথেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এর সারকথা হলো ইমামত কায়েম করা এবং বিশেষ গুণাবলীতে ভূষিত একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরজে কিফায়াভুক্ত বিষয়। এগুলো এমন সামষ্টিক বিষয় যার সাথে দ্বীনী বা পার্থিব বিবিধ কল্যাণ জড়িয়ে রয়েছে, যা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যাদি সুশৃঙ্খল হয় না। শারে' (বিধানদাতা) সামগ্রিকভাবে এটি হাসিল করার উদ্দেশ্য রেখেছেন, প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এটি সম্পাদিত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর এটি যে আকিদাগত বিষয়ের পরিবর্তে আমলগত বিধানের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই।"

"কিন্তু যখন মানুষের মাঝে ইমামত প্রসঙ্গে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতবিরোধ, এমনকি ভিত্তিহীন মনগড়া মতবাদ ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ করে রাফেজি ও খারেজি ফিরকাগুলোর পক্ষ থেকে—এবং প্রতিটি দল এমন গোঁড়ামির দিকে ঝুঁকে পড়ল যা ইসলামের অনেক মূলনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা, মুসলমানদের আকিদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের নিন্দা করার পর্যায়ে পৌঁছে গেল; অথচ এটি নিশ্চিত যে, তাঁদের অবস্থা, তাঁদের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করার সাথে মুকাল্লাফদের আমলের তেমন কোনো গভীর সম্পর্ক নেই—তখন মুতাকাল্লিমগণ (ধর্মতাত্ত্বিকগণ) এই অধ্যায়টিকে ইলমুল কালামের অধ্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

ইমামত বিষয়ক গবেষকদের এই বক্তব্য এটি স্পষ্ট করে যে, ইমামত সংক্রান্ত আলোচনা মূলত ফুরু বা শাখা-প্রশাখার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, আকিদার অন্তর্ভুক্ত নয়; এবং এটি ইলমুল কালামের বিষয় নয়, বরং এটি ইলমুল ফিকহ-এর বিষয়। অতঃপর এটি স্পষ্ট

হয় যে, ফকিহগণ শিয়াদের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন যারা ইমামতকে আকিদার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। তাই তাদের লিখিত আকিদাগত বিষয়গুলোর মাধ্যমেই তাদের জবাব দেওয়া যথাযথ ছিল, যাতে মানুষ ভ্রষ্টতা থেকে সত্যকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ — দশম পাঠ

খিলাফত, আমিরুল মুমিনিন এবং ইমাম-এর অর্থসমূহ

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান নিয়োগের বিষয়ে ইসলামি মাযহাবসমূহের বক্তব্য আলোচনার পূর্বে, আমরা প্রথমে মুসলিমদের বিষয়াবলি পরিচালনাকারীর ওপর যে উপাধিগুলো প্রয়োগ করা হতো তার বর্ণনা তুলে ধরব। উপাধিগুলো হলো: খলিফা, আমিরুল মুমিনিন এবং ইমাম। এই উপাধিগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারীর ওপর প্রয়োগ করা হতো এবং এগুলোর প্রত্যেকটির পেছনে কিছু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি ছিল, যা এগুলোর উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর এগুলোর ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করেছে।

১. খিলাফত:

মূলত এটি ‘খালাফা’ ক্রিয়ামূলের মাসদার (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)। বলা হয়ে থাকে: ‘অমুক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অমুকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, সে তার স্থলাভিষিক্ত হয়, সুতরাং সে একজন খলিফা’। ‘আল-কামুস’ গ্রন্থের লেখক ও এর ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন: ‘এবং সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে’। যুক্তিও এটিই দাবি করে; কেননা এর অর্থ হলো নেতৃত্ব প্রদান করা।

ভাষাতত্ত্বের কিতাবসমূহে ‘খালাফা’ ক্রিয়াটি যা নির্দেশ করে তা হলো—একজন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হওয়া সেই কাজে যা প্রথমজন করতেন; চাই প্রথম ব্যক্তিই তাকে স্থলাভিষিক্ত করে যান অথবা দ্বিতীয় ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া ছাড়াই তার পরে আগমন করেন। ‘আস-সিহাহ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: ‘অমুক ব্যক্তি অমুকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে যখন সে তার খলিফা হয়’। বলা হয়: ‘সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে’। এর মধ্য থেকে মহান আল্লাহর বাণী হলো: **{আর মুসা তার ভাই হারুনকে বললেন: “তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো”}** [আল-আরাফ: ১৪২]। এছাড়া ‘খালাফাহু’ এর অর্থ এটিও হয় যখন আপনি কারো পরে আসেন।

‘মুখতার আস-সিহাহ’ গ্রন্থে রয়েছে: ‘অমুক ব্যক্তি অমুকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে যখন সে তার খলিফা হয়’। বলা হয়: ‘সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে’, এর অন্তর্ভুক্ত হলো মহান আল্লাহর বাণী: **{আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো}** এবং ‘খালাফাহু’ এর অর্থ এটিও হয় যে—সে তার পরে এসেছে।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ‘খিলাফত’ শব্দটি মূলত ‘খালাফা’ এর মাসদার, এরপর এটি প্রচলিত অর্থে ‘মহান নেতৃত্ব’ (আল-জিয়ামাহ আল-উজমা)-এর ওপর প্রয়োগ করা শুরু হয়; আর তা হলো উম্মতের সকল সদস্যের ওপর সাধারণ কর্তৃত্ব বজায় রাখা, তাদের বিষয়াবলি পরিচালনা করা এবং শরিয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ অনুযায়ী উম্মতের কল্যাণ অর্জিত হয় এমন সব দায়িত্ব পালন করা।

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দশম পাঠ

কাকে ‘খলিফা’ নামে অভিহিত করা হয়?

রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে কাদের ক্ষেত্রে ‘খলিফা’ উপাধিটি ব্যবহার করা সংগত, সে বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন:

- সালাফদের একাংশের মত হলো—যাদের মাঝে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও রয়েছেন—হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পরবর্তী শাসকদের ক্ষেত্রে ‘খলিফা’ শব্দটির প্রয়োগ অপছন্দনীয়। এই মতের সপক্ষে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীটি পেশ করেন: “আমার উম্মতের মাঝে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, তারপর হবে রাজতন্ত্র।”

- সালাফদের অন্য একটি অংশ মনে করেন যে, হাসান ইবনে আলীর পরবর্তী যে কোনো ব্যক্তি যখন উম্মতের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাকেও ‘খলিফা’ বলা যাবে। তবে এই নামকরণের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যিনি এই পদে আসীন হবেন তাকে অবশ্যই ন্যায়বিচার ও সত্যের পথে পরিচালিত হতে হবে। তারা দলিল হিসেবে সেই বর্ণনাটি পেশ করেন যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তালহা, যুবাইর, কাব এবং সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে খলিফা ও বাদশাহর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তালহা ও যুবাইর বললেন: “আমরা জানি না।” কিন্তু সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: “খলিফা হলেন তিনি যিনি প্রজাদের মাঝে ন্যায়বিচার করেন, তাদের মাঝে সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করেন এবং তাদের প্রতি সেরূপ মমতা পোষণ করেন যেমন একজন ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি এবং একজন পিতা তার সন্তানের প্রতি মমতা রাখেন। আর তিনি তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করেন।” তখন কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: “আমি ভাবিনি যে এই মজলিসে খলিফা ও বাদশাহর মাঝে পার্থক্য করার মতো কেউ আছে; তবে মহান আল্লাহ সালমানকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছেন।”

তবে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই সাধারণ পরিভাষা হিসেবে এটি চলে আসছে যে, মুসলমানদের সামগ্রিক বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব যিনিই পালন করেন তাকেই ‘খলিফা’ বলা হয়। আর “আমার উম্মতের মাঝে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর...” এই হাদিস দ্বারা পেশকৃত দলিলের জবাবে বলা যায় যে, এখানে পূর্ণাঙ্গ খিলাফত বোঝানো হয়েছে, সাধারণ খিলাফত নয়।

খিলাফত কার স্থলাভিষিক্ত হওয়া?

খিলাফত কার স্থলাভিষিক্ত হওয়া সে বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম চারটি মত ব্যক্ত করেছেন:

দশম পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

প্রথমত: খিলাফত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; তাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধানকে বলা হয়: 'খলীফাতুল্লাহ' (আল্লাহর খলীফা)। কারণ মহান ইমাম তাঁর সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার অধিকারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন: "আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) করেছেন।" [আল-আনআম: ১৬৪]।

দ্বিতীয়ত: আদম ও দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) ব্যতীত অন্য কাউকে 'আল্লাহর খলীফা' বলা বৈধ নয়। এর কারণ হলো আদমের ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করব।" [আল-বাকারা: ৩০] এবং দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী: "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি।" [সদ: ২৬]।

তৃতীয়ত: সকল নবীর (আলাইহিমাস সালাম) ক্ষেত্রে 'আল্লাহর খলীফা' উপাধিটি ব্যবহার করা জায়েয।

চতুর্থত—এবং এটিই অধিকাংশ ফকীহগণের মত: 'আল্লাহর খলীফা' বলা বৈধ নয়। তারা এ কথা বলনেওয়ালাকে পাপাচারের দিকে নিসবত করেছেন। বরং সাধারণভাবে 'আল-খলীফা' বলা হবে অথবা 'রাসূলুল্লাহর খলীফা' বলা হবে। আর 'আল্লাহর খলীফা' না বলার কারণ হলো—কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা কেবল মৃত্যু বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে; অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করে না এবং তাঁর ক্ষেত্রে অনুপস্থিতিও অসম্ভব। আর তাকে যে 'রাসূলুল্লাহর খলীফা' বলা হয়, তার কারণ হলো তিনি দ্বীন ও দুনিয়া উভয় বিষয়ের সাধারণ নেতৃত্বে উম্মতের মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত আমাদের নিকট অগ্রগণ্য এই মতটিকে সমর্থন করে: জনৈক ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে আল্লাহর খলীফা!" আবু বকর তা অস্বীকার করলেন এবং বললেন, "আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রাসূলুল্লাহর খলীফা।" জনৈক ব্যক্তি উমর ইবনে আব্দুল আযীয-কে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আল্লাহর খলীফা!" তখন উমর তাকে বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক! তুমি অনেক দূরের এক বিষয় ধরেছ। আমার মা আমার নাম রেখেছেন উমর, তুমি যদি আমাকে এই নামে ডাকতে তবে আমি তা গ্রহণ করতাম। তারপর আমি বড় হলাম এবং আমার উপনাম রাখা হলো আবু হাফস, যদি তুমি আমাকে এই নামে ডাকতে তবে আমি তা গ্রহণ করতাম। এরপর তোমরা আমাকে তোমাদের বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছ এবং আমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' নাম দিয়েছ, যদি তুমি আমাকে এই নামে ডাকতে তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হতো।"

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
দশম পাঠ

এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি রাসূল হোক বা অ-রাসূল হোক, তাকে ‘খলিফাতুল্লাহ’ (আল্লাহর প্রতিনিধি) বলা সমীচীন নয়। কারণ, আমরা যদি এর যৌক্তিকতার দিকে লক্ষ্য করি যে, কেবল তারই স্থলাভিষিক্ত হওয়া যায় যে মৃত্যুবরণ করে অথবা অনুপস্থিত থাকে, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মৃত্যু ও অনুপস্থিতি থেকে পবিত্র; তবে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, এটি আদম, দাউদ এবং অন্য সকল রাসূলদের —তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক— ক্ষেত্রেও অসম্ভব।

আর যারা আদম ও দাউদ —তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক— এর ক্ষেত্রে ‘খলিফাতুল্লাহ’ উপাধি প্রয়োগ করা বৈধ বলে মনে করেন এবং যে দুটি আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন, সেগুলোতে তাঁদের কারো ক্ষেত্রেই ‘খলিফাতুল্লাহ’ শব্দটি সরাসরি ব্যবহার

করা হয়নি। বরং উক্ত আয়াতদ্বয়ে 'খলিফা' শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা ছাড়াই কেবল 'খলিফা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যিনি ইমামতে উজমা (সর্বোচ্চ নেতৃত্ব) গ্রহণ করেন, তাকে 'খলিফা' বলা বৈধ। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, তাঁদের দুজনের ক্ষেত্রে —অর্থাৎ আদম ও দাউদ আলাইহিমাস সালাম-এর ক্ষেত্রে— 'খলিফাতুল্লাহ' বলার স্বপক্ষে দলিল রয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ কেবল সম্মানের জন্য হতে পারে, যেহেতু তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

২. আমিরুল মুমিনীন উপাধি:

আবু বকর (রা.)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত সম্পন্ন হওয়ার পর মানুষ তাঁকে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা' বলে ডাকতে শুরু করে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তারা তাঁকে এই নামেই সম্বোধন করত। অতঃপর আবু বকর (রা.) কর্তৃক খিলাফতের জন্য মনোনীত হওয়ার পর যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর হাতে বায়আত করা হলো, তখন তারা তাঁকে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফার খলিফা' বলে ডাকত।

তারা কিছুকাল এভাবেই চালিয়ে যান, কিন্তু তারা সম্ভবত একে কিছুটা কষ্টসাধ্য মনে করতে থাকেন; কারণ এটি দীর্ঘসূত্রিতা এবং একের পর এক শাসক পরিবর্তনের ফলে সম্পর্কের দীর্ঘ পরম্পরা তৈরি করবে। এরপর যখনই 'খলিফা' শব্দটির পরিবর্তে অন্য একটি উপাধি তাঁদের সামনে দৃশ্যমান হলো, তাঁরা সেটিকে উত্তম মনে করলেন এবং সেটিই ইমামে আজম বা রাষ্ট্রপ্রধানের স্থায়ী উপাধি হয়ে দাঁড়ালো। এই উপাধিটি হলো 'আমিরুল মুমিনীন'। সর্বসম্মতিক্রমে শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁকে এই নামে ডাকা হয়, তিনি হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। উমর (রা.) ইরাকে তাঁর আমিলের (প্রতিনিধি) নিকট লিখেছিলেন: "আমার নিকট এমন দুজন শক্তিশালী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি পাঠাও যাঁদেরকে আমি... সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি।"

দশম পাঠ

"ইরাক ও তার অধিবাসীগণ"; অতঃপর তিনি লাবীদ ইবনে রাবীয়া এবং আদি ইবনে হাতিম আত-তায়ী-কে পাঠালেন। তারা যখন মদীনায় আসলেন, তখন মসজিদের প্রাঙ্গণে তাদের বাহন দুটি বাঁধলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে তারা আমর ইবনুল আস-কে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে বললেন: "আমীরুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা)-এর কাছে আমাদের প্রবেশের অনুমতি নিন।" তখন আমর বললেন: "আল্লাহর কসম, তোমরা তাঁর জন্য যথাযথ নামই নির্বাচন করেছ; আমরা মুমিন এবং তিনি আমাদের আমীর (নেতা)।" এরপর তাঁরা তাঁকে এই নামেই সম্বোধন করলেন এবং মানুষের মাঝে এটি তাঁর উপাধি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করল এবং উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরবর্তী খলিফাগণ উত্তরাধিকারসূত্রে এটি গ্রহণ করলেন।

অতঃপর শিয়াগণ আলী ইবনে আবি তালিবের ক্ষেত্রে 'ইমাম' উপাধিটি ব্যবহার করত। এর মাধ্যমে তারা তাদের এই বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করত যে, আলী ইবনে আবি তালিব আবু বকর-এর তুলনায় নামাজের ইমামতির জন্য অধিকতর যোগ্য—অর্থাৎ তিনি তাঁর চেয়ে মহান ইমামতির (রাষ্ট্র পরিচালনার) জন্য অধিকতর যোগ্য। তারা দাবি করত যে, আলী ইবনে আবি তালিব আবু বকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই তিনি ইমামত বা খিলাফতের অধিক হকদার। সুতরাং তারা আলীকে 'ইমাম' উপাধিতে বিশেষিত করে এবং পরবর্তী সময়ে যারা এই পদের যোগ্য বলে তাদের কাছে গণ্য হতো, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তারা এই উপাধি ব্যবহার করত। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সংগোপনে দাওয়াত দিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাকে 'ইমাম' বলে ডাকত। কিন্তু যখন তারা রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতো, তখন তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে উপাধিটি পরিবর্তন করে 'আমীরুল মুমিনীন' করে দিত। যেমনটি বনু আব্বাসের শিয়াগণ করেছিল; তারা ইব্রাহিম পর্যন্ত তাদের ইমামদের 'ইমাম' হিসেবেই ডেকে আসছিল, যাঁর জন্য তারা প্রকাশ্যে দোয়া করেছিল এবং তাঁর নির্দেশে যুদ্ধের অঙ্গীকার করেছিল। অতঃপর যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তাঁর ভাই

আস-সাফফাহ-কে 'আমীরুল মুমিনীন' হিসেবে ডাকা হয়েছিল।

৩. ইমাম ও ইমামত শব্দদ্বয়:

আমি শুরুতেই এ কথাটি উল্লেখ করতে চাই যে, রাষ্ট্রপ্রধানের বিষয়সংক্রান্ত আলোচনাগুলো কালামশাস্ত্রীয় বা ফিকহশাস্ত্রীয় গবেষণায় খিলাফত বা ইমারাতুল মুমিনীন সংক্রান্ত আলোচনা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়নি; বরং তা 'ইমামত' সংক্রান্ত আলোচনা হিসেবেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও খিলাফত, ইমারাতুল মুমিনীন এবং ইমামত—এই সবগুলিই মূলত একই অর্থ নির্দেশ করে, আর তা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব। তবে এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলি 'ইমামত' নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পিছনে একটি কারণ রয়েছে—যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে—শিয়াগণই সর্বপ্রথম এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলোকে ইমামত শিরোনামে তুলে ধরেছিল...

আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ

দশম পাঠ

মহান ইমামত (আল-ইমামাহ আল-উজমা) প্রসঙ্গের আলোচনা থেকে, এবং যেমনটি মুসলমানরা তাদের কার্যাবলী পরিচালনাকারীকে 'ইমাম' নামে অভিহিত করতেন, তারা এই পদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে ইমামত সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যখন তাদের বিরোধীরা এই বিষয়ে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো, তখন তারা তাদের পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারেনি, বিশেষ করে যখন সালাতের ইমামতকে অন্যতম সর্বোচ্চ ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে শিয়া এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যেকার সংলাপ শিয়াদের উদ্ভাবিত একই পরিভাষার ভিত্তিতে আবর্তিত হতে থাকে এবং পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন তারা একে একটি ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এতে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

এছাড়াও 'ইমাম' শব্দটি পবিত্র কুরআন এবং হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যদের ইমাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: **“স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বাণী দ্বারা পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম (নেতা) নিযুক্ত করছি’।”** [আল-বাকারাহ: ১২৪]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন: **“এবং আমি তাকে দান করলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকুব; এবং প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মপরায়ণ করলাম। আর আমি তাঁদেরকে ইমাম (নেতা) করলাম, তাঁরা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করতেন।”** [আল-আম্বিয়া: ৭২-৭৩] ।

‘ইমাম’ শব্দের আভিধানিক অর্থ:

ফিরোজাবাদী বলেন: "ইমাম হলো এমন কেউ যাকে অনুসরণ করা হয়, হোক সে কোনো প্রধান ব্যক্তি বা অন্য কেউ। এছাড়া রাজমিস্ত্রির ব্যবহৃত সুতা, পথ, বিষয় সংশোধনকারী, কুরআন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), খলিফা, সেনাবাহিনীর সেনাপতি, ছাত্র প্রতিদিন যা শেখে, এবং যাকে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"

‘আস-সিহাহ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: "ইমাম হলো সেই কাঠ যা দিয়ে দালানের নির্মাণ সোজা করা হয়। এছাড়া ইমাম হলো ভূখণ্ডের কোনো একটি অংশ বা জায়গা, পথ।" আল্লাহ তা'আলা বলেন: **“আর এ উভয় জনপদই প্রকাশ্য রাজপথে (ইমামুম মুবিন) অবস্থিত।”** [আল-হিজর: ৭৯]। এখানে ইমাম অর্থ: যার দ্বারা পথ চেনা যায়।

ইবনে মঞ্জুর ‘আম্মা’ (أَمَّ) মূলশব্দের অধীনে বলেন: "আল-আম্মু (فتح যোগে) অর্থ হলো সংকল্প করা বা লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া।" কাব ইবনে মালিকের বর্ণিত হাদিসে এসেছে: **“অতঃপর জাহান্নামীদের ওপর দরজার মূল স্তম্ভটি (বা প্রধান অংশ) বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, ফলে সেখান থেকে কোনো উত্তাপ বা ধোঁয়া বের হতে পারবে না।”**

৪৬৫

পৃষ্ঠা 16

দশম পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

...সর্বদা)) অর্থাৎ সেদিকে অভিমুখী হওয়া, ফলে তাদের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর আমি সালাতের উদ্দেশ্যে মাটির (তায়াম্মুমের) ইচ্ছা করেছি। অতঃপর তিনি বলেন: তিনি কওমের ইমামতি করেছেন এবং তাদের নিয়ে ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়েছেন: অর্থাৎ তিনি তাদের অগ্রবর্তী হয়েছেন, আর এটাই হলো ইমামত।

ইমাম: প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যাকে কোনো সম্প্রদায় অনুসরণ করে—চাই তারা সঠিক পথে থাকুক বা পথভ্রষ্ট হোক। আর ইমাম হলেন তিনি, যার অনুসরণ করা হয়—চাই তিনি প্রধান ব্যক্তি হোন বা অন্য কেউ। এর বহুবচন হলো 'আইম্মাহ' (ইমামগণ)। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে: "তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো" [আত-তাওবা: ১২], অর্থাৎ কুফরের প্রধান ও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাদের অনুসারীরা তাদের অনুগামী হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, 'ইমাম' শব্দটি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আদর্শ, অগ্রগামিতা, হিদায়াত বা পথপ্রদর্শন এবং দিকনির্দেশনা। কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে এটি নমুনা বা মডেল হিসেবে এবং মানুষের ক্ষেত্রে এটি অনুকরণের আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইমাম সেই অবস্থানে থাকেন যেখানে তিনি বিষয়াদির সংস্কার সাধন এবং মানুষের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন।

ইমামত শব্দটি 'আম্মা' ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। বলা হয়: অমুক ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করেছেন: যখন তিনি তাদের জন্য এমন একজন ইমামে পরিণত হন যাকে তারা অনুসরণ করে। যদি এই অনুসরণ সালাতের ক্ষেত্রে হয়, তবে তা 'ইমামতে সুগরা' (ক্ষুদ্রতর ইমামত) হিসেবে পরিচিত। আর যদি আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে অনুসরণ হয়, তবে তা 'ইমামতে কুবরা' (বৃহত্তর ইমামত), অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব।

এটি লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, যখন কোনো মুসলিমের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 'ইমামত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন তা কেবল 'ইমামতে কুবরা' বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অর্থই বহন করে। তবে যদি জ্ঞানের কোনো শাখা বা অন্য কোনো বিষয়ে কাউকে ইমাম হিসেবে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্যই তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়: বুখারী হলেন হাদীসের ইমাম, আবু হানীফা হলেন ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম এবং অমুক ব্যক্তি অমুক গোত্রের ইমাম।

যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 'ইমামত' শব্দটি ব্যবহার করা বৈধ নয়, তেমনিভাবে 'খিলাফত' এবং 'ইমারাতুল মুমিনীন' (মুমিনদের নেতৃত্ব) শব্দ দুটিও তদ্রূপ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে কোনো অঞ্চলের অথবা কোনো ছোট বা বড় সেনাদলের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন—যেমন আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস উসামা ইবনে যায়েদ—তাদের ক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে: যদি তাদের ক্ষেত্রে 'ইমারাতুল মুমিনীন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তবে 'মুমিনীন' শব্দের সাথে যুক্ত 'আল' (আলিফ-লাম) নির্দিষ্টকরণের জন্য। অর্থাৎ সেই মুমিনগণ যারা তাদের সাথে ছিলেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রত্যেকে সকল মুমিনের আমীর ছিলেন না, বরং তাদের এক অংশের আমীর ছিলেন। আর এই কারণে...

পৃষ্ঠা 17

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ — দশম পাঠ

আমরা উমর ইবনুল খাত্তাবকে উসামা ইবনু যায়িদকে এই বলে সম্বোধন করতে দেখি: "আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আমির।" তিনি এটি বলেননি যে: "আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আমিরুল মুমিনিন।" জবাবে উসামা তাঁকে বললেন: "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি আমাকে এ কথা বলছেন?" উমর বললেন: "আমি যতদিন বেঁচে থাকব আপনাকে আমির বলেই ডাকব; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার ওপর আমির ছিলেন।"

মহা-নেতৃত্বের (আল-ইমামাতুল উজমা) অর্থ:

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলমানরা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এবং বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপ্রধানকে খলিফা, আমিরুল মুমিনিন এবং ইমাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধানকে অবশ্যই এই উপাধিগুলোর কোনো একটি দ্বারা ভূষিত হতে হবে যাতে করে এই পদটি ইসলামি হয়ে যায়?

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি এমনটি মনে করে সে বিষয়গুলো বিচার করার ক্ষেত্রে জবরদস্তি করছে; কারণ এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমান এবং তাদের নেতা যেন ইসলামি আইনের অনুগত থাকেন; যাতে এই ব্যবস্থাকে ইসলামি ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করা যায়, সেই নেতার ওপর যে উপাধিই প্রয়োগ করা হোক না কেন। চাই তাঁর উপাধি আল্লাহর রাসূলের খলিফা হোক, কিংবা আমিরুল মুমিনিন অথবা তাঁদের মহান ইমাম (ইমামুল আজম) হোক; কারণ ইসলাম উপাধি নিয়ে মাথা ঘামায় না, বরং উপাধির পেছনে থাকা ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ নিয়েই ইসলাম গুরুত্ব দেয়।

সুতরাং যদি কোনো যুগে মুসলমানরা তাদের নেতার ওপর অথবা নেতা নিজেই নিজের ওপর "খলিফাতু রাসূলিল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপাধি প্রয়োগ করেন, অথচ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা ব্যবস্থার মূল চেতনা ইসলামি মূলনীতি ও আইন পালনের দিক থেকে দূরে থাকে, তবে বাস্তবে তা একটি অনৈসলামিক ব্যবস্থা হিসেবেই গণ্য হবে—তা "খলিফাতু রাসূলিল্লাহ" উপাধি থাকা সত্ত্বেও। আর যদি এর বিপরীতটি ঘটে, অর্থাৎ সমাজ ও তার নেতা ইসলামি আইনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকেন এবং এই নেতার ওপর খিলাফত, ইমারাতুল মুমিনিন কিংবা ইমামতের কোনো উপাধি ব্যবহার না করে বরং তাকে বলা হয়...

৪৬৭

পৃষ্ঠা 18

দশম পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

অন্য কোনো উপাধি যেমন 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি' বা উদাহরণস্বরূপ 'রাষ্ট্রপ্রধান' ব্যবহার করা হলেও, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থাটি একটি ইসলামী ব্যবস্থা হিসেবেই গণ্য হবে এবং কেউ এতে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে না।

এ বিষয়ে সারকথা হলো: ইসলাম নামের প্রতি লক্ষ্য করে না; আপনি একে যে নামেই ডাকুন না কেন: খলিফা, আমিরুল মুমিনিন কিংবা ইমাম। মূল বিষয় হলো এই খলিফাকে ইসলামের বিধান ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

আল-ইমামাহ আল-উজমার (সর্বোচ্চ নেতৃত্ব) পারিভাষিক সংজ্ঞা:

খেলাফত, ইমারাতুল মুমিনিন এবং ইমামত সংশ্লিষ্ট শাব্দিক অর্থ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পর আমরা এখন আল-ইমামাহ আল-উজমার সংজ্ঞা প্রদান করছি:

ইমাম মাওয়ার্দির প্রদত্ত সংজ্ঞা: ইমাম মাওয়ার্দির 'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থ থেকে ইমামাহ আল-উজমা সম্পর্কে যা বোঝা যায় তা হলো: দ্বীন রক্ষা এবং পার্থিব বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব।

লক্ষ্যণীয় যে, এই সংজ্ঞাটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে:

প্রথমত: ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান মূলত আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রতিনিধিত্ব করেন। এটি নির্দেশ করে যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামে আজমকে ইসলামের মূলনীতির পূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের জন্য একটি সর্বোত্তম আদর্শ হতে হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধানের দায়িত্বের বর্ণনা, যে ক্ষেত্রে তিনি রাসূলের (সা.) প্রতিনিধিত্ব করেন। আর তা হলো— প্রথমত, দ্বীনকে যাবতীয় কলুষতা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কাজ করা এবং দ্বিতীয়ত, উম্মতের পার্থিব স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমামাহ আল-উজমা প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী রাষ্ট্রের এমন এক নেতৃত্ব, যা ইসলামী আইনের অনুগত এবং যা দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় ক্ষেত্রে উম্মতের স্বার্থ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য সেই আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

দশম পাঠ
শরয়ী রাজনীতি

এবং দুনিয়া; কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অর্থ নেই যদি না তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো সেই সুস্পষ্ট সীমারেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় যা তিনি (রাসূলের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) তাঁর জন্য অঙ্কন করেছেন।

সুতরাং এটি এমন কোনো সরকার নয় যা কেবল তার পার্থিব স্বার্থের নিরিখে কোনো মানব রচিত আইনের অধীনে পরিচালিত হয়, যা পরকাল বা পরবর্তী জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না; বরং এটি এমন একটি সরকার যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতৃত্ব ছিল মানবীয় আচরণের সকল প্রকারে আল্লাহর বিধান বর্ণনা করার জন্য, চাই তা দ্বীন সংশ্লিষ্ট হোক বা দুনিয়া সংশ্লিষ্ট; অনুরূপভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত সরকারের অবস্থাও তাই। এই সরকার কেবল দ্বীন সংরক্ষণে এবং উজ্জ্বল শরীয়াহ কর্তৃক বর্ণিত সুস্পষ্ট হেদায়েতের আলোকে দুনিয়াবী রাজনীতি পরিচালনায় দায়বদ্ধ। কারণ, সৃষ্টির

উদ্দেশ্য কেবল তাদের দুনিয়া নয়; কেননা দুনিয়ার সবটাই অর্থহীন ও অসার, যেহেতু এর সমাপ্তি হলো মৃত্যু ও ধ্বংস। আর আল্লাহ তাআলা বলেন: "তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?" [আল-মুমিনুন: ১১৫]। সুতরাং মানুষের মূল লক্ষ্য হলো তাদের দ্বীন, যা তাদেরকে আখেরাতের সৌভাগ্যের দিকে ধাবিত করে: "আল্লাহর পথ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই।" [আশ-শূরা: ৫৩]

সুতরাং মুসলিম উলামায়ে কেরাম যেভাবে বর্ণনা করেছেন এটিই হলো ইমামা-তে কুবরা বা মহান নেতৃত্বের হাকিকত। অতএব, এটি রাজতন্ত্র নয়; কারণ রাজতন্ত্র রাজ্যের বিষয়াবলী পরিচালনায় প্রায়শই এমন সব বিধানের ওপর নির্ভর করে যা সত্যের পরিপন্থী বা জুলুমপূর্ণ। আর রাজতন্ত্রের লক্ষ্য সাধারণত থাকে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে নিজের আধিপত্য বজায় রাখা; সেখানে জোর-জবরদস্তি বা ক্ষমতার দাপটে তার শাসনে কী বিচ্যুতি ঘটল সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু ইমামা-তে কুবরার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই এই অর্থ বিদ্যমান নেই; বরং এটি মহাপ্রজ্ঞাবান শরীয়ত প্রণেতার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যা একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত আচরণে এবং আল্লাহর সাথে তাদের সামগ্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা অনুসরণ করা আবশ্যক তা স্পষ্ট করে দেয়।

অনুরূপভাবে, এটি এমন কোনো নেতৃত্বও নয় যা কেবল মানুষের সামাজিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে, যার অধীনে তারা এমন কিছু নিয়মের অনুগত হয় যা কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ ও বৈষয়িক উপযোগিতার ভিত্তিতে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, এমন আইন আল্লাহর নূর ব্যতিরেকে কোনো কিছু বিচার করার নামান্তর: "আল্লাহ যাকে নূর দান করেন না, তার জন্য কোনো নূর নেই..." [আন-নূর: ৪০]

কারণ শরীয়াহ প্রণেতা সকল মানুষের সেই সকল কল্যাণ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত যা তাদের পরকাল সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নিকট অগোচর; আর মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই পরকালে তাদের নিকট ফিরে আসবে। এ কারণেই নবী (সা.) বলেছেন: "এগুলো তোমাদেরই আমল যা তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" আর রাজনীতির বিধানসমূহ কেবল দুনিয়ার কল্যাণের দিকেই লক্ষ্য রাখে: "তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটি সম্পর্কে অবগত।" (আর-রুম: ৭)।

ইমাম নিয়োগের বিধান:

অর্থাৎ, মুসলমানদের জন্য কি একজন ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব, নাকি এটি ওয়াজিব বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়?

উম্মতের আলেমগণ মহান ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়া বিষয়ে চারটি মতামতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: তারা ইমাম নিয়োগ করাকে নিঃশর্তভাবে ওয়াজিব মনে করেন। অর্থাৎ, শান্তি ও স্থিতিশীলতার সময় হোক কিংবা ফিতনা ও অস্থিরতা প্রকাশের সময় হোক—সর্বাবস্থায় এটি ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মত: তারা ইমাম নিয়োগ করাকে একেবারেই ওয়াজিব মনে করেন না।

তৃতীয় মত: তারা ফিতনা ও অস্থিরতার সময় ইমাম নিয়োগ করাকে ওয়াজিব মনে করেন, কিন্তু শান্তি ও স্থিতিশীলতার সময় এটিকে ওয়াজিব মনে করেন না।

চতুর্থ মত: তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় ইমাম নিয়োগ করাকে ওয়াজিব মনে করেন, কিন্তু ফিতনা দেখা দিলে তার নিয়োগ

ওয়াজিব মনে করেন না।

প্রথম মত: ইমাম নিয়োগ করা নিঃশর্তভাবে ওয়াজিব:

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা হলেন উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম (জমহুর)। কেননা এটিই হলো সকল আহলে সুন্নাতের অভিমত, সকল মুরজিআদের অভিমত এবং নাজদাত সম্প্রদায় ব্যতীত অধিকাংশ মুতাজিলা ও খারেজীদের অভিমত এবং সকল শিয়াদের অভিমত। তবে আমাদের কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন:

প্রথম বিষয়: তারা সকলে নিরঙ্কুশভাবে ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও—অর্থাৎ সর্বাবস্থায়, চাই তা নিরাপত্তা ও গোলযোগহীন পরিস্থিতি হোক কিংবা বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার সময় হোক—তবে তারা এই ওয়াজিব হওয়ার উৎসের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন: তা কি শরীয়ত নাকি বিবেক?

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ বলেছেন: শ্রুতিগত দলিলসমূহ ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ দেয় এবং এক্ষেত্রে বিবেকের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এটি তাদের অনুসৃত এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে, বিধানসমূহ কেবল শরীয়ত থেকেই গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া ইমাম নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো শরয়ি বিষয়াদি সম্পাদন করা, যেমন: দণ্ডবিধি কায়েম করা এবং পাওনা অধিকারসমূহ আদায় করা।

পক্ষান্তরে যায়দিয়া, অধিকাংশ মুতাজিলা এবং ইসনা আশারিয়্যাহ সম্প্রদায় বলেছে: বিবেকই ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ দেয়।

অতঃপর যারা মনে করেন যে বিবেক ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ দেয়, তারা এই ওয়াজিবের প্রয়োগের দিক থেকে বিভক্ত হয়েছেন: এটি কি মানুষের প্রতি নির্দেশিত নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি?

দ্বিতীয় বিষয়: জমহুর বা ফকীহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা বলেছেন: "ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি জানার একমাত্র পথ হলো শরীয়ত।" তারা এখানে ওয়াজিব বলতে 'ওয়াজিব কিফায়া' বুঝিয়েছেন, 'ওয়াজিব আইনি' নয়। এর অর্থ হলো উম্মতের ওপর আবশ্যক হলো দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দুনিয়াবী শাসনের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করা। আর এই ওয়াজিব সমস্ত আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করার ক্ষমতার অধিকারী) এবং এই পদের যোগ্য সৎ ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশিত।

সুতরাং যদি আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর কেউ এই দায়িত্ব পালন করে, তবে বাকিদের ওপর থেকে এই ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সকলেই গুনাহগার হবে। উম্মতের যারা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন নয়, তারা গুনাহগার হবে না। তাই এখানে জমহুর 'ওয়াজিব' বলতে ওয়াজিব আইনি বুঝাননি; কারণ তারা বলেননি যে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করার কাজে শরিক হতে হবে। এই কারণেই

কাজী আবু ইয়ালা বলেছেন—এবং তিনি—

আশ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

দশম পাঠ

ইমামত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে: "এটি একটি ফরযে কিফায়া (সমষ্টিগত বাধ্যবাধকতা), যা মানুষের মধ্যকার দুটি দলের প্রতি নির্দেশিত: প্রথমটি হলো—ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যাতে তারা নির্বাচন করতে পারেন। আর দ্বিতীয়টি হলো—যাদের মধ্যে ইমামতের শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে, যাতে তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমামতির জন্য মনোনীত করা যায়। উম্মাহর এই দুই শ্রেণি ব্যতীত অন্য কারো ওপর ইমামত নিয়োগে বিলম্বের কারণে কোনো দায় বা গুনাহ নেই।"

ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের (যারা হলেন জমহুর উলামা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম) সপক্ষে প্রমাণাদি বা দলিলসমূহ:

যেহেতু মুসলিম উম্মাহর জমহুর—আহলে সুন্নাত ও অন্যান্যরা—ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন (যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি), এবং যেহেতু আহলে সুন্নাত তাদের দাবির সপক্ষে এমন কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যা অন্যদের উপস্থাপিত প্রমাণাদি হতে ভিন্ন, আর যেহেতু ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের মাঝে এমন একদল রয়েছে যারা মনে করে যে, এই ওয়াজিব বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির প্রতি নয় বরং মহান আল্লাহর প্রতি নির্দেশিত—তাই আমাদের জন্য এটি আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা প্রতিটি দলের দলিলসমূহ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা; যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের বিষয়ে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয়:

প্রথম দলিল: এই মতের অনুসারীরা ইজমা (ঐকমত্য)-কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আহলে সুন্নাত এবং তাদের সাথে একমত পোষণকারীদের নিকট শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে 'ইজমা' অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ, বরং এটিই হলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলিল। আর তা হলো মুসলিম উম্মাহর এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা যে, রাষ্ট্রের একজন সর্বোচ্চ প্রধান নিয়োগ করা ওয়াজিব। এর কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উম্মাহর বিষয়াবলি দেখাশোনা এবং দ্বীন রক্ষা ও পার্থিব শৃঙ্খলা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাদের জন্য একজন প্রধান নিয়োগ করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। অতঃপর তারা সাকীফাহ বনী সায়েদাহ-তে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এক দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খলিফা হিসেবে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্বাচন করেন। আনসারগণ এই বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্ত হয় যে, সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যেই হতে হবে এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খলিফা হিসেবে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হন।

পরদিন এই পদক্ষেপটি সেই সকল সাহাবীদেরও সমর্থন লাভ করে যারা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অতঃপর সাহাবীগণ যদিও শুরুতে ইমাম বা নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছিলেন, কিন্তু এটি শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে তাদের সকলের ঐকমত্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর এবং খলিফা হিসেবে বায়আত হওয়ার পূর্বে আবু বকর (রা.) জনগণের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন: "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইবাদত করতে, তবে জেনে রেখো মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করতে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। [আল্লাহ তায়ালা বলেন:] **'মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল; তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তবে কি তিনি যদি ইন্তেকাল করেন বা নিহত হন, তোমরা তোমাদের গোড়ালি উল্টে ফিরে যাবে?'** [আলে ইমরান: ১৪৪]। এরপর তিনি বলেন: "মুহাম্মাদ তাঁর পথে চলে গেছেন, আর এই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অবশ্যই এমন কাউকে প্রয়োজন যে এর দায়িত্ব পালন করবে। অতএব তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো এবং তোমাদের মতামত পেশ করো- আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন।" তখন মানুষ চতুর্দিক থেকে তাঁকে ডেকে বলতে লাগল: "হে আবু বকর, আপনি সত্য বলেছেন। তবে আমরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তখন আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করে এমন কাউকে নির্বাচন করব যে এর দায়িত্ব পালন করবে।" সাহাবীদের মধ্যে এমন কাউকেই পাওয়া যায়নি যিনি বলেছিলেন যে, এই কাজ (নেতৃত্ব) শাসক ছাড়াই চলা সম্ভব।

দ্বিতীয় দলিল: ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করার মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত করা হয়। এই মতের প্রবক্তাগণ বলেন: শাসক নিযুক্ত করার মাধ্যমে সেই সকল ক্ষতি প্রতিহত হয় যা তাকে নিযুক্ত না করার ফলে ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আর সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত করা ইজমা বা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। সুতরাং ফলাফল এই যে, শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব।

শাসক নিযুক্ত করার মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ একা একা জীবনযাপন করতে পারে না। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব, সে তার স্বজাতীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম নয়। আর মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা ছাড়া উপায়হীন হয়, তখন তাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও চিন্তাধারার ভিন্নতা এবং তাদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে -যেমনটি উলামাগণ বলেছেন- তারা একে অপরের অনুগত হওয়া তো দূরের কথা, বরং এটি বিবাদ-বিসংবাদের পথ প্রশস্ত করে এবং সম্ভবত তাদের সকলের বিনাশের দিকে নিয়ে যায়।

শাসকদের মৃত্যুর সময় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী। যদি এই অবস্থা প্রলম্বিত হয় তবে জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জান-মাল রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। যা মূলত দ্বীন বিলুপ্ত হওয়া এবং সকল মুসলিমের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করার মাধ্যমে এমন এক ক্ষতি প্রতিহত করা হয় যার চেয়ে বড় কোনো ক্ষতির কল্পনা করা যায় না।

আর ক্ষতি প্রতিহত করা যে ওয়াজিব; এটি সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট একটি সর্বসম্মত বিষয়।

আমরা লক্ষ্য করি যে, উলামায়ে কেরাম এই দলিলটি প্রতিষ্ঠিত করার পর সম্ভাব্য আপত্তিকারীদের আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। সুতরাং যদি কোনো আপত্তিকারী বলে: আপনারা বলেন যে, ইমাম নিযুক্ত করার মাঝে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত করা নিহিত, অথচ আমরা বলি: বরং ইমাম নিযুক্ত করার মাঝেই সম্ভাব্য ক্ষতি বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী দ্বারা নিষিদ্ধ: "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।"

ইমাম নিযুক্ত করার মাঝে যে তিনটি দিক থেকে ক্ষতি হতে পারে তার বর্ণনা নিম্নরূপ:

- তারা বলেন যে, মানুষের ওপর যখন অন্য কাউকে এমন সব বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় যেগুলোতে সে নিজেই দিকনির্দেশনা লাভে সক্ষম এবং যেগুলোতে সে সক্ষম নয়, তাতে স্পষ্ট কিছু ক্ষতি রয়েছে; অর্থাৎ মানুষ স্বভাবগতভাবেই নেতৃত্ব চায় না।

- এছাড়াও কিছু মানুষ তাদের ওপর অন্য কারোর কর্তৃত্ব থাকাকে অপছন্দ বা তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে, যা মানুষের চিরাচরিত স্বভাব। আর এটি বিবাদ সৃষ্টি করে এবং উম্মাহর সদস্যদের মধ্যে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

- তাছাড়া ইমাম যেহেতু বিচ্যুতির ঝুঁকির সম্মুখীন, তাই তার থেকে ফাসেকী (অনাচার) প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, এমনকি তার থেকে কুফর প্রকাশ পাওয়াও সম্ভব। এমতাবস্থায় যদি উম্মাহ তাকে অপসারণ না করে, তবে সে তার ফাসেকী ও কুফর দ্বারা উম্মাহর ক্ষতি সাধন করবে। আর যদি তাকে অপসারণ করা হয়, তবে তা ফিতনা ও অস্থিরতাকে উসকে দেয়।

আমরা বলি: এই দলিলের বিপরীতে কোনো আপত্তিকারী এভাবেই আপত্তি করতে পারে। কিন্তু প্রথম মতের অনুসারীগণ—যারা জমহুর ফকীহ—তারা এর উত্তরে বলেন যে, ইমাম নিযুক্ত না করার ফলে যে ক্ষতি হওয়া অনিবার্য, তা ইমাম নিযুক্ত করার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি। একারণেই বলা হয়: "সুলতান বা শাসকহীন এক রাতের চেয়ে একজন যালেম ইমামের অধীনে ষাট বছর কাটানো অধিক কল্যাণকর।" আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বৃহত্তর ক্ষতি প্রতিহত করা ওয়াজিব; সুতরাং ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব।

ফখরুদ্দীন আল-রাজি এই উত্তর প্রদান করে বলেন যে, এ ধরনের এবং এই জাতীয় ক্ষতিসমূহ সংঘটিত হতে পারে: "এতে কোনো বিতর্ক নেই যে এই নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ঘটতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে যখন উদ্ভূত অপকারসমূহ মোকাবিলা করা হয়..."

অনুগত নেতার অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট অনিষ্টের চেয়ে তার উপস্থিতিতে সৃষ্ট অনিষ্ট অনেক কম। বরং নেতার অনুপস্থিতির অনিষ্ট তার উপস্থিতির অনিষ্টের চেয়ে অনেক বেশি। আর যখন দুটির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, তখন প্রাধান্য বিস্তারকারী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেননা, সামান্য মন্দের আশঙ্কায় প্রভূত কল্যাণ বর্জন করা বড় ধরনের মন্দ। এর অর্থ হলো, বৃহত্তর ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষতি সহ্য করা।

তৃতীয় দলিল: ইমাম বা নেতা নিয়োগ করা ছাড়া ওয়াজিবসমূহ (আবশ্যকীয় কাজ) সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এর ব্যাখ্যা হলো, এটি সুপরিচিত যে, শারি' (শরিয়ত প্রবর্তক) দণ্ডবিধি কার্যকর করা, জিহাদের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করা, সীমান্ত রক্ষা করা এবং ইসলামের অস্তিত্ব সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এসব কাজ কোনো ব্যক্তি বা সাধারণ একদল মানুষের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; বরং এর জন্য এমন এক উচ্চতর ক্ষমতার প্রয়োজন যার রয়েছে বিশাল সক্ষমতা, উম্মাহর ওপর আনুগত্যের অধিকার এবং এই ওয়াজিবগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদানের সামর্থ্য।

এই উচ্চতর ক্ষমতাটিই হলো 'ইমামতে উজমা' বা মহা নেতৃত্ব। এর মাধ্যমেই এই সকল ওয়াজিব পালন করা সম্ভব হয়। আর যা

ছাড়া ওয়াজিব সম্পন্ন হয় না, তাও ওয়াজিব। সুতরাং ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। এই কারণেই কেউ কেউ বলেন: "মুসলিমদের জন্য এমন একজন ইমাম থাকা অপরিহার্য যিনি তাদের বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করবেন, দণ্ডবিধি কার্যকর করবেন, সীমান্ত রক্ষা করবেন, সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবেন, তাদের সদকা বা যাকাত গ্রহণ করবেন, জবরদখলকারী, চোর ও ডাকাতদের দমন করবেন, জুমুআ ও ঈদের জামাত কায়েম করবেন, মানুষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করবেন, অধিকারের স্বপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, অভিভাবকহীন নাবালক-নাবালিকাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করবেন... এই সবকিছুর জন্য ইমামের প্রয়োজন। যদি ইমাম না থাকেন, তবে এই সব কাজই স্থবির হয়ে পড়বে।"

চতুর্থ দলিল: সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করার পূর্বেই ইমাম বা নেতা নির্বাচনে তৎপর হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য সকিফায়ে বনি সা'দায় সমবেত হয়েছিলেন এবং তাদের সেই সভা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচনের মাধ্যমে শেষ হয়। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরপরই এবং তাকে দাফন করার আগে। এটি প্রমাণ করে যে, তারা ইমাম নিয়োগ করাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব মনে করতেন। অন্যথায় তারা শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কর্মের ওপর ইমাম নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতেন না।

দশম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

এগুলো হলো প্রথম মতাবলম্বীদের দলিলসমূহ। তারা হলেন অধিকাংশ ফকিহ এবং আহলুস সুন্নাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যারা বলেন যে: ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব। তারা আমাদের উল্লিখিত চারটি দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এসব দলিল আপত্তি থেকে মুক্ত নয় এবং এগুলো নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি:

উম্মাহর জন্য একজন সর্বোচ্চ প্রধান বা নেতা নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ এবং তাদের সাথে একমত পোষণকারীদের ব্যবহৃত দলিলসমূহের মধ্যে 'ইজমা' (ঐক্যমত্য)-কে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, কেউ কেউ এই দলিলটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। তারা এই সম্ভাবনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রতিটি নেতার মৃত্যুর পর ইমাম নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে যে ত্বরিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা সম্ভবত কোনো বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ছিল, যা তাদের এই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছিল।

কতিপয় আপত্তিদানকারী বলেন: "এটি কেবল ইমাম নিযুক্ত করার উত্তম হওয়া এবং তা নিয়োগ দেওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে—যদি আদৌ কিছু প্রমাণ করে থাকে। এটি সব যুগ ও সময়ের জন্য এর আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে না। কারণ এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইআত গ্রহণকারীগণ এবং শুরার জন্য সমবেত ব্যক্তিগণ যে বিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং যে বিষয়ে তারা আগ্রহী ছিলেন, তা কেবল ওই সময়ের পরিস্থিতির দাবির কারণেই ছিল। অর্থাৎ তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা দাবি করেছিল। সম্ভবত সেই পরিস্থিতি বিদ্যমান না থাকলে তারা এমনটি করতেন না। আর তাদের মনে এই ধারণা প্রবল ছিল যে, ইমাম নিযুক্ত করার বিষয়টি উপেক্ষা করলে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।"

যারা সর্বাবস্থায় ইমামত বা নেতৃত্বের আবশ্যকতা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, তারা এর কল্যাণকর হওয়াকে অস্বীকার করেন না। তবে তারা মনে করেন যে, কতিপয় বিশেষ সংকটময় পরিস্থিতিই এর দিকে ধাবিত হতে বাধ্য করে। তাই এই আপত্তিদানকারী বলেন: "ইমামের বিষয়টি এমন কিছু অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় হতে পারে, যেখানে মানুষের সংশোধন ও সঠিক পথে থাকার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা করা হয়।"

কিন্তু ফকিহগণ এর জবাবে বলেছেন: সাহাবায়ে কেরামের প্রতিটি ইমামের মৃত্যুর পর নতুন একজন ইমাম নিযুক্ত করার কর্মপন্থা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই কাজের পুনরাবৃত্তি হওয়া থেকে বাহ্যত একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম নিযুক্ত করার মূল কারণটি

সব অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। তাই আমরা এর জবাবে বলব...

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
দশম পাঠ

ইজমার (ঐক্যমত) ওপর এই আপত্তিকারীর উত্তরে বলা যায়: এই কারণটি প্রতিটি সময়েই বিদ্যমান; আর তাই ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় অভিমত: সাধারণভাবে ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব না হওয়া:

তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

প্রথমত: ইমাম নিযুক্ত করা ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, অর্থাৎ এর ফলে ফিতনা সৃষ্টি হয়; আর যা-ই এমন হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। সুতরাং ইমাম নিযুক্ত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। ইমাম নিযুক্ত করা কেন ফিতনা সৃষ্টিকারী—তার ব্যাখ্যা হলো মানুষের খেয়াল-খুশি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একদল লোক হয়তো ইমামতের পদের জন্য একজনকে নির্বাচন করতে চাইবে; কারণ তাদের দৃষ্টিতে সে-ই এ কাজের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আবার অন্য দল চাইবে অন্য কাউকে নিযুক্ত করতে। ফলে এ কারণে উম্মতের সাধারণ জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘাত সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। আর যা-ই ফিতনা সৃষ্টিকারী তা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব না হওয়া একটি সুস্পষ্ট বিষয় এবং তা কোনো দলিলের মুখাপেক্ষী নয়।

দ্বিতীয়ত: মানুষের ধর্ম এবং তাদের স্বভাবজাত প্রকৃতিই তাদেরকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থসমূহ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তাদের এমন কাউকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন নেই, যে তাদের সেই সকল বিষয়ে শাসন করবে যেগুলোতে তারা নিজেরাই সক্ষম। আপনি কি বেদুইন এবং মরুচারীদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন না যে, তাদের পার্থিব জীবনযাপন ও ধর্মীয় বিষয়াদি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, অথচ তারা সুলতানের শাসনের বাইরে এবং কোনো ইমাম তাদের ওপর কর্তৃত্ব করেন না।

এই দলিলের সারমর্ম হলো, মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থসমূহ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। এর অর্থ হলো, যেসব বিষয়ে তারা নিজেরাই সক্ষম, সেসব বিষয়ে তাদের ওপর শাসন করার জন্য কোনো ইমাম নিযুক্ত করার প্রয়োজন তাদের নেই। তারা একে বেদুইন ও মরুচারীদের অবস্থার সাথে তুলনা করে থাকে; আর তারা হলো সেই যাযাবর গোত্রসমূহ যাদের কোনো সরকার ছিল না যাদের শাসনের অধীনে তারা অনুগত থাকত।

দশম পাঠ

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি

কিন্তু দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা—যারা মনে করেন যে ইমাম নিয়োগ করা মোটেও ওয়াজিব নয়—যেই দলীলগুলো পেশ করেছেন, তার উত্তর হলো:

ইমাম নিয়োগের ইচ্ছার সময় মানুষের অবস্থা দুটির একটি থেকে খালি থাকে না: হয় তারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হয় যাকে তারা অন্য সবার চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করে; এমন কিছু গুণাবলীর কারণে যা এই পদের জন্য তার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে তাকে অনন্য করে তুলেছে। অথবা তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়।

প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে—যা হলো ইমামের ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের ঐকমত্যের অবস্থা—তবে সেখানে এটি মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টিকারী বলে দাবি করার কোনো অবকাশ নেই, বরং এটি তো ফিতনা দমনের অন্যতম মাধ্যম। আর দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে—যা হলো ইমাম নির্বাচনের বিষয়ে তাদের মতভেদের অবস্থা—তবে প্রজ্ঞাবান শরীয়ত প্রণেতা এই বিষয়টিকে এমন কিছু নীতিমালা ছাড়া ছেড়ে দেননি যা এই মতভেদ নিরসনের মানদণ্ড হবে। বরং আমরা বলি: এই অবস্থায় উম্মতের আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর ওপর ওয়াজিব হলো তারা ইমামতের জন্য প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেবেন। যদি তারা ইলমের ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে সবচেয়ে বেশি পরহেযগার ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যদি তারা তাতেও সমান হয়, তবে বয়সে বড় ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে—অর্থাৎ যিনি বয়সে বড়—আর এ সবই ফিতনা ও বিরোধ দূর করার মাধ্যম।

এই উত্তরের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা যারা ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন, এই দলীলের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সুযোগ নেই এবং তাদের দলীলটি অসার; তাই এটি ধর্তব্য নয়।

আর তাদের এই কথা যে: মানুষের দ্বীন ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তিই তাদেরকে তাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে।

এর উত্তরে আমরা বলি: এটি যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও অভ্যাসগতভাবে অসম্ভব। সুলতান ও শাসকদের মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে ফিতনা ও বিভেদ ছড়িয়ে পড়া অপেক্ষা এর বড় কোনো প্রমাণ নেই। আর পল্লী অঞ্চল ও বেদুঈনদের অবস্থা সুশৃঙ্খল থাকার দাবিটি অগ্রহণযোগ্য; কারণ আমরা তাদেরকে পলাতক নেকড়ে এবং হিংস্র সিংহের মতো দেখি, যেখানে তারা একে অপরের ওপর দয়া করে না।

অতএব এটিও একটি অসার দলীল।

আমরা বলি: এটি একটি অগ্রহণযোগ্য কথা; কারণ বাস্তবতা এর পরিপন্থী। আর এটি তখনই প্রকাশ পায় যখন কোনো শাসনব্যবস্থা বা কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের পতন ঘটে; তখন মানুষের মাঝে বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি হয়। আর মরুচারীদের অবস্থার সাথে একে তুলনা করা সম্ভব নয়; কারণ তাদের অবস্থা এর থেকে ভিন্ন।

তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ: বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইমাম নিয়োগের আবশ্যকতা:

সেখানে একটি অভিমত রয়েছে যে, ন্যায়বিচার প্রকাশিত হওয়ার সময় ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব, কিন্তু ফিতনা বা অরাজকতার সময় তা নিয়োগ করা ওয়াজিব নয়। আবার আমরা দেখি কিছু অভিমত এই মতের ঠিক বিপরীত পোষণ করে—অর্থাৎ জুলুম বা অত্যাচার দেখা দিলে ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ইনসাফ বিদ্যমান থাকাকালে তা ওয়াজিব নয়। সুতরাং তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ দুটির প্রতিটি একে অপরের পরিপন্থী।

যারা এ মত পোষণ করেন যে, ফিতনা বা গোলযোগের সময় ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব এবং ন্যায়বিচার ও মানুষের একে অপরের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণের সময় তা ওয়াজিব নয়, তারা এই মর্মে যুক্তি প্রদান করেছেন যে: মানুষের মধ্যে ফিতনা ও জুলুমের উপস্থিতিতে ক্ষতি রয়েছে, আর প্রতিটি ক্ষতি দূর করা আবশ্যক। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো, মানুষের মাঝে ফিতনা ও জুলুমের প্রাদুর্ভাব দূর করা ওয়াজিব। আর এটি এমন এক সক্ষম ও সর্বজনীন কর্তৃত্ব ব্যতীত দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়, যার মানুষের প্রতি আদেশ ও নিষেধ করার অধিকার রয়েছে; আর সেটি হলো ইমামতের কর্তৃত্ব। অতএব জুলুম ও ফিতনা প্রকাশকালে ইমামত কায়েম করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে, যখন মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন মানুষের মাঝে এমন কোনো ক্ষতি বিদ্যমান থাকে না যা দূর করার আবশ্যকতা নিয়ে আমরা কথা বলব।

আর যারা ন্যায়বিচারের সময় ইমাম নিয়োগ ওয়াজিব বলেন এবং ফিতনার সময় ওয়াজিব বলেন না, তাদের দলিলের জবাবে আমরা বলতে পারি যে: বিষয়টি আপনারা যা বলছেন তার ঠিক বিপরীত। কেননা মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি হওয়া হলো এমন এক পরাক্রমশালী কর্তৃত্বের আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান কারণ, যা অধিকারকে তার সঠিক স্থানে ফিরিয়ে দিতে এবং ফিতনা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে; যাতে ন্যায়বিচার সর্বব্যাপী হয় এবং নিরাপত্তা বিস্তৃত হয়। কারণ এই পরিস্থিতিতে ইমামের অনুপস্থিতি ফিতনাকারীদের তাদের পথভ্রষ্টতা ও জুলুমে অবিচল থাকতে প্রলুব্ধ করে, যেহেতু কোনো শক্তি তাদের ভীত করে না এবং কোনো শাসক তাদের মনে ত্রাস সঞ্চার করে না। বরং এই অবস্থায় যা ওয়াজিব তা হলো... কায়েম করা।

দশম পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

...নেতা, এবং তাঁর চারপাশে উম্মাহর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া; যাতে তিনি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সহায়তায় আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে এবং ফিতনা ও বিভেদের কারণসমূহ নির্মূল করতে সক্ষম হন।

আমরা এই মত পোষণকারীদের উত্তরে আরও বলতে পারি যে, সহীহ দলীলসমূহ নিঃশর্তভাবে ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে শান্তিকালীন অবস্থা ও ফিতনার অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং শান্তিকালীন ও ফিতনার সময়ের মধ্যে পার্থক্য করা দলীলবিহীন একটি দাবি; কেননা ফিতনার সময় যেমন ক্ষতি সাধিত হয়, শান্তির সময়ও তেমনিভাবে হয়ে থাকে। মানুষের একে অপরের প্রতি জুলুম কেবল ফিতনা চলাকালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—এমন দাবি কেউ করতে পারে না। কারণ একে অপরের প্রতি মানুষের অবিচার সব সময়ই ঘটে থাকে, এতে শান্তিকালীন অবস্থা বা তার অভাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সুতরাং মানুষের একে অপরের প্রতি অবিচার সব অবস্থাতেই বিদ্যমান এবং চলমান একটি বিষয়, যা যুগে যুগে তাদের সাধারণ আচরণের মাধ্যমেই প্রমাণিত। আর যখন মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজমান থাকা অবস্থায়ও একে অপরের প্রতি জুলুম সংঘটিত হয়, তখন তা দূর করার জন্য একজন ইমামের প্রয়োজন পড়ে; কারণ এটি এমন এক ক্ষতি যা দূর করা আবশ্যক। এছাড়া ইমামের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রগুলো কেবল ফিতনা চলাকালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; কেননা মানুষের জনস্বার্থ দেখাশোনা করা এবং তাদের মধ্যে হকের সাথে ফয়সালা করার জন্য ইমামের প্রয়োজন। তদুপরি, দণ্ডবিধি কার্যকর করা এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার জন্যও তাঁর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর এই বিষয়গুলো কোনো বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

অতঃপর কোনো ব্যক্তি কি এই দাবি করতে পারে যে, সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যে পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খলীফা হিসেবে আবু বকর (রা.)-কে নির্বাচনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন, তা মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ চলাকালীন কোনো অবস্থা ছিল?! উত্তরটি অবশ্যই নেতিবাচক; কারণ তখন তাদের মধ্যে কোনো গৃহযুদ্ধ বা ফিতনার বিস্তার ছিল না যে এর বিপরীত কিছু বলা যেতে পারে। আর যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তখন সাহাবীগণের অবস্থা ফিতনাগ্রস্ত ছিল না এবং তা সত্ত্বেও তারা ইমাম নিযুক্ত করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন; তখন এটি একথাই প্রমাণ করে যে, ইমাম নিযুক্ত করা কেবল ফিতনার সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং এটি সব অবস্থাতেই ওয়াজিব। এক্ষেত্রে ফিতনার সময় এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার সময়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
দশম পাঠ

প্রধান অভিমত:

অতঃপর, গ্রহণ ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য মতটি হলো আহলুস সুন্নাহর মত; যারা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান নিযুক্ত করা আবশ্যক বলে মনে করেন। আর এই আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার উৎস হলো শরীয়ত, বিবেক নয়—যেমনটি কেউ কেউ দাবি করেন। কারণ এখানে আলোচনা হচ্ছে 'ওয়াজিব' বা আবশ্যকতা নিয়ে—যেমনটি আহলুস সুন্নাহ বলেছেন। যার অর্থ হলো যা পালনে সওয়াব এবং বর্জনে শাস্তির অধিকার সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানকে মূলত শরীয়ত-নির্ভর (সংবাদ ভিত্তিক) বিষয়াবলির জন্যই প্রয়োজন হয়, যেমন হদ বা দণ্ডবিধি কায়েম করা—অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহ, যেমন চোরের হাত কাটা... ইত্যাদি এবং বিধানসমূহ কার্যকর করা ও এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। আর ইমামকে যে সকল কাজের জন্য প্রয়োজন হয় তাতে যখন বিবেকের কোনো ভূমিকা নেই, তখন ইমাম নিযুক্ত করার আবশ্যকতা প্রমাণের ক্ষেত্রে বিবেকের কোনো ভূমিকা না থাকাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং যখন আমরা সর্বাবস্থায় ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব গ্রহণ করি, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় আমরা এই আবশ্যকতাকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করছি। অর্থাৎ, এই ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার বিধানটি মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায় বলবৎ ও বাধ্যতামূলক; চাই তা শান্তিকালীন অবস্থা হোক কিংবা মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রকাশ পাওয়ার সময় হোক।

পৃষ্ঠা 32

""

পৃষ্ঠা 33

আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ
একাদশ পাঠ

ইমামতে উজমা (মহান নেতৃত্ব)-এর শর্তাবলি

পাঠের বিষয়বস্তুসমূহ:

প্রথম উপাদান: ইসলাম, সাবালকত্ব, সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাধীনতা, পুরুষত্ব, ইজতিহাদ করার যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সঠিক বিচারবোধ। (৪৮৫)

দ্বিতীয় উপাদান: শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক সক্ষমতা, কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়া এবং শ্রেষ্ঠত্ব। (৫০৯)

৪৮৩

পৃষ্ঠা 34

""

পৃষ্ঠা 35

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
একাদশ পাঠ
ইসলাম, সাবালকত্ব, আকল (বিবেক-বুদ্ধি), স্বাধীনতা, পুরুষত্ব, ইজতিহাদ, ন্যায়পরায়ণতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

ইসলামী উম্মাহর আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধানের পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না। এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য মনোনীত ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী থাকা অপরিহার্য। কেবল ইমামিয়া সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম; কেননা তারা উম্মাহর ঐকমত্যের (ইজমা) বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং উত্তরাধিকার প্রথার পক্ষাবলম্বন করেছে। এটি এমন একটি অভিমত যা আমরা নেতৃত্বের পদ্ধতি আলোচনার সময় বিস্তারিত উল্লেখ করব। তবে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উত্তরাধিকারকে এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার বৈধ পথ হিসেবে স্বীকার করেন না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের জন্য আলেমগণ যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন, সেগুলো মূলত স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য, যখন নির্বাচনের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় কেবল সেই ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ওয়াজিব যার মধ্যে এই শর্তগুলো বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু যখন নির্বাচনের পরিবেশ থাকে না এবং উম্মাহ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যেখানে তাদের কোনো ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ থাকে না—যেমন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষমতা দখল—তখন আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেই মুহূর্তেও সকল ওয়াজিব শর্তের ওপর অনড় থাকা উম্মাহকে ফিতনা ও অনিষ্টের মুখে ঠেলে দিতে পারে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে সাময়িকভাবে বর্তমান অবস্থাকে মেনে নেওয়া বৈধ, যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণকারী কোনো যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে পরিবর্তনের সুযোগ আসে। আমরা নিচে এই শর্তসমূহ এবং এগুলো কেন শর্ত করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা বর্ণনা করব:

প্রথম শর্ত: ইসলাম

কেউ কেউ বলেন: "আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফেরের জন্য ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না। একইভাবে যদি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কারো মাঝে কুফরি প্রকাশ পায়, তবে তাকে অপসারণ করতে হবে। তেমনি সালাত কায়েম ও দুআ (আযান) প্রদান বর্জন করলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।"

৪৮৫

পৃষ্ঠা 36

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

একাদশ পাঠ

তার দিকে; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ কখনও মুমিনদের ওপর কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।" [নিসা: ১৪১]। আর মহান ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) নেতৃত্বের চেয়ে বড় কি আর কোনো পথ হতে পারে?! তদুপরি আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে অথবা জিযিয়া প্রদান করে। সুতরাং কীভাবে একজন অমুসলিমের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া এবং মুসলমানদের পরিচালিত যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হতে পারে?! এ কারণে কোনো কাফির বা মুরতাদকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া জায়েজ নয়; কারণ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো এটি ইসলামি আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে, তা বাস্তবায়ন করবে এবং এর বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করবে। আর এই ইসলামি আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি এমন ব্যক্তিদের ছাড়া কল্পনা করা যায় না যারা এর প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং এই আইনের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

যেকোনো ব্যবস্থা—তা যে প্রকারেরই হোক না কেন—এটি মেনে নেওয়া যায় না যে, তার প্রথম স্তর বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন কাউকে আসীন করা হবে, যে এই ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ ঈমান রাখে না এবং একে বিজয়ী করার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে না।

দ্বিতীয় শর্ত: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া:

এটি এমন একটি শর্ত যার ওপর উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেছে। তবে ইমামিয়্যাহগণ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা শিশুর ইমামত বা নেতৃত্বকে জায়েজ মনে করেছেন। কিন্তু ইমামিয়্যাহদের এই মতটি বিচ্ছিন্ন এবং এর কোনো গুরুত্ব নেই। বরং এই ইজমা বা ঐকমত্যটি বহাল রয়েছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা জায়েজ নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে: যদি বাস্তবে কোনো শিশুকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তার বিধান কী হবে? অর্থাৎ জনগণের কোনো সন্তুষ্টি নেই, কিন্তু তাকে বলপ্রয়োগ ও দমনমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; যেমন—তার পিতার পারিষদবর্গ যাদের হাতে ক্ষমতা ও উম্মাহকে দমন করার শক্তি রয়েছে, তারা তাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিল?

উত্তর: এটি মূলত একটি জরুরি পরিস্থিতি। এমতাবস্থায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর ওপর ওয়াজিব হলো এটি যে একটি শরয়ি পরিপন্থী বিষয়, তা উম্মাহর নিকট ঘোষণা করা। আর উম্মাহর ওপর ওয়াজিব হলো এই ঘোষণায় তাদের সমর্থন জানানো এবং শর্তাবলী পূর্ণ করে এমন ব্যক্তির নেতৃত্বের দাবি করা। অতঃপর যদি এই অপ্রাপ্তবয়স্কের শাসন অব্যাহত থাকে...

আঠারোতম পাঠ

এমতাবস্থায় উম্মাহর স্বার্থ ও কল্যাণসমূহ ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এই অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্য একজন প্রতিনিধি (ওয়ালী) নিযুক্ত করা ওয়াজিব—যেমনটি হানাফীগণ বলেন। তবে তাকে ইমামতের শর্তাবলী পূরণকারী হতে হবে। যদি এই অপ্রাপ্তবয়স্ককে ক্ষমতায় বসানোর সামর্থ্য যাদের আছে তারা সীমালঙ্ঘন করে এবং এমন কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যে শর্তাবলী পূরণ করে না, তবে এটিও একটি আপদকালীন অবস্থা (জরুরত) হিসেবে গণ্য হবে যার প্রতি উম্মাহ সাময়িকভাবে অনুগত থাকবে; যাতে জনগণের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থসমূহ বিঘ্নিত না হয়।

কিন্তু উম্মাহর জন্য এই পরিস্থিতিকে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়া সংগত নয়। বরং উম্মাহর ওপর—বিশেষ করে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর ওপর—অপরিহার্য হলো এমন প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যা এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে এবং শর্তাবলী পূরণকারী কাউকে নিযুক্ত করতে সহায়ক হতে পারে; যদি এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় কোনো ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। পক্ষান্তরে, যদি প্রজাসাধারণ সন্তুষ্ট থাকে এবং রাষ্ট্রীয় কোনো জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই পিতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইমামের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে নিযুক্ত করার ব্যাপারে একমত হয়, তবে তা কোনো 'জরুরত' বা

আপদকালীন অবস্থা নয়। আর এটিই হলো সেই ভুল যার কোনো যৌক্তিক অজুহাত নেই।

তৃতীয় শর্ত: আকল (বিবেক-বুদ্ধি):

এটি একটি স্বত:সিদ্ধ শর্ত। সুতরাং পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার কারণে হিতাহিত জ্ঞান হারানো ব্যক্তির নেতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, নিজের বিষয়াদি পরিচালনার জন্যই তার একজন অভিভাবকের প্রয়োজন; এমতাবস্থায় অন্যের বিষয়াদি কীভাবে তার ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে?! যদি এই কারণেই শিশুর জন্য এই পদ লাভ করা নিষিদ্ধ হয়, তবে বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা তো আরও জোরালোভাবে প্রযোজ্য।

ইমাম আল-মাওয়ারদী তাঁর 'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থে একে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন:
প্রথমত: যা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায়, যেমন—মূর্ছা যাওয়া।
দ্বিতীয়ত: যা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায় না, যেমন—উন্মাদনা।

প্রথম প্রকার—অর্থাৎ যা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায়, যেমন মূর্ছা যাওয়া—ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয় এবং এটি ইমামত অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক নয়। কেননা এটি স্বল্পস্থায়ী ব্যাধি যা দ্রুত সেরে যায়।

দ্বাদশ পাঠ

আর দ্বিতীয় প্রকার যা অবিচ্ছেদ্য, তা দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: যা স্থায়ী হয় এবং সুস্থতার কোনো বিরতি থাকে না; এটি ইমামাতের পদ গ্রহণ বা ইমাম হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। আর যদি ইমাম দায়িত্ব গ্রহণের পর এই উন্মাদনায় আক্রান্ত হন, তবে যখন এই রোগের বিষয়টি নিশ্চিত ও স্থায়ী হওয়া প্রমাণিত হবে, তখন তিনি পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য হবেন।

দ্বিতীয় ভাগ: যে রোগের অবসানের আশা করা যায়, অর্থাৎ সেই রোগটি সর্বদা লেগে থাকে না, বরং মাঝে মাঝে এমন সুস্থতার সময় আসে যখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যান। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় হলো; যদি অসুস্থতার সময়কাল সুস্থতার সময়কালের চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে এটি স্থায়ী রোগের মতোই ইমামাতের পদে নিয়োগ প্রাপ্তিতে বাধা দেয়। আর যদি ইমাম সুস্থ অবস্থায় নিযুক্ত হওয়ার পর এই রোগে আক্রান্ত হন, তবে তিনি পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য হবেন। আর যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয়—অর্থাৎ সুস্থ থাকার সময়কাল অসুস্থ থাকার সময়ের চেয়ে বেশি হয়—তবে আলেমগণ এমতাবস্থায় ইমাম নিয়োগ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কিন্তু ইমামের দায়িত্ব গ্রহণের পর যদি এমন রোগের উদ্ভব হয়, তবে তা ইমামাত অব্যাহত রাখার পথে বাধা হবে কি না, সে বিষয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: এটি ইমামাত অব্যাহত রাখার পথে বাধা দেয়—অর্থাৎ ইমামাত স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক—যেমন এটি শুরুতে ইমাম নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। কারণ ইমামের অন্যতম দায়িত্ব হলো উম্মাহর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা, আর এই রোগের পুনরাবৃত্তি এই মহান দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায়।

দ্বিতীয় অভিমত: এটি ইমামাত অব্যাহত রাখার পথে বাধা সৃষ্টি করে না, যদিও এটি শুরুতে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কেননা ইমামাতের চুক্তির সময় পূর্ণ সুস্থতা থাকা আবশ্যক, আর ইমামাত থেকে বিচ্যুতি হলো এক ধরণের পূর্ণাঙ্গ ঘাটতি।

আমরা মনে করি প্রথম অভিমতটিই বিবেচনার দিক থেকে অধিকতর উত্তম; কারণ এমনও হতে পারে যে রোগের প্রকোপ এমন সময়ে দেখা দিল যখন উম্মাহর জন্য ইমামের মতামত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের একান্ত প্রয়োজন, যেমন যুদ্ধের বিষয়াবলি। আর ইমাম সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় বিষয়গুলো স্থগিত রাখা কল্পনা করা যায় না।

পৃষ্ঠা 39

একাদশ পাঠ

ইমাম আল-মাওয়ার্দী তাঁর ‘আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ’ গ্রন্থে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীর জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি—যার মধ্যে অন্যতম হলো বুদ্ধি—প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে: বিচারকের মাঝে অবশ্যই বিচক্ষণতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল সেই বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট নয় যার দ্বারা একজন ব্যক্তি শরয়ি বিধানের দায়িত্বশীল (তাকলিফ) হওয়ার যোগ্য হয় এবং যা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা যায়; বরং তাকে প্রখর বিচারবুদ্ধি ও উন্নত ধীশক্তির অধিকারী হতে হবে এবং ভুলভ্রান্তি ও অসতর্কতা থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি তাঁর মেধা দিয়ে অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করবেন এবং জটিল সমস্যার সমাধান করবেন। বিচারকের বুদ্ধিবৃত্তিক গুণের ক্ষেত্রে যদি এই শর্ত হয়, তবে ইমামে আজম বা রাষ্ট্রের প্রধান নেতার ক্ষেত্রে তা আরও বেশি অগ্রগণ্য।

ইমাম আল-মাওয়ার্দী আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, কেবল সেই সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট নয় যার মাধ্যমে মানুষ কেবল বস্তুসমূহ এবং উপকারী ও ক্ষতিকারক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে; বরং তাকে অবশ্যই প্রখর ধীশক্তির অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ এটি একটি বিশেষ স্তরের বুদ্ধি, যাতে রয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মেধা। আর ইমাম আল-মাওয়ার্দী যেহেতু বিচারকের জন্য এটি শর্ত করেছেন, তাই ইমামে আজমের ক্ষেত্রে এটি শর্ত করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

চতুর্থ শর্ত: স্বাধীনতা

দাসের ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না; সে পূর্ণ দাস হোক—অর্থাৎ যার মধ্যে স্বাধীনতার কোনো লেশমাত্র নেই—অথবা আংশিক দাস হোক—অর্থাৎ যার কিছু অংশ স্বাধীন এবং কিছু অংশ দাস—অথবা এমন দাস হোক যার মুক্তি কোনো শর্তের ওপর নির্ভরশীল। কারণ শরয়ি বিধান অনুযায়ী দাসের সমস্ত সময় ও শ্রম তার মুনিবের সেবায় ব্যয় হওয়া অবধারিত। যতক্ষণ তার সামর্থ্যে থাকে, সে তার মুনিবের পক্ষ থেকে আসা নির্দেশাবলি পালনে বাধ্য। আর যার নিজের বিষয়াদিই অন্যের আদেশে পরিচালিত হয়, তার নিকট উম্মাহর বিষয়াবলি কীভাবে ন্যস্ত করা যেতে পারে?

কেউ কেউ বলেন: “যাতে মুনিবের সেবা তাকে ইমামতের দায়িত্ব থেকে বিমুখ না রাখে, এবং তাকে যেন তুচ্ছজ্ঞান করে তার অবাধ্যতা করা না হয়; কেননা স্বাধীন ব্যক্তিরা দাসদের তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তাদের আনুগত্য করতে সংকুচিত বোধ করে।” আবার কেউ কেউ ইমামতে আজমার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার শর্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: “নিশ্চয়ই দাসের নিজের ওপরই কোনো কর্তৃত্ব নেই, তবে অন্যের ওপর তার কর্তৃত্ব কীভাবে থাকতে পারে? অথচ অন্যের ওপর অর্পিত কর্তৃত্ব তো নিজের ওপর থাকা কর্তৃত্বের একটি শাখা মাত্র।”

আশ-শিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ
দ্বাদশ পাঠ

পঞ্চম শর্ত: পুরুষ হওয়া:

আলেমগণ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে (ইজমা) রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণের জন্য প্রার্থীর পুরুষ হওয়াকে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন: "নারীর জন্য ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হবে না, যদিও তিনি পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতার সকল গুণে গুণান্বিত হন। একজন নারী কীভাবে ইমামত পদের জন্য মনোনীত হতে পারেন যেখানে অধিকাংশ শাসন ব্যবস্থায় তার জন্য বিচারিক পদ নেই এবং সাক্ষ্য প্রদানের অধিকারও নেই।"

আলেমগণ এর স্বপক্ষে ইমাম বুখারী বর্ণিত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "জামালে যুদ্ধের দিনগুলোতে একটি কথা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন, যখন আমি জামালের যুদ্ধকারীদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের পক্ষে লড়াই করার উপক্রম হয়েছিলাম।" তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছালো যে পারস্যের অধিবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করেছে—অর্থাৎ তাকে রানী বানিয়েছে—তখন তিনি ﷺ বললেন: ((সেই জাতি কখনো সফল হবে না যারা তাদের বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব একজন নারীর ওপর অর্পণ করে))।"

এটি একটি সহীহ হাদিস। একজন নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য পুরুষদের সাথে মেলামেশা এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা অপরিহার্য, অথচ নারীর জন্য তা নিষিদ্ধ। এছাড়া নারী নিজ বিষয়ের ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ, এমনকি সে নিজের বিবাহের অধিকারও রাখে না, সুতরাং অন্যের ওপর তার অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব অর্পণ করা যাবে না।

কেউ কেউ নারী কেন মহান ইমামত বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য নয় তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন: "নারীদেরকে ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের অবস্থার মূল ভিত্তি হলো পর্দা। নবী ﷺ সেদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন: ((সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যাদের শাসনভার একজন নারীর হাতে))। পুরুষ হওয়ার শর্তারোপের মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট করা হয়েছে যে নারীর ইমামত বৈধ নয়; কারণ নারীরা বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ, যেমনটি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তারা শাসনের কর্মক্ষেত্র এবং যুদ্ধের ময়দানে বের হওয়া থেকে নিষিদ্ধ।"

যদিও আলেমগণ নারীর বিচারক (কাযী) হওয়ার বৈধতার বিষয়ে মতভেদ করেছেন; তাঁদের কেউ কেউ একে নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, কেউ কেউ সেসব বিষয়ে তাকে বিচারিক অনুমতি দিয়েছেন যেগুলোতে সে সাক্ষ্য দিতে পারে, আর কেউ কেউ তার জন্য বিচারিক দায়িত্ব পালনকে বৈধ বলেছেন।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে, যদিও উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে—অর্থাৎ বিচারক পদে নারীর নিয়োগের বিষয়ে—মতভেদ করেছেন, তবে তারা রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নারীর আসীন হওয়ার অবৈধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এটি ইসলামী ফিকহের ইমামগণের কোনো গোঁড়ামি নয়; বরং নারীর প্রকৃতি এবং তার শারীরিক গঠন এই মহান পদের দায়িত্ব পালনের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট থেকে দাবি করা হতে পারে যে তিনি নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং এর ভয়াবহতা মোকাবিলা করবেন... এ জাতীয় আরও অনেক কাজ রয়েছে যা বিশেষ সক্ষমতা এবং নির্দিষ্ট শারীরিক যোগ্যতা দাবি করে, যা নারীর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

লক্ষ্যণীয় যে, এই মতটি—যা বলে যে নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া বৈধ নয়—তা নারীর শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাচীন ও আধুনিক সকল যুগে মানুষের অবস্থা পর্যালোচনার চেয়ে বড় কোনো প্রমাণ আর নেই। আর এটিও লক্ষ্যণীয় যে, সকল জাতির মধ্যে সাধারণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যারা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন পুরুষ। বিরল পরিস্থিতি এবং সচরাচর ঘটে না এমন কিছু কারণ ব্যতীত জাতি পরিচালনায় নারীদের পারদর্শিতা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

আর এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা সঠিক নয় যে, পুরুষ তার শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে; যা তাকে এমন সুযোগ করে দিয়েছে যা থেকে নারী বঞ্চিত ছিল। অথবা তাকে দীর্ঘ বছর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার কারণে সে পুরুষের অনুগামী হওয়ার চরিত্রে তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে—একথা বলাও সংগত নয়। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার ক্ষেত্রে পুরুষের শক্তি ব্যবহারের বিষয়টি যদি বিগত যুগে একটি স্বাভাবিক ও প্রচলিত পদ্ধতি হয়েও থাকে, তবে বর্তমান যুগে সেই পদ্ধতিটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা বিলুপ্তপ্রায়। তা সত্ত্বেও নেতৃত্ব এখনও বিরল ক্ষেত্র ছাড়া পুরুষের হাতেই রয়েছে, অথচ বর্তমানে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে, পুরুষের অধিক নেতৃত্বের কারণ হিসেবে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যাধিক্যকে দায়ী করাও সঠিক নয়; কারণ কিছু দেশে পরিসংখ্যান যেখানে সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ দেয় সেখানেও...

নারীদের প্রেক্ষিত; যেমনটি বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে ঘটেছিল, সেখানে নারীদের সংখ্যার তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কারণ যুদ্ধে পুরুষেরাই অধিক হারে প্রাণ হারিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও এবং নারীদের সামনে পুরুষদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক মেধার স্ফুরণ নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যেই অধিকতর বাস্তবায়িত হয়েছিল। যদিও যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিগন্ত উন্মোচনের পথে নারীদের জন্য কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট ছিল না। নেতৃত্ব, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীদের ওপর পুরুষদের এই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ হলো পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রাকৃতিক গঠন। মানুষের জন্য তার প্রকৃতি ও যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের দাবি করা কোনো ত্রুটি নয়; বরং ত্রুটি হলো এমন বিষয়ের দাবি করা যা তার স্বভাবজাত প্রকৃতির পরিপন্থী।

ষষ্ঠ শর্ত: ইজতিহাদ:

আমরা বলি: অধিকাংশ আলিম এই মত পোষণ করেন যে, যিনি ‘ইমামাতে উজমা’ বা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্য মনোনীত হবেন, তার মধ্যে এই শর্তটি থাকা অপরিহার্য। ইমাম পদের প্রার্থীকে দ্বীনের মূলনীতি (উসুল) ও শাখা-প্রশাখা (ফুরু) উভয় বিষয়েই ‘মুজতাহিদ’ হতে হবে; যাতে তিনি দ্বীনী বিষয়াদি আঞ্জাম দিতে পারেন, প্রমাণাদি উপস্থাপনে সক্ষম হন এবং ধর্মীয় আকিদাহর ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংশয়সমূহ নিরসন করতে পারেন। এছাড়া সমসাময়িক সমস্যাবলির ক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদান এবং নস ও ইস্তিনবাতের মাধ্যমে ঘটনার বিধান নির্ণয়ে তিনি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেন। কারণ ইমামতের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আকিদাহর হেফাজত করা, শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিবাদ মীমাংসা করা। আর ‘ইজতিহাদ’ নামক এই শর্তটি ব্যতীত তা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে হানাফিগণ ইমামের জন্য ইজতিহাদের শর্তারোপ না করার দিকে গিয়েছেন। আমরা দেখি যে, যখন তারা ইমামাতে উজমার শর্তাবলি বর্ণনা করেন, তখন তারা ইজতিহাদের শর্তটিকে গণ্য করেন না। আর এটিই হানাফি মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী অভিমত। যদিও হানাফি মাযহাবের কোনো কোনো আলিম—যেমন কামাল ইবনুল হুমাম, যিনি হানাফি ইমামদের অন্যতম—ইলম বা জ্ঞানকে ইমামের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকে ইমামের জন্য একটি ওয়াজিব শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
একাদশ পাঠ

ইমামতে উযমা বা মহান নেতৃত্ব; তবে তিনি এর দ্বারা মুজতাহিদের জ্ঞান বুঝাননি, যা অধিকাংশ আলেমের নিকট উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যখন তারা ইজতিহাদের শর্তকে 'ইলম' বা জ্ঞান শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেন।

কেননা জমহুর ওলামায়ে কেরাম যখন ইমামতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর মধ্যে ইলম-এর কথা উল্লেখ করেন, তখন তারা স্পষ্ট করে দেন যে এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো মুজতাহিদের ইলম। সুতরাং তারা মুজতাহিদ শব্দ ব্যবহার করুন কিংবা ইলম শব্দ ব্যবহার করুন, উভয়টিই তাদের নিকট সমান। তাদের পরিভাষায় ইলম শব্দটি মুজতাহিদের সমার্থক। এটি হানাফীদের মতের বিপরীত, যারা ইলমকে একটি বিষয় এবং ইজতিহাদকে অন্য আরেকটি বিষয় হিসেবে গণ্য করেন।

আমরা বলি: যে সকল আলেম ইজতিহাদকে ইমামতের অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য করেন, তারা কখনো এই শর্তটিকে ইজতিহাদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন, আবার কখনো ইলম শব্দ উল্লেখ করেন এবং এর দ্বারা মুজতাহিদের ইলমই উদ্দেশ্য করেন—যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। আর আল-কামাল ইবনুল হুমাম—যিনি হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম—তিনি এর দ্বারা মুজ‌াহিদের ইলম উদ্দেশ্য করেননি।

অতঃপর জমহুর ওলামায়ে কেরাম ইমামের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যে শর্তারোপ করেছেন, তার মাধ্যমে তারা মূলত বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম গ্রহণের শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর তার মধ্যে নিচের বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হতে হবে। অর্থাৎ, কোনো ইমামকে মুজতাহিদ বলতে হলে নিচের বিষয়গুলো থাকা অপরিহার্য:

প্রথমত: তাকে আরবি ভাষায় এমন পারদর্শী হতে হবে যার মাধ্যমে তিনি আহকামের (বিধিবিধানের) আয়াত এবং হাদিসসমূহ বুঝতে সক্ষম হন। কারণ কুরআন এবং সুন্নাহ—যা শরয়ি আহকামের প্রধান দুটি উৎস—উভয়টিই আরবি, অর্থাৎ আরবি ভাষায়। আর একজন মুজতাহিদ ততক্ষণ পর্যন্ত দলিল-প্রমাণ বুঝতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না তিনি আরবি ভাষার জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন।

দ্বিতীয়ত: তাকে আহকামের আয়াতসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে; ফলে তিনি সেগুলোর অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন—আম (সাধারণ) ও খাস (বিশেষ), মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) ও মুফাসসাল (বিস্তারিত), মুতলাক (নিঃশর্ত) ও মুকাইয়াদ (শর্তযুক্ত),

হাকিকত (প্রকৃত অর্থ) ও মাজায (রূপক অর্থ), নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত)... ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবেন।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করেছেন যে, বিধান সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ (আয়াতুল আহকাম) জানা থাকার অর্থ এই নয় যে, সেগুলো তার মুখস্থ থাকতে হবে। বরং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, যখন তিনি কোনো বিধান উদ্ভাবন করতে চাইবেন, তখন যেন সেগুলোর দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অবগত থাকেন।

তৃতীয়ত: বিধান সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। সুতরাং তিনি হাদিসের সনদ সম্পর্কে জানবেন যে, তা মুতাওয়াতির, আহাদ নাকি মাশহুর। এছাড়াও হাদিসের রাবির (বর্ণনাকারীর) অবস্থা সম্পর্কে 'জারহ ও তা'দীল' (দোষ-গুণ বিচার) শাস্ত্রের জ্ঞান থাকতে হবে; যাতে তিনি সহিহ হাদিসকে অন্য হাদিস থেকে পৃথক করতে সক্ষম হন।

যেহেতু বর্তমান সময় এবং ওই সকল রাবিদের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান অনেক দীর্ঘ, তাই উলামায়ে কেরাম হাদিস শাস্ত্রের ওই সকল বড় ইমামদের সত্যায়নের ওপরই নির্ভর করেছেন যাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে, যেমন: বুখারি, মুসলিম... এবং অন্যান্য হাদিস বিশারদগণ। সুতরাং একজন মুজতাহিদের জন্য এই কিতাবগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করাই যথেষ্ট। তিনি যখন সহিহ বুখারিতে দেখবেন যে, অমুক রাবি ন্যায়পরায়ণ, তবে সেটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হবে। ওই রাবির ইতিহাস নিয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

অতএব আমাদের উচিত হলো এর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা; যাতে কোনো কষ্টসাধ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। রাবিদের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণে আমরা যদি এই সহিহ কিতাবগুলোর ওপর সীমাবদ্ধ থাকি, তবে তা-ই যথেষ্ট এবং এতে কোনো বাধা নেই।

মুজতাহিদের জন্য বিধান সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহের মূল পাঠ (মতন) সম্পর্কেও অবগত থাকা আবশ্যক, যা ইতিপূর্বে আলোচিত সাধারণ ও বিশেষ, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত... ইত্যাদি দিক থেকে বিবেচিত হবে।

চতুর্থত: যেহেতু বিধান উদ্ভাবন করার জন্য উসূলী কায়দা বা মূলনীতিগুলো জানা প্রয়োজন যেগুলোর মাধ্যমে এই বিধানসমূহ বের করা সম্ভব; তাই তাকে অবশ্যই উসূলে ফিকহের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হতে হবে।

পঞ্চমত: ফকীহগণ যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন, সে সম্পর্কেও তাকে জ্ঞান রাখতে হবে; যাতে তিনি তার ইজতিহাদের মাধ্যমে উলামাদের ঐকমত্যের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত না নেন। অন্যথায় এটি তাকে একটি হারাম কাজে লিপ্ত করবে; কেননা উলামাদের ইজমার বিরোধিতা করা শরয়িভাবে নিষিদ্ধ।

একাদশ পাঠ

আমাদের জানা আবশ্যক যে, ইমামের মধ্যে যদি কোনো গুণাবলি বিদ্যমান থাকে এবং দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হন যার ফলে তিনি সেই গুণটি হারিয়ে ফেলেন, তবে যারা ইমামের জন্য 'ইলম' বা জ্ঞানের শর্তারোপ করেন তাদের নিকট তিনি এই অবস্থায় পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য।

জুমহুর ও তাদের বিরোধীদের সপক্ষের দলিলসমূহ:

আমরা বলেছি: অধিকাংশ ফকিহ ইমামের জন্য 'মুজতাহিদ' হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু জুমহুর ফকিহগণ ইমামের মুজতাহিদ হওয়া ওয়াজিব হওয়ার সপক্ষে কী কী দলিল পেশ করেছেন? অথবা ইমামের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের শর্তারোপের স্বপক্ষে তাদের দলিলগুলো কী?

আমরা বলি: অধিকাংশ আলিম ইমামে আযমের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের গুণ থাকা আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেন। প্রথমত: কিয়াস (সাদৃশ্য বিধান), এবং দ্বিতীয়ত: ইমামে আযমের ওপর অর্পিত দায়িত্বের প্রকৃতি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাবলি, যাতে তিনি শরিয়ত প্রবর্তক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় যথাযথভাবে তা পালন করতে পারেন।

প্রথম দিকটি তথা কিয়াসের ক্ষেত্রে তারা ইমামতে কুবরা বা মহান ইমামতের পদটিকে বিচারিক (কাজি) পদের সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং বিচারক বা কাজি হওয়ার জন্য যদি মুজতাহিদ হওয়া শর্ত হয়, তবে ইমামের জন্য তা হওয়া আরও বেশি সংগত ও অগ্রগণ্য।

ইমামের জন্য ইজতিহাদকে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করার পর কেউ কেউ বলেন: "যেহেতু ইমামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিচারকের জন্য এই যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তাই ইমামের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রযোজ্য।" অর্থাৎ, জুমহুর ফকিহগণ ইমামকে কাজির ওপর কিয়াস বা তুলনা করেন। যদি কাজির জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত হয়, তবে ইমামে আযমের জন্য তা শর্ত হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা ইমামে আযমই কাজি নিয়োগ দিয়ে থাকেন; আর কাজির ক্ষেত্রে যদি মুজতাহিদ হওয়া শর্ত হয়, তবে ইমামে আযমের জন্য মুজতাহিদ হওয়া আরও বেশি অপরিহার্য।

দ্বাদশ পাঠ

আর দ্বিতীয় দিকের সাথে যা সংশ্লিষ্ট, সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন: "কেননা তিনি বিষয়সমূহকে সঠিক পন্থায় পরিচালনা করতে এবং সরল পথে পরিচালিত করতে মুখাপেক্ষী। আর যাতে তিনি হুদুদ (দণ্ডবিধি) সম্পর্কে অবগত হতে পারেন, পাওনাদি পুরোপুরি আদায় করতে পারেন এবং মানুষের মাঝে বিবাদ নিরসন করতে পারেন। আর তিনি যদি আলিম ও মুজতাহিদ না হন, তবে তিনি এসব করতে সক্ষম হবেন না।"

কেউ কেউ বলেন: "ইমামের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের শর্তারোপ মূলত এই কারণেই করা হয়েছে, যাতে তিনি এর মাধ্যমে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন এবং ধর্মীয় আকিদাহ-বিশ্বাসে উদ্ভূত সংশয় নিরসন করতে সক্ষম হন। আর নতুন উদ্ভূত সমস্যাবলি এবং ঘটনাবলির বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে নস ও ইস্তিনবাতের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে ফতোয়া দিতে পারেন। কেননা ইমামতের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আকিদাহর হিফাযত করা, বিচারকার্য সমাধান করা এবং বিবাদ দূর করা।"

আর যারা এই শর্তটি ওয়াজিব না হওয়ার মত পোষণ করেছেন—আর তারা হলেন হানাফীগণ, যেমনটি আমরা বলেছি—তারা তাদের মতামতের ভিত্তি রেখেছেন এই বিষয়ের ওপর যে, একজনের মাঝে এই শর্তটির সাথে অন্যান্য কাম্য শর্তাবলির একত্র হওয়া একটি বিরল বিষয়। আর ইজতিহাদ প্রয়োজন এমন সব বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য মুজতাহিদদের প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা উলামাদের কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার পর ফয়সালা দিতে পারেন।

সুতরাং হানাফীগণ বলেন: তাঁর পক্ষ থেকে এটাই যথেষ্ট যে, তাঁর সামনে উপস্থাপিত যেকোনো বিষয়ে তিনি আহলে ইলম বা আহলে ইজতিহাদদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে নিজের ফয়সালা প্রদান করবেন; কারণ অন্যান্য শর্তাবলির সাথে হয়তো এই শর্তটি পাওয়া যাবে না, এমতাবস্থায় এটি শর্ত করা অসম্ভব পর্যায়ের কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে তাঁরা এ কথা বলেই ক্ষান্ত হন যে, তিনি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হবেন। আর এর মাধ্যমেই তাঁরা ইমামে আযম (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর মুজতাহিদ হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেন না।

সপ্তম শর্ত: আদালত (ন্যায়পরায়ণতা):

আদালত হলো আত্মার এমন এক গুণ যা এর অধিকারীকে কবীরা গুনাহ করা এবং সগীরা গুনাহের ওপর অটল থাকা থেকে বিরত রাখে। উলামায়ে কিরাম এই শর্তটি বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন; অধিকাংশ এটি ব্যক্ত করেছেন যে—

কেউ একে ন্যায়পরায়ণতা (আদল) হিসেবে ব্যক্ত করেন, কেউ দ্বীনি পরিশুদ্ধতা (সালাহ) বলেন, আবার কেউ একে খোদাভীতি (ওয়ারা) হিসেবে উল্লেখ করেন। ইমাম মাওয়ার্দি কাঙ্ক্ষিত ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো শর্তারোপ করেছেন। তিনি ‘বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব’ (ওয়ালায়াতুল কাজা) প্রসঙ্গে বলেন:

“ন্যায়পরায়ণতা হলো—ব্যক্তি সত্যবাদী হবে, তার আমানতদারী স্পষ্ট হবে, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে পবিত্র থাকবে, পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকবে, সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকবে, সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় বিশ্বস্ত থাকবে এবং তার দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের মর্যাদার সাথে মানানসই শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্য বজায় রাখবে।”

উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ইমামের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা থাকা আবশ্যক বলে মত দিয়েছেন। কারণ, এই শর্ত একজন সাক্ষী ও বিচারকের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হয়, এবং একজন বিচারকের রায় কার্যকর হওয়ার জন্যও তার ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। যখন সাক্ষী ও বিচারকের ক্ষেত্রে এই শর্ত আবশ্যক, তখন যিনি ‘ইমামতে উজমা’ বা প্রধান নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তার ক্ষেত্রে এটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও আবশ্যক হওয়া উচিত। কেননা ইমামতে উজমার মর্যাদা সাক্ষ্য প্রদান ও বিচার বিভাগের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।

আর ফাসেকী (অনাচার) হলো ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত। যদি ফাসেকী বিচারকার্য ও সাক্ষ্যদানের অন্তরায় হয়, তবে তা প্রধান নেতৃত্বের দায়িত্ব লাভের ক্ষেত্রে আরও বড় অন্তরায় হওয়া উচিত। ইমামের কাছে যখন মুসলমানদের জনকল্যাণের বিষয়টি

প্রত্যাশিত, তখন তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যখন তিনি স্বয়ং নিজের পাপাচারের কারণে নিজের কল্যাণই নিশ্চিত করতে পারেননি?

কেউ কেউ বলেন: “ফাসেক ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়ের জন্য উপযুক্ত নয় এবং তার আদেশ ও নিষেধের ওপর আস্থা রাখা যায় না। আর জালিমের কারণে দ্বীন ও দুনিয়ার শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সে নেতৃত্বের জন্য কীভাবে উপযুক্ত হতে পারে? অথচ শাসক তো কেবল অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্যই।”

ইমামের জন্য ন্যায়পরায়ণতা শর্ত হওয়ার ব্যাপারে হানাফীগণ ছাড়া জমহুর আলেমদের আর কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি। হানাফীগণ একে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি। তারা ফাসেক ব্যক্তির উম্মতের নেতৃত্ব গ্রহণ করা জায়েজ বলেছেন, তবে তারা একে অপছন্দ করেন। তারা তাদের এই মতের সপক্ষে দলিল পেশ করেন যে, সাহাবীগণ বনু উমাইয়ার অত্যাচারী ইমামদের পেছনে সালাত আদায় করেছেন এবং তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

এর উত্তর হলো, তারা ছিলেন এমন রাজা যারা উম্মতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তারা সন্তুষ্টি বা নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, বরং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই পদ গ্রহণ করেছিলেন। আর ক্ষমতা দখলের এই পরিস্থিতিটি ছিল একটি জরুরি অবস্থা, তাই এটি দিয়ে দলিল পেশ করা সঠিক নয়। যদি আমরা বলি যে, ন্যায়পরায়ণ নয় এমন ক্ষমতা দখলকারীর শাসন বৈধ নয়, তবে বিবাদ মীমাংসা করা, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং এ জাতীয় উম্মতের দ্বীনি ও দুনিয়াবি স্বার্থসমূহ বিঘ্নিত হবে।

কেউ কেউ বলেন: "ইমামের পেছনে সালাত সহীহ হওয়ার জন্য তার ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয়। ইমাম আবু দাউদ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন: ((জিহাদ তোমাদের ওপর ওয়াজিব প্রতিটি আমিরের সাথে, সে নেককার হোক বা পাপাচারী; আর সালাত তোমাদের ওপর ওয়াজিব প্রতিটি মুসলিমের পেছনে, সে নেককার হোক বা পাপাচারী, যদিও সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়))। সালাতের ইমামতির ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত না হওয়া এবং মহান ইমামতের (রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব) ক্ষেত্রে তা শর্ত হওয়ার হিকমত হলো এই যে, সালাত অন্যের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যা মহান ইমামতের বিপরীত; কারণ তা অন্যের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট।"

কেউ কেউ বলেন: "ইমামের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর করা, বিচারকার্য পরিচালনা করা, ইনসাফ কায়েম করা, হকদারকে তার হক বুঝিয়ে দেওয়া, সঠিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা এবং তা যথাস্থানে ব্যয় করা। একজন পাপাচারী ব্যক্তির ওপর এসব বিষয়ে আস্থা রাখা যায় না। সুতরাং মহান ইমামতকে সালাতের ইমামতির সাথে তুলনা করা মূলত অসম তুলনা মাত্র। এ কারণেই হানাফীগণ মহান ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয় বলে যে দলিল পেশ করেন তা অসার বলে গণ্য হয়।"

ইমাম মাওয়ার্দি তার 'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থে পাপাচারকে, যার মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়, দুই ভাগে ভাগ করেছেন: প্রথমটি: যা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে হয়, দ্বিতীয়টি: যা সংশয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রথম বিভাগ: যা প্রবৃত্তির অনুসরণের সাথে সংশ্লিষ্ট:

এটি আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। ফলে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার শাস্তির পরোয়া না করেই নিষিদ্ধ কাজগুলোতে লিপ্ত হয়। মাওয়ার্দির মতে, এ ধরনের পাপাচার তার জন্য নেতৃত্ব লাভের পথে অন্তরায়। আর যদি ক্ষমতা লাভের পর এমন পাপাচার প্রকাশ পায়, তবে মাওয়ার্দির নিকট সে নেতৃত্ব থেকে

চ্যুত হবে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
একাদশ পাঠ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সংশয়বশত সত্যের পরিপন্থী আকিদাহ পোষণ করা সম্পর্কিত বিষয়:

এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি ইমামত (নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে বাধা দেয়। আর যদি ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কারো মাঝে এটি ঘটে, তবে সে এর কারণে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য হয়। তারা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, কুফরের হুকুম যেমন ব্যাখ্যাকৃত হওয়া বা না হওয়ার উভয় অবস্থায় সমান, তেমনি ফাসেকীর অবস্থাও ব্যাখ্যাকৃত হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে সমান হওয়া আবশ্যক। ইমাম আল-মাওয়ার্দী উল্লেখ করেছেন যে, বসরার অনেক আলেম মনে করেন, এটি ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে বাধা নয়। আর যদি ইমামতের দায়িত্ব লাভের পর এটি কারো ওপর আপতিত হয়, তবে এর কারণে সে নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কৃত হবে না; যেমনটি এটি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ এবং সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

অতঃপর ফাসেকী (পাপাচার) যার কারণে ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) বিলুপ্ত হয়, তা কখনো প্রকাশ্য হয়—অর্থাৎ যা মানুষের মাঝে প্রচারের মাধ্যমে পরিচিত হয় অথবা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। আবার কখনো কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ন্যায়পরায়ণ হলেও বাস্তবে গোপনে ফাসেক হয়—মানুষ তার সম্পর্কে যা ধারণা করে তার বিপরীতে। সুতরাং যদি কেউ গোপনে ফাসেক হয় এবং আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) তাকে ইমামতের জন্য নির্বাচিত করেন, তবে তার জন্য কি এই পদ গ্রহণ করা বৈধ হবে, নাকি তার জন্য এটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো ওয়াজিব?

জনৈক আলেম বলেছেন: তার ওপর ওয়াজিব হলো সে যা করছে এবং নিজের সম্পর্কে যা জানে তা থেকে তওবা করা। এই পদটি গ্রহণের শর্ত হলো সে নিজের সংশোধন ও সততার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে এবং তার ন্যায়পরায়ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন কাজে পুনরায় ফিরে না আসার বিষয়ে দৃঢ় হবে। যদি সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারে, তবে সামগ্রিকভাবে নিজের অবস্থা প্রকাশ করা তার জন্য আবশ্যক। আর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর ওপর ওয়াজিব হলো তারা তার পক্ষ থেকে এটি গ্রহণ করবে এবং ইমামতের জন্য অন্য কাউকে মনোনীত করবে।

কিন্তু যদি ন্যায়পরায়ণতার উপস্থিতি অসম্ভব হয়, তবে বিধান কী?

ইমামের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার (আদালাত) অভাব দুটি কারণে পরিলক্ষিত হয়: হয় এমন কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই পদ দখল করে নেয় যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা নেই, ফলে ইমামতের ওপর তার দখলদারিত্বে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর কোনো এখতিয়ার থাকে না। অথবা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সামনে ইমামতের জন্য উপস্থাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার অভাব থাকলে...

একাদশ পাঠ

যাদের মধ্যে অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান এবং যারা এই পদের যোগ্য হওয়ার উপযোগী, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) অনুপস্থিত।

উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই অনিবার্যতার (জরুরত) অর্থ বিদ্যমান। প্রথম বিষয়টি দ্বারা আমরা উদ্দেশ্য নিচ্ছি—যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় সে ইমামত দখল করে নেওয়া। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো—আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার শর্তটি বিদ্যমান পাচ্ছেন না।

আমরা বলি: উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই অনিবার্যতার অর্থ বিদ্যমান; কেননা প্রথম ব্যক্তিকে সংশোধন করার কোনো পথ নেই যে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত তাকে নেতৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করার কোনো উপায় নেই, আর এটি ফিতনা প্রকাশ পাওয়া এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার দিকে ধাবিত করে, যা শরিয়ত অনুমোদন করে না। এমতাবস্থায় দুটি ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করা হবে: উম্মাহর সর্বোচ্চ প্রধান হিসেবে ন্যায়পরায়ণতাহীন ব্যক্তির উপস্থিতির ক্ষতি, এবং তাকে শক্তি প্রয়োগে অপসারণের চেষ্টার সময় মানুষের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার ক্ষতি। সুতরাং তুলনামূলক লঘু ক্ষতিটিই মেনে নেওয়া হবে, আর তা হলো—ফিতনা ও বড় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত তাকে তার পদে বহাল রাখা এবং তাকে অপসারণের সুযোগের অপেক্ষা করা।

কেউ কেউ বলেন: "যদি ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণকারীর মধ্যে জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার অস্তিত্ব পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে—যেমন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ কেউ কিংবা কোনো ফাসিক ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে নেয়—আর তাকে অপসারণ করার চেষ্টায় এমন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে যা সহ্য করা অসম্ভব, তবে আমরা তার ইমামত সংঘটিত হওয়ার রায় দেব; যাতে তাকে অপসারণ করতে গিয়ে আমরা অসহনীয় ফিতনা উস্কে না দিই। এটি অনেকটা তেমন, যে ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে গিয়ে একটি শহর ধ্বংস করে ফেলে। ফকিহগণ বর্ণনা করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিদ্রোহীদের এলাকায় তাদের বিচারকদের দেওয়া রায়সমূহ কার্যকর হওয়ার ফয়সালা দিচ্ছি (যে এলাকা পরবর্তীতে ন্যায়পরায়ণরা জয় করে নিয়েছে), কারণ মানুষের মাঝে এসব বিধান বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; তবে অবশ্যই যে ব্যক্তির মাঝে শর্ত অনুপস্থিত তার ইমামতকেও সহিহ বা বৈধ সাব্যস্ত করতে হবে। অন্যথায় মানুষের মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং তাদের বিচারকদের দেওয়া রায়সমূহও সঠিক হবে না, যেহেতু তারা ইমামের পক্ষ থেকেই বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন।"

তেমনিভাবে দ্বিতীয় অবস্থা হলো: এমন এক অবস্থা যেখানে ন্যায়পরায়ণতাহীন কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক ইমামত দখল করেনি, বরং 'আহলে হাল্ল ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) যখন ইমাম নির্বাচনের ইচ্ছা করেন, তখন ইমামতের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা পর্যালোচনা করে তারা এমন কাউকে পান না যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার (আদালত) শর্তটি বিদ্যমান আছে। আমরা বলি: এই অবস্থাও একটি জরুরি (যরুরত) অবস্থা। এ ক্ষেত্রে ফকীহগণ ফাসেক ব্যক্তির শাসন বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব; অর্থাৎ যার ফাসেকী কম সে অন্যের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে এবং এভাবেই ধারা চলতে থাকবে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে: ইমামের কি ভুল ও পাপাচার থেকে নিষ্পাপ (মাসুম) হওয়া আবশ্যক?

আমরা বলি: ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ইমামের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) গুণটি থাকা শর্ত। এর অর্থ হলো ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে না এবং সগীরা গুনাহের ওপর অবিচল থাকবে না। সুতরাং সগীরা গুনাহ বা ছোটখাটো বিচ্যুতি ইমামের ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রভাব ফেলে না, যতক্ষণ না সে তার ওপর অটল থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে ইমামের ভুল ও পাপাচার থেকে নিষ্পাপ হওয়া (ইসমত) আবশ্যক নয়; বরং কেবল তার প্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতা বজায় থাকা আবশ্যক। যদি তার থেকে এই ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পায়, তবে তার ইমামত সঠিক হবে। আর যখনই সে এ থেকে বিচ্যুত হবে, উম্মত তার মুখোমুখি হবে এবং তার ভুল তাকে স্পষ্ট করে দেবে। ইসলামী উম্মাহর বিশাল জনসমষ্টি যথা— আহলে সুন্নাহ, মুতাজিলা, যায়দিয়া ও খাওয়ারিজগণ এই মতই পোষণ করেন। তবে শিয়াদের মধ্য থেকে ইসনা আশারিয়া ও ইসমাইলিয়াগণ বিচ্ছিন্ন পথ অবলম্বন করেছে; তারা বলেছে যে, ইমামকে অবশ্যই পাপাচার থেকে নিষ্পাপ (মাসুম) হতে হবে।

ইসমত (নিষ্পাপতা)-এর অর্থ:

যারা বলেন ইমামকে পাপাচার থেকে নিষ্পাপ হতে হবে তাদের সংশয়সমূহ উল্লেখ করার আগে আমরা প্রথমে 'ইসমত' বা নিষ্পাপতার অর্থ স্পষ্ট করি। সুতরাং আমরা বলি:

কেউ কেউ 'ইসমত'-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এটি ব্যক্তির আত্মা বা তার দেহের এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যার কারণে তার থেকে পাপাচার সংঘটিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কেউ কেউ বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে: বান্দার সক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তার মধ্যে কোনো পাপ সৃষ্টি করেন না।

বারো ইমামি শিয়া এবং ইসমাইলিরা -যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি- ইমামদের জন্য ‘ইসমত’ বা নিষ্পাপ হওয়াকে আবশ্যক মনে করে। এর অর্থ হলো, তারা সকল প্রকার কলুষতা থেকে পবিত্র এবং তারা ছোট বা বড় কোনো পাপই করেন না। আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ দেন তারা তাতে অবাধ্য হন না এবং যা আদেশ করা হয় তা-ই পালন করেন। এমনকি তারা এই নিষ্পাপ হওয়ার গুণাবলীতে ইমামদেরকে নবী ও রাসূলদের সমপর্যায়ে গণ্য করেন।

তাদের মতে ইমাম ও নবীর মধ্যে পার্থক্য হলো, নবীর নিকট ওহি আসে কিন্তু ইমামের নিকট ওহি আসে না। বরং আমরা দেখি যে, কোনো কোনো শিয়া এ বিষয়ে চরমপন্থী মত পোষণ করে; তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে ভুল হওয়া সম্ভব মনে করলেও ইমামের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হওয়া অসম্ভব বলে গণ্য করে। তাদের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সম্ভব এবং বদরের যুদ্ধের দিন মুক্তিপণ গ্রহণের ঘটনায় নবী অবাধ্যতা করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইমামদের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ রাসূল যদি কোনো অবাধ্যতা করেন তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ওহি অবতীর্ণ হয়, কিন্তু ইমামদের নিকট তো ওহি আসে না এবং তাদের কাছে ফেরেশতাও অবতরণ করে না। তারা যেহেতু নিষ্পাপ, তাই তাদের ক্ষেত্রে কোনো ভুল বা বিস্মৃতি ঘটা সম্ভব নয়, যদিও রাসূলের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা সম্ভব হতে পারে।

তারা এ বিষয়ে যে সকল সংশয়পূর্ণ যুক্তির ওপর নির্ভর করেছে আমরা তা উল্লেখ করছি; এগুলোই সেই যুক্তি যার মাধ্যমে তারা ইমামদের জন্য 'ইসমত' বা নিষ্পাপ হওয়াকে অপরিহার্য বলে দাবি করে:

তারা ইমামদের নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক হওয়ার সপক্ষে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করে: "আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম (নেতা) নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আর আমার বংশধরদের থেকেও? তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমার অঙ্গীকার জালেমদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।" [সূরা আল-বাকারা: ১২৪]। এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ইমামতের এই অঙ্গীকার এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে না যে জালেম। আর যে ব্যক্তিই কোনো গুনাহ করে সে-ই জালেম। মহান আল্লাহর এই বাণীর দিকে লক্ষ্য করুন: "তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী।" [সূরা ফাতির: ৩২]। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে এই আয়াতটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করবে...

পাপ প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয়, তিনি ইমাম হওয়ার যোগ্য নন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইমামকে অবশ্যই নিষ্পাপ (মাসুম) হতে হবে।

আর আমরা এর উত্তর এভাবে দিতে পারি যে: সম্মানিত আয়াতটি একথাই নির্দেশ করে যে, ইমামের জন্য আবশ্যক হলো তিনি যেন পাপে লিপ্ত না থাকেন। কিন্তু তার নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে আয়াতে কোনো প্রমাণ নেই। ফকীহগণ এ সংশয়ের উত্তর এভাবে দিয়েছেন: আমরা এটি মেনে নিচ্ছি না যে, যে ব্যক্তি নিষ্পাপ নয় সেই জালেম; বরং জালেম হলো সে-ই, যে এমন গুনাহে লিপ্ত হয়েছে যা তার ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) নষ্ট করে দেয় এবং সে তাওবা ও সংশোধনেও ব্রতী হয়নি।

তারা যেসব সংশয়ের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে একটি হলো: তারা বলে যে, দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নবুওয়াতের জন্য নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অতএব এর ওপর কিয়াস করে আমরা ইমামদের জন্যও নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক বলব। কারণ উভয় পক্ষই শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী এবং মহান আল্লাহর বিধান কার্যকরকারী। সুতরাং তারা নবুওয়াতের ওপর ইমামতকে কিয়াস করে, যেহেতু তারা সবাই শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী এবং মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী।

এই সংশয়ের উত্তর হলো:
প্রথমত: নবী এবং ইমামের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা নবী হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর পক্ষ থেকে এমন সব মুজেজা দ্বারা সমর্থিত যা মিথ্যা এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের মর্যাদার পরিপন্থী অন্যান্য বিষয় থেকে তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু ইমামের বিষয়টি তেমন নয়। কারণ তিনি কেবল মানুষের মাধ্যমেই ইমামত লাভ করেন, আর মানুষের পক্ষে কারো নিষ্পাপ হওয়া বা তার অন্তরের স্বচ্ছতা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এটিকে শর্ত করার কোনো

অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত: নবী এমন শরীয়ত নিয়ে আসেন যা সম্পর্কে মানুষ কেবল তাঁর মাধ্যমেই জানতে পারে। অতএব তিনি যদি শরীয়ত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা এবং গুনাহ করা থেকে নিষ্পাপ না হতেন—অথচ আমাদের তাঁর আদেশ ও নিষেধ মান্য করার এবং তাঁর কৃত কাজগুলোকে বৈধ হিসেবে বিশ্বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রেসালাতের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়াবলির সংশোধনের জন্য যে মুজেজা প্রদান করেছেন, তা গুনাহর কাজ সংঘটিত হওয়ার এবং ইহকাল ও পরকালের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াত।

যেন সেখানে একটি পার্থক্য রয়েছে। তারা ইমামতকে নবুওয়াতের সাথে তুলনা করে, কিন্তু ফকীহগণ তাদের এই বলে উত্তর দেন যে, নবী এবং ইমামের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর এই কারণেই এটি একটি অসম তুলনা। কারণ নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু ইমাম তেমন নন। কেননা ইমামকে মূলত মানুষ অথবা ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) নিযুক্ত করেন। এটি নবুওয়াত থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে নবী ﷺ এমন এক শরীয়ত নিয়ে আসেন যা সম্পর্কে আমাদের পূর্ব কোনো জ্ঞান থাকে না। এমতাবস্থায় তিনি যদি নিষ্পাপ না হতেন, তবে তা পাপে লিপ্ত হওয়ার দিকে ধাবিত করতে পারত, অথচ আল্লাহ তা হতে দেন না।

তারা যে সকল সংশয়ের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে একটি হলো: তারা বলে যে, কুরআন ও ইজমার মাধ্যমে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলিল আমর (কর্তৃত্বশীল) তাদেরও।” [সূরা আন-নিসা: ৫৯]। আর যার আনুগত্য করা ওয়াজিব, তার জন্য নিষ্পাপ হওয়াও ওয়াজিব। অন্যথায় যদি তার নিষ্পাপ হওয়া ওয়াজিব না হতো, তবে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব হতো এবং সে মন্দ কাজের আদেশ দিত ও সৎ কাজ থেকে নিষেধ করত। যেহেতু তার আনুগত্য ওয়াজিব, সেহেতু ইবাদত বর্জন করা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়াও আবশ্যক হয়ে পড়ত। আর এর ফলাফল যেহেতু বাতিল বা অসম্ভব, তাই এর কারণটিও বাতিল অর্থাৎ তার নিষ্পাপ না হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এর বিপরীতটিই প্রমাণিত হলো, আর তা হলো তার নিষ্পাপ হওয়া ওয়াজিব।

তবে তাদের এ যুক্তির বিপরীতে এটিও বলা হয় যে, ইমামের আনুগত্য কেবল সেই বিষয়েই ওয়াজিব যা শরীয়তের পরিপন্থী নয়। আর যদি তিনি শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করেন, তবে মহান আল্লাহর এই বাণীর কারণে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে না: “অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।” [সূরা আন-নিসা: ৫৯]।

তাদের দাবিকৃত নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি কেবল তখনই গ্রহণ করা সম্ভব হতো যদি কেবল ইমামের বক্তব্যের কারণেই তার আনুগত্য ওয়াজিব হতো। কিন্তু বাস্তবতা তেমন নয়; বরং তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব এই কারণে যে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মিথ্যা না বলাই যথেষ্ট। যেমন সাধারণ মানুষের জন্য বিচারক ও গভর্নরের ক্ষেত্রে এবং বিচারকের জন্য সাক্ষীর ক্ষেত্রে এবং অনুসরণকারীর জন্য মুফতির ক্ষেত্রে ইসলাম ও ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করা হয়ে থাকে।

শরয়ী রাজনীতি

দ্বাদশ পাঠ

তারা যে সকল সংশয়ের ওপর নির্ভর করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: ইমাম হলেন শরীয়তের রক্ষক। সুতরাং আমরা যদি তাঁর ভুল করার সম্ভাবনা স্বীকার করি, তবে তিনি শরীয়তের রক্ষক না হয়ে বরং এর লঙ্ঘনকারী হয়ে পড়বেন; ফলে তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

এর জবাবে তাদের বলা হয় যে, ইমাম স্বয়ং শরীয়তের রক্ষক নন, বরং কিতাব, সুন্নাহ, উম্মতের ইজমা এবং তাঁর সঠিক ইজতিহাদের মাধ্যমেই তা রক্ষিত হয়। সুতরাং তিনি যদি তাঁর ইজতিহাদে ভুল করেন অথবা কোনো পাপে লিপ্ত হন, তবে উম্মতের মুজতাহিদগণ তাঁর ইজতিহাদ সংশোধন করে দেবেন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারীগণ তাঁকে তাঁর বিভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা এমনটি করবেন না, তবুও তাতে শরীয়তের কোনো বিনাশ ঘটবে না।

অতঃপর ইমামদের নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে শিয়া ইসনা আশারিয়া ও ইসমাইলিয়াদের উপস্থাপিত দলীলসমূহের অসারতা স্পষ্ট হয়ে গেল।

আমাদের এখন এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাদের ইমামদের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি আবশ্যক করার মূল প্রেরণা ছিল তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও পবিত্রতা বর্ণনায় চরম বাড়াবাড়ি করা। তারা তাঁদেরকে এমন এক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে যা সাধারণ মানুষের স্তরের উর্ধ্বে। তারা ইমামদের হাতে মুজিযা প্রকাশ এবং গুনাহ থেকে তাঁদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবি করে তাঁদেরকে রাসূলগণের মর্যাদার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। তারা রাসূল ও ইমামদের মধ্যে কেবল এতটুকুই পার্থক্য করেছে যে, রাসূলের কাছে ওহী নাযিল হয়, আর ইমামের কাছে ওহী নাযিল হয় না।

ইমামদের ওপর এই পবিত্রতা আরোপ করার কারণ ছিল বিজয়ের পর পারস্যের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর ইসলামে প্রবেশ করা, যারা তাদের রাজাদের পবিত্রতায় বিশ্বাস করত। নতুন ধর্মে প্রবেশের পরও তাদের এই বিশ্বাস থেকে গিয়েছিল। ফলে তারা আলীকে এমন এক পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বলয়ে বেষ্টিত করল, যে বলয়ে তাদের পূর্বপুরুষরা তাদের রাজাদের বেষ্টিত রাখতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে কিসরাকে 'পবিত্র রাজা, আকাশের সন্তান' উপাধিতে ভূষিত করত এবং তাদের গ্রন্থসমূহে তাঁকে 'সৈয়্যদ' ও 'মুরশিদ' হিসেবে অভিহিত করত, তেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণকারী এই লোকেরাও আলীকে 'ইমাম' উপাধিতে ভূষিত করল।

একাদশ পাঠ

উপাধিটির সরলতা সত্ত্বেও এর অর্থের মহিমা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান; কারণ এটি নির্দেশ করে যে, এর অধিকারী ব্যক্তি দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে একত্রিত করেছেন—পার্থিব কর্তৃত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা। শিয়াগণ তাদের ইমামদের অতিমাত্রায় পবিত্রকরণের ফলে তাদেরকে মিথ্যা থেকে মুক্ত বলে গণ্য করেছে এবং তাদের নিষ্পাপত্বের (ইসমাাহ) প্রবক্তা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা তাদেরকে এই মূলনীতির সাথে স্ববিরোধী অবস্থানে দেখতে পাই; তারা ইমামের জন্য অনুমতি দেয় যে, তিনি যদি নিজের জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হন তবে যেন বলেন: "আমি ইমাম নই", অথচ তিনি ইমাম। এটিই হলো 'তাকিয়্যাহ'র মর্মার্থ। অথচ যদি মিথ্যা থেকে নিষ্পাপ হওয়া তার জন্য প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত হতো, তবে আবশ্যক ছিল যে তিনি কোনো কোনো অবস্থায় সত্যবাদী এবং অন্য কোনো অবস্থায় মিথ্যাবাদী হবেন না, বরং সর্বাবস্থায় সত্যবাদিতা তার চিরসঙ্গী হবে।

তাদের উল্লিখিত সংশয়গুলোর মাধ্যমে দেখা যায় যে, তারা তাদের দাবিকৃত নিষ্পাপত্বের (ইসমাাহ) স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অযৌক্তিকতার আশ্রয় নেয়।

অষ্টম শর্ত: রাজনীতি, প্রশাসন ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা:

যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা, তাই ফকিহগণ ইমামের জন্য অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন যে, তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত বা মত প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতে হবে এবং রাজনীতি ও যুদ্ধের বিষয়ে প্রাজ্ঞ হতে হবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী পরিচালনায় তাকে উচ্চতর দক্ষতার অধিকারী হতে হবে।

এ কারণেই আলেমগণ এমন দূরদর্শী চিন্তাভাবনার শর্তারোপ করেছেন যা প্রজাদের শাসন পরিচালনা এবং জনকল্যাণ ব্যবস্থাপনার দিকে ধাবিত করে; যেমনটি 'আল-মাওয়ার্দি' ব্যক্ত করেছেন। অথবা যেমনটি কেউ কেউ বলেন: "তিনি যুদ্ধ ও শান্তি পরিচালনা, সেনাবাহিনী বিন্যাস এবং সীমান্ত সুরক্ষায় বিজ্ঞ ও দূরদর্শী হবেন, যাতে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন।"

কেউ কেউ সঠিক চিন্তার সক্ষমতার শর্তারোপের কারণ হিসেবে বলেন: "যাতে তিনি এর মাধ্যমে প্রজাদের শাসন করতে পারেন এবং তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থসমূহ পরিচালনা করতে পারেন।"

এর ভিত্তিতে, ইমাম যদি রাজনীতি, প্রশাসন ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন না হন, তবে জমহুর ফকিহদের নিকট তিনি এই পদের দায়িত্বভার গ্রহণের উপযুক্ত নন।

দ্বাদশ পাঠ

...ভয়াবহ, এজন্য কেউ কেউ বলেন: "দুর্বল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ইমামত (নেতৃত্ব) কার্যকর হবে না; কারণ ইসলামি রাষ্ট্রে যে সকল ঘটনা ঘটে তা তার কাছেই উপস্থাপিত হয়। যদি তার সঠিক বিচারবুদ্ধি ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা না থাকে, তবে তার নিকট জনকল্যাণের পথ স্পষ্ট হবে না।"

অধিকাংশ আলেম (জমহুর) এই মতই পোষণ করেন যে, যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়াদি পরিচালনায় তাকে দূরদর্শী হতে হবে; সেনাবাহিনী

বিন্যস্ত করা এবং রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় পারদর্শী হতে হবে; এবং প্রজাসাধারণকে কীভাবে শাসন করতে হয় ও জনস্বার্থ কীভাবে রক্ষা করতে হয় সে বিষয়ে তাকে অবগত হতে হবে।

তবে আলেমদের মধ্যে এমন একদল আছেন যারা এই শর্তটিকে আবশ্যক করেন না, বরং তারা এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করেন যে, ইমাম সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতের অধিকারীদের সাথে পরামর্শ করবেন। তারা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, ইমামতের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাবলী যেমন ইজতিহাদ ইত্যাদির পাশাপাশি এই শর্তটি (উন্নত রণকৌশল ও প্রজ্ঞা) একই সঙ্গে পাওয়া যাওয়া বিরল।

আমরা মনে করি যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে এমন প্রজ্ঞাবান হওয়ার শর্তারোপ করা—অর্থাৎ তাকে সমরনায়কদের মতো যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকতে হবে এবং ঝানু রাজনীতিকদের মতো রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ হতে হবে—এর মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে। কারণ, জীবনের বিভিন্ন দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিলতা বাড়ার আগেকার যুগে কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি অর্জন করা সহজসাধ্য হলেও, বর্তমানে তা আর আগের মতো সহজ নয়। বর্তমান সময়ে একজন ব্যক্তির মাঝে রাজনৈতিক দিক, প্রশাসনিক দিক এবং যুদ্ধের বিষয়াদি সম্পর্কে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ রাজনৈতিক ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো পূর্ববর্তী যুগের মতো আর অতটা সহজ-সরল অবস্থায় নেই।

ফলে এই প্রতিটি ক্ষেত্রই এখন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন বিশাল একদল বিশেষজ্ঞের পূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। রাজনীতি, যুদ্ধ কিংবা প্রশাসনের যেকোনো সমস্যা পর্যালোচনা এবং সে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও শিক্ষা প্রস্তুত করার জন্য এখন বিশেষজ্ঞ মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

একাদশ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

পূর্বোক্ত অর্থে বিচক্ষণতার শর্তারোপ করার মধ্যে যদি কিছুটা অতিরঞ্জন থেকে থাকে, তবে আমরা—যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন—এই শর্তটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে কেবল সঠিক মতামতের অধিকারীদের পরামর্শের ওপর তুষ্ট থাকার কথা বলি না। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুরা বা পরামর্শের নীতি অনুসরণে আদিষ্ট। সুতরাং পরামর্শ করা তার ওপর অর্পিত আবশ্যিক দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বরং আমরা বলি: রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে অবশ্যই বিচক্ষণতার গুণ বিদ্যমান থাকতে হবে। এর অর্থ হলো—যখন তার সম্মুখে রাজনৈতিক, যুদ্ধ সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক সমস্যাবলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তার থাকতে হবে। আর এটি অর্জিত হবে যুদ্ধ, প্রশাসন ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার পর এবং উম্মাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যেকোনো সমস্যা সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণা পর্যালোচনার পর।

বর্তমানে এটি দৃশ্যমান যে, রাষ্ট্রসমূহের কার্যাবলি তার স্বাভাবিক গতিতেই চলছে, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানগণ প্রশাসন ও যুদ্ধের বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকেন। অতঃপর কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলো রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সুস্পষ্ট হওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের এখতিয়ার তারই থাকে। এ ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রগুলো সমান যারা বর্তমানে মানব সভ্যতার শীর্ষে অবস্থান করছে, আর সেই রাষ্ট্রগুলোও যারা এখনো আধুনিকতা ও অগ্রগতির পথে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

এই মতামতের মাধ্যমে কোনো শরয়ী মূলনীতি কিংবা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো বিধানের লঙ্ঘন হয় না। কারণ ইমামতের (রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার) শর্তাবলির মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক অকাট্যভাবে নির্ধারিত কোনো শর্ত নেই, কেবল কুরাইশ হওয়ার শর্তটি ব্যতীত। এই শর্তটি ছাড়া বাকি অন্য সকল শর্ত উলামায়ে কেরাম প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারণ করেছেন। আর সেই প্রয়োজনটি কতটুকু জরুরি, সে বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। এ কারণেই কিছু শর্তারোপের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহর এক পক্ষের সাথে অন্য পক্ষের

মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অতঃপর আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে, এর অর্থ এই নয় যে—ফকিহগণ যে অর্থে শর্তারোপ করেছেন সেই অর্থে এই শর্তটি বর্জনীয়। আর ফকিহদের নির্ধারিত সেই অর্থটি হলো—যুদ্ধ ও সন্ধি পরিচালনা এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাস করার ক্ষেত্রে তাকে বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে হবে...

...সৈন্যবাহিনী পরিচালনা এবং সীমান্ত রক্ষা করা। বরং আমরা এটি নিশ্চিত করে বলছি যে, নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে যদি এই শর্তের পূর্ণতা পাওয়া যায়, তবে তাকে বাদ দিয়ে এমন ব্যক্তির দিকে ফিরে যাওয়া বৈধ নয় যার মধ্যে এই শর্তটি বিদ্যমান নেই; এটি 'উত্তম, অতঃপর অপেক্ষাকৃত উত্তম' নীতি অনুসরণ করার স্বার্থে। আর যদি এমন কাউকে পাওয়া না যায় যার মধ্যে এই গুণটি বিদ্যমান, তবে আমাদের দৃষ্টিতে যা অপরিহার্য তা হলো—বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত সুস্পষ্ট মতামতের পর সঠিক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা থাকা। আর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সঠিক প্রজ্ঞা বা মতামতের শর্ত পরিহার করে কেবল বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করার যে কথা বলা হয়, আমরা তা সমর্থন করি না।

শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক যোগ্যতা, কুরাইশী হওয়া এবং শ্রেষ্ঠত্ব

নবম শর্ত: শারীরিক যোগ্যতা:

এই শর্তের উদ্দেশ্য হলো ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা, যা চিন্তা ও কর্মের ওপর প্রভাব ফেলে। ইন্দ্রিয়সমূহের সুস্থতার বিচারে ওলামায়ে কেরাম শর্ত দিয়েছেন যে, তাকে শ্রবণকারী, দৃষ্টিমান ও বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং বধির ব্যক্তির ইমামত (নেতৃত্ব) কার্যকর হবে না; কারণ তার বধিরতা তাকে জনগণের কল্যাণকর বিষয়গুলো শোনা থেকে বিরত রাখে। তদুপরি, এটি যেহেতু বিচারকের দায়িত্ব পালনে বাধা স্বরূপ, তাই ইমামতের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি জোরালো বাধা হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে অন্ধ ব্যক্তির ইমামতও কার্যকর হবে না।

আল-মাওয়ারদী বলেন: "দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া ইমামত চুক্তি সম্পাদন এবং তার স্থায়িত্বের পরিপন্থী। সুতরাং দায়িত্ব পালনকালে দৃষ্টিহীনতা দেখা দিলে তার মাধ্যমে ইমামত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটি যেহেতু বিচারকের দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতা তৈরি করে এবং সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার রহিত করে, তাই ইমামতের বৈধতার ক্ষেত্রে এটি অন্তরায় হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।" অতঃপর আল-মাওয়ারদী বলেন: "আর রাতের বেলায় দেখতে না পাওয়া (রাতকানা হওয়া) ইমামত চুক্তির সূচনা বা তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়; কারণ এটি এমন এক ব্যাধি যা অবসরের সময়ে ঘটে এবং এর উপশমের আশা করা যায়। অনুরূপভাবে বাকশক্তিহীন ব্যক্তির ইমামতও সাব্যস্ত হবে না; কারণ তার বাকহীনতার দরুন উম্মতের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

উনবিংশ পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ইমামের দায়িত্বভার গ্রহণের পর যদি তার মধ্যে বাকশক্তিহীনতা বা শ্রবণশক্তিহীনতা আপতিত হয়, তবে এ বিষয়ে আলেমগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ, ইমামতি লাভের পর যদি এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়। একদল আলেমের মতে, যদি ইমামের বাকশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ইমামতি থেকে অব্যহতি নেওয়া ওয়াজিব, যেমনিভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে অব্যহতি নেওয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেননা বাকশক্তিহীনতা এবং শ্রবণশক্তিহীনতা—উভয়ই রাষ্ট্র পরিচালনা ও কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। অন্য একদল আলেম বলেছেন: শ্রবণশক্তি বা বাকশক্তি হারানোর কারণে তাকে ইমামতি থেকে অপসারিত হতে হবে না; কারণ ইশারা-ইঙ্গিত এই দুটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তৃতীয় একদল আলেম বলেছেন: যদি তিনি সুন্দরভাবে লিখতে পারেন তবে তাকে পদত্যাগ করতে হবে না, আর যদি লিখতে না পারেন তবে তাকে ইমামতি থেকে সরে যেতে হবে। কারণ লেখা দ্বারা মনের ভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কিন্তু ইশারা অস্পষ্ট ও সংশয়যুক্ত হতে পারে।

"আল-মাওয়ারদী" এই মতগুলো উল্লেখ করার পর প্রথম মতটিকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর তা হলো—যদি এই দুটির মধ্যে কোনো একটির উদ্ভব ঘটে, তবে ইমামতি থেকে সরে যাওয়া ওয়াজিব।

কানে কম শোনা এবং ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ইমামতি শুরু হওয়া বা তা স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি করবে না, যতক্ষণ না তা ব্যক্তি শনাক্তকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতার বিষয়ে "আল-মাওয়ারদী" অঙ্গহানিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথম বিভাগ: যা ইমামতি চুক্তির সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে বা তা বহাল থাকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে না। এটি এমন অঙ্গহানি যা চিন্তা-গবেষণা, কর্মতৎপরতা বা উদ্যমের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না এবং যা বাহ্যিক অবয়বকেও কুৎসিত করে না। যেমন পুরুষাঙ্গ ছেদন হওয়া বা অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া। কারণ বিচার-বুদ্ধি বা মতামতের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো ভূমিকা নেই এবং বংশবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কাজে এগুলোর কোনো প্রভাব নেই। সুতরাং এর বিধান 'ইন্নীন' (শারীরিক অক্ষম ব্যক্তি)-এর মতোই। 'ইন্নীন' ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি নারীদের নিকট গমনের সক্ষমতা রাখেন না। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আলাইহিমাস সালাম)-এর প্রশংসা করে বলেছেন: "এবং তিনি হবেন নেতা, নারী-সংস্রবমুক্ত (হাসুর) এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী।" [আলে ইমরান: ৩৯] ।

'হাসুর' শব্দের অর্থের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে: প্রথমটি হলো, তিনি হলেন সেই 'ইন্নীন' যিনি নারীদের নিকট গমনের সামর্থ্য রাখেন না। দ্বিতীয়টি হলো, তিনি এমন ব্যক্তি যার কোনো পুরুষাঙ্গ নেই যা দিয়ে তিনি নারীদের সাথে মিলিত হবেন, অথবা যার অঙ্গটি খেজুরের আঁটির ন্যায় অতি ক্ষুদ্র।

দ্বিতীয় বিভাগ: যা ইমামতের (নেতৃত্ব) চুক্তি সম্পন্ন করতে এবং এর স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আর তা হলো এমন কিছুর অভাব যা কর্মক্ষমতায় প্রভাব ফেলে, যেমন দুই হাত না থাকা; অথবা যা চলাফেরা বা সক্রিয়তায় প্রভাব ফেলে, যেমন দুই পা না থাকা। কেননা এটি জাতির অধিকার আদায়ের কাজ বা সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে এটি প্রাথমিকভাবে ইমামত চুক্তির ক্ষেত্রে এবং ইমামত গ্রহণের পর এমনটি ঘটলে তার স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়।

তৃতীয় বিভাগ: যা আংশিক কর্মক্ষমতায় বা আংশিক সক্রিয়তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যেমন হাতের কিছু অংশ না থাকা বা এক পা না থাকা। এটি প্রাথমিকভাবে ইমামত চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক; কারণ তিনি জাতির বিষয়াবলীতে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। ইমাম "মাওয়ার্দী" এর বিপরীত কোনো মত উল্লেখ করেননি।

আর যদি ইমামত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ইমামের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটে, তবে সেক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। প্রথমটি হলো: এটি স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক; যেহেতু এটি শুরুতে (চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময়) প্রতিবন্ধক ছিল, তাই স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও এটি প্রতিবন্ধক।

দ্বিতীয়টি হলো: এটি স্থায়িত্বে কোনো প্রভাব ফেলবে না, যদিও এটি প্রাথমিকভাবে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিল; কারণ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ সুস্থতা ধর্তব্য, আর তা থেকে অপসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ ঘাটতি ধর্তব্য।

চতুর্থ বিভাগ: যা না থাকলে ইমামত স্থায়িত্বে বাধা সৃষ্টি হয় না, তবে শুরুতে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে তা বাধা কি না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আর এটি এমন ত্রুটি যা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নষ্ট করে বা কুৎসিত দেখায় কিন্তু বিচারবুদ্ধি, সক্রিয়তা বা কর্মে কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন নাক কাটা থাকা বা এক চোখ নষ্ট হওয়া। ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, এটি ইমামতের স্থায়িত্বে বাধা সৃষ্টি করে না; কারণ এটি ইমামতের কোনো অধিকারে প্রভাব ফেলে না। তবে প্রাথমিকভাবে ইমামত চুক্তির ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধক কি না, সে বিষয়ে তারা দুটি মতের ওপর ইখতিলাফ করেছেন:

প্রথম মত: এটি প্রাথমিকভাবে ইমামত চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না; কারণ এটি ইমামতের কোনো অধিকারে বিঘ্ন ঘটায় না।

দ্বিতীয় মত: এটি ইমামত চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আর এক্ষেত্রে সুস্থতা ইমামত চুক্তির সঠিক হওয়ার জন্য একটি শর্ত; যাতে করে ইমামগণ এমন প্রতিটি ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকেন যা তাদের পূর্ণ গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ন করে, যার ঘাটতি আনুগত্যের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। আর যা এই পর্যন্ত পৌঁছায় তা জাতির অধিকারের ক্ষেত্রে একটি ঘাটতি।

আঠারোতম অধ্যায়

দশম শর্ত: মানসিক সক্ষমতা:

এই শর্তটি ব্যক্ত করতে ওলামায়ে কেরামের অভিব্যক্তির মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে দেখা যায় যারা এই শর্তটিকে সাহসিকতা শব্দে প্রকাশ করেন, আবার কেউ কেউ একে সক্ষমতা বা যোগ্যতা শব্দে ব্যক্ত করেন। মোদ্দাকথা হলো, এই শর্তটি

সাহসিকতা দ্বারা অভিহিত করা হোক, কিংবা সঠিক বিচারবুদ্ধি ও সাহসিকতা—উভয় গুণের সমন্বয় ঘটিয়ে একে সক্ষমতা হিসেবে অভিহিত করা হোক, জুমহুর ফকিহগণ ইমামের জন্য এটি শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

তারা এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন—যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—যে, দণ্ডবিধি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর তা কার্যকর করা ইমামের অন্যতম দায়িত্ব। ইমাম যদি কাপুরুষ হন, তবে তার ভীরুতা তাকে তা কার্যকর করা থেকে অক্ষম করে দেবে। এছাড়া এই গুণের মাধ্যমেই তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে এবং সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করতে সক্ষম হন।

জুমহুর ফকিহগণ কেন ইমামে আজমের (প্রধান নেতা) জন্য সাহসিকতা বা সক্ষমতাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেন?

তারা বলেন: কারণ তিনি যদি কাপুরুষ হন, তবে দণ্ডবিধি কার্যকর করতে অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতেও অপারগ হবেন। আর এটি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের কারণ হবে।

কিছু আলেম এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা ইমামের মাঝে সাহসিকতার গুণটি শর্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তারা এই যুক্তি পেশ করেছেন যে, ইমামের জন্য আবশ্যকীয় অন্যান্য গুণাবলীর সাথে এই গুণটির একত্র সমাবেশ ঘটা বিরল।

কিছু ফকিহ ইমামের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাহসী হওয়া শর্ত করেননি। বরং তারা বলেন যে, এসব দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করাই যথেষ্ট হবে; চাই তা বিচার কার্যকর করা বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে হোক, কিংবা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া ও সৈন্যদল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে হোক। ইমামের মাঝে এই গুণের অনুপস্থিতি কোনো ক্ষতি করবে না।

প্রকৃতপক্ষে ইমামের মধ্যে সাহসিকতার গুণটি শর্ত করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে তিনি যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষা করতে পারেন এবং অপরাধীদের ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করতে ভীরুতা প্রদর্শন না করেন, যেমনটি কোনো কোনো ফকিহ এর কারণ দর্শিয়েছেন।

আমরা বলি: এটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বিষয়; কারণ আমাদের মতে—ইমামের জন্য সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী হওয়া যথেষ্ট, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ' (রা'য়) এর শর্ত নিয়ে আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করেছি; যাতে তিনি যুদ্ধের বিষয়াদি এমন দক্ষ সেনাপতিদের ওপর ন্যস্ত করতে পারেন, যাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনার সক্ষমতার ওপর তিনি আস্থাশীল।

উম্মাহর স্বার্থসমূহ বর্তমানে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্যই এমন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন যারা একাগ্রতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম। যখন বিষয়টি এমন, তখন ইমামের পক্ষে এটি সম্ভব যে তিনি দক্ষ হিসেবে স্বীকৃত সেনাপতিদের নিকট যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং এ জাতীয় অন্যান্য সামরিক বিষয়গুলো ন্যস্ত করবেন। তদ্রূপ কিসাস ও দণ্ডবিধি কার্যকর করার বিষয়টিও বিশেষ কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করতে পারেন, যেমনটি বর্তমানে শাস্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়, যেখানে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ তা সম্পাদন করে থাকে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, এমন ব্যক্তিকে শাসক নিয়োগ করা বৈধ হবে যে কাপুরুষতার শিকার হয় অথবা যখন এমন কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসে যার জন্য দৃঢ় মনোবল প্রয়োজন তখন সে দুর্বল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া এবং এর পরবর্তী পরিণাম বহন করা। বরং যদি কারো মধ্যে এই স্বভাব বিদ্যমান থাকে, তবে অন্যান্য

শর্ত পাওয়া গেলেও তাকে ইমামতের পদ থেকে দূরে রাখার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে। কারণ তার ভীরুতা ও দুর্বলতা শত্রু পক্ষকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি লোলুপ হওয়ার সুযোগ করে দেবে, অথচ ইমামের দায়িত্ব হলো দীন এবং মুসলিমদের ভূখণ্ড রক্ষা করা।

একাদশ শর্ত: কুরাইশী হওয়া:

ইমামকে কুরাইশ বংশের হতে হবে।

এটি এমন একটি শর্ত যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি মুসলিমদের একটি প্রসিদ্ধ দল হলো খারেজী সম্প্রদায়, যাদের অন্যতম পরিচিতি হলো এই যে...

এই শর্তটি আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারে তাদের অভিমত। আমরা এ বিষয়ে আলেমদের মতামত স্পষ্ট করব, তারপর তারা যে সকল দলিলের ওপর নির্ভর করেছেন তা বর্ণনা করব।

কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার শর্ত সম্পর্কে আলেমদের মতামত:
আহলে সুন্নাত এবং অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে, ইমামের জন্য কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত। অন্যদিকে খারিজিরা মনে করে, কুরাইশ এবং অ-কুরাইশ সকলের জন্যই ইমামত বৈধ; এ ক্ষেত্রে বংশ, জাতি বা বর্ণের কারণে কোনো ব্যক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেকেই এর যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সমান, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর অনুসারী থাকবে এবং এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

দলিলসমূহের ব্যাপারে আমরা বলি:
আহলে সুন্নাত কুরাইশ বংশের শর্তের সপক্ষে সুন্নাহ ও ইজমা (ঐক্যমত্য) থেকে দলিল পেশ করেছেন।

সুন্নাহর ব্যাপারে বলতে গেলে: তারা অসংখ্য হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন, যা সুন্নাহর বিভিন্ন কিতাবে, বিধি-বিধানের অধ্যায়ে, নেতৃত্ব ও গুণাবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিসের মধ্যে একটি হলো ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ এই বিষয়ে (নেতৃত্বে) কুরাইশদের অনুগামী; তাদের মুসলিমরা কুরাইশদের মুসলিমদের অনুগামী এবং তাদের কাফিররা কুরাইশদের কাফিরদের অনুগামী।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "মানুষ কল্যাণ ও অকল্যাণে কুরাইশদের অনুগামী।"

তৃতীয় এক বর্ণনায় এসেছে: "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্য থেকে দুইজন অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়টি (খিলাফত) কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে।"

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন: "নিশ্চয়ই এই বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যে থাকবে; যে ব্যক্তিই তাদের সাথে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে নিপতিত করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দ্বীন কায়েম রাখবে।"

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল-এর মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর ও উমর যখন সকিফাহ বনী সাঈদায় গেলেন, যেখানে

আনসারগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খলীফা নির্বাচনের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন, তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বক্তব্য দিলেন। আনসারদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু বলেছেন, তার কোনোটিই তিনি উল্লেখ করতে বাদ দেননি। তিনি বললেন: "আপনারা অবশ্যই জানেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যদি সকল মানুষ একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা অন্য একটি উপত্যকা দিয়ে চলে, তবে আমি আনসারদের উপত্যকাটিই অনুসরণ করব।' হে সাদ, আপনিও জানেন যে রাসূলুল্লাহ..."

৫১৪

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
একাদশ পাঠ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসা অবস্থায় বলেছিলেন: "কুরাইশরা এই শাসনের অধিকারী; সৎ মানুষেরা তাদের মধ্য থেকে সৎ ব্যক্তিদের অনুসারী এবং পাপাচারীরা তাদের মধ্য থেকে পাপাচারীদের অনুসারী।" তাকে বলা হয়েছিল: "আপনি সত্য বলেছেন, আমরা হলাম উজির (সহকারী) আর আপনারা হলেন আমির (শাসক)।"

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, সুন্নাহ একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে এই শর্তটিকে আবশ্যক করেছে। এছাড়া এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্যও রয়েছে; সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং তাদের পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে।

এটিই হলো প্রথম মতের প্রবক্তাদের দলিল, আর তারা হলেন জমহুর ওলামা বা সংখ্যাগুরু আলেম। তারা মনে করেন যে, ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত।

অন্যদিকে আমরা যদি দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলিলের দিকে লক্ষ্য করি—যারা হলেন খারেজি এবং যারা মনে করেন যে এটি কোনো শর্ত নয়—তবে তাদের পক্ষ থেকেও নিজস্ব দলিল রয়েছে।

তারা কুরাইশ হওয়া শর্ত না হওয়ার সপক্ষে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিছু হাদিস, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি উক্তি এবং যুক্তিনির্ভর দলিল উপস্থাপন করেন।

যেসব হাদিস কুরাইশ হওয়া ইমামতের শর্ত নয় বলে প্রমাণ করে, তার মধ্যে একটি হলো ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমার বন্ধু আমাকে অসিয়ত করেছেন যেন আমি শুনি ও আনুগত্য করি, এমনকি যদি সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত কোনো গোলামও হয়।" অর্থাৎ আমি যেন শুনি ও আনুগত্য করি যদিও সে অতি নগণ্য কোনো গোলাম হয় যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। যতক্ষণ সে শাসক হিসেবে থাকবে, ততক্ষণ তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। ইমাম মুসলিম ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজে বলেছেন: "যদি তোমাদের ওপর এমন কোনো গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করে, তবে তোমরা তার কথা শোনো এবং আনুগত্য করো।" তিনি আরও বলেছেন: "তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর কোনো হাবশি গোলামকে শাসক নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটি যেন কিশমিশের মতো।"

এই হাদিসগুলো নির্দেশ করে যে, কুরাইশ হওয়া ইমামের জন্য শর্ত নয়; কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন গোলাম যখন মুসলিমদের শাসক হবে তখন তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটি সবার জানা যে কুরাইশদের মধ্যে এমন কোনো দাস নেই যাদের বংশধারা তাদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। বরং এসব হাদিসের কোনো একটিতে—অর্থাৎ এই

হাদিসগুলোতে—কথা শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি (বর্ণিত হয়েছে)...

৫১৫

শারয়ী রাজনীতি

হাবশী দাসের আনুগত্য করার নির্দেশ এই প্রমাণ বহন করে যে, ইমাম কুরাইশী না-ও হতে পারেন। আর এটিই তাদের দাবি যারা মনে করেন যে, ইমামের কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত নয়।

উমর (রা.)-এর দিকে নিসবতকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের দলীল পেশ করার বিষয়টি হলো— বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁকে আঘাত করা হলো, তখন মুসলিমরা তাঁর কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের জন্য এমন কাউকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন যাকে তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেন, যাতে তাঁর পরে তারা মতবিরোধে লিপ্ত না হয়। তারা তাঁকে বললেন: "আমাদের বিষয়াবলি কে পরিচালনা করবেন তা আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিন।" তখন তিনি (রা.) বললেন: "যদি আবু হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম জীবিত থাকত, তবে আমি তাকেই স্থলাভিষিক্ত করতাম।" তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "যদি আবু উবাইদাহ জীবিত থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু আসে, তবে আমি তাকেই স্থলাভিষিক্ত করব; আর যদি আবু উবাইদাহর মৃত্যুর পর আমার মৃত্যু আসে, তবে আমি মু'আয ইবনে জাবালকে স্থলাভিষিক্ত করব।"

উমর (রা.)-এর এই উক্তি একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি কুরাইশী হওয়ার শর্তকে আবশ্যক মনে করতেন না। কারণ তিনি আবু হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম অথবা মু'আয ইবনে জাবালকে স্থলাভিষিক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, অথচ তাদের কেউই কুরাইশী ছিলেন না। বরং প্রথমজন আরব ছিলেন না এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন আনসারী যার কুরাইশ বংশে কোনো বংশসূত্র নেই।

ইমামের ক্ষেত্রে কুরাইশী হওয়ার শর্ত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে যৌক্তিক দলীল সম্পর্কে তারা বলেন:

দ্বীনি বিষয়াবলি আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়ত দাতার নিকট বংশমর্যাদার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। নেক আমল এবং মহান আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন অথবা তার অভাব ছাড়া কোনো মর্যাদা বা হীনতার মাপকাঠি নেই। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" [আল-হুজুরাত: ১৩]। কেননা ইসলাম সাদা-কালো, লাল-বর্ণ, উচ্চবংশীয় এবং নিম্নবংশীয় সকল মানুষের মধ্যে সমতার মূলনীতি নিয়ে এসেছে। তাকওয়া ছাড়া কারো ওপর কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর কুরাইশী হওয়ার শর্তারোপ করা মূলত গোত্রপ্রীতির (আসাবিয়্যাত) দিকে ধাবিত হওয়া এবং অবশিষ্ট উম্মাহর ওপর একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রজ্ঞাময় শরীয়ত ঘৃণা ও অপছন্দ করে।

পরিশেষে, ইমাম কুরাইশী হওয়া আবশ্যক হওয়ার স্বপক্ষে বিদ্যমান দলীলাদি—যার মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত একাধিক হাদীস এবং এ বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা—সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে মানুষ সত্যিই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সকল দলীলের দিকেই ঝোঁকা উচিত যা এই শর্তটিকে সাব্যস্ত করেছে...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
একাদশ পাঠ

কুরাইশী হওয়া; কেননা এটি এমন কিছু নস (দলিল) দ্বারা প্রমাণিত যা এই শর্তের আবশ্যকতা প্রকাশ করে, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (ঐক্যমত) একে সুদৃঢ় করেছে। সুতরাং এই সমস্ত দলিল যা নির্দেশ করে তা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বিশেষ করে যেহেতু বিষয়টি ইজমার মাধ্যমে অকাট্য হয়ে গেছে, তাই এই শর্তের আবশ্যকতার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর খারেজীরা যা বলেছে—যে ইসলাম আসাবিয়্যাহ বা গোত্রবাদ নিষিদ্ধ করেছে, এবং বিশেষ কোনো গোষ্ঠী অন্য সকল মুসলিমের ওপর কর্তৃত্ব করবে তাও নিষেধ করেছে, এবং ইসলাম সকল মানুষের মাঝে সমতা আনয়ন করেছে, যা খিলাফতকে কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিপন্থী—তাদের জবাবে আমরা বলি:

নিশ্চয়ই ইসলাম ইমাম কুরাইশী হওয়ার শর্তারোপ করার মাধ্যমে সেই আসাবিয়্যাহর দিকে আহ্বান করেনি যা সে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকের উম্মাহর অন্য সাধারণ সদস্যদের ওপর কোনো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনিভাবে তার পরিবারেরও সাধারণ মুসলিমদের জন্য শারী (আইনদাতা) কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারের অতিরিক্ত সামান্যতম কোনো অধিকার নেই।

অতএব ইমাম এবং সাধারণ মুসলিমগণ সকলেই ইসলামি আইনের সামনে সমান, তারা এর বিধানের অনুগত। বরং ইমাম এমন সব দায়-দায়িত্ব বহন করেন যা তাকে সবচেয়ে ভারী বোঝা বহনকারী এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন ব্যক্তিতে পরিণত করে; কারণ তিনি তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ, যেমনটি আমাদের রাসূল (সা.) নির্দেশ করেছেন। আর আবু বকর বা উমর (রাযি.) যে পরিবারগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের খিলাফতের আমলে কোনো সাধারণ মুসলিমের ওপর সেই পরিবারগুলোর ন্যূনতম কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

উসমানের (রাযি.) খিলাফতের সময় মুসলিমদের অধিকারের ওপর বনু উমাইয়াহর জবরদখল উসমানের (রাযি.) পক্ষ থেকে কোনো আসাবিয়্যাহ বা গোত্রপ্রীতির ফল ছিল না। বরং তা ছিল তার কোমলতা এবং তার পক্ষ থেকে যারা জনগণের বিষয়াবলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাদের নির্বাচনে সফল না হওয়ার কারণে। শেষ পর্যন্ত এটি সেই ফিতনা বা গৃহযুদ্ধ জাগ্রত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা তৎকালীন ইসলামি বিশ্বকে গ্রাস করেছিল। আর তখন বিশৃঙ্খলাকারী, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা এক উন্মত্ত সমাবেশে একত্রিত হয়, যা পরিশেষে খলিফার নিজ গৃহে কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় তাঁর মর্মান্তিক শাহাদাতের দিকে ধাবিত করে।

শারয়ী রাজনীতি
একাদশ পাঠ

ইসলাম মানুষের এক বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বা সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করে না। ইমাম যদি কুরাইশ বংশের হন, তবে এর অর্থ এই নয় যে, কুরাইশ বংশের জন্য অন্য সব মুসলিমের তুলনায় উচ্চ কোনো মর্যাদা সাব্যস্ত হবে। কারণ ইসলাম—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বলেছি—কুরাইশ এবং অ-কুরাইশদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, এবং শাসক ও শাসিতের

মধ্যেও কোনো ভেদাভেদ করে না। ইসলামী আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণে উম্মাহর অধিকার রয়েছে খলিফাকে নিয়ন্ত্রণ করার; আর উম্মাহ যখনই তাদের কল্যাণের জন্য সমীচীন মনে করবে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতাও উম্মাহর রয়েছে। ইসলামে সদ্বোপদেশ প্রদান এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান ও মন্দ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় কর্তৃত্ব নেই। আর আল্লাহ এই কর্তৃত্ব প্রতিটি সাধারণ মুসলিমকেও দান করেছেন।

এভাবেই আমরা খারিজি এবং তাদের মতাবলম্বীদের সেই সব সংশয়ের উত্তর দিয়েছি, যা তারা ইমামতের ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্ত অস্বীকার করে পেশ করে থাকে।

কিন্তু কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্তারোপের হিকমত (রহস্য) কী?

আমরা শুরুতেই বলব যে, কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্তটি বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং শ্রেষ্ঠ যুগগুলোর মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের (ইজমা) মাধ্যমে সাব্যস্ত—যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এমতাবস্থায় যদি আমরা এই শর্তের পেছনে থাকা হিকমত বা রহস্য অন্বেষণ করতে গিয়ে কোনো ভুলও করি, তবে তা এই প্রমাণিত শর্তটির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ কোনো বিষয়ের বিধান দলিলে সাব্যস্ত হওয়া এবং সেই দলিলের ওপর ভিত্তি করে তা টিকে থাকার ওপরই সবকিছু নির্ভরশীল। সুতরাং যখন কোনো বিষয়ের দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে; প্রতিটি হুকুমের গূঢ় রহস্য বা বাহ্যিক হিকমত জানা থাকা আবশ্যক নয়।

তেমনিভাবে এটিও জানা উচিত যে, কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্তের হিকমত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নিকটাত্মীয়তা নয়। কারণ আত্মীয়তার বিশেষ কিছু বিধান রয়েছে যেমন মিরাস (উত্তরাধিকার) বা বিবাহের নিষেধাজ্ঞা; কিন্তু ইমামতের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। তেমনি কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রেও এর কোনো প্রভাব নেই। এটি প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আত্মীয়দের যেমন বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করতেন, তেমনি যাদের সাথে তাঁর আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক ছিল না তাদেরও তিনি নিযুক্ত করতেন।

ওলামায়ে কেরাম ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্তারোপের হিকমত বা নিহিত প্রজ্ঞা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাদের অধিকাংশের ইজতিহাদ বা গবেষণা সেই মর্যাদাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে যা সাধারণভাবে আরবদের মাঝে কুরাইশরা ভোগ করত। ফলে তাদের আনুগত্য করা মানুষের জন্য সহজসাধ্য ছিল; কারণ তাদের আভিজাত্য ও নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত ছিল। এছাড়া এই দ্বীন বা ধর্ম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কুরাইশদেরকে ইমামতের জন্য নির্দিষ্ট করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক; কারণ এই দ্বীন তাদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই দ্বীনের রাসূল —অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল— তাদেরই একজন ছিলেন। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে এই দ্বীন রক্ষা ও প্রসারে উদ্বুদ্ধ করে।

পরিশেষে আমরা বলব: ইসলাম ইমামে আজম বা প্রধান নেতার ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশীয় হওয়ার শর্তারোপ করেছে; চাই আমাদের কাছে এর হিকমত স্পষ্ট হোক কিংবা আমরা তা বুঝতে ভুল করি, এটি শারে' বা আইনদাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

দ্বাদশ শর্ত: ইমামকে অন্যদের তুলনায় উত্তম হতে হবে

আমরা শুরুতে এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, সকলে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যখন একজনের অনুকূলে ইমামতে উজমা বা

প্রধান নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তার চেয়ে অধিকতর যোগ্য বা উত্তম কারও আবির্ভাব ঘটে, তবে বিদ্যমান ইমামকে সরিয়ে সেই উত্তমের দিকে ফিরে যাওয়া যাবে না। এর কারণ সুস্পষ্ট; কেননা যেকোনো সময় অধিকতর উত্তম ব্যক্তির আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় যদি বর্তমান ইমামকে বাদ দিয়ে নবাগত উত্তমের দিকে যাওয়া বৈধ করা হয়, তবে তা রাষ্ট্রের শাসনের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করবে, যা শেষ পর্যন্ত চরম বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যাবে এবং প্রজ্ঞাময় আইনদাতা এতে সন্তুষ্ট নন।

অনুরূপভাবে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে নেতা বানানো বৈধ, যদি উম্মাহর মতামত তার ওপর একমত হয় এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে তারা সম্মত না হয়, অথবা যদি অধিকতর উত্তম ব্যক্তিকে নেতা বানানোর পথে কোনো সঙ্গত কারণ বা প্রতিবন্ধকতা থাকে; যেমন তার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা, কিংবা যদি অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটি মানুষের অধিক অনুগত এবং জনগণের হৃদয়ের বেশি কাছাকাছি হয়।

তবে ওলামায়ে কেরাম সেই ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন যেখানে এমন দুইজন ব্যক্তি বিদ্যমান যাদের উভয়ের মধ্যেই ইমামতে উজমার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, কিন্তু তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা উত্তম। আবার উম্মাহ তাদের কাউকে নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হয়নি এবং উত্তমকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার স্বপক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণও নেই...

৫১৯

পৃষ্ঠা 70

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

দ্বাদশ পাঠ

মফদূল (অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তি); এমতাবস্থায় কি তার জন্য অর্থাৎ মফদূলের ইমামতের চুক্তি করা বৈধ হবে, নাকি তা বৈধ হবে না এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্যই ইমামতের চুক্তি করা ওয়াজিব হবে?

এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত এবং সেই মতামতগুলো কিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা উল্লেখ করার আগে আমরা মনে করি যে, এমন কিছু দিক স্পষ্ট করা প্রয়োজন যার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ: ইমামতের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি অংশীদার হতে পারে, কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় গুণাবলির মধ্যে কোনো একটি বিশেষ গুণ—যেমন জ্ঞান বা বীরত্ব—কারও মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারে এবং সে সেই গুণে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এমতাবস্থায় কি সেই গুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মফদূল বা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয হবে, নাকি জায়েয হবে না? উলামাদের মতামতের আলোকে আমরা এটিই স্পষ্ট করব।

মফদূল বা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে উলামাদের মতামত:

আবুল হাসান আল-আশআরী এই মত পোষণ করেছেন যে, ইমামতের শর্তাবলির বিচারে ইমামকে অবশ্যই তার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। ইমামতের গুণাবলিতে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কারও জন্য ইমামত সাব্যস্ত হবে না। যদি কোনো গোষ্ঠী মফদূল বা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির জন্য ইমামতের চুক্তি করে, তবে উক্ত ব্যক্তি ইমামদের পরিবর্তে রাজাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। অর্থাৎ, মনে করা হবে যে তিনি শরয়ি কোনো ভিত্তি ছাড়াই ক্ষমতা দখল করেছেন।

অধিকাংশ ফকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদদের মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মফদূলের ইমামত জায়েয। যতক্ষণ পর্যন্ত মফদূল ব্যক্তি ইমামতের শর্তাবলি পূরণ করবেন, ততক্ষণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতি তার ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না।

মফদূলের ইমামত জায়েয না হওয়ার প্রবক্তাদের দলিলসমূহ:

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা অবস্থায় মফদূলের ইমামত জায়েয নয় বলে যারা মত দিয়েছেন, তারা নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেছেন:

প্রথমত: সাহাবীগণ পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুসারে ইমামতের চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন। চার খলিফার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবু বকর, এরপর উমর, তারপর উসমান এবং এরপর আলী। আবুল হাসান আল-আশআরী এই দলিলটিই পেশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: শরীয়তের আইন বাস্তবায়ন এবং ইসলামের সীমানা রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করাকে বিবেক অন্যায় ও অনুচিত সাব্যস্ত করে।

তৃতীয়ত: শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনসাধারণের আনুগত্য লাভ এবং তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে জনমত গঠনের জন্য অধিকতর উপযোগী।

অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির ইমামত বৈধ প্রবক্তাদের দলীলসমূহ:

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির ইমামত বা নেতৃত্ব বৈধ মনে করেন যারা, তারা নিম্নোক্ত দলীলসমূহ পেশ করেছেন:

প্রথমত: তাঁরা বলেন, উমর (রা.) তাঁর পরবর্তী খিলাফতের জন্য যে ছয়জনকে মনোনীত করেছিলেন, উম্মতের ঐকমত্য অনুসারে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অপেক্ষাকৃত কম শ্রেষ্ঠ উভয় স্তরের ব্যক্তিই ছিলেন। তা সত্ত্বেও উমর (রা.) তাঁদের মধ্যে যে কারো হাতে বাইয়াত গ্রহণ বা চুক্তি সম্পন্ন করা বৈধ করেছিলেন—যদি তাঁরা তাঁর ওপর ঐক্যবদ্ধ হন এবং তাঁর শাসনে জনকল্যাণ দেখতে পান। এটি প্রমাণ করে যে, ইমামকে জনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া শর্ত নয়।

দ্বিতীয়ত: উলামায়ে কেরাম চার খলীফার পর কুরাইশদের মধ্য থেকে মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতো কতিপয় ব্যক্তির ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন; অথচ অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন অনেকে বিদ্যমান ছিলেন যারা ফাতহে মক্কার (মক্কা বিজয়) পূর্বে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন ও জিহাদ করেছেন এবং তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তৃতীয়ত: শ্রেষ্ঠত্ব একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা অনেক সময় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর নিকটও অস্পষ্ট থাকতে পারে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা সম্ভবত বিবাদ সৃষ্টি এবং শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে, উভয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া ওয়াজিব। তবে যখন আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া ওয়াজিব বলছি, তখন আমরা এও বলছি যে: যদি কোনো কারণে তা সম্ভব না হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় ও 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'—যারা উম্মতের প্রতিনিধিত্ব করেন—তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, তবে তাঁর ইমামত বা নেতৃত্ব কার্যকর হয়ে যাবে। আমরা তাঁর ইমামত অসিদ্ধ বা বাতিল বলি না; যাতে তা ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি এবং বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত না হয়।

৫২১

পৃষ্ঠা 72

""

পৃষ্ঠা 73

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ, ইমামের দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ এবং তার কর্তৃত্ব অবসানের কারণসমূহ

পাঠের বিষয়বস্তুসমূহ

প্রথম বিষয়: আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ-এর মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া — ৫২৫
দ্বিতীয় বিষয়: অঙ্গীকার বা উত্তরসূরি মনোনয়নের মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া — ৫৪৩
তৃতীয় বিষয়: বলপ্রয়োগ ও বিজয়ের মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া — ৫৫১
চতুর্থ বিষয়: ইমামের দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ — ৫৫৯
পঞ্চম বিষয়: ইমামের কর্তৃত্বের অবসান, ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানকে তার পদ থেকে অপসারিত করা — ৫৭৭

৫২৩

পৃষ্ঠা 74

""

দ্বাদশ পাঠ
শরয়ি রাজনীতি

আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠা

ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আমরা বলি: অধিকাংশ ফকিহ এবং কালামশাস্ত্রবিদদের অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইমামতের শর্তাবলি বিদ্যমান থাকাই কেবল তার ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এমন একটি পদ্ধতি থাকা আবশ্যক যার মাধ্যমে এই পদটি সুনিশ্চিত হয়। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইমামতের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি উম্মাহর কেবল একজন ব্যক্তির মাঝেই বিদ্যমান এবং তিনি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র, তবুও অধিকাংশ আলেম বলেন যে, কেবল এই কারণেই তার ইমামত প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং তার জন্য আহলে হাল ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) কর্তৃক তাকে নির্বাচন করা অপরিহার্য।

আলেমগণ যখন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবল যোগ্যতাই ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এমন একটি কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন যারা তাকে এই ইমামতের দায়িত্ব অর্পণ করবে, তখন তারা এটি সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন যে, কোন পদ্ধতির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুস্পষ্ট হবে।

ইমামিয়াগণ বলেন: 'নস' (সুস্পষ্ট বর্ণনা বা নির্দেশ) ব্যতীত ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আর কোনো পথ নেই। আর আহলে সুন্নাত বলেন: এর পদ্ধতি হলো আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর বায়আত (আনুগত্যের শপথ) অথবা পূর্ববর্তী ইমামের পক্ষ থেকে কৃত মনোনয়ন বা অঙ্গীকার।

এছাড়া উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের নিকট ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর নির্বাচন ব্যতীত আরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে; সেগুলো হলো: মনোনয়ন এবং শক্তি প্রয়োগ বা বিজয়। আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়—অর্থাৎ আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর নির্বাচন, মনোনয়ন, শক্তি প্রয়োগ বা বিজয় এবং শিয়া ইমামিয়াদের দাবিকৃত ‘নস’ নিয়ে আলোচনা করব। সেই সাথে এগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আলেমদের মতভেদ (যদি থাকে) উল্লেখ করব এবং আমাদের নিকট যেটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হবে তা অগ্রাধিকার প্রদান করব।

শরীয়াহ-ভিত্তিক রাজনীতি

প্রথম পদ্ধতি: আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নির্বাচন:

ফকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদদের অধিকাংশের নিকট ইমামত (রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল পদ্ধতি হলো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নির্বাচন বা তাদের বায়আত। সুতরাং ইমামের মৃত্যু কিংবা পদচ্যুতির কারণে যখন ইমামতের পদটি শূন্য হয়, তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর প্রতিনিধিত্বে উম্মতের ওপর আবশ্যিক হয়ে যায় এমন ব্যক্তিদের অবস্থা যাচাই-বাছাই করা যারা এই পদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। অতঃপর তারা যাকে শর্তাবলি পূর্ণকারী হিসেবে দেখবেন, তার কাছে নিজেদের ইমাম হিসেবে বায়আত গ্রহণ করবেন।

যদি সে স্থানে শর্তাবলি পূর্ণকারী অন্য কেউ না থাকে, তবে তার ওপর এই পদ গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি তার কাছে এমন কোনো ওজর না থাকে যা তার নিকট পেশকৃত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা প্রদান করে। আর যদি তার এমন কোনো ওজর থাকে যা তাকে এই পদের গুরুদায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করে—যেমনটি শরীয়তের বিধানাবলীতে স্পষ্ট করা হয়েছে—তবে তারা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং বায়আতের ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেবেন, যাতে অযোগ্য কেউ এই বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ না করে।

ইমাম মাওয়ার্দী "আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ" গ্রন্থে বলেন:

“যখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নিকট ইজতিহাদের মাধ্যমে জনগণের মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত হয়, তখন তারা তার নিকট প্রস্তাবটি পেশ করবেন। তিনি যদি তাতে সম্মতি দেন, তবে তারা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের এই বায়আতের মাধ্যমেই ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতঃপর সমগ্র উম্মতের জন্য তার বায়আতে দাখিল হওয়া এবং তার আনুগত্য স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর যদি তিনি ইমামত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং তার ওপর তা গ্রহণ করা অবধারিত না হয়, তবে তাকে বাধ্য করা হবে না; কারণ এটি পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও নির্বাচনের একটি চুক্তি, এতে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। এমতাবস্থায় তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্য কারো দিকে ফিরে যাওয়া হবে।”

তবে আমরা একটি প্রশ্ন করছি: কেন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের দায়িত্ব একটি বিশেষ গোষ্ঠী যেমন— আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়?

আমরা বলি: ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে গবেষকদের নিকট এটি একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হতে পারে যা ইসলামের ফকীহগণ স্থির করেছেন যে, ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব সাধারণ জনগণের পরিবর্তে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত করা আবশ্যক...

উম্মাহর ব্যক্তিবর্গ; যা বাহ্যিকভাবে এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা দেয় যে, উম্মাহর জনসাধারণের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, অথচ ইমাম তো নিযুক্তই করা হয় তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থসমূহ দেখাশোনার জন্য। সংগত ছিল যে, ইমাম নির্বাচনের দায়িত্বটি জনগণের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা, যাতে এক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্যজনের কোনো পার্থক্য না থাকে; যেন এই নির্বাচনটি জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হয়।

চাই এই নির্বাচন সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে হোক, যেমন সাধারণ ভোটাভুটি; অথবা পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে হোক, যেমন জনগণের

দ্বারা নির্বাচিত একটি বিশেষ পর্ষদ বা কমিটির মাধ্যমে ইমাম নির্বাচন করা, যাদের ওপর এই গুরুতর দায়িত্বটি অর্পণ করা হবে। ইমাম নির্বাচনের অধিকারকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কারণ বাহ্যিকভাবে এটি প্রত্যেক নাগরিককে নির্বাচনের অধিকার প্রদানের মূলনীতির পরিপন্থী, যাতে নির্বাচনটি জনগণের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন হয়।

এটি সত্য যে, ইসলাম উম্মাহর সকল সদস্যের ওপর ইমামের বাইআত গ্রহণ এবং তার আনুগত্যে প্রবেশ করা ওয়াজিব করে দেয়, যখন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র চুক্তির মাধ্যমে তার ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ওয়াজিব করার উদ্দেশ্য কেবল অনৈক্যের পথ রুদ্ধ করা, যাতে মানুষের মধ্যে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। এজন্যই উলামায়ে কেরাম বলেছেন: যদি এক অঞ্চলে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র বাইআত সম্পন্ন হয়, তবে তাদের ওপর আবশ্যক হলো অন্যান্য অঞ্চলের 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র সদস্যদের সে সম্পর্কে অবহিত করা।

কেউ কেউ বলেন: "যদি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র কিছু সদস্য কোনো ইমাম নিযুক্ত করেন, তবে বাকিদের ওপর থেকে ইমাম নিযুক্ত করার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায় এবং যাকে তারা নিযুক্ত করেছেন তিনি ইমাম হয়ে যান। তাদের ওপর আবশ্যক হলো পত্রবিনিময় ও বার্তার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা; যেন অন্যরা অন্য কোনো ইমামকে নিয়ে ব্যস্ত না হয় যেহেতু দায়িত্বটি পালন হয়ে গেছে এবং যাতে ফিতনা সৃষ্টি না হয়। সুতরাং উম্মাহর অবশিষ্ট সদস্যদের বাইআত না করা ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না; কারণ কেবল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র বাইআতের মাধ্যমেই চুক্তিটি সম্পন্ন হয়ে যায়।"

আর এই চুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সহিহ বা বৈধ হবে না যতক্ষণ না 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি' ইমামের বাইআত করবে। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইমামের মৃত্যু বা তাকে পদচ্যুত করার পর এমন একদল লোক একত্রিত হলো যারা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তারা চুক্তি করল...

জনসাধারণের মধ্য হতে কোনো একজন ব্যক্তির নিকট কৃত বায়াত বা আনুগত্যের শপথের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই বায়াতের এমন কোনো শরয়ী বৈশিষ্ট্য নেই যা উম্মাহর বাকি সদস্যদেরকে সেই ব্যক্তির আনুগত্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করে যার নিকট ওই গোষ্ঠী বায়াত গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের দায়িত্ব একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত করার আবশ্যকতা বিষয়ক ইসলামী নীতিটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় আদর্শগত অর্থটি ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের প্রথমেই বলতে হবে: আমরা যদি সত্যিই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সর্বোত্তম পদ্ধতিটি সন্ধান করি, তবে আমাদের অবশ্যই দুটি বিষয় মেনে নিতে হবে:

প্রথম বিষয়: রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের দায়িত্ব কেবল তাদের ওপরই ন্যস্ত করা উচিত যাদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বভার গ্রহণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা বিদ্যমান। আর এই সক্ষমতা কেবল তখনই অর্জিত হয় যখন এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ শর্ত ও গুণাবলী আবশ্যক করা হয়। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধান কেবল এমন ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা হয় যার মধ্যে ওই বিশেষ শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে যা তাকে এই পদের গুরুভার বহনে সক্ষম করে তোলে, এবং সেগুলো আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আমরা বলি: রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের দায়িত্বটি কেবল এমন ব্যক্তিদের ওপর অর্পণ করা অপরিহার্য ছিল যাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা রয়েছে যারা এই শর্তগুলো পূরণ করেছে এবং যারা তা পূরণ করেনি তাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় বিষয়: সংসদীয় সংগঠনগুলো সমগ্র জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে—এই দাবি করা সঠিক নয়; চাই সেই জাতি জ্ঞান এবং রাজনৈতিক সচেতনতার উচ্চ স্তরে পৌঁছে থাকুক কিংবা এখনও সেই স্তরে না পৌঁছাক—তা বেশ কিছু কারণে:

প্রথম কারণ: সমগ্র পার্লামেন্ট ভোটারদের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যদি আমরা আমাদের হিসাব থেকে দুই ধরণের ভোটকে বাদ দিই:

প্রথম প্রকার: অনুপস্থিতদের ভোট যারা এই নির্বাচনে তাদের মতামত প্রদান করেনি। এই অনুপস্থিত ব্যক্তিরা প্রতিটি নির্বাচনে বাকি ভোটারদের তুলনায় একটি বড় সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে এবং বেশিরভাগ দেশে এদের সংখ্যা মোট ভোটার সংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি পৌঁছায়।

দ্বিতীয় প্রকার: ব্যর্থ ভোটসমূহ; অর্থাৎ সেই সকল ভোট যা এমন প্রার্থীরা লাভ করেছে যারা এই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি। এই দুই প্রকারের ভোটের সমষ্টি একটি বিশাল সংখ্যা গঠন করে, যা অবশিষ্ট ভোটের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে, যেমনটি পরিসংখ্যান দ্বারা প্রতীয়মান হয়; চাই তা বাধ্যতামূলক ভোটদান পদ্ধতি অনুসরণকারী দেশ হোক কিংবা এই পদ্ধতি অনুসরণ না করা দেশ হোক।

এর ভিত্তিতে, পার্লামেন্ট ভোটারদের মোট সংখ্যার তুলনায় কেবল একটি নগণ্য সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ফলস্বরূপ, এটি উম্মাহর সামগ্রিক প্রকৃত ঝোঁক বা অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে না। এর পাশাপাশি এটিও লক্ষণীয় যে, অনেক দেশে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা গুটিকয়েক নেতা ও রাজনীতিবিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, যারা তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুগামী করে তাদের পরিচালিত করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশি সেই জনসাধারণের ঝোঁকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না যাদের তারা প্রতিনিধিত্ব করেন, যদিও তারা মিথ্যা দাবি করেন যে তারা উম্মাহর জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন।

দ্বিতীয় কারণ: সংসদীয় সংগঠনগুলো সমগ্র জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে—এই দাবির অসারতার অন্যতম কারণ হলো: অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনের কলুষতা ও দুর্নীতি:

নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং এতে কারো হস্তক্ষেপ না থাকার বিষয়ে যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবে তা জালিয়াতি, জনগণকে ধোঁকা দেওয়া, ঘুষের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা এবং প্রবঞ্চনার মতো নানাবিধ অবৈধ পন্থা অবলম্বন থেকে মুক্ত থাকে না। এর মূল উদ্দেশ্য থাকে জনগণের ভোট কবজা করা, যা নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয় কারণ: আমরা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে, নির্বাচনসমূহ স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এবং উপরে বর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই সম্পন্ন হয়, আর আমরা যদি এটিও ধরে নেই যে পার্লামেন্ট প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ভোটারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, তবুও আমরা এই দাবি মেনে নিতে পারি না যে: পার্লামেন্ট সর্বক্ষণ উম্মাহর জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে; কারণ সময়ের ব্যবধানে...

জনসাধারণের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদ এবং তাদের ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো এই দাবিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে যে, সংসদ (পার্লামেন্ট) নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে স্বল্প সময়ের জন্য তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে সংসদ সর্বদা উম্মাহর আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে—এই দাবিটি মূলত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর এক প্রকার আধিপত্য বিস্তার ছাড়া আর কিছুই নয় যাদের হয়ে তারা প্রতিনিধিত্ব করছে।

আমরা যা আলোচনা করেছি তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, সংসদীয় ব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনমতের প্রতিফলন ঘটায়—এই দাবিটি স্বীকৃত নয়; যার কারণসমূহ আমরা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি। সুতরাং পূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট এটি প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে নির্ধারণ করা হলো এক ধরণের আদর্শিক বিষয় যা ইসলাম তার বিধানসমূহের মাধ্যমে কামনা করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পক্ষ বা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী থাকবে যাদেরকে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বলা হয়, তারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবেন। এটিই হলো মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি মানবরচিত আইন ও নির্বাচন পদ্ধতি—যার ব্যর্থতা আমরা পূর্বে তুলে ধরেছি—তার চেয়ে বহুগুণ শ্রেয়।

কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনকারী এই গোষ্ঠীর সদস্যরা কি নির্বাচিত হবেন, নাকি উম্মাহর মাঝে তাদের সুখ্যাতি, তাদের মর্যাদা ও জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের খবর ছড়িয়ে পড়াই যথেষ্ট হবে? এটি ফকীহদের (আইনবিদদের) মধ্যকার মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রপতিত্ব অন্যান্য চুক্তির ন্যায় একটি চুক্তি:

আমাদের এখানে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের ফকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, 'ইমামত' (নেতৃত্ব) হলো অন্যান্য চুক্তির ন্যায় একটি চুক্তি যা দুই পক্ষের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে উম্মাহ হলো প্রথম পক্ষ এবং রাষ্ট্রপতি বা ইমাম হলেন দ্বিতীয় পক্ষ। সুতরাং ইমামত হলো পারস্পরিক সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি প্রকৃত চুক্তি, যা উম্মাহ এবং ইমামের মধ্যে বিদ্যমান। এর দাবি অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইমাম বা রাষ্ট্রপতির ওপর আবশ্যক হলো পথ চলা...

ইসলামের শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা। আর প্রথম পক্ষ অর্থাৎ উম্মতের ওপর ওয়াজিব হলো,

শরীয়তের আদেশ ও নিষেধের পরিপন্থী নয় এমন সকল ক্ষেত্রে শাসকের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা প্রদর্শন করা।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ যখন স্পষ্ট করেছেন যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক তাদের মধ্যকার একটি চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তখন এর মাধ্যমে তারা আইনি-রাজনৈতিক গবেষণায় পশ্চিমা চিন্তাধারাকে ছাড়িয়ে গেছেন। কেননা ইউরোপের দৃষ্টিতে যাকে আধুনিক গণতন্ত্রের জনক মনে করা হয়, সেই 'জঁ-জ্যাক রুসো' তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে—যা ফরাসি বিপ্লবের নেতাদের কাছে ইঞ্জিলের সমতুল্য ছিল—এই তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন যে: "শাসক উম্মতের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন, যা তাদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে হয়ে থাকে।"

প্রকৃতপক্ষে রুসোর এই তত্ত্বের বহু শতাব্দী পূর্বেই ইসলামী তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। যদি ইসলামী চিন্তাবিদগণ তার এবং অন্যদের পূর্বেই শাসক ও শাসিতের মধ্যকার চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন, তবে তারাই এই গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের অগ্রপথিক। বিশেষ করে রুসো যে চুক্তির কথা বলেছেন, তা প্রাচীন যুগে ঘটেছে বলে নিছক কল্পনা করা হয় এবং এর স্বপক্ষে কোনো বাস্তব ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে, ইসলামী চিন্তাবিদগণ যে চুক্তির কথা বলেছেন, তা একটি সুনিশ্চিত বাস্তব চুক্তি, যা খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং উম্মতের বায়আত (আনুগত্যের শপথ) ছিল এই চুক্তি বাস্তবায়নের বাস্তব রূপ।

অন্যদিক থেকে, ইসলামী তত্ত্বে এমন নয় যে ব্যক্তিবর্গ তাদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার কোনো অংশ ত্যাগ করেছে; বরং আমাদের রয়েছে এক আদিষ্ট উম্মত, যারা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে। আর প্রতিনিধিত্বের (ওকালত) ক্ষেত্রে মালিকানা প্রদান করা হয় না এবং এতে মালিকানার অবকাশও নেই। বায়আত হলো এমন একটি চুক্তি যা শাসককে একটি বিশেষ সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ করে এবং তার দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং সে যদি চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলে, তবে শাসিতদের ওপর তার আনুগত্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে যদি তার জন্য নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে এবং শর্তের পরিপন্থী কাজ করে, তবে সে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই প্রতিনিধিত্ব থেকে বিচ্যুত হবে এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে অথবা যে জনগণ তাকে নিয়োগ করেছিল তারা তাকে অপসারণ করবে।

৫৩১

দ্বাদশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

বাইয়াতের অর্থ:

ইবনে খালদুন "বাইআত"-এর অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন:

"বাইআত হলো আনুগত্যের অঙ্গীকার। বাইআত গ্রহণকারী ব্যক্তি তার আমিরের সাথে এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে, সে নিজের এবং মুসলিমদের বিষয়াবলির কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্তের ভার তার হাতে সোপর্দ করবে। কোনো বিষয়ে তার সাথে বিবাদ করবে না এবং আমীর তাকে যা কিছুর নির্দেশ প্রদান করবেন, তা তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ, তাতে সে তার আনুগত্য করবে। প্রাচীনকালে তারা যখন আমিরের সাথে বাইআত করত এবং তাদের অঙ্গীকার দৃঢ় করত, তখন তারা তাদের হাত আমিরের হাতের ওপর রাখত; এই অঙ্গীকারকে নিশ্চিত করার জন্য। এটি যেহেতু বিক্রেতা ও ক্রেতার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, তাই একে 'বাইআত' (ক্রয়-বিক্রয়) নামকরণ করা হয়েছে।"

পরবর্তীতে 'বাইআত' শব্দটি রূপক অর্থে ইমামের প্রতি সন্তুষ্টি এবং তার আনুগত্য প্রকাশে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। যখন লোকেরা কারো প্রতি সন্তুষ্ট হতো এবং তার আনুগত্য মেনে নিত, তখন রূপকভাবে বলা হতো যে: তারা তাকে ইমাম হিসেবে বাইআত করেছে। এই কারণে ফকিহ ও কালামশাস্ত্রবিদগণ যখন বাইআত নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তারা এর দ্বারা সন্তুষ্টি ও আনুগত্যই

উদ্দেশ্য নেন এবং তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বাইআত কার্যকর হওয়ার জন্য করমর্দন বা হাত মেলানো শর্ত নয়।

বাইআত সহিহ হওয়ার শর্তাবলি:

বাইআত সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। আমরা নিচে সেই শর্তগুলো উল্লেখ করব এবং কোনো শর্তে মতভেদ থাকলে তাও আলোচনা করব। সেগুলো হলো:

প্রথম শর্ত: যার অনুকূলে বাইআত গ্রহণ করা হচ্ছে (রাষ্ট্রপ্রধান), তার মধ্যে বাইআতের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা। যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এমন ব্যক্তি যার মধ্যে এই শর্তগুলোর কোনো একটির অভাব রয়েছে, তার নেতৃত্ব বৈধ হবে না। তবে জরুরি অবস্থার (জরুরত) প্রেক্ষাপট ভিন্ন, যেমন—বিজয় অর্জন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা; বর্তমান যুগে যাকে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করেছেন যে, এর মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে, যদি এই পদের যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূর্ণ না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনের (জরুরত) প্রেক্ষিতে কতিপয় শর্ত শিথিল করা বৈধ। ফলে তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে যোগ্য তাকেই শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হবে, এরপরে যিনি যোগ্য তাকে। যাতে করে কালপরিক্রমা এমন কোনো শাসক থেকে শূন্য না থাকে যিনি দ্বীন রক্ষা এবং দুনিয়ার শাসন পরিচালনা করবেন।

দ্বিতীয় শর্ত: যারা শাসকের জন্য বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) সম্পাদন করবেন, তাদের অবশ্যই ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও কার্যনির্বাহী পরিষদ) হতে হবে। যদি তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা সম্পাদন করে, তবে তা কার্যকর হবে না।

তৃতীয় শর্ত: যার জন্য নেতৃত্ব স্থির করা হয়েছে তাকে এই পদ গ্রহণ করতে হবে। যদি তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তবে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তাকে এর জন্য বাধ্য করা যাবে না।

চতুর্থ শর্ত: বাইয়াতের সাক্ষী রাখা। এটি এমন এক শর্ত যার ব্যাপারে তিনটি মতভেদ রয়েছে: প্রথমত, বাইয়াতের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় মত: সাক্ষী রাখা আবশ্যক। তৃতীয় মত: বাইয়াত সম্পাদনকারীদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে; যদি তারা একটি বৃহৎ জামাত হয় তবে সাক্ষী রাখা শর্ত নয়, আর যদি বাইয়াত সম্পাদনকারী মাত্র একজন হন তবে সাক্ষী রাখা শর্ত।

পঞ্চম শর্ত: এই চুক্তির সাথে অন্য কোনো চুক্তি যুক্ত হবে না। অর্থাৎ একজনের অধিক ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা বৈধ নয়।

এই শর্তের মতপার্থক্য বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা এটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি যে, চুক্তির একাধিক হওয়া আকস্মিক ও সমাপতন উপায়ে হতে পারে অথবা আকস্মিক ও সমাপতন ব্যতীত অন্য উপায়ে হতে পারে:

প্রথমত: এটি এভাবে হতে পারে যে, ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’-এর বিভিন্ন দল একে অপরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় ছাড়াই কোনো শাসকের জন্য বাইয়াত সম্পাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করল। উদাহরণস্বরূপ, একটি দল এক ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে বাইয়াত প্রদান করল, আর অন্য একটি দল অন্য একজনকে বাইয়াত প্রদান করল। এক দল অপর দলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে

অবগত না থাকার কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। ফলে একাধিক ব্যক্তির বাইয়াত সংগঠিত হয়, যাদের প্রত্যেকেই...

নেতৃত্বের যোগ্য, এমতাবস্থায় আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) উদ্দেশ্যমূলকভাবে একাধিক ব্যক্তির নিকট বায়আত প্রদান না করা সত্ত্বেও দৈবক্রমে ও আকস্মিকভাবে চুক্তি একাধিক হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: একাধিক হওয়া এমনভাবে ঘটে যেখানে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে বায়আতের চুক্তি সম্পাদন করেন।
উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একই ভূখণ্ডে বা রাষ্ট্রে একের অধিক ইমামের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করা বৈধ নয়; চাই সেই একাধিক হওয়াটা আকস্মিক ও দৈবক্রমে ঘটুক অথবা অন্য কোনোভাবে হোক।

তবে যদি এই একাধিক ইমামের বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ঘটে, তবে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন যে, এটি কি বৈধ, নাকি বৈধ নয়?

জমহুর ফকীহ ও উলামাগণ একাধিক ইমাম হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন, এমনকি অঞ্চলগুলো পরস্পর থেকে অনেক দূরে হলেও। অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক কিছু আলিম ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে একাধিক ইমাম থাকা বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দলীল রয়েছে যার ওপর তাঁরা নির্ভর করেছেন।

একাধিক হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে জমহুর উলামার দলীলসমূহ:

জমহুর উলামা অঞ্চলসমূহ দূরে হলেও একাধিক ইমাম হওয়া বৈধ না হওয়ার স্বপক্ষে বেশ কিছু দলীল পেশ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: ইমাম মুসলিম আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন দুইজন খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে পরবর্তীজনকে হত্যা করো।" এই হাদীসটি একাধিক ইমাম হওয়ার অবৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। আর দ্বিতীয় ইমামকে হত্যা করার বিষয়টি তখন আসবে যখন তাকে বায়আত আঁকড়ে না ধরার এবং প্রথম ইমামের প্রতি অনুগত হওয়ার আহ্বান জানানোর পর সে তা অস্বীকার করবে। এমতাবস্থায় সে একজন বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে যাকে হত্যা করা আবশ্যক। হাদীসটির উদ্দেশ্য কেবল তার অনুকূলে বায়আত সম্পন্ন হওয়ার কারণেই তাকে হত্যা করা নয়; কারণ হতে পারে যে সে জানত না যে তার পূর্বে অন্য কোনো ইমামের অনুকূলে বায়আত সম্পন্ন হয়েছে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ - দ্বাদশ পাঠ

দ্বিতীয়ত: তাঁরা ইজমা (ঐকমত্য) দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আর তা হলো, সাহাবীগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, একজনের বেশি ইমাম হওয়া জায়েয নয়। এমনকি আনসাররা যখন শুরুতে প্রস্তাব করেছিলেন যে, তাদের থেকে একজন আমীর এবং মুহাজিরদের থেকে একজন আমীর হবেন, তখন মুহাজিররা তাতে সম্মত হননি। পরবর্তীতে আনসারগণ মুহাজিরদের উত্থাপিত বক্তব্যের সাথে একমত হন, ফলে এটি একটি ইজমায় পরিণত হয়।

তৃতীয়ত: একাধিক ইমাম থাকা বিবাদ ও ঝগড়া-বিবাদের দিকে ধাবিত করে, আর এগুলো দ্বীন ও দুনিয়ার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার কারণ হয়। সুতরাং একাধিক ইমামের অস্তিত্ব দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে অনৈক্যের সৃষ্টি করে, যা জায়েয নয়।

তবে অন্য মতাবলম্বীরা, যারা সংখ্যায় অল্প কিছু আলিম, তাঁরা একাধিক ইমাম থাকা জায়েয বলে মনে করেন। তাঁরা এই মর্মে দলীল পেশ করেন যে, ইমাম নিযুক্ত করা হয় উম্মাহর কল্যাণ সাধনের জন্য। সুতরাং যদি প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে ইমাম থাকেন, তবে প্রত্যেকেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলো অধিকতর উত্তমরূপে পরিচালনা করতে পারবেন; কারণ তখন তাঁর ওপর ন্যস্ত জনকল্যাণমূলক কাজের পরিমাণ কম হবে এবং তাঁর দ্বারা নিযুক্ত গভর্নর, বিচারক ও অন্যান্য কার্যাবলীর তদারকি করাও অধিকতর সুশৃঙ্খল হবে। তাঁরা আরও দলীল পেশ করেন যে, যেহেতু একই সময়ে একাধিক নবী থাকা জায়েয ছিল এবং তা নবুওয়াতকে বাতিল করেনি, তাই ইমামের ক্ষেত্রে এটি জায়েয হওয়া আরও বেশি অগ্রগণ্য; কারণ এটি নবুওয়াতেরই একটি শাখা।

কিন্তু জমহুর আলিমগণ তাঁদের এই মতামত ও দলীলসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই দলীলগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়েছে।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ এবং তাঁদের শর্তাবলী:

আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ—যেমনটি অধিকাংশ আলিম তাঁদের এই নামেই ডাকেন, অথবা "আহলুল ইখতিয়ার"—যেমনটি ইমাম আল-মাওয়ার্দী তাঁদের নামকরণ করেছেন, অথবা "আহলুল ইজতিহাদ"—যেমনটি অন্য কেউ কেউ তাঁদের অভিহিত করেছেন: তাঁরা হলেন উম্মাহর বিশেষ একদল গুণীজন, যাঁদের ওপর উম্মাহর দ্বীনি ও দুনিয়াবী কল্যাণসমূহ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। যার মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামে আযম নির্বাচনও অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং তাঁরাই হলেন সেই ব্যক্তি, যারা এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে এমন ব্যক্তিদের অবস্থা যাচাই-বাছাই করার এবং এ বিষয়ে ইজতিহাদ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। যাকে তাঁরা এই পদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন, তাঁরা তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন।

দ্বাদশ পাঠ
সিয়াসাহ শারইয়্যাহ

আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া এবং আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি নয় এমন

প্রতিটি বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক।

উলামায়ে কেরাম এই জামাতের (গোষ্ঠীর) মধ্যে যেসব শর্ত থাকা আবশ্যক তা স্পষ্ট করেছেন; যাতে তারা উম্মাহর অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। কেননা তারা—যেমন আমরা বলেছি—রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং যখন তারা এই উদ্দেশ্য সাধন করে অথবা তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এটি সম্পন্ন করে, তখন তাদের ওপর থেকে এবং উম্মাহর বাকি সদস্যদের ওপর থেকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করার আবশ্যকতা (ওয়াজিব) রহিত হয়ে যায়। আর যদি তারা এই ওয়াজিব পালন না করে, তবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সকলে গুনাহগার হবে, যেমনটি ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

এই জামাত সমগ্র উম্মাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবেই কেবল ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে। তারা এই নির্বাচনের মাধ্যমে কেবল নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং সমগ্র উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করে। এই কারণেই যখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ইমামের হাতে বায়আত গ্রহণ করে, তখন উম্মাহর বাকি সকল সদস্যের ওপর তাঁর বায়আত গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকা ওয়াজিব হয়ে যায়। উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করেছেন যে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন উলামা, নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে যেকোনো সময় সমবেত করা সহজসাধ্য।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর শর্তাবলি:

ইমাম আল-মাওয়ারদী তাঁর "আল-আহকামুস সুলতানিইয়াহ" কিতাবের ষষ্ঠ পৃষ্ঠা ও তার পরবর্তী অংশে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: নির্বাচকদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্ত তিনটি:

প্রথমটি: এমন ন্যায়পরায়ণতা যা তার সকল শর্তকে শামিল করে।
দ্বিতীয়টি: এমন জ্ঞান (ইলম) যা দ্বারা ওই ব্যক্তিকে চেনা সম্ভব যিনি ইমামতের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি অনুযায়ী নেতৃত্বের যোগ্য।
তৃতীয়টি: এমন প্রজ্ঞা ও হিকমাহ যা ইমামতের জন্য সবচেয়ে যোগ্য এবং জনস্বার্থ পরিচালনায় অধিক দক্ষ ও পারদর্শী ব্যক্তিকে নির্বাচনে সহায়ক হয়।

শরয়ি রাজনীতি
দ্বাদশ পাঠ

মাওয়ার্দি কর্তৃক বর্ণিত এই শর্তসমূহ সেই স্বরূপ নির্ধারণ করে যা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র (সমাধান ও চুক্তিকারী ব্যক্তিবর্গ) প্রত্যেকের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) সম্পর্কে আমরা নেতৃত্বের শর্তাবলি আলোচনার সময় বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় শর্তটি হলো, ব্যক্তিকে এমন জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে যা তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি সম্পর্কে অবগত করবে, যাতে করে তিনি তাদের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন যাদের মাঝে সাধারণ নেতৃত্বের শর্তাবলি বিদ্যমান এবং যাদের মাঝে তা নেই।

তৃতীয় শর্তটি হলো এমন প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি থাকা যার দ্বারা নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তি এবং অক্ষম ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করা যায়। আর এটি পূর্ববর্তী শর্ত থেকে ভিন্ন; কেননা এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব যার নিকট নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিবেচিত জ্ঞান বিদ্যমান, কিন্তু তার কাছে নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি এবং উম্মাহর স্বার্থ রক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করার মতো পর্যাপ্ত প্রজ্ঞা নেই।

রাজধানীতে অবস্থানকারী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র কি—অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের শহরের বাসিন্দাদের কি—অন্যদের ওপর

কোনো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে?

ইমাম মাওয়ার্দি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: "ইমাম যে শহরে থাকেন সেই শহরের অধিবাসীদের জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর এমন কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই যা তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে। বরং ইমামের মৃত্যুর খবর তাদের কাছে আগে পৌঁছায় বলে তারাই ইমামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার (বাইআত) দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়া সাধারণত যারা খিলাফতের যোগ্য তারা তাদের শহরেই অবস্থান করে থাকেন।"

যেহেতু মাওয়ার্দি স্পষ্ট করেছেন যে, শরয়ি বিধান রাজধানীতে অবস্থানকারী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'কে কোনো বিশেষ মর্যাদা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে কোনো অগ্রাধিকার প্রদান করেনি, বরং এটি প্রথাগতভাবে চলে আসছে যে তারাই এ কাজ সম্পাদন করে থাকে; তাই রাজধানীর বাইরে অবস্থানকারী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'র কোনো দল যদি রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তবে সেই নির্বাচন শরয়িভাবে সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে।

৫৩৭

পৃষ্ঠা ৪৪

রাজধানীতে অবস্থানকারী এবং অন্যান্য অঞ্চলের সকল আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর (সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ) ওপর সেই নেতার আনুগত্য করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ (বায়আত) গ্রহণ করা আবশ্যক, যাঁকে এই জামাতটি (রাজধানীর দলটি) বায়আত করেছে।

যদি কোনো কোনো যুগে এমন প্রথা প্রচলিত থেকে থাকে যে, নেতার শহরে অবস্থানরত আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-ই মূলত নেতৃত্বের চুক্তি সম্পাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন, তবে জেনে রাখা উচিত যে, প্রথা কোনো চিরস্থায়ী বিষয় নয়; বরং পরিবেশের পরিবর্তন ও যুগের আবর্তনে তা পরিবর্তিত হয়। বর্তমান আধুনিক যুগে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর অভাবনীয় উন্নতি নেতার শহরে অবস্থানকারীদের জন্য নেতার মৃত্যু সংবাদ আগে জানার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা অগ্রাধিকার অবশিষ্ট রাখেনি। বরং যোগাযোগ সরঞ্জামের প্রাচুর্য এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষিপ্রতা জনসাধারণের মাঝে, এমনকি সমগ্র বিশ্বে যেকোনো সংবাদ প্রচার করাকে একটি অত্যন্ত সহজ কাজে পরিণত করেছে, যার ফলে প্রচার ও প্রকাশের মুহূর্তেই তা দূরের ও কাছের সকল মানুষ সমানভাবে জানতে পারে।

অধিকন্তু, বর্তমানে এই দাবি করার কোনো সুযোগ নেই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তিবর্গ কেবল নেতার শহরেই বিদ্যমান থাকেন; কারণ তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং তাঁদের উপস্থিতি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের শহরেই সীমাবদ্ধ নয়।

নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর প্রয়োজনীয় সংখ্যা:

ইমামত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর কতজন সদস্যের প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। আমরা তা নিচে উল্লেখ করছি:

প্রথম মত: ইমামত কেবল সমগ্র জাতির ঐকমত্যের (ইজমার) মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; যাতে করে নেতার প্রতি সন্তুষ্টি সর্বজনীন হয় এবং তাঁর ইমামত মেনে নেওয়া একটি সর্বসম্মত বিষয়ে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মত: ইমামত কেবল আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের বায়আতের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় মত: তাঁদের মতে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো চল্লিশ জন; কারণ ইমামতের চুক্তি জুমার নামাজের

চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর বিষয়। আর জুমা যেহেতু চল্লিশ জনের কম সদস্যে সংঘটিত হয় না, সেহেতু ইমামের বায়আত এই সংখ্যার ক্ষেত্রে আরও বেশি অগ্রাধিকার রাখে।

শারয়ী রাজনীতি
দ্বাদশ পাঠ

চতুর্থ মত: এটি বলে যে, ইমামত (নেতৃত্ব) পাঁচজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয় যারা এটি সম্পাদনের জন্য সমবেত হন, অথবা তাদের মধ্যে একজন বাকি চারজনের সম্মতিতে এটি সম্পাদন করেন। এই মতের প্রবক্তাগণ দুটি বিষয় দ্বারা দলিল পেশ করেছেন:

প্রথম বিষয়: আবু বকর (রা.)-এর বায়আত পাঁচজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল যারা তাঁকে বায়আত প্রদান করেছিলেন, অতঃপর সাধারণ মানুষ তাঁদের অনুসরণ করেছিল। সেই পাঁচজন ব্যক্তি হলেন: উমর বিন আল-খাত্তাব, আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ, উসাইদ বিন হুদাইর, বিশর বিন সা'দ এবং আবু হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম — আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

দ্বিতীয় বিষয়: উমর (রা.) যখন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে উত্তরসূরি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি ছয়জন সাহাবীর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যাতে তাঁরা পাঁচজনের সম্মতিতে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করেন।

পঞ্চম মত: এটি বলে যে, বায়আত সম্পন্ন হওয়ার জন্য চারজন থাকাই যথেষ্ট; কারণ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে চারজনই হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

ষষ্ঠ মত: এটি বলে যে, তিনজনের বায়আতের মাধ্যমে ইমামত গঠিত হয়; কারণ তিনজনে একটি জামাআত বা দল গঠিত হয়।

সপ্তম মত: এটি বলে যে, ইমামত গঠিত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো পরহেযগার ও ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি; যেমন বিবাহের চুক্তি, যা দুইজন সাক্ষী ছাড়া বৈধ হয় না।

অষ্টম মত: এটি বলে যে, উম্মতের সেই সকল আলিমের দ্বারা ইমামত গঠিত হয় যারা ইমাম নির্বাচনের স্থানে উপস্থিত থাকেন, এবং এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই।

নবম মত: এটি বলে যে, ইমামত সম্পন্ন হওয়ার জন্য মাত্র একজনের বায়আত প্রদানই যথেষ্ট, তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে:

প্রথম শর্ত: যিনি এই চুক্তি সম্পাদন করবেন তাঁকে অবশ্যই মুজতাহিদ আলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
দ্বিতীয় শর্ত: এই চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই তাকওয়া বা পরহেযগারী গুণে গুণান্বিত হতে হবে।
তৃতীয় শর্ত: তাঁকে প্রজ্ঞাবান ও সুচিন্তিত পরিকল্পনাকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
চতুর্থ শর্ত: উম্মতের সাধারণ জনগণের নিকট তিনি সুপ্রসিদ্ধ হতে হবে।

পঞ্চম শর্ত: বায়আত বা আনুগত্যের শপথ যাঁর জন্য সম্পাদিত হবে, তাঁকে গুণাবলি এবং ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলির ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হতে হবে।

অতঃপর, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর কতজন সদস্যের উপস্থিতিতে ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হবে, সে বিষয়ে ফকীহগণ যে সকল মত ও দলিলের ওপর নির্ভর করেছেন, তা হলো এগুলো।

এখন প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রপ্রধানের পদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বর্ণিত মতগুলোর মধ্যে আমরা কোনটির প্রতি অধিক আগ্রহী বা ঝুঁকে আছি?

আমরা কোন মতটির প্রতি ঝুঁকে আছি তা বর্ণনা করার আগে আমরা প্রশ্ন করতে চাই—কিভাবে এটি কল্পনা করা সম্ভব যে, মাত্র একজনের বায়আতের মাধ্যমে ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যাবে? অথচ ইমামের প্রতি একজনের বায়আত শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত ও আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই আকাঙ্ক্ষা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর বাকি সদস্যদের মতামত ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না-ও হতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি একজনের মতামতের চেয়ে অনেক বেশি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ, সেই ব্যক্তি মর্যাদায় যত বড়ই হোন না কেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যত প্রসিদ্ধই হোক না কেন। এটি নিঃসন্দেহে এমন একটি বিষয় যার জন্য গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা ও পরামর্শ প্রয়োজন। আর এই কাজগুলোর জন্য আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সাথে যোগাযোগ করা আবশ্যক, যাতে তারা যাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে চান, তাঁর ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ করা যায়।

এ কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর মতামত নেওয়ার পূর্বেই আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে বায়আত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকে একটি ‘ফালতাহ’ (আকস্মিক ও অপরিকল্পিত ঘটনা) হিসেবে গণ্য করেছেন, যার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ মুসলিমদের রক্ষা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জনসমক্ষে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন: "আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, অমুক ব্যক্তি বলেছে—আল্লাহর কসম, যদি উমর ইবনুল খাত্তাব মৃত্যুবরণ করেন, তবে আমি অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করব। কোনো ব্যক্তি যেন এ কথা বলে ধোঁকায় না পড়ে যে, আবু বকরের বায়আত তো একটি ‘ফালতাহ’ ছিল এবং তা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমনই ছিল, কিন্তু আল্লাহ এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। তোমাদের মধ্যে আবু বকরের মতো এমন কেউ নেই যাঁর দিকে (মর্যাদায় ও আনুগত্যে) সবার ঘাড় ঝুঁকে পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করবে, তার কোনো বায়আত গণ্য হবে না; তার জন্যও নয় এবং যার হাতে সে বায়আত হয়েছে তার জন্যও নয়।"

এর থেকে স্পষ্ট হলো যে, বায়আতের মূল নীতি হলো তা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সাথে পরামর্শের পর সম্পন্ন হতে হবে। উমর (রা.) তাঁর কর্মের মাধ্যমে এই মূল নীতির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন, ফলে তা একটি বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ‘ফালতাহ’ বা আকস্মিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিটি হলো:

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর এই কাজটি কোনো স্থায়ী শারয়ী মূলনীতি নয় যা সর্বদা অনুসরণ করা হবে। সুতরাং নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞ পরিষদের (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) পরামর্শ ব্যতীত যদি কেউ এককভাবে কারও আনুগত্যের শপথ (বাইআত) গ্রহণ করে, তবে সে এবং যার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়েছে—তাদের কেউই এই শপথের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আমরা দেখেছি যে, আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) যখন তাঁর পরবর্তী সময়ে মানুষের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য উমর ইবনুল খাত্তাবকে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি প্রবীণ সাহাবীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ পরামর্শ করেছিলেন। আবার যখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ নিজেকে খিলাফতের মনোনয়ন থেকে সরিয়ে নিলেন এবং খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হলো, তখন তিনি টানা তিন দিন খুব একটা না ঘুমিয়েই অতিবাহিত করলেন; তিনি কে ইমামত বা নেতৃত্বের উপযুক্ত হতে পারেন সে বিষয়ে প্রবীণ মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করছিলেন।

যদি একজনের আনুগত্যের শপথের মাধ্যমেই ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যেত, তবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ এত প্রচেষ্টা চালাতেন না এবং তাঁর দৃষ্টিতে কে এই পদের যোগ্য হতে পারেন তা নিয়ে নিভৃতে চিন্তাভাবনা করতে সময় ব্যয় করতেন না। অতঃপর তিনি যখন তাঁর উপযুক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হলেন তখন তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। এর ফলে নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞ পরিষদের অবশিষ্ট সদস্য এবং উম্মতের সাধারণ জনগণের জন্য নতুন খলিফার আনুগত্য করা এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর শপথ গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ যদি মনে করতেন যে নীতিনির্ধারক পরিষদের মাত্র একজন সদস্যের মাধ্যমেই ইমামত সাব্যস্ত হয়, তবে তিনি তাই করতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞ পরিষদের একজনের মাধ্যমে ইমামত সাব্যস্ত হয় না; একারণেই তিনি কে ইমাম হওয়ার যোগ্য তা নির্ধারণে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করার পরিশ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আর এই যুক্তি দেওয়া যে, উমর যখন আবু বকরের (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন তখন সাহাবীরা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন এবং তাতে একমত হয়েছিলেন—তা সঠিক নয়। কারণ এই শপথের ক্ষেত্রে সাহাবীদের উমরের অনুসরণ করা এবং এতে সম্মতি প্রদানের মূল কারণ ছিল আল্লাহর রাসূলের (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) পর আবু বকর খলিফা হওয়ার বিষয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইমামত একজনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার দাবিটি গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে দুই, তিন, চার বা পাঁচজনের মতো অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হওয়ার মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইমামতের বিষয়টি—যেমনটি আমরা বলেছি—এমন কোনো বিষয় নয় যেখানে একজন ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক হতে পারে।

পুরো উম্মত, তবে যদি আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর সদস্য সংখ্যা কমে যায়; তখন প্রয়োজনের তাগিদে অল্প সংখ্যক সদস্যের মাধ্যমে ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা বলব—যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন—দেশের সকল প্রান্তের উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সর্বসম্মত ঐক্য ছাড়া বায়আত শুদ্ধ হবে না। কারণ, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সর্বসম্মত ঐকমত্য ছাড়া যদি ইমামত সাব্যস্ত না হতো, তবে আবু বকর-এর ইমামত শুদ্ধ হতো না। কেননা এটি প্রমাণিত যে, সা'দ বিন উবাদাহ ইমাম হিসেবে আবু বকর-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেননি; বরং তিনি সাকীফার সভা ত্যাগ করেছিলেন ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট অবস্থায়, তিনি কোনো মুহাজিরের হাতে বায়আত গ্রহণে রাজি ছিলেন না। আর আলী বিন আবি তালিব ছয় মাস পর্যন্ত আবু বকর-এর বায়আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন, যেমনটি কিছু ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যদি এটিকেও শর্ত হিসেবে মানি, তবে তা হবে—ইবনে হাজম এর বক্তব্য অনুযায়ী—সাধ্যের অতীত কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা চরম সংকটের চেয়েও কঠিন। আর আল্লাহ তাআলা কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। বরং আমরা এই বিষয়ে বলি যে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বায়আত গ্রহণ করা আবশ্যক।

সারসংক্ষেপ: ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পিত হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর যে সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তার মধ্যে অগ্রগণ্য মতটি হলো: আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এটি সাব্যস্ত হবে। কারণ আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সদস্যরা যত পূর্ণ গুণের অধিকারীই হোন না কেন, তারা মানুষ এবং তারা নিষ্পাপ নন। সুতরাং কুপ্রবৃত্তি এবং মন্দের নির্দেশদাতা নফসের পক্ষ থেকে আমরা নিরাপদ নই। এটি হওয়া সম্ভব যে, অল্প সংখ্যক লোক অযোগ্য কোনো ব্যক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে এবং তার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এই আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকতে অথবা নিরাপত্তার ধারণা পেতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সময় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শর্তারোপ করা আবশ্যক।

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কোন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেদিকে লক্ষ্য করা শুদ্ধ নয়। সুতরাং আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের বায়আত শুদ্ধ হবে, যদিও তাদের মধ্যে রাজধানীর একজন ব্যক্তিও না থাকে। কারণ এই কথা বলা যে—ইমামত চুক্তির বৈধতার জন্য বায়আত প্রদানকারীদের অবশ্যই ইমামের শহরে উপস্থিত আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হতে হবে—এটি একটি ভিত্তিহীন দাবি যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

অঙ্গীকার বা মনোনয়নের মাধ্যমে ইমামত নির্ধারণ

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বা ইমামতে উজমা (মহা-ইমামত) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: অঙ্গীকার বা মনোনয়ন (আল-আহদ)।

বর্তমান ইমাম কর্তৃক তার পরবর্তী ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করা হলো ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার অন্যতম একটি পদ্ধতি যা আলিমগণ কর্তৃক স্বীকৃত। তাই আমরা বলতে পারি: ফকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদগণ 'আল-আহদ' বা মনোনয়নকে ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার একটি পদ্ধতি হিসেবে আলোচনা করেছেন, যেখানে বর্তমান ইমাম তার পরবর্তী ইমাম হওয়ার জন্য নিজের পছন্দমতো কোনো ব্যক্তির নিকট নেতৃত্ব হস্তান্তরের অঙ্গীকার করেন।

ইমাম আল-মাওয়ার্দী বলেন: "পূর্বসূরির মনোনয়নের মাধ্যমে ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার বৈধতার বিষয়ে ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সঠিকতার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার কারণ হলো দুটি ঘটনা, যা মুসলিমগণ অনুসরণ করেছেন এবং কেউ তার বিরোধিতা করেননি:

প্রথমত: আবু বকর (রা.) উমর (রা.)-কে মনোনীত করেছিলেন এবং মুসলিমগণ উমর (রা.)-এর পরবর্তী ইমামতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: উমর (রা.) এটি (পরবর্তী ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব) শুরা বা পরামর্শ সভার সদস্যদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই মনোনয়নের বৈধতায় বিশ্বাস রেখে তা গ্রহণ করেছিলেন এবং অবশিষ্ট সাহাবীগণ এ থেকে বাইরে ছিলেন।"

আলিমগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ইমাম যখন তার পদে আসীন হন, তখন তার ওপর জনগণের দ্বীনি ও দুনিয়াবি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর যেহেতু তার জীবদ্দশায় তাদের কল্যাণ বিবেচনা করা ওয়াজিব, সেহেতু তার মৃত্যুর পরবর্তী কল্যাণের দিকে নজর দেওয়াও এরই অনুগামী।

এখন আমরা অঙ্গীকার বা মনোনয়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা বলি: ইমাম কেবল একজনকেও মনোনীত করতে পারেন, আবার একাধিক ব্যক্তিকেও মনোনীত করতে পারেন। আমরা এই উভয় অবস্থা সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

দ্বাদশ পাঠ

প্রথম অবস্থা: অঙ্গীকার (মনোনয়ন) কেবল একজনের প্রতি হওয়া। এমতাবস্থায় অঙ্গীকারটি সঠিক হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া অপরিহার্য:

প্রথম শর্ত: ইমামের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি মনোনীত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা; অঙ্গীকার প্রদানের সময় থেকে শুরু করে অঙ্গীকারকারী ইমামের মৃত্যুর পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় পর্যন্ত। এর ভিত্তিতে, যদি অঙ্গীকার প্রদানের সময় তার মধ্যে এই শর্তসমূহ বিদ্যমান না থাকে—যেমন সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাপাচারী হয়—তবে অঙ্গীকারটি শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে, যদি অঙ্গীকারের সময় সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাপাচারী থাকে এবং পরবর্তীতে অঙ্গীকারকারী ইমামের মৃত্যুর সময় সে প্রাপ্তবয়স্ক (যোগ্য) হয়, তবে কেবল সেই অঙ্গীকারের কারণে সে মুসলমানদের ইমাম হবে না; বরং আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক তাকে খিলাফতের বায়আত প্রদান করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় শর্ত: মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক সেই অঙ্গীকার গ্রহণ করা। যদি মনোনীত ব্যক্তি এই অঙ্গীকার গ্রহণে অসম্মতি জানায়, তবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর ওপর অন্য কাউকে বায়আত প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

তৃতীয় শর্ত: অঙ্গীকারকারী ইমাম যখন এই অঙ্গীকার বা মনোনয়ন প্রদান করবেন, তখনো যেন তাঁর নিজের ইমামতি বহাল থাকে। সুতরাং যদি তিনি এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যা তাঁকে ইমামতি থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং এমতাবস্থায় তিনি ইমামতির অঙ্গীকার করেন, তবে সেই চুক্তি সঠিক হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রতি অঙ্গীকার করা। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে:

প্রথম ধরন: ইমাম কর্তৃক ইমামতির বিষয়টি তাঁদের মাঝে পরামর্শের (শূরা) ভিত্তিতে ন্যস্ত করা, যেখানে কাউকে কারো ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না। এমতাবস্থায় আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর কর্তব্য হলো যাঁদের ওপর পরামর্শের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করা; অথবা তাঁরা সকলে মিলে নিজেদের মধ্য থেকে একজনের অনুকূলে নিজেদের অধিকার ত্যাগ করবেন।

ওলামায়ে কেরাম এর সপক্ষে উমর (রা.)-এর কাজের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন, যা তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামও তখন অনুরূপ করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁকে বলা হয়েছিল: "হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি অসিয়ত করুন এবং উত্তরসূরি মনোনীত করুন।" তখন তিনি বললেন: "আমি দেখছি না..."

পৃষ্ঠা 95

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দলটির ওপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন, তাদের চেয়ে এই বিষয়ের (নেতৃত্বের) জন্য অধিক যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, তখন এই দলটি একত্রিত হলেন যাদের ওপর ফয়সালার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। আব্দুর রহমান বিন আওফ বললেন: "তোমরা তোমাদের এই বিষয়টি তোমাদের মধ্যকার তিনজনের ওপর ন্যস্ত করো।" তখন যুবাইর বললেন: "আমি আমার বিষয়টি আলীর নিকট সোপর্দ করলাম।" তালহা বললেন: "আমি আমার বিষয়টি উসমানের নিকট সোপর্দ করলাম।" এবং সা'দ বললেন: "আমি আমার বিষয়টি আব্দুর রহমান বিন আওফের নিকট সোপর্দ করলাম।"

অতঃপর আব্দুর রহমান বিন আওফ আলী ও উসমানকে বললেন: "আপনাদের মধ্যে কে এই দায়িত্ব থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে চান? যেন আমরা সেই ব্যক্তির ওপরই বিষয়টি ন্যস্ত করি। আল্লাহ এবং ইসলামই সাক্ষী যে, তিনি অবশ্যই তাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাকেই নির্বাচন করবেন।" তখন উভয় মুরুব্বী নীরব থাকলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ বললেন: "আপনারা কি এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আমাকে দেবেন? আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খুঁজে নিতে কোনো ত্রুটি করব না।" তারা উভয়ে বললেন: "হ্যাঁ।"

এরপর তিনি আলীর হাত ধরলেন এবং তাকে বললেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আপনার আত্মীয়তা এবং ইসলামের ক্ষেত্রে আপনার অগ্রগামিতা সম্পর্কে আপনি যা জানেন তা তো আছেই। আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনাকে দায়িত্ব প্রদান করি তবে কি আপনি ইনসাফ করবেন? আর যদি আমি উসমানকে আমির নিযুক্ত করি তবে কি আপনি তার কথা শুনবেন এবং আনুগত্য করবেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি উসমানের সাথে একান্তে বসলেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা বললেন। এরপর আব্দুর রহমান বিন আওফের সিদ্ধান্ত উসমানের ওপর স্থির হলো। তিনি বললেন: "হে উসমান, আপনার হাত তুলুন।" অতঃপর তিনি তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন এবং আলীও তার নিকট বায়আত হলেন। এরপর সাধারণ মানুষ ধারাবাহিকভাবে তার নিকট বায়আত গ্রহণ করল।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ইমাম কর্তৃক ইমামত বা নেতৃত্বের দায়িত্ব একের অধিক ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা এবং তাদের মধ্যে একটি ক্রম নির্ধারণ করে দেওয়া। যেমন তিনি বলবেন: "যদি অমুক মারা যায় তবে অমুক হবে ইমাম, আর যদি সে-ও মারা যায় তবে অমুক হবে ইমাম।" এমতাবস্থায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সেই ক্রম অনুযায়ী ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত করা ওয়াজিব হবে।

এর স্বপক্ষে এই দলিল পেশ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারিসাহকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন এবং

বলেছিলেন: "যদি যায়েদ শহীদ হয় তবে জাফর বিন আবি তালিব দায়িত্ব পালন করবে, যদি জাফর শহীদ হয় তবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা হবে, আর যদি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও শহীদ হয় তবে মুসলিমরা তাদের পছন্দমতো কোনো ব্যক্তিকে নেতা বানিয়ে নেবে।" অতঃপর যায়েদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং শহীদ হলেন। এরপর জাফর ঝান্ডা গ্রহণ করলেন এবং তিনিও শহীদ হলেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং তিনিও শহীদ হলেন। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের মধ্য থেকে খালেদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করলেন।

দ্বাদশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

যাদের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাদের প্রকারভেদ এবং তাদের প্রত্যেকের বিধান:

যাদের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তারা তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: যাঁর নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে তিনি সন্তান অথবা পিতা হওয়া। ইমাম কি এককভাবে তাদের পক্ষে আনুগত্যের শপথ (বাইআত) সম্পন্ন করতে পারেন? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের তিনটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ইমাম তাদের কোনো একজনের জন্য এককভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে পারবেন না—অর্থাৎ তাঁর সন্তান বা পিতার জন্য নয়। বরং এই বাইআতের ক্ষেত্রে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি' (নীতি-নির্ধারক ব্যক্তিবর্গ)-এর সম্মতি থাকা অপরিহার্য। কারণ, ইমামের পক্ষ থেকে এটি একটি চারিত্রিক প্রশংসা (তাযকিয়্যাহ), যা সাক্ষ্য প্রদানের সমতুল্য; আর উম্মতের ওপর তাঁকে নিযুক্ত করা বিচারিক রায়ের সমতুল্য। অথচ একজন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর পিতা বা সন্তানের অনুকূলে সাক্ষ্য দেওয়া বা বিচারিক রায় প্রদান করা বৈধ নয়; কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবেই তাদের উভয়ের প্রতি অনুরাগী থাকে।

দ্বিতীয় মত: এটি বলে যে, ইমাম 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'-এর পরামর্শ ছাড়াই পিতা বা সন্তানের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। কারণ তিনি উম্মতের শাসক এবং তাঁর নির্দেশ তাদের ওপর ও তাদের জন্য কার্যকর। সুতরাং পদের বিধান বংশীয় সম্পর্কের বিধানের ওপর প্রাধান্য পাবে। এক্ষেত্রে তাঁর ওপর কোনো অভিযোগ বা অপবাদের অবকাশ রাখা হয়নি এবং এটি তাঁর সন্তান বা পিতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দায়িত্ব অর্পণের মতোই গণ্য হবে।

তৃতীয় মত: এই মতানুসারে, ইমাম তাঁর পিতার জন্য এককভাবে বাইআত সম্পন্ন করতে পারেন, তবে সন্তানের জন্য তা এককভাবে করা বৈধ নয়। কারণ স্বভাবগতভাবে তিনি পিতার চেয়ে সন্তানের প্রতি অধিক অনুরাগী হয়ে থাকেন; আর এই কারণেই মানুষ সাধারণত যা কিছু অর্জন করে তা তাঁর পিতার পরিবর্তে সন্তানের জন্যই সঞ্চয় করে রাখে।

দ্বিতীয় প্রকার: যাঁর নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে তিনি সন্তান বা পিতা নন; যেমন—ভাই, চাচাতো ভাই অথবা অন্য কোনো অনাত্মীয় ব্যক্তি। এক্ষেত্রে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইমাম 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'-এর পরামর্শ ছাড়াই এককভাবে তাঁর বাইআত সম্পন্ন করতে পারেন। তবে বাইআত সম্পন্ন হওয়ার জন্য 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি'-এর সন্তুষ্টি প্রকাশ পাওয়া শর্ত কি না, এ বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

তৃতীয় অংশ: যার অনুকূলে অঙ্গীকার (উত্তরাধিকার) করা হয়েছে সে অনুপস্থিত থাকা। এমতাবস্থায় তার অবস্থা বিবেচনা করা হবে; যদি তার বেঁচে থাকার বিষয়টি অজানা থাকে তবে তার অনুকূলে করা অঙ্গীকার বৈধ হবে না। আর যদি তার বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়, তবে তার অনুকূলে করা অঙ্গীকার বৈধ হবে এবং তা তার আগমনের ওপর স্থগিত থাকবে। অতঃপর যদি অঙ্গীকারকারী ইমাম মারা যান এবং উত্তরাধিকার মনোনীত ব্যক্তি তখনও অনুপস্থিত থাকেন, তবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর জন্য তাকে উপস্থিত করা ওয়াজিব। যদি সে আসে তবে সে মুসলিমদের ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর যদি সে অনুপস্থিতই থাকে এবং তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে মুসলিমদের ক্ষতি হয়, তবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' অন্য একজনকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবেন যতক্ষণ না সে উপস্থিত হয়। জনগণের মাঝে তার বিধানসমূহ ইমামের বিধানের ন্যায় কার্যকর হবে। অতঃপর যখন সেই অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসবে, তখন তার প্রতিনিধি পদচ্যুত হয়ে যাবে।

উত্তরাধিকার মনোনয়ন (বিলায়া আল-আহদ) বিষয়ে আমাদের অভিমত: ফকীহগণের বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের অধিকাংশের মতে খলিফা কর্তৃক কোনো একজনের অনুকূলে করা অঙ্গীকার তার ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইমামের অঙ্গীকারের পর বায়আত পূর্ণ হওয়ার জন্য 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর বায়আতের প্রয়োজন নেই। বরং তিনি কারো সাথে পরামর্শ না করেই নিজের পরবর্তী ইমামতের জন্য যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে মনোনীত করার ক্ষমতা রাখেন। তার ওপর একমাত্র দায়িত্ব হলো এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো ইজতিহাদ (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা) করা।

ইমাম নববী বলেন: "খলিফা যখন উত্তরাধিকার মনোনীত করতে চান, তখন তার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে খোঁজার ইজতিহাদ করা আবশ্যক। অতঃপর যখন তার নিকট কেউ স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন অন্য কারো উপস্থিতি বা পরামর্শ ছাড়াই এককভাবে তার বায়আতের চুক্তি সম্পন্ন করা জায়েয।" যারা এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন তারা দেখেন যে, আলেমগণ তাঁদের এই মতের ক্ষেত্রে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেন:

প্রথম বিষয়: যাকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে তিনি একজন আদর্শ ইমাম যার বায়আত সঠিক শরয়ী পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। ইমামতের শর্তাবলি আলোচনার সময় আমরা ইতিপূর্বে যে শর্তগুলো বর্ণনা করেছি, তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় শাসনকার্যের বিষয়ে তাঁর ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা জন্মে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি উত্তরাধিকার মনোনয়নের ক্ষেত্রে ওয়াজিব বা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি। সুতরাং তিনি উম্মতের নেতৃত্বের জন্য যাকে যোগ্য মনে করেছেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও মনোনীত করেননি। এবং এই কাজের ক্ষেত্রে তিনি আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা ভালোবাসার দ্বারা প্রভাবিত হননি; বরং তিনি যা করেছেন তাতে উম্মতের কল্যাণ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করেছেন।

দ্বাদশ পাঠ
ইবনে খালদুন বলেন: "পক্ষান্তরে উত্তরসূরি মনোনয়নের (আহদ) মাধ্যমে সন্তানদের জন্য উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য থাকা কোনো দ্বীনী উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিষয় যা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দান করেন। সুতরাং এতে যতটা সম্ভব দ্বীনী পদের সাথে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বেঁচে থেকে নিয়তকে সংশোধন করা উচিত। কারণ এই কাজটির মাধ্যমেই প্রজাসাধারণের বিষয়ে সে যা কিছু পরিচালনা করবে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে এবং এ জন্য তার রবের নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর এটি সমগ্র জাতির জীবনের ওপর এক বিশাল প্রভাব ফেলবে। এই কারণেই ওমর (রা.)-কে যখন তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করতে বলা হয়েছিল তখন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন: 'আমি কি জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই এর দায়িত্ব বহন করব?' সুতরাং, এই ইমাম যখন তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরি মনোনীত করেন, তখন তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার মধ্যে বিচ্যুতি বা ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তিশালী রক্ষাকবচসমূহ একত্রিত হয়েছে। এই ইমামের ওপর পূর্ণ আস্থা এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর ভীতির কারণে সাধারণত এটাই প্রবল ধারণা হয় যে তিনি সত্যের ওপর আছেন। আর যখন ইমাম এই সঠিক পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সাধারণত উম্মতের সেই মতামতেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটান যে কাকে তারা তাঁর পরে শাসনভার পরিচালনার জন্য যোগ্য মনে করে।"

দ্বিতীয় বিষয়: যে বিষয়টি আলেমদেরকে এই মত পোষণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, কেবল ইমামের মনোনয়নের মাধ্যমেই বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) সংঘটিত হয়, তা হলো ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা। ইমামতের ক্ষেত্রে এই মনোনয়ন বা 'আহদ' প্রথাকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য আলেমগণ এই দুটি ঘটনার মাধ্যমে দলিল পেশ করেন। ঘটনা দুটি হলো: আবু বকর (রা.) কর্তৃক ওমর (রা.)-এর মনোনয়ন এবং ওমর (রা.) কর্তৃক সেই ছয়জনের মনোনয়ন যাঁদের তিনি পছন্দ করেছিলেন। এই দুটি পূর্ববর্তী ঘটনা বাহ্যিকভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, আবু বকর ও ওমর (রা.)—আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন—উম্মতের পক্ষ থেকে সিনিয়র সাহাবায়ে কেরাম তথা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর প্রত্যক্ষ সম্মতি প্রকাশ ছাড়াই এককভাবে উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন।

তবে আমরা এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, এই দুটি বিষয়ের কোনোটিকেই কেবল ইমামের একক মনোনয়নের মাধ্যমে ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সঠিক নয়। কারণ প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে, খলিফার গুণাবলি যতই পূর্ণতায় পৌঁছাক না কেন, পরিশেষে তিনি ভুল-ক্রটির ঊর্ধ্বে নন এমন একজন মানুষ। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁর কোনো নিকটাত্মীয় বা বন্ধুর প্রতি ঝুঁকে পড়বেন না এবং তাকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন না—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং এটি একথাই প্রমাণ করে যে, ইমামের মধ্যে আমরা যে শর্তগুলো আরোপ করেছি তা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন মানুষ; এমন কোনো অলঙ্ঘনীয় বিষয় নেই যা তাঁকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।

কর্তব্য এবং প্রবৃত্তির দিকে ঝোঁকে; ফলে তিনি এমন কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করেন যে তার যোগ্য নয়; কেননা নিষ্পাপ হওয়ার গুণটি কেবল রাসূলগণের জন্যই সাব্যস্ত - তাঁদের প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: আবু বকরের উমরকে নিয়োগ এবং উমরের শুরা পরিষদের সদস্যদের প্রতি যে অগ্রবর্তী দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা বাহ্যিকভাবে এটিই প্রকাশ করে যে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর প্রতিনিধিত্বকারী উম্মাহর সন্তুষ্টির সম্মিলন ছাড়াই কেবল খলীফার পক্ষ থেকে করা নিয়োগই যথেষ্ট।

প্রথম দৃষ্টান্তটির ব্যাপারে আমরা বলি—আর তা দ্বারা আমরা উমরের প্রতি আবু বকরের (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন) নিয়োগকে বোঝাচ্ছি—নিশ্চয়ই এটি প্রমাণিত যে, আবু বকর মানুষকে দুটি বিষয়ের মাঝে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন: হয় তারা নিজেরা নির্বাচন করবে কে তাঁর পরে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, অথবা তারা এই নির্বাচনের বিষয়টি তাঁর ওপর ছেড়ে

দিবে। তখন তাঁর প্রতি গভীর আস্থার কারণে তারা তাঁর কাছে আবেদন করল যেন তিনি তাদের জন্য কাউকে নির্বাচন করে দেন।

অতঃপর আবু বকর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি অনুভব করলেন, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যেন মানুষ তাঁর কাছে একত্রিত হয়। তারা সমবেত হলে তিনি বললেন: "হে লোকসকল! আল্লাহর ফয়সালার যা কিছু তোমরা দেখতে পাচ্ছ তা আমার সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছে। তোমাদের জন্য অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি প্রয়োজন যে তোমাদের বিষয়ের দায়িত্ব নিবে, তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদেরকে আদেশ দান করবে। তোমরা যদি চাও তবে নিজেরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করো এবং যাকে পছন্দ করো তাকে তোমাদের ওপর নেতা নিযুক্ত করো। আর যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে ইজতিহাদ বা সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করব। সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমাদের কল্যাণে কোনো ত্রুটি করব না।" তখন তিনি কাঁদলেন এবং মানুষও কাঁদল। তারা বলল: "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি আমাদের মাঝে সর্বোত্তম এবং আমাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী, অতএব আপনিই আমাদের জন্য নির্বাচন করে দিন।" তিনি বললেন: "আমি তোমাদের জন্য ইজতিহাদ করব এবং ইনশাআল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই তোমাদের জন্য নির্বাচন করব।"

এবং মানুষ আবু বকরের কাজে সন্তুষ্ট ছিল এবং কারও কোনো জবরদস্তি ছাড়াই তারা তাঁর নিয়োগকৃত ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য ও কথা শোনার অঙ্গীকার প্রকাশ করল। যখন তাঁর সিদ্ধান্ত উমরের ব্যাপারে স্থির হলো, তখন তিনি মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন: "আমি তোমাদের ওপর যাকে খলীফা নিযুক্ত করছি তার প্রতি কি তোমরা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, আমি আমার চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রমে কোনো ত্রুটি করিনি এবং আমি কোনো নিকটাত্মীয়কে নিযুক্ত করিনি। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করেছি, সুতরাং তোমরা তাঁর কথা শোনো এবং তাঁর আনুগত্য করো।" তারা বলল: "আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।"

৫৪৯

পৃষ্ঠা 100

দ্বাদশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

প্রকৃতপক্ষে সে সময় যা ঘটেছিল তার বর্ণনায় কোনো কোনো বর্ণনা বলে যে, জনগণ যাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তার পরিচয় জানার আগেই সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ সিদ্দীক (আবু বকর রা.) যা করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর মধ্য হতে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে খলীফার কাছে দাবি জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন উমর (রা.) ব্যতীত অন্য কারো হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ না করেন।

এটি সত্য যে, উমর (রা.)-এর কঠোরতা সম্পর্কে জানা থাকায় কোনো কোনো সাহাবী এ বিষয়ে আবু বকর (রা.)-এর সাথে আলোচনা করেছিলেন এবং যখন উমর (রা.)-কে মনোনীত করার বিষয়টি তাদের নিকট পৌঁছাল তখন তারা অনুযোগ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এতে সন্তুষ্ট হন। সুতরাং এর অর্থ হলো, আবু বকর (রা.) জনগণের সাথে পরামর্শ করার এবং আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর মতামত গ্রহণ করার পরেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর জন্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন।

আর দ্বিতীয় নজিরটির ক্ষেত্রে যা হলো—উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের শুরা কমিটির নিকট খিলাফতের বিষয়টি ন্যস্ত করা; এতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ ছয়জন ব্যক্তির প্রতি উম্মাহর সন্তুষ্টি ও সমর্থন ছিল এবং ইমামতের জন্য তাদের যোগ্য অন্য কেউ ছিল না।

এই সব আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, খলীফার পক্ষ থেকে উত্তরসূরি নির্বাচনের মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ যে দুটি নজির দ্বারা দলিল পেশ করেন, তা প্রকৃতপক্ষে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ইমামের জন্য এটি বৈধ যে তিনি উম্মাহর নেতৃত্বে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য কাউকে মনোনীত করবেন। তার এই পছন্দের ওপর আস্থা রাখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির মাঝে ইমামের প্রয়োজনীয় গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে এবং তা সকল প্রকার সংশয়মুক্ত হয়;

এমনকি তিনি যদি তার পুত্র বা পিতাকেও মনোনীত করেন। তবে আমরা যেমনটি বলেছি—এই নিছক মনোনয়নই মনোনীত ব্যক্তির ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এককভাবে যথেষ্ট নয়। বরং এক্ষেত্রে অবশ্যই আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সন্তুষ্টি এবং মনোনীত ব্যক্তির প্রতি তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ অপরিহার্য।

অতএব, মনোনীত ব্যক্তির ইমামত ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না যতক্ষণ না আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ তার হাতে বাইয়াত হবে। তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তার হাতে বাইয়াত হবে না এবং যদি তাদের দৃষ্টিতে সে এই পদের জন্য যোগ্য না হয় তবে তারা অন্য কাউকে নির্বাচন করবে। বনু উমাইয়ার খলীফাগণও বিষয়টি এভাবেই বুঝতেন। তাই তারা যখন তাদের কোনো নিকটাত্মীয়কে উত্তরসূরি মনোনীত করতেন, তখন কেবল খলীফার পক্ষ থেকে প্রদত্ত মনোনয়নের ওপরই নির্ভর করতেন না; বরং খলীফা জীবিত থাকা অবস্থাতেই জনগণের পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তির জন্য বাইয়াত গ্রহণ করা হতো এবং তার মৃত্যুর পর পুনরায় নতুন করে বাইয়াত নেওয়া হতো। যদিও তারা...

তারা জানেন যে, ইমামের পক্ষ থেকে কেবল মনোনয়ন প্রদানই যদি বায়আত সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতো, তবে তাদের জনগণের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো না।

আমরা উমর ইবনে আব্দুল আযীযকে দেখতে পাই—যিনি ফিকহ এবং শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত—সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক তাকে খেলাফতের জন্য মনোনীত করার পর এবং সুলাইমানের মৃত্যুর পর জনগণের সামনে সেই মনোনয়নপত্র পাঠ করার পর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং বলেন: "আল্লাহর কসম, এই বিষয়ের (নেতৃত্বের) ক্ষেত্রে আমার কোনো মত নেওয়া হয়নি, আর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আপনাদেরই রয়েছে।"

এটি তার পক্ষ থেকে এই প্রমাণ বহন করে যে, বায়আত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা উম্মতের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্বকারী 'আহলে হাল ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর পক্ষ থেকে আসে। যদি পূর্ববর্তী খলীফার মনোনয়ন একাই ইমামত প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হতো, তবে উমর জনগণের সাথে মিলিত হয়ে তাদের এই সংবাদ দিতেন না যে, তাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করার বা না করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে।

শক্তি ও দাপটের মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠা

নেতৃত্ব বা ইমামত প্রতিষ্ঠার মূল মূলনীতি হলো, 'আহলে হাল ওয়াল আকদ' এমন কোনো ব্যক্তিকে তা প্রদান করবেন যাকে তারা প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করেন। এটি করা হয় এমন ব্যক্তিদের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর যাদের মধ্যে নেতৃত্বের এই গুরুভার বহন করার পূর্ণ প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে নেতার আগমন ঘটে উম্মতের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও পছন্দের ভিত্তিতে, যার প্রতিনিধিত্ব করে 'আহলে হাল ওয়াল আকদ', যখন ওই পদের জন্য তার যোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এটি স্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা, যেখানে কেউ উম্মতের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু অনেক সময় এমন ঘটে যে, যাদের হাতে শক্তি ও দাপটের উপকরণ রয়েছে তারা এই পদের ওপর চড়াও হয় এবং বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়, যেমনটি ঘটে থাকে যেটিকে আমরা বলে থাকি...

দ্বাদশ পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

আমাদের বর্তমান যুগ সামরিক অভ্যুত্থান এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের যুগ। যারা সুযোগ পেয়ে এই পথে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে, তাদের কি নেতৃত্ব সাব্যস্ত হবে? নাকি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি গণ্য হবে না?

এ বিষয়ে আলেমগণের দুটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: খারিজি এবং মুতাজিলাদের মতে, যেকোনো ধরনের জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগমুক্ত আনুগত্যের শপথ (বাইআত) ব্যতিরেকে ইমামত বা নেতৃত্ব সাব্যস্ত হয় না।

দ্বিতীয় মত: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সাধারণ মত হলো, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর বিজয়ী হয় এবং শক্তির জোরে শাসনক্ষমতায় আসীন হয়, তার ইমামত বা নেতৃত্ব বৈধ হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি তলোয়ারের মাধ্যমে মানুষের ওপর বিজয়ী হয়েছে যতক্ষণ না সে খলিফা হয়েছে এবং তাকে 'আমিরুল মুমিনিন' বলা হয়েছে, আল্লাহ এবং পরকালের ওপর বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্যই এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করা বৈধ নয় যে, সে তাকে ইমাম হিসেবে মানবে না; চাই সে শাসক নেককার হোক বা পাপাচারী।"

জমহুর (অধিকাংশ) আলেম এই পন্থায় নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন; চাই এই দখলদার ব্যক্তির মাঝে ইমামতের শর্তাবলি বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। এমনকি দখলদার ব্যক্তি যদি পাপাচারী বা মূর্খও হয়, তবুও তার ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। বরং কোনো নারী যদি নেতৃত্বের ওপর বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়, তবে তার ইমামতও সাব্যস্ত হবে। একইভাবে যদি কোনো দাস ক্ষমতা দখল করে নেয়, তবে তার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। এর কারণ হলো, আলেমগণ বিবেচনা করেছেন যে, যদি এই দখলদার ব্যক্তির ইমামত সাব্যস্ত না হওয়ার কথা বলা হয়, তবে তার ফলে দখলদার ও তার সহযোগীদের সাথে বিদ্যমান ইমাম ও তার সমর্থকদের মাঝে সংঘাতের সৃষ্টি হবে এবং ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। আর এই দখলদার শাসকের পক্ষ থেকে জারিকৃত বিধানগুলো কার্যকর না হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, সেক্ষেত্রে এমন নারীর বিবাহ সহিহ না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে যাকে সে বিয়ে দিয়েছে অথচ তার কোনো অভিভাবক নেই (কেননা শাসকই অভিভাবকহীনদের অভিভাবক); এছাড়া তার পরবর্তী শাসককে প্রথমত পুনরায় দণ্ডবিধি (হুদুদ) কায়েম করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত পুনরায় জিজিয়া গ্রহণ করতে হবে।

বরং আলেমগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি অন্য কোনো ব্যক্তি এই দখলদারকে পরাস্ত করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়, তবে প্রথম জন অপসারিত হবে এবং দ্বিতীয় জন ইমাম হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং আলেমগণ দুটি অনিষ্টের মধ্যে তুলনা করেন এবং উম্মতের জন্য যেটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর সেটিই বেছে নেন। তারা উম্মতকে বৃহত্তর অনিষ্টের সম্মুখীন করার ফতোয়া দেন না।

৫৫২

তবে এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এটি একটি জরুরি অবস্থা; আর 'জরুরি অবস্থা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ করে দেয়'। সুতরাং এটি হলো বাধ্যবাধকতা ও নিরুপায় পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত, যেমন মৃত প্রাণীর দেহ বা শূকরের গোশত ভক্ষণ করা; আর এটি মেনে নেওয়া হয়েছে কারণ এটি মানুষের মাঝে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার চেয়ে উত্তম।

এর ভিত্তিতে উম্মাহর জন্য উচিত নয় এই পরিস্থিতির স্থায়িত্বের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। বরং উম্মাহর ওপর ওয়াজিব হলো ত্রুটিপূর্ণ ইমামতকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইমামতে পরিবর্তন করার জন্য কাজ করা, যা একজন প্রকৃত ইমামের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করবে। আর তা হতে হবে এমন পন্থায় যাতে মানুষের মাঝে কোনো ফিতনা বা গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি না হয়। ইমাম যেন সঠিক পথে মনোনীত হন—যা হলো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (নীতি-নির্ধারক ব্যক্তিবর্গ)-এর পথ—সেই প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখা ওয়াজিব।

যদিও জবরদখলকারী বা বিজয়ী ব্যক্তির ইমামত জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যকর হয়—যেমনটি আমরা বলেছি—তবে মুসলিম উলামায়ে কিরামের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনো কাফিরের জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমদের ইমামত লাভ করাকে বৈধ মনে করেননি। কেননা জবরদখলের ক্ষেত্রে ইমামতের কিছু শর্তের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা যেতে পারে, যেমন: জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া; কিন্তু 'ইসলাম'-এর শর্তটি ইমামের ক্ষেত্রে কখনোই রহিত করা সম্ভব নয়। এর ভিত্তিতে, যদি কোনো কাফির এই পদের ওপর জবরদখল করে বসে, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই পরিস্থিতির ওপর নিশ্চুপ থাকা বৈধ নয়। বরং অস্ত্রবলে সেই জবরদখলকারীকে অপসারণ করা ওয়াজিব; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর আল্লাহ কখনোই মুমিনদের ওপর কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।" [আন-নিসা: ১৪১]।

এর মাধ্যমে আমরা ইসলামি উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নিকট ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন করলাম।

এখন শিয়াদের নিকট এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা বাকি রয়েছে। ইমামিয়া শিয়া এবং জায়দিয়াদের মধ্য থেকে জারুদিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে উম্মাহর নেতৃত্বে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন সে ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা (নস) প্রদান করেছেন; আর তিনি হলেন আলী বিন আবি তালিব। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সেই নির্দেশনার প্রকৃত রূপ নিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝে মতভেদ রয়েছে; তা কি এমন কোনো উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বর্ণনা যার দ্বারা আলী বিন আবি তালিবের ইমামতের বিষয়টি অকাট্যভাবে জানা যায়, নাকি তা এমন এক বর্ণনা...

এটি কি অস্পষ্ট যে যার উদ্দেশ্য অনিবার্যভাবে জানা যায় না? এই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর অর্থ হলো: ইমামিয়াদের নিকট 'নস' (সুস্পষ্ট টেক্সট বা ঐশী নির্দেশ) ছাড়া ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আর কোনো পথ নেই। সুতরাং, জমহুর ফকিহদের নিকট যেসব পদ্ধতিতে ইমামত সাব্যস্ত হয়, তারা সেগুলো স্বীকার করে না। তাদের মতে, ইমামের ব্যাপারে 'নস' থাকা ছাড়া ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার কোনো পথ নেই।

এখানে আমাদের এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'নস' এর বিষয়ে শিয়া ইমামিয়াদের বক্তব্য দুটি দাবি প্রমাণের ওপর আবর্তিত, যার

একটি অপরটির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই দুটি দাবির মধ্যে প্রথমটি হলো: ‘নস’ ছাড়া ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো পথ নেই। আর দ্বিতীয়টি হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইমামতের ব্যাপারে ‘নস’ বা সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান না করে মহান বন্ধুর (আল্লাহর) সান্নিধ্যে গমন করেননি।

এটা স্পষ্ট যে, শিয়া ইমামিয়ারা প্রথম দাবিটি—অর্থাৎ ‘নস’ ছাড়া ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার কোনো পথ নেই—প্রমাণের মাধ্যমে মূলত দ্বিতীয় দাবিটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, আর তা হলো: আলীর ইমামতের ব্যাপারে ‘নস’ বা সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা। অর্থাৎ, তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হলো আলী ইবনে আবি তালিবের ইমামত প্রমাণ করা এবং এটি সাব্যস্ত করা যে, তিনি আবু বকর, উমর ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অপেক্ষা ইমামতের জন্য অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন।

এখন আমরা ‘নস’-ই ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার একমাত্র পথ—এই বিষয়ে তাদের সংশয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করি। আমরা বলব: ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার একমাত্র পথ হলো ‘নস’—এটি প্রমাণের জন্য ইমামিয়ারা অনেক দলিল পেশ করেছে, যার সবগুলোরই উত্তর উলামায়ে কেরাম দিয়েছেন এবং সেগুলোকে অসার প্রমাণ করেছেন। তাদের পেশকৃত দলিলগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের এই বক্তব্য: "যদি নির্বাচনের মাধ্যমে ইমাম হওয়া বৈধ হতো, তবে রাসুল ও নবীর ক্ষেত্রেও তা বৈধ হতো। কিন্তু তা যেহেতু বাতিল (অসম্ভব), তাই প্রমাণিত হলো যে নির্বাচনের মাধ্যমে ইমাম হওয়া বৈধ নয়।"

তবে এর উত্তরে তাদের বলা হবে যে, এটি একটি ভুল ‘কিয়াস’ (তুলনা)। কেননা কিয়াস তখনই সঠিক হয় যখন ‘মাক্বীস’ (যাকে তুলনা করা হচ্ছে) এবং ‘মাক্বীস আলাইহি’ (যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে)-এর মধ্যে একটি সাধারণ কারণ বা ‘ইল্লত’ বিদ্যমান থাকে। অথচ রাসুল ও ইমামের মধ্যে এমন কোনো সাধারণ কারণ নেই যার ভিত্তিতে এই কিয়াস শুদ্ধ হতে পারে। মূলত মানুষের নির্বাচনের মাধ্যমে রিসালাত সাব্যস্ত হয় না; কারণ রাসুল...

তিনি যা পৌঁছে দেন সে বিষয়ে তিনি একজন প্রমাণ (হুজ্জত)। সুতরাং এমন একটি পথ থাকা আবশ্যক যার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি তাঁর রিসালাতের দাবিতে সত্যবাদী। আর নির্বাচন এমন কোনো পথ নয় যার মাধ্যমে তাঁর দাবির সত্যতা প্রকাশ পায়। কিন্তু ইমামের বিষয়টি ভিন্ন; কারণ তিনি হলেন বিধানাবলি এবং সুপরিচিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নকারী। তিনি একজন বিচারকের মতো; যখন তাঁর মধ্যে বিচারক হওয়ার শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে, তখন বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁর নির্বাচন সঠিক হয়। এর অর্থ হলো: তাঁরা যে সংশয়ের ওপর নির্ভর করেছেন এবং ইমামতের পদকে নবুওয়াতের পদের সাথে তুলনা করেছেন, তা কেবল একটি অসার সংশয় মাত্র। তাই এ ক্ষেত্রে তাঁদের দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

তাঁরা আরও বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামতের অসিয়ত করেছেন, তবে যাঁর জন্য তিনি অসিয়ত করেছেন তিনি হলেন আলী বিন আবি তালিব। তাঁরা এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন:

প্রথম বিষয়: নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি মদীনা থেকে বের হতেন না যতক্ষণ না সেখানে মুসলমানদের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করতেন। তাঁর এই অভ্যাসের কখনো একবারের জন্যও ব্যত্যয় ঘটেনি। যখন তাঁর জীবদ্দশায় এটাই ছিল তাঁর অভ্যাস, তবে অবশ্যই তিনি সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যখন তিনি তাঁদের ছেড়ে ‘রফিক আল-আ’লা’-র (মহান বন্ধুর) দিকে চলে যাবেন। কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের স্বার্থ দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল, যদিও তা কষ্টসাধ্য ছিল; কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তা (নির্ধারিত প্রতিনিধি ছাড়া) সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিষয়: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমি তোমাদের জন্য সন্তানের প্রতি পিতার ন্যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন

শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলামুখী না হয় এবং কিবলাকে পেছনেও না রাখে।" আর যেভাবে একজন স্নেহময় পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় সন্তানদের কল্যাণ দেখাশোনা করা আবশ্যক, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও তা দেখাশোনা করা আবশ্যক যাতে তারা ধ্বংস না হয়ে যায়। এটা সুবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাঁর পরে কে দায়িত্ব পালন করবেন তা নির্দিষ্ট না করতেন, তবে তাঁরা তাঁদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে ধ্বংস হয়ে যেতেন। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে বলা আবশ্যক যে, তিনি তাঁর পরবর্তী ইমামকে নির্দিষ্ট করে গেছেন।

তৃতীয় বিষয়: এটি সুবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের প্রতি দয়ার ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁদেরকে প্রতিটি কল্যাণকর বিষয়ের দিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, এমনকি অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও। এমনকি তিনি তাঁদেরকে শৌচকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ত্রিশটি আদব শিক্ষা দিয়েছেন। যদি বিষয়টি এমনই হয়, এবং যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেলাফত...

শরয়ী রাজনীতি
দ্বাদশ পাঠ

...দুনিয়া ও দ্বীনের সবচেয়ে বড় স্বার্থসমূহ এর ওপর নির্ভরশীল। তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি এর প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করবেন না? এবং তিনি তাঁর উম্মতকে এমন কারো নিকট দিকনির্দেশনা না দিয়ে রেখে যাবেন না, যে তাঁর পরে তাদের বিষয়াবলী পরিচালনা করবে?

চতুর্থ বিষয়: নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘রফিক আল-আলা’র (মহান বন্ধুর) নিকট স্থানান্তরিত হননি যতক্ষণ না দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পন্ন করলাম।" [আল-মায়িদা: ৩] আর যদি ইমামত দ্বীনের সবচেয়ে বড় রোকন বা স্তম্ভ হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর আগেই এর পূর্ণতা পাওয়া জরুরি। আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরে কে ইমাম হবেন সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন।

অতঃপর তারা বলল: এই চারটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় সুনির্দিষ্টভাবে এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, যে তাঁর পরে উম্মতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

শিয়া ইমামিয়াদের উপস্থাপিত সেই সকল দলিলের বিপরীতে জমহুর বা সংখ্যাধিক্য ওলামায়ে কেরামের জবাব, যেগুলোর মাধ্যমে তারা দাবি করে যে, ইমামত কেবল সুনির্দিষ্ট নির্দেশের (নস) মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়:

প্রথমত: এমন অনেক হাদিস ও আসার (সাহাবীদের বক্তব্য) রয়েছে যা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকেই ইমামতির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে মনোনীত করে যাননি। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাকে খলিফা নিযুক্ত করবেন? তিনি বললেন: "যদি তোমরা আবু বকরকে খলিফা বানাও, তবে তাকে আমানতদার, দুনিয়াবিমুখ এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হিসেবে পাবে। আর যদি তোমরা উমরকে খলিফা বানাও, তবে তাকে শক্তিশালী ও আমানতদার হিসেবে পাবে, যে আল্লাহর পথে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। আর যদি তোমরা আলীকে খলিফা বানাও—তবে আমি মনে করি না তোমরা তা করবে—তবে তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতকারী হিসেবে পাবে, যে তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।"

আর এই যে ইবনে উমর বলছেন: "আমি আমার পিতার (উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিকট উপস্থিত ছিলাম যখন তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল এবং বলল: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। অতঃপর তাঁকে বলা হলো: আপনি কি

কাউকে খলিফা মনোনীত করবেন? তিনি বললেন: আমি কি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তোমাদের দায়িত্ব বহন করব? আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, এর দায়ভার যেন সমান সমান হয়—আমার পক্ষেও কিছু না থাকুক, আমার বিরুদ্ধেও কিছু না থাকুক। যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তবে আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন—অর্থাৎ আবু বকর—তিনিও মনোনীত করেছিলেন। আর যদি আমি তোমাদেরকে (মনোনীত করা ছাড়াই) ছেড়ে যাই, তবে আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)—তিনিও তোমাদের সেভাবেই ছেড়ে গিয়েছিলেন।"

৫৫৬

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

যখন আলী বিন আবি তালিব আহত হলেন, তখন লোকেরা তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: "হে আমিরুল মুমিনীন! যদি আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলি, তবে কি আমরা হাসানের নিকট বায়আত গ্রহণ করব?" তিনি বললেন: "আমি তোমাদের আদেশও দিচ্ছি না, আবার নিষেধও করছি না; তোমরাই অধিক ভালো জানো।" তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল: "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি কাউকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাবেন না?" তিনি বললেন: "না, বরং আমি তাদেরকে সেভাবেই রেখে যাচ্ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে রেখে গিয়েছিলেন।"

দ্বিতীয়ত: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু বকরের খিলাফতের প্রতি তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি জনগণের সাথে সেই অঙ্গীকারনামার প্রতিও সন্তোষ প্রকাশ করেন, যার মাধ্যমে আবু বকর ওমরের জন্য খিলাফতের পথ সুগম করেছিলেন। বরং তিনি তাঁর সন্তুষ্টিকে এর ওপর নির্ভরশীল করেছিলেন যে, মনোনীত ব্যক্তিটি যেন ওমর ইবনুল খাত্তাব হন। বর্ণিত আছে যে, আবু বকর যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি উচ্চ স্থান থেকে জনগণের দিকে তাকিয়ে বললেন: "হে লোকসকল! আমি কি একটি অঙ্গীকার (উত্তরাধিকারী মনোনয়ন) করেছি, তোমরা কি তাতে সন্তুষ্ট?" তখন লোকসকল বলল: "হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আমরা সন্তুষ্ট।" এমতাবস্থায় আলী দাঁড়িয়ে বললেন: "যদি তিনি ওমর হন, তবেই আমরা সন্তুষ্ট।" আবু বকর বললেন: "তিনি ওমরই।"

যদি আলীর ইমামতের (নেতৃত্বের) বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য (নস) থাকত, তবে তিনি আবু বকর ও ওমরের খিলাফতে সন্তুষ্ট হতেন না। তিনি অবশ্যই সেই বক্তব্যটি প্রকাশ করতেন এবং তার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতেন এবং অন্য কাউকে মুসলিমদের ইমামত গ্রহণ করা থেকে বাধা দিতেন। অথচ আমরা দেখেছি, আবু বকর কীভাবে আনসারদের সামনে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের জন্য ইমামত নির্দিষ্ট হওয়ার সপক্ষে লড়াই করেছেন এবং "ইমামগণ কুরাইশ বংশ থেকে হবেন" -এই হাদীসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। ফলে আনসাররা তাঁর আনুগত্য করে এবং একটি একক সংবাদের (খবরুল ওয়াহেদ) কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের পূর্বের দাবি ত্যাগ করে। এমতাবস্থায় কীভাবে কল্পনা করা যায় যে, আলী বিন আবি তালিবের ইমামতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির নস বা বর্ণনা থাকবে, আর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের মাঝে নিজের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবেন না যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি মাত্র বাণীর কাছেও মাথা নত করে দেয়?!

ইমামিয়্যারা যে দাবি করে যে, আবু বকর ও ওমরের খিলাফতের প্রতি আলীর সন্তুষ্টি ছিল মূলত 'তাকিয়্যাহ' (কৌশলগত সতর্কতা), তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আলী বিন আবি তালিবের বীরত্ব সুবিদিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে এবং জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনো বিতর্কের অবকাশ রাখে না। এমতাবস্থায় তাঁর মতো সাহসী ব্যক্তি—যাঁর বীরত্ব সম্পর্কে আমরা অবগত—কীভাবে ভীরুতা প্রদর্শন করতে পারেন এবং নিজের অধিকার প্রকাশের ক্ষেত্রে নীরব থাকতে পারেন, যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নস বা অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে বলে গিয়েছিলেন যে তাঁর পরে তিনিই হবেন ইমাম?!

পৃষ্ঠা 108

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

তৃতীয়ত: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেন, তখন আব্বাস আলী (রা.)-এর কাছে আবেদন করলেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি খেলাফতের দায়িত্ব কার জন্য নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আলী (রা.) এই প্রস্তাবে একমত হননি। বুখারীতে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ: "আব্বাস আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর হাত ধরলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই অসুস্থতার সময় যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন— এবং তাকে বললেন: আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চলুন, যেন আমরা তাঁকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। যদি এই বিষয়টি আমাদের মাঝে থাকে তবে আমরা তা জানতে পারব, আর যদি তা অন্যদের জন্য হয় তবে আমরা তাঁর সাথে কথা বলব এবং তিনি আমাদের ব্যাপারে অসিয়ত করবেন। আলী (রা.) বললেন: আল্লাহর শপথ! আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এটি চাই এবং তিনি আমাদের তা দিতে অস্বীকার করেন, তবে লোকেরা তাঁর পরে আর কখনো আমাদের তা দেবে না। আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এটি চাইব না।"

এর প্রেক্ষিতে মন্তব্য হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে যদি আলী (রা.)-এর ইমামতের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য (নস) থাকত, তবে আলী ও আব্বাস (রা.)-এর মধ্যে এই আলোচনার কোনো প্রয়োজন হতো না। সুতরাং তাদের উভয়ের অবস্থান একথাই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর ইমামতের ওপর কোনো সুস্পষ্ট নস প্রদান করেননি।

চতুর্থত: সাহাবায়ে কেরাম থেকে মুতাওয়াতির বা নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ইমামতের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নস রেখে যাননি। সুতরাং সুস্পষ্ট নস-এর ধারণাটি একটি বিদআত, যা সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বাস করতেন না এবং তাবেয়ীদের যুগেও তা প্রসিদ্ধ ছিল না।

যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর ইমামতের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নস থাকত এবং বিষয়টি তেমনই হতো, তবে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দুটি বিষয়ের বাইরে হতো না: হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সেই সুস্পষ্ট নস তাদের নিকট পৌঁছেছিল কিন্তু তারা তা গোপন করেছেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই খবরটি তাদের নিকট আদতেই পৌঁছায়নি।

প্রথম সম্ভাবনাটি যে, এই নস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট পৌঁছেছিল কিন্তু তারা তা গোপন করেছেন— এটি একটি বাতিল বা অসার সম্ভাবনা যা চিন্তার বিকৃতি, আকিদাগত বিচ্যুতি, কুপ্রবৃত্তি এবং বিতণ্ডার উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত। কারণ, এই সম্ভাবনা মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের ওপর এই অপবাদ আরোপ করা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করেননি, অথচ তাদের মধ্যে অগ্রবর্তী হিজরতকারীগণ (মুহাজিরিন) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

দ্বাদশ পাঠ

...এবং আনসারগণ, যাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন এবং অন্যান্যরা রয়েছেন, যারা হেদায়েত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁদের অন্তরের স্বচ্ছতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও কলুষতা থেকে আকিদাহর বিশুদ্ধতার বিষয়টি এমন এক সর্বজনবিদিত বিষয় যা নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই।

এ কারণে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে: আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কিংবা অন্য কারো ইমামতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মূলত কোনো সুস্পষ্ট পাঠ বা নস পাওয়া যায় না। যদি এমন কোনো নস থাকত, তবে তাঁরা অবশ্যই তা পৌঁছে দিতেন—আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইমামের দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ

আল-ইমামাতুল উজমা বা খিলাফত ইসলামি রাষ্ট্রে এবং যেকোনো রাষ্ট্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে এটি এমন একটি আমানত যার দায়বদ্ধতাগুলো তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। এটি মূলত একটি অর্পিত দায়িত্ব, কোনো নিছক সম্মানসূচক পদ নয়। এ কারণেই উম্মাহর প্রতি খলিফার কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে যা তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে হয়; এর বিপরীতে উম্মাহর উপর তাঁর কিছু অধিকারও রয়েছে। নিচে আমরা বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করব:

প্রথমত: খলিফার দায়িত্বসমূহ:

মুসলিম ফকিহ ও আলেমগণের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্ভবত এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখনীগুলোর একটি হলো যা "আল-মাওয়ার্দি" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আল-মাওয়ার্দি এই প্রেক্ষাপটে বলেন: ইমামের উপর সাধারণ বিষয়াবলীর মধ্য থেকে দশটি বিষয় পালন করা আবশ্যক:

প্রথম দায়িত্ব: দ্বীনকে তার সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতিসমূহ এবং উম্মাহর সালাফগণ যে বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা। যদি কোনো বিদআতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে অথবা কোনো সংশয়বাদী সত্য থেকে বিচ্যুত হয়, তবে ইমাম তার সামনে দলিল পেশ করবেন এবং তাকে সঠিক পথটি স্পষ্ট করে দেবেন। এছাড়া তিনি তাকে প্রয়োজনীয় হক ও সীমানা (হুদুদ) পালনে বাধ্য করবেন; যাতে দ্বীন সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং ইমামত বা নেতৃত্ব সকল প্রকার পদস্খলন থেকে মুক্ত থাকে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

"মাওয়ার্দী"-র এই কথাটি অত্যন্ত চমৎকার এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের গবেষণা ও সূক্ষ্মতা সম্পন্ন। কেননা এটি দ্বীনের সেসব বিষয়ে সালাফে সালেহীন যেগুলোর ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন তা রক্ষা করা এবং এর বাইরের বিষয়গুলোতে উম্মাহকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদ করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে ইমামের কর্তব্যের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যদি নিজে ইজতিহাদ করার যোগ্য না হন, তবে তাঁর জন্য কর্তব্য হলো আলিমদের সাথে পরামর্শ করা যাতে তাঁর কার্যাবলী সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হয়। এই উম্মাহর সালাফদের কর্মপদ্ধতি সর্বদা এমনই ছিল; শাসক ও আলিমদের মধ্যে সর্বদা সংলাপ ও পরামর্শ বিদ্যমান ছিল। কখনো কখনো আলিমগণ এমন বিষয়ে শাসকদের আনুগত্য করতেন যা তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদের বিপরীত হতো, যদি না তা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো অকাট্য দলিলের বিরোধী হয় অথবা সালাফদের ইজমার (ঐক্যমত) সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই কারণেই আলিমগণ 'কুরআন সৃষ্টির' মতবাদে শাসকদের সাথে একমত হননি। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের কঠিন পরীক্ষার ঘটনা অত্যন্ত সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার এই স্বরূপ সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে কিছুটা ভিন্নতর। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান শাসন করেন না এবং ফলস্বরূপ তিনি জনগণের সামনে বা তাদের প্রতিনিধিদের সামনে দায়বদ্ধ থাকেন না; বরং দায়বদ্ধতা মূলত মন্ত্রিসভার ওপর বর্তায়, যারা আইনসভার সামনে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সাংবিধানিক নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকি করে। তবে ইসলামী ব্যবস্থা অনেকটা রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থার মতো, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণের সামনে বা সংসদে তাদের প্রতিনিধিদের সামনে প্রধান দায়বদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিই তাঁর মন্ত্রীদের নিয়োগ দান ও অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তাঁরা তাঁর কাছে পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকেন।

দ্বিতীয় দায়িত্ব: বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিচারকার্য কার্যকর করা এবং বিরোধীদের মধ্যে বিবাদ নিরসন করা; যাতে ইনসাফ ও সাহায্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং কোনো জালেম সীমালঙ্ঘন করতে না পারে আর কোনো মাজলুম দুর্বল হয়ে না পড়ে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইমামগণ নিজেরাই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবই সর্বপ্রথম এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট বিচারক নিয়োগ করেছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতি
দ্বাদশ পাঠ

যাই হোক না কেন, খলিফার বিচারকগণ মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও খলিফা তাঁদের প্রধান থাকেন, তবে একে বিচারিক কর্মকাণ্ডে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দোষণীয় হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ ইসলামী ব্যবস্থায় বিচারক শরীয়তের বিধানের অনুগত থাকেন এবং খলিফাও শরীয়তের বিধানের অনুগত। একইভাবে খলিফা বিচারকদের কর্মকাণ্ডে তাঁদের ভুল ধরা না পড়া পর্যন্ত তাতে হস্তক্ষেপ করেন না। একে ইসলামী ব্যবস্থার সেই নীতির স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা হয় যা বলে—ন্যায়বিচারই হলো রাজত্ব ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি।

তৃতীয় দায়িত্ব: জনপদকে রক্ষা করা এবং ভূখণ্ড পাহারা দেওয়া, যাতে মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য চলাফেরা করতে পারে এবং জান ও মালের কোনো প্রকার ঝুঁকি ছাড়াই নিরাপদ ভ্রমণে বের হতে পারে। কোনো কিছুর 'বায়দাহ' বলতে তার সংরক্ষিত সীমানাকে বোঝায়। সুতরাং শাসক উম্মাহর সীমানা রক্ষা করবেন, যা বর্তমানে জননিরাপত্তা হিসেবে পরিচিত। এটি নিশ্চিত করা

হবে রাষ্ট্রদ্রোহীদের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যাতে দেশে এমন কিছু না ঘটে যা মানুষের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে।

চতুর্থ দায়িত্ব: দণ্ডবিধি (হুদুদ) কার্যকর করা; যাতে আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ লঙ্ঘিত হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং বান্দাদের অধিকারসমূহ বিনাশ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকে। বর্তমান যুগের সংবিধানেও এটি রাষ্ট্রের অন্যতম বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ রাষ্ট্রই হলো আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ধর্ম রক্ষা এবং সে অনুযায়ী পার্থিব জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল, যা আগেই বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম দায়িত্ব: প্রতিবন্ধক সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষা শক্তি দ্বারা সীমান্ত এলাকাগুলোকে সুরক্ষিত করা; যাতে শত্রুরা এমন কোনো ছিদ্রপথ না পায় যার মাধ্যমে তারা পবিত্র বিষয়সমূহ লঙ্ঘন করতে পারে কিংবা কোনো মুসলিম বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের রক্ত ঝরাতে পারে।

বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। আর এটি সম্ভব আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে সক্ষম শক্তিশালী ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে।

দ্বাদশ পাঠ

খলিফার ওপর অর্পিত এই বিভিন্ন দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম তাকে—যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের সরাসরি প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে গণ্য করে। একারণেই আলেমগণ খলিফার মধ্যে এমন কিছু বিশেষ শর্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যা শাসনকার্যের গুরুভার বহন করার জন্য তার যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমনটি আমরা মহান ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) শর্তাবলির আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

ষষ্ঠ দায়িত্ব: দাওয়াত পৌঁছানোর পরও যারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়; যেন সমগ্র দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার হক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সুবিদিত যে, জিহাদ 'ফরজে আইন' এবং 'ফরজে কিফায়া' উভয়ই হতে পারে। যখন শত্রু মুসলিম দেশসমূহের কোনো অংশ দখল করে নেয় এবং তা প্রতিহত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, অথবা ইমাম যখন সাধারণ ডাক প্রদান করেন, তখন প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির ওপর জিহাদ করা ফরজে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যক হয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য অবস্থায় এটি ফরজে কিফায়া; অর্থাৎ যদি কিছু লোক তা পালন করে, তবে বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যায়।

জিহাদ কখনো সম্পদের মাধ্যমে হয়, আবার কখনো অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমেও হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই শত্রুদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতির জন্য ইমামের নির্দেশিত সেনাবাহিনীতে যোগদানের নিয়মাবলী এবং সামরিক শিক্ষার অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা তাদের (শত্রুদের) মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও যুদ্ধের ঘোড়া প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এবং তারা ছাড়াও অন্যদের আতঙ্কিত করবে যাদের তোমরা চেনো না, কিন্তু আল্লাহ চেনেন। আর আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।" [আনফাল: ৬০]। এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলিম উম্মাহকে, যার অন্তর্ভুক্ত হলেন ইমাম; কারণ তিনি দাওয়াত দেওয়ার পর বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রধান দায়িত্বশীল।

সপ্তম দায়িত্ব: শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ (নস) এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে নির্ধারিত 'ফায়' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও সদকা (যাকাত) সংগ্রহ করা; কোনো প্রকার ভীতি প্রদর্শন বা জুলুম ছাড়াই। বাস্তবে এটি হকদারদের নিকট তাদের পাওনা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। কেননা শরিয়ত প্রণেতা (আল্লাহ) এই সম্পদগুলোকে কিছু মানুষের অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যেমন সদকার ক্ষেত্রে দরিদ্র ও মিসকিনগণ; যারা হয়তো তাদের পাওনা দাবি করতে সক্ষম নয়। একারণেই প্রথম খলিফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছিল, যা ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ (স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) নামে পরিচিত।

পৃষ্ঠা 113

তদ্রূপ খলিফার ওপর 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে খারাজ, জিজিয়া এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ করা আবশ্যক। আর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর খিলাফতের সময় সিরিয়া ও ইরাকের ভূমি বিজয়ের পর সর্বপ্রথম খারাজ প্রবর্তন করেছিলেন।

অষ্টম দায়িত্ব: অপচয় বা কার্পণ্য না করে বাইতুল মাল থেকে অনুদান এবং প্রাপ্য সুবিধাদি নির্ধারণ করা এবং সময়মতো তা প্রদান করা—যাতে কোনো অগ্রিম প্রদান বা বিলম্ব করা হবে না। এটি আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ বাজেট প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার অনুরূপ, যা অপচয় বা কার্পণ্য ব্যতিরেকে বাজেটে সমতা বজায় রাখে। কারণ অপচয় মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করতে পারে, আর কার্পণ্য প্রজাসাধারণের প্রতি অবিচারের কারণ হতে পারে। এই সবকিছুই শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ, যা রক্ষা করার দায়িত্ব শাসকের ওপর অর্পিত।

নবম দায়িত্ব: অর্পিত কার্যাবলি পালনের জন্য যোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া এবং সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান করা; যাতে করে কার্যাবলি দক্ষতার সাথে সুশৃঙ্খল থাকে এবং সম্পদ আমানতদার ব্যক্তিদের নিকট সংরক্ষিত থাকে। এ ক্ষেত্রে শাসকের কর্তব্য হলো—অর্থাৎ যখন তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের নির্বাচন করবেন—তখন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা এবং সবচেয়ে যোগ্য, শ্রেষ্ঠ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও আমানতদার ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া। এখানে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে ঘুষের মতো বিষয়গুলোকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এটি সর্বজনবিদিত যে, পূর্ণতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাই জনকল্যাণমূলক বড় দায়িত্বগুলো অর্পণের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যাতে নিয়োগপ্রাপ্তরা দক্ষতা ও আমানতদারির জন্য সুপরিচিত হন; ফলে কর্মসমূহ দক্ষতার মাধ্যমে নিখুঁত হবে এবং সম্পদ আমানতদারির মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে।

দশম দায়িত্ব: শাসনকার্য পরিচালনা ও অবস্থাসমূহ সশরীরে তদারকি করা; যাতে তিনি উম্মাহর রাজনীতি এবং দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ সুচারুভাবে করতে পারেন। ভোগ-বিলাস কিংবা ইবাদতে মশগুল হওয়ার অজুহাতে সব দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাবে না। কেননা কখনো আমানতদার ব্যক্তি খিয়ানত করতে পারে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও প্রতারণা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানিয়েছি; সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" [সুরা সাদ: ২৬]। সুতরাং...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সরাসরি পরিচালনার পরিবর্তে (মানুষের ওপর) দায়ভার অর্পণ করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত নেই, এমনকি এর বিপরীতকারীকে গোমরাহির বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এটি দ্বীনের বিধান এবং খিলাফতের পদের কারণে তাঁর ওপর অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও, এটি প্রতিটি দায়িত্বশীলের জন্য রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা.) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

তবে এর অর্থ এই নয় যে, খলিফা কখনোই দায়িত্ব অর্পণ বা প্রতিনিধি নিয়োগের আশ্রয় নেবেন না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি গভর্নর, সহযোগী এবং মন্ত্রীদের সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব বরাদ্দ করবেন। তবে তাকে অবশ্যই এই সকলের ওপর নজরদারি করতে হবে এবং তাদের অবস্থা তদারকি করতে হবে, কারণ ইতিপূর্বে উল্লিখিত তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব এটিই। আর যেহেতু কখনো আমানতদার ব্যক্তিও বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও প্রতারণা করতে পারে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দি বলেছেন।

জনৈক গবেষক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রজাদের অবস্থা তদারকিতে খলিফার অধিকার দুই ভাগে বিভক্ত: হয় তা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (খাছ) ক্ষেত্রে, অথবা সাধারণ জনগণের (আম) ক্ষেত্রে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিচারক এবং যারা সুলতানের পক্ষ থেকে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং বাদশাহর ওপর ওয়াজিব হলো তাদের প্রত্যেকের অবস্থা, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, তাদের কর্মতৎপরতা, তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য এবং তাদের থেকে যা প্রকাশ পায় তা তদারকি করা। যদি তিনি তাকে সঠিক পথে অবিচল পান, তবে তার প্রশংসা করবেন এবং তাকে পুরস্কৃত করবেন; আর যদি এর ব্যতিক্রম দেখেন, তবে তাকে বরখাস্ত করবেন।

আর গ্রাম, জনপদ, কৃষিজমি ও বিভিন্ন স্থাপনায় বসবাসরত সাধারণ জনগণ বা প্রজাদের অবস্থার সাথে যা সংশ্লিষ্ট, সেক্ষেত্রেও তাদের খবরাখবর নেওয়া, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, তাদের থেকে কী প্রকাশ পাচ্ছে তা দেখা এবং তাদের বিষয়াবলি পরিচালনা ও সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অপরিহার্য।

সম্ভবত এ বিষয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অবশ্যই পালনীয় এবং যা কোনোভাবেই অবহেলা করা বা বর্জন করা সমীচীন নয়, তা হলো—যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট বিধান (নস) নেই এবং যে বিষয়ে কোনো ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেগুলোতে ইমামের জন্য পরামর্শ (শূরা) করা ওয়াজিব। বিশেষ করে শাসনকার্য ও রাজনীতির বিষয়াবলিতে, যা সাধারণত জনস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। কারণ ইসলামি শাসনব্যবস্থায় খলিফা কোনো নিরঙ্কুশ শাসক নন; বরং তিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সাধারণ কর্মপদ্ধতির দলিলাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ।

পরামর্শ করার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং যারা তাঁর অধস্তন বা নিম্নে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য। কারণ উম্মাহর জনস্বার্থ অনেক এবং তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়; এছাড়া সময় ও স্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আর এ কারণেই পরামর্শ করা অপরিহার্য।

সারকথা: এটি বলা সম্ভব যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইমাম বা শাসকের দায়িত্বসমূহ মূলত দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, দ্বীনের আলোকে পার্থিব বিষয়াবলি পরিচালনা, দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদন, সকল উপায়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রচার এবং ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মূল্যায়নের দিকে ফিরে যায়। কতই না ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐসব রাষ্ট্র যেখানে আলেমদের তুচ্ছজ্ঞান করা হয় এবং অযোগ্য দাবিদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইমামের ওপর আবশ্যিক হলো তাঁর প্রজাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা এবং এক্ষেত্রে উম্মাহর পূর্বসূরিদের (সালাফ) ঐ আদর্শে সজ্জিত হওয়া যা খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিদ্যমান ছিল। কেননা তাঁদের ইতিহাসে এমন সব উদাহরণ রয়েছে যা অনুসরণ করা আবশ্যক।

যদি আমরা খলিফার দায়িত্বের বিষয়ে ইসলামী রাজনৈতিক ফিকহ-এ নির্ধারিত বিষয় এবং আধুনিক সংবিধানে রাষ্ট্রের যে কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে তার মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করি, তবে আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক সাংবিধানিক ফিকহ রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে আইন প্রণয়ন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে। এই ক্ষমতাগুলো হুবহু মুসলিম ফকীহগণ ইমাম বা খলিফার দায়িত্ব সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে আমরা আহরণ করতে পারি। তবে ইসলামী ব্যবস্থার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি, যেখানে আইন প্রণয়ন বা বিধান প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। সেখানে শরীয়তই হলো অধিকার ও কর্তব্যের নির্ধারক, চাই তা শাসকের ক্ষেত্রে হোক কিংবা প্রজাদের ক্ষেত্রে।

তবে এর পাশাপাশি ইসলামী ব্যবস্থার সেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে যা ইমামের কার্যাবলিকে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করে; এই ক্ষমতাগুলো ভোগ বা চর্চা করার আগে এগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়ে তাঁকে উম্মাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হয়।

এটি সুবিদিত যে, শাসক হলেন উম্মাহর প্রতিনিধি (উকিল), তাই তাঁর ভুলত্রুটির জন্য উম্মাহর নিকট তাঁর দায়বদ্ধতা নির্ধারিত। শাসনক্ষমতা তাঁকে এমন কোনো বিশেষ মর্যাদা দান করে না যা তাঁকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। ফলে শাসক ও শাসিত...

হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তির অধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সমান; কারণ শরীয়তের মানদণ্ডে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া ও নেক আমল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে নিজেকেই প্রথম সাংবিধানিক দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) নবী (সা.)-এর অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন নবী (সা.) বললেন: "হে ফযল, আমার মাথায় এই পট্টিটি বেঁধে দাও।" তিনি তা বেঁধে দিলেন। এরপর নবী (সা.) বললেন: "তোমার হাতটি আমাকে দেখাও।" ফযল (রা.) বলেন: অতঃপর নবী (সা.) আমার হাত ধরলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন, এমনকি তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে পাওনা অধিকারসমূহ আদায়ের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, আর আমি তো কেবল একজন মানুষ। সুতরাং আমি যদি কারো সম্মানে আঘাত করে থাকি, তবে এই যে আমার সম্মান, সে যেন তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর আমি যদি কারো শরীরে আঘাত করে থাকি, তবে এই যে আমার শরীর, সে যেন তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর আমি যদি কারো সম্পদ নিয়ে থাকি, তবে এই যে আমার সম্পদ, সে যেন তা থেকে গ্রহণ করে। তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় যার কাছে আমার কোনো দেনা ছিল এবং সে তা আদায় করে নিয়েছে অথবা আমাকে দায়মুক্ত করে দিয়েছে, যাতে আমি আমার রবের সাথে

এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারি যে, আমি সবার পাওনা থেকে মুক্ত।"

যদি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর অবস্থা এমন হয়, তবে তাঁর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের খলিফা, শাসক ও ইমামদের ক্ষেত্রে কি তা আরও বেশি প্রযোজ্য হওয়ার দাবি রাখে না?!

এর পাশাপাশি আল্লাহর সামনে পরকালীন জবাবদিহিতার বিষয়টিও রয়েছে, যদি শাসক আমানতের খেয়ানত করেন এবং প্রজাদের অধিকার নষ্ট করেন। শরীয়ত এ বিষয়ে সতর্ক করেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-বুঝে তোমাদের আমানতসমূহেরও খেয়ানত করো না।" [আনফাল: ২৭]

আল্লাহ তাআলা সূরা আল-কাসাসে ফেরাউনের ঔদ্ধত্য ও যমিনে তার ফাসাদ সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করার পর ইরশাদ করেছেন: "আর আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম যারা আগুনের (জাহান্নামের) দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (৪১) আর এ পৃথিবীতে আমি লানতকে তাদের পশ্চাদগামী করেছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাতদের অন্তর্ভুক্ত। (৪২)" [কাসাস: ৪১, ৪২]

দ্বাদশ পাঠ
শরয়ি রাজনীতি

আশ-শাওকানি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "অর্থাৎ আমি তাদেরকে কাফেরদের মধ্যে এমন নেতা বানিয়েছি যাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা হয়। তারা কুফরির ওপর অবিচল থাকা এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করার মাধ্যমে যেন তাদের অনুসারীদের আগুনের দিকে ডাকছে; কারণ তারা অন্ধ অনুকরণের বশবর্তী হয়ে তাদের পথ অনুসরণ করেছে ও সেই পথে চলেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং মানুষের ওপর নিযুক্ত ইমাম একজন রাখাল এবং তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।" এবং তিনি ﷺ বলেন: "আল্লাহ কোনো বান্দাকে যদি কোনো প্রজাসাধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে তার অধীনস্থদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।" তিনি ﷺ আরও বলেন: "আল্লাহ যাকে মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেন, আর সে তাদের প্রয়োজন পূরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় (তাদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে), কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার প্রয়োজনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন।" এবং তিনি ﷺ বলেন: "হে আবু যর! এটি একটি আমানত। আর কিয়ামতের দিন এটি হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে একে হকের সাথে গ্রহণ করেছে এবং এর হক আদায় করেছে।" এটি তিনি তখন বলেছিলেন যখন আবু যর (রা.) তাঁর কাছে শাসনক্ষমতা বা নিয়োগ লাভের প্রার্থনা করেছিলেন।

এগুলোই ছিল ইমামের দায়িত্ব বা কার্যাবলি।

ইমামের অধিকারসমূহ:

আমরা এখন ইমামের অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। তাঁর ওপর যেমন কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা তাঁকে পালন করতে হয়, ঠিক তেমনি প্রজাসাধারণ বা শাসিতদের ওপর তাঁর কিছু অধিকারও রয়েছে। এই অধিকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

প্রথমত: আনুগত্যের আবশ্যকতা:

জনকর্তৃপক্ষের ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থেকে এটি সাব্যস্ত হয় যে, তারা যা আদেশ করবে বা নিষেধ

করবে তাতে তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক। এই বাধ্যবাধকতা কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যারা সাধারণ বায়আতের মাধ্যমে এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলদের নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হয়েছে; বরং তা সেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপরও বর্তায় যারা এতে একমত হতে পারেনি। এর কারণ হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠরা যা সাব্যস্ত করেছে তা সংখ্যালঘুদের মেনে নিতে হয় সেই সব নির্দেশনার ভিত্তিতে যা জামাআতের (সম্মিলিত সমাজ) শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার বিধান দেয়।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)
দ্বাদশ পাঠ

ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ কর্তৃপক্ষের পক্ষে উম্মাহর অধিকার নিশ্চিত করা ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না উম্মাহর সদস্যরা ইসলামী শরীয়াহর বিধানের গণ্ডির মধ্যে গৃহীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। আর যেহেতু সাধারণ কর্তৃপক্ষ আল্লাহর হক এবং উম্মাহর অধিকারসমূহ রক্ষায় কেবল তখনই সক্ষম হতে পারে যখন তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়, তবুও এই আনুগত্য নিরঙ্কুশ নয়। বরং শরীয়ত প্রণেতা একে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ও নিয়মনীতি দ্বারা আবদ্ধ করে দিয়েছেন যা একে নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে যেতে বাধা দেয়। আমরা প্রথমে আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার শরয়ী উৎসসমূহ নিয়ে আলোচনা করব যা উম্মাহর জন্য মেনে চলা আবশ্যক, অতঃপর আমরা এই আনুগত্যের পরিধি বা গণ্ডি স্পষ্ট করব।

আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার শরয়ী উৎসসমূহ:

সাধারণ কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত আনুগত্যের অপরিহার্যতা প্রমাণের স্বপক্ষে কুরআনুল কারীম, সুন্নাহ এবং ইজমা (ঐক্যমত) থেকে অকাট্য দলীলসমূহ একীভূত হয়েছে। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর (কর্তৃত্বশীলদের) আনুগত্য করো।" [আন-নিসা: ৫৯]। মুফাসসির ও ফকীহগণ এই আয়াতের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হলো—এটি ইমাম ও শাসকবর্গের আনুগত্য করা ওয়াজিব করে। আর এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি যা মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কাজ, তাতে তাদের আনুগত্য করাও আবশ্যক।

সুন্নাহর মধ্যেও অসংখ্য দলীল রয়েছে যা মুসলিমদের মধ্যকার উলুল আমরের আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিকে অপরিহার্য করে। এসকল দলীলের মধ্যে অন্যতম হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমীরের আনুগত্য করল, সে মূলত আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্য হলো, সে মূলত আমারই অবাধ্য হলো।" তিনি আরও বলেন: "মুসলিম ব্যক্তির জন্য (শাসকের নির্দেশ) শোনা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক, চাই সে তা পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক, যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপাচারের আদেশ দেওয়া হয়। আর যদি তাকে পাপাচারের আদেশ দেওয়া হয়, তবে আর কোনো শোনা বা আনুগত্য নেই।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: "তোমরা (নির্দেশ) শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর কোনো হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর নিযুক্ত করা হয়।" তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে যাবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।"

শরয়ি রাজনীতি
দ্বাদশ পাঠ

...জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু)) এবং তিনি আরও বলেন: ((যে ব্যক্তি তার আমিরের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখবে যা সে অপছন্দ করে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হবে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুই বরণ করবে।))

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলসমূহের পাশাপাশি উলুল আমরের (কর্তৃপক্ষ) নির্দেশিত বা নিষিদ্ধ বিষয়ে আনুগত্য করার আবশ্যকতা সম্পর্কে ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই আদেশ ও নিষেধসমূহ শরয়ি বিধানদাতার নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে।

অতঃপর আমরা আনুগত্যের সীমা সম্পর্কে আলোচনা করছি এবং বলছি: যদি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযুক্ত ক্ষমতা শরীয়তের বিধানের সীমার মধ্যে থাকে— তবে এক্ষেত্রে সাধারণ মুসলিম এবং আলেম ও ফকিহদের জন্য তাদের আনুগত্য করা অনিবার্য। কারণ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চর্চা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কল্যাণ স্পষ্ট নয়, সেক্ষেত্রেও তাদের পক্ষ থেকে জারিকৃত আদেশ পালন করা ওয়াজিব বা আবশ্যক, যতক্ষণ না তা শরীয়তের কোনো অকাট্য দলীল বা মূলনীতির পরিপন্থী হয়।

এর কারণ হলো, আনুগত্যের আবশ্যকতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত দলীলসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত। আর জনগণের নিকট তার কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্পর্কিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এই অকাট্য দলীলগুলোর বিরোধিতার ভিত্তি হতে পারে না। অতএব, ইজতিহাদি আহকাম বা মাসআলাসমূহে যেখানে মতভেদ রয়েছে, সেখানে শাসকের ফয়সালা বা আদেশ মানা ওয়াজিব; যা শুধু সাধারণ মানুষের জন্যই নয়, বরং ফকিহদের জন্যও আবশ্যক। চাই তারা শাসকের মতের সাথে একমত পোষণকারী হোন কিংবা প্রাথমিকভাবে তারা শাসকের মতের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী হোন।

এমতাবস্থায় বিরোধিতাকারীদের জন্য এটি অপরিহার্য যে, তারা শাসকের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে ফতোয়া প্রদান করবে না। কারণ সেসব মাসআলায় যেখানে আলেমদের মতামত এক নয়, সেখানে শাসকের ফয়সালা বা হুকুম প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করা যায় না। সুতরাং এর বিপরীতে ফতোয়া দেওয়া বৈধ নয়। কেননা এক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী ফতোয়া দেওয়া আহকাম বা বিধানসমূহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এবং শাসকের হুকুমের ওপর আস্থাকে নড়বড়ে করে দেয়। আর এটি সেই জনস্বার্থের পরিপন্থী যার লক্ষ্যেই হুকুম নির্ধারণ করা হয়েছে।

দ্বাদশ পাঠ

যদি আনুগত্য ওয়াজিব হয় এবং শরীয়ত প্রণেতা উম্মাহর সকলের ওপর সুনিশ্চিত দলিলের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করেন, তবে এই ওয়াজিবের মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে জনকর্তৃপক্ষ শরীয়াহর মাকাসিদ (উদ্দেশ্যসমূহ) বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়; যার অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করা এবং বিধিবিধানগুলো রক্ষা করা তাদের জন্য অপরিহার্য।

ক্ষমতার চর্চা শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান এবং উম্মাহর ওপর আনুগত্য ওয়াজিব করার পেছনে যে লক্ষ্য নিহিত রয়েছে তার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ফলে জনকর্তৃপক্ষ যদি শরীয়ত প্রণেতা নির্ধারিত সীমানা লঙ্ঘন করে, তবে সেই আনুগত্য তখন আর আবশ্যক থাকে না; বরং আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, তখন আনুগত্য করা বৈধ নয়। মুফাসসিরগণ মহান আল্লাহর বাণীর তাফসীরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (কর্তৃত্বশীল) তাদের আনুগত্য করো।" [আন-নিসা: ৫৯]

সেখানে তারা সাব্যস্ত করেছেন যে, শাসকদের প্রতি আরোপিত আনুগত্য কোনো মৌলিক বা প্রাথমিক ওয়াজিব আনুগত্য নয়; বরং এটি একটি অনুগামী আনুগত্য যা মূলত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি শাসকদের আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশের পুনরাবৃত্তি থেকে বোঝা যায়, যা উলুল আমরের আনুগত্যের নির্দেশের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটি স্পষ্ট করে যে, এই আনুগত্যের উৎস মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শাসকের আনুগত্যের মধ্যে নিহিত, যা তাদের আদেশ পালন, নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং শরীয়ত প্রণেতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

একটি অকাট্য মূলনীতি হিসেবে এতে কোনো দ্বিধা নেই যে, আনুগত্য তখনই ওয়াজিব যখন জনকর্তৃপক্ষ ইসলামি ফিকহের বৈধতার নিয়মাবলী মেনে চলে। এর বাইরে আনুগত্য ওয়াজিব নয়; বরং এমতাবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য হলো তা প্রত্যাখ্যান করা ও প্রতিবাদ জানানো।

এটি তখন ঘটে যখন জনকর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশ কোনো স্পষ্ট দলিল (নাস), ইজমা বা সুস্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী হয়; অথবা নির্দেশটি কোনো জন্নী (প্রমাণসাপেক্ষ) দলিলের পরিপন্থী হয় এবং শাসক নিজে মুজতাহিদ নন, কিংবা তিনি শরীয়াহ বিরোধী সিদ্ধান্ত জারির ক্ষেত্রে ওয়াজিব শুরা (পরামর্শ) গ্রহণ করেননি—যা এই বিষয়ে উম্মাহর অধিকাংশ আলেম ও ফকিহদের অভিমত।

দ্বাদশ পাঠ

অনুরূপভাবে অবাধ্যতা তখনি সংঘটিত হয়, যখন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ এমন শরয়ি বিধানের পরিপন্থী হয় যা সাধারণ বা বিশিষ্ট কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। এমতাবস্থায় এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির আশঙ্কায় কারো জন্যই আনুগত্য করা আবশ্যক বা ওয়াজিব নয়।

একইভাবে অবাধ্যতা সেই সকল ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয় যেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জারিকৃত নির্দেশ মুসলিমদের সাধারণ জনস্বার্থ ব্যতীত অন্য কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে; যেমন ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা। এমতাবস্থায় আনুগত্য আর অপরিহার্য থাকে না।

সুতরাং আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয় যদি মুসলিম শাসক তার বিচারকার্যে অন্যায়কারী ও জালিম হয় এবং প্রজাদের অধিকার খর্ব করে। এটিই কেউ কেউ এই বলে সাব্যস্ত করেছেন যে, আনুগত্য কেবল ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্যই; কেননা জালিম শাসকের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দায়মুক্ত। ইমাম আলী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "ইমামের ওপর কর্তব্য হলো আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করা এবং আমানত রক্ষা করা; যখন তিনি তা করবেন, তখন প্রজাদের ওপর কর্তব্য হবে তাঁর কথা শোনা ও আনুগত্য করা।"

যদিও আনুগত্য ইসলামী আইন কর্তৃক নির্ধারিত কিছু শর্ত ও সীমার দ্বারা আবদ্ধ, তবুও কিছু ক্ষেত্রে এই আনুগত্য নিরঙ্কুশ হতে পারে এবং মুসলিমদের জন্য তা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এমনকি যদি তা সাধারণ পরিস্থিতির জন্য শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থীও হয়, যখন জরুরি অবস্থা বা জরুরত তা দাবি করে।

আবার আনুগত্য সেই ক্ষেত্রেও ওয়াজিব হতে পারে যখন জরুরত বা জরুরি অবস্থা কেবল প্রজাদের ওপর আপতিত হয়; অর্থাৎ এমন সকল ক্ষেত্রে যেখানে আনুগত্য না করলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে অথবা উম্মাহর ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ জাতীয় পরিস্থিতিতে মূলত সেই বিশেষ প্রয়োজন বা জরুরতই সরকারি কর্তৃপক্ষের আদেশ ও সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলাকে অপরিহার্য করে তোলে।

৫৭১

পৃষ্ঠা 122

শরয়ি রাজনীতি

দ্বাদশ পাঠ

দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের মানদণ্ড হলো দুটি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত হালকা ও সহজতরটি বেছে নেওয়া। সুতরাং, যদি আনুগত্য না করার ফলে উদ্ভূত ক্ষতি জনকর্তৃপক্ষের নির্দেশসমূহ পালনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই নির্দেশগুলো গ্রহণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এমতাবস্থায় অধিকতর গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধের নিমিত্তে আনুগত্য করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

এর বিপরীতে, যদি আনুগত্য থেকে উদ্ভূত ক্ষতি এই সিদ্ধান্তগুলো লঙ্ঘনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়, তবে আনুগত্য না করা ছাড়া কোনো উপায় নেই; যাতে আইনের পরিপন্থী নির্দেশ পালনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়, যেমন যদি সেটি উম্মাহর বিনাশ ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেই অনুযায়ী, স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য প্রণীত ইসলামি আইনের সীমারেখা এমন প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয় না যেখানে আনুগত্য না করার ফলে উম্মাহর ওপর মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তবে সামর্থ্য ও ইচ্ছাধীন অবস্থায় সাধারণ নিয়মের প্রয়োগ থেকে কোনো নিষ্কৃতি নেই, আর তা হলো—ইসলামি ফিকহের বৈধতার উৎসসমূহের সাধারণ নিয়মনীতির গণ্ডির মধ্যে আনুগত্য থাকা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত: তাকে সাহায্য করার আবশ্যকতা:

আনুগত্যের অধিকারের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ জনকর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে এবং উম্মাহর ঐক্য খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যেকোনো বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য। আনুগত্যের আবশ্যকতা যদি মূলত ইসলামি রাষ্ট্রে জনকর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত এখতিয়ার ও ক্ষমতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হাসিল করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে সহযোগিতার আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার লক্ষ্য হলো জামাআতের ঐক্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যেকোনো অপচেষ্টা

নস্যাৎ করা, চাই সেই অপচেষ্টা বৈদেশিক হোক—

অর্থাৎ এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে শত্রু ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্বকে লক্ষ্যবস্তু বানায়, অথবা তা অভ্যন্তরীণ হোক, যেমন কোনো বিদ্রোহী বা সীমা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি শাসনক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

রাষ্ট্র কিংবা কোনো অঞ্চলের স্বাধীনতা; এই সকল ক্ষেত্রে ফকীহগণ এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, মুসলিম উম্মাহ জনকর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে এবং তাদের সহায়তা প্রদান করতে দায়বদ্ধ।

কিছু ফকীহ সাহায্যের আবশ্যকতা (ওয়াজিবুন নুসরাহ) এবং আনুগত্যের আবশ্যকতার (ওয়াজিবুত তাআহ) মাঝে গুলিয়ে ফেলেন এবং মনে করেন যে, আনুগত্যের আবশ্যকতা সাহায্যের আবশ্যকতারই অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই মতটি গ্রহণ করি না, কারণ তারা দুটি দিক থেকে ভিন্ন:

প্রথম দিক: আনুগত্যের আবশ্যকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিতে তৈরি হয় যেখানে শাসিতদের ওপর কেবল একটি নেতিবাচক দায়বদ্ধতা বর্তায়। এর মূল দিকটি হলো জনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা এবং তাদের বিরোধিতা না করার মাধ্যমে মুসলিম জামাআতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আবশ্যকতাটি—যা হলো সাহায্য—তা সকল ক্ষেত্রে মুসলিম জামাআতের ওপর একটি নির্দিষ্ট ইতিবাচক দায়বদ্ধতা আরোপ করে। এটি দাবি করে যে, জনকর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক যেকোনো আক্রমণ বা আঘাতের মোকাবিলায় বিদ্যমান ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে তারা তাদের সাধ্যমতো সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করবে।

দ্বিতীয় দিক: সাহায্যের আবশ্যকতা বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার পাশাপাশি মুসলিম জামাআতকে বিচ্ছিন্নতা ও পতন থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যও রাখে। এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়, যখন এক সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ফিতনার সময় কী করণীয়? তিনি বলেছিলেন: "তুমি মুসলিমদের জামাআত এবং তাদের ইমামের সাথে লেগে থাকবে।"

সাহায্যের আবশ্যকতার পরিধি:

সাহায্যের আবশ্যকতা আনুগত্যের আবশ্যকতার মতোই কোনো নিরঙ্কুশ বিষয় নয় যা মুসলিম উম্মাহ সব ক্ষেত্রে পালন করতে বাধ্য। বরং এটি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন হয়; বিশেষত জনকর্তৃপক্ষের ওপর যে ভুল বা বিপদ ঘনিয়ে আসছে তা যদি...

দ্বাদশ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (ইসলামি রাজনীতি)

ইসলামি রাষ্ট্র বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। এই বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয় এই ভিত্তিতে যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ উম্মাহর সম্মতি ও ঐচ্ছিক পছন্দের অধিকারী এবং ইসলামি শরীয়তের বিধান পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কি না, নাকি তারা ক্ষমতা দখলকারী এবং শারে' (আইনদাতা) কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও বিধান পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়।

যদি বিপদ বাহ্যিক হয়, তবে সাহায্যের দায়িত্বটি একটি নিরঙ্কুশ ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো মুসলমানের জন্যই এই দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে থাকা বা অবহেলা করা বৈধ নয়; চাই ইসলামি রাষ্ট্রের সেই সাধারণ কর্তৃপক্ষ ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা অত্যাচারী। কারণ, এখানে বিপদটি সরাসরি ইসলামি সমাজের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত এবং এর উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করা ও শত্রুদের হাতে এর পতন ঘটানো।

তাই সাধারণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জুলুম ও অত্যাচার প্রকাশ পেলেও কেউ তাদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না। কেননা এই অবস্থায় সাহায্যের মূল লক্ষ্য শাসন কর্তৃপক্ষ নিজে নয়, বরং ইসলামি রাষ্ট্রকে শত্রুদের হাতে পড়া থেকে রক্ষা করা। তাছাড়া, জিহাদের আবশ্যকতা অনুযায়ী শত্রুদের প্রতিহত করা একটি ধর্মীয় ফরজ। এর শরয়ী ভিত্তি হলো আল্লাহর রাসুলের বাণী: "জিহাদ তোমাদের ওপর প্রত্যেক আমিরের সাথে ওয়াজিব, সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী, এমনকি সে কবিরা গুনাহ করলেও।"

তবে যদি আক্রমণটি অভ্যন্তরীণ হয়—যা মূলত কোনো গোষ্ঠীর বিদ্রোহ এবং কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতার মাধ্যমে ঘটে থাকে—তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা দখলকারী কি না অথবা তারা উম্মাহর মাধ্যমে শরীয়তের বিধান মেনে ক্ষমতায় এসেছে কি না, তার ওপর ভিত্তি করে হুকুম পরিবর্তিত হয়। যদি জোর-জবরদস্তি ও শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হয়ে থাকে, তবে মুসলমানদের জন্য সেই কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা আবশ্যক নয়। বরং এর বিপরীতে, যদি কোনো বিদ্রোহী এমন থাকে যার লক্ষ্য হলো সেই অবৈধ কর্তৃপক্ষকে উৎখাত করে পুনরায় ইসলামি আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা, তবে মুসলমানদের উচিত তাকে সাহায্য করা। কারণ এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো ইসলামি সাধারণ আইনের নিয়ম অনুযায়ী একটি সঠিক সাধারণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু যদি এই বিদ্রোহী আইনের শাসনে ফিরে আসার লক্ষ্য না রাখে, বরং সে নিজেও ক্ষমতা দখল করতে চায়—তবে তাকে সাহায্য করা ওয়াজিব নয়; কারণ তাদের প্রত্যেকেই এমন একটি বিষয়ের জন্য একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত যা তাদের কারোর জন্যই

বৈধ নয়। আর তাদের কাউকেই সাহায্য বা সমর্থন করা ওয়াজিব নয়।

পক্ষান্তরে, যদি জনকর্তৃপক্ষ শরীয়াহর বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে এবং ইসলামী শরীয়াহর বিধানের প্রতি অনুগত থাকে—তবে এই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো বিদ্রোহের বিপক্ষে তাদের সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। তেমনিভাবে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার ওপর চড়াও হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে করা যেকোনো প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়াও ওয়াজিব।

আর যদি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণ হয় তাদের পক্ষ থেকে ঘটা কোনো জুলুম, তবে মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্য সেই জুলুম থেকে তাদের অবিলম্বে ফিরে আসা ওয়াজিব; কারণ জুলুমের কারণে বিদ্রোহ করাকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ গণ্য করা হয় না।

তৃতীয়ত: মুসলমানদের সম্পদ থেকে তার জন্য এমন পরিমাণ অর্থ থাকা যা তার এবং তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়:

অর্থাৎ: তার জন্য এমন একটি বেতন নির্ধারণ করা যা অপব্যয় বা কার্পণ্য ছাড়াই তার ও তার পরিবারের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হয়; কারণ তিনি দিন-রাত মুসলমানদের সাধারণ জনস্বার্থের কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য উপার্জন করার মতো সময় তার কাছে অবশিষ্ট থাকে না।

ইবনে সা'দ 'আত-তাবাকাত'-এ বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবু বকর খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি সকালে কাঁধে কাপড় নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—তাঁদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন—এর সাথে তাঁর দেখা হলো। তাঁরা তাঁকে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বললেন: "বাজারে।" তাঁরা বললেন: "আপনি একি করছেন অথচ আপনি মুসলমানদের সকল বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন?!" তিনি বললেন: "তাহলে আমি আমার পরিবারকে কোত্থেকে খাওয়াব?" তিনি তাঁকে বললেন: "চলুন, আমরা আপনার জন্য কিছু বরাদ্দ করি।" অতঃপর তিনি তাঁদের সাথে গেলেন এবং তাঁরা তাঁর জন্য প্রতিদিন অর্ধেক বকরী বরাদ্দ করলেন। আর যখন আবু বকর দেখলেন যে, তাঁর জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না, তখন তিনি মুসলমানদের নিকট তা বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। ফলে তাঁরা তাঁর বরাদ্দ আরও পাঁচশত দিরহাম বাড়িয়ে দেন।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

যখন উমর ইবনুল খাত্তাব আবু বকরের পর মুসলিমদের শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুসলিমদের সম্পদ থেকে কিছুই গ্রহণ না করে অতিবাহিত করেন। অবশেষে তার মধ্যে অভাব-অনটন—অর্থাৎ তীব্র দরিদ্রতা—দেখা দেয়। তখন তিনি এ মাল থেকে নিজের জন্য কতটুকু গ্রহণ করা সমীচীন হবে সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন; যেহেতু তিনি নিজের ব্যক্তিগত কাজের পরিবর্তে মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন উসমান বললেন: "আপনি নিজে আহার করুন এবং অন্যদের আহার করান।" আর আলী বললেন: "দুপুরের ও রাতের খাবার।" এরপর উমর সে অনুযায়ী গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তিনি নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য প্রতিদিন দুই দিরহাম ব্যয় করতেন। তিনি তার হজ্জের সফরে একশ আশি দিরহাম ব্যয় করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "আমরা এ সম্পদের বিষয়ে অপব্যয় করে ফেলেছি।"

এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, খলিফার জন্য বায়তুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ করা একটি অধিকার, যদিও তিনি সচ্ছল হন। কারণ তিনি নিজেকে মুসলিমদের স্বার্থে নিবেদিত রেখেছেন এবং নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ের পরিবর্তে তাদের কল্যাণের কাজে ব্যস্ত

হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি রাষ্ট্রের অন্য যেকোনো কর্মকর্তার মতো, এমনকি তিনি সচ্ছল হলেও তার জন্য এটি বৈধ।

আর বায়তুল মাল থেকে আলী ইবনে আবি তালিব এবং উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একে নিষিদ্ধ বা অবৈধ হওয়া প্রমাণ করে না; কারণ এর অর্থ হলো তারা তাদের অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। যদি তারা বায়তুল মাল থেকে সম্পদ গ্রহণ করতেন তবে তাতে কোনো দোষ ছিল না। কেননা আবু বকর ও উমর—আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন—মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অংশ গ্রহণ করতেন অথচ তারা মুসলিমদের মধ্যে সচ্ছল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারণ মানুষের নিজ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে কোনো বাধা নেই। আর খলিফা, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ের পরিবর্তে মুসলিমদের সার্বিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন।

চতুর্থত: তাকে নসিহত বা সদুপদেশ প্রদান করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছেন, দ্বীন হলো নসিহত বা কল্যাণকামিতা: "দ্বীন হলো নসিহত।" তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। আমরা বললাম: কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের নেতা ও সাধারণ জনগণের জন্য।"

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের ওপর এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত; যেহেতু তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।" [সূরা আল-ইমরান: ১১০]।

দ্বাদশ পাঠ
শরয়ি রাজনীতি

এই প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, মুসলিম আলেমগণ ইমামের যে সকল দায়িত্ব ও অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, তা আধুনিক আইনবিদদের বর্ণিত "রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী"র কাছাকাছি। আল-মাওয়ার্দী এবং আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ বিষয়ে যারা লিখেছেন, তাঁদের যুগে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানই ছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্র, অথবা বিষয়টি প্রায় এমনই ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী অধিকতর নমনীয় ও পরিবর্তনশীল, যা সময়, স্থান, শাসন ব্যবস্থার ধরন এবং শাসনের দর্শন ও জনগণের পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইমামের শাসনের অবসান, ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ

আমরা বলব: ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বহাল থাকা একটি মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্বের জন্য তাঁর যোগ্যতার ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভরশীল। নেতৃত্বের পদের জন্য যে সকল শর্তাবলি কাম্য, যতক্ষণ সেগুলো বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ এই যোগ্যতাও বহাল থাকে। এই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা পদত্যাগকে আবশ্যক করে তোলে, যাতে অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি সেই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। আমরা এই বিষয়ে দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব: ইমাম কর্তৃক স্বয়ং পদত্যাগ এবং ইমাম ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে তাঁর অপসারণ।

প্রথম বিষয়: রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বয়ং পদত্যাগ:

আমরা বলব: ফকীহগণ স্পষ্ট করেছেন যে, ইমামের স্বয়ং পদত্যাগ করা হয় কোনো অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে হতে

পারে—যেমন অসুস্থতা ও বার্ধক্য; অথবা কোনো অক্ষমতা বা দুর্বলতা ছাড়াও হতে পারে, বরং দুনিয়া ও আখেরাতের দায়ভার হালকা করার উদ্দেশ্যে পদত্যাগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে, অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট হুকুমের প্রেক্ষিতে। এ সকল অবস্থার প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে।

প্রথম অবস্থা: ইমাম তাঁর ওপর অর্পিত জনগণের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হওয়ার কারণে স্বয়ং পদত্যাগ করা। বার্ধক্য, অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনো কারণে যদি তিনি পদত্যাগ করেন, তবে তা কার্যকর হবে; কারণ যখন তাঁর শাসনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া নিশ্চিত হবে, তখন তাঁর কর্তৃত্বের অবসান হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। বরং তিনি যখনই তা অনুভব করবেন, তখনই তাঁর ওপর পদত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

তিনি মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নিজেকে পদচ্যুত করেন। এই অক্ষমতা মানুষের কাছে প্রকাশ্য হোক অথবা তিনি নিজে তা অনুভব করুন না কেন—উভয় ক্ষেত্রেই এটি তাঁর এই পদ ত্যাগ করার কারণ হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: তিনি অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে নয়, বরং দুনিয়াতে নিজের ওপর অর্পিত বোঝা কমানোর জন্য পদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে মুসলমানদের প্রধান নেতার ওপর অর্পিত মহান দায়িত্বসমূহ পালনে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে না হয়; অথবা পরকালে নিজের হিসাব হালকা করার প্রত্যাশায়। এই বিষয়ে ফকীহগণের দুটি অভিমত রয়েছে:
প্রথমটি: এর মাধ্যমে তিনি পদচ্যুত হয়ে যাবেন; কারণ যেমনভাবে তাঁর জন্য বায়আতে সাড়া দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, তেমনিভাবে পদে বহাল থাকাও তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।
দ্বিতীয়টি: তিনি পদচ্যুত হবেন না; কারণ আবু বকর সিদ্দিক মুসলমানদের কাছে তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যদি ইমামের নিজের পক্ষ থেকে পদত্যাগ কার্যকর হতো, তবে তিনি তাঁদের কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করতেন না।

তৃতীয় অবস্থা: ইমাম যদি মুসলমানদের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা অথবা দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা কমানোর আকাঙ্ক্ষার মতো কোনো ওজর ছাড়াই নিজেকে পদচ্যুত করেন, তবে ফকীহগণ এই বিষয়ে তিনটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:
প্রথম মত: এমতাবস্থায় তিনি পদচ্যুত হবেন না। এই মতের স্বপক্ষে দলিল হলো যে, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অধিকার মুসলমানদের, তাঁর নিজের নয়।
দ্বিতীয় মত: তিনি পদচ্যুত হয়ে যাবেন; কারণ তাঁকে দায়িত্বে বহাল থাকতে বাধ্য করা হলে তা তাঁর পরকাল ও ইহকালের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।
তৃতীয় মত: বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ। ইমাম যদি অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত না করেন অথবা তাঁর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেন, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই পদচ্যুত হবেন না। আর যদি তিনি নিজের চেয়ে উত্তম বা তাঁর সমপর্যায়ের কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেন, তবে এ ক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে: এক মতে তিনি পদচ্যুত হবেন, আর অন্য মতে তিনি পদচ্যুত হবেন না।

আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

দ্বিতীয় মাসআলা: রাষ্ট্রপ্রধানের নিজের পক্ষ থেকে হওয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে পদচ্যুতি:

মুসলিমরা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি এমন কোনো কাজ না করেন যা তার ন্যায়পরায়ণতাকে নষ্ট করে অথবা যদি তার অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে, তবে উম্মাহর জন্য তাকে পদচ্যুত করা জায়েয নয়।

কেউ কেউ বলেন: "কোনো অঘটন কিংবা অবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত ইমামকে পদচ্যুত করা জায়েয নয়, আর এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়; এর কারণ হলো, তৃতীয় খলিফা উসমানের যুগে যে ফিতনা প্রজ্বলিত হয়েছিল সেই সময় মুসলিমগণ এমন দুটি মতের ওপর বিভক্ত হয়েছিলেন যার তৃতীয় কোনো বিকল্প ছিল না। তাদের মধ্যে একদল বলেছিলেন: তিনি এমন কিছু বিষয় ঘটিয়েছেন যা তার পদের দায়িত্বসমূহকে ব্যাহত করেছে, ফলে তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন: তিনি এমন কোনো অঘটন ঘটাননি যা তার দায়িত্বসমূহকে ব্যাহত করে, ফলে তাকে পদচ্যুত করা জায়েয নয়। সুতরাং এই দুই মতের বাইরে যা কিছু আছে তা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। এছাড়াও ইমামকে এই পদে কেবল তখনই দায়িত্ব দেওয়া হয় যখন তার মধ্যে বিশেষ কিছু শর্ত পূর্ণ হয়। সুতরাং যখন তিনি দায়িত্বভার গ্রহণের পর এই শর্তগুলো হারিয়ে ফেলেন, তখন তাকে পদচ্যুত করার সংগত কারণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তার অবস্থা সঠিক থাকে এবং দ্বীনি বিষয়ে অথবা জনগণের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তার থেকে কোনো বিচ্যুতি প্রকাশ না পায়, তবে সেই মুহূর্তে তাকে পদচ্যুত করার পদক্ষেপ নেওয়া কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নেতৃত্বের পদ নিয়ে খেলা করার শামিল, যা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।"

আর যদি তার অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটে যার ফলে মুসলিমদের সার্বিক অবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অথবা দ্বীনি বিষয়ে অবনতি ঘটে, তবে তখন তিনি ইমামতের বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং এই পদ থেকে অপসারিত হওয়ার যোগ্য হয়ে যান।

উলামায়ে কেরাম সেইসব বিষয়সমূহ স্পষ্ট করেছেন যার মাধ্যমে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে কিছু বিষয় তার চরিত্র ও আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু বিষয় তার শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সময় উলামাদের মতভেদ থাকলে তা বর্ণনা করে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বলব:

যেসব কারণে ইমাম পদচ্যুত হন তার মধ্যে প্রথম বিষয়: ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ):

রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান, তবে তিনি সেই মুহূর্তেই প্রধানের পদ থেকে পদচ্যুত হয়ে যাবেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ কখনও মুমিনদের ওপর কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।" [আন-নিসা: ১৪১]

দ্বাদশ পাঠ

ইমামের পথের চেয়ে বড় পথ আর কী হতে পারে? আর একারণেও যে, ইমামকে এই পদে কেবল দ্বীন রক্ষা এবং দুনিয়াবি শাসনের জন্যই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি ইসলাম থেকে বিচ্যুত (মুরতাদ) হয়ে যান, তবে তার মাধ্যমে দ্বীন রক্ষার বিষয়টি কীভাবে নিশ্চিত হবে? দ্বীন থেকে তার বিচ্যুতি বা ধর্মত্যাগের মাধ্যমে ইমামতের উদ্দেশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যার মাধ্যমে ইমামতের উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়, তা ইমামতের চুক্তি ভঙ্গের কারণ হয়। সুতরাং ধর্মত্যাগ ইমামতের চুক্তি ভঙ্গের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি এমন এক সুস্পষ্ট বিষয় যা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

দ্বিতীয়ত: যে সকল বিষয়ের কারণে ইমাম অপসারিত হন: বুদ্ধি লোপ পাওয়া:

উলামায়ে কেরাম বুদ্ধি লোপ পাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিটি অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানও স্পষ্ট করেছেন। তারা বলেছেন: বুদ্ধি লোপ পাওয়া হয় সাময়িক হতে পারে যা থেকে আরোগ্যের আশা থাকে, যেমন—মূর্ছা যাওয়া; অথবা তা স্থায়ী হতে পারে যা থেকে আরোগ্যের আশা নেই, যেমন—উন্মাদনা ও বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়া। যদি তা সাময়িক হয় এবং আরোগ্যের আশা থাকে—যেমন মূর্ছা যাওয়া—তবে তা নেতৃত্বকে বাতিল করে না। সুতরাং তাদের জন্য তাকে পদচ্যুত করা বৈধ নয়; কারণ এটি একটি ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা মাত্র।

আর যদি তা স্থায়ী হয় যা থেকে আরোগ্যের আশা নেই—যেমন উন্মাদনা ও বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়া—তবে তা হয় নিরবচ্ছিন্ন হবে যার মাঝে কোনো সুস্থতার সময় থাকে না, অথবা এমন হবে যার মাঝে সুস্থতার সময় থাকে। যদি তা নিরবচ্ছিন্ন হয় এবং মাঝে কোনো সুস্থতার সময় না থাকে, তবে তা ইমামতের চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। কারণ এটি ইমামতের মূল উদ্দেশ্য পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর তা হলো—অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করা, পাওনা আদায় করা এবং মুসলিমদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তাছাড়া উন্মাদের ওপর অভিভাবকত্ব আরোপ করা ওয়াজিব, এমতাবস্থায় সে উম্মতের ওপর অভিভাবক হবে তা কীভাবে কল্পনা করা যেতে পারে?

আর যদি এমন সুস্থতার সময় থাকে যাতে সে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে, তবে দেখতে হবে তার অধিকাংশ সময় কি বিকারগ্রস্ততায় কাটে নাকি সুস্থতায়। যদি তার অধিকাংশ সময় বিকারগ্রস্ততায় অতিবাহিত হয়, তবে এর বিধান নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদনার মতোই হবে এবং এর মাধ্যমে ইমামতের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তার অধিকাংশ সময় সুস্থতায় কাটে, তবে এ বিষয়ে আলেমগণ দুইটি মতে বিভক্ত হয়েছেন: এক মত অনুযায়ী এটি ইমামতের চুক্তিকে বাতিল করে দেবে ঠিক যেমন শুরুতে তার সাথে চুক্তি করার ক্ষেত্রে এটি বাধা হিসেবে কাজ করে; কারণ এতে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ত্রুটি দেখা দেয়। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী: ইমামতের চুক্তি বাতিল হবে না, যদিও শুরুতে তার সাথে চুক্তি করার ক্ষেত্রে এটি বাধা হতো; কারণ চুক্তির শুরুতে পূর্ণ সুস্থতা বজায় থাকা জরুরি, কিন্তু চুক্তি থেকে অব্যাহতির ক্ষেত্রে পূর্ণ ত্রুটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

দ্বাদশ পাঠ

তৃতীয় বিষয় যার কারণে ইমাম অপসারিত হন: চিন্তা-গবেষণা বা কর্মে প্রভাব বিস্তারকারী ইন্দ্রিয়শক্তির বিলুপ্তি:

এই বিষয়ে আলোচনা তিনটি ত্রুটিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলো হলো: অন্ধত্ব, বধিরতা এবং মূকতা।

অন্ধত্ব প্রসঙ্গে: রাষ্ট্রপ্রধান যদি দায়িত্ব গ্রহণের পর এতে আক্রান্ত হন, তবে তার নেতৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে; যেভাবে বিচারকের দায়িত্ব (বিচারের যোগ্যতা) বাতিল হয়ে যায় এবং তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়। আর যদি তার দৃষ্টিশক্তি কেবল দুর্বল হয়ে যায় তবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে; যদি তিনি তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিদের চিনতে সক্ষম হন, তবে তা তার নেতৃত্বের জন্য দোষণীয় হবে না। অন্যথায় তার নেতৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে। আর রাতকানা রোগ বা রাতে দৃষ্টিশক্তি না থাকা—যেহেতু এটি শুরুতে নেতৃত্বের চুক্তি সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে না, তাই নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধক না হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

বধিরতা প্রসঙ্গে: রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর এটি আপতিত হলে তার নেতৃত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না, এ বিষয়ে উলামাগণ তিনটি মতের ওপর বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত এবং এটিই অধিক বিশুদ্ধ: এর মাধ্যমে তিনি অপসারিত হবেন, যেভাবে অন্ধত্বের কারণে অপসারিত হন; কারণ এটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও কর্মতৎপরতায় প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয় মত: তিনি অপসারিত হবেন না; কারণ ইশারা শ্রবণশক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়। আর নেতৃত্ব থেকে অপসারণ কেবল পূর্ণাঙ্গ ত্রুটির ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়।

তৃতীয় মত: তিনি লিখতে জানেন কি না, তার ভিত্তিতে পার্থক্য করা হবে। বলা হয়েছে: যদি তিনি লিখতে সক্ষম হন তবে বধিরতার কারণে তার নেতৃত্ব বাতিল হবে না, আর যদি লিখতে অক্ষম হন তবে তার নেতৃত্ব বাতিল হয়ে যাবে। কারণ লিখনী বোধগম্য হলেও ইশারা অনেক সময় অস্পষ্ট হতে পারে। তবে যদি তার শ্রবণশক্তি কেবল ভারী হয়—অর্থাৎ উচ্চস্বর ব্যতীত তিনি শুনতে পান না—তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা তার নেতৃত্বের জন্য কোনো ত্রুটি নয়। আর মূকতা বা কথা বলতে না পারার বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর আপতিত হলে এতেও বধিরতার ন্যায় মতভেদ বিদ্যমান। আর সঠিক মত হলো—যা ইতিপূর্বে বধিরতার ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হয়েছে—যে, এর ফলে তিনি অপসারিত হবেন।

এটি ছিল চিন্তা-গবেষণা বা কর্মে প্রভাব বিস্তারকারী ইন্দ্রিয়সমূহের বিলুপ্তি সংক্রান্ত আলোচনা। আর যেসব ইন্দ্রিয়ের বিলুপ্তি চিন্তা-গবেষণা বা কর্মে প্রভাব ফেলে না—যেমন ঘ্রাণশক্তি চলে যাওয়া বা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হারানো—উলামাদের ঐকমত্য অনুযায়ী এর ফলে রাষ্ট্রপ্রধান অপসারিত হবেন না।

৫৮১

পৃষ্ঠা 132

ইমাম অপসারিত হওয়ার চতুর্থ কারণ: এমন কোনো অঙ্গ হারানো যার অনুপস্থিতি কাজ বা চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

যেমন উভয় হাত বা উভয় পা বিচ্ছিন্ন হওয়া। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে যদি এমন কিছু ঘটে, তবে উম্মতের অধিকারসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে তিনি পদচ্যুত হবেন। পক্ষান্তরে, যদি এমন কিছু ঘটে যা কিছু কাজে বা চলাফেরায় প্রভাব ফেলে কিন্তু পুরোপুরি নয়—যেমন এক হাত বা এক পা বিচ্ছিন্ন হওয়া—তবে এ বিষয়ে আলেমগণ দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত (যা অধিক সঠিক): এর মাধ্যমে তিনি পদচ্যুত হবেন না, যদিও শুরুতে তাকে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধক ছিল; কারণ নেতৃত্বের চুক্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ সুস্থতাকে মানদণ্ড ধরা হয়, তাই পদ থেকে বিযুক্তির জন্য পূর্ণ অক্ষমতা বা ত্রুটিকে বিবেচনা করা হবে।

দ্বিতীয় মত: এর মাধ্যমে তিনি পদচ্যুত হবেন; কারণ এর ফলে রাষ্ট্রপ্রধান চলাফেরায় ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েন। তবে রাষ্ট্রপ্রধান যদি

এমন কিছু হারান যা কাজ বা চলাফেরায় কোনো প্রভাব ফেলে না—যেমন লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ কর্তন, নাক কাটা বা এক চোখ অন্ধ হওয়া—তবে তা তার নেতৃত্বে কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না।

ইমাম অপসারিত হওয়ার পঞ্চম কারণ: রাষ্ট্রপ্রধানের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অকার্যকর হয়ে পড়া।

এর অধীনে কয়েকটি পর্যায় রয়েছে:

প্রথম পর্যায়: রাষ্ট্রপ্রধান যদি তার কোনো সহযোগীর মাধ্যমে অবরুদ্ধ ও পরাভূত হন এবং সেই সহযোগী জাতির শাসনকার্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে, অথচ সে প্রকাশ্যে কোনো পাপাচার করছে না বা আনুগত্য থেকেও বের হয়ে যায়নি। এমতাবস্থায় আলেমগণ এর বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে দুটি দিক বিবেচনা করেন:

প্রথম দিক: রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তার যোগ্যতা কি এখনো বহাল আছে, নাকি এই স্বৈরশাসকের অধীনে দমিত হওয়ার কারণে তিনি এই পদের যোগ্যতা হারিয়েছেন?

দ্বিতীয় দিক: রাষ্ট্রপ্রধানের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এই স্বৈরশাসকের কর্মকাণ্ড ও আচরণসমূহ বহাল রাখা কি বৈধ হবে, নাকি বৈধ হবে না?

প্রথম দিকটির সাথে যা সংশ্লিষ্ট তা হলো: নেতৃত্বের জন্য তার যোগ্যতা কি এখনও বিদ্যমান আছে নাকি নেই? এ প্রসঙ্গে আলেমগণ বলেন: এটি তার নেতৃত্বে কোনো ত্রুটি তৈরি করে না, ফলে এই জবরদস্তির কারণে তিনি তার পদ থেকে অপসারিত হবেন না।

আর দ্বিতীয় দিকের সাথে যা সংশ্লিষ্ট তা হলো: এই স্বৈরশাসকের কর্মকান্ড কি অনুমোদন করা বৈধ হবে নাকি হবে না? এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি বিষয়গুলোর ওপর কর্তৃত্ব লাভ করেছে তার কার্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করা হবে। হয় তার কার্যাবলী দ্বীনের বিধান ও ইনসাফের দাবি অনুযায়ী হবে, নতুবা হবে না। যদি কার্যাবলী দ্বীনের বিধান ও ইনসাফের দাবি অনুযায়ী হয়, তবে তা অনুমোদন করা বৈধ হবে; কারণ তা অনুমোদন না করলে কিছু জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে, যা উম্মতের জন্য বিপর্যয় বয়ে আনবে। এমতাবস্থায় বিষয়টি এমন হবে যেন তিনি নিজেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্বের পদটি দখল করে নিয়েছেন।

পক্ষান্তরে তার কর্মকান্ড যদি দ্বীনের বিধান ও ইনসাফের দাবির পরিপন্থী হয়, তবে তা অনুমোদন করা বৈধ নয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর কর্তব্য হলো জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করা, যাতে এই দখলদার ব্যক্তির আধিপত্য ও কর্তৃত্ব দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা: রাষ্ট্রপ্রধানের বন্দি হওয়া। এই বন্দিদশা হয় মুশরিকদের হাতে হতে পারে অথবা মুসলিম বিদ্রোহীদের হাতে। যদি মুশরিকরা তাকে বন্দি করে, তবে হয় তার মুক্তির আশা থাকতে পারে অথবা সে ব্যাপারে নিরাশ হতে হতে পারে। যদি যুদ্ধ বা মুক্তিপণের মাধ্যমে তার মুক্তির আশা থাকে, তবে তিনি তার নেতৃত্বে বহাল থাকবেন এবং তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করা সমগ্র উম্মতের ওপর আবশ্যক। কিন্তু যদি তার মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হওয়া যায় অর্থাৎ প্রবল ধারণা জন্মে যে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মুক্তি পাবেন না, তবে এই বিষয়ের কারণে তিনি নেতৃত্ব থেকে অপসারিত বলে গণ্য হবেন। এমতাবস্থায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর ওপর কর্তব্য হলো উম্মতের নেতৃত্বের জন্য অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং তাকে প্রধান হিসেবে বায়আত প্রদান করা।

আর যদি মুসলিম বিদ্রোহীরা তাকে বন্দি করে, তবে সেক্ষেত্রেও দেখা হবে যে, তাদের হাত থেকে তার মুক্তির আশা আছে নাকি নেই। যদি মুক্তির আশা থাকে তবে তিনি তার নেতৃত্বে বহাল থাকবেন এবং তাকে এই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করা সমগ্র উম্মতের ওপর আবশ্যক। আর যদি তার মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হওয়া যায়, তবে বিদ্রোহীদের অবস্থা বিবেচনা করা হবে। তারা যদি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচন না করে থাকে, তবে বন্দি রাষ্ট্রপ্রধান...

দ্বাদশ পাঠ

আস-সিয়াহ আশ-শারইয়্যাহ

তাদের আনুগত্য তার নেতৃত্বের ওপর বজায় রাখা আবশ্যক; কারণ তার প্রতি আনুগত্যের শপথ (বায়াত) তাদের ওপর অপরিহার্য এবং তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। বিষয়টি তেমনই যেমনটি হতো যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে এমন অবস্থায় থাকতেন যেখানে তিনি তার সহযোগীদের দ্বারা অবরুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করা ওয়াজিব, যাতে তিনি রাষ্ট্রের বিষয়াদি পরিচালনা করতে পারেন প্রধান নেতার প্রতিনিধি হিসেবে, নিজে প্রধান নেতা হিসেবে নয়; যাতে উম্মাহর স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। বন্দী নেতা যাকে পছন্দ করেন তাকে স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার সক্ষমতা রাখেন। আর যদি তিনি তাতে সক্ষম না হন, তবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিষদ)-এর প্রতিনিধিত্বকারী উম্মাহর দায়িত্ব হলো এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা, যিনি উম্মাহর বিষয়াদি পরিচালনা করবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ উক্ত নেতার মুক্তি বা মৃত্যুর মাধ্যমে কোনো ফয়সালা করেন।

যখন নেতার মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তার প্রতিনিধি পদচ্যুত হয়ে যান এবং রাষ্ট্রের বিষয়াদি পুনরায় প্রধান নেতার সিদ্ধান্তের ওপর ন্যস্ত হয়। আর যখন বন্দী থাকা অবস্থায় খোদ প্রধান নেতাকেই পদচ্যুত করা হয় অথবা তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার প্রতিনিধি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে গণ্য হবেন না, যতক্ষণ না 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তাকে নতুন করে বায়াত প্রদান করে; কারণ তার প্রতিনিধিত্ব ছিল একজন বিদ্যমান নেতার পক্ষ থেকে, যা তার অবর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

যদি বিদ্রোহীরা নিজেদের জন্য এমন কোনো নেতা নিযুক্ত করে যার আনুগত্য তারা স্বীকার করে, তবে তাদের হাতে বন্দী প্রধান নেতা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য হবেন। কারণ বিদ্রোহীরা পৃথক ভূখণ্ডে চলে গেছে এবং মূল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আনুগত্য প্রত্যাহার করেছে, ফলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য তাদের পক্ষ থেকে সাহায্যের কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' প্রতিনিধিত্বকারী উম্মাহর ওপর ওয়াজিব হলো নিজেদের জন্য অন্য একজন নেতা নির্বাচন করা। এমতাবস্থায় যদি বন্দী নেতা তার বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে পারেন, তবে তিনি আর নেতৃত্বে ফিরে আসবেন না; কারণ তিনি নেতৃত্ব থেকে বহির্ভূত হয়ে গেছেন।

তৃতীয় পদ্ধতি: শক্তির মাধ্যমে নেতৃত্বের পদ দখল করা, যা বর্তমান যুগে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। এটি নেতৃত্ব অর্জনের অন্যতম একটি পদ্ধতি, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। ওলামায়ে কেরাম পূর্ববর্তী নেতার অপসারণ এবং ক্ষমতা দখলকারীর নেতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলেছেন, যাতে মানুষ গৃহযুদ্ধ ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলায় পতিত না হয়।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
দ্বাদশ পাঠ

কথার সারমর্ম হলো: রাষ্ট্রপ্রধান তার পদ থেকে অপসারিত হন যখন অন্য কেউ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সেই পদ দখল করে নেয় এবং তার কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায়; চাই সেই পরাজিত রাষ্ট্রপ্রধান 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে থাকুন অথবা তিনিও তার পূর্বসূরিকে পরাভূত করে ক্ষমতা দখল করে থাকুন না কেন।

ষষ্ঠ বিষয় যার কারণে ইমাম অপসারিত হন: রাষ্ট্রপ্রধানের জুলুম বা অত্যাচার:

অর্থাৎ: আল্লাহ তাআলার বান্দাদের ওপর তার জুলুম করা এবং তার 'ফিসক' বা পাপাচার; অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া।

আমরা বলব: রাষ্ট্রপ্রধানের জুলুম ও পাপাচার নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ: তিনি যদি জালিম ও অবিচারক হয়ে যান, তবে কি এই কারণে তিনি পদচ্যুত হবেন? অন্য কথায়, ক্ষমতা গ্রহণের পর তার মাঝে যে জুলুম ও পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণে তিনি অপসারিত হবেন কি না?

উত্তরে আমরা বলব: খারেজীদের মত হলো—যেহেতু তারা মনে করে যে পাপাচার বা 'ফিসক' লিপ্ত ব্যক্তিকে ঈমান থেকে বের করে দেয়, তাই তারা বলেছে ইমাম ফাসিক (পাপাচারী) হলে অপসারিত হবেন; কারণ তখন তিনি আর মুমিন থাকেন না, আর একজন অ-মুমিন ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। অনুরূপভাবে মুতাযিলাগণও জুলুম ও পাপাচারের কারণে ইমামের অপসারিত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ তাদের যুক্তি হলো, পাপাচার প্রকাশ পাওয়ার কারণে যদি বিচারক (কাজী) এবং প্রাদেশিক আমিরের অপসারণ ওয়াজিব হয়, তবে ইমাম এমন কাজ করলে তার অপসারণ তো আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এর কারণে তিনি অপসারিত হবেন না; কারণ ইমামের অপসারণ এবং অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, যেহেতু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি রয়েছে।

আর আমরা যদি হানাফী মাযহাবের দিকে লক্ষ্য করি, তবে দেখব যে—যেহেতু তারা রাষ্ট্রক্ষমতা বৈধ হওয়ার জন্য 'আদালাত' বা ন্যায়পরায়ণতাকে অপরিহার্য শর্ত মনে করেন না এবং তাদের মতে ফাসিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও বৈধ (যেমনটি আমরা রাষ্ট্রপ্রধানের শর্তাবলি আলোচনার সময় ব্যক্ত করেছি)—সেহেতু তারা বলেন: রাষ্ট্রপ্রধানের বৈধতার জন্য যেহেতু ন্যায়পরায়ণতা তাদের নিকট শর্ত নয়, তাই যদি উম্মত এমন একজন ইমাম নির্বাচন করে যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার গুণাবলি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জুলুম বা পাপাচারে লিপ্ত হন, তবে তিনি ইমামতের পদ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবেন না। তবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) তাকে অপসারণ করার অধিকার রাখেন যদি তারা ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা না করেন। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভয় থাকে, তবে তাকে অপসারণ করা যাবে না।

অর্থাৎ হানাফিগণ বলেন যে, যদি রাষ্ট্রপ্রধান পাপাচার বা ফাসিকিতে লিপ্ত হন, তবে এমতাবস্থায় তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব নয় অথবা কেবল এই পাপাচারের কারণেই তিনি অপসারিত হন না। বরং বিষয়টি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি তারা তাকে অপসারণ করাকে সমীচীন মনে করেন তবে অপসারণ করবেন, আর যদি তাকে বহাল রাখাকেই সমীচীন মনে করেন তবে বহাল রাখবেন। তবে যদি তারা তাকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে অপসারণের ফলে কী ধরণের ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা তাদের জন্য আবশ্যক। যদি তাকে অপসারণ করার কারণে ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় তাকে অপসারণ না করাই তাদের জন্য কর্তব্য।

হানাফিগণ তাদের এই মতের স্বপক্ষে এ বিষয়টিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বনু উমাইয়ার কিছু শাসকের পেছনে নামাজ পড়েছেন এবং তাদের শাসন মেনে নিয়েছেন। এমনকি তাদের মধ্য থেকে একাধিক ব্যক্তি মারওয়ান ইবনুল হাকামের পেছনেও নামাজ পড়েছেন।

তারা বলেন: ইমাম বুখারি তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দশজন সাহাবিকে পেয়েছি, যারা সকলেই অত্যাচারী শাসকদের পেছনে নামাজ পড়তেন।"

পাপাচারের কারণে রাষ্ট্রপ্রধান পদচ্যুত না হওয়ার মতটিই অধিকাংশ আলেম পোষণ করেছেন। কেননা সালাফ বা পূর্বসূরিগণ খুলাফায়ে রাশিদিনের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে প্রকাশ্য পাপাচার ও যুলুম প্রত্যক্ষ করতেন, তা সত্ত্বেও তারা তাদের অনুগত থাকতেন। সাহাবি, তাবেয়ি এবং তাদের পরবর্তীগণ বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের খেলাফতের শাসন মেনে নিয়েছেন, যদিও বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের অধিকাংশ শাসকই পাপাচারী ছিলেন।

পরিশেষে, রাষ্ট্রপ্রধানের পাপাচার ও যুলুমের কারণে তাকে অপসারণের বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত এগুলোই। আমাদের দৃষ্টিতে সেই মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য যা যুলুম ও পাপাচারের কারণে রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ করা ওয়াজিব বলে গণ্য করে, যদি এর ফলে কোনো ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর ওপর কর্তব্য হলো—যদি তারা রাষ্ট্রপ্রধানের যুলুম বা পাপাচার দেখেন এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকেন, তবে তাকে তার পদ থেকে অপসারণের ঘোষণা দেওয়া এবং এরপর নেতৃত্বের যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আর যদি তারা ফিতনা থেকে নিরাপদ না থাকেন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ করা তাদের জন্য বৈধ নয়। আমরা যুলুম বা পাপাচারের কারণে অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার কথা কেবল তখনই বলেছি যখন ফিতনা না হওয়ার শর্তটি বিদ্যমান থাকে। কারণ, আমরা যখন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করি, তা মূলত এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

মুসলিমদের। সুতরাং এই শর্তের অনুপস্থিতি যদি প্রাথমিকভাবে ইমামতের পদ লাভের যোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে, তবে তা ইমামত অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হওয়া আবশ্যক; কারণ এই শর্তটি আরোপ করার মূল কারণ কেবল এই পদ লাভের মাধ্যমেই

শেষ হয়ে যায় না, আর ইমামত হলো একটি মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব।

আর যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল যুগে শাসক ও শাসিত সকল মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, তেমনি তাদের প্রধান ব্যক্তিকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এবং যে দ্বীনের সুরক্ষার জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়েছে তার বিধানাবলির প্রতি অনুগত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতোই হতে হবে। কারণ মানুষ সাধারণত তাদের রাজাদের নীতি অনুসরণ করে। ফলে যদি রাষ্ট্রপ্রধান—যিনি রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার শীর্ষে আসীন—পাপাচার বা জুলুমে লিপ্ত হন, তবে মানুষের অন্তরে সচ্চরিত্র ও ন্যায়ের প্রতি আস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আর যাদের অন্তরে ইসলাম পূর্ণরূপে গেঁথে যায়নি, তারা তাকে তাদের আচরণে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে; যা দ্বীন ও উম্মাহর জন্য চরম ক্ষতিকর।

আর যারা শাসককে পদচ্যুত না করার স্বপক্ষে এই যুক্তি প্রদান করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম বনু উমাইয়ার কিছু শাসকের ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের পেছনে সালাত আদায় করতেন এবং তাবেঈনগণ বনু আব্বাসের খেলাফতকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অথচ তাদের অনেকেই ফাসেক ছিলেন; আমরা তাদের এই দলীলের সাথে একমত নই। কারণ ওই শাসকরা ছিলেন এমন রাজা যারা ক্ষমতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন (জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী)। আর নিরুপায় অবস্থায় বিজয়ীর (মুতাগাল্লিব) ইমামত বৈধ হয়ে যায়; যাতে মুসলিমদের স্বার্থসমূহ যেমন বিচারকার্য পরিচালনা, অভিভাবকহীনদের বিবাহ দান এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদি যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাহত না হয়। আর ইমামের পেছনে সালাত সহীহ হওয়ার জন্য ইমামের ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত নয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জিহাদ তোমাদের ওপর ওয়াজিব প্রত্যেক আমিরের সাথে, সে নেককার হোক বা গুনাহগার। আর সালাত তোমাদের ওপর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে, সে নেককার হোক বা গুনাহগার, যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।”

""

শরয়ী রাজনীতি
ত্রয়োদশ পাঠ

ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনা

পাঠের উপাদানসমূহ

প্রথম উপাদান: ইসলামে কর্মের মর্যাদা ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ — ৫৯১
দ্বিতীয় উপাদান: ব্যবহারিক সংগঠনসমূহের গঠনের প্রকৃতি — ৬০৫

তৃতীয় উপাদান: ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনা — ৬০৭

৫৮৯

পৃষ্ঠা 140

""

পৃষ্ঠা 141

ত্রয়োদশ পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ইসলামে কর্মের মর্যাদা ও তার বৈশিষ্ট্য

ইসলামে প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

প্রশাসনিক বিন্যাস হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যবহারিক ও তাৎক্ষণিক রূপ এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্ভূত সকল পরিকল্পনা ও প্রকল্পের প্রথম নির্বাহী সংস্থা। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাষ্ট্র গঠন ও এর মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে তাদের উদ্দেশ্যসমূহ ঘোষণা করে, তবে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সেই মাধ্যম যা এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে। এগুলো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করে। প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ জনগণের সামনে শাসকগোষ্ঠীর দর্পণ এবং রাষ্ট্রের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষের মধ্যকার সূক্ষ্ম যোগাযোগ নেটওয়ার্ক হয়ে ওঠে, যা তাদের সন্তুষ্টি ও আস্থার সাথে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদন করতে প্রস্তুত করে তোলে।

প্রশাসনিক বিন্যাসের সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংযোগ সর্বদা মুদ্রার দুই পিঠের মতো অবিচ্ছেদ্য। এমনভাবে যে, একটিকে ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং স্থিতিশীল প্রশাসন হলো সঠিক রাজনীতির পরিচায়ক, আর নড়বড়ে প্রশাসন হলো রাজনৈতিক বিপর্যয় ও পতনের প্রতীক।

ইসলামে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় আমরা চারটি প্রধান বিষয় নিয়ে কথা বলব:

প্রথমত: ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার নির্দেশনাবলী।
দ্বিতীয়ত: ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতি।
তৃতীয়ত: বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিন্যাস।
চতুর্থত: প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ।

পৃষ্ঠা 142

শরিয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

প্রথমত: ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনাসমূহ:

ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস দুটি হলো: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কেননা এই দুই উৎসে যা বর্ণিত হয়েছে তা ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যকে সুনিশ্চিত করে, যা পুঁজিবাদী চিন্তাধারার ন্যায় সমষ্টির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়, আবার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মতো ব্যক্তির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির প্রতিও ঝুঁকে পড়ে না। বরং আমরা একে এ দুয়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় পাই; কারণ এই উৎসদ্বয় ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের মাঝে এক পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় সাধন করে। ইসলাম একের ওপর অন্যের আধিপত্যকে অনুমোদন দেয় না, ফলে এখানে যেমন নিরঙ্কুশ ব্যক্তিবাদ নেই, তেমনি নেই নিরঙ্কুশ সমষ্টিবাদ। আর এটাই হলো সেই সঠিক পথ যা বর্তমান বিশ্বের মানবজাতি প্রত্যাশা করে।

এই প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার কিছু নমুনা আমরা নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে উপস্থাপন করছি: প্রশাসনিক সংগঠনের ক্ষেত্র এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র।

কর্ম একটি ইসলামী বাধ্যবাধকতা:

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কর্মতৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: “আর আপনি বলুন, তোমরা কাজ করো, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৫]। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সম্মানিত রাসুলকে সম্বোধন করে বলেন: “অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন, তখনই পরিশ্রমে ব্রতী হোন।” [সূরা আশ-শরহ: ০৭]। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “তোমার ইহকালের জন্য এমনভাবে কাজ করো যেন তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে, আর তোমার পরকালের জন্য এমনভাবে কাজ করো যেন তুমি আগামীকালই মৃত্যুবরণ করবে।” তিনি কর্মীদের প্রশংসা করে বলেন: “যে ব্যক্তি নিজের হাতের কাজে ক্লান্ত হয়ে —অর্থাৎ পরিশ্রম করে— সন্ধ্যা অতিবাহিত করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।”

পৃষ্ঠা 143

যেমনটি তাঁর (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার হাত কঠোর পরিশ্রমের কারণে ফুলে গিয়েছিল। তখন তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন: "এটি এমন একটি হাত যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।"

ইসলাম কর্মের আবশ্যকতাকে ধর্মীয় ফরজের স্তরে উন্নীত করেছে; কারণ এটি সর্বদা ঈমানকে সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে, অর্থাৎ এমন কর্ম যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। পবিত্র কুরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ তার সাথে সৎকর্মের কথা যুক্ত করা হয়নি; প্রজ্ঞাময় যিকিরের আয়াতসমূহ বিভিন্ন স্থানে এসেছে যেখানে মহান আল্লাহ বলেন: "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে" [আল-বাকারা: ২৫]। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে কর্মের আকীদা এবং আকীদার কর্ম।

কর্ম যেমন একটি ফরজ বা আবশ্যিক কর্তব্য, তেমনি এটি মর্যাদারও উৎস। ইসলাম যখন কর্মকে সকলের জন্য একটি সাধারণ ফরজ হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তখন এটি কর্মের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। ফলে এটি আগের মতো কোনো তুচ্ছ বিষয় হিসেবে রয়ে যায়নি, বরং এটি ইহজীবনে মানুষের মর্যাদার উৎস এবং তার দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "মানুষ কেবল তা-ই পায়, যা সে চেষ্টা করে" [আন-নাজম: ৩৯]।

তদ্রূপ মানুষের মর্যাদার তারতম্যও তাদের কর্মের ভিত্তিতেই হয়, তা দুনিয়াতে হোক কিংবা আখিরাতে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মহান রব বলেন: "প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মানুযায়ী স্তর রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আপনার রব অনবহিত নন" [আল-আন'আম: ১৩২]। সুতরাং কর্মই হলো মানবিক মর্যাদার উৎস, অর্থাৎ এটি ব্যক্তিকে তার সমাজে মর্যাদাবান করে তোলে যেখানে সে বসবাস করে।

মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই বস্তুর ওপর মূল্য আরোপ করে। উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিনিময়, ব্যবহার এবং ভোগের মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে এটি সম্পন্ন করে। বস্তুর নিজস্ব কোনো মূল্য নেই; অর্থাৎ মানুষ এবং মানুষের কর্ম ছাড়া বস্তুর কোনো মূল্য হতে পারে না।

অতএব: ব্যক্তি ও সমাজের উপকারের জন্য মানুষের কর্ম বা শ্রম কাম্য।

এর মাধ্যমে একটি প্রশস্ত মানবিক ধারণার আলোকে ইসলামী চিন্তাধারার দিকনির্দেশনাগুলো কর্মের স্বরূপ এবং এর ব্যাপকতাকে উন্মোচিত করে যে, কর্মই হলো মূল্যের উৎস। কর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং একে মূল্যের উৎস হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে এই নির্দেশনাগুলো অনেক শতাব্দী পূর্বেই পশ্চিমা অর্থনীতি এবং এর পথিকৃৎ "অ্যাডাম স্মিথ" এর ধারণার অগ্রবর্তী ছিল; যিনি মনে করতেন যে—তার বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী—কর্মই হলো মূল্য ও সম্পদের উৎস। প্রখ্যাত পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ যা উপনীত হয়েছেন, আমাদের ইসলাম এই পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের সময় থেকেই তা প্রদান করেছে।

তেমনিভাবে, ইসলামে যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়নের একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ উৎস হিসেবে কর্মের জন্য সুশৃঙ্খল কর্ম-মানদণ্ড এবং নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের হার নির্ধারণ করা আবশ্যক। আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারা তার বৈজ্ঞানিক ধারায় বর্তমানে এটিই অর্জনের চেষ্টা করছে। একইভাবে এটি কর্মতৎপরতার রিপোর্ট তৈরির দাবি রাখে, যা কর্মীকে মূল্যায়নের হাতিয়ার

হিসেবে তার কর্মদক্ষতার স্তর প্রকাশ করবে।

সুতরাং: এই আধুনিক প্রশাসনিক পরিভাষাগুলো ইসলামী ফিকহ এবং ইসলামী শরীয়তের পরিচিত বিষয়।

এভাবেই ইসলাম মানুষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের বিষয়গুলোকে নাকচ করে দেয়, তা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যা-ই হোক না কেন। কারণ ইসলাম কর্মকেই মানুষের মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আর কর্ম যদি মূল্যের উৎস হয়, তবে তা উপার্জনেরও মাধ্যম। কেননা মানুষ উপার্জনের মাধ্যম, ব্যক্তির রিযিকের উৎস এবং তার নিজস্ব আয় হিসেবে কর্মকে গ্রহণ করে, যার ওপর সে তার জীবনধারণের জন্য নির্ভর করে।

আল্লাহ আমাদের জন্য জীবনধারণ ও রিযিক উপার্জনের পথসমূহ সুগম করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "আমি তোমাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছি।" [আল-আরাফ: ১০]। তবে এর প্রাপ্তি প্রচেষ্টা ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত; এজন্যই সত্যস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর রিযিক থেকে আহার করো।" [আল-মুলক: ১৫]

আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারাও সমর্থিত, যেখানে তিনি বলেন: "নিজ হাতের উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতের উপার্জনে আহার করতেন।" যেমনটি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "উত্তম উপার্জন হলো ব্যক্তির নিজ হাতের কাজ।"

আর মহান আল্লাহ আমাদের এই মর্মে সতর্ক করেছেন যে, ধর্মীয় ফরযসমূহ রিযিক অন্বেষণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তাই আল্লাহ তাআলা জুমুআর ফরয আদায় উপলক্ষ্যে—যা একটি জামায়াতবদ্ধ সালাত—বলেন: "অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ করো।" [সূরা আল-জুমুআহ: ১০]

আর ইসলাম যখন রিযিক উপার্জনের জন্য আমাদের কাজের নির্দেশ দেয়, তখন তা শরীয়তসম্মত ও হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে তা থেকে আহার করো।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৮]। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।" [সূরা আন-নিসা: ২৯]

যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব (আবশ্যক)।" ইসলাম কাজ করাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ফরয করেছে; মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিজেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও অভাবের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচানোর জন্য। আর এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাওয়া এবং এক বোঝা কাঠ নিয়ে এসে তা বিক্রি করা—যার মাধ্যমে সে তার সম্মান রক্ষা করে—লোকদের কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম, চাই তারা তাকে কিছু দান করুক বা না করুক।" আরও বর্ণিত আছে যে, দুজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং তারা তাদের এক ভাইকে সাথে করে আনলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সে এক সালাত শেষ করেই অন্য সালাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং এক সিয়াম শেষ করেই অন্য সিয়াম শুরু করে, এমনকি তার শারীরিক ক্লান্তি—অর্থাৎ পরিশ্রম—আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জিজ্ঞেস করলেন: "তার উটগুলোর দেখাশোনা কে করে? আর তার সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য কে চেষ্টা-তদবির করে?" তারা বললেন: আমরা করি। তখন তিনি বললেন: "তোমরা দুজনই তার চেয়ে বড় ইবাদতকারী।"

বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে একজন তেজী ও শক্তিশালী ব্যক্তি কোনো এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন—অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো স্থানের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যদি এটি—অর্থাৎ সাহাবীগণ আকাঙ্ক্ষা করছিলেন—যদি তার এই শক্তি ও উদ্যম আল্লাহর পথে হতো—অর্থাৎ সাহাবীগণ কামনা করছিলেন যেন...

ত্রয়োদশ পাঠ: আল-সিয়াসা আল-শরইয়্যাহ

এই শক্তিশালী ব্যক্তিটি যিনি তাদের সামনে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে চলছিলেন, তিনি একজন মুসলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "যদি সে তার ছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের প্রচেষ্টায় বের হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহর পথে। যদি সে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য উপার্জনের প্রচেষ্টায় বের হয়ে থাকে তবে তাও আল্লাহর পথে। আর যদি সে নিজেকে অভাবমুক্ত রাখার জন্য উপার্জনের প্রচেষ্টায় বের হয়ে থাকে তবে তাও আল্লাহর পথে।"

এভাবেই নবীজি (সা.) আমাদের নিকট স্পষ্ট করেছেন যে, যে কর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত রাখে, তা আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য। কর্ম যদি উপার্জনের মাধ্যম হয়—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি—তবে তা অগ্রগতিরও মূল ভিত্তি। কারণ কর্মসংস্থানকে উপার্জনের মাধ্যম এবং ব্যক্তির আয়ের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

ইসলাম সামাজিকভাবেও এই অগ্রগতি অর্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তাই ইসলাম তার অনুসারীদের কৃষি, শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করেছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করে:

কৃষিখাতে:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "কোনো মুসলিম যদি কোনো চারাগাছ রোপণ করে অথবা শস্য বপন করে, আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।" তিনি (সা.) আরও বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো গাছ রোপণ করল, অতঃপর সেটি ফলবতী হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করল, তবে তার ফল থেকে যা কিছুই আহরিত হবে, তার বিনিময়ে মহান আল্লাহর নিকট তার জন্য সদকার সওয়াব রয়েছে।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল পার্থিব লাভের জন্যই নয়, বরং আখেরাতের সওয়াবের আশায় কৃষি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

শিল্পখাতে:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "সর্বোত্তম উপার্জন হলো কারিগরের উপার্জন, যদি সে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে।" ইসলামে শিল্প হলো উপার্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস, কারণ এর মধ্যেই জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের প্রকৃত উন্নতি নিহিত রয়েছে, যা আমরা বর্তমান বিশ্বেও বাস্তবভাবে অনুভব করছি।

শরয়ী রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মর্যাদা নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং নেককারদের স্তরে উন্নীত করেছেন, যদি তারা তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং নেককারদের সাথে থাকবেন।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফার প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবসার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন: "রিজিকের দশ ভাগের নয় ভাগই ব্যবসার মধ্যে।" সুতরাং ব্যবসা বলতে বোঝায়: উৎপাদনের বাজারজাতকরণ এবং তার বিপণন, তা যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন; বৈধ উপার্জনের উদ্দেশ্যে যা আল্লাহ সুদের বিপরীতে হালাল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" [সূরা আল-বাকারা: ২৭৫]

ইমাম রাযীর বক্তব্য অনুযায়ী সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো—এটি মানুষকে উপার্জনের কাজে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। কারণ, দিরহামের মালিক যদি সুদী চুক্তির মাধ্যমে নগদ বা বাকিতে অতিরিক্ত দিরহাম লাভে সক্ষম হয়, তবে তার কাছে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা সহজ বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে সে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কষ্টসাধ্য শিল্পকর্মে পরিশ্রম করতে চায় না। আর এটি সৃষ্টিজগতের উপকারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, বিশ্বের কল্যাণ ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা, শিল্প ও স্থাপত্য নির্মাণের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়।

অতএব, ইসলাম সুদকে হারাম করেছে এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে; কারণ এটি পুঁজির মালিককে শ্রম, উপার্জনের চেষ্টা এবং বিনিয়োগ থেকে বিমুখ করে দেয়। তদুপরি এতে অন্য মানুষকে শোষণ করার সুযোগ থাকে, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার দিকে ধাবিত করে।

ইসলামে কর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

আমরা দেখেছি যে, ইসলাম কর্মকে একটি সাধারণ আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছে; যা আদম সন্তানদের মধ্যে সমতার নীতি বাস্তবায়নের বহিঃপ্রকাশ। একইভাবে ইসলাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকেই সরল পথ (সিরাতাল মুস্তাকিম) অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে, আর এর দাবি হলো এমন পথ অনুসরণ করা যা...

সুষম ও সঠিক আচরণ; এই উদ্দেশ্যেই কাজের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এই আচরণকে বাস্তবায়ন করে। আর আমাদের জন্য এখানে সেগুলোর মধ্য থেকে আমলের কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করাই যথেষ্ট হবে:

আমরা বলব: ঈমানকে নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত করা হলো ইসলামে আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য। কারণ ইসলাম হলো আমলের আকীদা এবং আকীদার আমল। আর পবিত্র কুরআন পঞ্চাশটিরও বেশি আয়াতে ঈমান ও নেক আমলের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই বিষয়টিই নিশ্চিত করেছে; চাই তা একবচনের শব্দে আল্লাহর এই বাণীতে হোক: "যে ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে" [আল-কাহফ: ৮৮] অথবা বহুবচনের শব্দে আল্লাহর এই বাণীতে হোক: "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে" [আল-বাকারা: ২৫]।

আর ঈমান হলো: বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় এবং কোনো চিন্তা বা নির্দিষ্ট আচরণের সত্যয়ন। আর নেক আমল বলতে বোঝায়: সাধারণভাবে সকল প্রকার সৎ কাজ, যা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ, মঙ্গল এবং উপকার সাধন করে, চাই তা দুনিয়াবী বিষয়ে হোক কিংবা দ্বীনি বিষয়ে।

পবিত্র কুরআন ঈমান ও নেক আমলকে মূলের সাথে শাখার এবং ভিত্তির সাথে দালানের ন্যায় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করেছে। এটি এমন এক সম্পর্ক যেখানে একটির উপস্থিতি অপরটি ছাড়া অসম্ভব। সুতরাং কোনো মানুষ এমন ঈমান সম্পর্কে জানে না যা নেক আমলের ফল দান করে না, আর ঈমানের ওপর ভিত্তিহীন বা আকীদা থেকে উৎসারিত নয় এমন কোনো কাজ নেক আমল হিসেবে গণ্য হয় না। আল্লাহ তাআলা নেক আমলকারী মুমিনদের জন্য অত্যন্ত যত্নের ব্যবস্থা করেছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য মহাপ্রতিদান ও সওয়াবকে পরিপূর্ণ করেছেন। কেননা তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান, উত্তম প্রতিদান, বিশাল সওয়াব, অফুরন্ত নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, জান্নাতুল মাওয়া এবং জান্নাতুন নাঈম। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এসব গুণাবলীর কথা যেমন বর্ণনা করেছে, তারা হলো সৃষ্টির সেরা।

আর এটিই সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই বাণীতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যেখানে তিনি বলেছেন: "মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করবে, আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দান করব" [আন-নাহল: ৯৭]। এবং আল্লাহর এই বাণীতে: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন। আর তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের সেই দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ের পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন" [আন-নুর: ৫৫]।

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামি প্রশাসনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমরা নিম্নলিখিত দুটি নির্দেশনায় উপনীত হই:

১. মুমিন ব্যক্তি সকল সৎকাজ করতে আদিষ্ট; চাই তা কর্মীর ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক অথবা সংগঠনের সামষ্টিক কল্যাণের সাথে। ইসলামের নিজস্ব সত্তা থেকে উৎসারিত ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য অর্জন দাবি করে।

২. নেক আমল বা সৎকাজসমূহ—যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অবস্থার সংশোধনের লক্ষ্য রাখে—অবশ্যই ঈমান থেকে উৎসারিত হতে হবে, যাতে তা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আর এজন্য ইসলাম হলো আকিদাহর আমল এবং আমলের আকিদাহ। যেকোনো সংস্কারমূলক কাজের জন্য এটিই হলো আকিদাগত প্রবেশদ্বার। জন প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের সাফল্যের জন্য এটি গ্রহণ করা অপরিহার্য। সংস্কারের যেকোনো ক্ষেত্রে ঈমানের সাথে আমলের এই সংশ্লিষ্টতার জন্য উক্ত সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আহ্বান এবং এর সফল প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সচেতনতা প্রয়োজন।

ইসলামে কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, তা পরিকল্পিত হতে হবে। কেননা লক্ষ্য অর্জন এবং পরিকল্পনা হলো কাজের বুদ্ধিবৃত্তিক দিক এবং কাজ সম্পন্ন করার পূর্ববর্তী পর্যায়। মানুষ, যাকে আল্লাহ তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির ওপর বিবেক দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, তার গভীর সত্তা ও কর্মকাণ্ড পূর্বচিন্তা থেকে উৎসারিত হয়; যা তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ—অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়নকে—অন্তর্ভুক্ত করে।

একজন বুদ্ধিমান মানুষ যেকোনো কাজ শুরু করার আগে প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করে: কেন সে এই কাজটি করছে? এবং তার চিন্তাভাবনা তাকে যে বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে তার আলোকে সে এর উত্তর দেয়; এর পেছনে প্রেষণা হিসেবে কাজ করে তার কাজের লক্ষ্যবস্তু নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা। লক্ষ্য নির্ধারণের আলোকে সে সেই কাজের জন্য প্রস্তুতি ও পূর্বপ্রস্তুতি শুরু করে; কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি ও উপায় এবং এটি সম্পন্ন করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, স্থান ও সময় অনুসন্ধানের মাধ্যমে। আর এটিই হলো কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া—অর্থাৎ এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ—যা প্রশাসন বা ম্যানেজমেন্টের মূল বিবেচ্য বিষয়, যেহেতু প্রশাসন হলো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী সামষ্টিক মানবীয় কর্মকাণ্ডের সংগঠন।

ত্রয়োদশ পাঠ

ইসলাম যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায়, তাই এটি নিয়তের ওপর—অর্থাৎ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যের ওপর—অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে এবং একে আমল মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে সাব্যস্ত করে। আমল নির্ধারণ এবং সেগুলোর ওপর বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ত হলো মৌলিক ভিত্তি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে; সুতরাং তোমাদের প্রতিপালক ভালো করেই জানেন কে সঠিক পথে রয়েছে।" [আল-ইসরা: ৮৪]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "প্রত্যেকের একটি লক্ষ্য রয়েছে যেদিকে সে মুখ ফেরায়; অতএব তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো।" [আল-বাক্বারাহ: ১৪৮]। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাই পাবে যার সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য হবে অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হবে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।"

অনুরূপভাবে ইসলাম আমলসমূহকে সেগুলোর উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যগুলোর মহত্ত্ব, কল্যাণকামিতা এবং তা অর্জনে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানায়; যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কেননা, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্মের পেছনে অবশ্যই একটি লক্ষ্য থাকতে হয়। আর সেই লক্ষ্যই আমল কবুল হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মূল ভিত্তি। এটিই সেই মানদণ্ড যার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমলের স্তর নির্ধারিত হয়। সুতরাং লক্ষ্য যখন সুউচ্চ ও মহৎ হয় এবং অবিচল সংকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, তখন তা আমল কবুল হওয়ার এবং মর্যাদা বৃদ্ধির এক শক্তিশালী কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে এটি আল্লাহর প্রতি আমলকারীর ঈমানের দৃঢ়তা এবং তার রবের প্রতি গভীর সচেতনতার এক স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে কাজ করে; ফলে সে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ সম্পন্ন করে।

যেকোনো কাজ শুরু করার মুহূর্তে ইসলাম আমাদের লক্ষ্যকে অনুধাবন করার আহ্বান জানায়, যাতে কাজের পদ্ধতি, সময় ও অবস্থান তার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণেই ইবাদতসমূহ পালনের সময় নিয়ত উপস্থিত রাখাকে শর্ত করা হয়েছে; যেমন: সালাত, সিয়াম, হজ ইত্যাদি। ইসলাম অভিন্ন উদ্দেশ্যের মাঝে জামাতের সংহতি ও পারস্পরিক বন্ধনের মূল ভিত্তি খুঁজে পায়। আর এটি মহান আল্লাহর এই বাণীতে পরিস্ফুট হয়েছে: "তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [আলে ইমরান: ১০৩]।

শারইয়্যাহ রাজনীতি
ত্রয়োদশ পাঠ

লক্ষ্য নির্ধারণের পর কাজের পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতে কাজ সম্পাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। একে পরিস্থিতি বা আকস্মিকতার করুণার ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা এবং বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। এটি মহান আল্লাহর বাণীতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: **"আর তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি প্রস্তুত করো।"** [আল-আনফাল: ৬০]। যদিও এই সম্মানিত আয়াতটি সামরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এটি কর্মজীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেকোনো চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মোকাবিলায় আমাদের জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনীতে রসদ বা খাদ্য সরবরাহ ক্ষেত্রে বেসামরিক পরিকল্পনার একটি নমুনা আমাদের কাছে বিদ্যমান, যখন তিনি মিশরের অধিপতিকে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, দেশ টানা সাত বছর প্রচুর কৃষিজ উৎপাদন লাভ করবে, যার পর আসবে সাতটি দুর্ভিক্ষের বছর। যার ফলে অভাবের বছরগুলো মোকাবিলার জন্য সচ্ছলতার বছরগুলোর উৎপাদন থেকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: **"তিনি বললেন, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষাবাদ করবে। অতঃপর তোমরা যা কাটবে তার মধ্যে সামান্য অংশ যা তোমরা খাবে তা ছাড়া বাকিটা শীষসমেত রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, যা তোমাদের আগে সঞ্চিত শস্য খেয়ে ফেলবে, তবে অল্প কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করবে।"** [ইউসুফ: ৪৭-৪৮]।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হাদিস দ্বারাও এটি নিশ্চিত হয়েছে: **"তোমার দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করো যেন তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে।"** যা কাজের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানায়, এমনকি নির্দেশ প্রদান করে; এটি কেবল স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য নয়, বরং সুদূরপ্রসারী সময়ের জন্য। কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত; কারণ ইসলাম কর্মের উৎকর্ষতার ওপর জোর দেয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত একে সমর্থন করে। মহান আল্লাহ মানুষ, জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে তাদের কাজের নৈপুণ্য বা উৎকর্ষতা পরীক্ষার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন: **"আর তিনিই আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম।"** [হূদ: ৭]। যেমন তিনি আরও বলেন: **"নিশ্চয়ই জমিনের ওপর যা আছে তাকে আমি তার শোভা করেছি যাতে আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ।"** [আল-কাহাফ: ৭]। তিনি আরও বলেন: **"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম।"** [আল-মুলক: ২]।

তেমনিভাবে মহান মালিক সুনিপুণভাবে কাজ সম্পাদনকারী কর্মীদের পুরস্কার প্রদানের কথা ব্যক্ত করেছেন। মহামহিম আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আমি অবশ্যই তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না, যারা উত্তমরূপে কাজ করে।" [আল-কাহাফ: ৩০]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "যাতে আল্লাহ তাদের কাজের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন।" [আন-নূর: ৩৮]। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, কোনো কর্মী যখন কোনো কাজ করে, তখন সে যেন তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে।" সুতরাং ইসলাম কর্মের উৎকর্ষ এবং সুনিপুণ সম্পাদনের নিশ্চয়তা বিধানে ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিবেক এবং অভ্যন্তরীণ আকিদাগত অনুপ্রেরণার ওপর নির্ভর করে। এটি হচ্ছে নির্বাহী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে।

আর পরামর্শমূলক দায়িত্বের ক্ষেত্রে, যা কেবল পরামর্শ প্রদান এবং কারিগরি মতামত ব্যক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে। মহান আল্লাহ বলেন: "এক সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।" [ফাতির: ১৪]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জানো।" [আন-নাহল: ৪৩]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর যদি তারা তা রাসূলের কাছে এবং তাদের মধ্যকার উলুল আমর (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ)-এর কাছে পেশ করত, তবে তাদের মধ্যে যারা রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী, তারা অবশ্যই তা জানত।" [আন-নিসা: ৮৩]।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং যেসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই, সেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়াকে আবশ্যক করে। তবে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার অথবা এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তাআলার এই বাণী সেদিকেই ইঙ্গিত করে: "অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও।" [আল-গাশিয়াহ: ২১, ২২]। আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারাও এই নীতিটি গ্রহণ করে থাকে।

এভাবেই ইসলাম আমাদের কাজের নিপুণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে; চাই তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উত্তম কর্মদক্ষতার আহ্বানের মাধ্যমে হোক, কিংবা পরামর্শের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে হোক।

শরয়ী রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

প্রতিটি কাজের জন্য যদি এমন কিছু নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি থাকে যা তার সম্পাদনের মূলনীতির দাবি এবং সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন, তবে বাস্তবায়নের সঠিকতার জন্য কর্মপদ্ধতিতে যতটুকু অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় ততটুকু গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ কর্মপদ্ধতি হলো একটি মাধ্যম, তা স্বয়ং কোনো উদ্দেশ্য নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাজের কর্মপদ্ধতি ও তা সম্পাদনের ধাপসমূহে প্রয়োজনহীন অতিরঞ্জন করা হলো লক্ষ্য ও ভারসাম্য থেকে বিচ্যুতি; অথচ ইসলাম সঠিক আচরণের আহ্বানে এই ভারসাম্যই প্রত্যাশা করে। আর এটিই হলো সেই আমলাতন্ত্র যা ইসলাম প্রতিরোধ করেছে। আমলাতন্ত্র বলতে কাজের দীর্ঘ কর্মপদ্ধতি ও তার ধাপসমূহকে বোঝায়। আর এজন্যই ইসলাম এই আমলাতন্ত্রকে সেই লক্ষ্য ও ভারসাম্য থেকে বিচ্যুতি বলে গণ্য করেছে, যা ইসলাম সঠিক আচরণের আহ্বানে প্রত্যাশা করে।

এর পাশাপাশি কর্মপদ্ধতি গ্রহণে অতিরঞ্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ অপচয়ের একটি প্রকার। এটি অপচয়কারীদের মহান আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে। যেমনটি পবিত্র আয়াতে বলা হয়েছে: "আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি

অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা আল-আনআম: ১৪১]

ইসলাম আনুষ্ঠানিকতা ও কর্মপদ্ধতিকে কেবল সেই পরিমাণ গ্রহণ করে যা লেনদেনের বিশুদ্ধতার জন্য অপরিহার্য। যখন এই আবশ্যকতা থাকে না, তখন লেনদেন সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে সেগুলোকে বর্জন করা জরুরি হয়ে পড়ে। ঋণ সংক্রান্ত আয়াত এই অর্থকেই সুনিশ্চিত করে। কারণ এতে লেনদেনকারীদের অধিকার রক্ষায় বাকিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে তা লিখে রাখার শর্তারোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিক নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে তা পরিহার করাতে কোনো বাধা নেই। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে নাও।" মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: "তবে যদি তা এমন নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা নিজেদের মধ্যে হাতে হাতে পরিচালনা করো, তবে তা না লিখলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।" [সূরা আল-বাকারা: ২৮২]

এর অর্থ হলো: লেনদেনের পূর্ববর্তী কর্মপদ্ধতি বা আনুষ্ঠানিকতাগুলোর ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত সীমাবদ্ধতা বজায় রাখে। কারণ এতে কোনো বৃদ্ধি মূলত আমলাতন্ত্রের দিকেই নিয়ে যায়, যার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

সুতরাং এই সম্মানিত আয়াত—ঋণ সংক্রান্ত আয়াত—আমাদের নিকট স্পষ্ট করে দেয় যে, ঋণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া কেবল বাকিতে লেনদেনের (বকেয়া ঋণ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে যদি ব্যবসা নগদ হয় এবং সেখানে কোনো ঋণ না থাকে, তবে সেখানে এই সাক্ষ্য গ্রহণের কোনো আবশ্যকতা নেই। এটি একটি প্রমাণ যে, ইসলাম কাজের প্রক্রিয়া ও উৎপাদনের ধাপগুলোতে অতিশয়োক্তি এবং অপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা ও অহেতুক নিয়মকানুন পছন্দ করে না এবং এতে আগ্রহী নয়।

অতএব, ইসলাম লেনদেনের ক্ষেত্রে কাগজের নথিপত্রের ব্যবহারে অপচয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; যা প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম ব্যাধিগুলোর অন্যতম এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বহিঃপ্রকাশ, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। আমরা দেখি যে ইসলাম কাজ সহজ ও সাবলীল করার আহ্বান জানায় এবং কাজে কঠোরতা ও অতিরঞ্জনকে নিন্দা করে। এটি আমাদের রাসূলুল্লাহ—আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক—এর হাদিস থেকে প্রমাণিত: "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। আর যে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা করবে, দ্বীন তার ওপর বিজয়ী হবে। সুতরাং তোমরা সঠিক পথে থাকো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, সুসংবাদ দাও এবং সকাল-বিকাল ও রাতের শেষ ভাগের ইবাদতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"

যেহেতু তিনি—আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক—কঠোরতা কিংবা অবহেলা ব্যতিরেকে ইবাদতের ক্ষেত্রে পরিমিতি ও ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল কর্মই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদতের সেই ব্যাপক ধারণা অনুযায়ী—যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি—জনসাধারণের সেবা করা আকিদাগতভাবে একটি আবশ্যিক ইবাদত হিসেবে গণ্য। এর কার্যপদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যা সেবা গ্রহণকারীদের জন্য কষ্টকর বা ক্লান্তিকর না হয় এবং সেবার মান ও উৎকর্ষকেও ব্যাহত না করে; অর্থাৎ: কোনো বাড়াবাড়ি বা কমতি ছাড়াই।

কাজ সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করা এবং তা সহজীকরণের বিষয়টি সামর্থ্যের গণ্ডির মধ্যে থাকার সাথে সম্পৃক্ত; যা ইসলামের এই মানবিক মূলনীতির বাস্তবায়ন: "সামর্থ্যের বাইরে কোনো বিধান নেই।" এ বিষয়ে আমাদের রব মহান আল্লাহ বলেন: "কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কার্যভার প্রদান করা হয় না।" (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৩)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: "হে আমাদের রব!

আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপাবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।" (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)। সুতরাং এমন কোনো ক্লান্তি বা চাপ প্রয়োগ করা যাবে না যা কর্মীর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি সাধন করে।

শারঈ রাজনীতি
ত্রয়োদশ পাঠ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ইসলাম সঠিক কর্মের ক্ষেত্রে —তাত্ত্বিকভাবে— শর্ত আরোপ করে যে, লক্ষ্য বা অভীষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট হতে হবে; এবং পূর্ব-প্রস্তুতি তথা পরিকল্পনা থাকতে হবে। আর আচরণগতভাবে আবশ্যক হলো যে, কর্মসম্পাদন হতে হবে নিপুণ, সহজসাধ্য এবং সামর্থ্যের ভেতরে।

ব্যবহারিক সংগঠন কাঠামোর প্রকৃতি

সংগঠন বলতে আমরা বুঝি: এমন এক জনসমষ্টি যারা কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে, যেমন কোনো নির্দিষ্ট কারখানায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ। প্রশাসনিক আইন এবং সাধারণ ব্যবস্থাপনার পরিভাষায় এই জনসমষ্টির সমষ্টিকে 'সংগঠন' বলা হয়। সুতরাং সংগঠন হলো এমন একটি কাঠামো যার মধ্যে এবং যার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় অর্থাৎ সামষ্টিক মানবিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংগঠনের গঠনগত প্রকৃতি আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারার প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। আমরা ইতিপূর্বে এই বিষয়ে প্রশাসনিক চিন্তাধারার ধারণাসমূহ উপস্থাপন করেছি।

নিম্নে আমরা সংগঠনের গঠনের ক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনাগুলো উল্লেখ করছি। অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট কারখানা বা নির্দিষ্ট কোম্পানিতে বিশেষ কাজ সম্পাদনকারী এই জনসমষ্টি বা ব্যক্তিদের সমষ্টিকে কীভাবে সুসংগঠিত করা হবে; এই স্থানে, এই কারখানায় বা এই কোম্পানিতে যারা কাজ করছেন তাদেরকেই —আমরা যেমনটি বলেছি— প্রশাসনিক পরিভাষায় 'সংগঠন' বলা হয়। ইসলাম এই সংগঠনের জন্য এবং এতে কীভাবে কাজ পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইসলাম সর্বাগ্রে যে বিষয়টির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তা হলো: প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস। ইসলাম যেকোনো রূপ বা কর্মক্ষেত্রের সংগঠনকে একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা হিসেবে গঠন করেছে যার মূল ভিত্তি হলো সাংগঠনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস। এটি করা হয়েছে সংগঠনের ও এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় এবং সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে।

ইসলাম এই প্রশাসনিক পর্যায়ক্রমকে আমাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করে—আমরা নেতা হই কিংবা অনুসারী। কারণ এটি প্রকাশ করে যে, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক আদেশ জারির ক্ষেত্রে এই পর্যায়ক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং অনুসারীরা এই আদেশগুলো মেনে চলা ও সেই অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে তাদের প্রতি কতটা আনুগত্য প্রদর্শন করছে। এটি একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা, যা সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের স্বার্থই সমানভাবে বিবেচনা করে। কারণ এটি মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণ করে, যার ব্যবস্থাপনা এই প্রশাসনিক পর্যায়ক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এই কারণেই মহান আল্লাহ বলেন: “তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের কয়েকজনকে অন্যদের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন সে বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।” [আল-আন'আম: ১৬৫]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: “আমি তাদের একজনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অপরকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।” [আয-যুখরুফ: ৩২]। এই আয়াতগুলো পর্যায়ক্রমের প্রমাণ দেয়।

কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টিগত স্বভাব (ফিতরাত) যদি মানুষকে একে অপরের উপরে স্তরে স্তরে উন্নীত করার—অর্থাৎ প্রশাসনিক পর্যায়ক্রমের—দাবি রাখে, তবে এই পর্যায়ক্রমের অর্থ কি এই যে, সেখানে বিশেষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত সামাজিক শ্রেণী বিদ্যমান থাকবে, যা ইসলামি মানবিক সাম্যের নীতির পরিপন্থী?

বাস্তবতা হলো, এই প্রশাসনিক পর্যায়ক্রম সমাজে কোনো আধিপত্যকামী শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নয়; বরং এটি কর্ম বা আমলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আর আমলই হলো মানবিক মূল্যের একমাত্র উৎস—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। যেহেতু ব্যক্তিদের মাঝে বোধশক্তি, সক্ষমতা ও যোগ্যতার পার্থক্য থাকে—যা একটি স্বাভাবিক বিষয়—তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা কাজের স্তর ও তা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অধিকারী হবে। ফলে এখানকার প্রশাসনিক পর্যায়ক্রম মূলত আমলের পর্যায়ক্রম ও পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে এটিই স্পষ্ট করেছেন: “তারা যা করে সে অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য মর্যাদা রয়েছে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আপনার রব উদাসীন নন।” [আল-আন'আম: ১৩২]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: “তারা যা করে সে অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য মর্যাদা রয়েছে, যাতে তিনি তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।” [আল-আহকাফ: ১৯]

কিন্তু তাদের আমলের পার্থক্যের ভিত্তি কী? এবং ফলস্বরূপ এই আমল অনুযায়ী তাদের পর্যায়ক্রমেরই বা ভিত্তি কী?

প্রজ্ঞাময় কুরআন এটি স্পষ্ট করে যে, এর মূল কারণ হলো: জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য এবং জ্ঞানের উৎস; এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি, আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে রয়েছেন একজন মহাজ্ঞানী।" (ইউসুফ: ৭৬)। যেমন তিনি আরও বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" (আল-মুজাদালাহ: ১১)।

যেহেতু ইসলামে কর্মকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই ব্যক্তিরা তাদের কর্মের স্তর অনুযায়ী জীবিকা ও আয়ের

ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে; আর এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে তোমাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" (আন-নাহল: ৭১)। এর ভিত্তিতে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি:

ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনা

১. কোনো গোষ্ঠীর সহজাত গঠন—তার রূপ এবং কার্যক্রমের প্রকৃতি যাই হোক না কেন—তা তার লক্ষ্য অর্জন এবং সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে তার অস্তিত্বের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এর স্তম্ভ এবং মূল ভিত্তি হলো সদস্যদের মধ্যে প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস, যা এর সাংগঠনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত এবং যা নেতৃত্বের ঐক্য ও দিকনির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত হয়।

২. সংগঠনগুলোতে প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হলো কাজের স্তরবিন্যাস—অর্থাৎ বিভিন্ন পদ ও পেশার বিন্যাস। আর এই স্তরবিন্যাস অর্জনের জন্য প্রতিটি গোষ্ঠীতে বিদ্যমান বিচিত্র কাজগুলো নিয়ে গবেষণা করা এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যাতে সেগুলোর ওপর অর্পিত কর্তব্য, দায়িত্ব ও বিবরণ ফুটে ওঠে; যা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করে এবং যার মাধ্যমে সেই কাজগুলো সম্পাদিত হবে।

যেহেতু ইসলামে কর্ম হলো উপার্জনের মাধ্যম এবং আয়ের আনুষ্ঠানিক উৎস; তাই পারিশ্রমিক ও বেতনসমূহ কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয় এবং ক্রমবিন্যাস করা হয়, যাতে পারিশ্রমিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

ত্রয়োদশ পাঠ
শরয়ী রাজনীতি

অথবা এটি কাজের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এবং এর স্তর ও পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট; মহান আল্লাহর এই বাণীর বাস্তবায়ন স্বরূপ: "নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রতিদান নষ্ট করি না যারা উত্তম কাজ করেছে" (আল-কাহাফ: ৩০) এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান দেব" (আন-নাহল: ৯৭)। এটি মূলত কাজের সমানুপাতিক পারিশ্রমিকের মূলনীতি, যা সমসাময়িক পশ্চিমা প্রশাসনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে; এবং উৎপাদনের সাথে পারিশ্রমিককে যুক্ত করার বিভিন্ন তত্ত্ব এখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

আর যেহেতু কর্মের সোপান বা ক্রমবিন্যাস জ্ঞানের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে—জ্ঞানের ব্যাপকতম অর্থে—অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান, চাই তা তাত্ত্বিক হোক কিংবা ব্যবহারিক, যার ধরন ও সময়সীমায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; সেহেতু প্রত্যেকের সামর্থ্য ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মের সুযোগ নিশ্চিত করা আবশ্যক, চাই তা স্কুল, ইনস্টিটিউট বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হোক না কেন, তাদের বিভিন্ন পর্যায়, বিশেষত্ব এবং পদ্ধতির ভিন্নতা সত্ত্বেও।

এই সংগঠনের আরেকটি দিক হলো: কর্তৃত্ব ও দায়বদ্ধতা:

নেতৃত্বের সোপান বা হায়ারার্কি এই সোপানের বিভিন্ন স্তরে কর্তৃত্ব ও দায়বদ্ধতার পরিধি নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রশাসনের পরিভাষায় যাকে "কর্তৃত্বের রেখা" বলা হয়, সেই অনুযায়ী কর্তৃত্বের অর্থ হলো: সক্ষমতা, শক্তি এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা; অর্থাৎ যা অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক, যাদের ওপর এর বাস্তবায়ন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা অপরিহার্য হয়, এর উৎসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের খাতিরে।

কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন উলুল আমর (কর্তৃপক্ষ), যাদের আনুগত্য কুরআনুল কারীম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অনুগামী হিসেবে আবশ্যক করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আমরের (নেতৃবৃন্দের) আনুগত্য করো।" (আন-নিসা: ৫৯)।

আর এটিই পবিত্র সুন্নাতে নববী জোর দিয়ে পুনরুক্ত করেছে, যা সব ধরণের বর্ণবাদী, জাতিগত বা শ্রেণীগত বৈষম্যকে নাকচ করে দেয়; যা এই অপরিহার্য বিধানকে অকার্যকর করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
ত্রয়োদশ পাঠ

সম্মানিত রাসূল বলেছেন: "তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর এমন কোনো হাবশী ক্রীতদাসকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় যার মাথা কিশমিশের মতো।"

এটি তার সর্বোচ্চ মানবিক রূপে সমতা। এই ক্ষেত্রে ইসলাম 'কর্তৃত্ব' (সুলতানি) শব্দটি ব্যবহার করেনি; যাতে নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের সেই প্রবণতা এড়িয়ে চলা যায় যা বৈজ্ঞানিক প্রশাসনিক চিন্তাধারায় লক্ষ্য করা যায়, এবং মানবিক প্রশাসনিক চিন্তাধারা যার নেতিবাচক প্রভাব লাঘব করার চেষ্টা করেছে।

এই বিশেষ বিষয়ে ইসলামের বিশেষত্ব হলো যে, জামাআতের শৃঙ্খলা ও এর সদস্যদের সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং এর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জামাআতের 'উলিল আমর' বা আদেশদাতাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে। তারা হলেন সেই সব কর্তৃপক্ষ যাদের ওপর বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রশাসনে কর্তৃত্বের সাথে দায়বদ্ধতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অর্থাৎ: এর প্রয়োগের জন্য জবাবদিহিতা। এদের একটি অপরটি ছাড়া থাকতে পারে না। অর্থাৎ, কর্তৃত্ব দায়বদ্ধ, তাই দায়িত্বশীলতা অনিবার্য; কোনো দায়িত্বহীন কর্তৃত্বের অস্তিত্ব নেই।

ইসলাম দায়িত্বশীল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে এবং এখানে দায়বদ্ধতা হলো ব্যক্তিগত। প্রত্যেকে তার নিজের হাতের অর্জিত কাজের জন্য জবাবদিহি করবে এবং তার দায়বদ্ধতা অন্যের ওপর বর্তাবে না। এটিই পবিত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।" [আন-নাহল: ৯৩]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের বিনিময়ে দায়বদ্ধ।" [আত-তূর: ২১]। মহান আল্লাহ বলেন: "প্রত্যেক সত্তা তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।" [আল-মুদ্দাসসির: ৩৮]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তার নিজের ওপরই বর্তায় এবং কোনো বহনকারী অন্য কারো (পাপের) বোঝা বহন করবে না।" [আল-আনআম: ১৬৪]। মহান আল্লাহ বলেন: "আপনি বলুন, আমাদের অপরাধ সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে না।" [সাবা: ২৫]।

ইসলামে দায়বদ্ধতা কেবল শারীরিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সুমহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং হৃদয়—এদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।" [আল-ইসরা: ৩৬]। সুতরাং মানুষ তার চিন্তা ও আচরণের জন্য দায়বদ্ধ।

শরীয়তসম্মত রাজনীতি
ত্রয়োদশ পাঠ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মানবিক ও সামাজিক পন্থায় ক্ষমতা ও দায়িত্বের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। ক্ষমতা এখানে তার সেই সহজাত ও সুস্থ অর্থ গ্রহণ করেছে যা মানবজাতি সমাজের প্রাথমিক একক অর্থাৎ পরিবারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জেনেছে; আর তা হলো অন্যদের বিষয়াদির দেখাশোনা ও তাদের সেবা করা। এই উদ্দেশ্যেই নবী ﷺ হাদীসে বলেছেন: "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং মানুষের ওপর নিযুক্ত ইমাম একজন রাখাল এবং তিনি তার অধীনস্থদের জন্য দায়ী। পুরুষ তার পরিবারের লোকজনের ওপর রাখাল এবং সে তার অধীনস্থদের জন্য দায়ী। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের ওপর রাখাল এবং সে তাদের ব্যাপারে দায়ী। আর ভৃত্য তার মালিকের সম্পদের ওপর রাখাল এবং সে তার ব্যাপারে দায়ী। সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"

এটি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইসলামি চিন্তাধারার এক সুমহান নির্দেশনা, যার সামনে অন্য যেকোনো চিন্তাধারাই তুচ্ছ হয়ে পড়ে; চাই আমরা সেই চিন্তাধারা বা তার প্রবর্তকদের ওপর যতই বৈজ্ঞানিক পবিত্রতা আরোপ করি না কেন।

এই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন:

ইসলাম জামাআতের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরির আহ্বান জানায়, যেন তাদের মাঝে অনুভূতির ঐক্য বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" [আল-হুজুরাত: ১০]। তিনি মুসলমানদেরকে সম্প্রীতির নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: "তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।" [আলি ইমরান: ১০৩]

তিনি—যিনি মহিমান্বিত ও সুউচ্চ—আমাদের কাতারের ঐক্যের আদেশ দিয়েছেন এবং বিভেদ থেকে নিষেধ করে বলেছেন: "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [আলি ইমরান: ১০৩]। মহান আল্লাহ বিবাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে বলেন: "তোমরা পরস্পর বিবাদ করো না, নতুবা তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।" [আল-আনফাল: ৪৬]। তিনি আরো ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, জামাআতের বিমুখতা ও এর সদস্যদের অনৈক্য বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। তিনি বলেন: "তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তরগুলো বিচ্ছিন্ন; এটি এ কারণে যে, তারা এমন এক কওম যারা বিচার-বুদ্ধি রাখে না।" [আল-হাশর: ১৪]

সম্মানিত নববী হাদিসসমূহ এই সামাজিক সংহতির বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে এসেছে। যেমন দয়ালু রাসূল ﷺ বলেন: "একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"

তিনি আরও বলেন: "এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে সাহায্যহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সবকিছুই হারাম: তার সম্মান, তার সম্পদ এবং তার রক্ত। তাকওয়া এখানে—তিনি তাঁর হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন—একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।" নবী ﷺ আমাদের নিকট এভাবেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সামাজিক সংহতি ও এর শক্তিকে কখনো শরীরের সাথে, আবার কখনো ইমারতের (ভবন) সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন: "মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহমর্মিতার উদাহরণ একটি শরীরের মতো; যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে তার ডাকে সাড়া দেয়।" যেমন নবী ﷺ বলেন: "এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য ইমারত স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" এ কথা বলে তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

রাসূল ﷺ জামাআত (সংগঠিত সমাজ) থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তা ত্যাগ করাকে জাহেলি বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামাআত ত্যাগ করল, অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলি মৃত্যু বরণ করল।" যেমন তিনি ﷺ আরও বলেন: "যে ব্যক্তি তার আমিরের (নেতা) মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয় এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তবে তার মৃত্যু জাহেলি মৃত্যু হিসেবে গণ্য হবে।"

এছাড়াও ইসলাম এই সংগঠন বা জামাআতের সদস্যদের জন্য যে সকল বিষয় বা নির্দেশনা নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: এই জামাআতের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ বিনিময় করা। ইসলাম সামাজিক সংহতির দাওয়াত কেবল আচরণগত দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তা চিন্তাগত দিক পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। আর তা হলো জামাআতের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ বিনিময়ের আহ্বান জানানো। মহান আল্লাহ বলেন: "এবং তাদের কাজগুলো তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।" [আশ-শুরা: ৩৮]। যেমন...

আল্লাহ তাআলা পারিবারিক বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তথা বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়ে বলেন: “অতঃপর যদি তারা উভয়ের পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের মাধ্যমে (দুধ ছাড়ানো বা) বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তবে তাদের কোনো গুনাহ নেই।” [আল-বাকারাহ: ২৩৩]। এটি এমন একটি বিষয় যা জামাআতের সদস্যদের মাঝে পরস্পরের অনুভূমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং

তাদের ও অন্যান্য দলগুলোর মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সেতুবন্ধন নিশ্চিত করে।

ইসলাম এই বুদ্ধিবৃত্তিক সেতুবন্ধন লম্বিক বা ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করে। কারণ এটি নেতা ও অনুসারীদের মাঝে—অর্থাৎ যেকোনো সংগঠনে—বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শের নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে এবং সকল নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা হিসেবে বলেন: “এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করো।” [আলে ইমরান: ১৫৯] ।

ইসলাম সমাজ গঠন এবং এর কার্যাবলি পরিচালনার ভিত্তি তৈরি করেছে—এর কর্তৃত্বের উৎস নির্ধারণের পাশাপাশি—পরামর্শ (শুরা), মতবিনিময় এবং নেতা ও অনুসারী বা শাসক ও শাসিতের মাঝে আলোচনার ভিত্তিতে। আর কাজের সংকল্প বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে পরামর্শের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তার ভিত্তিতে। ইসলাম এই বিষয়টিকে মুসলমানদের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বাস্তবতা হলো, কোনো সংগঠনের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শ কেবল তাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়াই সুদৃঢ় করে না; বরং এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে, তার মনোবল বৃদ্ধি করে এবং সংগঠনের প্রতি তার মমত্ববোধ ও আনুগত্যের অনুভূতিকে জাগ্রত করে, যেহেতু সে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত প্রদানের সুযোগ পায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন কেউ যখন পরামর্শ চাইবে তখন যেন আমানতদারিতার সাথে মত প্রকাশ করা হয়। এই বিষয়ে তিনি বলেন: “যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, সে যেন তাকে পরামর্শ দেয়।” তিনি আরও বলেন: “পরামর্শদাতা আমানতদার।”

এভাবেই ইসলাম আমাদের সামনে একটি সংগঠনের কাঠামোগত ভিত্তিগুলো উপস্থাপন করে এবং কার্যকর পদ্ধতির দিকে আমাদের দিকনির্দেশনা দেয়; যাতে জামাআতের সদস্যদের মাঝে আচরণগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি অর্জিত হয় এমন এক সুশৃঙ্খল পন্থায়, যা সমকালীন আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারা কিংবা চরমপন্থী মানবীয় মতবাদসমূহ এখনো স্পর্শ করতে পারেনি।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

ত্রয়োদশ পাঠ

নজরদারি এবং কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ:

ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার অন্যতম একটি দিকনির্দেশনা হলো: নজরদারি এবং কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এর নির্দেশনাবলী।

ইসলাম মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে আত্ম-নজরদারি এবং সচেতন পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে এমন সব দিকনির্দেশনা প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছে, যা মূলত সমাজের অস্তিত্ব ও সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে; যেন সমাজের প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয় এবং একইসাথে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়। নজরদারি এবং কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার সেই দিকনির্দেশনাগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা তা নিরূপণ করব:

প্রথমত: আত্ম-নজরদারি:

ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামের সঠিক পথ বা পন্থা এটিই দাবি করে যে, এটি হবে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপী। এর অনিবার্য ফলাফল হিসেবে ইবাদতের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যার অর্থ হলো: ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর আদেশসমূহ অনুসরণ করা এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করা। যেমনটি মহিমাময় কুরআন নির্দেশ দিয়েছে এবং আমাদের নবী (সা.)-এর সুন্নাহ তা ব্যাখ্যা করেছে। এই কুরআন ও সুন্নাহকে এমন বিধানদাতা উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা আমাদের জন্য আচরণের নিয়মাবলী এবং সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা নির্ধারণ করে দেয়।

যেহেতু এই নিয়মাবলী দুনিয়া ও দ্বীনের বিষয়ে মানবজাতির কল্যাণকে লক্ষ্য করে প্রণীত, তাই ইসলাম মুসলমানদের এই নিয়মাবলী মেনে চলার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। আর এটি সম্পন্ন হয় এক প্রকার আত্ম-নজরদারির মাধ্যমে যার ভিত্তি হলো: নিজেদের মধ্যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে পরস্পরকে সুপরামর্শ প্রদান করা। এর ফলে তারা একটি শ্রেষ্ঠ সমাজ গঠন করবে এবং ফলস্বরূপ তারা হবে মানবজাতির কল্যাণে শ্রেষ্ঠ উম্মত।

৬১৩

ত্রয়োদশ পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরীয়াহভিত্তিক রাজনীতি)

পবিত্র কুরআনের মহান আয়াতসমূহ এই উচ্চতর অর্থগুলোকে সুনিশ্চিত করে। মহান আল্লাহ বলেন: "আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে..." [আত-তাওবাহ: ৭১]। যেমন মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম" [আল-ইমরান: ১০৪]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো" [আল-ইমরান: ১১০]।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসেবে নসিহত বা উপদেশের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: "দ্বীন হলো নসিহত বা কল্যাণকামিতা (আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের জন্য)।"

মহান প্রতিপালক কোনো বাধা প্রদান ছাড়া মন্দ কাজ ছেড়ে দেওয়ার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন; মহান আল্লাহ বলেন: "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় ঈসার মুখে অভিশপ্ত হয়েছিল। এটা এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা যেসব মন্দ কাজ করত, তা হতে একে অপরকে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট!" [আল-মায়িদাহ: ৭৮-৭৯]।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামর্থ্য অনুযায়ী মন্দ কাজ প্রতিরোধ ও তা পরিবর্তনের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখে, তবে সে যেন তার হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়; যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে যেন তার জিহ্বা দিয়ে (প্রতিবাদ করে); আর যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়, তবে যেন তার অন্তর দিয়ে (তা ঘৃণা করে); আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।" এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণই হলো সমাজ উন্নয়নের লক্ষে ইসলামে স্বীকৃত আচরণের পরিবর্তনের হাতিয়ার; যেমন মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন করে" [আর-রাদ: ১১]।

ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ প্রশাসনের পরিচিত 'হিসবাহ' ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এটি সংস্থা ও প্রকল্পের পর্যায়ে

কাঙ্ক্ষিত প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে, ঠিক যেমনটি এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ পূরণ করে থাকে।

ত্রয়োদশ পাঠ

দ্বিতীয়ত: কার্যসম্পাদন পর্যবেক্ষণ:

ইসলাম এই নীতিকে স্বীকৃতি দেয় যে, ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনের কর্মের জন্য দায়ী। এর ভিত্তি মূলত পরকালীন হিসাব দিবসের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যেদিন আল্লাহ মানুষের আমলসমূহের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং এর বিনিময় প্রদান করবেন: হয় জান্নাতের সওয়াব, নতুবা জাহান্নামের শাস্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সর্ববেষ্টনকারী, সর্বদ্রষ্টা, তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং তাদের ওপর সদা পর্যবেক্ষণকারী। আল-কুরআনের অনেক আয়াত একে সুনিশ্চিত করে, যার মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখযোগ্য: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কিছু করো তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" [আন-নিসা: ১০৮]। তিনি আরও বলেন: "আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।" [আলে ইমরান: ১৫৬]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আর তোমরা যা আমল করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" [আল-বাকারাহ: ২৩৪]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর সদা পর্যবেক্ষণকারী।" [আন-নিসা: ১]

মানুষের সকল কার্যাবলির ওপর ঐশ্বরিক এই তদারকির আলোকে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের পার্থিব জ্ঞান অনুযায়ী এ জাতীয় কার্যাবলির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন; যা তাঁর এই বাণীতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: "বলুন, তোমরা আমল করো, শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনগণও। আর তোমাদেরকে অচিরেই অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত সত্তার নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা আমল করতে।" [আত-তাওবাহ: ১০৫]। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা পরোক্ষভাবেও ইঙ্গিত করেছেন: "আর মানুষের জন্য তা-ই থাকে যার জন্য সে চেষ্টা করে। আর তার প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখা হবে।" [আন-নাজম: ৩৯, ৪০]

উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যেহেতু এই জীবনে মানুষের আমল ও প্রচেষ্টাই তার মূল্যমান এবং তার দায়বদ্ধতার মূল ভিত্তি, তাই অন্যদের মাধ্যমে সেই কাজ পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তা বিভিন্ন তদারকি পদ্ধতির মাধ্যমে হতে পারে; চাই তা সরাসরি তত্ত্বাবধান ও এর জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্বমূলক যোগ্যতার মাধ্যমে হোক, অথবা নিয়মিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন মূল্যায়নের মাধ্যমে হোক, কিংবা বিভিন্ন ধরনের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে হোক। সুতরাং সক্রিয় পর্যবেক্ষণের এমন পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই যা কর্মীকে তার কাজে প্রাণবন্ত রাখে এবং পর্যায়ক্রমে তার প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করে। এটি হতে হবে সূক্ষ্ম ও সুপরিচিত অনুপাত এবং দায়িত্ব ও কর্মসম্পাদনের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী।

পৃষ্ঠা 16

ত্রয়োদশ পাঠ
শরয়ী রাজনীতি (আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ)

অর্জিত কার্যাবলীর তদারকি ও অনুসরণের সাথে যা সম্পৃক্ত তা হলো: কিছু নীতিমালা ও মানদণ্ড নির্ধারণ করা। কেননা ইসলাম—যেমনটি পূর্বে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—সঠিক চিন্তা ও সুষম আচরণের প্রতি আহ্বান জানায়, যাতে কোনো অতিরঞ্জন, শিথিলতা কিংবা বিচ্যুতি থাকবে না। এটি মানবিক কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল বিন্যাস ও বিধিবদ্ধকরণের দাবি রাখে, যা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মানদণ্ড অনুযায়ী হবে। ব্যক্তিবর্গ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে এবং তার আলোকেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এই কারণেই কাজের ভারসাম্য রক্ষাকারী নীতিমালা ও মানদণ্ড নির্ধারণ করা অপরিহার্য, যার ভিত্তিতে কর্মীবৃন্দ কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবে। এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক মূলনীতি ও এর প্রযুক্তিগত পদ্ধতির আলোকে তদারকি ও অনুসরণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

কুরআনুল হাকীমের দিকনির্দেশনা এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক। মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এর সৃষ্টিশৈলীকে সুনিপুণ করেছেন এবং অত্যন্ত সুক্ষ্ম নীতিমালা ও পরিমাপ অনুসারে একে পরিচালনা করছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।" [আল-কামার: ৪৯]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "এবং তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা সুনির্দিষ্ট পরিমাপে নির্ধারণ করেছেন।" [আল-ফুরকান: ২]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।" [আত-তালাক: ৩]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "এবং এমন কোনো বস্তু নেই যার ভাণ্ডারসমূহ আমার কাছে নেই; আর আমি তা একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতিরেকে অবতীর্ণ করি না।" [আল-হিজর: ২১]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলো এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার জন্য মনজিলসমূহ (কক্ষপথের পর্যায়) নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এগুলো কেবল যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন।" [ইউনুস: ৫]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন পর্যায় নির্ধারণ করেছি; পরিশেষে তা শুষ্ক ও বক্র পুরাতন খেজুর শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে দিনের আগে বেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।" [ইয়াসীন: ৩৯-৪০]

সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ আমাদের এই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড ও পরিমাপ অনুসৃত হয়েছে। তাই আমাদের জন্য এটিই সমীচীন যে, এই ঐশ্বরিক নির্দেশনার আলোকে আমরা আমাদের চিন্তা ও আচরণকে একটি সঠিক পন্থায় এবং এমন কিছু মূলনীতি ও নিয়মের অধীনে পরিচালিত করব, যার দিকে সুস্থ বিবেক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

পৃষ্ঠা 17

শরয়ী রাজনীতি
তেইশতম পাঠ

যেমন মহান বরকতময় আল্লাহ—যিনি মানুষের স্বভাব সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাদের কর্ম সম্পর্কে খবরদার—হকের মানদণ্ড এবং মানুষের আমলের জন্য ন্যায়ের পাল্লা স্থাপন করেন, কিয়ামত দিবসে যার দাবি অনুযায়ী তিনি সওয়াব বা শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাঁর কুদরত মহান এবং প্রজ্ঞা সুউচ্চ:

“আর আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়ের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব, সুতরাং কারও প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না। আর যদি তা

সরিষার দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।" (আল-আম্বিয়া: ৪৭)

"আর সেদিন পরিমাপ হবে সত্য। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের নফসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে..." (আল-আরাফ: ৮, ৯)

কুরআনের এই হিদায়াতের আলোকে আমাদের কর্তব্য হলো কর্মের পাল্লাসমূহ নির্ধারণ করা এবং আমাদের পার্থিব জীবনে কাজের জন্য মানদণ্ড ও পরিমাপক স্থির করা; যাতে আমাদের জবাবদিহিতা বস্তুনিষ্ঠ এবং নির্ভুল হয়।

তদারকি ও দায়িত্ববোধ সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গণনা করা এবং অর্জিত সাফল্যগুলো ধারাবাহিকভাবে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত; যা বিভিন্ন রিপোর্ট এবং উন্মুক্ত আমলনামায় সংরক্ষিত হবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন: **"আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গলায় লটকিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য বের করব একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।"** (আল-ইসরা: ১৩, ১৪)

যেমন মহান আল্লাহ আরও বলেন: **"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে, তখন তুমি অপরাধীদের দেখবে যে, তাতে যা আছে তার কারণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায় আফসোস! এ কেমন কিতাব! যা ছোট-বড় কোনো কাজই বাদ দেয়নি, বরং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব রেখেছে'। আর তারা যা আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারও প্রতি যুলুম করবেন না।"** (আল-কাহাফ: ৪৯)

এগুলোই হলো ইসলামের সেই মৌলিক উপাদানসমূহ যা সর্বোত্তম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিবেচনায় রাখা উচিত; এবং আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তা বর্তমানে যা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর গভর্নর ও কর্মীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতেন। আবদ আল-কায়েস প্রতিনিধি দল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাদের উপর নিযুক্ত গভর্নর আলা ইবনুল হাদরামী সম্পর্কে অভিযোগ করলে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বক্তব্য শুনতেন এবং বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতেন...

ত্রয়োদশ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি আলাকে অপসারিত করেন এবং তাদের উপর আবান ইবন সাঈদকে নিযুক্ত করেন। তাকে নসিহত প্রদান করে তিনি বলেন: "তোমরা আবদ আল-কায়স গোত্রের সাথে কল্যাণকর আচরণ করো।" একবার তিনি এক ব্যক্তিকে সাদাকা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন। যখন সে ফিরে এল এবং তার হিসাব গ্রহণ করা হলো, তখন সে বলল: "এটি আপনাদের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) সম্পদ, আর এটি আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "সেই ব্যক্তির কী হলো যাকে আমরা এমন কাজে নিযুক্ত করি যার দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, অথচ সে বলে: এটি আপনাদের জন্য আর এটি আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে? সে কেন তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকল না, তখন সে দেখতে পেত যে তাকে কেউ উপহার দেয় কি না?" এরপর তিনি বলেন: "যাকে আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করেছি এবং তার জন্য জীবিকা (বেতন) নির্ধারণ করে দিয়েছি, এরপর সে অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে তা হবে আত্মসাৎ।"

ইসলামি প্রশাসনিক চিন্তাধারার অন্যান্য নির্দেশনার মধ্যে একটি হলো: যা জনশক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা এখানে জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইসলামি চিন্তাধারার এমন কিছু নির্দেশনার প্রতি ইঙ্গিত করব যা উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। ইসলাম মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে তার সঠিক আচরণগত পদ্ধতির আলোকে

এগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

যৌথ কর্মে মানবিক সম্পর্ক:

ইসলাম হলো শ্রেষ্ঠত্বের ধর্ম এবং মহৎ চরিত্রের আহ্বান। মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত রাসূলের চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা আল-কালাম: ৪]। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "আমি কেবল সচ্চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনার এমন কিছু দিক উপস্থাপন করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে, যা সঠিক প্রশাসনিক আচরণকে সুনিশ্চিত করে, চাই তা মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হোক কিংবা সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে:

প্রথমত: মানবিক সম্পর্ক:

নিম্নে আমরা ব্যক্তিবর্গের সেই সব গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক গুণাবলি তুলে ধরছি, যা সকল প্রকার সমষ্টিগত মানবিক কর্মকাণ্ডে তাদের সামাজিক আচরণের সর্বোচ্চ নৈতিকতা হিসেবে গণ্য হয়: আমানতদারিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা।

শরয়ী রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করব তা হলো: আমানত (আমানতদারিতা) এবং ইনসাফ (ন্যায়বিচার)। ব্যক্তিরা তাদের ওপর অর্পিত কর্মের ক্ষেত্রে আমানতদার হিসেবে গণ্য হবে—অর্থাৎ পেশাগত দায়িত্ব ও কারিগরি কাজের ক্ষেত্রে। ফলে কর্মচারী বা কর্মকর্তা জনসাধারণের স্বার্থের আমানতদার হিসেবে বিবেচিত হবে যার সাথে সে লেনদেন করছে; তার অধীনে থাকা ধন-সম্পদ এবং বিভিন্ন প্রকার পণ্য ও উপকরণের সে আমানতদার; সে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট যে সকল তথ্য ও মতামত পেশ করে তার সত্যতার ক্ষেত্রেও সে আমানতদার; তদ্রূপ সে তার অধীনস্তদের সুপরামর্শ ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমানতদার; আর তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার বজায় রাখা, তাদের মূল্যায়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রেও সে আমানতদার।

শ্রমিক তার পরিচালিত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এবং সে যে সকল সরঞ্জাম ও কাঁচামাল ব্যবহার করে তার ক্ষেত্রে আমানতদার। এ কারণেই ইসলাম আমানত রক্ষা এবং ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে ফয়সালা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না উৎকৃষ্ট উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"** (আন-নিসা: ৫৮)। মহান আল্লাহ মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **"এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"** (আল-মুমিনুন: ৮)। তিনি আরও বলেন: **"নিশ্চয়ই তোমার কর্মচারী হিসেবে সেই সর্বোত্তম, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"** (আল-কাসাস: ২৬)।

এ প্রসঙ্গে নববী আদর্শ ইমাম আলীর একটি বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, তিনি বলেন: "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় আলিয়া (উচ্চভূমি) অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি আগমন করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ‘হে আলিয়ার অধিবাসী, আমাকে এই দ্বীনের সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে সহজ বিষয়টি সম্পর্কে জানাও।’ সে বলল: ‘এই দ্বীনের সবচেয়ে সহজ বিষয়টি হলো—এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর এর সবচেয়ে কঠিন বিষয়টি হলো—আমানত। জেনে রেখো, যার আমানতদারিতা নেই তার কোনো দ্বীন নেই, যদিও সে

সিয়াম পালন করে এবং সালাত আদায় করে।’"

প্রতারণা বা ধোঁকা দেওয়ার সকল প্রকার ও পদ্ধতিই আমানতদারিতার পরিপন্থী, যেমন—পণ্যের দোষ গোপন করা এবং কেবল তার ভালো দিকগুলো প্রকাশ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে খাদ্যশস্য বিক্রি করছিল। খাদ্যটি দেখে তাঁর পছন্দ হলো। অতঃপর তিনি তার ভেতর হাত প্রবেশ করালেন এবং সিক্ততা (ভেজা ভাব) অনুভব করলেন। তখন তিনি বললেন: "হে খাদ্য বিক্রেতা, এটি কী?" সে বলল: "এতে (বৃষ্টির পানি) লেগেছে..."

৬১৯

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

ত্রয়োদশ পাঠ

"(আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়েছে) হে আল্লাহর রাসূল - অর্থাৎ: তার (খাবারের) ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল - তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তবে কেন তুমি তা খাবারের উপরে রাখনি যাতে মানুষ তা দেখতে পায়?" অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের মাঝে ফয়সালার ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন; আর এটি আমাদের আচরণে, অন্যদের সাথে আমাদের সামগ্রিক লেনদেনে এবং পাওনাদারদের কাছে তাদের প্রাপ্য অধিকার পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে কোনো স্বজনপ্রীতি থাকবে না যা আত্মীয়তার টানে জন্ম নেয়, আর না কোনো প্রতিশোধস্পৃহা থাকবে যা ক্রোধ উসকে দেয়। এই জন্যই আমাদের রব সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: **"আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায়সংগত বলবে, যদিও তা নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারেও হয়"** [আল-আন'আম: ১৫২]। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেছেন: **"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে তোমরা সুবিচার করবে না। তোমরা সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী"** [আল-মায়িদাহ: ৮]। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "দশজন লোকেরও যদি কোনো আমির বা নেতা থাকে, কিয়ামতের দিন তাকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় আনা হবে, একমাত্র ন্যায়বিচারই তাকে মুক্ত করতে পারে।"

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমাদের সতর্ক করেছেন যেন আমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ন্যায়বিচার পরিহার না করি, পরিস্থিতি বা বিবেচনা যাই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"হে মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী এবং আল্লাহর সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক বা গরিব, আল্লাহই উভয়ের জন্য অধিক কল্যাণকামী। সুতরাং তোমরা সুবিচার করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না; আর যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো কিংবা বিমুখ হও, তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত"** [আন-নিসা: ১৩৫]।

কেউ কেউ এই সম্মানিত আয়াতের তাফসিরে বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের ওপর অবিচল থেকো, তা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হও, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, অথবা তোমাদের পিতা-মাতা কিংবা তোমাদের নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে সে যদি ধনী হয় তবে তার ধনের প্রতি আসক্ত হয়ে কিংবা সে যদি দরিদ্র হয় তবে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সাক্ষ্য দান হতে বিরত থেকো না। কারণ তোমাদের চেয়ে আল্লাহই ধনী ও দরিদ্রের অবস্থা বিবেচনার অধিক হকদার। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচারের প্রতি অনিহা বশত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা সত্যের নিদর্শন গোপন করার জন্য তোমাদের জিহ্বা বাঁকিয়ে কথা বলো অথবা সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবহিত; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।"

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
ত্রয়োদশ পাঠ

লেনদেনে ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণের দাবি হলো: মাপ ও ওজনে পূর্ণতা রক্ষা করা। আর এটিই আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বাণীতে: "যখন তোমরা মেপে দিবে তখন পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।" (আল-ইসরা: ৩৫)। তিনি মাপে কম দানকারীদের ধ্বংস ও আযাবের ভয় দেখিয়েছেন, যখন আল্লাহ তাআলা বলেন: "ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন তারা কম দেয়।" (আল-মুতাফফিফীন: ১-৩)।

এভাবেই ইসলাম আমাদের কথা ও কাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণের আহ্বান জানায়; পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় এটি পালনীয়। এটিই আমাদের কথা ও কাজে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করে এবং একে পক্ষপাতিত্ব বা প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখে।

কর্মক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: সহযোগিতা ও দয়া। একজন কর্মীর নিকট তার চারপাশের সবার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা কাম্য, তা দলের ভেতরে হোক বা বাইরে; সহকর্মী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধস্তন কর্মচারী অথবা সাধারণ জনগণ যাদের সাথে সে লেনদেন করে—সবার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। আর এটি করা হয় সামগ্রিক কল্যাণ এবং দল ও তার সদস্যদের সাধারণ মঙ্গলের আশায়। ইসলাম আমাদের এই নির্দেশই দিয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না।" (আল-মায়িদাহ: ২)।

আমাদের নবী (সা.) বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের পার্থিব বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ করে দিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।" নবী (সা.) আরও বলেন: "এমন কোনো বান্দা নেই যাকে আল্লাহ কোনো নিয়ামত দান করেছেন এবং তা তার ওপর পূর্ণ করেছেন, অতঃপর মানুষের প্রয়োজনগুলো তার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু সে তাতে বিরক্ত বোধ করল—অর্থাৎ সে তাদের প্রয়োজন পূরণ করল না—তবে সে সেই নিয়ামতকে বিলীন হওয়ার সম্মুখীন করল।"

ইসলামে এই পারস্পরিক সহযোগিতা সামাজিক সংহতি অর্জনের মাধ্যমে তার উজ্জ্বলতম মানবিক রূপ পরিগ্রহ করে; যার উচ্চতায় মানবীয় কোনো সামাজিক মতবাদ আজও পৌঁছাতে পারেনি। এটি তখন প্রকাশ পায় যখন এটি নির্দেশ দেয় যে, যার কাছে কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত বা প্রাচুর্য আছে সে যেন অপরের প্রয়োজন মেটাতে দ্রুত এগিয়ে আসে। যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যার কাছে অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোনো বাহন নেই—অর্থাৎ গবাদি পশু বা সওয়ারি—আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দেয় যার কোনো পাথেয় নেই।”

এই সহযোগিতা কেবল দয়ার সাথে সম্পৃক্তই নয়, বরং এটি দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিই ইসলামের বাণীর মূল ভিত্তি। মহান প্রতিপালক আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেন: “আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত (দয়া) স্বরূপই প্রেরণ করেছি।” [আল-আম্বিয়া: ১০৭]। এবং সত্য ও সুমহান আল্লাহ নিজের গুণ বর্ণনা করে বলেন: “আর আমার রহমত প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে।” [আল-আ’রাফ: ১৫৬]।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: “যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।” তিনি আরও বলেন: “নিশ্চয়ই কোমলতা যে কোনো বিষয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করে না, আর যে বিষয় থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা কেবল তাকে কলঙ্কিতই করে।” এভাবে সহযোগিতা ও রহমত মানুষের প্রতিটি আচরণকে এক মানবিক রঙে রঞ্জিত করে যা কোমলতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, হোক তা মানুষের সাথে কিংবা পশুপাখির সাথে। সুতরাং এই দুটি—অর্থাৎ সহযোগিতা ও রহমত—ইসলামের সেই মহত্তম মানবিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত যা কার্যকর সামাজিক সুসম্পর্ক ও গঠনমূলক কর্মসম্পর্ক নিশ্চিত করে।

ইসলামি প্রশাসনিক চিন্তাধারায় কর্মক্ষেত্র ও মানবিক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: পরিমিতিবোধ ও ভারসাম্য।

ইসলাম যে সঠিক ও আদর্শ আচরণের আহ্বান জানায়, তা কর্ম ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও ভারসাম্যের দাবি রাখে। এছাড়া আচরণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা প্রয়োজন; যাতে থাকবে না কোনো অবহেলা, থাকবে না কোনো কঠোরতা, থাকবে না কোনো কার্পণ্য বা অপচয়। থাকবে না কোনো স্থবিরতা কিংবা নীতিহীন লাগামহীনতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা।

পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে আমাদের জন্য এক সঠিক মূলনীতি তুলে ধরেছে যখন মহান আল্লাহ মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন: “আর যারা ব্যয় করার সময় অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তাদের নীতি হয় এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ।”

"...সেটি ছিল মধ্যমপন্থা" [আল-ফুরকান: ৬৭]। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: "তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না

এবং তা পুরোপুরি প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।" [আল-ইসরা: ২৯] ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সঠিক মূলনীতিটি অপচয়ের পরিপন্থী, যা অর্থ, শ্রম, সময় ও উপকরণের ব্যাপক অপচয় ঘটায়। একইভাবে অপ্রয়োজনীয় দাপ্তরিক প্রক্রিয়া ও চিঠিপত্রের অতিব্যবহার, আর্থিক বরাদ্দের সীমা লঙ্ঘন করা এবং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মিতব্যয়ী না হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই পবিত্র কুরআন একাধিক আয়াতে অপচয় করতে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা আহার করো ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" [আল-আরাফ: ৩১]। তেমনিভাবে তিনি আমাদের অপচয়কারীদের নির্দেশ মানতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী অপচয়কারীদের আনুগত্য করো না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সংস্কার করে না।" [আশ-শুআরা: ১৫১-১৫২] ।

এ বিষয়ে নববী নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত হলো মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো এবং দান করো; তবে তাতে যেন অপচয় ও অহংকার না থাকে।"

চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পরিচালিত করে।

ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা যৌথভাবে কোনো কাজ করে তাদের মধ্যে যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা।

সত্যবাদিতা বলতে বোঝায় কথা ও কাজে সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং তা অনুসন্ধান করা। এটি তথ্যের সঠিকতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে পেশকৃত তথ্য ও প্রতিবেদনের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। এর ফলে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবসম্মত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই পবিত্র কুরআন সত্যবাদিতা ও সত্যবাদীদের প্রশংসা করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের—তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক—সম্পর্কে বলেন: "এবং আমি তাদের দান করেছি..."

তেরোতম পাঠ

...আমাদের রহমত থেকে এবং তাদের জন্য আমরা উচ্চমর্যাদার সুখ্যাতি দান করেছি। [মারইয়াম: ৫০] যেমন মহান আল্লাহ বলেন: আর এই কিতাবে ইসমাইলের কথা স্মরণ করো, তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সত্যবাদী এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী। [মারইয়াম: ৫৪] মহান আল্লাহ মুমিনদের সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন: হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। [আত-তাওবাহ: ১১৯]

মিথ্যা বলা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক, কেননা মহান সত্য সত্তা আল্লাহ বলেন: যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না তারাই কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে, আর তারাই হলো মিথ্যাবাদী। [আন-নাহল: ১০৫]

অনুরূপভাবে নিফাক বা কপটতা সত্যবাদিতার পরিপন্থী। আল্লাহ সত্যবাদীদের পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং মুনাফিকদের শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: যেন আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতার কারণে পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদের চাইলে শাস্তি দেন অথবা তাদের তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [আল-আহযাব: ২৪]

সম্মানিত রাসূল ﷺ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন: “যার মধ্যে চারটি গুণ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি থাকবে, সেটি ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে: যখন তাকে বিশ্বাস করা হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন অন্যায় আচরণ বা গালিগালাজ করে।” যেমনটি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলেছিলেন: “যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও এবং যাতে সন্দেহ নেই তা গ্রহণ করো; কারণ মিথ্যা হলো সংশয় বা অস্থিরতা, আর সত্য হলো প্রশান্তি।”

সত্য প্রকাশের জন্য সত্য কথা বলতে আমাদের দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “মানুষের ভয় যেন কোনো ব্যক্তিকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে যখন সে সত্যটি জানে।”

কথার সাথে কাজের অমিল হওয়াও সত্যবাদিতার পরিপন্থী; তাই মহান আল্লাহ বলেন: হে মুমিনগণ, তোমরা কেন তা বলো যা তোমরা করো না? আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা তা বলো যা তোমরা করো না। [আস-সাফ: ২, ৩] এটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি বিষয়, বিশেষ করে কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ, তথ্য ও অগ্রগতি প্রতিবেদনের (পারফরম্যান্স রিপোর্ট) ক্ষেত্রে।

শরয়ী রাজনীতি
ত্রয়োদশ পাঠ

নিষ্ঠা (ইখলাস) সত্যবাদিতার সাথে সম্পৃক্ত, যা দাবি করে যে সকল কথা ও কাজ যেন তাদের শরয়ী লক্ষ্যপানে ধাবিত হয় এবং তাতে যেন কোনো বিচ্যুতি না ঘটে। ইসলামে এই লক্ষ্যগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হলো কল্যাণ, কারণ আমাদের এটি অর্জনে প্রতিযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন: "প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ ফিরায়। অতএব তোমরা সৎকাজে একে অপরের ওপর অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো।" [আল-বাকারাহ: ১৪৮]। বিচ্যুতিহীনভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

মহিমান্বিত কুরআন আমাদের আল্লাহর ইবাদতে নিষ্ঠাবান হওয়ার নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।" [আয-যুমার: ২]। তিনি আরও বলেন: "তাদের এছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে এবং একমুখী হয়ে।" [আল-বাইয়্যিনাহ: ৫]।।

এগুলো হলো নির্দিষ্ট কোনো কাজে নিয়োজিত দলের সদস্যদের মধ্যকার মানবিক সম্পর্কসমূহ।

দ্বিতীয়ত: সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্কের উপস্থিতি:

ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তাধারার নির্দেশনাসমূহের মধ্যে রয়েছে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত একটি দলের মধ্যে সাধারণ সম্পর্কের উপস্থিতি।

জনসম্পর্ক (পাবলিক রিলেশনস) বলতে দল অর্থাৎ সংগঠন ও তার কর্মরত সদস্যদের মধ্যে এবং এর সেবা গ্রহণকারী ও সুবিধাভোগী নাগরিকদের মধ্যে উত্তম বোঝাপড়া বৃদ্ধি করাকে বোঝায়, যাতে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয়। এই বোঝাপড়া বৃদ্ধির জন্য জনসম্পর্কের মাধ্যমগুলো হলো—দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সেবা গ্রহণকারীদের জনমত যাচাই করা, তাদের প্রদত্ত সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং কীভাবে তারা সর্বোত্তম উপায়ে ও সদাচরণের মাধ্যমে এই সেবাগুলো লাভ

করতে ও তা থেকে উপকৃত হতে পারে সে বিষয়ে তাদের সচেতন করা।

ইসলামের নির্দেশনাসমূহ এই সম্পর্কগুলোর উন্নয়নে এবং যেকোনো দল ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা অর্জনে আমাদের এক সঠিক নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। এক্ষেত্রে পরামর্শের (শূরা) নীতি...

ত্রয়োদশ পাঠ

শরয়ি রাজনীতি (আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ)

ইসলামিক এবং এর ভিত্তি হলো প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বাণী: "এবং তাদের কার্যাবলি তাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।" [আশ-শূরা: ৩৮]। এই নীতির বিশেষত্ব হলো এটি কেবল সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেই নয়, বরং সংগঠন এবং তার সাথে লেনদেনকারী অন্যান্য দল ও ব্যক্তিদের মধ্যেও পারস্পরিক সমঝোতা নিশ্চিত করে, যারা এর কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ থেকে উপকৃত হয়।

ইসলামী শূরার (পরামর্শ) নীতি প্রয়োগের দাবি হলো লেনদেনকারী এই ব্যক্তিদের মধ্যে জনমত যাচাই করা, যাতে তাদের জরুরি ও প্রকৃত প্রয়োজনীয়তাগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং এর ফলে তাদের গ্রাহক ও জনসাধারণের মতামতের আলোকে সেই প্রয়োজনগুলো সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট উপায়ে পূরণ করা সম্ভব হয়।

সংগঠনের সাথে লেনদেনকারী সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করা উচিত প্রচলিত ও সহজলভ্য বিভিন্ন জনমত যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে, যেমন: সংবাদ মাধ্যম, অনুসন্ধানমূলক জরিপ এবং এই সেবার দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিদের উপদেষ্টা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে।

নাগরিকদেরকে সংগঠনের (অর্থাৎ সংস্থার) সেবাসমূহ সম্পর্কে জানানো এবং সেই সেবা লাভের সর্বোত্তম উপায় ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়ে তাদের সচেতন করা এমন একটি কাজ যা ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো" [আল-বাকারা: ৮৩]। অর্থাৎ: তাদের জন্য কল্যাণকামী উপদেশ প্রদান করা। এর অর্থ কেবল কথার মাধুর্য বা বাক্যালাপে শিষ্টাচার প্রদর্শন নয়; বরং 'হুসন' (সুন্দর) বলতে তাই বুঝায় যা দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য উপকারী। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর আমার বান্দাদের বলে দিন তারা যেন সেই কথাই বলে যা সর্বোত্তম।" [আল-ইসরা: ৫৩]

সত্যের অধিকারী মহান আল্লাহ 'উত্তম বাক্যে'র উপকারী প্রভাবের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন: "তুমি কি দেখনি আল্লাহ কীভাবে একটি উত্তম বাক্যের উপমা দিয়েছেন? তা একটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের নির্দেশে সবসময় ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এবং অপবিত্র বাক্যের উপমা হলো একটি মন্দ বৃক্ষের মতো, যাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।" [ইবরাহীম: ২৪-২৬]

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ত্রয়োদশ পাঠ

আমাদের নবী ﷺ বলেন: "উত্তম কথা সদকা, এবং সর্বোত্তম সদকা হলো জিহবার সদকা।"

কোনো গোষ্ঠী এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা তৈরির ক্ষেত্রে সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের উত্তম আচরণের চেয়ে কার্যকর আর কিছু নেই। ইসলাম এরই তাকিদ দেয় যখন সম্মানিত রাসূল ﷺ আমাদের লেনদেনে উদারতা এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৃদ্যতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি ﷺ বলেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে বিক্রয় করার সময়, ক্রয় করার সময়, ঋণ পরিশোধের সময় এবং পাওনা তলব করার সময় উদারতা প্রদর্শন করে।"

তিনি ﷺ আরও বলেন: "মু’মিন হলো সম্প্রীতির আধার, সে অন্যের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তোলে এবং অন্যরাও তার সাথে হৃদ্যতা বজায় রাখে; আর সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে অন্যের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তোলে না এবং যার সাথে অন্যরাও হৃদ্যতা বজায় রাখে না।"

নিশ্চয়ই অন্যের প্রয়োজন পূরণ করা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ইতিকাফে বসার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা সম্মানিত রাসূল ﷺ বলেন: "তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য পদচারণা করা আমার এই মসজিদে দুই মাস ইতিকাফ করার চেয়েও উত্তম।"

যারা মানুষের প্রয়োজন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তাদের সুসংবাদ প্রদান করে তিনি ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন যাদেরকে তিনি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন; তিনি কল্যাণকে তাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে কল্যাণের নিকট প্রিয় করেছেন। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ থাকবে।"

আর যারা মানুষের প্রয়োজন থেকে নিজেকে আড়ালে রাখে, তাদের সতর্ক করে তিনি ﷺ বলেন: "যাকে আল্লাহ মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, অতঃপর সে তাদের প্রয়োজন থেকে নিজেকে আড়ালে রাখে, আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন থেকে নিজেকে আড়ালে রাখবেন।"

যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ:

ইসলামি প্রশাসনিক চিন্তাধারার অন্যতম নির্দেশনা হলো, নিয়োগ হতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। আমরা এই বিষয়ে বলতে পারি: কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই ইসলামের নির্দেশনাগুলো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যোগ্যতার নীতি অনুসরণের আবশ্যকতা ব্যক্ত করে আসছে। এর মাধ্যমে ইসলাম সেই উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোর চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে, যারা গত শতাব্দীতে এই নীতির দিশা পেয়েছে; দীর্ঘকাল স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অনিষ্ট এবং সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা হ্রাসে এর নেতিবাচক প্রভাব ভোগ করার পর। ইসলামে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার নীতি অনুসরণের সারকথা হলো পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান এবং পদাধিকারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। এটিই আমরা ইসলামের সঠিক নির্দেশনার আলোকে উপস্থাপন করছি।

ইসলামি রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

যোগ্যতমকে দায়িত্ব প্রদান:

ইসলাম কর্মের দায়িত্ব অর্পণে—অর্থাৎ বিভিন্ন পদ ও পেশার ক্ষেত্রে—যোগ্যতা ও সততার অধিকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানায়। এটি মহান আল্লাহর বাণীর ওপর ভিত্তি করে: "নিশ্চয়ই তোমার নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত" [আল-কাসাস: ২৬]। এখানে 'শক্তিশালী' বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যে কাজের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। পাশাপাশি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদা যোগ্যতম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হয়।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হয়, অতঃপর তাদের ওপর এমন কাউকে নিযুক্ত করে যার চেয়ে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে সে অবগত, তবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করল।" তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি দশজনের ওপর কাউকে নিযুক্ত করল এমতাবস্থায় যে সে জানে তাদের মধ্যে তার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান, তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম জামাতের সাথে প্রতারণা করল।"

ইসলামি ব্যবস্থায় জনসেবামূলক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইনি নীতিগুলো যোগ্যতাকে নিয়োগের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে অযোগ্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া যেমন বৈধ নয়, তেমনি যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়াও জায়েজ নয়। এর অর্থ হলো, যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় যার যোগ্যতা থাকলেও তা অন্য আবেদনকারীদের যোগ্যতার তুলনায় কম, তবে সেই নির্বাচন ইসলামের একটি মৌলিক আইনি নীতির পরিপন্থী হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্বাচনের পূর্বে পরীক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মুআয বিন জাবালকে বিচারকের পদে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছিলেন তা একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন: "হে মুআয, তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?" তিনি উত্তর দিলেন: "আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব।" রাসূল (সা.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন: "যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও?" তিনি উত্তর দিলেন: "তবে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করব।" রাসূল (সা.) আবার প্রশ্ন করলেন: "যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহতেও তা না পাও?" তিনি উত্তর দিলেন: "আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করব এবং এতে কোনো ত্রুটি করব না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন।"

অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র চাওয়ার কারণে বা কোনো মহান সাহাবীর প্রতি বিশেষ অনুকম্পাবশত কোনো দায়িত্ব প্রদান করতে অস্বীকার করেছেন, যতক্ষণ না সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি এবং আমার চাচাতো ভাইদের মধ্য থেকে দুইজন লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তাদের একজন বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার কিছু অংশে আমাদের আমির (দায়িত্বশীল) নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'আল্লাহর কসম! আমরা এই কাজে এমন কাউকে নিয়োগ করি না যে তা চায় অথবা এর প্রতি লোভ রাখে'।"

বর্ণিত আছে যে, আবু যার আল-গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাকে নিয়োগ করবেন না? - অর্থাৎ: কোনো কাজের দায়িত্ব দেবেন না? - তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'হে আবু যার! নিশ্চয়ই তুমি দুর্বল, আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা নিজের জন্য পছন্দ করি। নিশ্চয়ই এটি (দায়িত্ব) একটি আমানত, আর কিয়ামতের দিন এটি হবে লাঞ্ছনা ও অনুতাপের কারণ, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার হক আদায় করে গ্রহণ করেছে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে'।"

ইমাম নববী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: "নেতৃত্ব বা দায়িত্ব গ্রহণ পরিহার করার ক্ষেত্রে এটি একটি মহান মূলনীতি, বিশেষ করে যার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি যোগ্যতা ছাড়া এতে প্রবেশ করল এবং ন্যায়বিচার করল না, সে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার শিকার হলে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে তা নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন: "যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" এভাবেই ইসলাম এই বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে যে, পদের নিয়োগ যেন যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে বসানো হয়।

ইসলাম কাজ ও পারিশ্রমিকের অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা বিধান করেছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে যারা মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" [আন-নিসা: ১২৪]। যেমন মহান আল্লাহ আরও বলেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমলই নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী, তোমরা একে অপরের অংশ।" [আল-ইমরান: ১৯৫]।

শরয়ী রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে যা সংশ্লিষ্ট তা হলো—দক্ষতার উন্নয়ন। কেননা ইসলামের দিকনির্দেশনাগুলো আমাদের যাবতীয় কার্যক্রমকে সর্বোত্তম উপায়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। এই দিকনির্দেশনাগুলো ব্যক্তিকে গুরুত্ব, পরিশ্রম ও ইজতিহাদের সাথে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে সচেষ্ট থাকে। আর প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার ক্ষেত্রে আমরা যা উপস্থাপন করছি তা হলো এই উৎসাহ প্রদানেরই মাধ্যম।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে:
প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায়: আমাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা। আর এই সক্ষমতা অর্জন ও বিকাশের মাধ্যম হলো জ্ঞান। তাই ইসলাম আমাদের জ্ঞান অর্জন এবং আরও বেশি জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি

উৎসাহিত করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন: "এবং বলো, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" [ত্বহা: ১১৪]। এটি এই কারণে যে, বিভিন্ন সক্ষমতা অর্জনের সূচনা হয় জ্ঞান থেকেই। এটি আমাদের যাবতীয় ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিশেষ জ্ঞান উন্নয়নের একটি আহ্বান; যেন কাঙ্ক্ষিত দক্ষতার সাথে সেগুলো সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

এখানে জ্ঞানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত, যা আমাদের যাবতীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সকল প্রকার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপকারী জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জনের পরিধি কাজের সকল ক্ষেত্র তথা পেশা ও কারুশিল্পকেও শামিল করে, যেগুলোকে ইসলাম তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে গ্রহণ করেছে। মহান কুরআন আমাদের এর প্রধান মাধ্যমগুলোর মধ্য থেকে পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলকে বলেন: "পাঠ করো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [আলাক: ১]। তিনি একই সূরাতে পুনরায় বলেন: "পাঠ করো, আর তোমার রব মহাসম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।" [আলাক: ৩-৫]।

অনুরূপভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াতে বারবার এ কথাটি এসেছে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "বলো, তোমরা লক্ষ্য করো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কী রয়েছে।" [ইউনুস: ১০১]। এটি আমাদের উপকারী জ্ঞান অর্জনেরও দাবি জানায়।

শ্রবণশক্তির মাধ্যমে; মহান আল্লাহ বলেন: "যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার মধ্য থেকে যা উত্তম তা অনুসরণ করে; তাদেরই আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন আর তারাই বুদ্ধিমান।" (যুমার: ১৮)।

সম্মানিত রাসূল আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, জ্ঞান অর্জনের পথ যতোই দীর্ঘ হোক না কেন। তিনি বলেন: "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।"

উদ্দীপনা বা প্রণোদনার ক্ষেত্রে, 'উদ্দীপনা' পরিভাষাটি এমন একগুচ্ছ মাধ্যম ও পরিকল্পনার ওপর ব্যবহৃত হয় যা কোনো ব্যক্তির তার কাজের প্রতি গুণগত ও পরিমাণগত আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। ইসলাম নিখুঁতভাবে এই উদ্দীপনা প্রদান ও তা রক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল থেকেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আমি তার প্রতিদান নষ্ট করি না যে উত্তম কাজ করে।" (কাহাফ: ৩০)।

এখানে 'প্রতিদান' (আজর) শব্দটি আল্লাহর নেককার বান্দাদের জন্য বরাদ্দকৃত সমস্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সুযোগ-সুবিধার একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ এই উদ্দীপনাগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ইতিবাচক (অর্থাৎ সওয়াব) হোক বা নেতিবাচক (অর্থাৎ শাস্তি)। যেমন তিনি বলেন: "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে।" (যিলযাল: ৭-৮)।

উদ্দীপনা প্রদানের সঠিক কৌশলের প্রয়োগ এমনই হওয়া আবশ্যক; কারণ উদ্দীপনার ভারসাম্যে সামান্যতম বিচ্যুতি—তা বৃদ্ধি বা হ্রাস যা-ই হোক—কর্মীদের মনোবল, জামাআতের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা এবং কাঙ্ক্ষিত দক্ষতার সাথে বৈধ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের গতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সুতরাং কাজের বস্তুগত বিনিময় হিসেবে 'প্রতিদান' বা 'পারিশ্রমিক' সমস্ত আর্থিক ও উপকরণগত সুবিধাকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ

ইসলামে উদ্দীপনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ও সঠিক নীতি রয়েছে, যার মূল ভিত্তি হলো কাজের সাথে এর সম্পৃক্ততা ও উৎপাদনশীলতা। কারণ পবিত্র আল্লাহ বলেন: "প্রত্যেকের জন্য তাদের আমল অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে, যাতে তিনি তাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দান করতে পারেন এবং তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।" (আহকাফ: ১৯)।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

ত্রয়োদশ পাঠ

ইসলাম মৌলিকভাবে কর্মের সাথে প্রণোদনাকে সম্পৃক্ত করে। এটি দাবি করে যে, সকল প্রকার কাজের একটি বিশ্লেষণ থাকতে হবে, যার আলোকে কর্ম সম্পাদনকারীর বৈশিষ্ট্য, কর্মদক্ষতার হার, স্তর এবং মান নির্ধারিত হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রশাসনিক চিন্তা তার সাম্প্রতিক ধারাসমূহে এটিই গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে, ইসলাম লক্ষ্য রাখে যেন আর্থিক প্রণোদনাগুলো কর্মীর মানবিক চাহিদা পূরণ করে এবং তার পারিবারিক ব্যয় নিশ্চিত করে। কেননা মজুরি কেবল কাজের বিনিময়ে নয়, বরং এটি একজন ব্যক্তির এমন একটি আয় যার ওপর সে তার জীবনধারণের জন্য মৌলিকভাবে নির্ভরশীল। এই কারণেই দয়ালু রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবাহিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যার ওপর পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে তাকে) দুই ভাগ দিতেন এবং অবিবাহিত ব্যক্তিকে এক ভাগ দিতেন। তিনি (সা.) বলেন: "যে আমাদের কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে অথচ তার ঘর নেই, সে যেন একটি ঘর গ্রহণ করে; অথবা যার স্ত্রী নেই, সে যেন বিবাহ করে; অথবা যার বাহন নেই, সে যেন একটি বাহন গ্রহণ করে।" এটিই সেই লক্ষ্য যা মানবিক প্রশাসনিক চিন্তা তার আধুনিক ধারাসমূহে অর্জনের চেষ্টা করছে।

এটি ইসলামী প্রশাসনিক চিন্তার সেই সঠিক ধারাকে আবারও নিশ্চিত করে, যার প্রতি ইসলামের এই দিকনির্দেশনাগুলো তাকিদ প্রদান করে।

ইসলাম দাবি করে যে, এই প্রণোদনাগুলো পূর্বনির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে, পাশাপাশি তা অবিলম্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব; যাতে কর্মীর জন্য তার কাজ দক্ষতার সাথে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে নববী হিদায়াতের অন্যতম হলো দয়ালু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক নিয়োগ করবে, সে যেন তার মজুরি সুনির্দিষ্ট করে দেয়।" অর্থাৎ মজুরি নির্ধারণ করে নিতে হবে। এবং তাঁর (সা.) বাণী: "আল্লাহ তাআলা বলেন: কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব, আর আমি যার প্রতিপক্ষ হব তাকে লাঞ্ছিত করব: সেই ব্যক্তি যে আমার নামে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করেছে, সেই ব্যক্তি যে কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে এবং সেই ব্যক্তি যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করেছে কিন্তু তার প্রাপ্য মজুরি প্রদান করেনি।"

অনুরূপভাবে তাঁর (সা.) বাণী: "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পাওনা পরিশোধ করে দাও।" এই ব্যবস্থাটি ইসলামী সমাজের অন্যতম স্তম্ভ, যা পরামর্শ (শুরা) এবং সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক উপদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত...

শরয়ী রাজনীতি

ত্রয়োদশ পাঠ

সম্মানিত রাসূল বলেন: "দীন হলো কল্যাণকামিতা... আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।"

এভাবেই ইসলাম সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণকামিতার ধারণাকে বিকশিত করে, যা অধস্তনদের প্রতি নির্দেশনার আকারে এবং ঊর্ধ্বতনদের (নেতৃস্থানীয়দের) প্রতি উত্থাপিত প্রস্তাবনার আকারে একটি বলিষ্ঠ মানবিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

ইসলাম সামাজিক প্রণোদনা প্রদানের আহ্বান জানায়, যা কর্মীদের জন্য যাবতীয় সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন কর্মীকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম প্রদান করা, যাতে কোনো অতিরিক্ত পরিশ্রম তাকে মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত না করে। এই কারণেই আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই তোমার নিজের প্রতি তোমার হক রয়েছে, তোমার শরীরের প্রতি তোমার হক রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার হক রয়েছে এবং তোমার চোখের প্রতিও তোমার হক রয়েছে।" একইভাবে কর্মীদের জন্য বিনোদনমূলক সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেননা সম্মানিত রাসূল বলেন: "অন্তরসমূহকে সময়ে সময়ে প্রফুল্ল করো, কারণ অন্তর ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্ধ হয়ে যায়।"

এছাড়াও তাদের পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যার কোনো সম্পদ ছাড়াই মৃত্যু হয়েছে—অর্থাৎ সন্তানদের জন্য কোনো মাল রেখে যাননি—তার বিষয়ে বলেন: "যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য, আর যে ব্যক্তি নিঃস্ব অভাবী পরিবার বা দুর্বল বংশধর রেখে যায়, তারা যেন আমার কাছে আসে, কারণ আমিই তাদের অভিভাবক।" এর মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়, যা ইসলামের সামাজিক সংহতির মূলনীতিকে বাস্তবায়ন করে।

একইভাবে ইসলাম কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছে, যাতে তারা বেকারত্ব থেকে সুরক্ষিত থাকে। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে আবেদন জানালেন যেন তিনি তার বিষয়টি বিবেচনা করেন; কারণ সে ছিল কর্মহীন এবং উপার্জনের কোনো মাধ্যম বা জীবিকা নির্বাহের কোনো উপকরণ তার ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কুড়ালের মাথা আনালেন এবং একটি কাঠের হাতল আনালেন যা তিনি নিজ হাতে প্রস্তুত করলেন। অতঃপর তিনি সেই কাঠটি কুড়ালের মাথায় বসালেন এবং সেটি ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিলেন যাতে সে জীবিকা অর্জন করতে পারে এবং তাকে ফিরে আসতে বললেন...

৬৩৩

কয়েক দিন পর নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানানোর জন্য লোকটি ফিরে এল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে যা করেছিলেন তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সেই সাথে সে তার বর্তমান সচ্ছল অবস্থার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করল।

ইসলামি প্রশাসনিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশনাসমূহ থেকে: সঠিক নেতৃত্বের উপস্থিতি:

ইসলাম তার মৌলিক দিকনির্দেশনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্বের ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। আমরা নিচে সংক্ষেপে সেদিকে ইঙ্গিত করছি:

ইসলামি দিকনির্দেশনায় নেতৃত্ব:

১. নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা: ইসলাম সামাজিক আবশ্যকতা হিসেবে নেতৃত্বের অপরিহার্যতাকে সুনিশ্চিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "পৃথিবীর কোনো নির্জন প্রান্তরে (অর্থাৎ যেমন মরুভূমিতে) তিনজন অবস্থান করলে তাদের একজনকে নিজেদের ওপর নেতা নিযুক্ত করা ছাড়া তাদের জন্য অবস্থান করা বৈধ নয়।" যেমনটি তাঁর ﷺ থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে: "যখন তিনজন সফরে বের হবে, তারা যেন তাদের একজনকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নেয়।"

ইমাম শাওকানী এই দুটি হাদীসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "এতে এই প্রমাণ রয়েছে যে, তিন বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হলে তাদের একজনকে নেতা নিযুক্ত করা শরয়ি বিধান; কারণ এতে সেই মতবিরোধ থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায় যা ধ্বংস ও বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। নেতৃত্ব না থাকলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশে স্বেচ্ছাচারী হবে এবং নিজ খেয়ালখুশি মতো কাজ করবে, ফলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর নেতৃত্বের ফলে মতভেদ হ্রাস পায় এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মরুভূমিতে থাকা বা সফরে থাকা তিনজনের জন্য যদি এটি বিধিবদ্ধ হয়, তবে গ্রাম ও নগরগুলোতে বসবাসকারী অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য—যাদের ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করা এবং বিবাদ মীমাংসার প্রয়োজন রয়েছে— এটি আরও বেশি যুক্তিযুক্ত ও অধিকতর প্রয়োজনীয়।"

আর এতে সেই সব ব্যক্তিদের বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল রয়েছে যারা বলেন: "মুসলমানদের জন্য ইমাম, গভর্নর ও শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব। সুতরাং ইসলাম নেতৃত্বের বিষয়টিকে অপরিহার্য করেছে মুসলিম জামাতের অস্তিত্ব, সংহতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে, যাতে এটি সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলো পূরণের লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে।"

---

২. নেতৃত্বের দায়িত্বাবলী: ইসলামের নির্দেশনানুসারে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব; এটি বৈজ্ঞানিক প্রশাসনিক চিন্তাধারার চরমপন্থী প্রবণতা অনুযায়ী কোনো স্বৈরাচারী ও রূঢ় নেতৃত্ব নয়, আবার এটি মানবিক প্রশাসনিক চিন্তাধারার চরমপন্থী প্রবণতা অনুযায়ী কোনো শিথিল ও উদাসীন নেতৃত্বও নয়। বরং আমরা একে এ দুয়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় পাই।

ইসলামী নেতৃত্বের এই ভারসাম্যপূর্ণ ধারাটি মহান আল্লাহর বাণীতে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূলকে ইসলামী উম্মাহর নেতা হিসেবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন: "আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন আপনি কোনো সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।" [আলে ইমরান: ১৫৯]

সুষ্ঠু নেতৃত্বের এই সঠিক নির্দেশনার আলোকে আমরা ইসলামে নেতৃত্বের মৌলিক দায়িত্বগুলো তুলে ধরছি, যা চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা হিসেবে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোকে ফুটিয়ে তোলে।

১. পরামর্শ (মাশওয়ারা):

মহান আল্লাহ পূর্বোক্ত আয়াতে তাঁর সম্মানিত রাসূলকে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি নেতার জন্য তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তাঁর দলের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করাকে আবশ্যক করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য মতামত যাচাইয়ের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হবে। অতঃপর যখন তিনি কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তখন তিনি তা কার্যকর করবেন এবং সে অনুযায়ী তাঁর সিদ্ধান্ত জারি করবেন।

সুতরাং নেতা এখানে স্বৈরাচারী নেতৃত্বের মতো এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না, আবার শিথিল নেতৃত্বের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি পুরোপুরি দলের ওপরও ছেড়ে দেন না। বরং এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সামষ্টিকতার মাঝামাঝি একটি মধ্যমপন্থী নেতৃত্ব। এই দায়িত্বটি বিনিময়ে দলের সদস্যদের ওপর এই কর্তব্য আরোপ করে যে, যখন তাদের কাছে মতামত চাওয়া হবে, তখন তারা আমানতদারি ও একনিষ্ঠতার সাথে মতামত প্রদান করবে।

---

২. উত্তম আদর্শ:

একজন নেতাকে তাঁর দলের জন্য চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বোচ্চ আদর্শ হতে হবে, কারণ তিনিই তাঁদের সেই আদর্শ যাঁকে তাঁরা নিজেদের কর্মপদ্ধতিতে অনুকরণ করেন। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রতিটি কথা ও কাজে তাঁকে উত্তম আদর্শ হওয়া সমীচীন। আর সম্মানীত রাসূল ছিলেন মুসলিমদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, কারণ মহান আল্লাহ বলেন: “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” [আল-আহযাব: ২১]। এটি দলের সদস্যদের জন্য তাদের নেতার অনুসরণ এবং তাঁর কর্মে তাঁর অনুকরণ করাকে আবশ্যক করে তোলে।

৩. রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীলতা:

একজন নেতাকে অবশ্যই সেই দল বা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যেটির তিনি সভাপতিত্ব করছেন। তাঁকে দলের বিষয়াবলির রক্ষণাবেক্ষণকারীর ভূমিকায় থাকতে হবে, যিনি দলের কল্যাণ ও অগ্রগতির বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। ইসলামে এটিই তাঁর দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন এক নেতৃত্ব যা দলের এবং এর সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং আধিপত্য বিস্তারের পরিবর্তে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ। আর প্রশাসন মূলত অন্যের বিষয়াবলির তদারকি করা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলাম যখন নেতার ওপর রক্ষণাবেক্ষণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে, তখন তা মূলত ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্বের মানবিক দিকটিকে তার সর্বোত্তম রূপে উপস্থাপন করে। এটি এমন এক সচেতন নেতৃত্ব যা তার সামাজিক দায়িত্ব অনুভব করে। এটি সেই মূলনীতি যা রাসূলুল্লাহ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ হাদিসে ব্যক্ত করেছেন: “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার

দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

৪. দলকে সদুপদেশ প্রদান:

একইভাবে নেতার উচিত তাঁর দল ও দলের সদস্যদের সদুপদেশ প্রদান করা। আর তা হবে প্রয়োজনীয় উপকারী নির্দেশনা জারি করার মাধ্যমে এবং তাঁদের এমন বিষয়ের দিকে পথপ্রদর্শন ও পরিচালনার মাধ্যমে যাতে দল ও সদস্যদের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তাঁদের পরিচালনা করা...

যা তার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করে এবং এর সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যাতে তারা তাদের দায়িত্বসমূহ সর্বোত্তমভাবে পালন করতে পারে এবং জামাআতের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে; যার ফলে এর কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহর কোনো বান্দাকে যদি প্রজাসাধারণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং সে তাদেরকে সদুপদেশের মাধ্যমে রক্ষা না করে, তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"

নেতার উচিত জামাআতকে সদুপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করা, পাশাপাশি তাদের দেখাশোনার ক্ষেত্রেও একনিষ্ঠ হওয়া। কেননা বিশ্বস্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে কোনো শাসক মুসলিম প্রজাসাধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর সে তাদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

৫. উত্তম উপায়ে সম্মত করা:

তদুপরি, যেহেতু নেতৃত্ব—তার একটি আধুনিকতম সংজ্ঞা অনুযায়ী—অন্যদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করাকে বোঝায়, তাই নেতার উচিত তার জামাআতকে এমন সব আচরণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে সম্মত করা যা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। তাকে সেই প্রজ্ঞার পথ অবলম্বন করতে হবে যার দিকে সে তাদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় আলোচনা ও বিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে; আর এটাই হলো অন্যদের চিন্তাধারা ও আচরণে প্রভাব বিস্তারের সঠিক পদ্ধতি।

এটি আধুনিক যুগের আলেমগণ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের দক্ষতার দিকে আহ্বান জানান তার মধ্যে একটি। আর এ ক্ষেত্রে কুরআনের দিকনির্দেশনা আমাদের জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক; যেখানে মহান প্রতিপালক তাঁর সম্মানিত রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন: "আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন এমন পদ্ধতিতে যা সর্বোত্তম।" [আন-নাহল: ১২৫]

পৃষ্ঠা 38

""

পৃষ্ঠা 39

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

ইসলামে প্রশাসনিক পদ্ধতি

পাঠের উপাদানসমূহ

প্রথম উপাদান: পরিকল্পনায় ইসলামী পদ্ধতি ৬৪১
দ্বিতীয় উপাদান: নবী ﷺ এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সংগঠিতকরণ ও বাস্তব প্রয়োগে ইসলামী পদ্ধতি ৬৬২

৬৩৯

পৃষ্ঠা 40

""

পৃষ্ঠা 41

চতুর্দশ পাঠ

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

পরিকল্পনায় ইসলামী পদ্ধতি

দ্বিতীয়ত: ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতি:

ইসলামী প্রশাসনিক নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনার পর, এখন আমরা সেই ইসলামী প্রশাসনিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যা ইসলাম কর্মীদের জন্য রূপরেখা প্রদান করেছে। এই ইসলামী পদ্ধতিটি যেমন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান, তেমনি তা সংগঠন এবং তদারকির ক্ষেত্রেও বর্তমান। সে কারণে আমরা সর্বপ্রথম পরিকল্পনায় ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং বলব:

একটি প্রশাসনিক কাজ হিসেবে পরিকল্পনা বর্তমানে সকল প্রশাসনিক চিন্তাধারার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেননা সংগঠনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব প্রদানকে এক অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত করেছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গতিশীল সমাজে পরিকল্পনাই হলো প্রধান পথ যার মাধ্যমে একটি সংগঠন সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়; কারণ এটি ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সিদ্ধান্তসমূহের বিচক্ষণতার স্তরকে উন্নত করে।

পরিকল্পনা হলো এমন একটি মৌলিক কার্যক্রম যা কোনো ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে তার সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক যে কারো জন্য অপরিহার্য। আর পরিকল্পনা মূলত দুই প্রকার:

কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plans): যা মূলত সাধারণ লক্ষ্যসমূহ এবং তা অর্জনের উপায়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে।
ট্যাকটিক্যাল পরিকল্পনা (Tactical Plans): যা সাধারণ লক্ষ্যগুলোর সহায়ক উপ-লক্ষ্যগুলোতে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

পরিকল্পনার তত্ত্ব ও এর ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, তাই আমরা ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ এই তত্ত্বগুলোর ধারণা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার যে সর্বাধিক নির্ভুল ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বের করেছেন, তা উল্লেখ করার মাধ্যমেই ক্ষান্ত হচ্ছি, যা নিম্নরূপে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

চতুর্দশ পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিকল্পগুলোর সন্ধান করা। এই সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার ক্ষেত্রগুলো নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে নির্ধারিত হয়:

১. কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা।
২. এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য সহজতম উপায়সমূহ নির্ধারণ করা, যাকে কৌশল প্রণয়ন বলা হয়।
৩. বিদ্যমান মানব ও বস্তুগত সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন।
৪. লক্ষ্য নির্ধারণ বা সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখা।
৫. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো মোকাবিলা করা।

পরিকল্পনা সমাজের লালিত দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ রাষ্ট্রের সামাজিক দর্শনই সেই ক্ষেত্র ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে দেয় যেখানে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং যার পরিধির মধ্যে পরিকল্পনা কার্যকর হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে এর সামাজিক দর্শন ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, জাহিলিয়াত নির্মূল করা এবং মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ইসলাম ও ঈমানের আলোর দিকে নিয়ে আসা। তাই সাধারণভাবে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী দাওয়াতকে সংরক্ষণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা।

এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, ইসলামী পরিকল্পনা পদ্ধতি সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সমস্ত উপাদানকে ধারণ করেছিল; যদিও তাত্ত্বিকভাবে বর্তমানে প্রচলিত পরিভাষাগুলো যেমন—সমস্যা বা লক্ষ্য নির্ধারণ, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিকল্প সমাধান প্রণয়ন ইত্যাদি থেকে হয়তো ভিন্ন ছিল।

চতুর্দশ পাঠ

বস্তুত বাস্তবে এটি এই সকল উপাদানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রধান লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন যাতে তিনি তা বাস্তবায়ন করেন। অতঃপর তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ওপর অর্পিত ছিল কর্মপরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করা এবং সাহাবায়ে কেরামকে সেগুলো পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া, অতঃপর সে বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাঁদের পক্ষ থেকে পেশকৃত সকল পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য শ্রবণ করা।

ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় জুড়ে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার শুরু থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খল সংগঠনের জন্য সচেতন ও নিখুঁত পরিকল্পনা পর্যন্ত।

ইসলামী ইতিহাস মানবতার সামনে প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক—পরিকল্পনার সকল রূপেই ইসলামী পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছে।

আমরা এই গবেষণায় কেবল প্রশাসনিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব; অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে আলোচনার মতো পর্যাপ্ত অবকাশ এখানে নেই।

প্রশাসনিক পরিকল্পনা:

পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন করা। মূলত সকল পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই হলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো। অন্য কথায়, পরিকল্পনা হলো এমন একটি মাধ্যম যা প্রচলিত অবস্থা থেকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উন্নীত হওয়ার জন্য প্রশাসন অবলম্বন করে থাকে। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে লক্ষ্যবস্তুর সঠিক নির্বাচন এবং সেগুলোর সূক্ষ্ম ও যথাযথ বর্ণনার সক্ষমতার ওপর। লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রশাসনিক পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হিসেবে বিবেচিত। আমরা তিনটি নমুনার মাধ্যমে প্রশাসনিক পরিকল্পনার একটি ইসলামী প্রয়োগ দেখতে পাব:

প্রথম নমুনা: ইসলামী দাওয়াত প্রচারের পরিকল্পনা:

কুরআনুল কারীম দাওয়াতের লক্ষ্য হিসেবে তাওহীদকে নির্ধারণ করেছে এবং মানুষকে মূর্তিপূজা থেকে সরিয়ে রহমানের ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করেছে। লক্ষ্য নির্ধারণ করাই ছিল ইসলামী পরিকল্পনার প্রথম উপাদান।

চতুর্দশ পাঠ

শরয়ী রাজনীতি

যা ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর উপাদানসমূহ পূর্ণ করতে এবং এর রূপরেখা প্রণয়নে সহায়তা করেছে। ফলে তিনি বিদ্যমান সকল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করেছেন এবং ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখেছেন। এর ফলে তাঁর পরিকল্পনা সুদৃঢ় উদ্দেশ্য ও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাথে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গোপনে দাওয়াত শুরু করা:

এই পর্যায়টি প্রায় তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। তখন বিদ্যমান পরিস্থিতি দাওয়াতকে গোপন রাখা ব্যতীত অন্য কিছুর অনুকূলে ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ একা ছিলেন, ঐশী তত্ত্বাবধান ছাড়া তাঁর কোনো সাহায্যকারী ছিল না। তিনি এমন এক সমাজের মাঝে অবস্থান করছিলেন যা জুলুম ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং মূর্তিপূজার দাসত্বের ভারে নুব্জ হয়ে পড়েছিল।

সেই সমাজের মূলমন্ত্র ছিল ‘শক্তিশালীই টিকে থাকবে’, এবং তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে, এমনকি তা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী হলেও। দাওয়াতের প্রথম দিনগুলোতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে এই সমাজের একাকী ও প্রকাশ্যে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা ছিল যুক্তি ও বিবেকের পরিপন্থী। তাই ঐশী প্রজ্ঞা এটাই দাবি করছিল যে, এই সময়ে দাওয়াত গোপন থাকুক, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে এমন কাউকে পান যারা তাঁর পাশে দাঁড়াবে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে।

এই সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তার মোকাবিলার জন্য সঠিক সময় নির্বাচন করা ছিল ইসলামী দাওয়াতের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া এই তিন বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াতের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করার জন্য এবং তাঁর ওপর অর্পিত রিসালাতের মহানুভবতাকে হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমনকি তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম, হে চাচা! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় যাতে আমি এই কাজ ছেড়ে দিই, তবুও আমি তা ছাড়ব না; যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করেন অথবা আমি এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেই।"

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রচার:

আমরা বলতে পারি: তিন বছরের প্রস্তুতি ও ইসলামী দাওয়াতের পটভূমি তৈরির পর, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি আসল। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং বিমুখ হও..."

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

...মুশরিকদের... [আল-হিজর: ৯৪]। এরপর ক্রমাগত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতে থাকে যা সংকল্পকে সুদৃঢ় করে এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ বলেন: **"এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন। (২১৪) এবং যারা মুমিনদের মধ্যে আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি আপনি আপনার ডানা অবনমিত করুন (বিনয়ী হোন)। (২১৫) এরপর যদি তারা আপনার অবাধ্য হয়, তবে আপনি বলুন: নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ তা থেকে আমি মুক্ত।"** [আশ-শুআরা: ২১৪-২১৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পর্যায়টিতে বিদ্যমান সকল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সফল হন; যেমন তাঁর স্ত্রী খাদীজার সম্পদ, তাঁর চাচা আবু তালিবের সুরক্ষা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আবু বকর, আলী ও বিলালের মতো অন্যান্য সাহাবীদের প্রচেষ্টা।

একইভাবে তিনি আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে আসা আরব গোত্রগুলোর প্রতিনিধিদের নিকট থেকেও সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তিনি তাদের মাঝে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। আরবরা স্বভাবগতভাবেই মক্কাবাসীদের তুলনায় এই দাওয়াত গ্রহণের জন্য অধিক অনুকূল ছিল, কেননা মক্কাবাসীদের ওপর পার্থিব জীবনের মোহ ও জাঁকজমক আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ফলে তাদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেন এবং ইসলামের সাহায্যকারীতে (আনসার) পরিণত হন।

তদুপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যা তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে তাঁর দাওয়াত ও পরিকল্পনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একজন সাহসী নেতার ন্যায় এগুলোর মোকাবিলা করা এবং তাঁর রিসালাতের প্রতি আস্থাশীল মুমিনের ন্যায় অটল থাকা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে এবং সংকল্পকে সুদৃঢ় করতে মাঝে মাঝে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হত। মহান আল্লাহ বলেন: **"এবং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আর আপনার ধৈর্য কেবল আল্লাহর তৌফীকেই সম্ভব। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে আপনি মনঃকষ্টে ভুগবেন না। (১২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।"** [আন-নাহল: ১২৭-১২৮]

৩. যুক্তিগ্রাহ্য দাওয়াত এবং উত্তম উপদেশ:

মুহাম্মাদ ﷺ যদি মক্কার অন্যতম সম্ভ্রান্ত গোত্রের একজন মানুষ না হতেন এবং তিনি যদি এই কথা উপলব্ধি না করতেন যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরাক্রমশালী সত্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, তবে তিনি তাঁর পথে আসা এই সমস্ত কণ্টকাকীর্ণ বাধা সহ্য করতে রাজি হতেন না। তিনি সালাত আদায়রত অবস্থায় তাঁর মাথায় আবর্জনা নিক্ষেপ সহ্য করেছেন এবং তাঁর সাহাবীদের নির্যাতিত হতে দেখেছেন। তখন তিনি কেবল তাদের উদ্দেশ্যে এ কথাই বলতে পেরেছিলেন: **"সবর করো হে ইয়াসির পরিবার, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান জান্নাত।"**

চতুর্দশ পাঠ

ইতিহাসের বাঁকে আমরা আল্লাহর নবী নূহ (আ.)-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই যখন তিনি তাঁর রবকে আহ্বান করছিলেন: "হে আমার রব! যমীনে কাফিরদের কোনো গৃহবাসীকে অবশিষ্ট রেখ না। নিশ্চয় তুমি যদি তাদের ছেড়ে দাও, তবে তারা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং কেবল পাপাচারী ও কাফিরদেরই জন্ম দেবে।" [নূহ: ২৬, ২৭]।

আমরা সেই রাগান্বিত কণ্ঠস্বরের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কণ্ঠস্বরের তুলনা করি, যখন তিনি তায়েফ থেকে ফিরে এসে একটি বাগানের ছায়ায় বসলেন। তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু আর তাঁর দুই পা থেকে রক্ত ঝরছিল। তায়েফবাসীদের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি, বরং এর বিপরীতে তাদের সন্তানদের ও নির্বোধদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল যারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করছিল। এই কঠিন ও তিক্ত অনুভূতির মাঝে জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাকে বলছেন: আপনি যদি চান তবে আমি এই দুই পাহাড়কে তাদের ওপর চাপিয়ে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এই বলে উত্তর দিলেন: "হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না।"

এই পরিস্থিতিতে আমরা রাসূলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই এবং এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এটি নিশ্চিত হয় যে, সকল মানুষের জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর (সা.) রিসালাতের এই নির্বাচন মোটেও আকস্মিক ছিল না। বরং আসমান থেকে আসা সেই ঐশী সাহায্য তাঁকে শিখিয়েছিল কীভাবে সেই সমাজের সাথে বসবাস করতে হবে যেখানে তাঁকে পাঠানো হয়েছে এবং কীভাবে প্রতিটি স্তরে সঠিক সময়ে নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইসলামের দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রকৃতি ছিল কোমলতা, প্রজ্ঞা এবং প্রশস্ত হৃদয়ের দাবিদার, যাতে মানুষ তাঁর চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। একারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তুমি যদি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।" [আল-ইমরান: ১৫৯]।

আর একারণেই এই পর্যায়ের আবশ্যকতা ছিল যুক্তিপ্রদর্শন ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া এবং এই সীমার মধ্যেই অবস্থান করা: "তুমি তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো অতি উত্তম পন্থায়।" [আন-নাহল: ১২৫]।

সম্মানিত রাসূল এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তেরো বছর ধরে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এই পথে তিনি এমন সব কষ্ট সহ্য করেছিলেন যা অন্য কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা এটি অতিরঞ্জিত করে বলছি না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তিনি কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করেন, যেমন নূহ (আ.) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে করেছিলেন। কিন্তু রিসালাতের জন্য উপযুক্ত স্বভাবজাত কারণে তিনি তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

ইমাম বুখারী কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমি খাব্বাবকে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম

যখন তিনি কাবার ছায়ায় একটি চাদরে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলাম। আমি বললাম: আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? এতে তিনি রক্তিম মুখমণ্ডল নিয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন: ((তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁর শরীরের গোশত ও স্নায়ুর নিচ পর্যন্ত লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হতো, কিন্তু তা তাঁকে তাঁর দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। আর কারো মাথার সিঁথিতে করাত রেখে তাঁকে দুই খণ্ড করে ফেলা হতো, তবুও তা তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন, এমনকি একজন আরোহী সান'আ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে অথচ সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং তার মেষপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়ো করছ))।"

রিসালাতের মহত্ত্বের প্রতি এই বিশ্বাস এবং পরিশেষে আল্লাহই একে বিজয়ী করবেন—এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ এই বছরগুলো হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং সহিংসতা ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিষেধ করেন। যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে শত্রুতা মোকাবিলার অনুমতি আসে, যখন ইসলাম একটি নতুন পর্যায়ে পদার্পণ করে।

৪. আক্রমণের সূচনা না করে আক্রমণ প্রতিহত করা:

সফল পরিকল্পনা সেটিই যা সময়ের গুরুত্বকে বিবেচনায় রাখে এবং তার চাহিদা ও বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে এই মূলনীতি প্রয়োগ করেছিলেন।

তাই তিনি তেরো বছর ধরে তাঁর রবের নির্দেশের আনুগত্যে এবং মহান আল্লাহর বাণীর বাস্তবায়নে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে তাঁর রবের দিকে আহ্বান অব্যাহত রাখেন: "অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রাসূলগণ; আর তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না।" [সূরা আল-আহকাফ: ৩৫]।

চতুর্দশ পাঠ

সাহাবীগণ যখনই তাঁদের ওপর আপতিত নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে তাঁর নিকট আসতেন এবং যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করতেন, তিনি তাঁদের বলতেন: "ধৈর্য ধারণ করো, কারণ আমাকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" পরিশেষে সেই উপযুক্ত মুহূর্তটি এল, যখন মদীনায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং শত্রু মোকাবিলা করার মতো একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি হলো। বিশেষ করে মদীনার ইয়াহুদীরা যখন কুরাইশদের সাথে মিলে রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, তখন তাদের দমন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল।

অতঃপর মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে আসমান থেকে সুনির্দিষ্ট অনুমতি অবতীর্ণ হলো: **"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো; কারণ তারা নির্যাতিত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে: আমাদের রব আল্লাহ। আর আল্লাহ যদি মানুষের একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়—তা বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"** [আল-হাজ্জ: ৩৯-৪০]

তবে এই অনুমতিটি কোনোক্রমেই আগ্রাসনের নির্দেশ ছিল না, বরং তা ছিল কেবল শত্রুতা প্রতিহত করার জন্য। এর পরপরই বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করতে এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো: **"আর তোমরা আল্লাহর পথে**

তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" [আল-বাকারা: ১৯০]

ইসলামী বিজয়সমূহের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বজনীন দ্বীন যা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমের সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য এসেছে। মহান আল্লাহর বাণীর সত্যতা অনুযায়ী: **"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"** [সাবা: ২৮] এবং আল্লাহর বাণী: **"বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল।"** [আল-আ'রাফ: ১৫৮]

অতঃপর রিসালাতের মহান দায়িত্বপ্রাপ্ত রাসূলের ওপর এটি আবশ্যক হয়ে পড়ল যে, তিনি পৃথিবীর সকল জাতির কাছে এই বাণী পৌঁছে দেবেন। ফলে যারা সন্তুষ্টচিত্তে ও পছন্দ করে এতে প্রবেশ করল, তারা সুপথ প্রাপ্ত হলো। আর যারা হেদায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল, তাদের ক্ষেত্রে নীতি হলো—দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; তবে দ্বীনের অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না এবং এর অনুসারীদের ওপর কোনো আক্রমণ করা যাবে না।

সুতরাং যারা এই মূলনীতি মেনে চলে, ইসলাম তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। আর যারা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়, ইসলাম আমাদের তাদের মোকাবিলা করার এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়। এটিই ইসলামে যুদ্ধের দর্শন; মহৎ যুদ্ধ যাতে কোনো সীমালঙ্ঘন নেই, পবিত্র জিনিসের অবমাননা নেই এবং মানব মর্যাদার ওপর কোনো আঘাত নেই। এটি কেবল তাদের শাসনের উদ্দেশ্যে যারা দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যতক্ষণ না তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এবং তাদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়। এ সত্যের সাক্ষ্য আপনজনদের আগে পরজন এবং বন্ধুদের আগে শত্রুরা দিয়েছে।

দ্বিতীয় নমুনা: হিজরতের পরিকল্পনা:

একজন সূক্ষ্মদর্শী ও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষকের কাছে হিজরতের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সকল মূলনীতি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠার বিষয়টি উপলব্ধি করতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। যেন ইসলাম এর মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার একটি অনুকরণীয় আদর্শ পেশ করতে চেয়েছে।

হিজরত সম্পন্ন হয়েছিল অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, মুশরিকদের অবরোধ এবং এই ঘটনাটি রুখে দেওয়ার জন্য এক উন্মত্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে। কুরাইশরা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, তাদের ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের ওপর এই ঘটনার কতটা মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তাই তারা এটি প্রতিহত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যাকে ঐশী তত্ত্বাবধান সহায়তা করছিল, তিনি প্রতিটি পরিস্থিতি ও সম্ভাবনার মোকাবিলায় এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যা দেখে মানুষের বুদ্ধি এই নববী প্রজ্ঞার মহত্ত্বের সামনে স্তব্ধ হয়ে যায়।

হিজরতের মূল লক্ষ্য ছিল একটি ইসলামি সমাজ গঠনের উপযোগী ভূমির সন্ধান করা; যখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চিত হলেন যে, মক্কা ইসলামি দাওয়াতকে ধারণ করার মতো উপযুক্ত ভূমি নয়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথ্য সংগ্রহ এবং কর্মক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। আধুনিক প্রশাসনিক ধারণা অনুযায়ী পরবর্তী ধাপটি ছিল সহজলভ্য বিকল্পগুলোর মধ্যে তুলনা করে সেরাটি বেছে নেওয়া। সে সময় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে তিনটি বিকল্প ছিল:

চতুর্দশ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

প্রথম বিকল্প: তায়েফে হিজরত।
দ্বিতীয় বিকল্প: হাবশায় হিজরত।
তৃতীয় বিকল্প: মদিনায় হিজরত।

প্রথম বিকল্প: তায়েফে হিজরত:

সম্ভবত বিভিন্ন ইতিবাচক উপাদানের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিন্তায় বিদ্যমান বিকল্পগুলোর মধ্যে প্রথম বিকল্প হিসেবে তায়েফ শহরের কথা এসেছিল। আমরা তার মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করছি:

১. তায়েফের অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান। এটি হিজাজের শহরগুলোর মধ্যে একটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত, যা এর অধিবাসীদের জন্য উপযুক্ত জলবায়ুর পাশাপাশি প্রচুর কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করে।
২. তায়েফ ছিল মক্কাবাসীদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র এবং এমন এক স্থান যেখানে তারা তাদের ব্যবসার মুনাফা বিনিয়োগ করত।
৩. তায়েফের সাকিফ গোত্র ছিল কুরাইশ গোত্রের ঘোর শত্রু। তারা ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কুরাইশদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। তাই আশা করা হচ্ছিল যে, সাকিফ গোত্র তাদের পুরোনো শত্রুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করবে। যৌক্তিকভাবে তাদের সেই সব মুহাজিরদের স্বাগত জানানোর কথা ছিল যাদের কুরাইশরা তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে তারা কুরাইশদের পিঠে কাঁটা হয়ে বিঁধতে পারে। এই ইতিবাচক উপাদানগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের তায়েফে হিজরতের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

তবে সেখানে আরও কিছু নেতিবাচক উপাদান ছিল যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি দেখছিলেন যে সেগুলো তায়েফবাসীর ইসলামের দাওয়াত কবুল করার পথে অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাধাগুলোর মধ্যে ছিল:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, মক্কায় কুরাইশদের যেমন ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল, তায়েফে সাকিফ গোত্রও তেমনি ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী ছিল। তাদের 'লাত' নামক একটি মূর্তি ছিল এবং তারা একে ঘিরে কাবার মতো একটি হারাম (পবিত্র এলাকা) তৈরি করেছিল এবং সেখানে হজ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানাত। এমনকি তারা আবরাহাকে কাবা ধ্বংস করতে উৎসাহিত করেছিল, যাতে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে মানুষের হজের গন্তব্য কেবল তাদের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (ইসলামি রাজনীতি)
চতুর্দশ পাঠ

রাসুল উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলাম এই অন্ধ মূর্তিপূজার অবসান ঘটাবে, যা ছিল ছাকীফ গোত্রের আয়ের এক স্থায়ী উৎস; আর এই গোত্র তা সহজে মেনে নেবে না।

তিনি জানতেন যে, মক্কায় কুরাইশদের নেতৃত্বের তুলনায় তায়েফে ছাকীফদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোনো অংশে কম নয় এবং তায়েফে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে তাদের এই নেতৃত্বের অবসান ঘটবে। এটি তাদের ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য করবে। রাসুল এ আশঙ্কাও করছিলেন যে, ছাকীফ গোত্র তাকে তাদের চিরশত্রু কুরাইশ গোত্রের একজন হিসেবেই দেখবে, আসমানি বার্তার বাহক হিসেবে নয়।

এই সমস্ত কারণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে ছিল, যখন তিনি তাঁর সমাজ গঠনের উপযোগী পরিবেশে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যমান বিকল্পগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে তায়েফের কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু তিনি তাঁর মুক্তদাস যায়েদ ইবনে হারিসাহ-কে নিয়ে যে পর্যবেক্ষণমূলক সফর করেছিলেন—যা এখানে বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নেই—তা তাঁর কাছে নিশ্চিত করেছিল যে, পরিস্থিতি তায়েফে হিজরতের জন্য অনুকূল নয়। পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে ইসলামি সমাজ গঠনের জন্য তা উপযুক্ত ভূখণ্ডও ছিল না।

দ্বিতীয় বিকল্প: হাবশায় হিজরত

রাসুলুল্লাহ-এর কাছে থাকা তথ্য এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার ভিত্তিতে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, মুসলমানদের সাময়িক হিজরতের জন্য হাবশাই (বর্তমান ইথিওপিয়া) সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. হাবশার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এটি মুশরিকদের নাগালের বাইরে ছিল। তাছাড়া কুরাইশদের সাথে হাবশার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল যা থেকে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। এর ফলে তাদের মধ্যে এমন কিছু পারস্পরিক স্বার্থ বিদ্যমান ছিল যা তাদেরকে যুদ্ধে বা সংঘর্ষে জড়াতে বাধা দিত। এছাড়া তাদের মধ্যকার এই অভিন্ন স্বার্থ ভবিষ্যতে ইসলামের উপকারে আসতে পারত।

---

২. আবিসিনিয়ার (হাবশার) নেতৃত্বে ছিলেন নাজ্জাশি; তিনি ছিলেন এমন এক রাজা যিনি তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, যেমনটি তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। যা তাঁকে বৈশ্বিক পর্যায়ে গুরুত্ববহ করে তুলেছিল। ফলে ইসলামের দাওয়াতের পক্ষে তাঁকে পাওয়া ছিল একটি মূল্যবান অর্জন; কারণ তিনি ছিলেন আসমানি ধর্ম ও পবিত্র গ্রন্থের অনুসারী। এর পাশাপাশি, তাঁর সময়ে বিদ্যমান খ্রিস্টধর্ম তার মৌলিক বিশুদ্ধতায় ছিল না; বরং তাতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং সেখানে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করেছিল। এ কারণে নাজ্জাশির মতো একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ইসলামের প্রতি তখন আশ্বস্ত হয়েছিলেন যখন তাঁর সামনে একে একটি পরিচ্ছন্ন আসমানি দ্বীন হিসেবে পেশ করা হয়েছিল, যাতে কোনো বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

৩. অন্য দিক থেকে, ঘটনাবলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই বার্তাই দেয় যে, তৎকালীন আবিসিনিয়ায় প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ওপর কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না; কারণ তা ছিল লোভ-লালসা ও পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। আর যাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহিদের ওপর গড়ে তুলেছিলেন এবং যাদের অন্তরে ইমানের হাকিকত এমনভাবে প্রোথিত করেছিলেন যে তারা দ্বীনের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো ভয়ই ছিল না। তাঁদের মতো ব্যক্তিরা কোনো প্রলোভনের মুখেই ইসলামের পরিবর্তে খ্রিস্টধর্ম বা অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করার মতো ছিলেন না।

পরিস্থিতির এই সূক্ষ্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবিদের আবিসিনিয়ায় সাময়িক হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। সাহাবিদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে এই নববি ঘোষণা জারি হয়: "তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যেতে, কারণ সেখানে এমন এক রাজা আছেন যাঁর কাছে কারও প্রতি জুলুম করা হয় না এবং তা হলো একটি সত্যের ভূমি, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো পথ উন্মুক্ত করে দেন।" এই অনুমতির প্রতিটি শব্দ একটি যথার্থ সিদ্ধান্তের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করছিল, যেমন:

প্রথমত: তিনি তাঁদের সামনে স্পষ্ট করেছেন যে এটি একটি সাময়িক হিজরত। তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো পথ উন্মুক্ত করে দেন।" সুতরাং এটি স্থায়ী কোনো হিজরত ছিল না।

দ্বিতীয়ত: এই সিদ্ধান্তটি এমন কিছু তথ্য ধারণ করেছিল যা এটি বাস্তবায়নে সাহাবিদের আশ্বস্ত ও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর বাণীতে এসেছে: "সেখানে এমন এক রাজা আছেন যাঁর কাছে কারও প্রতি জুলুম করা হয় না এবং তা হলো একটি সত্যের ভূমি।"

হিজরতের পরিকল্পনাটির সফলতা নিশ্চিত করার জন্য এতে দুটি মূল ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন অভিজ্ঞ নেতার প্রজ্ঞার সাথে নির্ধারণ করেছিলেন:

প্রথম স্তম্ভ: প্রস্থান যেন অত্যন্ত সংগোপনে ও গোপনে সম্পন্ন হয়, যাতে কুরাইশরা এই পরিকল্পনা টের পেয়ে তা নস্যাৎ করতে না পারে। একেই আকস্মিকতার কৌশল বলা হয়।

দ্বিতীয় স্তম্ভ: হিজরত যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আকারে হয় এবং তা বৃহৎ পরিসরে না ঘটে, যাতে মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

পরিকল্পনার উভয় দিক বাস্তবায়নের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে মুসলিমগণ ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেন। পরিশেষে তারা দুটি বাণিজ্যিক জাহাজে আরোহণ করেন যা তাদের হাবশায় (আবিসিনিয়া) নিয়ে যায়। আল্লাহর সাহায্যে পরিকল্পনাটি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। হাবশায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথীগণ সদ্ব্যবহার, নিরাপত্তা ও আশ্রয় লাভ করেন। এই উত্তম জনপদে ইসলামের সাহায্যকারী তৈরি হয় এবং বাদশাহ নাজ্জাসি তার পূর্ণ প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে ইসলামের সাহায্যকারী হিসেবে যোগদান করেন।

অর্জিত এই বিস্ময়কর সাফল্য কিছু গবেষক ও লেখককে এ প্রশ্নে ভাবিয়ে তোলে যে: কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে নিজের পরিবার ও সাহাবীদের নিয়ে হাবশায় স্থায়ীভাবে চলে গেলেন না, যাতে সেখানেই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারত? আর কেনইবা তিনি —তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক— হাবশায় মুসলিমদের হিজরতকে সাময়িক হিসেবে নির্ধারণ করার ব্যাপারে অনড় ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিদ্যমান তথ্যাবলির বিশ্লেষণ এবং পরিস্থিতির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ তাঁর নিকট এটি নিশ্চিত করেছিল যে, হাবশা ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হওয়ার জন্য অনুকূল নয়। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে:

এই কারণগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো: হাবশা একটি বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল যা নতুন দাওয়াতের বিকাশের জন্য উপযুক্ত নয়। যেহেতু ইসলাম একটি বৈশ্বিক দাওয়াত, তাই এর জন্য এমন একটি অঞ্চল প্রয়োজন যা বহিঃবিশ্বের সাথে সংযুক্ত। অথচ হাবশা তার দীর্ঘ ইতিহাসে কখনোই দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার মতো এলাকা ছিল না।

চতুর্দশ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

দ্বিতীয় কারণ: আবিসিনিয়া (হাবশা) এই নতুন ধর্মকে খ্রিষ্টধর্মের পাশাপাশি বিকশিত হতে দিত না। আর রোমানরা—যারা তৎকালীন বিশ্বে খ্রিষ্টধর্মের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী ছিল—আবিসিনিয়াকে তা করার অনুমতি দিত না, এমনকি যদি তাদের রাজা ইসলাম গ্রহণ করতেন তবুও।

তৃতীয় কারণ: পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় ও তাদের বাকরীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে এই আবিসিনীয় পরিবেশে তা বোঝা, শিক্ষা করা এবং মুখস্থ করা একটি কঠিন বিষয় এবং দাওয়াতের পথে অন্তরায় হিসেবে গণ্য হতো।

এই সকল কারণ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ—তাঁর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—স্থায়ী হিজরতের ভূমি হিসেবে আবিসিনিয়ার কথা বিবেচনা থেকে বাদ দেন এবং অন্য কোনো বিকল্পের কথা চিন্তা করেন।

এ কথা বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হিজরতের মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে লব্ধ সর্বোত্তম জ্ঞানের আলোকে সাময়িক হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, আর সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এই মূলনীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় বিকল্প: মদিনায় হিজরত:

সুপরিচিত প্রশাসনিক নীতিমালার মধ্যে একটি হলো, জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ তত বাড়বে এবং এটি সিদ্ধান্ত সফল করতে সহায়তা করবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাকে অর্পিত কাজের পরিধি ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত থাকেন, তিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে অধিক সক্ষম হন। আর সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নিকট বিদ্যমান তথ্যের ব্যাপ্তি এবং এই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতার ওপর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি এমন অনেক ইতিবাচক দিক বিবেচনায় রেখেছিলেন যা ইসলামি দাওয়াতের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ছিল। সেই কারণগুলোর মধ্য থেকে আমরা উল্লেখ করছি:

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ
১. মদীনার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে এর ভূখণ্ডে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী ছিল। যদি আমরা মদীনার ইতিহাসের দিকে সামান্য ফিরে তাকাই, তবে দেখতে পাব যে, এর আদি অধিবাসীরা ছিল আরবদের ‘আমালিকা’ গোষ্ঠীভুক্ত, যারা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র সামের বংশধর ‘লাউয’-এর দিকে সম্পর্কিত। এরপর ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে আসা ইহুদী গোত্রগুলো ইয়াসরিবে (মদীনায়) আগমন করে। ইহুদীরা সর্বদা অর্থনৈতিক সম্পদ এবং তারা যে দেশে বসবাস করে সেখানকার অর্থব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকত।

মা’রিব বাঁধ ধসে পড়ার পর ইয়েমেন থেকে আগত দুটি গোত্র আউস ও খাজরাজ ইয়াসরিবে আসে। ইহুদীরা এই দুই গোত্রকে ইয়াসরিবে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিল যাতে তারা তাদের কৃষিকাজে শ্রমজীবী জনশক্তি হিসেবে কাজ করে; তারা যেন একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে দাসের মতো কাজ করত। তবে এই দুই গোত্র এই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয় এবং তারা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। ফলে ইয়েমেনের আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়।

যখন ইহুদীরা এই অবস্থা দেখল, তখন তারা তাদের প্রিয় খেলা তথা আরব গোত্রগুলোর মধ্যে গোত্রীয় বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার নীতি অনুসরণ করল। ফলে আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের একটি ধারাবাহিকতা শুরু হয়, যা প্রায় উভয় গোত্রকেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল।

এভাবেই মদীনা সমাজ শত্রুতা ও নানামুখী সংঘাতের এক সমাজে পরিণত হয়। ইহুদীরা আরবদের ঘৃণা করত এবং ইয়াসরিবে আধিপত্য লাভের চেষ্টা করত। তারা আরবদের মূর্তিপূজার জন্য দোষারোপ করত। অন্যদিকে আরব গোত্রগুলো ইহুদীদের প্রতি ঘৃণার পাশাপাশি মদীনার কর্তৃত্ব লাভের জন্য নিজেদের মধ্যেও সংঘাতে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধের এই ভয়াবহতার ফলে মদীনা সমাজ শান্তি ও স্থিতিশীলতার নিয়ামতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল এবং মানুষ এমন যে কোনো আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিল যা তাদের এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারে।

চতুর্দশ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (ইসলামী রাজনীতি)

এই সংঘাতগুলোর প্রভাবের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল:

ইয়াহুদীরা মদীনায় এই বলে প্রচার করত যে, এই সময়ে একজন নবী আবির্ভূত হবেন এবং তারা—অর্থাৎ ইয়াহুদীরা—তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁর মাধ্যমে আরবদেরকে আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় হত্যা করবে। অতঃপর আরবরা যখন মুহাম্মাদী রিসালাতের সংবাদ জানতে পারল, তখন তারা বুঝতে পারল যে ইনিই সেই নবী যাঁর ব্যাপারে ইয়াহুদীরা তাদের হুমকি দিত।

কুরাইশদের সমর্থন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই মক্কায় প্রতিনিধি দল পাঠাত যাতে একে অপরের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করা যায়। এটি ছিল তাকদীরের লিখন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম পরিকল্পনার অংশ যে, তিনি এই প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফলে তাদের অনেক সদস্য জাহিলী যুগের চুক্তির পরিবর্তে ঈমান ও হকের আলো নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

২. রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি যেমন মদীনার সমাজকে ইসলামী দাওয়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল, তেমনি মদীনা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এমন একটি অঞ্চল ছিল যেখানে আরবরা বাস করত এবং তাদের ভাষা ছিল আরবী। ফলে ইসলামী দাওয়াত সেখানে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং এমন আরবী ভাষাভাষী লোক খুঁজে পায় যারা কুরআন পাঠ ও হিফজ করতে পারত।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিপুণ পরিকল্পনার অংশ ছিল মদীনার প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে মুসআব ইবনে উমাইরকে পাঠানো; যাতে তিনি মানুষকে ইসলামের মূলনীতি শিক্ষা দিতে পারেন। আল্লাহর তাওফীকে মুসআব সফল হয়েছিলেন এবং মদীনার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা তাঁকে এই শহরের পরিবেশকে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সেই ইতিবাচক দিকগুলো উপলব্ধি করেছিলেন যা তাঁকে মুসলিমদের স্থায়ী হিজরতের স্থান হিসেবে মদীনাকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল, তেমনি তিনি সেই নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন না যা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারত বা পথের অন্তরায় হতে পারত। সেগুলোর মধ্যে ছিল:

১. মদীনার ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত জাতি মনে করত। যদিও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের কিতাবের মাধ্যমে তেমনভাবেই চিনত যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদের চিনত, তবুও হিংসা—

(তাদের অন্তরসমূহকে) অন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে তারা আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত যে, কেন রাসূল তাদের মধ্য থেকে হলেন; কেননা তারা চেয়েছিল তিনি বনী ইসরাঈল থেকে হোন। রাসূল তাঁর বাস্তব জ্ঞান থেকে নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে, এর প্রতিরোধ করবে এবং সব উপায়ে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।

২. আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী যুদ্ধবিরতির সময়কালে, যা হিজরতের সমসাময়িক ছিল, উভয় গোত্র একটি যৌথ সরকার গঠনের বিষয়ে একমত হয়েছিল, যা ইয়াসরিব শাসন করবে এবং এর প্রধান হবেন খাযরাজ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।

মদিনায় একটি ইসলামী সমাজ গঠনের অর্থ ছিল এ ধরণের সরকারের অবসান ঘটানো, যা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারীদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ উস্কে দিয়েছিল। একজন অভিজ্ঞ নেতা এবং সুদক্ষ পরিকল্পনাকারীর যৌক্তিকতায় রাসূল ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবকসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন। তিনি নিশ্চিত হন যে, ইতিবাচক দিকগুলোই বেশি এবং মদিনায় হিজরতের জন্য অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন সুযোগ বেশি অনুকূল। ফলে তিনি পরিবেশ প্রস্তুত করতে এবং লক্ষ্য অর্জনে উপযোগী পরিস্থিতি তৈরি করতে শুরু করেন। এভাবে হিজরতের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুসংহত এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রণীত হয়।

প্রশাসনিক পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, যেকোনো পরিকল্পনার সফলতার অন্যতম প্রভাবক হলো দায়িত্ব ও কার্যাবলী বণ্টন করা এবং তা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা, যাতে প্রত্যেকে তার ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে কর্মপরিধির মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি না হয় এবং একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না ঘটে। একই সাথে এই কর্মপরিধিগুলোর মধ্যে এমন এক সমন্বয় সাধিত হয় যা পরিশেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। হিজরত পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. প্রস্তুতি ও সরঞ্জামাদির দায়িত্ব।
২. প্রস্তুতি ও রসদ সরবরাহের দায়িত্ব।
৩. পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা তথ্যের দায়িত্ব।

---

৪. পথপ্রদর্শন এবং পদচিহ্ন অনুসরণ করার দায়িত্ব।
৫. প্রতারণা করা এবং শত্রুদের বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব।

যদি এই পরিকল্পনাটি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির হতো, তবে এই দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বিশাল জনশক্তির প্রয়োজন হতো; আর যদি কর্ম সম্পাদনকারীগণ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ ব্যতীত অন্য কেউ হতেন, তবে বিষয়টি একটি বিশাল বাহিনীর মুখাপেক্ষী হতো। কিন্তু রাসুল ও তাঁর সাহাবীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল স্বতন্ত্র।

আবু বকর আস-সিদ্দিক একাকী হিজরতের প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের এবং আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য দুটি উট প্রস্তুত করেন এবং হিজরতকালে তাঁর সকল সম্পদ সাথে নিয়েছিলেন; এমতাবস্থায় তিনি তাঁর পরিবারকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন যেমনটি তিনি বলেছিলেন।

তাঁর কন্যা আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রসদ ও অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গুহায় রাসুল ও তাঁর পিতার নিকট খাবার পৌঁছে দিতেন। এ পথে তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন; একবার তিনি তাঁর পোশাকের এক অংশ ছিঁড়ে দুটি কোমরবন্ধনী (নিতাক) তৈরি করেছিলেন যাতে খাবার বহন করা যায়। এ কারণে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে 'জাতুন নিতাকাইন' (দুই কোমরবন্ধনী বিশিষ্ট) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তিনি আবু জাহলের পক্ষ থেকে কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যখন সে তাঁকে দুই সম্মানিত হিজরতকারীর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। যখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি জানেন না, তখন সে তাঁর মুখে অত্যন্ত জোরে চড় মারে যার ফলে তিনি মাটিতে পড়ে যান।

আমের ইবনে ফুহাইরা রসদ সরবরাহের কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। তিনি রাতে গুহায় যেতেন এবং রাসুল ও তাঁর সঙ্গীর প্রয়োজন অনুযায়ী দুধ সরবরাহ করতেন।

আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ তথ্য অনুসন্ধানের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি গুহায় রাসুল ও তাঁর পিতার সাথে রাত যাপন করতেন এবং ভোরবেলায় কুরাইশদের মাঝে এমনভাবে উপস্থিত হতেন যেন তিনি তাদের সাথেই রাত কাটিয়েছেন। অতঃপর কুরাইশদের খবরাখবর নিয়ে পুনরায় গুহায় ফিরে আসতেন।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

চতুর্দশ পাঠ

মরুভূমি বিশেষজ্ঞ এবং হিজরতের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিত মক্কা থেকে মদীনার পথে মুহাজিরদের পথপ্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

আর বিভ্রান্তি তৈরি ও ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষেত্রে আমির ইবনে ফুহাইরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীর চলার পথে নিজের মেষপাল নিয়ে যাতায়াত করতেন, যাতে তাঁদের পায়ের চিহ্ন মুছে যায়। আবদুল্লাহ অথবা আসমা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে ফেরার পর আমির ইবনে ফুহাইরা প্রতিবারই তাঁদের পদচিহ্ন মুছে দিতেন।

একইভাবে আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) হিজরতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিছানায় ঘুমানোর মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেন, যাতে কুরাইশরা মনে করে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ঘর ত্যাগ করেননি।

হিজরতের এই সফরে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হিজরতের পরিকল্পনার ওপর আরোপিত চরম গোপনীয়তার কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল, যার ফলে কুরাইশরা এর কোনো সূত্র খুঁজে পায়নি।

আমরা যদি এই দায়িত্ববন্টনের দিকে লক্ষ করি, তবে দেখব যে প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। হিজরতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর উপযুক্ত স্থানে রাখা হয়েছিল, প্রতিটি ছিদ্রপথ বন্ধ করা হয়েছিল এবং সফরের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ

করা হয়েছিল।

অতিরিক্ত কোনো লোক ছাড়াই কেবল প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়ে এই মিশন পরিচালিত হয়েছিল। সমস্ত কাজ অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল, যা কুরাইশদের রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীর অবস্থান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জানতে দেয়নি। কাজগুলো এমন বিস্ময়কর সমন্বয়ের সাথে সম্পাদিত হয়েছিল যে, যে তিনজন ব্যক্তি গুহায় তাঁদের কাছে যেতেন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেতেন এবং তাঁদের মধ্যে এক বারের জন্যও একে অপরের সাথে দেখা হয়নি। আমরা কি বলিনি যে, হিজরতের ঘটনাবলী হলো সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মূলনীতির এক জীবন্ত অভিধান?

তৃতীয় নমুনা: হিজরত পরবর্তী মদীনার জীবন পরিকল্পনা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় পৌঁছানোর পর থেকেই এমন একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা শুরু করেন যার মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ, যার কর্মপদ্ধতি হলো কুরআন এবং যার লক্ষ্য হলো ইসলামের পতাকা সমুন্নত করা।

চতুর্দশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)

একজন সুদক্ষ পরিকল্পনাকারীর মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পারিপার্শ্বিকতা পর্যবেক্ষণ করেন; যাতে বাস্তবতা অনুধাবন এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যায়। তিনি দেখতে পান যে, মদীনার সমাজটি বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত—আরব ও ইহুদি, মুসলিম ও অমুসলিম, আউস ও খাজরাজ; এমন কিছু বিচ্ছিন্ন দল যাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো যোগসূত্র ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এমন একটি নতুন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করা, যা সবার ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও জাতীয় মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করবে। মানবিক সম্পর্কের ভূমিকা এবং সমাজের ব্যক্তিবর্গের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির আলোকে তিনি তিনটি লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হন:

- মুসলিম ও অমুসলিমদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; যাতে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত ও দুর্বল ব্যক্তিরা ইসলামের প্রতি ধাবিত হয়।
- সমাজের সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মূলনীতি বলবৎ করা; যাতে ধর্মে কোনো ফিতনা সৃষ্টি না হয় এবং বিশ্বাস বা মতামতের কারণে কারো প্রতি জুলুম না করা হয়।
- গোত্রগুলোর মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সংঘাত নির্মূল করা। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিকল্পনা তিনটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছিল:

প্রথম দিক: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন; এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোত্রীয় রেষারেষি, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা দূর করতে চেয়েছিলেন।

সহযোগিতা, সামষ্টিকতা ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসার চেতনা জাগ্রত করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক প্রাজ্ঞ নীতি প্রয়োগ করেন। তা হলো মুহাজির ও আনসারদের আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর ভাই বানিয়ে দেওয়া, যাতে একজনের ওপর অপরজনের ঠিক তেমন অধিকার থাকে যেমনটি একজন সহোদর ভাইয়ের ওপর থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জোড়ায় জোড়ায় ভাই হয়ে যাও।" অতঃপর তিনি একজন আনসারী ও একজন মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করতে থাকেন। তিনি তাঁর চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকে যায়িদ বিন হারিসার ভাই হিসেবে এবং আবূ বকরকে খারিজাহ বিন যুহাইরের ভাই হিসেবে নির্বাচন করেন... এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত।

পৃষ্ঠা 61

শরীয়াহ রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

এই ক্ষেত্রে আনসার ও মুহাজিরগণ ইসলামের ভালোবাসার মহত্ত্বের চমৎকার সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইমাম বুখারী আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আবদুর রহমান ইবনে আউফ মদীনায় আগমন করলে নবী (সা.) তাঁর ও সাদ ইবনে রাবী আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। তখন সাদ তাঁর পরিবার ও সম্পদের অর্ধেক তাঁকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তখন আবদুর রহমান বলেন: আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দিন, বরং আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দাও।"

পবিত্র কুরআন এই ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহর প্রতি এই ভালোবাসার প্রশংসা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, তিনি তোমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট করেন যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও।" [সূরা আল ইমরান: ১০৩]

দ্বিতীয় দিক: সমগ্র মদীনা সমাজে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা:

নবী (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী পুরনো শত্রুতার শিকড় নির্মূল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

যেহেতু রাসূল (সা.) ইহুদিদের স্বভাব ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জানতেন, তাই তিনি তাদের থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি তিনি সকলের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও প্রয়াস চালান। এটি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি মদীনার অধিবাসী মুহাজির, আনসার ও ইহুদিদের একত্রিত করেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করেন। পরিশেষে তারা মদীনার সকল অধিবাসীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠনে সম্মত হন। রাসূল (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি লিখিত দলিল সম্পাদন করেন, যেখানে তিনি ইহুদিদের সাথে অঙ্গীকার ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি তাদের ধর্ম ও সম্পদের স্বীকৃতি দেন এবং তাদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করেন ও তাদের জন্য কিছু অধিকার নির্ধারণ করেন।

রাসূল (সা.)-এর লক্ষ্য ছিল মদীনা যেন একটি সুসংহত একক সত্তায় পরিণত হয় যা নিজেকে রক্ষা করবে এবং নিজেদের স্বার্থ দেখাশোনা করবে। এই দলিলের মূলনীতিগুলো ইতিহাসের পাতায় পরিচিত মানবাধিকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

চতুর্দশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (ইসলামী রাজনীতি)

তৃতীয় দিক: মসজিদ নির্মাণ এবং একে শাসনের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা:

রাসূলুল্লাহ মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম যে কাজগুলো সম্পাদন করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সম্মানিত মসজিদে নববী নির্মাণ। এটিই ছিল সেই স্থান যেখানে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগী পালন করতেন, কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং দ্বীনি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন। পাশাপাশি এটি ছিল শাসনের কেন্দ্র, পরামর্শ সভা (শুরা), জ্ঞান অর্জনের বিদ্যাপীঠ এবং বিচারালয়।

ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতিমালা এবং নবী ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ

ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতিমালা:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম তার ব্যাপক অর্থে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাসের ধর্ম। মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়:
“আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, আমি তা থেকে দিন অপসারিত করি, ফলে তখনই তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। এটা মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের সুনির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ। আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মঞ্জিল বা কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছি, অবশেষে তা পুরাতন শুকনো খেজুর শাখার ন্যায় হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে পাকড়াও করা এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে ছাড়িয়ে যাওয়া। আর তারা প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।” [সূরা ইয়াসিন: ৩৭-৪০]

এই মহান আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি এক সূক্ষ্ম ও চমৎকার ব্যবস্থাপনা এবং দৃশ্যমান সুশৃঙ্খল বিন্যাস দেখতে পান, যেখানে বিভিন্ন বস্তু একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরস্পর একীভূত ও সহযোগী হয়ে কাজ করে; একটি মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, আর তা হলো মহাবিশ্বে প্রাণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

অনুরূপভাবে মানুষের শরীর, আল্লাহ যেভাবে তা সৃষ্টি করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তার গঠন ও সামঞ্জস্যকে নিখুঁত করেছেন, তা একটি বাস্তব উদাহরণ যা সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার প্রমাণ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন:
“আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। তারপর আমি তাকে শুক্রকীট হিসেবে এক সুরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রকীটকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি; এরপর আমি তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছি...” [সূরা আল-মুমিনুন: ১২-১৪]

...অতঃপর আল্লাহ বরকতময়, যিনি শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা। (১৪) এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৫) [আল-মুমিনূন: ১২-১৫] ।

প্রশাসনিক অর্থে ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বলা যেতে পারে যে: ইসলাম সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রতি যে ব্যক্তি গভীরভাবে লক্ষ্য করবে: "তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? পার্থিব জীবনে আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি এবং তাদের একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তারা যা জমা করে, তোমার প্রতিপালকের করুণা তা অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম।" [আয-যুখরুফ: ৩২] ।

আমরা বলব: যে ব্যক্তি এই আয়াতের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করবে, সে এই সত্যটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলো স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে এবং বিশেষজ্ঞতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য; যেখানে প্রত্যেকেই তার শক্তি, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করবে।

অনুরূপভাবে ইসলাম মানুষকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছে; যেন উচ্চস্তরের ব্যক্তি নিম্নস্তরের ব্যক্তির দ্বারা এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারে যা সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের অশেষ কল্যাণে আসে। ইসলাম এক মানুষের ওপর অন্য মানুষের এই নির্ভরতাকে বংশ, বর্ণ অথবা আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেনি। বরং এই নির্ভরতাকে মানুষের প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও সক্ষমতার সাথে যুক্ত করেছে। ফলে তাদের শক্তি ও দুর্বলতা, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, কর্মতৎপরতা ও স্থবিরতা এবং এ জাতীয় অন্যান্য পার্থক্যের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন।

এখানে এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম যে স্তরগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যার মাধ্যমে কিছু মানুষকে অন্যদের ওপর মর্যাদা দান করেছে—যাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'সাংগঠনিক কাঠামো' বলা যেতে পারে—তা প্রতিটি সমাজের পরিস্থিতি ও সম্পাদিত কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী নমনীয়তা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

সুতরাং এমন কোনো বাধা নেই যে, নিম্নস্তরে থাকা কেউ তার ঈমানের মাধ্যমে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমলকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মী সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদন করবে এবং সেই দক্ষতা অর্জন করবে যা তাকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর যোগ্য করে তোলে, ততক্ষণ ইসলাম তার জন্য উন্নতি ও অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন:

চতুর্দশ পাঠ

“আমি তোমাদের মধ্যে কোনো আমলকারীর আমলই বৃথা যেতে দেই না, সে পুরুষ হোক বা নারী।” [সূরা আলে ইমরান: ১৯৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নিশ্চয়ই আমি তার প্রতিদান নষ্ট করি না, যে উত্তম আমল করে।” [সূরা আল-কাহফ: ৩০]

ইসলামী সাংগঠনিক কাঠামোতে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ মুমিন হয়ে সৎকর্ম করবে, আমি তাকে নিশ্চয়ই এক পবিত্র জীবন দান করব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান প্রদান করব।” [সূরা আন-নাহল: ৯৭] এটি আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যকেই সুদৃঢ় করে যে, উন্নতির সোপান ও মর্যাদার স্তরসমূহ কেবল ঈমান ও আমলের ওপরই নির্ভরশীল। মহান আল্লাহর বাণী সত্য, তিনি বলেন: “প্রত্যেকের জন্যই তাদের আমল অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আপনার রব গাফেল নন।” [সূরা

আল-আনআম: ১৩২]

পবিত্র কুরআন সামাজিক সুশৃঙ্খলার সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি ﷺ বলেন: "মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতার উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়; যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন শরীরের অন্য সকল অঙ্গও অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তাতে সাড়া দেয়।" তিনি ﷺ আরও বলেন: "এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য একটি ভবনের সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলামী সমাজকে একটি সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ সমাজ হিসেবে দেখেন। তাই বিদ্যমান সংস্থাগুলো মূলত সামাজিক সংগঠন, যারা সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে সহযোগিতা করে। শরীরের কোনো এক অংশের ত্রুটি যেমন অন্য অংশগুলোকে প্রভাবিত করে এবং কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রের অবহেলা যেমন অন্য অনেক ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে—সেই ধারণা থেকেই একজন বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব কেবল একটি নির্দিষ্ট কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের চিন্তা-চেতনা, পরামর্শ বা অভিজ্ঞতা অন্য ক্ষেত্রগুলোতেও পৌঁছে দেওয়া তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটি মূলত 'দ্বীন হলো নসিহত (একনিষ্ঠ কল্যাণকামনা)'—আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সাধারণ জনগণের জন্য—এই মহৎ ধারণা থেকেই উৎসারিত।

৬৬৪

আশ-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
চতুর্দশ পাঠ

ইসলামী সংহতির ধারণা অনুযায়ী, প্রশাসন যখন বিশেষজ্ঞদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, তখন অর্পিত কাজের দায়িত্বভার প্রশাসনের পক্ষ থেকে শেষ হয়ে যায় না। বরং প্রশাসন সেই দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে অংশীদার থাকে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনের তদারকি করতে দায়বদ্ধ থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি কর্মসমূহকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করেন এবং এই বিভাগগুলোর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে নওফাল মদীনার বিচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি ছিলেন এবং মুসআব ইবনে উমায়ের ছিলেন মদীনার প্রথম ক্বারী। তেমনিভাবে যায়েদ ইবনে সাবিত অনুবাদ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; কারণ তিনি ফারসি, রুশ, কিবতী, হাবশি এবং হিব্রু ভাষা জানতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ধর্মীয় প্রচারমাধ্যমের বিষয়টিও ভুলে যাননি। তাই তিনি হাসসান ইবনে সাবিত ও কাব ইবনে মালিককে ইসলামী দাওয়াতের কবি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানের জন্য এমন কিছু সহযোগী ছিল যারা তাকে সাহায্য করত, তার আদেশ মেনে চলত এবং তার নির্দেশনা বাস্তবায়ন করত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন যুদ্ধের জন্য বাহিনী পাঠাতেন, তখন সেই বাহিনীর প্রধান হিসেবে একজন আমির এবং আমিরের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদানকারী পরামর্শমূলক পদের কথা বিস্মৃত হননি। তাই তিনি চৌদ্দজন নকীব বা নেতার সমন্বয়ে একটি পরামর্শ সভা (মজলিসে শূরা) গঠন করেন। প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অধিকারীদের মধ্য থেকে তাদের নির্বাচন করা হয়েছিল। এই মজলিস বা সভায় সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হতে পারে। এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন ছিল: "অতএব তোমাদের যদি জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।" [আল-আম্বিয়া: ৭]

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি আরও বৃদ্ধি পায় এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। তবে তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়েছিল।

চতুর্দশ পাঠ

যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা; আবু বকর বিচারের দায়িত্ব উমরের নিকট অর্পণ করেছিলেন, যেমন তিনি আবু উবাইদাহর নিকট বায়তুল মালের আমানতদারিতা অর্পণ করেছিলেন এবং আলী বিন আবি তালিবের নিকট যুদ্ধবন্দীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাবও অনুরূপ করেছিলেন, তিনি কোষাধ্যক্ষের কার্যাবলী নিজের জন্য রেখেছিলেন এবং কার্যাবলী যোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। তিনি জনগণের মাঝে তা ঘোষণা করে বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি ফিকহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সে যেন মুআয বিন জাবালের নিকট আসে; যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সে যেন যায়েদ বিন সাবিতের নিকট আসে; আর যে ব্যক্তি সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সে যেন আমার নিকট আসে। কারণ আল্লাহ আমাকে এর কোষাধ্যক্ষ ও বণ্টনকারী বানিয়েছেন।"

তদারকির ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি:

সাধারণ অর্থে তদারকি হলো যা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা; যাতে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তা নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে।

প্রশাসনিক ধারণা অনুযায়ী তদারকি হলো: এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রশাসন পর্যবেক্ষণ করে যে, যা ঘটেছে তা কি ঘটার কথা ছিল? আর যদি তা না হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ করা অপরিহার্য।

তদারকির ইসলামী ধারণা হলো এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর ওপর ন্যস্ত থাকে এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট একটি পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ প্রসঙ্গে নবী (সা.) বলেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"

বলা যেতে পারে যে, ইসলামে তদারকির তিনটি উৎস রয়েছে: খোদায়ী তদারকি, আত্ম-তদারকি এবং সাধারণ তদারকি।

শরয়ী রাজনীতি

চতুর্দশ পাঠ

১. খোদায়ী পর্যবেক্ষণ:

পর্যবেক্ষণের প্রধান উৎস হলো খোদায়ী পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তি হলো একজন মুসলিমের এই অনুভূতি যে, তার কর্মকাণ্ড—যদিও তা সরকারি সংস্থা বা সমাজের কাছে গোপন থাকে—তা মহান আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। বরং কিয়ামতের দিন তা সওয়াব বা শাস্তির কারণ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকবে না।" [আল-হাক্কাহ: ১৮] এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে জমিন ও আসমানের কোনো কিছুই গোপন থাকে না।" [আল-ইমরান: ৫] এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "সেদিন তারা প্রকাশ হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না।" [গাফির: ১৬] এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা যদি তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন।" [আল-বাক্বারাহ: ২৮৪]। সকল মুসলিম এই সত্যের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং সর্বদা তা ঘোষণা করে: "হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি।" [ইবরাহীম: ৩৮]

২. আত্ম-পর্যবেক্ষণ:

ইসলামী জীবনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবে এটি বিবেক থেকে উৎসারিত আত্ম-পর্যবেক্ষণকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং একে পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে সফল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করে। বিবেক হলো মানুষের মাঝে সুপ্ত আল্লাহর জীবন্ত আহ্বান, কেউ কেউ একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবজাত প্রকৃতির মাঝে সুপ্ত প্রতিটি কল্যাণকর প্রবৃত্তি।

ইসলাম মুসলিমের মধ্যে এমন এক জীবন্ত বিবেক তৈরি করে দিয়েছে যা কখনো মরে না; কারণ এটি মুসলিমকে মহান আল্লাহর সাথে এক অন্তহীন স্থায়ী বন্ধনে এবং দূরত্বের ব্যবধানহীন এক নৈকট্যের সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিদ্যমান।" [আল-বাক্বারাহ: ১১৫] এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথেই থাকেন।" [আল-মুজাদালাহ: ৭] এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত করো এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে মনে রেখো তিনি তোমাকে দেখছেন।" এবং তিনি (সা.) আরও বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও শরীরের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।"

কর্মক্ষেত্রে মানুষের বিবেক সর্বদা তাকে মহান আল্লাহর এই বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: “আর বলুন, তোমরা কাজ করো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের পরিজ্ঞাতার কাছে ফিরে যাবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে।” [আত-তাওবাহ: ১০৫]

আত্ম-তদারকি ব্যক্তিকে এমন করে তোলে যে সে নিজেই নিজের মূল্যায়ন করে, নিজের ভুলগুলো সংশোধন করে এবং তার ওপর অর্পিত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তরে এই তদারকির চেতনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় বলেন: “তোমাদের হিসাব নেয়ার আগে তোমরা নিজেদের হিসাব নাও।” এবং বলেন: “তোমাদের আমল ওজন করার আগে তোমাদের আমলগুলো ওজন করে নাও।” তিনি আরও বলেন: “ইহসান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।”

৩. সাধারণ তদারকি:

ইসলাম তার সমসাময়িক দুটি ধারণার মাধ্যমে সাধারণ তদারকিকে সংজ্ঞায়িত করেছে: ইতিবাচক তদারকি যা ভুল সংঘটিত হওয়ার আগে তা এড়ানোর চেষ্টা করে এবং নেতিবাচক তদারকি যা সংঘটিত ভুলের জন্য শাস্তি প্রদান করে এবং এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

ইসলামে সাধারণ তদারকির বিষয়টি এই ধারণা থেকে উদ্ভূত যে, প্রবৃত্তি মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে; ফলস্বরূপ এটি এমন একজনের মুখাপেক্ষী যে তার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবে এবং তাকে নিবৃত্ত করবে যদি না অভ্যন্তরীণ বিবেক তাকে বাধা দেয়। তবে ইতিবাচক তদারকির ধারণা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম অগ্রগামী ছিল। সুপরিচিত ইসলামি প্রবাদ অনুসারে: ‘প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম’। এটিই ছিল সমকালীন বিভিন্ন চিন্তাধারার ইতিবাচক তদারকি বিষয়ক মূল ভিত্তি।

ইতিবাচক তদারকি হলো একটি কার্যকর তদারকি যা সঠিক সময়ে ভুলগুলো চিহ্নিত করা অথবা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা অনুমান করা এবং তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্য রাখে। এই ধরণের তদারকি প্রশাসন এবং বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়; কেননা এটি চেষ্টা করে...

সংগঠনের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা, যাতে সংগঠনের লক্ষ্যসমূহ ব্যাহত হওয়ার পূর্বেই সেই দুর্বলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

পক্ষান্তরে নেতিবাচক তদারকি হলো সেই প্রক্রিয়া, যা বাস্তবে ঘটে যাওয়া ভুলত্রুটিগুলো প্রকাশ করে দেয় এবং কর্মকর্তাদের সামনে তা উন্মোচিত করে; যেন ত্রুটি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

নেতিবাচক তদারকির ধারণায় ইসলাম দুই ধরনের ভুলের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে: প্রথমত, ইচ্ছাকৃত ভুল যা সংগঠনের ক্ষতি

করার উদ্দেশ্যে করা হয়; এক্ষেত্রে কঠোর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও কঠিন শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক ভুল যা কাজের আধিক্য, নির্দেশনাসমূহ বুঝতে না পারা অথবা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যেমন—অসাবধানতা ও বিস্মৃতি ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা, সতর্কতা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। পবিত্র কুরআন এই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত নিখুঁত ও সাবলীল ভাষায় সারসংক্ষেপ করেছে, ইরশাদ হয়েছে: "তোমরা ভুলবশত যা করে ফেলো সে বিষয়ে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, তবে তোমাদের অন্তর যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তাতে গুনাহ হবে)।" [সূরা আল-আহজাব: ৫]

আমরা যেমনটি দেখছি, ইসলামে সাধারণ তদারকি দুই ভাগে বিভক্ত—অভ্যন্তরীণ তদারকি ও বাহ্যিক তদারকি। অভ্যন্তরীণ তদারকি বলতে আমরা প্রশাসনিক তদারকিকে বুঝিয়ে থাকি। এই ধরনের তদারকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকেই স্বীকৃত, তিনি এই তদারকি পদ্ধতিটি দুটি রূপে প্রয়োগ করতেন:

১. যাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে, তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও প্রশাসকদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা।
২. শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষ থেকে আসা অভিযোগসমূহের তদন্ত করা।

এর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু কার্যকর মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন যা তাঁর কর্মচারীদের ওপর পূর্ণ তদারকি নিশ্চিত করত। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—মুসলিমদের আবাসস্থলে যাতায়াত করা, তাদের অবস্থার খোঁজ নেওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত অভাবী ও দুঃখকষ্টে আছে তাদের দেখাশোনা করা।

চতুর্দশ পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)

এছাড়া হজের মৌসুমে তিনি কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হতেন, তাদের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করার ব্যাপারে তাদের সতর্ক করতেন। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত তাঁর কর্মকর্তাদের আদেশ দিতেন যে, তারা যেন দিনের বেলা মদিনায় প্রবেশ করে; যাতে সকল মানুষ তাদের সাথে থাকা সম্পদ বা উপহারসামগ্রী দেখতে পায়।

আর বাহ্যিক তদারকির (জবাবদিহিতা) ক্ষেত্রে ইসলামে দুই ধরনের তদারকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: জন-তদারকি এবং বিচার বিভাগীয় তদারকি।

জন-তদারকির ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য হলো—রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর জনগণের নজরদারি। কেননা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে এই কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করার এবং জনস্বার্থ রক্ষার্থে গঠনমূলক সমালোচনা করার।

ইসলামী ব্যবস্থায় জন-তদারকির বিষয়টি 'হিসবাহ' পদ্ধতির সুমহান ধারণায় ফুটে উঠেছে, যা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এতে 'মুহতাসিব'-এর (তদারককারী) ওপর খলিফা, গভর্নর এবং ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক করা হয়েছে। ইসলাম সাধারণ জনগণের জন্য 'হিসবাহ'-কে ফরজে কিফায়া হিসেবে নির্ধারণ করেছে; যেহেতু প্রত্যেকের ওপরই সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা অপরিহার্য। তবে পদমর্যাদার কারণে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ওপর এটি ফরজে আইন করা হয়েছে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে যেন তার জিহ্বা দিয়ে (প্রতিবাদ করে); আর যদি তাও না

পারে, তবে যেন তার অন্তর দিয়ে (তা ঘৃণা করে); আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"

বিচার বিভাগীয় তদারকির ক্ষেত্রে ইসলাম বিচার বিভাগীয় নজরদারি ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল, যা 'নাযিরুল মাযালিম' (অভিযোগ প্রতিকারকারী)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তিনি প্রশাসনিক তদারকির কাজগুলো তদারক করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু বিশেষ এখতিয়ার ছিল; তার কয়েকটি হলো:

১. প্রজাদের ওপর শাসকদের সীমালঙ্ঘনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা।
২. সম্পদ বা কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের জুলুমের বিচার করা।
৩. সরকারি দপ্তরের লেখকদের কাছে অর্পিত সম্পদের হিসাব ও তা নথিবদ্ধকরণের বিষয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

পৃষ্ঠা 71

---

৪. নাগরিক ও প্রশাসনের মধ্যকার বিবাদসমূহ পর্যবেক্ষণ করা।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজসমূহের জন্য উপযোগী সকল প্রকার তদারকি বা নজরদারির ব্যবস্থাটি ইসলামি চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি থেকে গৃহীত হয়েছে। তারা একে একটি আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করত যার জন্য তারা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করবে। এটি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীরই বাস্তব প্রতিফলন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কি তা রক্ষা করেছে নাকি নষ্ট করেছে।"

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তখন বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন: "তোমাদের কী মত, আমি যদি তোমাদের ওপর এমন একজনকে নিযুক্ত করি যাকে আমি সর্বোত্তম মনে করি, অতঃপর তাকে ন্যায়বিচারের আদেশ দেই, তবে কি আমি আমার দায়িত্ব পালন করলাম?" তারা বলল: "হ্যাঁ, হে আমিরুল মুমিনীন।" তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ না আমি লক্ষ্য করি যে সে আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে কি না।"

তৃতীয়ত: বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইসলামি চিন্তাধারার দিকনির্দেশনা এবং ইসলামি কর্মপন্থা উল্লেখ করার পর, এখন আমরা এই তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে চাই। তাই আমরা এখন বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করব। আর এর সর্বোত্তম প্রয়োগ হলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং আমরা ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ের অধীনে বাস্তব প্রয়োগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা মুসলিমদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও তার বিকাশের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য। এটি এমন একটি কার্যকর মাধ্যম যা এই রাষ্ট্র গঠনের সূচনা থেকেই এর সাথে মিশে ছিল। এর কারণ হলো ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন উচ্চতর ঐতিহ্য এবং সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নির্ধারণ করেছিলেন; কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন...

পৃষ্ঠা 72

চতুর্দশ পাঠ

শরিয়াহ-সম্মত রাজনীতি (আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে শুরু করার সময় থেকেই নতুন ইসলামী সমাজের সদস্যদের জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্ব এবং ইসলামের দাওয়াত সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহান লক্ষ্যে তাঁর এবং এই কাঠামোর দায়িত্বশীলদের মধ্যে কর্ম-সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এই নতুন ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষণসমূহ আকাবার দ্বিতীয় বায়আতের সময় থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করে, যাতে ইয়াসরিব থেকে আগত একদল লোক মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের পূর্ববর্তী বছরে মক্কায় এসেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

যেহেতু এই প্রতিনিধি দলটি তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দুইজন নারী সমন্বয়ে একটি বিশাল দল ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অপরিহার্য মনে করলেন; কারণ তারাই ছিলেন নতুন সমাজের মূল ভিত্তি। এই সমাজের নিরাপত্তা রক্ষা এবং এর সদস্যদের মধ্যে কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি এটি করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়াসরিবের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কাছে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাদের ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন: "তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নকিব (প্রতিনিধি) নির্বাচন করে আমার কাছে পেশ করো, যাতে তারা তাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকদের বিষয়ে দায়িত্বশীল হতে পারে।"

অতঃপর তারা তাদের মধ্য থেকে বারোজন নকিব নির্বাচন করেন; যাদের মধ্যে নয়জন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের এবং তিনজন আউস গোত্রের। সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত নকিবদের বা ইসলামের প্রথম প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্বোধন করে তাদের কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট করে বলেন: "তোমরা তোমাদের কওমের জন্য তেমনিভাবে জিম্মাদার, যেমন ঈসা ইবনে মারিয়ামের হাওয়ারিগণ জিম্মাদার ছিলেন; আর আমি আমার কওমের জিম্মাদার।"

এই আগাম প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি কাফেরদের কূটকৌশল ও চক্রান্ত সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইয়াসরিবে হিজরতের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সফলতার পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে তার প্রথম চমৎকার ফল অর্জন করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়াসরিবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ধর্মীয় মিশন পালনে পূর্ণ আত্মনিয়োগ এবং নবগঠিত ইসলামী সমাজ ও উদীয়মান রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক সম্পাদিত মদিনার সনদে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

রাসুলুল্লাহ ﷺ মুহাজির, আনসার এবং ইয়াসরিবের ইহুদিদের মধ্যে যে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছিলেন, তা মদীনার মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়ী সংবিধানের প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে।

কেননা এই দলিলটি—রাজনৈতিক শর্তাবলী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি—সকল নাগরিক শ্রেণির মধ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এর ফলে প্রশাসনিক বিন্যাসটি উক্ত দলিলের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি তাৎক্ষণিক এবং ব্যবহারিক অনুবাদে পরিণত হয়েছিল।

গবেষক এই দলিলের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাঝে এক নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করেন। এটি এমন এক সত্য যা সমগ্র ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং একটি মৌলিক নীতিতে পরিণত হয়েছিল, যা এই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধ যুগ জুড়ে পূর্বসূরীদের অনুসরণে উত্তরসূরীরা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছেন।

এই যোগসূত্রের মৌলিক নিয়মগুলো সেই পাঠ্য থেকে স্পষ্ট হয় যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুমিনরা অন্য সব মানুষ থেকে পৃথক একটি জাতি। আর এই জাতির সদস্যদের প্রশাসনিকভাবে নিজেদের মধ্যে কাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত; যেন নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কঠোর হস্তে দমন করা যায় এবং মুত্তাকী মুমিনরা তাদের মধ্যকার সীমালঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকে। তাদের সবার হাত তার বিরুদ্ধে থাকবে, এমনকি সে যদি তাদের কারো সন্তানও হয়।

আল্লাহর রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে তাঁর প্রশাসনের জন্য ব্যক্তিদের বেছে নিয়েছিলেন, প্রত্যেকেই তাদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও এর পরিধি বিস্তারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনাও প্রদান করা হতো।

দাওয়াত প্রচারের সক্ষমতা ছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজ করার প্রাথমিক ভিত্তি। এই প্রশাসনিক অঙ্গনে কর্মরতদের অগ্রভাগে ছিলেন সাতজন মুহাজির এবং সাতজন আনসার। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হামজা, জাফর, আবু বকর, উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, সুলায়মান, আম্মার, হুযায়ফা, আবু যর, মিকদাদ এবং বিলাল।

তাঁরা সবাই 'নুকাবা' (প্রতিনিধি) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; কারণ তাঁরা রাসুলুল্লাহর নিকট তাঁদের কওমের ইসলামের ব্যাপারে জামিনদার হয়েছিলেন। আর 'নাকীব' হলেন তিনি, যিনি তাঁর ওপর অর্পিত বিষয়ের জিম্মাদার। নুকাবা ব্যবস্থাটি... রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

চতুর্দশ পাঠ
শরয়ি রাজনীতি

নতুন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নবী ﷺ এবং মুসলিম জামাতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো সেই মূলনীতির আলোকে, যা ইতিপূর্বে দ্বিতীয় বায়আতে আকাবায় প্রশাসনিকভাবে নির্ধারিত হয়েছিল।

রাসূল ﷺ তাঁর প্রশাসনের ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, ফলে তিনি মানুষকে তাঁদের কর্মতৎপরতা থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বোত্তম পন্থার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন: “আমার উম্মতের প্রতি আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু হলেন আবু বকর, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর হলেন উমর, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলেন উসমান, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ বিচারক হলেন আলী, হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল, ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী হলেন জায়েদ ইবনে সাবিত এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কুরআন পাঠকারী হলেন উবাই ইবনে কাব। প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে, আর এই উম্মতের আমানতদার বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।”

তিনি ﷺ আরও বলেছেন: “তোমরা চারজনের কাছ থেকে কুরআন গ্রহণ করো: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং হুজাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম।”

আনসারদের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন: উবাই, মুয়াজ এবং জায়েদ ইবনে সাবিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে আলেমদের এই দলটি থেকেই তিনি নিজের জন্য লেখক (কাতিব) নির্বাচন করেছিলেন, যারা ওহি নাযিল হওয়ার পরপরই তা লিখে রাখতেন। এ ছাড়াও নবজাতক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়াদিও তাঁরা লিপিবদ্ধ করতেন।

সেই লেখক সাহাবীগণ জাহেলি যুগ ও ইসলামের সূচনালগ্নে আরবি ভাষায় লেখার দক্ষতা এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মে পারদর্শিতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। নবী ﷺ-এর লেখকদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ জনে পৌঁছেছিল।

প্রতিনিধিদলের বছর (আমুল উফুদ) অর্থাৎ হিজরি নবম বছর থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একটি শ্রেণির উদ্ভব শুরু হয়। এর কারণ ছিল নবজাতক ইসলামী রাষ্ট্রের বিকাশ এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে এর কর্তৃত্বের বিস্তার। এই পরিস্থিতি ভূখণ্ডটিকে বড় বড় প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে, যাতে সেখানকার জনগণের বিষয়াদি সুশৃঙ্খল করা সহজ হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন রাজধানী মদিনা মুনাওয়ারার সাথে সরাসরি সেগুলোকে সংযুক্ত করা যায়।

চতুর্দশ পাঠ

রাজধানী এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সম্মানিত নবীর সরাসরি প্রশাসনের অধীনে ছিল, যতক্ষণ না মক্কায় একজন গভর্নর নিযুক্ত হন যিনি তাঁর নিকট থেকে নির্দেশনা এবং নতুন প্রশাসনিক কার্যাবলীর সকল প্রয়োজন গ্রহণ করতেন।

এই পবিত্র দুই শহর ছাড়াও আরব ভূখণ্ড বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা: তায়মা, আল-জান্দ, বনী কিনদাহ, নাজরান, হাজরামাউত, ওমান এবং বাহরাইন।

প্রতিনিধি আগমনের বছর থেকে সম্মানিত রাসূলের রীতি ছিল যে, আগত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, যা ঐ আমীরের যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে হতো, বয়সের দিকে না তাকিয়ে।

এরই একটি উদাহরণ হলো, যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আসল, তখন রাসূল উসমান ইবনে আবিল আস-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন, অথচ তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে বয়সে কনিষ্ঠ; কারণ তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি

জ্ঞানী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাকে তার প্রশাসনিক এলাকায় ফিরে যাওয়ার সময় নির্দেশনা দিয়ে বললেন: "হে উসমান! সালাতে সংক্ষেপ করবে এবং মানুষকে তাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী বিবেচনা করবে; কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল এবং অভাবী লোক রয়েছে।"

প্রত্যেক আমীরের পাশাপাশি নবী অপর একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন যাকাত ও সদকা সংগ্রহের জন্য, সেইসাথে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বীনি লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদি শেখানোর জন্য। নবী নিজে এই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন, ফলে তারা মর্যাদা, সততা এবং কাজে একনিষ্ঠতার এক উচ্চতর মডেলে পরিণত হয়েছিলেন।

এর অন্যতম উদাহরণ হলো যা সম্মানিত রাসূল করেছিলেন যখন তিনি মুয়ায-কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন: "তুমি আহলে কিতাবদের একটি জাতির কাছে যাচ্ছ, তাই তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান যেন হয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে। যখন তারা মহান আল্লাহকে চিনবে, তখন তাদের জানাবে যে আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয়, তবে তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে, আর তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকবে; কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।"

৬৭৫

পৃষ্ঠা 76

শরয়ী রাজনীতি

চতুর্দশ পাঠ

মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কর্মকর্তাদের নিকট প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনাবলী লিখে পাঠাতেন, যেমনটি তিনি নাজরানের প্রশাসক আমর ইবনে হুরাইসের নিকট লিখেছিলেন। সেখানে তিনি তার জন্য ফরজ ও সুন্নাত বিষয়সমূহ এবং সদকা ও দিয়াতের (রক্তপণ) ক্ষেত্রে করণীয় কার্যাবলি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মীবৃন্দ তাঁদের সততা ও কর্মনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এর একটি উদাহরণ হলো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের ইহুদিদের ফল-ফসলের পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তখন ইহুদিরা তাকে অলঙ্কারের মাধ্যমে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করে বলেছিল: "এটি আপনার জন্য, আমাদের ওপর করের বোঝা কিছুটা কমিয়ে দিন এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করুন।" তখন আব্দুল্লাহ তাদের বললেন: "হে ইহুদি সম্প্রদায়! আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তোমরাই আমার নিকট সবচেয়ে অপ্রিয়, তবে এই অপ্রিয় হওয়া আমাকে তোমাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য করবে না। আর তোমরা আমাকে যে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছ তা হারাম মাল, যা আমরা ভক্ষণ করি না।" তখন তারা বলেছিল: "এই ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই আসমান ও জমিন টিকে আছে।"

এসব সত্ত্বেও মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মকর্তাদের হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। তিনি সদকা আদায়ের কাজে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট হিসাব গ্রহণ করলেন, তখন লোকটি বলল: "এটি আপনাদের প্রাপ্য এবং এটি আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।" তখন মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সেই ব্যক্তির কী হলো যাকে আমরা এমন কাজের দায়িত্ব দিয়েছি যা আল্লাহ আমাদের অর্পণ করেছেন, অথচ সে বলছে—এটি আপনাদের এবং এটি আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার বাবা ও মায়ের ঘরে বসে থাকল না, তখন দেখত তাকে কেউ উপহার দেয় কি না?" তিনি আরও বলেছেন: "যাকে আমরা কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়েছি এবং তার জন্য জীবিকা (বেতন) নির্ধারণ করেছি, এরপর সে অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে তাই 'গুলুল' বা আত্মসাৎ।" অর্থাৎ: খিয়ানত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যেকোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগও গুরুত্বের সাথে শুনতেন। এর একটি উদাহরণ হলো, তিনি বাহরাইনের প্রশাসক আলা ইবনুল হাদরামিকে পদচ্যুত করেছিলেন; কারণ আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁর বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করেছিল। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সরিয়ে আবান ইবনে সাঈদকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: "আব্দুল কায়স গোত্রের লোকদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করো।"

৬৭৬

শরয়ি রাজনীতি

চতুর্দশ পাঠ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু সুফিয়ান বিন হারব, যাকে তিনি নাজরানের নামায এবং যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর তাঁর সাথে রাশিদ বিন আব্দুল্লাহকে বিচার বিভাগ এবং অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে যুবকদের আধিক্য ছিল এবং তারা লোকসমাজে প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কর্মকর্তাদের তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন বনু উমাইয়া গোত্র থেকে, যাদের জাহেলি যুগেও মক্কার প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যাপক তৎপরতা ছিল।

আবু বকর-এর যুগের শাসনব্যবস্থা:

আবু বকর তাঁর শাসনকাল শুরু করেন সেই বিখ্যাত ভাষণের মাধ্যমে, যাকে ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণ—সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও—শাসন পরিচালনার একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ ও আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং মুসলিমদের হৃদয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের আদর্শ হিসেবে গণ্য করেন।

আবু বকর তাঁর প্রথম ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর এবং তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করার পর বলেন:

"অতঃপর: হে লোকসকল! আমাকে আপনাদের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে অথচ আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। সুতরাং আমি যদি ভালো কাজ করি তবে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর যদি মন্দ কাজ করি তবে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দেবেন। সত্যবাদিতা হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খেয়ানত। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আল্লাহর ইচ্ছায় আমার কাছে শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার হক তাকে আদায় করে দিই। আর আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আল্লাহর ইচ্ছায় আমার কাছে দুর্বল যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অন্যের হক আদায় করে নিই। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ বর্জন করে, আল্লাহ তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ-আপদ ব্যাপক করে দেন। আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য করুন যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি; আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি আপনাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আপনারা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হোন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহম করুন।"

এটিই সেই ভাষণ যার মাধ্যমে আবু বকর আস-সিদ্দীক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিমদের ওপর তাঁর শাসনকার্য শুরু করেছিলেন।

পৃষ্ঠা 78

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

চতুর্দশ পাঠ

আবু বকর উম্মাতে মুসলিমাকে খলিফার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন। আবু বকরের কর্মকাণ্ড তাঁর ইসলাম গ্রহণের সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হয়, যখন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর পাশে দ্বিতীয় ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত এবং হিজরতকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ নিরাপত্তা দায়িত্বশীল, তাঁর রহস্যের আমানতদার এবং দ্বীনি ও প্রজাসাধারণের বিষয়ে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। দাওয়াত প্রচারের সূচনা থেকে শুরু করে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে দীর্ঘ সাহচর্য তাঁকে এক অনন্য প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দান করেছিল, যা তাঁকে নবজাত রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ইসলামী ইতিহাসের অত্যন্ত সংবেদনশীল এক সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে সফল হওয়ার জন্য প্রকৃত অর্থেই যোগ্য করে তুলেছিল।

এই কারণে আবু বকর ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম দিন থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসৃত পথ ও তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করার এবং ইসলাম প্রচার ও আরবদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি যে পথ অবলম্বন করেছিলেন সেই পথে চলার সংকল্প করেছিলেন। তিনি কোনো দুর্বলতা, দ্বিধা বা ভীরুতাকে পরোয়া করেননি। ফলে শাসনকার্যে তাঁর নীতি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাজনীতি ও শাসনের পূর্ণ অনুসরণ।

তিনি প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেন এবং যে সকল কর্মচারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সহযোগিতা করেছিলেন এবং যে সকল আমিরকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের বহাল রাখেন। তিনি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ এবং বিচার বিভাগের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাবকে নির্বাচন করেন। জায়দ ইবনে সাবিতকে তাঁর লেখক হিসেবে বহাল রাখেন। অনুরূপভাবে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মনোনীত শূরা সদস্যদেরও বহাল রাখেন, তবে কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনেন কারণ তাঁদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আর প্রদেশগুলোর বিচারক নিয়োগের বিষয়টি তিনি গভর্নরদের ওপর ন্যস্ত করতেন; কারণ তাঁরাই এ ব্যাপারে অধিক অবগত ছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁদের জন্য বিচারকার্যের নিয়োগপত্র জারি করতেন।

উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে প্রশাসন >

বিজিত দেশসমূহে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি উমরের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশনার আলোকে বিকশিত হয়েছিল এবং এটি সেই বিশাল ও দ্রুত পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়ে উঠেছিল যা সেই দেশগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল...

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে; এর কারণ হলো, এই খলিফার সময়ে যে ইসলামি বিজয়গুলো সম্পন্ন হয়েছিল তা আরবদেরকে উর্বর ভূখণ্ড (ফারটাইল ক্রিসেন্ট), পারস্য এবং মিশরের অধিপতিতে পরিণত করেছিল। এগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সেখানে বিশ্বের প্রাচীনতম প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলোর কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। ফলে আরবরা এমন কিছু প্রাচীন ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হয়েছিল, যার ঐতিহ্য গ্রিক, রোমান, পারস্য, ফারাও, আসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারা এই সমস্ত ব্যবস্থাকে সমগ্র মানবজাতির ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য করত, যা তাদের নিকট এসে পৌঁছেছিল; এবং তারা এই ঐতিহ্যের নিরাপত্তা বিধান ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরী ও দায়িত্বশীলে পরিণত হয়েছিল।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন ব্যবস্থাগুলো থেকে কার্যকর শিক্ষা গ্রহণের বাস্তব উদাহরণ নিজে পেশ করেছিলেন। এর কারণ ছিল, তাঁর যুগে নতুন অধিকৃত অঞ্চলগুলোর ব্যবস্থাপনা ইসলামি কর্তৃপক্ষের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল; কারণ সেই ভূখণ্ডগুলোতে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বসবাস করত এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক রীতিনীতির অনুসারী ছিল। মিশর ও সিরিয়া পরিচালিত হতো বাইজেন্টাইন মডেলে, অন্যদিকে ইরাক ও পারস্যে ভাষা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পাহলভি ঐতিহ্যের প্রাধান্য ছিল। ফলে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব সেই প্রশাসনিক কাঠামোসমূহ অপরিবর্তিত রাখেন।

একইভাবে বিজিত দেশগুলোর প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পূর্বের অবস্থায় রাখা হয়েছিল; যাতে কাজের ধারায় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং সেখানকার কর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকেও সুফল পাওয়া যায়। একই সময়ে এই প্রশাসনিক বিভাগগুলোকে ইসলামের মাধ্যমে পরিমার্জিত নতুন আরবীয় চেতনায় সিক্ত করা হয়েছিল এবং সেগুলোকে মানবকল্যাণ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চতর আদর্শ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছিল।

আর আরবীয় চেতনা ইসলামের সার্বভৌমত্বের ধারণা থেকে এর মূল উপাদানগুলো সংগ্রহ করেছিল। এটি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্য, যিনি সবকিছুর মালিক এবং জনস্বার্থের রক্ষক ও অভিভাবক। সুতরাং রাষ্ট্রের সম্পদ হলো আল্লাহর সম্পদ, সেনাবাহিনী হলো আল্লাহর সৈন্যদল, অর্থাৎ আল্লাহর বাণী...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

চতুর্দশ পাঠ

বর্তমান যুগের পরিভাষায় 'জনস্বার্থ' (আস-সালিহ আল-আম) আল্লাহর সম্পদের সমার্থক। এর অর্থ হলো, আল্লাহর সম্পদ বলতে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বা সাধারণ সম্পদকে বোঝায়; আর আল্লাহর বাহিনী হলো সেই বাহিনী যা জনস্বার্থের দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়।

তবে মহান আল্লাহ নিজে সরাসরি মানুষের মাঝে শাসন ও পরিচালনা কার্যে লিপ্ত হন না, যেমনটি উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন ফেরাউনদের শাসনব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব খলিফার নিকট আমানত হিসেবে ন্যস্ত থাকে, যাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার চাবিকাঠির নিয়ন্ত্রক হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুতরাং খলিফা হলেন পার্থিব জগতের এমন ব্যক্তি যিনি জনস্বার্থের তত্ত্বাবধান করেন, যা মূলত মহান আল্লাহর। ফলে খলিফাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রশাসন ও শাসনের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য যাকে ইচ্ছা পছন্দ করার অধিকার রাখেন। তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী; কারণ তারা তাঁর অনুগত, তাঁর নামে কাজ করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব পরিচালনা করে।

কর্তৃত্ব সম্পর্কে ইসলামের এই ধারণা দাবি করে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি যেন কেন্দ্রীয় হয়; কারণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খলিফাই মূল দায়ী ব্যক্তি। খলিফা এবং তাঁর কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্কটি অবশ্যই সরাসরি হতে হবে। অতএব, সেই সকল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো বিদ্রোহ খলিফার নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য হবে। মূল দায়িত্বটি প্রথমত এবং শেষত খলিফারই।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব এই ধারণার ওপর গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন, যা তাঁর এই বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে: "আল্লাহর কসম, যদি ইরাকে কোনো উট হোঁচট খায়, তবে তার জন্য আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।" তিনি বারবার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধারণার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যার সর্বশেষ ছিল তাঁর এই উক্তি: "আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে এক বছর সফর করব। কারণ আমি জানি যে, মানুষের এমন অনেক প্রয়োজন থাকে যা আমার কাছে পৌঁছানোর আগেই বন্ধ হয়ে যায়—অর্থাৎ তার খবর আমি পাই না। তাদের কর্মকর্তারা—অর্থাৎ প্রজাদের দায়িত্বশীলরা—তা আমার কাছে পেশ করে না, আর প্রজারা নিজেরাও সরাসরি আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না। তাই আমি শামে গিয়ে সেখানে দুই মাস অবস্থান করব, এরপর জাজিরায় গিয়ে সেখানে দুই মাস থাকব, তারপর মিশরে গিয়ে সেখানে দুই মাস থাকব, এরপর বাহরাইনে গিয়ে সেখানে দুই মাস থাকব, তারপর..."

৬৮০

পৃষ্ঠা 81

শরয়ি রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

কুফা, সেখানে দুই মাস অবস্থান করেন। অতঃপর বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে দুই মাস অবস্থান করেন। আল্লাহর শপথ, এই পরিস্থিতি কতই না চমৎকার!

খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব এই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ইসলামি চেতনা এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত তাঁর সুনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে ক্রমবর্ধমান ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিন্যাসের সমস্যার মুখোমুখি হন। তিনি এই পথে এমন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিকূলতা ও ধ্বংসাত্মক অস্থিরতা এড়িয়ে চলার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাঁর অসাধারণ সক্ষমতার পরিচয় দেয়। তিনি মহান রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক নিয়মাবলী এবং তাঁর শাসনামলে বিশাল বিজয়ের পর ইসলামি রাষ্ট্রের নতুন পরিস্থিতির চাহিদার মধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

তিনি একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, যা এর ছায়াতলে বসবাসকারী সকল নাগরিকের জন্য প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি

নিশ্চিত করেছিল। তিনি তাদের সামনে ইসলামে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার ধারণার একটি বাস্তব উদাহরণও পেশ করেন।

ইসলামে ক্ষমতার ধারণা ও তৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী এবং বিজিত দেশসমূহের প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের আমীর পদটি বহাল রাখার মাধ্যমে, যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই নির্ধারিত হয়েছিল। খলিফা প্রতিটি বিজিত ভূখণ্ডে একজন করে আমীর নিযুক্ত করেন, পাশাপাশি ঐ সকল অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সেখানকার স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও বহাল রাখেন।

ওমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে প্রশাসনিক কাজ সহজ করার লক্ষ্যে ইসলামি রাষ্ট্রকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়; সেগুলো হলো: মক্কা, মদিনা, শাম, আল-জাজিরা, বসরা, কুফা, মিশর এবং ফিলিস্তিন। প্রতিটি প্রদেশের জন্য একজন আমীর থাকতেন যিনি কখনো কখনো 'ওয়ালি' উপাধি ধারণ করতেন। তিনি প্রদেশের রাজধানীতে অর্থাৎ প্রধান শহরে অবস্থান করতেন, যেখানে তাঁর জন্য একটি বিশেষ কার্যালয় নির্ধারিত থাকতো যা 'দারুল ইমারাহ' নামে পরিচিত ছিল। আমীরকে খলিফার প্রতিনিধি, রাজনৈতিক প্রধান এবং খলিফার নিকট তাঁর সকল কাজের জন্য সরাসরি প্রশাসনিক দায়বদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো।

৬৮১

পৃষ্ঠা 82

চতুর্দশ পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

গভর্নর (ওয়ালী) খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিটি প্রদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমুআ ও ঈদের নামাযে মুসলিমদের ইমামতি করতেন। এর ফলে তিনি ‘আমীরুস সালাত’ উপাধি লাভ করেন। এটি ছিল আমীরের মর্যাদার পরিচায়ক একটি সম্মাননা; কারণ সালাতের ইমামতি ছিল এমন একটি বিষয় যা খলীফাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যেখানে তাদের প্রত্যেককে ‘ইমাম’ উপাধিতে ভূষিত করা হতো।

আমীর প্রদেশের সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্বও পালন করতেন এবং নিয়োগের সময় তিনি ‘বিলায়াতুল হারব’ উপাধি লাভ করতেন। তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর তদারকি করা এবং নিজের প্রদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য নিজেই সেগুলোর নেতৃত্ব প্রদান করা। আমীর কখনো কখনো—সবসময় নয়—তার নিয়মিত কার্যাবলীর পাশাপাশি প্রদেশের আর্থিক প্রশাসন তদারকির দায়িত্বও পালন করতেন, যাকে তৎকালীন সময়ে ‘খারাজ’ নামে অভিহিত করা হতো। এ ধরনের আমীরকে প্রদেশের সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে গণ্য করা হতো।

ইসলামী শাসনব্যবস্থার ফকীহগণ উমর ইবনুল খাত্তাবের আমলের এই প্রাথমিক প্রশাসনিক কাঠামোকে ‘ইমারাতুল আম্মাহ’ (সাধারণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব) হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ, আমীর নিজেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন, সালাতে ইমামতি করতেন, বিচারকার্য সম্পাদন করতেন এবং অর্থ আদায় করতেন। তবে বিজয়ের পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর এবং প্রশাসনিক চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়, উমর ইবনুল খাত্তাব আমীরের পাশাপাশি খারাজ আদায়ের জন্য একজন পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

খারাজ আদায়ের দায়িত্বে থাকা এই কর্মকর্তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করতেন, বিশেষ করে উচ্চ আয়সম্পন্ন প্রদেশগুলোতে। এর ফলে তিনি স্বয়ং আমীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। উমর ইবনুল খাত্তাব মিশরে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন; তিনি আমর ইবনুল আসকে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে রাখেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহকে খারাজ সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োগ দেন।

এর মাধ্যমে আমর ইবনুল আসের আমীরশাহি—যা পূর্বে ‘সাধারণ’ (আম্মাহ) ছিল—তা ‘বিশেষ’ (খাসসাহ) আমীরশাহিতে

রূপান্তরিত হয়। ফকীহদের পরিভাষায় 'ইমারাতুল খাসসাহ' (বিশেষ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব) মানে হলো—আমীর সেখানে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সেনাবাহিনী পরিচালনা, প্রজাদের শাসন, রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড রক্ষা এবং জনপদগুলোর হেফাযত করার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। তার জন্য অধিকার থাকবে না যে...

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)
চতুর্দশ পাঠ

বিচারকার্য, বিধিবিধান, খারাজ (ভূমিরাজস্ব) সংগ্রহ বা সদকার মতো বিষয়গুলোতে তিনি সংশ্লিষ্ট হতেন, এমনকি সালাতের ইমামতির ক্ষেত্রেও; কারণ অনেক সময় বিচারক (কাযী) তার চেয়ে এর জন্য অধিক উপযুক্ত হতেন।

বিজিত দেশগুলোর প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিচালনায় আমিরকে সহযোগিতা করত সাবেক প্রশাসনের সেই সব ব্যক্তিবর্গ, যাদের খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব বহাল রেখেছিলেন; তারা বাইজেন্টাইন কিংবা সাসানীয় প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন। কারণ এই খলিফা তার প্রখর প্রশাসনিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এটি জরুরি যে, ইসলামের ছায়াতলে আসা প্রদেশগুলোর সাবেক প্রশাসনিক কাঠামোকে অচল বা বাতিল না করা।

নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য বাইজেন্টাইন বা সাসানীয়দের প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো প্রয়োজন ছিল। এর মাধ্যমেই উমর ইবনুল খাত্তাব মহান রাসূল ﷺ-এর পরে ইসলামী রাষ্ট্রের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' উপাধি লাভ করেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব বিজিত দেশগুলোতে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি তার মূল্যায়ন প্রদর্শন করেন, বিশেষ করে তার সিরিয়া (শাম) প্রদেশ সফরের সময় থেকে। তিনি এই প্রদেশের জন্য এমন একটি প্রশাসনিক বিভাগ নির্ধারণ করেন যা ইসলামী ও বাইজেন্টাইন ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করে। দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তিনি সেখানে পূর্বে প্রচলিত প্রশাসনিক বিভাজনকেই বহাল রাখেন।

এটি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের একটি ব্যবস্থা, যেখানে প্রদেশের গভর্নর তার বেসামরিক দায়িত্বের পাশাপাশি সামরিক ক্ষমতাও প্রয়োগ করতেন। তিনি এই অবস্থা বহাল রাখেন এবং এই বিভাগগুলোকে আরবি নাম দেন 'আজনাদ' (যা 'জুন্দ' শব্দের বহুবচন), যা বাইজেন্টাইনদের নিকট গ্রিক শব্দ 'বুনুদ'-এর সমার্থক ছিল। ফলে 'আজনাদ' বলতে এমন সামরিক প্রদেশ বোঝাত, যার প্রতিটির কেন্দ্রে সেনাবাহিনীর একটি বাহিনী অবস্থান করত। এটি বাইজেন্টাইন ব্যবস্থায় প্রচলিত একই প্রশাসনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে মিসর প্রদেশটি এর নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান এবং নতুন ইসলামী বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল হিসেবে গণ্য হয়।

চতুর্দশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

অতঃপর (শাসনভার) আমর ইবনুল আস-এর নিকট হস্তান্তরিত হলো। তিনি ছিলেন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব-এর শাসনামলে মিশরের প্রথম গভর্নর। তার নিকট বাইজেন্টাইন জেনারেল গভর্নরের দায়িত্বসমূহ হস্তান্তরিত হয়, যিনি দেশটিতে (সামবুলুস) নামে পরিচিত ছিলেন।

আমর ইবনুল আস-এর প্রভাব বহু প্রশাসনিক দিকে এবং দেশের ইসলামি পরিস্থিতির প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়েও বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে সালাতে জনগণের ইমামতি করতেন, যা তৎকালীন সময়ে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে তিনি দেশটির সর্বোচ্চ প্রধান।

আমর রাজনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি দেশটির আর্থিক প্রশাসন তদারকি করার অধিকারও নিজের নিকট একত্রিত করেছিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা যখন একজন গভর্নর সালাতে জনগণের ইমামতি এবং রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব একত্রে পালন করেন, তখন তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন। অর্থাৎ তার কর্তৃত্ব তখন সাধারণ কর্তৃত্বে (বিলায়াতুন আম্মাহ) পরিণত হয়, যেভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিষয়ের গবেষক ফকীহগণ এই পরিভাষাটি প্রয়োগ করেছেন।

আমর ইবনুল আস এই প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে গর্ববোধ করতেন, এমনকি তিনি বলেছিলেন: "মিশরের শাসনভার হলো এক সামগ্রিক দায়িত্ব, যা খেলাফতের সমতুল্য," অর্থাৎ এটি খেলাফতের সমান।

তবে এই ব্যাপক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমর ইবনুল আস কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও তার কর্তৃত্বের অনুগত এবং এর নির্দেশাবলি সরাসরি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত একজন মুসলিম আমিরের আদর্শ হয়ে ছিলেন। খলিফা আমর ইবনুল আস-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তার প্রশাসনিক কাজে মিশরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানকার প্রাচীন বাইজেন্টাইন প্রশাসনের অবশিষ্টাংশ নির্মূল করার সর্বোত্তম উপায়গুলো সম্পর্কে অবগত হন।

এর কারণ ছিল যে, মিশর বাইজেন্টাইন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের হাতে অনেক দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল, যাদের লক্ষ্য ছিল দেশটির সম্পদ লুণ্ঠন করা। ফলে ইসলামি বিজয়ের ঠিক পূর্ববর্তী শতাব্দীতে মিশর সরাসরি অরাজক পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল। এর কারণ ছিল এই যে: বাইজেন্টাইনরা—অর্থাৎ রোমানরা—এখানকার কৃষকদের কেবল গম উৎপাদনের সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করত এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা...

এতে তাদের কাছে কেবল প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ শোষণ করার বিষয়টিই ন্যস্ত ছিল; তাদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা কিংবা জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং তাদের দাবি পূরণ করা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

আমর ইবনুল আস খলিফা উমরের নির্দেশ পালন করলেন এবং মিসরের বিশপ (বেনিয়ামিন)-এর নিকট দেশ পরিচালনা ও এর

বিষয়াদি সুশৃঙ্খল করার সর্বোত্তম মাধ্যম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন (বেনিয়ামিন) নিম্নোক্ত পরামর্শ প্রদান করলেন:

তিনি তাকে বললেন: "হে আমীর, আপনাকে এর—অর্থাৎ মিসরের—আবাদ নিশ্চিত করতে হবে পাঁচটি দিক থেকে: এর খারাজ (ভূমি রাজস্ব) একযোগে আদায় করতে হবে যখন অধিবাসীরা তাদের চাষাবাদ থেকে অবসর হবে, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যখন স্থানীয়রা ফসল কাটা শেষ করবে। আর খারাজ একযোগে গ্রহণ করতে হবে যখন তারা তাদের আঙ্গুর মাড়াই থেকে অবসর হবে, অর্থাৎ তাদের থেকে খারাজ এক সময়ে গ্রহণ করা হবে যখন তারা তাদের উৎপাদিত আঙ্গুরের রস তৈরির কাজ সমাপ্ত করবে। আর সেইসাথে এর খালগুলো খনন করতে হবে এবং এর নালা ও বাঁধগুলো সংস্কার করতে হবে।"

আর (বেনিয়ামিন) এই শর্তারোপ করেন যে, মানুষের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য যেন কোনো জালেম কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করা না হয়; কারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাই অন্যান্য শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্য দায়ী, যা তিনি দেশের সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

আমর ইবনুল আস প্রকৃতপক্ষে মিসরীয় (বেনিয়ামিন)-এর বক্তব্যের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চললেন, কেননা তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের দেশ পরিচালনায় তার সাথে অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে তাদের জন্য ইসলামী প্রশাসনের ন্যায়বিচার থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এবং এর পাশাপাশি তারা বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রের অধীনে যেসব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্ত ছিল তাও বহাল রাখা হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দপ্তরসমূহ (আদ-দিওয়ান):

আমরা যখন উমর ইবনুল খাত্তাবের আমলের প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করছি, তখন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব যেসব প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম ও উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলোর ওপর আলোকপাত করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

চতুর্দশ পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ (শরিয়াহ-ভিত্তিক রাজনীতি)

...যা তাঁর পূর্বে বিদ্যমান ছিল না, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেও নয় এবং খলিফা আবু বকরের যুগেও নয়।

ওমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক প্রবর্তিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ:

দেওয়ান ব্যবস্থা, বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি সেনাবাহিনী সুবিন্যস্তকরণ। নিচে এগুলোর ওপর আলোকপাত করা হলো:

১. দেওয়ানসমূহ:

দেওয়ান: এটি এমন একটি স্থান যেখানে শাসনকর্তার কার্যাবলি ও সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার এবং যারা তা পরিচালনা করে সেই সেনাবাহিনী ও কর্মচারীদের তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামে দেওয়ান ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক হলেন ওমর ইবনুল খাত্তাব। তিনি প্রথম দেওয়ান লিপিবদ্ধ করেন, যার অর্থ হলো তিনি দেওয়ানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; যেমন পারস্য ও রোমের দেওয়ান ছিল। তাঁর জন্য এই দেওয়ানের তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন

আকিল ইবনে আবি তালিব, মাখরামা ইবনে নাওফাল এবং জুবাইর ইবনে মুতইম। তাঁরা ছিলেন কুরাইশ বংশের অত্যন্ত বিজ্ঞ ও মেধাবী ব্যক্তি।

ওমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক প্রবর্তিত গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানসমূহ:

ক. দেওয়ানুল ইনশা (রচনা বিভাগ) বা চিঠিপত্র বিভাগ:

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দেওয়ান হলো একটি রেজিস্টার যেখানে পরিসংখ্যান, নাম, বেতন, প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। তেমনিভাবে বলা যেতে পারে যে, এটি এমন একটি স্থান যেখানে চিঠিপত্র, চুক্তি এবং দলিলাদি রাখা হয়। যদি বিষয়টি সঠিক হয়, তবে আমরা বলতে পারি যে, ওমর ইবনুল খাত্তাবই ইসলামে প্রথম ‘দেওয়ানুল ইনশা’ বা চিঠিপত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ওমর তাঁর দলিলাদি ও চুক্তিনামা সংরক্ষণের জন্য একটি বাক্স বা সিন্দুক তৈরি করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন: "রচনামূলক লিখন, অথবা যা পরবর্তীতে 'দিওয়ানুল ইনশা' নামে পরিচিত হয়েছে, সেই প্রাথমিক সময়ে তা প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। খলিফা উমর তাঁর গভর্নর ও কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজেই তাদের নিকট থেকে আগত পত্রাবলি পাঠ করতেন এবং তাদের জন্য যা প্রয়োজন তা নিজ হাতে লিখে পাঠাতেন। সেই যুগে এই রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু বিদ্যমান ছিল, তা ছিল কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লেখকদের আদলে একদল লেখক, যারা খলিফা যা বলতেন তা লিখে নিতেন। উমর (রা.)-এর প্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে ছিলেন: যায়েদ বিন সাবিত এবং আবদুল্লাহ বিন আল-আরকাম।"

কেউ কেউ আরও বলেন: "উমর (রা.) এটি প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক দিওয়ান (দপ্তর) ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর কর্মকর্তাদের নিকট এবং বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র লিখতেন। এই পত্রগুলো এবং সেগুলোর উত্তর মদিনায় তাঁর কাছেই সংরক্ষিত থাকত। আবু বকর (রা.)-ও তাঁরই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু উমর (রা.)-এর যুগে পত্রের আদান-প্রদান স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়, ফলে তিনি মদিনায় এর জন্য একটি বিশেষ দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। একেই 'দিওয়ানুল ইনশা' বা 'দিওয়ানুর রাসাইল' বলা হয়।"

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যাকে 'দিওয়ানুল ইনশা' বলা হয়, তা উমর (রা.)-এর যুগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রা.)-এর যুগের তুলনায় এক স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছিল। উমর (রা.) অন্যান্য দিওয়ানগুলোর পূর্বেই এটি স্থাপন করেছিলেন। আর অন্যান্য দিওয়ানসমূহ, যেমন: দিওয়ানুল আতা (ভাতা দপ্তর), দিওয়ানুল জুনদ (সৈন্য দপ্তর) এবং দিওয়ানুল জিবায়াহ (রাজস্ব দপ্তর)—এগুলো এমন সব দিওয়ান যা উমর (রা.) পারস্য ও রোমের অনুরূপ দপ্তরের আদলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ. দিওয়ানুল আতা, বা যা দিওয়ানুল আমওয়াল নামে পরিচিত:

এটি হলো প্রজাসাধারণ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের মাঝে অর্থ বণ্টনের দিওয়ান। এই দিওয়ানটি অর্থের বিষয়াদি, এর পরিসংখ্যান, এর হকদারদের তালিকা এবং বণ্টন পদ্ধতির প্রতি গুরুত্বারোপ করত...

পৃষ্ঠা ৪৪

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

তাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করা। এই রেজিস্টার—অর্থাৎ দেওয়ান—মদিনায় বিদ্যমান ছিল এবং এটি একটির অধিক রেজিস্টার ছিল, যাতে প্রতিটি গোত্রের জন্য আলাদা একটি বিশেষ রেজিস্টার থাকত।

একইভাবে উমর অত্যন্ত সজাগ ছিলেন যাতে প্রতিটি হকদারের কাছে ভাতা ও অর্থ পৌঁছে যায়। বলা হয়ে থাকে যে, উমর প্রতিটি গোত্রের রেজিস্টার বহন করে নিজেই তাদের বসতিতে যেতেন এবং তাদের সদস্যদের হাতে তাদের ভাতা তুলে দিতেন।

উমর মদিনায় যে দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে তার শাখা ছিল। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যে দেশে সে অবস্থান করত সেখান থেকেই তার ভাতা গ্রহণ করা সহজ হয়েছিল। প্রতিটি গভর্নর তার শাসনাধীন এলাকায় প্রাপকদের কাছে ভাতা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন, ঠিক যেমন উমর মদিনা ও তার আশেপাশে প্রাপকদের কাছে ভাতা পৌঁছে দিতেন।

এই আরবি দেওয়ানের শাখাগুলোর পাশাপাশি স্থানীয় দেওয়ানগুলোও সচল ছিল, যা ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে ইসলামের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। উমর এই দেওয়ানগুলোকে তাদের কর্মকর্তা ও ভাষাসহ বহাল রেখেছিলেন। ফলে সিরিয়ার দেওয়ান গ্রিক ভাষায়, পারস্য ও ইরাকের দেওয়ান ফারসি ভাষায় এবং মিশরের দেওয়ান কিবতি ভাষায় লেখা হতো। উমর এই পদগুলো অমুসলিমদের হাতেই রেখে দিয়েছিলেন; কারণ বিজয়ীরা ছিলেন নিরক্ষর আরব, যারা লেখালেখি ও হিসাব-নিকাশে পারদর্শী ছিলেন না। তাই তারা হিসাবের কাজে আহলে কিতাব অথবা অনারবদের মধ্য থেকে যারা এতে পারদর্শী ছিল তাদের নিয়োগ দিতেন, আর তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর লেখকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন বংশানুক্রমিক বিন্যাস অনুযায়ী মানুষের নাম তালিকাভুক্ত করে, যা শুরু হবে রাসূলের নিকটাত্মীয়দের থেকে এবং এরপর পর্যায়ক্রমে যারা নিকটবর্তী তাদের নাম আসবে। এটি ছিল উমরের নীতি যে, তিনি রাসূলের আত্মীয় এবং অন্যদের মধ্যে ভাতার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী হওয়ার ভিত্তিতে তারতম্য করতেন। যদি দু'জন আত্মীয়তার মর্যাদায় সমান হতো, তবে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।

পৃষ্ঠা ৪৫

শরয়ি রাজনীতি (আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ)

উমর (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ এভাবে ব্যক্ত করেছেন: "আমরা দুনিয়াতে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি এবং আখিরাতে যে সওয়াবের আশা করি, তা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং তাঁর গোত্র আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয় ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি এই বলে তার সমর্থন করতেন যে: "আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাকে আমি এমন ব্যক্তির সমান করব না যে তাঁর সাথে মিলে যুদ্ধ করেছে।" অর্থাৎ অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য যে, আবু বকর (রা.) বংশমর্যাদা বা ইসলামে অগ্রগণ্যতার দিকে না তাকিয়ে মুসলমানদেরকে সমানভাবে অনুদান দিতেন। যখন তাকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে পার্থক্য করার পরামর্শ দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন: "তোমরা যে অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছ, তা আমার খুব ভালো করেই জানা আছে। তবে এটি এমন বিষয় যার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর এটি তো জীবনধারণের উপায় মাত্র—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সম্পদ বণ্টন করা হয় তা জীবনধারণের উপকরণ। আর এতে সমতাই হলো একজনের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার চেয়ে উত্তম।" অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার পরিবর্তে সমানভাবে সম্পদ বণ্টন করা।

পরবর্তীতে উমর (রা.) তাঁর শেষ জীবনে আবু বকর (রা.)-এর মতের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছিলেন: "আমি যদি আগামী বছরের এই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে আমি পরবর্তী লোকদের পূর্ববর্তী লোকদের স্তরে নিয়ে আসব, যাতে তারা অনুদান প্রাপ্তিতে সমান হয়ে যায়।" কিন্তু এর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

অনুরূপভাবে উমর (রা.) নারী ও শিশুদের জন্যও অনুদান নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি শিশুদের জন্য দুধ ছাড়ানোর পর অনুদান বরাদ্দ করতেন। পরে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, অনুদান পাওয়ার লোভে মানুষ তাড়াতাড়ি শিশুদের দুধ ছাড়ানো শুরু করেছে। ফলে তিনি এক ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন: "তোমরা তোমাদের শিশুদের দুধ ছাড়াতে তাড়াহুড়ো করো না, কারণ আমরা ইসলামে জন্ম নেওয়া প্রতিটি নবজাতকের জন্যই অনুদান নির্ধারণ করব।"

তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, ইসলামে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুর জন্য যেন অনুদান বরাদ্দ করা হয়। উমর (রা.) প্রত্যেক নবজাতকের জন্য একশত দিরহাম নির্ধারণ করেন। যখন শিশুটি বড় হতো, তখন তা বাড়িয়ে দুইশত দিরহাম করা হতো। আর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হতো, তখন তার অনুদান আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। উমর (রা.) বলেন: "সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এই সম্পদে অধিকার নেই এমন কেউ নেই; যাকে তা দেওয়া হয় বা বঞ্চিত করা হয়। আর ক্রীতদাস ছাড়া এই সম্পদে একজনের চেয়ে অন্যজন বেশি হকদার নয়। আমি তো তোমাদেরই একজনের মতো। তবে আমরা আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত বণ্টন অনুযায়ী মর্যাদাপ্রাপ্ত। সুতরাং মানুষের মর্যাদা তার কর্ম ও অবদান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।"

...ইসলামে, এবং ইসলামে ব্যক্তির অগ্রগামিতা, ইসলামে ব্যক্তির সচ্ছলতা এবং ইসলামে ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা। আল্লাহর কসম,

আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে সানআ পাহাড়ের রাখালও তার নিজ স্থানে অবস্থানরত অবস্থায় এই সম্পদ থেকে তার অংশ পেয়ে যাবে, তার চেহারা লাল হওয়ার আগেই (অর্থাৎ সম্পদ অন্বেষণে ক্লান্ত হওয়ার আগেই)।

অনুদান নির্ধারণ কেবল আরব মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এই অনুদান কিছু অনারব মুসলিম ও অন্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যেমন উমর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো আহলে কিতাবদের জন্যও কিছু অনুদান নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাদের বৃদ্ধদের জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

একদা উমর এক অন্ধ বৃদ্ধ ভিক্ষুকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পেছন থেকে তার বাহুতে স্পর্শ করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কোন আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত?" সে বলল: ইহুদি। তিনি বললেন: "আমি যা দেখছি (ভিক্ষাবৃত্তি) তা করতে তোমাকে কিসে বাধ্য করল?" সে বলল: জিজিয়া পরিশোধের চাপ, অভাব এবং বার্ধক্য। তখন উমর তার হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্থ প্রদান করলেন। এরপর তিনি বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন: এর এবং এর মতো অন্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখ। আল্লাহর কসম, আমরা তার প্রতি ইনসাফ করিনি যে, আমরা তার যৌবনকাল ভোগ করলাম আর বার্ধক্যে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিলাম। এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী তিলাওয়াত করলেন: "নিশ্চয়ই সদকা কেবল ফকির ও মিসকিনদের জন্য।" (আত-তাওবা: ৬০)। সুতরাং ফকিরগণ হলো মুসলিম এবং এই ব্যক্তি আহলে কিতাবের মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত।

এটি ছিল অনুদান বিভাগ (দিওয়ানুল আতা) যা উমর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অনুমোদন দিয়েছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এতে মুসলিম প্রজাদের এবং আহলে কিতাব ও অনারবদের মধ্য থেকে কিছু হকদারের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের জন্য স্থায়ী অনুদান ও ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

গ. রাজস্ব বিভাগ, বা খারাজ ও জিজিয়া:
এটি এমন একটি বিভাগ যেখানে মুসলিমদের সম্পদের জাকাত এবং বিজিত ভূমি ও ইসলাম গ্রহণ না করা ব্যক্তিদের ওপর ধার্যকৃত খারাজ ও জিজিয়া থেকে রাষ্ট্রের তহবিলে আসা অর্থ লিপিবদ্ধ করা হতো।

চতুর্দশ পাঠ

উমর (রা.)-এর শাসনামলে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চল এবং পারস্যের অধিকাংশ প্রদেশ বিজিত হয়। এর পাশাপাশি মিশর এবং আফ্রিকার রোমান প্রদেশগুলোও বিজিত হয়েছিল। সিরিয়া থেকে আবু উবাইদাহ এবং তাঁর পূর্বে ইরাক থেকে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস উমর (রা.)-এর নিকট ভূমি বণ্টন, গণিমত ও ফায় সম্পর্কে পত্র লেখেন। তবে উমর (রা.)—মদিনার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার পর—বিজিত ভূমিগুলো সেগুলোর মালিকদের হাতেই রেখে দেন এবং তাদের ওপর 'খারাজ' বা ভূমি কর ধার্য করেন। এছাড়া তিনি তাদের ওপর মাথাপিছু কর হিসেবে 'জিযিয়া'ও ধার্য করেন। এটিই 'দিওয়ান' (দপ্তর) প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ছিল, যা পরবর্তীতে বাইতুল মালের আয়ের একটি প্রধান উৎসে পরিণত হয়।

২. বাধ্যতামূলক সৈন্য নিয়োগ:

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুসংগঠিত করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইসলামী সেনাবাহিনী গঠন এবং তিনি সৈন্য নিয়োগকে বাধ্যতামূলক করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সেনাবাহিনী এভাবে সুসংগঠিত ছিল না। যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ও সাহাবীদের যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন জিহাদের আহ্বান ছিল তাদের জন্য যারা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ

করতে চাইতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিতে সাহাবীদের কাউকে সৈন্য হিসেবে যোগ দিতে বাধ্য করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কাউকে বাধ্য করেননি, বরং তিনি কেবল মুমিনদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল তাদেরই যুদ্ধক্ষেত্রে সাথে নিতেন যারা সন্তুষ্টচিত্তে ও স্বেচ্ছায় অগ্রসর হতো। কোনো বিলম্বকারী বা পিছুটান দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বলতেন: "তাকে ছেড়ে দাও; যদি তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে, তবে আল্লাহ অচিরেই তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি বিষয়টি অন্যরকম হয়, তবে আল্লাহ তোমাদের তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" তিনি প্রায়ই যুদ্ধের আগে মুমিনদের বলতেন: "জিহাদে আগ্রহী নয় এমন কেউ আমাদের সাথে বের হবে না।"

পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন এবং মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করল, তখন মুমিনদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের জন্য একটি বিশেষ দল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক রূপ নেয়নি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম হিসেবেই অব্যাহত ছিল।

৬৯১

শারয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

সম্ভবত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে সৈন্য সংগ্রহের (নিয়োগ) চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক ব্যক্তিকে একদল লোকের ওপর আমীর নিযুক্ত করতেন, যদিও তাদের মধ্যে তাঁর চেয়েও উত্তম লোক উপস্থিত থাকত। এর কারণ ছিল তিনি (মনোনীত ব্যক্তি) ছিলেন অধিক সজাগ এবং যুদ্ধবিগ্রহের বিষয়ে অধিকতর দূরদর্শী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে পরিচালিত যুদ্ধগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজয়ের অন্যতম রহস্য হিসেবে হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের ঝটিকা অভিযানের নেতৃত্বে তাঁর এই নির্বাচনের বিষয়টি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি।

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রয়োজনে মানুষকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি আগ্রহীদের সমবেত করতেন এবং যারা বিরত থাকত তাদের ওপর কোনো জবরদস্তি করতেন না।

কিন্তু আরব উপদ্বীপের প্রান্তীয় অঞ্চলসমূহ এবং এর নিকটবর্তী সভ্য রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সৈন্য সংগ্রহ পদ্ধতির প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেন, যাতে উৎসাহ প্রদান এবং কঠোরতা—উভয়ই বিদ্যমান ছিল। উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে আরব উপদ্বীপের অনুর্বরতা ও রুক্ষতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং ইরাক বিজয়ের পূর্ণতায় তাদের জন্য যে 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) অপেক্ষা করছে তা উল্লেখ করতেন। কারণ হিজাজ তাদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অগ্রগতির ভূমি ছিল না।

আর কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনের দিকটি হলো—উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের আদেশ প্রদান করেছিলেন যেন তারা প্রত্যেক সাহসী যোদ্ধা, বিজ্ঞ সমর-বিশারদ, অশ্বারোহী কিংবা অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে উপস্থিত করেন। যদি কেউ স্বেচ্ছায় আসে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে যেন অবশ্যই সমবেত করে ধরে আনা হয়।

অর্থাৎ: তিনি তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন যুদ্ধে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমর সরঞ্জামাদিসহ উপস্থিত করা হয়, এমনকি তারা

রাজি না থাকলেও। তিনি তার সুবিদিত দৃঢ়তার সাথে তাদের তাগিদ দিয়ে বলতেন: "কাউকেও বাকি রাখবে না, বরং সবাইকে আমার নিকট পাঠাও। জলদি করো, জলদি করো।" অর্থাৎ তিনি এ বিষয়ে দ্রুততা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মূলত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জিহাদের জন্য নির্ধারিত বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের কথা চিন্তা করছিলেন। কেবল স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। যখন 'দিওয়ান' (রাষ্ট্রীয় দপ্তর) নথিবদ্ধ করা হলো এবং মুসলমানদের জন্য বার্ষিক ভাতার ব্যবস্থা করা হলো, তখন তাঁর এই চিন্তা বাস্তবায়িত হতে শুরু করল...

অস্তিত্ব লাভ করল; ফলে দিওয়ান (দপ্তর) প্রতিষ্ঠার সাথে আনুষ্ঠানিক নিয়মিত সৈন্য নিয়োগের প্রক্রিয়াটি যুক্ত হলো এবং নিয়মিত সৈন্যদের জন্য মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে তাদের অনুদান ও বেতন নির্ধারিত করা হলো।

সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে উমর যে সকল সাংগঠনিক পদ্ধতি যোগ করেছিলেন তার অন্যতম দিক হলো, তিনি এর কিছু মূলনীতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে গ্রহণ করে তাতে কিছু পরিমার্জন করেছিলেন। আবার কিছু পদ্ধতি পারস্য ও রোম থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তা ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।

উমর 'নকীব' ও 'আরিফ' পদমর্যাদা ব্যবহার করেছিলেন। উমরের এই বিধানে 'আরাফাহ' সাধারণ জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করত, যেন তারা বেসামরিক নাগরিক; অন্যদিকে 'তআমীর' ও 'তাবিয়াহ' সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করত, যারা ছিল সামরিক বাহিনীর সদস্য।

এটি ছিল উমরের আমলের সামরিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। উমরের যুগে 'আরিফ' তার গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করত, অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে 'আরিফ' দশজন সৈন্যের প্রতিনিধিত্ব করত।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ ইঙ্গিত করে যে, উমরের যুগে ইসলামী সেনাবাহিনীতে পঞ্চাশজন সৈন্যের প্রধানের জন্য 'খলিফা', একশত জনের জন্য 'কায়েদ', এক হাজার জনের জন্য 'আমিরুল কুরদুস' এবং দশ হাজার বা তার অধিক সৈন্যের প্রধানের জন্য 'আমিরুল জাইশ' পদমর্যাদা নির্ধারিত ছিল।

উমর মদিনায় সৈন্য পাঠানোর পূর্বে প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিবির স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেই সৈন্যদের প্রশিক্ষণের তদারকি করতেন, বিশেষ করে মদিনার নিকটবর্তী 'হিমা' নামক স্থানে অশ্বারোহীদের প্রশিক্ষণ। সেখানে তিনি—যদি বলা সঠিক হয়—সামরিক কুচকাওয়াজ বা যুদ্ধ মহড়া প্রত্যক্ষ করতেন। এই দৈনন্দিন প্রশিক্ষণে তাঁর সাথে উটের চিকিৎসায় দক্ষ ব্যক্তিরা থাকতেন, যাতে তারা তাদের রোগবালাই ও চিকিৎসার তদারকি করতে পারেন।

তিনি কুফার সেনাবাহিনীর ঘোড়াগুলোর দায়িত্বে সালমান ইবনে রাবিয়া আল-বাহিলিকে নিযুক্ত করেছিলেন। ঘোড়ার সেবা ও সে বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার কারণে মানুষ তাঁকে 'সালমানুল খাইল' (ঘোড়ার সালমান) বলে ডাকত। উমর বিভিন্ন দুর্গ ও সেনাশিবির নির্মাণ করেছিলেন।

সৈনিকদের পথের মাঝে বিশ্রামের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা, যেহেতু তারা ঘোড়া ও উটের পিঠে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত এবং খেজুর পাতার তৈরি কুঁড়েঘর ছাড়া অন্য কোথাও বিশ্রাম নিতে পারত না।

অতঃপর তিনি তাঁর সৈন্যদের জন্য শহর নির্মাণ করলেন যাতে তারা বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে দূরে বসবাস করতে পারে। শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সামরিক ছাউনি স্থাপন করা হলো। এরপর তিনি তাদের জন্য 'দিওয়ানুল জুন্দ' (সৈন্যবিভাগ) লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের জন্য স্থায়ী জীবিকার (ভাতা) ব্যবস্থা করেন। এটি ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম এবং উমরের শ্রেষ্ঠ অর্জনসমূহের একটি, যা একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩. বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এর উদ্ভব:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বাইতুল মালের খুব একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল না; কারণ জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত), জাকাত এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় উদীয়মান রাষ্ট্রের নিকট আসত এবং তা তৎক্ষণাৎ সেই সব হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন: "নিশ্চয়ই সদকা (জাকাত) হচ্ছে কেবল ফকীর, মিসকীন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [আত-তাওবাহ: ৬০]। এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে: "তোমরা জেনে রাখো যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণিমত লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য..." [আল-আনফাল: ৪১]।

আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর মতোই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন। উমরের খেলাফতের প্রথম যুগেও বিষয়টি এভাবেই চলছিল। তবে বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার ফলে 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ের অন্য এক অধিকতর প্রাচুর্যময় ও স্থায়ী উৎস উন্মুক্ত হয়; তা হলো 'খারাজ' (ভূমি রাজস্ব) এবং 'জিজিয়া'-এর উৎস।

পারস্য বিজয় সম্পন্ন হওয়ার আগে এবং মিশর বিজয় শুরু হওয়ার আগেই এই সম্পদ ও আয়ের প্রাচুর্য এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, খলিফা উমর উদীয়মান রাষ্ট্রের জন্য একটি আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তা করতে শুরু করেন। ফলে উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

চতুর্দশ পাঠ

তাঁর দীর্ঘ শাসনকাল এবং তাঁর খেলাফতকালে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য পারস্য, সিরিয়া ও মিশর বিজয় করে দেওয়ার ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের বিষয়াবলি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, এর চাহিদাসমূহ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয় এবং এর রাষ্ট্রীয় কোষাগার বৃদ্ধি পায়।

একই সময়ে এই উদীয়মান রাষ্ট্রটি বিজিত দেশগুলোর প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সংস্পর্শে আসে। এটি উমর (রা.)-কে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য এবং রাষ্ট্রকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে এই দেশগুলোর বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়ে সচেতন করে তোলে।

এভাবেই উমর (রা.) পূর্বে উল্লেখিত দিওয়ানসমূহ (দপ্তরসমূহ) প্রতিষ্ঠা করেন। উমর (রা.)-এর জন্য বাইতুল মাল (রাজকোষ) প্রতিষ্ঠা করা, এর ভিত্তি স্থাপন করা এবং একে উন্নত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তিনি বিচারক ও গভর্নরদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, সৈন্যদের সুবিন্যস্ত করেছিলেন এবং আমরা যেমনটি দেখেছি যে, তিনি সামরিক বাহিনীকে একটি স্থায়ী পেশায় পরিণত করেছিলেন। সৈন্যরা সীমান্ত এলাকায় পাহারায় নিয়োজিত থাকত। তাদের জন্য ছিল 'দিওয়ানুল জুন্দ' (সৈন্য দপ্তর), যেখানে তাদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের জন্য নিয়মিত বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি মুসলিমদের জন্য 'আতা' বা নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং তাদের জন্য ছিল 'দিওয়ানুল আতা'। এছাড়া খিরাজ ও জিজিয়া সংগ্রহের জন্য তিনি 'দিওয়ানুল জিবায়াহ' (রাজস্ব দপ্তর) প্রতিষ্ঠা করেন। উমর (রা.)-এর এই নিয়মিত বৃত্তি প্রদান এবং তাঁর সৈন্য ও কর্মকর্তাদের বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি তাঁকে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায়; যাতে তিনি তাঁর দায়বদ্ধতা পূর্ণ করতে পারেন। ফলে এই সঞ্চিত অর্থ এবং হকদারদের তালিকা সংরক্ষণের জন্য তাঁর একটি বাইতুল মালের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং বাইতুল মাল রাষ্ট্রের সকল প্রকার অর্থসম্পদ যেমন—জাকাত, খিরাজ, জিজিয়া, ফায় এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের তদারকিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বাইতুল মালকে 'দিওয়ান আল-সামি' (উচ্চতর দপ্তর) বা 'দিওয়ানুল আমওয়াল' (অর্থ দপ্তর) বলা হয়। এটিই হলো সকল দিওয়ানের মূল এবং কেন্দ্রস্থল। এর কাজ হলো বাইতুল মালের সকল পাওনা বা আয়কে তার প্রকারভেদে যেমন—নগদ অর্থ, শস্য এবং গবাদিপশু হিসেবে নথিবদ্ধ করা। তেমনিভাবে বাইতুল মাল থেকে প্রদেয় অর্থ যেমন—সেনাবাহিনীর রসদ, বিচারকদের বেতন, প্রয়োজনীয় অস্ত্রের মূল্য এবং জনস্বার্থে ব্যয়িত অন্যান্য খরচসমূহও এতে নথিভুক্ত করা হয়।

ইসলামি শরিয়াহ তার বিধিবিধানের মাধ্যমে ইসলামে আর্থিক বিষয়াবলি সুসংগঠিত করার সুযোগ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ, গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ এবং ফায়-এর বর্ণনা দিয়েছেন, আর তিনি নীরব থেকেছেন...

চতুর্দশ পাঠ

অন্যান্য ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা, যা তিনি শাসকবর্গের ইজতিহাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন; কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য যে অংশটি নির্ধারিত ছিল, তা তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

এটি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক প্রবর্তিত বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখেছি কীভাবে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

মুআল্লাফাতুল কুলুব (যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য) এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য বরাদ্দকৃত দান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি শাসকদের জন্য এই বিষয়গুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেন।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ এবং 'ফাই' ইসলামি শরীআতের বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতেন। আর এ ছাড়া অবশিষ্ট অর্থ বায়তুল মালে জমা রাখতেন যা অন্যান্য ব্যয়ভার এবং সারা বছরের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য যথেষ্ট হতো। এভাবেই বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম অর্থ মন্ত্রণালয় হিসেবে গণ্য হয়।

কর্মকর্তাদের ওপর উমর ইবনুল খাত্তাবের নজরদারি:

গভর্নর ও কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিজস্ব কিছু পদ্ধতি ছিল। ব্যাপক প্রকাশ্য ও গোপন পরীক্ষার মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে এবং যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তিনি কাউকে গভর্নর বা কর্মকর্তা নিয়োগ দিতেন না।

তিনি তাদের ওপর এই শর্ত আরোপ করতেন যে, মানুষের প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা যেন নিজেদের দরজা বন্ধ না রাখে। এছাড়া তিনি এমন কাউকে কোনো পদের দায়িত্ব দিতেন না যে নিজে তা চেয়ে নিত। এ বিষয়ে তিনি বলতেন: "যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব চাইবে তাকে এ কাজে সাহায্য করা হবে না," অর্থাৎ তাকে সেই পদে নিযুক্ত করা হবে না। তিনি এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করেছিলেন; কেননা তিনি কোনো পদপ্রার্থীকে বলেছিলেন: "আমরা আমাদের কাজে এমন ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করি না যে তা প্রার্থনা করে।"

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন কাউকেও নিয়োগ দিতেন না যার হৃদয়ে দয়া নেই। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে তাকে নিয়োগ প্রদানের জন্য একটি চুক্তিপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। যখন লেখক তা লিখছিলেন, তখন একটি ছোট শিশু এসে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কোলে বসে পড়ল এবং তিনি তাকে আদর করতে লাগলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলল: "হে আমিরুল মুমিনিন, আমার এমন দশটি সন্তান রয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ কখনো আমার এতো কাছে আসেনি।" উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন তবে তাতে আমার কী দোষ? আল্লাহ কেবল তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।" অতঃপর তিনি বললেন: "চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলো; কেননা যে ব্যক্তি তার নিজের সন্তানদের প্রতি দয়া করে না, সে প্রজাদের প্রতি কীভাবে দয়া করবে?"

উমর (রা.) তাঁর কর্মকর্তাদের ও গভর্নরদের সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেন ও চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করতেন, তারা বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা। বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আল-হারিস বিন কাব বিন ওয়াহাব নামক এক কর্মকর্তার মাঝে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখা গেল। উমর (রা.) তাকে তার সম্পদের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন: "আমি আমার কিছু অর্থ নিয়ে বের হয়েছিলাম এবং তা দিয়ে ব্যবসা করেছি।" উমর (রা.) বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যবসা করার জন্য পাঠাইনি।" অতঃপর তিনি তার অর্জিত মুনাফা থেকে (অতিরিক্ত অংশ) গ্রহণ করলেন।

উমর (রা.) তাঁর নিকটাত্মীয়দের কাউকে কোনো পদে নিযুক্ত করতেন না। তিনি তাঁর শাসনভার গ্রহণের শুরু থেকেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হলো, অতঃপর সে কারো প্রতি ভালোবাসা বা আত্মীয়তার খাতিরে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ দিল, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সাথে খিয়ানত করল।"

উমর (রা.) এই পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি জনগণের সামনে গভর্নরদের প্রতি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছিলেন: "আমি আমার আমানত এবং আমি যে অবস্থায় আছি সে সম্পর্কে দায়বদ্ধ। আল্লাহ চাহেন তো আমার সামনে যা উপস্থিত হয় সে সম্পর্কে আমি অবগত। আর আমানতদারদের সাহায্য ছাড়া এর বাইরের কোনো কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" অর্থাৎ: আমি আমার কাজের জন্য আপনাদের মধ্যকার বিশ্বস্ত এবং ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে—এমনকি তারা দূরে থাকলেও—নিয়োগ দেই না।

তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁর নীতি পুনর্ব্যক্ত করে বলতেন: "হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের নিকট কর্মকর্তাদের তোমাদের শরীরে প্রহার করার জন্য বা তোমাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্য পাঠাইনি। বরং আমি তাদের পাঠিয়েছি তোমাদের দ্বীন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সুতরাং যার সাথে এর ব্যতিক্রম কিছু করা হবে, সে যেন তা আমার কাছে উত্থাপন করে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে উমরের প্রাণ রয়েছে, আমি অবশ্যই তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।"

তিনি জনগণের সামনে তাঁর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন: "জেনে রেখো! আমি তোমাদেরকে শাসক বা অত্যাচারী হিসেবে পাঠাইনি, বরং আমি তোমাদেরকে হিদায়াতের ইমাম হিসেবে পাঠিয়েছি যেন তোমাদের অনুসরণ করে মানুষ সঠিক পথ পায়। সুতরাং মুসলিমদের প্রাপ্য অধিকার তাদের প্রদান করো, তাদের প্রহার করো না যে তারা লাঞ্ছিত হবে, তাদের অধিকার বঞ্চিত করো না যে তারা ফিতনায় পতিত হবে, তাদের সামনে নিজেদের দরজা বন্ধ করে দিও না যেন তাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের গ্রাস করতে পারে, এবং তাদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য দিও না যে তাদের ওপর জুলুম করা হয়। যদি তোমরা দেখ যে তারা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তবে তাদের থেকে বিরত থাকো।"

৬৯৭

চতুর্দশ পাঠ

...তা; কারণ তা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অধিকতর কার্যকর। হে লোকসকল! আমি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের উপর তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদেরকে কেবল একারণেই পাঠিয়েছি যাতে তারা মানুষকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, তাদের মাঝে তাদের ‘ফায়’ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টন করে এবং তাদের মধ্যে ফয়সালা করে। এরপর যদি তাদের কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়, তবে যেন তারা তা আমার কাছে পেশ করে।

ওমর তাঁর কর্মকর্তাদের এবং সেনাবাহিনী ও জনপদের প্রধানদের জন্য খাবারের প্রয়োজন এবং জীবন ধারণের মান অনুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করতেন; যাতে তাদের কারও কোনো ওজর না থাকে এবং তারা যেন অনাহক অন্যের পাওনা সম্পদের দিকে হাত না বাড়ায়।

নিশ্চয়ই ওমর শাসনের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ও মুসলমানদের বিষয়াদি তদারকিতে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তিদের নির্বাচন করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো চাপ বা প্রলোভনের বশবর্তী হতেন না। তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের জন্য জবাবদিহিতার এমন পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন, যা দেখে মনে হতো তিনি যেখানেই থাকুন না কেন সর্বদা তাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি তাদের ওপর পরিদর্শক ও গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন, যারা নিয়মিত সংবাদ পৌঁছে দিত।

তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের সাথে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তার মধ্যে একটি হলো—নিয়োগের সময় তিনি গভর্নরদের সম্পদের হিসাব নিতেন। অর্থাৎ, কর্মকর্তাদের নিয়োগের পূর্বের সম্পদের হিসাব নিতেন যাতে নিয়োগের পর তাদের সম্পদের যে পরিমাণ বৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত সীমার বাইরে, তার হিসাব নিতে পারেন। তাদের মধ্যে কেউ যদি ব্যবসার অজুহাত দিত, তবে তিনি তার সেই দাবি গ্রহণ

করতেন না এবং তাদের বলতেন: "আমি তোমাদেরকে শাসক হিসেবে পাঠিয়েছি, ব্যবসায়ী হিসেবে পাঠাইনি।"

ওমর তাঁর কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন সূক্ষ্ম উপায়ের ওপর নির্ভর করতেন। এর মধ্যে একটি ছিল, তিনি তাদের আশেপাশে পরিদর্শক ও গোয়েন্দা মোতায়েন করতেন যারা তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করত। এমনকি বড় বা ছোট সব স্তরের গভর্নরই তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষটির ব্যাপারেও ভীত থাকতেন যে, সে হয়তো খলিফার কাছে তাঁর সংবাদ পৌঁছে দেবে। ওমর তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু দূত পাঠাতেন যারা অভিযোগকারীদের অভিযোগ সংগ্রহ করত এবং তদন্ত ও পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করত; যাতে পরিদর্শক ও গোয়েন্দাদের দেয়া তথ্যের পূর্ণাঙ্গ যাচাই সম্পন্ন হয়।

আরেকটি পদ্ধতি ছিল, তিনি গভর্নর ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতেন যে, তারা যখন দায়িত্ব পালন শেষে নিজ এলাকায় ফিরবে তখন যেন দিনের বেলা প্রবেশ করে; যাতে তাদের সাথে করে আনা জিনিসপত্রগুলো প্রকাশ পায় এবং রাস্তার সংযোগস্থলে নিযুক্ত প্রহরী ও পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে তাদের সংবাদ পৌঁছে যায়।

৬৯৮

পৃষ্ঠা 99

আস-সিয়াসাহ আশ-শরঈয়াহ

চতুর্দশ পাঠ

উমর (রা.) কেবল তার কর্মচারীদের উত্তম নির্বাচনের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকতেন না, বরং তিনি তাদের পর্যবেক্ষণেও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করতেন; যাতে তিনি তাদের সুন্দর আচরণের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারেন এবং তাদের চরিত্রে বিচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা দূর হয়। তার মূলমন্ত্র ছিল: "জালিমকে দিনের এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমতায় রাখার চেয়ে প্রতিদিন একজন গভর্নরকে বরখাস্ত করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

তিনি বলতেন: "আমার কোনো কর্মচারী যদি কারো ওপর জুলুম করে আর সেই জুলুমের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছানো সত্ত্বেও আমি তা পরিবর্তন না করি, তবে আমিই তার ওপর জুলুম করলাম।" একদিন তিনি তার উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন: "তোমরা কি মনে করো, আমি যদি তোমাদের ওপর এমন কাউকে নিযুক্ত করি যাকে আমি সবচেয়ে ভালো হিসেবে জানি এবং তাকে ইনসাফের নির্দেশ দেই, তবে কি আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলাম?" তারা বলল: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ না আমি তার কর্মের প্রতি লক্ষ্য করি যে, সে আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছে নাকি করেনি।" তিনি আরও বলেন: "কোনো জাতিকে সংশোধন করার জন্য সবচেয়ে সহজ বিষয় হলো তাদের এক আমিরের পরিবর্তে অন্য একজনকে আমির হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।"

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) কুফায় তার বসবাসের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বাজারগুলো তার বাড়ির খুব কাছে ছিল। বাজারের শোরগোল সাদকে কষ্ট দিত, তাই তিনি একটি দরজা তৈরি করলেন যা বাজারের মানুষের আওয়াজ তার নিকট পৌঁছাতে বাধা দিত। উমর (রা.)-এর নিকট সাদের বাড়ি ও তার দরজা সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছাল এবং এ খবরও পৌঁছাল যে মানুষ একে 'সাদের প্রাসাদ' বলে অভিহিত করছে। তখন তিনি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহকে ডেকে কুফায় পাঠালেন এবং তাকে বললেন: "তুমি সেই প্রাসাদের দিকে যাও এবং তার দরজাটি জ্বালিয়ে দাও, অতঃপর দ্রুত ফিরে এসো।" তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে কুফায় পৌঁছলেন এবং কাঠ ক্রয় করে প্রাসাদে গিয়ে তার দরজাটি জ্বালিয়ে দিলেন। অর্থাৎ সেই দরজা যা প্রজাদের থেকে আমির বা গভর্নরকে আড়াল করে রাখত।

তিনি বিপথগামী গভর্নরদের জন্য কিছু প্রকাশ্য শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। উমর (রা.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, হিমসের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে কুরাত একটি উচ্চ কক্ষ (অলিইয়াহ) তৈরি করেছেন যেখানে তিনি মানুষের থেকে নিজেকে আড়ালে রাখেন। উমর (রা.) তার নিকট একজন দূত পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি কাঠ সংগ্রহ করে সেই কক্ষের দরজা জ্বালিয়ে দেন। দূত

যখন হিমসে পৌঁছলেন, তখন তিনি কাঠ সংগ্রহ করে কক্ষের দরজাটি জ্বালিয়ে দিলেন। লোকজন গভর্নরের নিকট গিয়ে তাকে সংবাদটি দিলে তিনি বললেন: "তাকে তার কাজ করতে দাও, কেননা সে আমিরুল মুমিনিনের দূত।" অতঃপর দূত তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং তাকে প্রদান করলেন...

চতুর্দশ পাঠ

তিনি কিতাবটি হাত থেকে নামাননি যতক্ষণ না সওয়ার হয়েছেন। উমর (রা.) যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন: "তাকে আমার নিকট হতে দূরে তিন দিন রোদে আটকে রাখো।" এটি ছিল সেই গভর্নরের জন্য এক প্রকাশ্য শাস্তি, যে জনগণের তুলনায় নিজেকে উচ্চমর্যাদাবান জাহির করতে চেয়েছিল এবং তাদের সামনে নিজের দ্বার রুদ্ধ রাখতে চেয়েছিল।

জনগণ তার কাছে সমান ছিল। এজন্যই উমরের কাছে এক মুসলিম ব্যক্তির অভিযোগ পৌঁছল যে, বসরার গভর্নর আবু মুসা আল-আশআরি তাকে তার পাওনার কিছু অংশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আবু মুসা তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করেন এবং তার মাথা মুণ্ডন করে দেন। ফলে আমাদের নেতা উমর সেই ব্যক্তিকে আবু মুসা আল-আশআরির নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার প্রদান করেন।

উমর (রা.) সন্দেহের উদ্রেক হলেই সতর্কতাস্বরূপ পদচ্যুত করার নীতি অনুসরণ করতেন। ইরাকের একটি গোষ্ঠী মহান সাহাবী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে, তিনি সুষম বণ্টন করেন না এবং যুদ্ধে ইনসাফ করেন না। ফলে তিনি তাকে পদচ্যুত করেন। অনুরূপভাবে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু মুসা আল-আশআরি, মুসান্না বিন হারিসা এবং অন্যদেরকেও কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা কিসাসের কারণ ছাড়াই পদচ্যুত করেছিলেন; বরং নিছক সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টির কারণে তিনি এমনটি করেছিলেন।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্দেহাতীত থাকা ছিল তার সিদ্ধান্ত। উমরের নীতি ছিল এই যে, যদি মুসলমানদের সম্পদে কোনো অসাধু হস্তক্ষেপের সন্দেহ প্রমাণিত হতো, তবে তিনি অর্জিত সেই সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতেন যা যুক্তিসঙ্গত আয়ের অতিরিক্ত হতো। তিনি এর অর্ধেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য রেখে দিতেন এবং বাকি অর্ধেক বায়তুল মালে অন্তর্ভুক্ত করতেন। এটি পদচ্যুতি বা শাস্তির অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হতো।

তার একটি বিশেষ দপ্তর ছিল যা গোয়েন্দা সংস্থার সদৃশ। প্রশাসনে উমরের পদ্ধতি ছিল কর্মচারীকে স্থানীয় বিষয়াবলিতে স্বাধীনতা প্রদান করা, তবে নীতিগত বিষয়ে এবং তার আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা।

গভর্নর ও প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তার একটি গোপন সংস্থা ছিল। ঐতিহাসিক উৎসসমূহ আমাদের নিকট এটি স্পষ্ট করে যে, বর্তমানে যা গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে পরিচিত, উমরের যুগেও তার সদৃশ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

কেউ কেউ বলেন: "উমর (রা.) থেকে দূরে অবস্থিত কর্মচারীদের সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল ঠিক তেমন, যেমনটি ছিল একই বিছানায় ও একই বালিশে তার সাথে রাত কাটানো ব্যক্তি সম্পর্কে। কোনো ভূখণ্ড বা অঞ্চলে এমন কোনো কর্মচারী বা সেনাপতি ছিলেন না, যার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য একজন পরিদর্শক নিয়োজিত ছিল না। ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকদের কথাবার্তা সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পৌঁছে যেত।"

আমরা যা আলোচনা করেছি তার আলোকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, উমর (রা.) তার কর্মচারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই নীতি মুসলিমদের সম্পদ থেকে প্রাদেশিক কর্মচারীরা যাতে অনৈতিকভাবে কিছু গ্রহণ না করে, সে বিষয়ে তার গভীর আগ্রহের প্রতিফলন ঘটায়। যখনই তিনি এ ধরনের কিছুর আভাস পেতেন, তখন তিনি তাদের সম্পদের অর্ধেক অংশ সরকারি কোষাগারে নিয়ে নিতেন, যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

হজ্জের মৌসুমে যখন প্রজারা হিজাজে আসত, তখন উমর (রা.) তাদের কাছে তার নিযুক্ত গভর্নরদের অবস্থা এবং তাদের সাথে তাদের আচরণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। তারা যখন ভালো বলত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন: "গভর্নর কি তোমাদের অসুস্থদের দেখতে যান?" তারা বলত: "হ্যাঁ।" তিনি বলতেন: "তিনি কি ক্রীতদাসের খোঁজখবর নেন?" তারা বলত: "হ্যাঁ।" তিনি জিজ্ঞেস করতেন: "দুর্বলদের সাথে তার আচরণ কেমন? তিনি কি তার দরজায় (মানুষের জন্য) বসেন?" যদি তারা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটির ক্ষেত্রে "না" বলত, তবে তিনি তাকে বরখাস্ত করতেন।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন: "উমর (রা.) হজ্জের মৌসুমকে প্রজাদের সামনে গভর্নরদের জবাবদিহিতার জন্য একটি বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের মতে, উমর (রা.) এখানে শাসন ও প্রশাসনের শৈল্পিক চূড়ায় পৌঁছেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা হজ্জকে ঈমানের অন্যতম রুকন হিসেবে মুসলিমদের ওপর ফরজ করেছেন, যা সামর্থ্যবানরা তাদের বহুবিধ কল্যাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করার জন্য পালন করে। এটি এমন একটি মৌসুম যেখানে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলিমরা একত্রিত হয়।"

উমর (রা.)-এর এটি এক প্রকৃত প্রতিভা এবং মৌলিক দূরদর্শিতা ছিল যে, তিনি এই সুযোগটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন; যাতে করে তিনি নিজে সেই সব প্রজাদের খবর নিতে পারেন যারা সরাসরি তার কাছে পৌঁছাতে পারে না। তার সম্পূর্ণ খিলাফতকাল জুড়েই তিনি প্রতি বছর মক্কায় প্রাদেশিক গভর্নরদের একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান করার এই রীতি বজায় রেখেছিলেন। সেখানে তিনি শাসক এবং শাসিতদের সাথে মুখোমুখি হতেন, তাদের সকলের কথা শুনতেন এবং শাসনের আমানত পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিতেন।

চতুর্দশ পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

উমাইয়া যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী খোলাফায়ে রাশেদীনের পুরো শাসনকাল জুড়ে প্রশাসনিক কাঠামোর সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে বজায় ছিল। এটি ছিল সেই সঠিক মানদণ্ড, যার প্রতি মানুষ প্রাদেশিক গভর্নরদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের জীবনরীতি মূল্যায়নের জন্য প্রত্যাবর্তন করত।

উসমান ইবনে আফফানের খিলাফতের শেষ সময় থেকে এই মানদণ্ডটি প্রবল অস্থিরতার সম্মুখীন হতে শুরু করে। কারণ, সেই সময়ে বনু উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তারা রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে খলিফার সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়। এই কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; কারণ তারা উমর ইবনুল খাত্তাব তাদের জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, তাতে বিশৃঙ্খলা অনুভব করেছিল।

উসমান ইবনে আফফানের শাসনের শেষভাগে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদেশগুলোতে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল—যা 'ফিতনা' নামে পরিচিতি পায়—তা ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যকার গভীর সম্পর্ক এবং একে অপরের ওপর উভয়ের প্রভাবের মাত্রাকে উন্মোচিত করে দেয়।

সুতরাং যখন প্রশাসনিক শৃঙ্খলার রজ্জু শিথিল হয়ে গেল, তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিও বিনষ্ট হলো। খলিফা উসমান ইবনে আফফানকে রাষ্ট্রের এই প্রশাসনিক অস্থিরতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে মূল্য দিতে হয়েছিল। নতুন খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব পরিস্থিতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হননি; কারণ তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শৃঙ্খলাকে সুসংহত করতে পারেননি। এই খলিফার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উসমান ইবনে আফফানের নিয়োগকৃত সকল কর্মচারীকে পদচ্যুত করা, যাদের মধ্যে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা তিনি তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে বিরাজমান ফিতনার কারণ হিসেবে গণ্য করতেন।

তিনি অন্য একদল ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসেবে মনোনীত করে ইসলামী প্রদেশসমূহের প্রধান কেন্দ্রগুলোতে প্রেরণ করেন। তবে সিরিয়া (শাম) প্রদেশে তিনি যে প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেখানে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন; কারণ সেখানে তাঁকে প্রতিহত করা হয়েছিল...

চতুর্দশ পাঠ

মুয়াবিয়ার কাছে সেনাবাহিনী ছিল এবং এর মাধ্যমে আলী ইবনে আবি তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। এটি সেই বিরোধ যা উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

উত্তরাধিকারমূলক খেলাফত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য একটি নতুন প্রশাসনিক বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল, যার ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান গ্রহণ করেন। এই প্রথম উমাইয়া খলিফা প্রমাণ

করেছিলেন যে, তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যখন তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার উপায় হিসেবে প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তারে সচেষ্ট হন, তখন থেকেই মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের কর্মকাণ্ডগুলো বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং এমন সব ঐতিহ্যে পরিণত হয়, যা উমাইয়া রাজবংশের পরবর্তী খলিফারা অনুসরণ করেছিলেন।

বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনিক নীতি ও এর প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনকারী একটি দলকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে নির্বাচন ও প্রস্তুত করা। তিনি এই প্রশাসনিক দলের ভিত্তি হিসেবে কেবল যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেননি, বরং এর সদস্যরা যেন তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হয় অথবা তারা উমাইয়া বংশের সাথে বৈষয়িক বন্ধন বা রাষ্ট্রের নতুন প্রয়োজনে স্বার্থের দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকে—সেই বিষয়টিকেও আবশ্যক মনে করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে সফল হতে মুয়াবিয়াকে তিনটি বিষয় সহায়তা করেছিল:

প্রথমত: ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা বা দায়িত্ব পালন।

দ্বিতীয়ত: যে পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন।

তৃতীয়ত: খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে বিরাজমান নতুন পরিবর্তন ও ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন।

চতুর্দশ পাঠ
শরয়ি রাজনীতি

মুয়াবিয়া যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের জন্য লোকবল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার একটি বিশেষ প্রভাব ছিল। এটি ছিল গভীর আস্থা ও সুদৃঢ় জানাশোনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। তিনি ছিলেন মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের পুত্র এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যাঁর ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা। মক্কার বড় বড় পরিবারগুলোর সাথে তাঁর যেমন নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তেমনি হিজাজের শহরগুলো ও তার বাইরের এলাকা সম্পর্কেও ছিল গভীর জানাশোনা।

ফলে মুয়াবিয়া তাঁর অভিজ্ঞ পিতার কাছে শাসন ও পরিচালনার মূলনীতিগুলো এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, যেভাবে মক্কাবাসীরা তা বুঝতেন। এটি ছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে যার ওপর আবু সুফিয়ান আস্থাশীল ছিলেন; বিশেষ করে লোকবল গঠন, দল ও অনুসারী তৈরি এবং কর্মকর্তা ও কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে।

মুয়াবিয়া তাঁর নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের জন্য সাকিফ গোত্রের লোকদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। মুয়াবিয়ার শাসনামলে বনু সাকিফ গোত্র থেকে মুগীরা ইবনে শুবা খ্যাতি লাভ করেন, যিনি কুফার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া যিয়াদ ইবনে আবিহি বসরার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। এই দু'জন ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন। তাঁরা নতুন এই ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন ও তা সুসংহত করার ক্ষেত্রে মুয়াবিয়ার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন।

পরিশেষে, মুয়াবিয়া তাঁর প্রশাসনের এই স্তরকে বিস্তৃত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একদল লোক দ্বারা শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তিদের বেছে নিয়েছিলেন যাদের নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কাজে লাগানো সম্ভব

ছিল। এর ফলে মুয়াবিয়ার প্রশাসনের মাধ্যমে এক নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তাদের উদ্ভব ঘটে, যা বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের অভ্যন্তরে এবং সেখানে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করেছিল।

এই দলটি কুরাইশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের নিয়ে গঠিত ছিল, যাদের নিয়ে উমাইয়ারা কোনো ধরনের বিপত্তি বা ক্ষতির আশঙ্কা করত না। ফলে দূরবর্তী এলাকা কিংবা ফিতনা ও অস্থিরতায় জর্জরিত প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে তাদের ওপর নির্ভর করা সম্ভব হয়েছিল।

পৃষ্ঠা 105

শরয়ী রাজনীতি
চতুর্দশ পাঠ

মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবং তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে কোনো সম্ভাব্য বিচ্যুতি রোধ করতে আরও দুটি নীতিমালা নির্ধারণ করেছিলেন।

প্রথম নীতিটি ছিল প্রদেশের আর্থিক প্রশাসনকে আমীরের (গভর্নর) অধীনতা থেকে পৃথক করা এবং একে সরাসরি দামেস্কের খিলাফতের অনুগত করা। এই প্রশাসনের প্রধান 'সাহিবুল খারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন, যিনি একটি শক্তিশালী অবস্থানে পরিণত হয়েছিলেন; প্রদেশের আমীর তাকে প্রতিটি কাজে গুরুত্ব দিতেন, বিশেষ করে যেহেতু সমস্ত আর্থিক বিষয়াদি তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিল।

তবে এই নীতি মেনে চলা সর্বদা বাধ্যতামূলক ছিল না; কারণ উমাইয়ারা তাঁদের এমন কিছু গভর্নরের কাছে আর্থিক বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যাঁরা তাঁদের পূর্ণ উৎসর্গ ও একনিষ্ঠতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, অথবা তাঁদের পক্ষ থেকে 'সাহিবুল খারাজ' নিয়োগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ফলে সেই গভর্নরগণ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁরা উমাইয়াদের বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুস্থতার প্রতি আস্থার এক উৎকৃষ্ট মডেলে পরিণত হন।

উমাইয়ারা যে দ্বিতীয় নীতিটি নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল প্রদেশসমূহ পরিচালনার জন্য এমন কিছু কর্মচারী নিয়োগ করা, যাঁদের কাজ ছিল সরাসরি খিলাফতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রদেশে যা কিছু ঘটছে—চাই তা আমীর সংক্রান্ত হোক বা সাধারণ জনগণ সংক্রান্ত—সে সম্পর্কে খিলাফতকে পূর্ণ অবহিত রাখা। তবে এই নীতিটি প্রদেশের আমীরদের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না, বরং এটি ছিল দিকনির্দেশনায় অংশগ্রহণের একটি মাধ্যম যা তাঁদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করত এবং আমীরদের নিজেদের অগোচরে থাকা সম্ভাব্য ভুলত্রুটিগুলো এড়াতে সাহায্য করত।

কেননা উমাইয়ারা প্রদেশের আমীরদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দামেস্কে অবস্থানরত খলিফার তুলনায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিই বিষয়াবলির প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে এবং প্রজাদের স্বার্থের কোনো ক্ষতি না করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অধিক সক্ষম। বনু উমাইয়া খলিফাগণ প্রদেশের আমীরদের ভোগ করা এই স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বিশেষ করে সেই সকল খলিফা যাঁরা জনকল্যাণের প্রতি অত্যন্ত প্রখর আগ্রহের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

চতুর্দশ পাঠ

এর একটি উদাহরণ হলো খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার জন্য পঞ্চম খিলাফায়ে রাশেদিন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনায় উমর ইবনুল খাত্তাবের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই খলিফা উমাইয়া রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি গভর্নরদের (আমিরদের) কর্মস্বাধীনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তাঁদের প্রত্যেককে নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা দেন। বিশেষ করে এমন সব বিষয়ে খলিফার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় না থেকে পদক্ষেপ নিতে বলেন, যেগুলোতে বিলম্ব হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মুসলিম ফকিহগণ প্রদেশগুলোর এই ধরণের বিকেন্দ্রীকৃত শাসনরীতিকে ‘ইমারতে ইস্তিকফা’ (যোগ্যতাভিত্তিক প্রশাসন) হিসেবে অভিহিত করেছেন। খলিফা তাঁর মনোনীত অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে এই শাসনভার ন্যস্ত করতেন এবং তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামগ্রিক জনবল ও বিষয়াবলির ওপর সাধারণ তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতেন।

পরবর্তীতে ‘ইমারতে ইস্তিকফা’ একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত মর্যাদায় পরিণত হয়, যা খলিফা কেবল অসামান্য দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অথবা রাষ্ট্রের প্রতি বড় ধরণের অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রদান করতেন। খলিফা তাঁদের কোনো এক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কয়েকটি এলাকা জুড়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতেন। অর্থাৎ, তিনি অন্যদের পরিবর্তে এই একদল যোগ্য লোকের মাধ্যমেই প্রশাসনিক প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলের সকল ক্ষমতা তাঁদের হাতেই অর্পণ করতেন। তাঁরা অর্থসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিচারকার্য সম্পাদন এবং জনগণের ইমামতি ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতেন।

এই বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিন্যাসে এমন পরিবর্তনের দাবি রাখত, যা উমাইয়াদের জন্য রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তির ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। একই সাথে এটি সর্বত্র তাঁদের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রভাব বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেয়।

খলিফা উসমানের শাসনামলের ফিতনার পর থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভূখণ্ডে শাসনতান্ত্রিক যে বিবর্তন ঘটেছিল এবং এর সাথে সাথে মানুষের মতাদর্শ ও ঝোঁক-প্রবণতার যে বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই প্রশাসনিক বিভাজনটি সামনে এসেছিল।

চতুর্দশ পাঠ

অতঃপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে উমাইয়ারা যে সকল বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা ইসলামী রাষ্ট্রে বিশাল ভূখণ্ড যুক্ত করেছিল। এই সুবিশাল রাষ্ট্রের সাথে প্রশাসনিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য সেগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা অপরিহার্য ছিল যা প্রশাসনিক সংহতি নিশ্চিত করে। উমাইয়ারা তাদের রাষ্ট্রকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন; সেগুলো হলো: শাম প্রদেশ, অতঃপর আরব ভূখণ্ড প্রদেশ, অতঃপর ইরাক প্রদেশ, অতঃপর জাজিরা প্রদেশ এবং পরিশেষে মিশর প্রদেশ।

এর মাধ্যমে আমরা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামোর আলোচনা শেষ করলাম, যেখানে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের প্রশাসন, আবু বকর (রা.)-এর যুগের প্রশাসন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগের প্রশাসন এবং উমাইয়া আমলের প্রশাসনের বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

৭০৭

পৃষ্ঠা 108

""

পৃষ্ঠা 109

শরয়ী রাজনীতি

পঞ্চদশ পাঠ

মন্ত্রণালয়, অন্যদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক এবং চুক্তিসমূহ

পাঠের উপাদানসমূহ

প্রথম উপাদান : ইসলামি রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয় ৭১১

দ্বিতীয় উপাদান : ইসলামি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ৭২৬

তৃতীয় উপাদান : ইসলামে চুক্তিসমূহ ৭৭৫

৭০৯

পৃষ্ঠা 110

""

পৃষ্ঠা 111

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

পঞ্চদশ পাঠ

ইসলামি রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয়

ইসলামি রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয় সম্পর্কে ভূমিকা:

মাওয়ার্দি খলিফার প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথমত: সাধারণ কার্যাবলিতে সাধারণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; আর তারা হলেন উজির বা মন্ত্রীগণ।
দ্বিতীয়ত: বিশেষ কার্যাবলিতে সাধারণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; তারা হলেন প্রদেশসমূহের আমির বা গভর্নরগণ।
তৃতীয়ত: সাধারণ কার্যাবলিতে বিশেষ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; যেমন—প্রধান বিচারপতি।
চতুর্থত: বিশেষ কার্যাবলিতে বিশেষ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; যেমন—কোনো নির্দিষ্ট শহর বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিচারক (কাযি)।

প্রতিনিধিদের দায়িত্বাবলি:

এই সকল প্রতিনিধিদের দায়িত্বাবলি ছিল নিম্নরূপ:
প্রথমত: মন্ত্রণালয় (উজিরাত)।
দ্বিতীয়ত: প্রদেশসমূহের শাসনভার (ইমারাতুল আকালিম)।

নিম্নে আমরা মন্ত্রণালয় এবং প্রদেশসমূহের শাসনভার সম্পর্কে আলোকপাত করব:

প্রথমত: মন্ত্রণালয়:

আধুনিক রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয়কে নির্বাহী ক্ষমতার অন্যতম প্রধান বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; বরং যখনই নির্বাহী বিভাগ বা

ক্ষমতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তা মূলত সেই মন্ত্রণালয়ের প্রতিই নির্দেশ করে যার উপর বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে...

আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ

আইনসভা থেকে জারি করা আইনসমূহ; সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান একজন যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন। কখনো রাষ্ট্রপ্রধান নিজেই এই গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ফলে তিনি নিজেই প্রধান উজির বা মন্ত্রীসভার প্রধান হিসেবে গণ্য হন। সাধারণত উজির বা মন্ত্রীদের তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা ও বিশেষত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ বা সংস্থার জন্য একজন করে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, যিনি সেই বিভাগের বিষয়াবলী পরিচালনা করেন এবং মন্ত্রীসভার প্রধানের কাছে সে ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকেন। শরয়ী রাজনৈতিক ফিকহশাস্ত্রের আলেমগণ মন্ত্রণালয় বা উজিরাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আল-মাওয়ারদী এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা নিচে এ বিষয়ে আলেমদের কিছু আলোচনা তুলে ধরব।

মন্ত্রণালয়ের (উজিরাত) অর্থ:

মন্ত্রণালয় বা 'উজিরাত' শব্দটি 'অযর' ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। 'অযর' শব্দের অর্থ হলো আশ্রয়স্থল। মহান আল্লাহর বাণীও এই অর্থ নির্দেশ করে: "কখনো নয়, কোনো আশ্রয় নেই।" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১১]। আবার 'অযর' অর্থ ভারী বোঝাও হতে পারে। এখান থেকেই বলা হয়: উজির হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বাদশাহর পক্ষ থেকে তার ভারী বোঝা বা দায়িত্ব বহন করেন এবং নিজের পরামর্শের মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করেন। কোনো কাজে 'ওয়াযারা' করার অর্থ হলো সে কাজে সাহায্য করা এবং শক্তিশালী করা; এর মূল শব্দ হলো 'আযারা'। খলিফার উজির মানে এমন ব্যক্তি যার মতামতের ওপর তিনি নিজ কার্যাবলীতে নির্ভর করেন এবং যার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানের সহযোগীকে 'উজির' বলা হয় কারণ তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনার যে গুরুভার তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তা সুলতানের পক্ষ থেকে বহন করেন।

ইমাম আল-মাওয়ারদী তার 'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উজিরাত শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এটি 'অযর' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো ভারী বোঝা; কারণ তিনি রাজার পক্ষ থেকে তার গুরুভারসমূহ বহন করেন।

দ্বিতীয়ত: এটি 'অযর' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো আশ্রয়স্থল। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "কখনো নয়, কোনো আশ্রয় নেই", অর্থাৎ কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ তার প্রজ্ঞা ও সাহায্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

তৃতীয়ত: এটি 'আজর' (পিঠ বা শক্তি) শব্দ থেকে গৃহীত; কেননা রাজা তার উজিরের মাধ্যমে শক্তিশালী হন, যেমন শরীর পিঠের মাধ্যমে শক্তি লাভ করে।

আল-মাওয়ার্দীর বক্তব্য থেকে যা অনুধাবন করা যায় তা হলো, মন্ত্রিত্ব (উজারাহ) খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। কেননা উজির তাকে অর্পিত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি পরিচালনায় নিজ পরামর্শের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করেন। এর কারণ হলো, রাষ্ট্রপ্রধান স্বভাবগতভাবেই কোনো সাহায্যকারী ব্যতীত এককভাবে শাসনের বিবিধ গুরুভার বহন করতে সক্ষম নন। তাই উজির গ্রহণ করার বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ উজির নিযুক্ত করার বৈধতার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "আর অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দান করেছি এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে উজির হিসেবে নিযুক্ত করেছি।" [সূরা আল-ফুরকান: ৩৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন উজির নিযুক্ত করুন। আমার ভাই হারুনকে; তার মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন।" [সূরা ত্বহা: ২৯-৩২]

সুতরাং উজির হলেন সাহায্যকারী; কারণ তিনি সুলতানের বোঝা (উজর) অর্থাৎ তার গুরুভার বহন করেন। মুসা (আলাইহিস সালাম) তার প্রতিপালকের নিকট যে উজির প্রার্থনা করেছিলেন, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আল-মাওয়ার্দী বলেন: "যদি নবুয়তের ক্ষেত্রে এটি বৈধ হয়, তবে নেতৃত্বের (ইমারত) ক্ষেত্রে এটি আরও অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ উম্মাহর পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমামের ওপর যা অর্পিত হয়েছে, প্রতিনিধি নিয়োগ ব্যতীত তার একার পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। পরিচালনায় অংশীদার হিসেবে উজিরের প্রতিনিধিত্ব করা ইমামের একাকী কাজ করার চেয়ে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিক সঠিক। এর মাধ্যমে তিনি নিজের কাজে শক্তি লাভ করেন এবং ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে অধিক সুরক্ষিত থাকেন।"

পবিত্র সুন্নাহর মধ্যেও উজির নিযুক্ত করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ যখন কোনো আমিরের মঙ্গল চান, তখন তার জন্য একজন সত্যনিষ্ঠ উজিরের ব্যবস্থা করেন; যদি আমির (কোনো ভালো কাজ) ভুলে যান তবে তিনি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন, আর যদি তার স্মরণে থাকে তবে তিনি তাকে সাহায্য করেন। আর আল্লাহ যখন তার জন্য অকল্যাণ চান, তখন তাকে একজন মন্দ উজির দান করেন; আমির ভুলে গেলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না, আর আমিরের মনে থাকলেও সে তাকে সাহায্য করে না।"

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহুম)-এর নিকট উজিরের পদটি সাহায্যকারী হিসেবেই পরিচিত ও স্বীকৃত ছিল। এই কারণেই সাকিফাহর দিনে আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছিলেন যখন আনসারগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) বলেছিল: "আমাদের মধ্য থেকে একজন আমির..."

পঞ্চদশ পাঠ

তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমির তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "বরং আমরা হলাম আমির (নেতা) আর তোমরা হলে উজির (মন্ত্রী)।" অর্থাৎ: আমরা হলাম শাসক এবং তোমরা শাসনের বোঝা বহনে আমাদের সহযোগিতা করবে এবং কাজসমূহ সুচারুভাবে পালনে আমাদের সাহায্য করবে।

মন্ত্রিত্বের ধারণাটি এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে, এটি বর্তমানে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য এমন এক অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে যা বর্জন করা সম্ভব নয়। উমাইয়া খলিফাগণ এই ব্যবস্থা গ্রহণের রীতি চালু করেন। মুআবিয়া আমর ইবনুল আস এবং যিয়াদ ইবনে আবিহিকে উজির হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। একইভাবে আব্বাসীয় খলিফাগণও উজিরদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণের রীতি বজায় রাখেন। বরং আব্বাসীয় শাসনামলে মন্ত্রিত্বের নিয়ম-কানুন ও মূলনীতিসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে উজিরের ভূমিকা কেবল শাসককে সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রকৃত অংশীদারে পরিণত হন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন; যেমন— রাজনীতি, যুদ্ধ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা, খিলাফত এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ।

মন্ত্রিত্বের প্রকারভেদ:

ফকিহগণ ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে দুই ধরনের মন্ত্রিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো: ক্ষমতা অর্পণমূলক মন্ত্রিত্ব এবং বাস্তবায়নমূলক মন্ত্রিত্ব। এই দুই প্রকার মন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রে মন্ত্রীর ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ, তাঁর মধ্যে যেসব শর্ত থাকা আবশ্যক এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামের সাথে তাঁদের উভয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আমরা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. ক্ষমতা অর্পণমূলক মন্ত্রিত্ব:

ক্ষমতা অর্পণমূলক মন্ত্রিত্ব বলতে বোঝায়: খলিফা বা ইমাম অভিজ্ঞ ও দক্ষ কোনো ব্যক্তির ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করবেন যে, তিনি খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের এমন কোনো বিষয়ের দায়িত্ব পালন করবেন যেখানে তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সুতরাং এই মনোনীত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ (বিচক্ষণতা) অনুযায়ী যা উপযুক্ত মনে করবেন সেই অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করবেন। ক্ষমতা অর্পণমূলক মন্ত্রীর কর্তৃত্ব সাধারণ প্রতিনিধিত্বের সমতুল্য; কেননা তাঁকে অর্পিত বিষয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয় যাতে তিনি উক্ত বিষয়ে পুনরায় তাঁর নিকট ফিরে না গিয়েই...

খলিফা; এই বিষয়ে ইমাম মাওয়ার্দি বলেন: ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় (ওয়াজারাতে তাফউইদ) হলো ইমামের এমন কাউকে উজির নিযুক্ত করা, যার কাছে তিনি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনা এবং স্বীয় ইজতিহাদ অনুসারে তা বাস্তবায়নের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন।

সারকথা হলো, অর্পিত বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজিরের (ওয়াজিরুত তাফউইদ) ক্ষমতা হলো ইমামের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর কর্মপরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, এমনকি রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার দিক থেকে তাঁকে খলিফার পর দ্বিতীয় অবস্থানে বিবেচনা করা হয়।

এক্ষেত্রে কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার শর্ত ব্যতীত খলিফা বা ইমামের জন্য যা যা শর্ত রয়েছে, 'ওয়াজিরুত তাফউইদ'-এর জন্যও

সেসব শর্ত প্রযোজ্য হবে—ইমাম মাওয়ার্দি এই মত পোষণ করেছেন। অপরদিকে হাম্বলী ফকিহ আবু ইয়া'লা আল-ফাররা এর বিপরীত মত প্রদান করেছেন। তিনি কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই 'ওয়াজিরুত তাফউইদ'-এর জন্য খলিফার শর্তগুলোকেই অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং বলেছেন: এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ইমামতের শর্তগুলোই ধর্তব্য হবে।

এই বিষয়ে আমরা শাফেয়ী ইমাম মাওয়ার্দির বক্তব্য গ্রহণ করাকে প্রাধান্য দেই, যিনি কুরাইশ বংশের শর্তটি থেকে 'ওয়াজিরুত তাফউইদ'-কে ব্যতিক্রম রেখেছেন। কারণ, কুরাইশ বংশের শর্ত সংক্রান্ত দলীলসমূহ বিশেষভাবে ইমামের ক্ষেত্রেই এসেছে, তাই অন্য কাউকে এর সাথে তুলনা করা যাবে না। সাকিফার দিনে আবু বকর (রা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "আমরা আমির এবং আপনারা উজির"। তাছাড়া কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে মন্ত্রণালয়কে কেবল কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলে তা স্বৈরাচার ও জুলুমের পথ প্রশস্ত করবে, যা থেকে মহান শরীয়ত সতর্ক করেছে এবং তা করতে নিষেধ করেছে।

ইমাম মাওয়ার্দি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন: এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে কেবল বংশীয় পরিচয় ব্যতীত ইমামতের সকল শর্তই বিবেচিত হবে। যেহেতু তিনি নিজস্ব মতামতের বাস্তবায়নকারী এবং ইজতিহাদ প্রয়োগকারী, তাই তাঁর মধ্যে মুজতাহিদের গুণাবলি থাকা আবশ্যক। ফলে ইমামতের শর্তগুলোর অতিরিক্ত তাঁর জন্য আরও একটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হলো: তাঁকে অর্পিত দায়িত্ব তথা যুদ্ধ পরিচালনা এবং খরাজ (রাজস্ব) আদায়ের বিষয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ হতে হবে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ তিনি কখনো সরাসরি এগুলো পরিচালনা করেন, আবার কখনো অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে দক্ষ না হলে দক্ষ কাউকে প্রতিনিধি বানাতে পারবেন না, তেমনি নিজের জ্ঞানের অভাব থাকলে সরাসরি পরিচালনা করতেও সক্ষম হবেন না। এই শর্তটির ওপরই মন্ত্রণালয়ের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল হয়।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ

উযিরে তাফবীদ (ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী)-এর গুণাবলি:

যিনি মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করবেন, তাঁর মধ্যে কিছু আচরণগত ও চারিত্রিক গুণাবলি থাকা আবশ্যক। এটি ইমাম বা খলীফার শর্তাবলি নিয়ে পূর্বে আমরা যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তার অতিরিক্ত। জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা আল-মামুন ইবনে হারুনুর রশীদ উযীরের গুণাবলি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন: "আমি আমার কার্যাবলীর জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে সন্ধান করছি যিনি কল্যাণের সকল গুণের সমাহার হবেন; যাঁর চরিত্রে থাকবে পবিত্রতা, যাঁর কর্মপন্থা হবে ঋজু, যাঁকে আদব ও শিষ্টাচার মার্জিত করেছে, ঘটনাপ্রবাহ যাঁকে অভিজ্ঞ করেছে এবং নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁকে সুদৃঢ় করেছে। যদি তাঁকে কোনো গোপন বিষয়ের আমানতদার বানানো হয় তবে তিনি তা রক্ষা করেন, আর যদি তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তিনি তা সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। ধৈর্য তাঁকে নীরব রাখে এবং জ্ঞান তাঁকে কথা বলায়। সামান্য ইঙ্গিতই তাঁর জন্য যথেষ্ট এবং মুহূর্তের অবলোকনই তাঁকে অভাবমুক্ত করে। তাঁর মধ্যে থাকবে আমীরদের প্রতাপ এবং জ্ঞানীদের ধীরস্থিরতা।" ইত্যাদি।

যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, উযীরের পদের গুরুত্বের কারণে এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁর ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা ও সুষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকতে হবে। যাতে তাঁর মধ্যে এমন কোনো প্রকাশ্য দুর্বলতা না থাকে যার মাধ্যমে তাঁকে পরাস্ত করা যায়; এর ফলে উম্মাহর সেই স্বার্থগুলো যেন নষ্ট না হয় যা তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

উযিরে তাফবীদের এখতিয়ারসমূহ:

সাধারণ নিয়ম হলো উযিরে তাফবীদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামের যে ক্ষমতা থাকে, তাঁরও সেই ক্ষমতা রয়েছে। তিনি গভর্নরদের নিযুক্ত ও অপসারিত করতে পারেন। তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কিংবা জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

তিনি নিজের পক্ষ থেকে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। তিনি যেসব বিষয় তদারকি করেন তা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করতে পারেন এবং জুলুম-নিপীড়ন বিষয়ক মামলাগুলো দেখতে পারেন। এই সকল বিষয় ইমামের জন্য যেমন বৈধ, উযিরে তাফবীদের জন্যও তেমন বৈধ। তবে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা খলীফার অধিকারে থাকলেও উযিরে তাফবীদ তাঁর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকারী হন না। ফকীহগণ এই বিষয়গুলোকে তিনটি ভাগে গণ্য করেছেন: উত্তরাধিকারী মনোনয়ন (বিলায়াতুল আহদ); এটি কেবল খলীফার অধিকার। আমরা ইতিপূর্বে যে শর্তাবলি উল্লেখ করেছি, সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে পারেন। উযিরে তাফবীদের ক্ষমতা যতই নিরঙ্কুশ হোক না কেন, তাঁর এই অধিকার নেই; যেন উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইমামের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা না হয়।

পৃষ্ঠা 117

যেসব বিষয় খলিফার জন্য নির্দিষ্ট কিন্তু উযীরে তাফবীযের (ক্ষমতাপ্রাপ্ত উযীর) জন্য প্রযোজ্য নয়, তার মধ্যে একটি হলো: খিলাফত থেকে অব্যহতি চাওয়া। সুতরাং ইমামের জন্য উম্মতের নিকট ইমামত থেকে অব্যহতি চাওয়া—অর্থাৎ পদত্যাগপত্র পেশ করা—বৈধ। কিন্তু উযীরে তাফবীযের জন্য তা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে, ইমামের অধিকার রয়েছে উযীরে তাফবীয কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার, কিন্তু উযীরের কোনো অধিকার নেই ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার। কারণ ইমামই হলেন মূল শাসক এবং তাঁর কর্তৃত্বই রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ। এ প্রসঙ্গে আবু ইয়ালা আল-ফাররা বলেন: উযীরে তাফবীযের ওপর আবশ্যক হলো তিনি যে সকল নিয়োগ দান করবেন বা দায়িত্ব অর্পণ করবেন সে সম্পর্কে ইমামকে অবহিত করা; যাতে তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ইমামের সমতুল্য না হয়ে যান। আর ইমামের কর্তব্য হলো উযীরের কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করা, যাতে তিনি সঠিক কাজগুলোকে অনুমোদন দিতে পারেন এবং ভুলগুলো সংশোধন করতে পারেন; কারণ উম্মতের তদারকি ও ইজতিহাদ তাঁর (ইমামের) ওপরই ন্যস্ত।

উক্ত উযীরের জন্য নিজে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং কাউকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা জায়েয, যেমনটি ইমামের জন্য জায়েয; কেননা বিচারের যোগ্যতাসম্পন্ন শর্তাবলি তাঁর মাঝে বিদ্যমান। তিনি নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং অন্যকে সেনাপতি নিযুক্ত করতে পারেন; কারণ জিহাদের নেতৃত্ব দানের শর্তাবলি তাঁর মাঝে পূর্ণ রয়েছে। তিনি জুলুম-নিপীড়ন (মাযালিম) সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং এ বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন; কারণ মাযালিম সংক্রান্ত শর্তাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তদুপরি, তিনি যে সকল বিষয় তদারকি করছেন তা নিজে পরিচালনা করতে পারেন অথবা তা বাস্তবায়নে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন; কারণ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক দক্ষতার শর্তাবলি তাঁর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম মাওয়ারদী উযীরে তাফবীযের ক্ষমতা থেকে উপরে উল্লেখিত তিনটি বিষয়কে ব্যতিক্রম গণ্য করার পর বলেন: এই তিনটি বিষয় ব্যতিরেকে অন্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণের বিধান অনুযায়ী তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তা কার্যকর করা বৈধ। তবে যদি ইমাম তাঁর কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন, তবে তা যদি যথাযথভাবে সম্পাদিত কোনো বিচারবিভাগীয় রায় হয় কিংবা সঠিক খাতে ব্যয়কৃত কোনো সম্পদ হয়, তবে উযীরের ইজতিহাদলব্ধ ফয়সালা বাতিল করা যাবে না এবং তাঁর সিদ্ধান্তে ব্যয়িত সম্পদ ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু বিষয়টি যদি কোনো কর্মকর্তা নিয়োগ, বাহিনী গঠন কিংবা যুদ্ধ পরিচালনার কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে ইমামের জন্য তাঁর বিরোধিতা করা জায়েয। এক্ষেত্রে তিনি নিযুক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং বাহিনীকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী স্থানে সরিয়ে নিতে পারেন এবং যুদ্ধের কৌশলকে অধিকতর উত্তম উপায়ে পরিচালনা করতে পারেন। কেননা ইমামের নিজের কৃত কাজই যেখানে পুনর্বিবেচনা করা যায়, সেখানে উযীরের কৃত কাজের ভুল সংশোধন করা অধিকতর সমীচীন ও অগ্রাধিকারযোগ্য।

পঞ্চদশ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

সম্ভবত আল-মাওয়ার্দী যা উল্লেখ করেছেন তা আমাদের কাছে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী 'ওয়াযিরে তাফবীদ' (প্রতিনিধি মন্ত্রী) এবং ইমামের মধ্যকার সম্পর্ককে স্পষ্ট করে দেয়—এই বিবেচনায় যে ইমাম হলেন সর্বোচ্চ প্রধান ও প্রথম শাসক এবং তাঁর কর্তৃত্বই অগ্রগণ্য। আর তা হলো, যখন মুসলিম উম্মাহর বিষয়াবলি পরিচালনা এবং তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধি মন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের সাথে ইমামের কর্মকাণ্ডের বিরোধ দেখা দেয়, তখন এই বিষয়ে দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক:

প্রথম অবস্থা: যদি প্রতিনিধি মন্ত্রী আর্থিক বা বিচারিক বিষয় সংক্রান্ত কোনো নির্দেশ জারি করেন, যেমন: কোনো নির্দিষ্ট খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ দেন অথবা কারো হক বা পাওনা তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তবে এই অবস্থায় তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ইমামের সেই সিদ্ধান্তের ওপর আপত্তি করার কোনো অধিকার থাকবে না, যদিও তা তাঁর নিজের মতের বিরোধী হয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে জারিকৃত গবেষণালব্ধ (ইজতিহাদি) সিদ্ধান্ত হয় এবং তা আল্লাহর কিতাব কিংবা তাঁর রাসূলের সুন্নাহর কোনো অকাট্য দলিলের (নস) পরিপন্থী না হয়, তবে ইমামের ইজতিহাদের বিরোধী হওয়ার কারণে তা বাতিল করা বৈধ নয়। কারণ, উসূলে ফিকহ বা মূলনীতির সুপরিচিত নিয়ম অনুযায়ী—'এক ইজতিহাদ অন্য ইজতিহাদ দ্বারা ভুল প্রমাণিত বা বাতিল হয় না' ।

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি প্রতিনিধি মন্ত্রীর পক্ষ থেকে জারিকৃত সিদ্ধান্তগুলো গভর্নর নিয়োগ বা বরখাস্ত, শত্রুদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা অথবা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে রাজনৈতিক বা সামরিক চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত হয়—তবে এই অবস্থায় ইমামের জন্য মন্ত্রীর মতামতের ওপর আপত্তি জানানো জায়েয, যদি তা ইমামের মতের পরিপন্থী হয়। কারণ ইমামই হলেন প্রাথমিক ও মূল ক্ষমতার অধিকারী; তিনি যখন নিজের কাজেরই সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা করার অধিকার রাখেন, তখন তাঁর মন্ত্রীর কাজের সংশোধন করা তো আরও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য।

মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অর্পণ:

ইসলামি ব্যবস্থায় 'ওয়াযিরাতুত তাফবীদ' (প্রতিনিধি মন্ত্রিত্ব)—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যার ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর এখতিয়ার অনেকাংশে নিরঙ্কুশ। এর ওপর ভিত্তি করে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, এর জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের (ওয়ালিউল আমর) পক্ষ থেকে নিয়োগ বা দায়িত্ব অর্পণ প্রয়োজন, যা ইমাম এবং প্রতিনিধি মন্ত্রীর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটি অনেকটা বর্তমানে প্রচলিত 'মন্ত্রিসভা গঠন'-এর প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পঞ্চদশ পাঠ

এখন, যেহেতু মন্ত্রীকে তার মনোনয়ন সম্পর্কে এমন একটি পত্র বা বার্তার মাধ্যমে অবহিত করা হয় যা তাকে মনোনীত করেছে, ফলে মনোনীত মন্ত্রী এবং তাকে মনোনীতকারী পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়, চাই তিনি মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হোন বা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান।

আল-মাওয়ার্দী উল্লেখ করেছেন যে, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ পত্রে দুটি শর্ত থাকা আবশ্যক:

প্রথমত: তত্ত্বাবধানের ব্যাপকতা; কারণ এটাই হলো অর্পিত ক্ষমতার (তাফউইদ) প্রকৃতি। কেননা সাধারণত খলিফার যে সকল ক্ষমতা থাকে, মন্ত্রীরও সেই একই ক্ষমতা থাকে।

দ্বিতীয়ত: প্রতিনিধিত্ব; যেমন খলিফা মন্ত্রীকে বলবেন: "আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আমি আমার সকল দায়িত্ব পালনের ভার তোমার উপর অর্পণ করলাম" বা এই জাতীয় কিছু। কারণ অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রী (ওয়াজিরে তাফউইদ)-এর ক্ষমতা যদিও নিরঙ্কুশ, তবুও তিনি ইমামের অধিকার খর্ব করতে পারেন না এবং তাকে বাদ দিয়ে এককভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ পত্রটি, যা মন্ত্রী এবং যিনি তাকে মন্ত্রী বানিয়েছেন তাদের মধ্যে একটি চুক্তিস্বরূপ, তা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী এবং উম্মাহর মধ্যকার একটি চুক্তি। কারণ যে ইমাম তাকে মন্ত্রী বানাচ্ছেন, তিনি উম্মাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র। সুতরাং এটি একটি প্রতিনিধিত্বের (ওকালাহ) চুক্তি। ইমাম তাকে মনোনীত করলেও মন্ত্রী উম্মাহরই প্রতিনিধি। এই কারণেই তিনি নিজ পদে বহাল থাকেন এবং তাকে নিয়োগ দানকারী খলিফার মৃত্যুতে তার পদ বিলুপ্ত হয় না। যদি তিনি খলিফার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হতেন, তবে খলিফার মৃত্যুতে তিনি পদচ্যুত হতেন; কেননা প্রতিনিধি মূল ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। সুতরাং অর্পিত চুক্তির মাধ্যমে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তারা ইমামের সাথে সমান অবস্থানে থাকেন এই অর্থে যে, তারা সকলেই উম্মাহর অধিকার আদায়কারী। তারা সকলেই প্রশাসক এবং তাদের শাসন ক্ষমতার ধরন ইমামের শাসন ক্ষমতা থেকে ভিন্ন নয়, যদিও তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য থাকতে পারে। মূল কথা হলো, ইমাম সরাসরি উম্মাহর সাথে যুক্ত, আর অন্যান্য প্রশাসকগণ ইমামের মাধ্যমে যুক্ত। সুতরাং ইমাম হলেন তাদের এবং উম্মাহর মধ্যকার সংযোগসূত্র। প্রশাসনিক সুশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা, নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের তাগিদে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে তা ইমামের ব্যক্তিত্বে মূর্ত হয়। ফলে উম্মাহ তার মুখোমুখি হতে পারে, তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে এবং তার বিষয়ে পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যাই হোক, ইমামের উপস্থিতি অন্যান্য প্রশাসকদের আল্লাহর কাছে এবং উম্মাহর কাছে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয় না, সেইসাথে ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ইমামের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা তো বিদ্যমান থাকেই।

আল-মাওয়ার্দী (আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন: যদি ইমাম মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁর নিযুক্ত বিচারকগণ পদচ্যুত হন না। যদি খলিফার পক্ষ থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে খলিফার মৃত্যুতে তাঁরা পদচ্যুত হন না। আর যদি উজিরের পক্ষ থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে উজিরের মৃত্যুতে তাঁরা পদচ্যুত হয়ে যান; কারণ খলিফার নিয়োগ হলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক এবং উজিরের নিয়োগ হলো তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। এর মাধ্যমে মুসলিম ফকিহগণ শাসক ব্যক্তিবর্গের স্থায়িত্ব বা বিলুপ্তি নির্বিশেষে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতাকে একটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তবে প্রশ্ন হলো: একই রাষ্ট্র বা একই প্রদেশে কি একাধিক তাফউইদ (পূর্ণ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত) উজির থাকা বৈধ?

সম্ভবত এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে খলিফা বা ইমামের ক্ষমতার সাথে তাফউইদ উজিরের ক্ষমতার সাধারণ সংযোগ বা ব্যাপ্তির কারণে। আবু ইয়ালা আল-ফাররা তাঁর (আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ) গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন যার সারমর্ম হলো: সম্মিলিতভাবে দুইজন তাফউইদ উজির নিয়োগ করা বৈধ নয়, যেভাবে দুইজন ইমাম নিয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ চুক্তি সম্পাদন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়োগ প্রদান ও পদচ্যুতির ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যদি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত আরও অনেক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।" [আল-আম্বিয়া: ২২]। যদি দুইজন তাফউইদ উজির নিয়োগ করা হয়, তবে আমরা বিষয়টি বিবেচনা করব। যদি তাঁদের প্রত্যেককে সাধারণ তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি সে কারণে তা সঠিক হবে না। এরপর আমরা দেখব, যদি তাঁদেরকে একই সময়ে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে তাঁদের উভয়ের নিয়োগ বাতিল হবে। আর যদি তাঁদের একজন অন্যজনের আগে নিযুক্ত হন, তবে পূর্ববর্তী ব্যক্তির নিয়োগ সঠিক হবে এবং পরবর্তী ব্যক্তির নিয়োগ বাতিল হবে। আর যদি তাঁদের উভয়কে কোনো বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং কাউকেও এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে তা সঠিক হবে। সেক্ষেত্রে উজিরের দায়িত্ব তাঁদের উভয়ের ওপর ন্যস্ত হবে, কোনো একজনের ওপর নয়। তাঁরা যে বিষয়ে একমত হবেন তা কার্যকর করতে পারবেন, কিন্তু যে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করবেন তা কার্যকর করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে বিষয়টি খলিফার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে এবং তা এই উজিরের এখতিয়ারের বাইরে চলে যাবে। এক্ষেত্রে এই উজিরের দায়িত্ব এবং নিরঙ্কুশ তাফউইদ উজিরের দায়িত্বের মধ্যে দুটি পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা বা পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত: তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মিলিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছে সে বিষয়ে তাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটা। যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে একীভূত না করা হয়, বরং তাদের প্রত্যেককে এমন কোনো কাজে স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয় যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক কিন্তু কাজ বিশেষায়িত হবে—যেমন একজনকে প্রাচ্যের দেশসমূহের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া এবং অন্যজনকে প্রতীচ্যের দেশসমূহের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া; অথবা তাদের প্রত্যেককে এমন বিষয়ে বিশেষায়িত করা যেখানে কাজ ব্যাপক কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষায়িত—যেমন একজনকে যুদ্ধের মন্ত্রী এবং অন্যজনকে রাজস্বের (খরাজ) মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া; তবে উভয় পদ্ধতিতেই তাদের নিয়োগ বৈধ হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী (ওয়াজিরে তাফউইয) হবেন না, বরং তারা ভিন্ন ভিন্ন দুটি কাজের প্রশাসক (ওয়ালি) হিসেবে গণ্য হবেন। কারণ 'ওয়াজিরাতে তাফউইয' হলো তা-ই যা ব্যাপক এবং যেখানে প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি বিষয়ে মন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের নিয়োগ কেবল তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্যজনের দৃষ্টিভঙ্গি বা কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার থাকবে না।

আবু ইয়ালা যে মত পোষণ করেছেন তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি 'ওয়াজিরে তাফউইয'-এর ক্ষমতার নিরঙ্কুশতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে যাকে কোনো নির্দিষ্ট কাজে—যেমন যুদ্ধ বা রাজস্ব বা অনুরূপ কিছুতে—বিশেষায়িত করা হয়, তাকে তিনি প্রশাসক (ওয়ালি) বা আমিল (কর্মকর্তা) হিসেবে গণ্য করেন এবং তাকে মন্ত্রী (উজির) মনে করেন না। কারণ 'ওয়াজিরাতে তাফউইয'-এর বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি বিষয় ও প্রতিটি কাজে এর ব্যাপকতা থাকা। এই কারণেই 'ওয়াজিরাতে তাফউইয'-এ একাধিক ব্যক্তি থাকা বৈধ নয়, যাতে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। কারণ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট কাজ ছাড়াই রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার 'ওয়াজিরে তাফউইয'-এর রয়েছে। তবে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দুজন 'ওয়াজিরে তাফউইয' নিয়োগ করা বৈধ। এই পরিস্থিতিতে কেবল সেইসব বিষয়েই তাদের কথা গ্রহণ করা হবে যেগুলোতে তারা একমত হয়েছেন, যেগুলোতে তারা মতবিরোধ করেছেন সেগুলো নয়।

২. ওয়াজিরাতে তানফিজ (নির্বাহী মন্ত্রণালয়):
মুসলিম ফকিহদের নিকট 'ওয়াজিরাতে তানফিজ' হলো মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় প্রকার। এটি 'ওয়াজিরাতে তাফউইয'-এর চেয়ে মর্যাদায় নিম্নতর, কারণ এতে মন্ত্রী কোনো ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেন না। বরং তিনি কেবল খলিফার অনুমোদিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। তিনি খলিফার নিকট প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রজাদের সংবাদ পৌঁছে দেন এবং খলিফার নির্দেশনাগুলো গভর্নর, আমীর, বিচারক ও অন্যান্য প্রজাদের নিকট পৌঁছে দেন। এই কারণে তার জন্য আবশ্যক হলো...

পৃষ্ঠা 122

পঞ্চদশ পাঠ

কার্যনির্বাহী উজির যেন ইমামের (নেতার) স্থান থেকে অনুপস্থিত না থাকেন; কারণ অধিকাংশ উদ্ভূত বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। তিনি মূলত প্রজাসাধারণ এবং শাসকদের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী মাত্র। তাই তাঁর পদমর্যাদা — যেমনটি আল-মাওয়ারদী ব্যক্ত করেছেন — মধ্যস্থতা বা দূতিয়ালির মতো।

আল-মাওয়ারদী এই প্রসঙ্গে বলেন: পক্ষান্তরে কার্যনির্বাহী মন্ত্রণালয়ের বিধান অধিকতর শিথিল এবং এর শর্তাবলিও কম; কেননা এর ওপর নজরদারি করা ইমামের রায় ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। আর এই উজির ইমাম এবং প্রজাসাধারণ ও গভর্নরদের মধ্যে একটি যোগসূত্র। তিনি ইমাম যা আদেশ করেন তা পৌঁছে দেন, যা উল্লেখ করেন তা বাস্তবায়ন করেন, যা ফয়সালা করেন তা কার্যকর করেন এবং গভর্নর নিয়োগ ও সেনাবাহিনী প্রস্তুতির সংবাদ প্রদান করেন। তাঁর নিকট গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ও নতুন উদ্ভূত ঘটনাবলি পেশ করা হয় যেন তিনি সে বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে কাজ করতে পারেন। সুতরাং তিনি কার্য সম্পাদনে সাহায্যকারী মাত্র, এর অভিভাবক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নন। যদি তাঁকে মতামতে শরিক করা হয় তবে তাঁর নাম বিশেষভাবে ‘মন্ত্রণালয়’ (উজিরাত) হবে, আর যদি মতামতে শরিক না করা হয় তবে তাঁর অবস্থান মধ্যস্থতা ও দূতিয়ালির অধিক কাছাকাছি হবে। যেহেতু কার্যনির্বাহী উজির ইমাম ও প্রজাসাধারণের মাঝে নিছক এক মধ্যস্থতাকারী এবং তিনি স্বতন্ত্রভাবে কার্যাদি পরিচালনা করেন না, বরং প্রতিটি বিষয়ে তিনি আদিষ্ট মাত্র, সেহেতু এই মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য ক্ষমতা প্রদান বা নিয়োগপত্রের প্রয়োজন নেই, যেমনটি অর্পিত মন্ত্রণালয়ের (উজিরাতুত তাফবীজ) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বরং কেবল কার্য সম্পাদনে তাঁর অনুমতির ভিত্তিতেই এটি যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। যা-ই হোক, তাঁর দৃষ্টি কেবল খলিফার কাছে সংবাদ পৌঁছানো এবং তাঁর পক্ষ থেকে তা পৌঁছে দেওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ।

কার্যনির্বাহী উজিরের শর্তাবলি:

যেহেতু কার্যনির্বাহী উজির কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নন এবং তিনি কোনো একক কর্তৃত্বের অধিকারী নন, বরং কেবল কার্য বাস্তবায়নে অনুমতিপ্রাপ্ত মাত্র; তাই এটিই স্বাভাবিক যে তাঁর মধ্যে বিবেচ্য শর্তাবলি অর্পিত উজিরের শর্তাবলির তুলনায় কম হবে। এই কারণেই ফকীহগণ কার্যনির্বাহী উজিরের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একগুচ্ছ শর্ত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্য হতে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আমানতদারিতা: তাঁর মধ্যে আমানতদার বা বিশ্বস্ত হওয়ার শর্তারোপ করা হয় যেন অর্পিত আমানতের খেয়ানত না করেন এবং নসিহত বা পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রতারণা না করেন।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ

২. সত্যবাদিতা; যেন সে যা পৌঁছে দেয় তাতে তার সংবাদের ওপর আস্থা রাখা যায় এবং সে যা নির্দেশ করে সে অনুযায়ী কাজ করা যায়।

৩. লোভ-লালসা কম হওয়া; যেন সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বে ঘুষ গ্রহণ না করে এবং প্রতারিত হয়ে শিথিলতা প্রদর্শন না করে।

৪. সাধারণ মানুষের সাথে তার কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ না থাকা; কেননা শত্রুতা ন্যায়বিচার থেকে বিমুখ করে এবং সহমর্মিতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৫. প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া; অর্থাৎ খলিফার কাছে সংবাদ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এবং খলিফার পক্ষ থেকে সংবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে তার স্মরণ রাখা ও অনুধাবনের সামর্থ্য থাকা। কারণ সে খলিফার পক্ষে এবং খলিফার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী স্বরূপ।

৬. তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা; যেন কোনো বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট না থাকে যার ফলে সংশয় তৈরি হয় এবং কেউ যেন ধোঁকা দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

৭. কুপ্রবৃত্তির অনুসারী না হওয়া; নতুবা প্রবৃত্তি তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে মিথ্যার দিকে নিয়ে যাবে এবং তার নিকট সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি জ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে।

৮. প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা; যা সঠিক সিদ্ধান্ত এবং নির্ভুল ব্যবস্থাপনার পথ দেখায়। কেননা অভিজ্ঞতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে শাণিত করে এবং তাকে কর্মের পরিণাম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দান করে। তবে এই শর্তটি কেবল ‘উজিরুত তানফিজ’ (কার্যনির্বাহী মন্ত্রী)-এর ক্ষেত্রে তখনই প্রয়োজন, যদি খলিফা বা ইমাম তার সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করেন। আর যদি ইমাম তার সাথে পরামর্শ না করেন—যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে—তবে তার জন্য এর প্রয়োজন নেই। কারণ তখন তার মতামতের ওপর নির্ভর করা হয় না, বরং সকল বিষয় ইমামের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে।

৯. পুরুষ হওয়া; যাতে কোনো নারীর পক্ষে এই মন্ত্রিত্ব বা এ জাতীয় নেতৃত্বের মর্যাদা সম্পন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ না হয়। কেননা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সংবাদ দেওয়া হলো যে, পারস্য সম্রাট কিসরার কন্যা সে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে, তখন তিনি বলেছিলেন: “সেই জাতি কখনোই সফল হবে না, যারা তাদের বিষয়াবলির দায়িত্ব কোনো নারীর ওপর অর্পণ করে।”

ইমাম আল-মাওয়ার্দি এই প্রসঙ্গে বলেন: “আর কোনো নারীর পক্ষে এই দায়িত্ব—অর্থাৎ কার্যনির্বাহী মন্ত্রিত্ব—পালন করা বৈধ নয়, যদিও তার বর্ণিত সংবাদ গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ এতে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে যা নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এর কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: ‘সেই জাতি সফল হতে পারে না যারা তাদের বিষয়ের ভার কোনো নারীর ওপর ন্যস্ত করে।’ এবং যেহেতু এতে রয়েছে...”

পঞ্চদশ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (ইসলামি রাষ্ট্রনীতি)

মতামতের প্রজ্ঞা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা এমন বিষয় যাতে নারীরা দুর্বল হয়ে থাকে। এছাড়া জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে সরাসরি কার্যাদি সম্পাদন করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

পূর্বালোচনার ভিত্তিতে এটি স্থির হয়েছে যে, নারীর জন্য সাধারণভাবে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ নয়; কারণ এটি একটি কর্তৃত্বপূর্ণ পদ যার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প, সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা। সৃষ্টিগত স্বভাবের কারণে একজন নারী এ সকল গুণের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারেন। তবে সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর দাবি হলো জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে সরাসরি কাজ পরিচালনা করা। অথচ নারীর বৈশিষ্ট্য হলো তারা পর্দার অন্তরালে থাকবেন এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা করবেন না; বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন লজ্জাশীলতা কমে গেছে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

জিম্মি এবং নির্বাহী মন্ত্রণালয়:

একজন জিম্মি—যিনি অমুসলিম—তিনি কি নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন?

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা অর্পণকৃত মন্ত্রণালয়ের (ওয়াজাতুত তাফবীদ) চেয়ে নিম্নতর। এই কারণে কোনো কোনো ফকীহ—যাদের মধ্যে ইমাম আল-মাওয়ার্দীও রয়েছেন—ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি নাগরিকদের জন্য এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ বলে মনে করেন। অর্পণকৃত মন্ত্রণালয়ের বিপরীত এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা শর্ত নয়। কারণ, অর্পণকৃত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ দান করেন, বরখাস্ত করেন, সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন এবং বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) তদারকি করেন; যা নির্বাহী মন্ত্রীর কার্যাবলীর বিপরীত। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের উদারতার প্রমাণ দেয়। কেননা ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে তাদের ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করে না। সাধারণ নীতি হিসেবে জিম্মিদের অধিকার ও কর্তব্য আমাদের মতোই; যা ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান যুগের অতি উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীত। কারণ সেখানে আজও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের—এমনকি কখনো কখনো ভিন্ন মতাদর্শীদেরও—মন্ত্রণালয়ের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

আবার কিছু ফকীহ জিম্মিদের নিয়োগ দেওয়া বৈধ নয় বলে মত পোষণ করেছেন। তারা এর সপক্ষে মহান আল্লাহর এই বাণী পেশ করেছেন: "তোমাদের দ্বীন যারা অনুসরণ করে তারা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করো না।" [আলে ইমরান: ৭৩]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো ত্রুটি করবে না।"

"তারা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গেছে, আর তাদের অন্তর যা গোপন রাখে তা আরও অনেক বেশি বড়। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো।" (আলে ইমরান: ১১৮)

কোনো ব্যক্তির 'বিতানাহ' বলতে তার এমন অন্তরঙ্গ সহচরদের বোঝায় যারা তার গোপন বিষয়াবলি অবগত থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ সহচর হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; কারণ তাদের কথাবার্তায় শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং তাদের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের যে বিষয়গুলো তারা গোপন করে রেখেছে তা আরও বড়।

তবে আমরা ইমাম মাওয়ার্দীর এই মতের সাথে একমত হওয়া পছন্দ করি যে, 'উযারাতে তানফিজ' বা নির্বাহী মন্ত্রণালয়ে জিম্মিদের (অমুসলিম নাগরিকদের) নিয়োগ দেওয়া বৈধ; কারণ আল্লাহর প্রশংসায় ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের কর্তৃত্ব সমুন্নত থাকে। আর যা নিষিদ্ধ তা হলো—মুসলমানের ওপর অমুসলমানের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য থাকা। নির্বাহী মন্ত্রীর পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি লক্ষ্য করলে এটি স্পষ্ট হয়; কেননা পূর্বোল্লিখিতভাবে বিষয়াদির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব ইমামের হাতেই থাকে। তিনি (নির্বাহী মন্ত্রী) কেবল একজন বাস্তবায়নকারী বা এ বিষয়ে অনুমতিপ্রাপ্ত মাত্র। তিনি ইমাম ও প্রজাসাধারণের মধ্যে অনেকটা দূতের মতো বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। তবুও আমরা বলব যে, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কোনোভাবেই মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সমীচীন নয়; কারণ এটি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। আর ইমাম মাওয়ার্দী নিজেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এই বলে: "যদি তারা আধিপত্য বিস্তার করে, তবে সেক্ষেত্রে তারা আধিপত্য বিস্তার হতে নিষিদ্ধ হবে।"

নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের প্রকারভেদ:

এই বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মুসলিম ফকীহগণ দুই ধরনের নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন:

প্রথমত: এমন মন্ত্রণালয় যা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সরাসরি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে নির্বাহী মন্ত্রী খলিফা বা ইমামের মন্ত্রী হিসেবে গণ্য হন এবং তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলে বিচারকার্য পরিচালনা ও আদেশ কার্যকর করেন, যতক্ষণ না খলিফা তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক এলাকা নির্ধারণ করে দেন।

দ্বিতীয়ত: এমন নির্বাহী মন্ত্রণালয় যা প্রদেশের গভর্নরের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মন্ত্রীর ক্ষমতা কেবল সেই প্রদেশের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে, রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের সাথে নয়। তিনি সেই প্রদেশের গভর্নরের অনুসারী হয়ে থাকেন, ফলে তার মর্যাদা গভর্নরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় না।

এর মাধ্যমে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রে এমন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের কথা কল্পনা করতে পারি যা খলিফার অনুগামী হবে, অতঃপর প্রদেশগুলোর সংখ্যা অনুযায়ী একাধিক আঞ্চলিক মন্ত্রণালয় থাকবে। এটি অনেকটা বর্তমান মার্কিন ব্যবস্থার সাথে

সামঞ্জস্যপূর্ণ—যেখানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকে এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকে। আল-মাওয়ার্দি এ বিষয়ে বলেন: "খলিফা যদি প্রদেশসমূহের শাসনের দায়িত্ব তাদের গভর্নরদের হাতে ন্যস্ত করেন এবং এর পরিচালনার ভার কর্মকর্তাদের ওপর সোপর্দ করেন—যেমনটা বর্তমানে প্রচলিত—তবে প্রতিটি অঞ্চলের শাসকের জন্য একজন উজির বা মন্ত্রী নিয়োগ করা বৈধ। আর খলিফার উজিরের ক্ষেত্রে যে নিয়মাবলী প্রযোজ্য, এই উজিরের ক্ষেত্রেও উভয় মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক বিধানের বিচারে তা প্রযোজ্য হবে।"

ক্ষমতার্পণ মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তুলনা:

ক. ঐক্যের দিকসমূহ:

উভয় মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একমত যে, উজিরের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক:
১. মন্ত্রণালয়ের গুরুভার বহনে সক্ষম হওয়া; অর্থাৎ এর দায়িত্ব পালন করার সামর্থ্য রাখা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
২. কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখা এবং ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা।
৩. খলিফার আনুগত্যের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হওয়া এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা যেন একই রকম হয়।
৪. শাসকের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করা এবং নিজের প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি না করা, শাসকের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা এবং তার বিপক্ষে ব্যাখ্যা না দেওয়া; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে খলিফা ও ইমামের সাহায্যকারী হওয়া, ইমামের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ না করা কিংবা ইমাম অথবা খলিফার নির্দেশ বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক না হওয়া।
৫. উজির যেন আল্লাহ তাআলাকে নিজের অন্তরের গোপন বিষয়ের পর্যবেক্ষক হিসেবে জ্ঞান করেন।

৬. অন্য কারো হকের ওপর আল্লাহ তাআলার হককে অগ্রাধিকার প্রদান করা; কেননা সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে ভালোবাসবে, সে তার আখিরাতের ক্ষতি করবে; আর যে ব্যক্তি তার আখিরাতকে ভালোবাসবে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করবে। সুতরাং যা অবশিষ্ট থাকবে (স্থায়ী), তাকে নশ্বর জিনিসের ওপর প্রাধান্য দাও।”

৭. মন্ত্রীকে প্রজাসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ হতে হবে এবং কাজগুলো সরাসরি তত্ত্বাবধান করতে হবে। আরাম-আয়েশ বা আলস্যের বশবর্তী হয়ে নিজের বিশেষ দায়িত্বগুলো অন্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া তার জন্য উচিত নয়।

খ. পার্থক্যের দিকসমূহ:

নিয়োগের মূলভিত্তি, প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি এবং বিচারিক অধিকার বা এখতিয়ারের দিক থেকে উভয় মন্ত্রণালয়ের (উযারাতে তাফবীদ ও উযারাতে তানফীধ) মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

নিয়োগের মূলভিত্তির দিক থেকে উভয় মন্ত্রণালয় ভিন্নতর; কেননা ‘উযারাতে তাফবীদ’ বা অর্পিত ক্ষমতার মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি ও নিয়োগদান অপরিহার্য, কিন্তু ‘উযারাতে তানফীধ’ বা নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের বিষয়টি তেমন নয়, বরং এতে ইতিপূর্বে উল্লিখিত শুধু অনুমতির মাধ্যমেই কাজ সম্পন্ন হয়। আর উভয় মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে বিবেচিত শর্তাবলির দিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ‘উযারাতে তাফবীদ’-এর ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া শর্ত, যা ‘উযারাতে তানফীধ’-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করাও (উযারাতে তাফবীদে) শর্ত। এছাড়াও শরীয়াহর বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা—যা একজন মন্ত্রীকে ‘মুজতাহিদ’ হওয়ার পর্যায়ে

নিয়ে যায়—তা 'উযারাতে তাফবীদ'-এর ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে গণ্য, যা 'উযারাতে তানফীধ'-এর ক্ষেত্রে নয়। একইভাবে যুদ্ধ ও রাজস্ব (খারাজ) সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকাও কেবল 'উযারাতে তাফবীদ'-এর ক্ষেত্রেই শর্ত হিসেবে গণ্য হয়।

আর বিচারিক অধিকার বা মন্ত্রীদের ওপর অর্পিত বিশেষ দায়িত্বের দিক থেকে উভয় মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে পৃথক হয়ে থাকে:

১. উযীরে তাফবীদ (ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী) সরাসরি বিচারকার্য পরিচালনা এবং জুলুম-নিপীড়ন বা মাজালিম সংক্রান্ত বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার অধিকার রাখেন, কিন্তু উযীরে তানফীধ (নির্বাহী মন্ত্রী)-এর সেই অধিকার নেই।

২. উযীরে তাফবীদ স্বাধীনভাবে গভর্নর বা শাসনকর্তাদের নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু উযীরে তানফীধ তা পারেন না।

৩. উযীরে তাফবীদ এককভাবে সেনাবাহিনী পরিচালনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ করতে পারেন, যা উযারাতে তানফীধ বা নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

---

৪. উযীরে তাফবীদ (প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রী)-এর জন্য বায়তুল মালের অর্থ সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে; তিনি সেখান থেকে পাওনা গ্রহণ করবেন এবং প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করবেন। কিন্তু উযীরে তানফীয (নির্বাহী মন্ত্রী)-এর ক্ষেত্রে এই অধিকার নেই।

৫. উযীরাতে তাফবীদে একাধিক মন্ত্রী নিয়োগ করা জায়েয নয়, যেমনটি একই সাথে দুইজন ইমাম নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে উযীরাতে তানফীযে মূল নিয়ম হলো একাধিক মন্ত্রী নিয়োগ করা। কেননা খলীফা একের অধিক নির্বাহী মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন যাতে তারা তাদের প্রতি জারিকৃত নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারেন। উযীরে তানফীযদের কর্মপরিধির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ নেই; কারণ তাদের কর্মকাণ্ড সরাসরি মূল শাসনকর্তৃত্বের (বিলায়াত) অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা প্রতিনিধিত্বের (নিয়াবাত) অন্তর্ভুক্ত। এটি উযীরে তাফবীদের ঠিক বিপরীত।

৬. উযীরাতে তাফবীদে মন্ত্রী তার পক্ষ থেকে একজন নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন যিনি তাকে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলিতে সহায়তা করবেন, তবে খলীফা যদি তাকে এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে নিষেধ না করেন। পক্ষান্তরে উযীরাতে তানফীযে মন্ত্রীর জন্য কোনো নায়েব নিয়োগ করার অধিকার নেই। কারণ তার দায়িত্ব কেবল নির্দেশ পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং খলীফার অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে কোনো দায়িত্ব দেওয়ার অধিকার তার নেই।

ইসলামি ব্যবস্থায় মন্ত্রিত্বের বিধানসমূহ পর্যালোচনার পর আমরা লক্ষ্য করি যে, উযীরে তাফবীদের পদটি বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত প্রধানমন্ত্রী বা প্রথম মন্ত্রীর পদের সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সমকালীন শাসন ব্যবস্থায়ও এই পদটি একাধিক হওয়া সম্ভব নয়। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে স্বাধীনভাবে কাজ করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ভূমিকা পালন করেন, তাই তার কর্তৃত্ব ও তদারকি ব্যাপক। এর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, আধুনিক সাংবিধানিক আইনবিদদের অনেক আগেই মুসলিম ফকীহগণ প্রধানমন্ত্রী বা প্রথম মন্ত্রী অথবা উযীরে তাফবীদের পদটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। ইমাম আল-মাওয়ার্দীর যুগের কয়েক শতাব্দী পর সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে এসে আধুনিক বিশ্বে এই পদের পরিচিতি লাভ করার বিষয়টি মুসলিমদের নিকট রাজনৈতিক ফিকহের মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে নিশ্চিত করে।

যদি আমরা উযীরে তাফবীদকে সমকালীন শাসন ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীর সাথে তুলনা করি, তবে আধুনিক সরকারগুলোর অন্যান্য

মন্ত্রীদের উযীরে তানফীয বা নির্বাহী মন্ত্রী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যাদের দায়িত্ব কেবল নির্দেশ বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে...

মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ, বিধানাবলির বাস্তবায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রত্যেক নির্বাহী মন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তদারকির জন্য বিশেষায়িত হন; যেমন কেউ অর্থের জন্য, কেউ শিক্ষার জন্য, কেউ প্রতিরক্ষার জন্য এবং কেউ বিচারের জন্য... ইত্যাদি।

বলা যেতে পারে যে, নির্বাহী মন্ত্রীর অবস্থান রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির মন্ত্রীর অবস্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; যেখানে তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের একজন সচিব হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার কাজ হলো রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা ও নীতি বাস্তবায়ন করা। পক্ষান্তরে, অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রী সংসদীয় পদ্ধতির মন্ত্রীর সদৃশ; যেখানে মন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে শাসনে অংশীদার হন, বরং প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে মন্ত্রিসভাই শাসনের রূপরেখা অঙ্কন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: প্রদেশসমূহের শাসনব্যবস্থা:

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে খলিফার পক্ষে এককভাবে শাসন ও প্রশাসনের কার্যাবলী পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে এই উম্মতের সালাফে সালেহীনদের পরিচালিত বরকতময় বিজয়সমূহের ফলে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং এর সীমান্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এই কারণে দেশকে একাধিক প্রদেশে বিভক্ত করা এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য একজন আমির নিযুক্ত করা আবশ্যক ছিল, যাতে তিনি সেই প্রদেশের বিষয়াবলী পরিচালনায় ইমামের সহযোগী ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রদেশ শাসনের এই ধারণাটি আধুনিক যুগে রাষ্ট্রকে কতগুলো প্রদেশে বিভক্ত করা এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন গভর্নর নিয়োগ করার পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে তিনি রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থিত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট প্রদেশের বিষয়াবলীর জন্য প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে বিবেচিত হন।

প্রদেশ শাসন বা ইমারত হলো এক প্রকারের অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব; এই কারণেই আমিরকে মাঝে মাঝে 'ওয়ালী' বলা হতো। যদিও এই ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয়েছিল, যখন তিনি প্রতিটি গোত্রের নিকট এমন ব্যক্তিকে পাঠাতেন যিনি তাদের দ্বীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতেন, তাদের সালাতে ইমামতি করতেন এবং তাদের থেকে...

যাকাত, তবে রাষ্ট্রীয় সীমানা বিস্তৃতির ফলে বিজয়াভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাংগঠনিক রূপটি স্পষ্টভাবে এবং মৌলিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। যখন আবু বকর খলিফা নিযুক্ত হলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়োজিত কর্মকর্তাদের তাদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে বহাল রাখেন। তিনি রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনায় প্রবীণ সাহাবীদের সাহায্য নিতেন, তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের রায় অনুযায়ী কাজ করতেন। আবু বকরের যুগে ইসলামি ভূখণ্ডটি বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যেমন: মক্কা, মদিনা, তায়েফ, সানা, হাজরামাউত, নাজরান এবং বাহরাইন।

আবু বকরের ইন্তেকালের পর উমর ইবনুল খাত্তাব যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাসনামলে বিজয়াভিযান বিস্তৃত হয় ও রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি পায়—এর ফলে বিষয়াবলি পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাজ সহজ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে বড় বড় প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এই প্রদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল আহওয়াজ ও বাহরাইন প্রদেশ, সিজিস্তান ও কেরমান প্রদেশ, তাবারিস্তান প্রদেশ, খোরাসান প্রদেশ, ইরাক ভূখণ্ডের কুফা ও বসরা প্রদেশ, এরপর শাম (সিরিয়া) ভূখণ্ডের হিমস প্রদেশ, দামেস্ক প্রদেশ এবং ফিলিস্তিন প্রদেশ। আর আফ্রিকায় ছিল উচ্চ মিশর ও নিম্ন মিশর প্রদেশ, এরপর পশ্চিম মিশর ও লিবীয় মরুভূমি। এর মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রে একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা খলিফা বা ইমামের অভিপ্রায় অনুযায়ী রাষ্ট্রের উচ্চতর শাসননীতির আলোকে এসব প্রদেশের কার্যাবলী পরিচালনা করত।

উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রের সীমানা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং খেলাফতের কর্তৃত্ব সুদূর পূর্ব থেকে সুদূর পশ্চিম পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে উমাইয়াদের শাসনামলে দেশকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল, সেগুলো হলো: হিজাজ, ইয়েমেন ও মধ্য আরব ভূখণ্ড; মিশর; 'আল-ইরাকান' তথা আরবীয় ইরাক যার প্রতিনিধিত্ব করত ব্যাবিলন ও আশুর ভূমি এবং অনারব ইরাক যা পারস্য ভূমির প্রতিনিধিত্ব করত; আরব উপদ্বীপের এলাকাগুলো: পশ্চিম মিশর থেকে উত্তর আফ্রিকা হয়ে মাগরিব (মরক্কো), আন্দালুস (স্পেন) এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত।

পঞ্চদশ পাঠ

উমাইয়া যুগে ওয়ালি বা আমিরদের ক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদের নিজ নিজ প্রদেশে তা প্রায় নিরঙ্কুশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইরাকের হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা সম্ভবত এর সবচেয়ে প্রকট উদাহরণ। তবে ন্যায়পরায়ণ খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ খেলাফতে আসীন হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি বিষয়গুলোকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে কাজ করেন এবং এই ওয়ালিদের অনেকের প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমিত করেন, যাতে তাদের জুলুম দূর হয় এবং প্রজাদের ওপর থেকে তাদের কষ্টদায়ক আচরণ প্রতিহত করা যায়।

আব্বাসীয় শাসনামলের শুরুর দিকে খেলাফতের শক্তি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমিরদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং তাদের মর্যাদা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে সমস্ত ক্ষমতা খলিফার হাতে পুঞ্জীভূত হয়, যার ফলে ওয়ালি বা আমিররা কেবল সাধারণ কর্মচারী হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে, যা প্রায় নামাজে ইমামতি এবং সেনাবাহিনী পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, আর্থিক বিষয়াদি তদারকির দায়িত্ব অর্থ কর্মকর্তার (সাহিবুল মাল) কাছে এবং বিচারিক বিষয়াদি দেখার দায়িত্ব বিচারকের (কাজী) কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তবে আব্বাসীয় শাসনের শেষ দিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে; রাষ্ট্র যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার সাথে সাথে খলিফার কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা বা কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়, তখন তা আমিরদের প্রভাব বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগায়। এমনকি তাদের কেউ কেউ খেলাফতের রাজধানী বা কেন্দ্রীয় শাসন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

ফলে মুসলিম সমাজে এমন কিছু ছোট ছোট রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে যেগুলোর আমিররা বাহ্যিকভাবে আব্বাসীয় খেলাফতের সাথে যুক্ত থাকলেও বাস্তবে তারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন।

অঞ্চলসমূহের শাসনের প্রকারভেদ:

সিয়াসা শরইয়্যাহ বিশেষজ্ঞ মুসলিম ফকিহগণ শাসনক্ষমতাকে (ইমারত) দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন: সাধারণ শাসন এবং বিশেষ শাসন।

১. সাধারণ শাসন:

সাধারণ শাসন বা 'বিলায়াতুল আম্মাহ' হলো: কোনো দেশ বা অঞ্চলের আমিরের এখতিয়ার বা ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হওয়া, যাতে আমির সমস্ত কাজ তদারকি করার ক্ষমতা রাখেন যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে...

সেনাবাহিনী পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ, খরাজ আদায়, সদকা গ্রহণ, দণ্ডবিধি কার্যকর করা, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচন এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। আল-মাওয়ার্দীর ভাষ্য অনুযায়ী—একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে—এটি হলো সকল অধিবাসীর ওপর সাধারণ কর্তৃত্ব এবং তাদের প্রচলিত যাবতীয় কার্যাবলীর তদারকি করা। ফলে এটি এমন এক সাধারণ তদারকিতে পরিণত হয় যা আগে ছিল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

এই সাধারণ শাসনকর্তৃত্বের (ইমারাতুল আম্মাহ) ক্ষেত্রেও সেই একই শর্তাবলী প্রযোজ্য যা অর্পিত ক্ষমতাধারী মন্ত্রিত্বের (বিজারাতুত তাফবীজ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কেবল ইমারাতের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বিশিষ্টতা এবং বিজারাতের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ব্যাপকতার মধ্যে। আল-মাওয়ার্দী বলেন: এই ইমারাতের ক্ষেত্রে অর্পিত ক্ষমতাধারী মন্ত্রিত্বের শর্তাবলীই ধর্তব্য হবে; কারণ এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কেবল ইমারাতের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বিশেষত্ব এবং বিজারাতের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ব্যাপকতার মধ্যে। তবে কর্তৃত্বের ব্যাপকতা বা বিশেষত্ব হওয়ার কারণে শর্তাবলীর মাঝে কোনো পার্থক্য তৈরি হয় না। অতএব, অর্পিত ক্ষমতাধারী মন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রে আমীর এবং উযীর উভয়েই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। পার্থক্যের সারকথা হলো, আমীর তার শাসনের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে অর্পিত ক্ষমতাধারী উযীর কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে সীমাবদ্ধ নন।

সাধারণ ইমারাতের প্রকারভেদ:

সাধারণ ইমারাত দুই ভাগে বিভক্ত: ইমারাতু আস-স্তিকফা (যোগ্যতা ও নিয়োগভিত্তিক শাসন) এবং ইমারাতু আল-ইসতিলা (বিজয় বা দখলভিত্তিক শাসন)।

ক. ইমারাতু আস-স্তিকফা: এটি ইমাম বা খলীফার নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যার অনুকূলে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তাকে শর্তাবলী সাপেক্ষে ইমারাতের দায়িত্ব পালনে যোগ্য হতে হয়। এটি অর্পিত ক্ষমতাধারী মন্ত্রিত্বের (বিজারাতুত তাফবীজ) সদৃশ—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। খলীফা যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন, তখন তার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে: "আমি তোমাকে অমুক অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে বহাল করলাম" অথবা "আমি তোমাকে এই অঞ্চলের শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করলাম"; যাতে তিনি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ তদারকির অধিকার লাভ করেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে এই জাতীয় শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়। যেহেতু সাধারণ ইমারাতের ক্ষেত্রে আমীর তার

শাসনাঞ্চলে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, তাই তিনি খলীফার নির্দেশে অথবা খলীফার নির্দেশ ছাড়াই নিজের জন্য একজন নির্বাহী মন্ত্রী (উযীরুত তানফীয) নিয়োগ করতে পারেন। তবে খলীফার অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া তিনি কোনো অর্পিত ক্ষমতাধারী মন্ত্রী (উযীরুত তাফবীজ) নিয়োগ দিতে পারবেন না।

পঞ্চদশ পাঠ

সাধারণ নেতৃত্বের (ইমারতে আম্মাহ) ক্ষেত্রে আমীরের দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে বলা যায় যে, তা -যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি- সমগ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্বসমূহের অনুরূপ। তবে পার্থক্য কেবল এই যে, আমীর শুধুমাত্র তার নিজস্ব নেতৃত্বের এলাকার জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং তিনি এর রাজনৈতিক, আর্থিক, সামরিক, ধর্মীয় ও বিচারিকসহ যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনা করবেন।

খ. জবরদখলমূলক নেতৃত্ব (ইমারতে ইসতিলা): এটি এমন এক প্রকার নেতৃত্ব যা ইমাম বা খলিফা বাধ্য হয়ে প্রদান করেন। তা এভাবে যে, কোনো আমীর শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে কোনো একটি অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, অতঃপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান তাকে সেই অঞ্চলের নেতৃত্বের পদে বহাল করেন এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও রাজনীতির দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করেন। ফলে সেই আমীর তার দখলের কারণে রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন। আর এই জবরদখলমূলক নেতৃত্ব হলো সাধারণ নেতৃত্বের দ্বিতীয় প্রকার।

এই জবরদখলমূলক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে বাধ্যবাধকতার বিধান থেকে, অথবা এটি হলো বিদ্যমান বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার একটি নীতি। এটি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পরিচিত ছিল না, উমাইয়া খিলাফতের সময়েও নয় এবং আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল না। বরং এটি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে যখন আব্বাসীয় রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাজধানীর খিলাফতের কর্তৃত্ব থেকে কিছু প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীন হয়ে যান। ফলে আব্বাসীয় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকগুলো স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদয় ঘটে, যেমন: বুয়াইহী, সামানী, গজনবী, সেলজুক, তুলুনী ও ইখশিদী রাজবংশসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ, যেগুলোর আমীররা শক্তি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করতেন। খলিফার পক্ষে তখন তাদেরকে সেই সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না; এটি ছিল এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যা অস্বীকার বা বাতিল করার কোনো সুযোগ ছিল না, যাতে পরিস্থিতি আরও বেশি বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ এবং রক্তপাতের দিকে ধাবিত না হয়।

জবরদখলকারী আমীরের শর্ত ও দায়িত্বসমূহ:

জবরদখলকারী আমীরের ওপর তার ক্ষমতাকে বাস্তব সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিপরীতে কিছু কাজ সম্পাদন করা আবশ্যক। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: নবুওয়াতের ধারায় খিলাফতের এই ইমামত পদটির মর্যাদা রক্ষা করা এবং মিল্লাতের বিষয়াবলি পরিচালনা করা; যাতে শরীয়ত কর্তৃক তা প্রতিষ্ঠা করার যে আবশ্যকতা রয়েছে তা সংরক্ষিত থাকে এবং এর থেকে উৎসারিত অধিকারসমূহ সুরক্ষিত থাকে।

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

দ্বীনি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ, যার মাধ্যমে হঠকারিতার শাসন দূরীভূত হয়; ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐকমত্য গড়ে তোলা; যাতে মুসলিমরা অন্যদের মোকাবিলায় এক হাত (একতাবদ্ধ) হতে পারে; দ্বীনি পদসমূহের চুক্তিগুলো যেন বৈধ হয় এবং সেগুলোতে প্রদত্ত হুকুম ও ফয়সালাসমূহ কার্যকর হয়, চুক্তির ত্রুটির কারণে তা বাতিল না হয় এবং ওয়াদার খেলাফের কারণে তা অকার্যকর না হয়; শরয়ি সম্পদ সংগ্রহ যেন ন্যায়ের সাথে হয়, যার মাধ্যমে প্রদানকারীর দায়মুক্তি ঘটে এবং গ্রহণকারীর জন্য তা বৈধ হয়; দণ্ডবিধি (হুদুদ) যেন ন্যায়ের সাথে পুরোপুরি কার্যকর করা হয় এবং যারা এর যোগ্য তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়; কেননা মুমিনের জান-মাল আল্লাহর হক ও তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন ব্যতীত সুরক্ষিত; আর আমির যেন দ্বীন রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকেন।

বিজয়লব্ধ শাসন (ইমারতে ইস্তিলা) এবং যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসন (ইমারতে ইস্তিকফা)-এর মধ্যে পার্থক্য:

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিজয়লব্ধ শাসন বা জবরদখলমূলক শাসন বাধ্যবাধকতার কারণে সম্পাদিত হয়, পক্ষান্তরে যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসন স্বেচ্ছায় ও নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ ছাড়াও উলামায়ে কিরাম এই দুই প্রকার শাসনের মধ্যে দুটি দিক থেকে পার্থক্য করেছেন:

১. বিজয়লব্ধ শাসনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি নির্দিষ্ট হয়ে থাকেন, অর্থাৎ: ইমামের তাকে নিয়োগ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। পক্ষান্তরে যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসনের বিষয়টি যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের ওপর সীমাবদ্ধ; অর্থাৎ: তিনি (ইমাম) এই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত যে কোনো ব্যক্তিকে বেছে নিতে পারেন।

২. বিজয়লব্ধ শাসন সেই সমস্ত অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলোর ওপর দায়িত্বশীল ব্যক্তি বিজয়ী হয়েছেন, পক্ষান্তরে যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসন কেবল সেই অঞ্চলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে যা যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২. বিশেষ শাসন (ইমারতে খাসসাহ):

এটি সাধারণ শাসনের বিপরীত; আর তা হলো আমিরের নিয়োগ কোনো একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে অথবা কোনো প্রদেশের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকা। যেমন— সেনাবাহিনী পরিচালনা করা, প্রজাসাধারণের বিষয়াদি দেখাশোনা করা, সীমান্ত রক্ষা করা এবং পবিত্র স্থান বা পরিবার রক্ষা করা। বিচারকার্য ও ফয়সালা প্রদান, খাজনা বা রাজস্ব আদায় অথবা সাদাকাত সংগ্রহের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার থাকবে না।

যেহেতু বিশেষ শাসনক্ষমতা (আল-ইমারাতুল খাসসাহ) সাধারণ শাসনক্ষমতার তুলনায় কম প্রভাবশালী এবং এটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সীমাবদ্ধ—যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি—তাই এটি অর্পিত মন্ত্রণালয়ের (ওয়ারাতুত তাফবীদ) তুলনায় নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের (ওয়ারাতুত তানফীয) সাথে অনেকাংশেই সদৃশ। সে কারণে বলা যেতে পারে: বিশেষ ইমারতের আমীরের ক্ষেত্রেও নির্বাহী উজিরের ন্যায় একই শর্তাবলি প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো আমীরকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে; কারণ ইমারতের মধ্যে অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্বের (বিলায়াহ) অর্থ নিহিত থাকে, যদিও তা বিশেষ ইমারত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমীরকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে; কারণ অন্যের ওপর কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব দাসত্ব ও গোলামির সাথে সাংঘর্ষিক। তবে বিশেষ ইমারতের আমীরের জন্য 'আহলুল ইলম' (আলিম) হওয়া শর্ত নয়; কারণ তার হাতে শাসন বা বিচারিক ফয়সালা করার ক্ষমতা নেই—যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি—তাই তিনি ইলমের মুখাপেক্ষী নন। তবে তিনি আলিম হওয়া অথবা অন্তত শিক্ষিত হওয়া উত্তম, যাতে তিনি শারঈ বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ না থাকেন; কারণ অজ্ঞতা তাকে তার অর্পিত দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে তুলবে।

বিশেষ ইমারতের আমীরের দায়িত্বসমূহ:

বিশেষ ইমারতের আমীরের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধি (হুদুদ) কার্যকর করা, যেমন ব্যভিচারের দণ্ড; কারণ এটি রাজনীতির নিয়মাবলি এবং দ্বীন রক্ষা ও সংরক্ষণের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে মানুষের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট দণ্ডসমূহ কার্যকর করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, যদি তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের (গবেষণা) প্রয়োজন না হয়। তবে যেসব বিষয়ে ফকীহগণের মতবিরোধের কারণে ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়, অথবা যেসব বিষয়ে বিবাদমান পক্ষগুলোর একে অপরকে অস্বীকার করার কারণে প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তা আমীরের কর্তৃত্বের বহির্ভূত। এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার নেই; কারণ তিনি মুজতাহিদ নন, তদুপরি এটি তার বিশেষ কর্তৃত্বের সীমার বাইরে।

২. শাসক ও বিচারকগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাদের যুলুম-অবিচার (মাযালিম) পর্যবেক্ষণ করা; শর্ত হলো এই অভিযোগগুলো যেন পুনর্বিবেচনা বা আপিলযোগ্য না হয়। যদি বিষয়টি এমন হয় যাতে পুনরায় বিচারিক রায় প্রদানের অবকাশ থাকে এবং নতুন করে বিচারকার্য শুরু করতে হয়, তবে আমীরের পক্ষে তা পর্যবেক্ষণ করা নিষিদ্ধ; এমতাবস্থায় তার কর্তব্য...

...বিষয়টি তার নিজ শহরের শাসকের নিকট অথবা শহরের নিকটতম শাসকের নিকট ন্যস্ত করা। তবে পাওনা আদায় করার ক্ষেত্রে শাসককে সহযোগিতা করা তার জন্য বৈধ; কারণ শাসকই হলেন প্রকৃত সাহায্যকারী।

৩. সালাতের ইমামত করা এবং হজ্জ পরিচালনা করা; কারণ এগুলো আমিরের উপর অর্পিত পছন্দনীয় (মুস্তাহাব) দায়িত্বসমূহের

অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. জিহাদ। তবে এক্ষেত্রে সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজে থেকে যুদ্ধ শুরু করা—যা খলিফার অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়—এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত আক্রমণের মোকাবিলা করা—যা খলিফার অনুমতি ছাড়াই বৈধ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। কারণ প্রতিরক্ষার অধিকারটি নিরাপত্তা বিধানের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষার চাহিদার অন্তর্ভুক্ত, যা আমিরের বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত বিষয়।

ইসলামি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

অন্যদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের ভিত্তিসমূহ:

এই বিষয়টি—অর্থাৎ অন্যদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক—দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:
প্রথমত: ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে সকল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
দ্বিতীয়ত: যুদ্ধাবস্থা ব্যতিরেকে শান্তিকালীন সময়ে মুসলিম ও অন্যদের মাঝে সম্পর্কের মূলনীতি।

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে সকল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

ইসলামের দিকনির্দেশনা এবং এর বিধানসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ফকীহগণের নিকট ইসলামি সম্পর্কসমূহ এমন কিছু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। আমরা নিম্নে এই ভিত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করব:

শরয়ি রাজনীতি

পনেরোতম পাঠ

প্রথমত: মানবীয় ঐক্য

মানবীয় ঐক্য কতগুলো শাখায় বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে: মূলগত সমতা। এ প্রসঙ্গে আমরা বলি: মানুষ মূলে সবাই সমান, তাকওয়া ব্যতীত একজনের ওপর অন্যজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বর্ণ, লিঙ্গ বা ভাষার কারণে মানুষের মাঝে কোনো বৈচিত্র্য বা ভেদাভেদ থাকলেও শ্রেষ্ঠত্বের কোনো পার্থক্য নেই; কারণ সবাই আদমের বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে মহান সত্য (আল্লাহ) বলেন: "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" [আন-নিসা: ১]। এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, স্রষ্টা একজন এবং মানবসত্তা এক। তদুপরি এটি সকল মানুষের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে; কারণ এটি একটি বৈশ্বিক মানবিক বিষয়, কোনো আঞ্চলিক বা সাময়িক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: "মানুষ ছিল এক উম্মাহভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবীদের প্রেরণ করলেন এবং মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিল, তার মীমাংসার জন্য সত্যসহ তাঁদের সাথে কিতাব নাজিল করলেন।" [আল-বাকারা: ২১৩]। এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, মানবজাতি এক উম্মাহ। আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন যে সকল মানুষ এক উম্মাহ এবং মতভেদ হলো একটি আপতিক বিষয় যার মূলে রয়েছে প্রবৃত্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিদায়াতসহ রাসূলদের পাঠিয়েছেন; যাতে তাঁরা এই মতভেদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশে ফয়সালা করেন এবং তাদের জন্য হিদায়াতের পথ স্পষ্ট

করে দেন। ফলে যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির ওপর জয়লাভ করবে সে সেই পথে চলবে, আর অন্যজন পথভ্রষ্ট ও দুর্ভাগা হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।" [আর-রুম: ২২]। এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সামগ্রিক মানবীয় ঐক্যের পথে কোনো বাধা নয়; বরং এই বৈচিত্র্য মানুষের সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার একটি বিধান, কেননা তিনি মানুষের মধ্যে এমন শক্তি দিয়েছেন যার ফলে সে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ও সাড়া প্রদান করে।

মহান সত্য (আল্লাহ) বলেন: "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।" [আল-হুজুরাত: ১৩]। অর্থাৎ: তোমরা সবাই এক পিতা ও এক মাতা থেকে আগত। সুতরাং বংশ বা স্বভাবের বিচারে তোমাদের একজনের ওপর অন্যজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ যদি তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে থাকেন, তবে তিনি তোমাদেরকে এমনটি করেননি এক জাতিকে অন্য জাতির ওপর বা এক গোত্রকে অন্য গোত্রের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার জন্য; বরং এটি করেছেন যেন তা পারস্পরিক পরিচয়ের একটি মাধ্যম হয়।

অন্য অর্থে: এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া একে অপরের সাথে যুদ্ধ বা বিবাদে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়; বরং তারা যেন একে অপরকে চিনতে পারে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে। এই পারস্পরিক পরিচয় প্রতিটি দলকে অন্য দলের কাছে থাকা কল্যাণ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এই পৃথিবীর সন্তান তথা মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়। আর এটি কেবল মানবিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মূলনীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেছেন: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা এবং পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথা দূর করে দিয়েছেন। মানুষ হয় মুত্তাকি মুমিন, নতুবা হতভাগা পাপিষ্ঠ। সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।”

দ্বিতীয়ত: বিধানের অভিন্নতা: মানবিক ঐক্য বিধানের অভিন্নতাকে দাবি করে। কারণ ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন দাওয়াত, তাই শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে কুরআনের আদেশ ও নিষেধ সকল মানুষের প্রতি সমভাবে নিবদ্ধ। এটি কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য সুনির্দিষ্ট নয়, কিংবা কোনো বিশেষ বর্ণের জন্যও নয়; বরং সকল বর্ণ ও গোষ্ঠীর কাছেই এই নির্দেশনাসমূহ পালনীয়। এক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য যেমন—নারী-পুরুষ বা সাদা-কালো হওয়া; অথবা সামাজিক পার্থক্য যেমন—নেতৃত্ব ও অধীনতা, শাসক ও শাসিত হওয়া কিংবা ধনী ও দরিদ্র হওয়া—এসবের কোনো ভেদাভেদ নেই। এই অর্থেই মহান আল্লাহ বলেন: “তোমাদের আকাঙ্ক্ষা কিংবা কিতাবধারীদের আকাঙ্ক্ষায় কোনো কাজ হবে না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।” [আন-নিসা: ১২৩]

সুতরাং আল্লাহর সামনে এবং সমাজের কাছে দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে সকলেই সমান স্তরে অবস্থান করে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, মানবিক ঐক্য সকল মানুষের জন্য বিধানের অভিন্নতা দাবি করে। মহান আল্লাহ সকল মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে শরীয়তের বিধানসমূহ সকল মানুষের জন্য একই। মহান আল্লাহর বাণীতে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট: “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।” [আন-নিসা: ১]। আর মুহাম্মদী রিসালাত হলো একটি

বিশ্বজনীন রিসালাত, যা সমগ্র মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য এক আহ্বান।

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ
তৃতীয়ত: দ্বীনের ঐক্য: মানবিক ঐক্য দ্বীনের ঐক্যের দাবি রাখে; কেননা ইসলামি শরীয়ত হলো পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেরই সম্প্রসারণ। প্রতিটি শরীয়ত যে সময় ও স্থানে প্রেরিত হয়েছিল, সেই সময়ের জন্য তা উপযোগী ছিল। যখন মানবজাতি একটি সমাপ্তিকারী শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতার স্তরে উপনীত হলো, তখন ইসলামি শরীয়ত নাযিল হলো। সকল আসমানি বার্তা বা রিসালাত মৌলিক নীতিমালাসমূহের ক্ষেত্রে একবিন্দুতে মিলিত হয়; তবে বিস্তারিত বিধিবিধানগুলো প্রতিটি শরীয়তের সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইসলাম হলো সেই দ্বীন যা সকল নবীগণের ধর্ম, পৃথিবীতে মানুষের পদার্পণের সূচনা লগ্ন থেকেই। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন একমাত্র ইসলাম।" [আলে ইমরান: ১৯]

পরিপূর্ণ মূলনীতিসমূহ অভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি এবং যার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" [আশ-শূরা: ১৩]

সকল নবীগণের নিকট দ্বীন ছিল একমাত্র ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন: "ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" [আলে ইমরান: ৬৭] মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর এরই ওসিয়ত ইব্রাহিম তাঁর সন্তানদের করেছিলেন এবং ইয়াকুবও; (তারা বলেছিলেন) হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" [আল-বাকারাহ: ১৩২, ১৩৩]

ইসলাম পূর্ববর্তী সকল রাসূল ও নবীর ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মুসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)।" [আল-বাকারাহ: ১৩৬]

সুতরাং ইসলামি শরীয়ত হলো আসমানি শরীয়তসমূহের সমাপ্তি, যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে; মানবতা যার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল। এটি মানুষকে তাদের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে বের করে আনার জন্য এসেছে।

এবং দৃঢ় বিশ্বাস প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর নির্মাণ করল, অতঃপর তা অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করল, কেবল একটি ইটের স্থান বাদ দিয়ে। মানুষ সেই ঘরে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হয়ে বলতে লাগল: যদি এই ইটের স্থানটুকু পূরণ করা হতো! অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমিই সেই ইটের স্থান এবং আমি এসে নবীদের আগমনের সমাপ্তি ঘটিয়েছি।”

সকল মানুষের মাঝে অভিন্ন একটি বিষয় হলো: পরিণতির অভিন্নতা:

সমগ্র মানবতার জন্য দ্বীনের অভিন্নতা এবং শরীয়তের অর্পিত দায়িত্বের অভিন্নতার পাশাপাশি তাদের শেষ পরিণতিও এক। সকল মানুষ তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং তাদের পরিসমাপ্তিতে অভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন: “হে লোকসকল! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাকো, তবে (ভেবে দেখো) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, যাতে আমি তোমাদের কাছে (আমার ক্ষমতা) প্রকাশ করি। আর আমি মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্থির রাখি, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ করো।” [সূরা আল-হজ্জ: ৫]

এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, মানবিক ঐক্য হচ্ছে এমন একটি মূল ভিত্তি যার ওপর ইসলামের সকল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত; তা ব্যক্তিগত, সামষ্টিক বা আন্তর্জাতিক যাই হোক না কেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র যখন এই উপলব্ধি করে যে তারা উৎপত্তি এবং পরিণতির দিক থেকে একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত, তখন এটি তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিকে মজবুত করতে উদ্বুদ্ধ করে। যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে।

চতুর্থ: মানবিক সম্পর্ক: ইসলাম মানুষকে একটি অভিন্ন জাতি হিসেবে দেখে, যারা সবাই আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। তাই মানবতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখতে কোনো বাধা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন।” [সূরা আন-নাহল: ৯০]

আর কুরআনুল কারীম তাদের প্রতি হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের অনুমতি দিয়েছে যারা দ্বীনের ব্যাপারে মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি কিংবা তাদের বের করার কাজে অন্যকে সহযোগিতা করেনি। মহান আল্লাহ বলেন: “যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি...”

“যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই জালিম।” (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮-৯)

এই আয়াতটি আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)-এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: “কুরাইশদের সাথে চুক্তিকালীন সময়ে আমার মা আমার কাছে আসলেন, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এসেছেন এবং তিনি (আমার সাহচর্য বা দান) প্রত্যাশী; আমি কি তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।” এই মা মুসলিম না হওয়া সত্ত্বেও নবী (সা.) তাঁর সাথে সুসম্পর্ক রাখার

নির্দেশ দিয়েছেন।

জাসসাস ‘আহকামুল কুরআন’-এ “তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ করবে” এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন: এটি যিম্মি বা অমুসলিম নাগরিকদের সদকা প্রদানের সাধারণ বৈধতার প্রমাণ; কারণ তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়। ইসলাম এই মানবিক সম্পর্কের আহ্বান জানায়। নবী (সা.) তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীকে দেখতে যেতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে: “একজন ইহুদি কিশোর নবী (সা.)-এর সেবা করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিশোরটি তার পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা বলল: আবুল কাসিমের (নবীজির উপনাম) আনুগত্য করো। ফলে কিশোরটি ইসলাম গ্রহণ করল। নবী (সা.) এই বলে বের হয়ে আসলেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়েছেন।”

নবী (সা.) মুশরিকদের প্রতিনিধি দলকে গ্রহণ করতেন, তাদের বড়দের সাথে সৌজন্যবোধ বজায় রাখতেন এবং তাদের প্রতি নমনীয় কথা বলতেন। তিনি বলতেন: “যখন তোমাদের কাছে কোনো জাতির কোনো সম্মানিত ব্যক্তি আসে, তখন তাকে সম্মান করো।”

পঞ্চম: মানুষের মধ্যে সমতা। মানুষ সমতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, একে মূল্যায়ন করেছে এবং এর ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। এটি মূলত দুর্বলের ওপর সবলের জুলুমের প্রবণতা থেকে ফিরে আসার একটি প্রচেষ্টা, যা অহংকার, শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং স্বার্থপরতা থেকে জন্ম নেয়। এ কারণেই ধর্মগুলোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জুলুমের অবসান ঘটানো এবং মানুষের মধ্যকার ব্যবধান দূর করা।

অধিকার হরণ করা; আর এটিই ছিল রাসুলগণের কাজ—তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। প্রাচীনকাল থেকেই অহংকার ও অধিকার হরণের প্রতি আসক্ত মানবপ্রকৃতি ধর্ম ও রাসুলগণের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে; যার ফলে রাসুলগণ এবং তাঁদের দাওয়াত প্রচারকারীদের জীবন অসংখ্য দুঃখ-কষ্টের এক দীর্ঘ ধারায় পরিণত হয়েছে।

মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে পৃথিবীতে শ্রেণিপ্রথা ব্যাপকভাবে এবং নিষ্ঠুরভাবে প্রচলিত ছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। রোমানরা মানুষকে স্বাধীন ও পরাধীন—এই দুই ভাগে বিভক্ত করত; স্বাধীন ব্যক্তিরা সকল অধিকার ভোগ করত, আর পরাধীনরা যেকোনো ধরনের অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত ছিল। আরব উপদ্বীপের অবস্থাও এর চেয়ে ভালো ছিল না, বরং সেখানেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে দাসপ্রথা ছিল অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। উপর্যুপরি আক্রমণ ও যুদ্ধের ফলে এটি সৃষ্টি হয়েছিল এবং দাসপ্রথা ছিল লাভজনক ব্যবসার একটি মাধ্যম। ইসলাম যখন আসলো, তখন এই পরিস্থিতিকে সে মেনে নেয়নি। ইসলাম যেভাবে মানুষকে তার চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন করেছে, তেমনি তাকে তার মনিব ও অন্যদের দাসত্ব থেকেও মুক্তি দিয়েছে। আর এই ন্যায়ভিত্তিক প্রবণতাই ছিল সেই মূল্যবোধ, যা শাসকরা রক্ষা করেছেন এবং বিচারকরা মানুষের মাঝে তা বাস্তবায়ন করেছেন।

নিশ্চয়ই ইসলাম পূর্ণ সমতার বিধান নিয়ে এসেছে, যেখানে জাতি ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে সমতা ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থায় তারা অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমান। ইসলাম এই সমতাকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছে এবং একে অন্যতম মৌলিক বিশ্বাসে পরিণত করেছে, যা প্রত্যেক মুসলিমের পোষণ করা আবশ্যক। ইসলাম মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বর্ণবৈষম্যের নিন্দা জানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই ফেরাউন জমিনে উদ্ধত হয়েছিল এবং সেখানের অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। সে তাদের একটি দলকে

হীনবল করে দিয়েছিল; সে তাদের পুত্রসন্তানদের জবেহ করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [আল-কাসাস: ৪]। ইসলাম যে সমতার আহ্বান জানিয়েছে, তা সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি তারা কোন ধর্ম পালন করে সেটি বিবেচনা না করেই।

পঞ্চদশ পাঠ

শরয়ি রাজনীতি

এই হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে যেকোনো বৈষম্যকে ধূলিসাৎ করে দেন। এটি তখন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যখন তিনি মিসরের এক কিবতিকে (খ্রিস্টান অধিবাসী) মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের পুত্রের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন সে তাকে প্রহার করেছিল।

বর্ণিত আছে যে, আমর ইবনুল আসের পুত্র মুহাম্মদ একজন মিসরি ব্যক্তিকে চাবুক দিয়ে আঘাত করেন এবং তাকে বলেন: "এটি নাও, আমি অভিজাত বংশের সন্তান।" এরপর ইবনুল আস সেই মিসরিকে বন্দি করে রাখেন এই ভয়ে যে, সে যেন খলিফার কাছে তার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে না পারে। যখন সেই মিসরি ব্যক্তি বন্দিশালা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, সে মদিনায় যায় এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে তার ওপর ঘটে যাওয়া অবিচারের অভিযোগ জানায়। উমর ইবনুল খাত্তাব তাকে মদিনায় রেখে দেন।

এরপর তিনি মিসর থেকে আমর ও তার পুত্রকে খিলাফতের রাজধানীতে তলব করেন এবং তাদের উভয়কে কিসাস বা প্রতিশোধের মজলিসে আহ্বান করেন। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হলো, উমর (রা.) ডাক দিয়ে বললেন: "মিসরি কোথায়? এই নাও চাবুক (প্রহার করার লাঠি), অর্থাৎ চাবুকটি ধরো এবং এই 'অভিজাত বংশের সন্তানকে' আঘাত করো।" তখন সেই মিসরি ব্যক্তি মুহাম্মদকে আঘাত করতে শুরু করল এবং তাকে জর্জরিত করে ফেলল, আর উমর (রা.) বলছিলেন: "অভিজাত বংশের সন্তানকে মারো।" যখন লোকটি প্রহার শেষ করল এবং আমিরুল মুমিনীনকে চাবুকটি ফিরিয়ে দিতে চাইল, তখন তিনি তাকে বললেন: "এটি আমরের টাক মাথার ওপর রাখো। আল্লাহর শপথ! তার ছেলে তোমাকে কেবল তার পিতার ক্ষমতার দাপটেই প্রহার করেছিল।" আমর (রা.) বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি আপনার হক উসুল করেছেন এবং আপনার প্রশান্তি লাভ হয়েছে।" মিসরি বলল: "হে আমিরুল মুমিনীন, যে আমাকে প্রহার করেছে আমি তাকেই প্রহার করেছি।" উমর (রা.) বললেন: "আল্লাহর শপথ! তুমি যদি তাকে (আমরকেও) আঘাত করতে, তবে আমরা তোমার এবং তার মাঝে বাধা হতাম না যতক্ষণ না তুমি নিজেই তাকে ছেড়ে দিতে।" এরপর তিনি রাগান্বিত হয়ে আমরের দিকে ফিরে বললেন: "হে আমর! তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাসে পরিণত করলে, অথচ তাদের মায়েরা তো তাদের স্বাধীন হিসেবেই জন্ম দিয়েছে?!"

মুসলিম বিচারকগণ তাদের বিচারকার্যে সমতার নীতিকে সম্ভবপর সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) একটি বর্ম হারিয়ে ফেলেন—তখন তিনি ছিলেন মুসলিমদের খলিফা। এরপর তিনি বর্মটি বাজারে একজন খ্রিস্টানের কাছে দেখতে পান। তখন আলী ইবনে আবু তালিব মুসলিমদের বিচারক শুরাইহের কাছে যান এবং সেই বর্ম নিয়ে খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হন। তিনি বলেন: "এটি আমার বর্ম, আমি এটি বিক্রি করিনি এবং দানও করিনি।" অর্থাৎ, আমি এটি বিক্রিও করিনি, কাউকে উপহার হিসেবেও দেইনি। বিচারক শুরাইহ খ্রিস্টানকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাকে বললেন: তোমার কথা কী...

আমীরুল মুমিনীন যা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন? খ্রিস্টান লোকটি বলল: এই বর্মটি আমার বর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, আর আমার কাছে আমীরুল মুমিনীন কোনো মিথ্যাবাদী নন। তখন শুরাইহ আলীর দিকে ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে? এই বর্মটি যে কেবল আপনারই—এ বিষয়ে আপনার কাছে কি কোনো সাক্ষী আছে? আলী বললেন: শুরাইহ ঠিকই বলেছে, আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তখন শুরাইহ বর্মটি খ্রিস্টান লোকটির বলে ফয়সালা দিলেন। সে বর্মটি নিয়ে চলে গেল এবং আমীরুল মুমিনীন তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

ষষ্ঠত: মানবিক সহযোগিতা: কোনো মানুষই নিজের যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু নিজে নিজে সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়। তাই তাকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়, যেমন অন্যরাও তার সাহায্য গ্রহণ করে। কেননা মানুষ পরিবেশ ও সমাজের একটি অংশ; সে অন্যকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও প্রভাবিত হয়, অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং অন্যরাও তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব। আর যেহেতু সকল মানুষ একটি মূল উৎস থেকে উদ্ভূত, তাই এটি পারস্পরিক সহযোগিতার পথে অধিকতর আহ্বানকারী। মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য একে অপরের সাথে লড়াই করা ছিল না, বরং একে অপরকে জানার জন্য। আর এই জানাশোনা কেবল ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ বলেন: "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" [আল-হুজুরাত: ১৩]। ইসলামে সহযোগিতা হলো সকল মানবীয় গোষ্ঠীর জন্য একটি সাধারণ মূলনীতি। আল্লাহ তাআলার এই বাণী এর প্রমাণ দেয়: "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।" [আল-মায়িদাহ: ২]

পরিবারের ভিত্তি এবং জাতির স্থায়িত্ব হলো সহযোগিতা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো: তিনি যখন মদিনায় আসলেন, তখন ইহুদিদের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি করেন যার ভিত্তি ছিল কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা, সচ্চরিত্র রক্ষা এবং অনিষ্ট প্রতিরোধ। এই চুক্তিটিকে "সহীফাহ" বা সনদ বলা হতো। এই সনদে অনেক বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল যা মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে কীভাবে সহযোগিতা অর্জিত হবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। অনুরূপভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরব গোত্রগুলোর সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যার উৎস ছিল সহনশীলতা এবং মূল লক্ষ্য ছিল দয়া ও মমতা; যার অন্যতম হলো হুদাইবিয়ার সন্ধি। তিনি খায়বারের ইহুদিদের সাথে কৃষি ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি করেছিলেন, যেখানে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জমিতে তাদের বহাল রেখেছিলেন এবং ফল বা ফসল যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক ছিল তাদের জন্য।

এর প্রমাণ হলো যা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে: "নবী (সা.) খায়বারবাসীদের সাথে সেখান থেকে যা উৎপন্ন হয় তার অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন" অর্থাৎ ভূমি থেকে উৎপাদিত ফল বা ফসল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: "আল্লাহর রাসূল (সা.) খায়বারের জমি ইহুদিদের এই শর্তে অর্পণ করেছিলেন যে, তারা সেখানে কাজ করবে এবং চাষাবাদ করবে আর সেখান থেকে যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে।" বরং নবী (সা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন যে ব্যক্তি যেকোনো অঞ্চলে বা যেকোনো স্থানে তার মানব ভাইকে সাহায্য করে। তিনি (সা.) বলেন: "আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।" এই হাদিসে নবী (সা.) 'ভাই' শব্দটিকে নির্দিষ্ট করেননি, বরং একে সাধারণ রেখেছেন। শব্দটি সাধারণভাবে আসার কারণে এটি মানবিক ভ্রাতৃত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং তা কেবল ধর্মীয় বা আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

এভাবে আমরা দেখি যে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে আহ্বানকারী প্রতিটি বিষয়, যা সত্য ও ন্যায়ের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, শরীয়ত সেটির প্রতি উৎসাহিত করে। কারণ এটি সৎকর্ম ও তাকওয়ার ওপর পারস্পরিক সহযোগিতার একটি স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

সপ্তম: আকিদার স্বাধীনতা: ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে আরও একটি মূলনীতি হলো: স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতার অর্থ হলো: ব্যক্তিকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা বা বাধা থেকে মুক্ত করা এবং স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করার সক্ষমতা প্রদান করা। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তি সে-ই যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, সে দাসত্ব বা বন্দিত্বের অধীন নয়। স্বাধীনতার অর্থ হলো বন্দিত্ব ও দাসত্ব থেকে মুক্তি। এটি স্বাধীন মানুষের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত, যার মধ্যে উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। এ কারণেই স্বাধীনতা শব্দটি 'স্বাধীন' (হুর) থেকে উদ্ভূত এবং ব্যক্তি এর মাধ্যমে ভূষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ব্যক্তি সে-ই যে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করে, আর যখন তার মধ্যে এটি অর্জিত হয়, তখন সে প্রকৃতই স্বাধীন হয়।

যদি আমরা ফিকহী পরিভাষায় স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই, তবে আমরা বলব: ইসলামি শরীয়ত 'স্বাধীনতা' শব্দের জন্য এমন কোনো স্বতন্ত্র পরিভাষাগত অর্থ নির্ধারণ করেনি যা এর আভিধানিক অর্থ থেকে ভিন্ন—যার কিছু অংশের দিকে আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি। তেমনিভাবে আদি ফকীহগণও এ সম্পর্কে আলাদা কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি, তবে কেউ কেউ—

আধুনিক পণ্ডিতগণ একে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, এটি হলো মানুষের সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি এবং শরীয়ত নির্ধারিত প্রতিটি মানবিক অধিকার ভোগ করা। এগুলো মানুষের জন্য স্বাভাবিক অধিকার। যখন তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাদের ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নেওয়া হয় এবং তারা তাদের মানবিকতা হারিয়ে ফেলে। একারণে ইসলাম এই অধিকারসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং এতে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এসেছে যেহেতু সে মানুষ। ফলে এটি মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহর অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: “আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছি।” [আল-ইসরা: ৭০]

ইসলাম গোড়া থেকেই শ্রেণিভেদ প্রথা বিলুপ্ত করেছে। তার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান; তাকওয়া এবং নেক আমল ছাড়া কেউ কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন: “হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।” [আল-হুজুরাত: ১৩]। তিনি আরও বলেন: “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।” [আন-নিসা: ১]। এর মধ্যে আদি উৎসের অভিন্নতার স্বীকৃতি রয়েছে, যা লিঙ্গ বা শ্রেণির ভিত্তিতে কোনো প্রকার পার্থক্যের অবকাশ রাখে না। ইসলামে স্বাধীনতার দর্শন হলো মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ দাসত্বের মধ্যে নিহিত থাকা। এই দাসত্বের অর্থ হলো মানুষ তার স্বজাতির ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। কারণ সবাই যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই তারা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন। মানুষ যখন স্বাধীনতার এই নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করে, তখন সে বাস্তবে তা অনুভব করে এবং এক মহৎ প্রাণ নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে; সে শক্তি, সম্পদ বা পদের কাছে মাথা নত করে না।

রাসূলগণের—তাঁদের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে এই দাসত্ব শিক্ষা দেওয়া। তাঁদের সবার মিশন ছিল মানুষের ওপর মানুষের দাসত্ব বিলুপ্ত করা এবং তার পরিবর্তে সবার জন্য আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে তাঁরা ঐসব মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যারা মানবিক সীমা অতিক্রম করেছিল এবং দাবি করেছিল...

তাদের মতো সাধারণ মানুষের ওপর মিথ্যা প্রভুত্বের দাবি করা; যেন তারা তাদের ওপর হওয়া জুলুম প্রতিহত করতে পারে যারা এই প্রভুত্বের দাবি করেছিল, এবং যেন তারা তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে, এবং তাদেরকে একটি ন্যায়নিষ্ঠ জীবন ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত করতে পারে, যেখানে কোনো মানুষ অন্য মানুষের দাস হবে না, বরং সকল মানুষ একত্রে কেবল আল্লাহর বান্দা হিসেবে গণ্য হবে।

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: "তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" (সূরা আল-আনআম: ১০২)। তিনি আরও বলেন: "বলুন: হে কিতাবধারীগণ! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; তা হলো—আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করবে না।" (সূরা আল ইমরান: ৬৪)। এটিই সেই ঐশী আহ্বান যা মানুষের বিবেক ও চিন্তাধারাকে মুক্ত করেছে; এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও জাগতিক যত শক্তি রয়েছে সেগুলোকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে; এবং তাদের ওপর থেকে সেই গুরুভার নামিয়ে দিয়েছে যার নিচে তারা পিষ্ট হচ্ছিল।

ইসলামে স্বাধীনতার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক; ইসলাম যখন স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানিয়েছে তখন তা কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য ছিল না, কিংবা কেবল গোষ্ঠীগত স্বাধীনতার জন্যও ছিল না, বরং এই স্বাধীনতাকে পৃথিবীর সকল প্রান্তে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার ও সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ তার মনুষ্যত্বে স্বাধীন, তার বিশ্বাসে স্বাধীন এবং তার মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

সারকথা হলো: ইসলাম প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবিক, নাগরিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং স্বাধীনতার অন্যান্য সকল রূপ ও বৈচিত্র্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

এই ধারণার স্বাধীনতাকে ইসলাম মুমিনদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করেছে এবং একে তাদের আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করেছে; একারণেই আমরা দেখি যে মুসলিম সমাজ মহান আল্লাহর দাসত্বের আইনের অনুগত থাকে এবং একে নিজেদের ওপর

এক আবশ্যিক কর্তব্য ও তাঁদের স্রষ্টা আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচনা করে, আর এর মাধ্যমেই তারা তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে।

আমরা যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো: অমুসলিমদের জন্য ইসলাম যে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

পঞ্চদশ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

ইসলাম তার সুমহান গ্রন্থে বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করেছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছে।"** [আল-বাকারা: ২৫৬]। ইমাম আল-রাজি এই আয়াতের তাফসিরে বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ঈমানের বিষয়টি বাধ্যবাধকতা ও জবরদস্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেননি, বরং তিনি একে সামর্থ্য ও পছন্দের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাওহিদের প্রমাণসমূহ এমন পর্যাপ্ত ও অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন যেন অজুহাতের কোনো অবকাশ না থাকে।

তিনি এরপর বলেন: এই প্রমাণগুলো সুস্পষ্ট হওয়ার পর কোনো কাফিরের জন্য কুফরিতে অটল থাকার আর কোনো অজুহাত অবশিষ্ট নেই। তবে যদি তাকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং তার ওপর জবরদস্তি করা হয়, যা এই পার্থিব জীবনে জায়েজ নয়; কারণ এটি হলো পরীক্ষার ঘর। কেননা ধর্মে জবরদস্তি ও বাধ্য করা পরীক্ষা ও আজমাইশের তাৎপর্যকে বাতিল করে দেয়।

আর যে বিষয়টি এই কথাকে দৃঢ় করে তা হলো আল্লাহ তাআলার পরবর্তী বাণী: **"ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছে।"** অর্থাৎ: প্রমাণসমূহ উদ্ভাসিত হয়েছে এবং নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট হয়েছে, এমতাবস্থায় এরপর কেবল বলপ্রয়োগ এবং জবরদস্তির পথই অবশিষ্ট থাকে; আর তা বৈধ নয়, কারণ এটি শারয়ি দায়িত্ব অর্পণের (তাকলিফ) পরিপন্থী।

এর অর্থ হলো: যদি কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় তবে তার ওপর সেই জবরদস্তি জায়েজ হবে না। আর এই জবরদস্তিমূলক ইসলামের ফলাফল এই হবে যে, তার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ না তার থেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাওয়ার আগে যদি সে মারা যায় তবে তার বিধান কাফিরদের বিধানের মতোই হবে এবং তার সাথে মুসলিমসুলভ আচরণ করা হবে না। তদ্রূপ সে যদি কুফরিতে ফিরে যায় তবে তার ওপর মুরতাদ হওয়ার বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং ফলশ্রুতিতে তাকে হত্যা করাও জায়েজ হবে না। কারণ তাকে এমন একটি বিষয়ে বাধ্য করা হয়েছে যাতে ইসলাম জবরদস্তির অনুমতি দেয় না, তাই তার ওপর এর হুকুমও কার্যকর হবে না।

এই বিষয়টি একজন মুসলিমের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যাকে যদি কুফরিতে বাধ্য করা হয়; তবে তাকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে না যতক্ষণ তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল থাকে। মহান আল্লাহ বলেন: **"তবে তার কথা ভিন্ন, যাকে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর ঈমানে অটল।"** [আন-নাহল: ১০৬]।

সুতরাং যে আল্লাহ মানুষকে তাদের চিন্তায় স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, বরং তাদের স্বাধীনতাকে সম্মানিত করেছেন, তিনি তাদের ওপর ঈমান আনতে বা তাঁর ইবাদত করতে জবরদস্তি করেননি। তিনি তাদের সাথে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আচরণ করেননি, এমনকি মঙ্গলের ক্ষেত্রেও।

আসি-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ

এটি এই বিষয়ের দিকে ফিরে যায় যে, প্রকৃত ইবাদত এবং যুক্তিসঙ্গত দায়িত্বারোপের (তাকলিফ) মর্মার্থ জবরদস্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এরপর মহাবিশ্বের নিয়মাবলিকে ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার নিজস্ব ধারায় কাজ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এটি এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাওহীদের মূল চেতনা স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। আর ঈমান কেবলমাত্র অনুভূতির চেয়েও বেশি কিছু; বাস্তবে এটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে অর্জিত মানসিক প্রশান্তির অনুরূপ।

অন্যদিকে মহান আল্লাহ সকল মানুষকে ঈমান বা কুফরের ক্ষেত্রে এক উম্মত বা জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম। তবে মানুষের মধ্যে তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসগত মতপার্থক্য সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাঙ্ক্ষা করতেন যেন সকল মানুষ ঈমান আনে এবং তাদের কারো কারো কুফরির কারণে তিনি ব্যথিত হতেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "আর আপনার রব যদি ইচ্ছা করতেন, তবে জমিনে যারা আছে তারা সবাই একত্রে ঈমান আনত। তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন?" (সূরা ইউনুস: ৯৯)।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের তাফসিরে বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের ঈমানের ব্যাপারে অতি আগ্রহী ছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে অবহিত করলেন যে, যার জন্য আদি লিপি (তাকদীর)-তে সৌভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যতীত কেউ ঈমান আনবে না। আর যার জন্য আদি লিপিতে দুর্ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে আছে, সে ব্যতীত কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। এর ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তাআলা আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা ইসলাম ধর্মে প্রবেশের জন্য কাউকে বাধ্য না করি। কারণ ইসলাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল; এর প্রমাণাদি ও দলিলসমূহ কাউকে এতে প্রবেশের জন্য বাধ্য করার প্রয়োজন রাখে না। বরং আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, যার বক্ষ উন্মোচিত করে দেন এবং যার অন্তর্দৃষ্টিকে আলোকিত করেন, সে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই এতে প্রবেশ করে। আর আল্লাহ যার অন্তর অন্ধ করে দিয়েছেন এবং যার কান ও চোখের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, জবরদস্তি করে ধর্মে প্রবেশ করানো তার কোনো উপকারে আসে না।"

ইসলাম এটিই নির্ধারণ করেছে; কারণ ইসলাম মনে করে যে, তার নিকট গ্রহণযোগ্য সঠিক ঈমান হলো সেটিই যা বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ এবং সন্তুষ্টি ও আগ্রহের ভিত্তিতে অর্জিত হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয় থেকে উৎসারিত। ইসলাম এই ভাবধারার মধ্যেই নিজেকে উপস্থাপন করেছে এবং এর বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটায়নি। ইসলাম বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে প্রতিটি মানুষের জন্য সকল যুগে ও সকল স্থানে একটি স্বভাবজাত অধিকার হিসেবে গণ্য করে, যা ভোগ করার সুযোগ তাকে সর্বদা প্রদান করা আবশ্যক। বরং এটি মানুষের এমন এক প্রাথমিক অধিকার যার মাধ্যমে তার মনুষ্যত্বের পরিচয় সাব্যস্ত হয়; যদি এটি তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তবে তার মনুষ্যত্বকেই ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

ইসলামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত নয় যে, সে নিজেকে মানুষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেবে, যাতে এটিই একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়; কারণ এ জাতীয় যেকোনো প্রচেষ্টা একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বরং এটি অস্তিত্বের স্বভাবজাত নিয়মের বিরোধিতা এবং বিশ্বজগতের রবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠকারিতা।

এমন কিছু ধ্রুব সত্য রয়েছে যা ইসলাম তার অনুসারীদের মানসপটে গেঁথে দিয়েছে, যা তাদের ভিন্নধর্মীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সহনশীল করে তুলেছে। এই সত্যগুলো একজন মুসলিমের এই বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত যে, মানুষের ধর্ম, লিঙ্গ বা বর্ণ যা-ই হোক না কেন, সে মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে যে, মানুষের ধর্মীয় বিভেদ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। সে আরও বিশ্বাস করে যে, কাফেরদের কুফরির হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব তার নয়; কারণ কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব হবে আল্লাহর নিকট। তবে পরিশেষে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, ইসলামে বিশ্বাসের স্বাধীনতার ধারণাটি আধুনিক ব্যবস্থার ধারণা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন; কারণ আধুনিক ব্যবস্থাগুলো বিশ্বাসের স্বাধীনতার ধারণাকে ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার (মুরতাদ হওয়ার) স্বাধীনতা পর্যন্ত বিস্তৃত করে।

ইসলামী ব্যবস্থা এ বিষয়ে দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে:

প্রথমত: সূচনালগ্নে বিশ্বাসের স্বাধীনতা; এখানে ইসলাম ধর্মে প্রবেশের জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা সকলের জন্য নিশ্চিত।

দ্বিতীয়ত: ধর্মত্যাগের স্বাধীনতা; অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশের পর তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। ইসলাম এই স্বাধীনতাকে অনুমোদন দেয় না এবং এর চর্চাকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করে। সুতরাং, সূচনালগ্নে বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইসলাম সকল মানুষের জন্য নিশ্চিত করেছে, তাদের ধর্ম ও অনুসারী যা-ই হোক না কেন; এক্ষেত্রে জাতি ও বর্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়ে শরীয়তের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ইসলামে আকিদা বা বিশ্বাস যেহেতু একটি তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়, যার একমাত্র পথ হলো বুঝানো ও সন্তুষ্ট করা; তাই এটি কোনো জবরদস্তি গ্রহণ করে না। আকল বা বিবেকই এটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, এটি কোনো...

পৃষ্ঠা 1

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

জবরদস্তির কোনো পথ নেই, যেমনটি আমরা স্পষ্ট করেছি। আর এই ধারণার মাধ্যমেই এই বিষয়ে শরীয়তের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে যার দ্বারা শরীয়ত স্বতন্ত্র হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে:

ইসলামের আকিদা স্বভাবগতভাবেই সহজ ও সাবলীলতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এতে কোনো স্ববিরোধিতা বা জটিল সমস্যা নেই। আর স্পষ্ট ও সহজ বিষয়গুলোর প্রকৃতিই হলো মানুষ তা সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করবে। ঠিক তেমনি জটিল ও স্ববিরোধী বিষয়গুলোর প্রকৃতি হলো মানুষ সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে এবং তা থেকে বিমুখ হবে। ফলশ্রুতিতে, মানুষকে তা গ্রহণ করানোর জন্য তাদের ওপর তা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া এবং বাধ্য করার প্রয়োজন পড়ে। ইসলামের আকিদার প্রকৃতি এমন নয়; কেননা ইসলাম সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, জবরদস্তির মাধ্যমে অর্জিত ঈমানের কোনো মূল্য নেই এবং এর অধিকারীরও কোনো মর্যাদা নেই। মহান আল্লাহ ফেরাউন সম্পর্কে বলেছেন, যখন সে ডুবতে শুরু করল এবং বলল: "আমি বিশ্বাস আনলাম যে, বনী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।" [ইউনুস: ৯০]। তখন আল্লাহ উত্তরে বললেন: "এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছ এবং তুমি ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" [ইউনুস: ৯১]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল: আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরিক করতাম তাদের অস্বীকার করলাম। কিন্তু যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসল না। আল্লাহর এই বিধান তাঁর বান্দাদের মধ্যে অতীত থেকেই চলে আসছে। আর সেখানে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।" [গাফির: ৮৪, ৮৫]।

তেমনিভাবে মহান আল্লাহ সেই তাওবাকে গণ্য না করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যার উৎস হলো জবরদস্তি বা আযাব প্রত্যক্ষ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে: আমি এখন তাওবা করছি। আর তাদের জন্যও নয় যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এদের জন্যই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।" [আন-নিসা: ১৮]।

অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও যে: ইসলামী শরীয়তের দলিলসমূহ প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী আকিদার প্রতি আশ্বস্ত করার মাধ্যম হলো উত্তম উপদেশ এবং শ্রেষ্ঠ পন্থায় বিতর্ক করা; যেমনটি এর পূর্ববর্তী আসমানী রিসালাতগুলোর ক্ষেত্রেও ছিল। আসুন আমরা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কথা শুনি, যখন তিনি...

পৃষ্ঠা 2

শরিয়াহ রাজনীতি

তিনি তাঁর কওমের সাথে বিতর্ক করেন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয় বরং দলিলের মাধ্যমে তাদের যুক্তি খণ্ডন করেন; তিনি বলেন: "হে আমার কওম! তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত দান করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তবে আমি কি তোমাদের ওপর তা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারি, যখন তোমরা তা অপছন্দ করো?" [হুদ: ২৮] অতঃপর আদ জাতির কথা শুনুন, যখন তারা তাদের নবীকে বলছিল: "তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের বর্জনকারী নই এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীও নই" [হুদ: ৫৩]। এ কারণে হুদ (আ.) তাঁর রবের দিকে মনোনিবেশ করে বললেন: "নিশ্চয়ই আমি আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি" [হুদ: ৫৬]।

অতঃপর ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কথা শুনুন—যখন তিনি অত্যন্ত বিনম্রতা ও কোমলতার সাথে তাঁর পিতার সাথে বিতর্ক করছিলেন এবং তাকে বলছিলেন: "যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন কিছুর ইবাদত করেন যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো উপকারে আসে না? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না, নিশ্চয়ই শয়তান পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করছি যে, পরম দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, ফলে আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবেন। (পিতা) বললেন, হে ইবরাহিম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর ছুড়ে মারব, আর তুমি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও।" [মারইয়াম: ৪২-৪৬]

অতঃপর সেই দয়ালু নবী তাঁর পিতাকে উত্তরে বললেন: "তিনি বললেন, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি অচিরেই আমার রবের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। আর আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি, আর আমি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করছি; আশা করি আমি আমার রবের নিকট দুআ করে বঞ্চিত হব না।" [মারইয়াম: ৪৭-৪৮]

এটিই হলো নবীদের মানহাজ বা পদ্ধতি, এবং এটিই হলো রাসূলদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানহাজ। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবানে বলেন: "বলুন, এটিই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারা পূর্ণ জাগ্রত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।" [ইউসুফ: ১০৮]

অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামি দাওয়াতের ধারক—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—মহামহিম আল্লাহর সামনে কিংবা সৃষ্টির সামনে ওহির মাধ্যমে যা নাজিল হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে দায়বদ্ধ নন; আর তা হলো পৌঁছে দেওয়া এবং সতর্ক করার দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন: "রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেওয়া।"

...সুস্পষ্ট। (আন-নূর: ৫৪) এবং মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের ওপর কোনো কর্মনিয়ন্ত্রক নন।" (আল-গাশিয়াহ: ২১, ২২)। এর ওপর ভিত্তি করে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের ঈমান আনয়ন কিংবা তাদের এর ওপর বাধ্য করার জন্য দায়বদ্ধ নন। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: "তাদেরকে হেদায়াত দানের দায়িত্ব আপনার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।" (আল-বাকারা: ২৭২)।

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে সকল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি হলো: ন্যায়বিচার (আল-আদল):

ইসলাম ন্যায়বিচারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে; কারণ এর মর্যাদা অতি মহৎ এবং এর অবস্থান অত্যন্ত সুউচ্চ। এটি এমন একটি ভিত্তি যার ওপর জাতিসমূহের উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন পন্থায় ন্যায়বিচারের আদেশ প্রদান করা হয়েছে, যা এর মর্যাদাকে সমুন্নত করে এবং এটি আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা স্পষ্ট করে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন, আল্লাহই উভয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ হিতৈষী। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" (আন-নিসা: ১৩৫)। এখানে ন্যায়বিচারের নির্দেশটি আধিক্যসূচক শব্দে (সিগাহ মুবালগা) এসেছে: "কাওয়্যামীন" (দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠাকারী), যাতে তা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়। এটি একটি আধিক্যসূচক শব্দগঠন, যার অর্থ হলো: তোমাদের পক্ষ থেকে যেন বারবার ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর "তোমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠাকারী হও" এর অর্থ হলো: ইনসাফ কায়েম করার ক্ষেত্রে এই আধিক্য ও বিশেষ যত্ন যেন তোমাদের একটি চরিত্রে পরিণত হয়, যা তোমরা অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে অন্বেষণ করবে; এমনকি তা তোমাদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, কোনো অবস্থাতেই তোমরা তা বর্জন করবে না, তোমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। সুতরাং তোমরা দুর্বলতার কারণে দরিদ্রের প্রতি অনুরাগী হয়ে কিংবা সচ্ছলতার কারণে ধনীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। বরং সত্যের ওপর অটল থাকো; কারণ আল্লাহ—যিনি একজনকে ধনী ও অন্যজনকে দরিদ্র বানিয়েছেন—দরিদ্রের প্রতি এই বিষয়ে অধিক দয়াবান যে, তিনি তাকে স্বীয় অনুগ্রহে সত্যের মাধ্যমে অভাবমুক্ত করবেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় নয়। আর আল্লাহ ধনীর ব্যাপারেও অধিক হকদার যে, তিনি তার হাতে যা আছে তা ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন, কোনো প্রকার চাতুরি বা অন্যায়ের মাধ্যমে নয়।

ন্যায়বিচার যেমন বন্ধুদের প্রাপ্য অধিকার, তেমনি তা শত্রুদেরও প্রাপ্য। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: শত্রুতা যেন কখনো জুলুমের পথে পরিচালিত না করে; কেননা শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার করা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে তোমরা সুবিচার করবে না। তোমরা সুবিচার করো; তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"** [আল-মায়িদাহ: ৮] অর্থাৎ: কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের তাদের বিষয়ে বিচারে এবং তোমাদের আচরণে সুবিচার না করার প্রতি প্ররোচিত না করে; যার ফলে তোমাদের ও তাদের মধ্যকার শত্রুতার কারণে তোমরা তাদের ওপর জুলুম করো। ইমাম তাবারী বলেন: মহান আল্লাহ তাঁর বাণী— **"তোমরা সুবিচার করো; তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী"** দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন— হে মুমিনগণ! মানুষের মধ্যে যে কেউ হোক না কেন, সে তোমাদের বন্ধু হোক কিংবা শত্রু, তোমরা সকলের প্রতি সুবিচার করো। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আমার নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করো এবং তাদের কারো প্রতি জুলুম করো না। হে মুমিনগণ! তোমাদের এই সুবিচার চর্চা তোমাদের জন্য তাকওয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিক নিকটবর্তী মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা সুবিচারকে এই গুনে গুণান্বিত করেছেন যে, তা জুলুমের তুলনায় তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী; কারণ যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয় সে তার ইনসাফের কারণে অনুগত বান্দা হিসেবে গণ্য হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয় সে নিঃসন্দেহে তাকওয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জালেম বা অন্যায়কারী, সে আল্লাহর অবাধ্য। আর যে আল্লাহর অবাধ্য, সে আল্লাহর তাকওয়া থেকে দূরে অবস্থানকারী।

আল্লাহ তাআলা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এমনকি বিবাদমান পক্ষগুলো যদি কাফেরও হয়। মহান আল্লাহ বলেন: **"অতঃপর যদি তারা আপনার কাছে আসে তবে আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন অথবা তাদের এড়িয়ে চলুন। আর যদি আপনি তাদের এড়িয়ে চলেন তবে তারা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি ফয়সালা করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।"** [আল-মায়িদাহ: ৪২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: **"তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করুন"** অর্থাৎ ইনসাফের সাথে। আর তা হলো সেই বিধান দ্বারা ফয়সালা করা যা আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী-এর উম্মতসহ তাঁর সকল সৃষ্টির জন্য অনুরূপ ক্ষেত্রে বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা 'মুকসিতিন'—অর্থাৎ সেই সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের ভালোবাসেন যারা মানুষের মাঝে বিচারে ইনসাফ করেন এবং তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবে অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করেন।

আরেকটি বিষয় যা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক তা হলো, শরীয়ত যে সুবিচার নিয়ে এসেছে তা মূলত এক নিরঙ্কুশ সুবিচার; যা দ্বারা মানবজাতি জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রে সুখী হতে পারে। শরীয়ত সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "শরীয়ত পুরোটাই সুবিচার, পুরোটাই রহমত, পুরোটাই কল্যাণ এবং পুরোটাই প্রজ্ঞা। সুতরাং যে কোনো বিষয় যা সুবিচার থেকে জুলুমের দিকে, রহমত থেকে তার বিপরীতে এবং কল্যাণ থেকে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয় এবং..."

...প্রজ্ঞা থেকে নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়, তবে তা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা শরীয়ত হলো তাঁর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর ইনসাফ, তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁর রহমত, তাঁর যমীনে তাঁর ছায়া এবং তাঁর এমন হিকমত যা তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় এবং যা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যতারও প্রমাণ বহন করে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্পর্ক যে সকল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম হলো: অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

নিশ্চয়ই অঙ্গীকার পূর্ণ করা একটি মহৎ চরিত্র এবং উত্তম গুণ। এ কারণেই ইসলাম অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: “হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।” (সূরা আল-মায়িদাহ: ১) অর্থাৎ: তোমরা সেই সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করো যা তোমরা তোমাদের রবের সাথে করেছ, এবং সেই সকল চুক্তি যা তোমরা তাঁর সাথে সম্পাদন করেছ এবং যার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের ওপর বিভিন্ন হক বা অধিকার অনিবার্য করেছ। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তোমরা নিজেদের ওপর যে সকল বিষয় ফরজ হিসেবে আবশ্যক করে নিয়েছ, তা আনুগত্য, পূর্ণতা ও যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো—যেহেতু তিনি তা তোমাদের ওপর আবশ্যক করেছেন। আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, তাদের প্রাপ্য হিসেবে নিজেদের ওপর যা অনিবার্য করেছ তা রক্ষা করো। আর তা সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করো না।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: “এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো; নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।” (সূরা আল-ইসরা: ৩৪) অর্থাৎ: যুদ্ধরত পক্ষ ও ইসলামের মধ্যে সন্ধির ক্ষেত্রে তোমরা মানুষের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করো তা পূর্ণ করো। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ও অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রেও তা পালন করো। মহান আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গকারীকে তার অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি বলেন: হে মানুষ! তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে এবং যাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ তাদের সাথে সম্পাদিত বৈধ অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করো না; অন্যথায় তোমরা একে তুচ্ছজ্ঞান করলে এবং যাদেরকে কথা দিয়েছিলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

অঙ্গীকার পূর্ণ করা নবীদের চরিত্র। মহান আল্লাহ বলেন: “আর এই কিতাবে ইসমাইলের কথা স্মরণ করো, নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন

অঙ্গীকার রক্ষায় সত্যবাদী।” (সূরা মারইয়াম: ৫৪) এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলছেন: হে মুহাম্মদ! তুমি এই কিতাবে ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের কথা উল্লেখ করো এবং তাঁর সংবাদ বর্ণনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিতে মিথ্যা বলতেন না এবং তা ভঙ্গ করতেন না। বরং তিনি যখন তাঁর রবের কাছে অথবা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দার কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতেন, তখন তিনি তা পূর্ণ করতেন।

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন: "আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।" [মুমিনুন: ৮] অর্থাৎ: তাদের নিকট গচ্ছিত আমানতসমূহ এবং তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ—যা মূলত মানুষের সাথে সম্পাদিত তাদের চুক্তি—তারা তা রক্ষা করে। অর্থাৎ তারা তা সংরক্ষণ করে, বিনষ্ট করে না; বরং তারা এসব পুরোপুরি পালন করে।

কুরআন সতর্ক করেছে যে, যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সে নিন্দিত, বরং সে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম বিচরণশীল প্রাণী। কুরআনুল কারীম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইয়াহূদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম বিচরণশীল প্রাণী হচ্ছে তারাই যারা কুফরি করেছে, ফলে তারা ঈমান আনবে না। যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ, অতঃপর তারা প্রতিবারই তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা ভয় করে না।" [আনফাল: ৫৫-৫৬]

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "তারা ছিল বনূ কুরাইজা। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং বদর যুদ্ধের দিন তারা মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। এরপর তারা বলেছিল: 'আমরা ভুল করেছি'। ফলে তিনি পুনরায় তাদের সাথে চুক্তি করেন, কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের দিন তারা আবারও তা ভঙ্গ করে।"

এবং তাঁর বাণী: "এবং তারা ভয় করে না" এর অর্থ হলো: বিবেকবান ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বভাব হলো চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা; যাতে মানুষ তার কথার প্রতি আশ্বস্ত হতে পারে এবং তার বক্তব্যের ওপর আস্থা রাখতে পারে। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে রয়েছে মহাপাপ। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়।" [সাফ: ২-৩] অর্থাৎ: হে মুমিনগণ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ: তোমরা এমন কথা কেন বলো যা কাজের মাধ্যমে সত্য প্রমাণ করো না? এমতাবস্থায় তোমাদের কাজ তোমাদের কথার বিপরীত হয়ে যায়। তোমরা যা করো না তা বলা তোমাদের রবের নিকট চরম ক্রোধের কারণ।

ইসলাম দুর্বলের সাথে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিও সবলের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মতোই শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়। কোনো রাষ্ট্রের দুর্বলতা যেন তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের কারণ না হয়। বরং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আবশ্যক; সেখানে কোনো প্রকার প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা চলবে না। কেননা এসবই নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন: "এবং যখন তোমরা অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং শপথ সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের ওপর..."

আশ-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ
...জামিনদার হিসেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (৯১) আর তোমরা সেই মহিলার মতো হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ কর এই অজুহাতে যে, এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আল্লাহ কেবল এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে, কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেবেন। (৯২) আর আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদের এক উম্মত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দেন। আর তোমরা যা আমল করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৯৩) আর তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যম বানিও না; অন্যথায় পা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদানের কারণে তোমরা অকল্যাণের স্বাদ গ্রহণ করবে আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (৯৪)
[আন-নাহল: ৯১ - ৯৪]

পূর্বোক্ত পাঠ্যসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে:

এতে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে; কেননা আল্লাহ তাআলা এর ওপর সাক্ষী, হিফাযতকারী এবং যামিন। আর এটি অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অধিক উদ্বুদ্ধকারী।

আরও: আয়াতটি ওই ব্যক্তিকে সেই নির্বোধ মহিলার সাথে তুলনা করেছে যে ওয়াদা খেলাফ করে, অঙ্গীকার করে এবং তা মজবুতভাবে স্থির করার পর পুনরায় তা ভঙ্গ করে; যে মহিলা সুতা কাটে এবং তা মজবুতভাবে পাকানোর পর আবার তা খুলে ফেলে। সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা একটি বোকামি, যা ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও দলসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর এটি কেবল কুচিন্তা ও মন্দ ব্যবস্থাপনারই বহিঃপ্রকাশ।

আয়াতটি এটিও স্পষ্ট করেছে যে, সংখ্যায় কম বা বেশি হওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণ হওয়া উচিত নয়, বরং অঙ্গীকার রক্ষা করা এবং তাতে অটল থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন; যাতে তিনি দেখেন কে নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার বিরোধিতা করে, আর কে এর অনুগামী হয়ে নিজ খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চলে।

এছাড়াও আয়াতটি ওই ব্যক্তির জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি অন্তর্ভুক্ত করেছে যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে প্রতারণা ও ফাসাদের আশ্রয় নেয়; ফলে তার পা পিছলে যায় এবং সে পতনের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং লাঞ্ছনার দিকে ধাবিত করে, আর এভাবেই বিষয়টি ঘটে থাকে।

আয়াতগুলো থেকে যা আহরিত হয়:

শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পথ হলো নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক আক্রমণ না করার চুক্তি। চুক্তিসমূহ কেবল তাদের লিখিত পাঠ্য থেকে শক্তি অর্জন করে না, বরং তা লাভ করে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর দৃঢ় সংকল্প ও বিশ্বস্ততা থেকে। এই কারণেই কুরআন অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাকে একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করেছে, আর একে ভঙ্গ করাকে দুর্বলতার কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ডান হাত দ্বারা তার অঙ্গীকার সুদৃঢ় করল, সে আল্লাহকে তার জামিনদার হিসেবে গ্রহণ করল। সুতরাং সে যদি তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে সে আল্লাহকে ধোঁকা ও মিথ্যাচারের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করল। আর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কারণ এটি হওয়া সমীচীন নয় যে, কোনো এক জাতি সম্পদ, জনবল ও সমরাস্ত্রে অন্য জাতির চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার বা অন্যের চেয়ে বিস্তৃত ভূখণ্ড অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে।

আল্লাহ তাআলা এটি স্পষ্ট করেছেন যে, অঙ্গীকার পূর্ণ করাই হলো সেই মৌলিক ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য যেদিকে মুমিনরা ধাবিত হয়; যেন মানুষের স্বেচ্ছাধীন সংকল্প ও নির্বাচনের মাধ্যমে মানবিক ঐক্যের তাৎপর্য অর্জিত হয় এবং মহান আল্লাহ যা চেয়েছেন তা বাস্তবায়িত হয়। তিনি চাইলে সমস্ত মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করতেন যে তারা কখনো মতভেদে লিপ্ত হতো না, কিন্তু এই মতভেদ দেওয়া হয়েছে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে কতটুকু অনুগত থাকে।

পবিত্র কুরআন যখন মুমিনদেরকে অঙ্গীকার সুদৃঢ় করতে, তা বাস্তবায়ন করতে এবং মানুষের মাঝে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানায়, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যিনি কুরআনের বাণীর প্রচারক—তিনিও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি নিশান বা পতাকা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে: এটি অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।" আবু রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কুরাইশরা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করেছিল। যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম, তখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি আর কখনোই তাদের কাছে ফিরে যাব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না এবং দূতদের আটকে রাখি না। বরং তুমি ফিরে যাও..."

তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাও - তোমার মনে এখন যা আছে তা যদি তখনও থেকে থাকে তবে ফিরে এসো। তিনি বললেন: অতঃপর আমি চলে গেলাম, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে যা নির্যাস পাওয়া যায়:

অঙ্গীকার পূরণ করা হলো সেই সব ভিত্তির অন্যতম যার ওপর ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক সম্পর্কসমূহ প্রতিষ্ঠিত; কারণ এতে

বন্ধন শক্তিশালী হয়, যোগাযোগ বজায় থাকে এবং সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। আর ইসলামী শরীয়াহর লক্ষ্যও এটাই।

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে সকল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি হলো: সচ্চরিত্রতা (ফজিলত):

ইসলাম সচ্চরিত্রতা বজায় রাখার আহ্বান জানায়, চাই সেই সম্পর্ক ব্যক্তিগত হোক, সামষ্টিক হোক কিংবা আন্তর্জাতিক হোক; কারণ এর মাধ্যমে ইসলামের সুউচ্চ মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয় এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয় যা তার দায়-দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

ইসলাম নৈতিকতার আইনকে একটি সার্বজনীন আইন হিসেবে দেখে, যা সাদা ও কালো, লাল ও হলুদ সকল বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পৃথিবীর সকল প্রান্ত ও জনপদের সকল মানুষকে শামিল করে। সচ্চরিত্র আচরণের নিয়ম অনুযায়ী সচ্চরিত্রতা প্রতিটি মানুষের অধিকার, যা সে তার মানবসত্ত্বার কারণে প্রাপ্য, যা সকল আদম সন্তানের মাঝে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মানুষের ওপর প্রয়োগযোগ্য ইসলামী নীতিসমূহে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত। সচ্চরিত্রতার নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন যে বিষয়টির প্রতি সবচাইতে বেশি জোর দিয়েছে তা জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট; যাতে যুদ্ধের তীব্রতার সময় মানুষের প্রবৃত্তি যেন এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির পরিপন্থী কোনো কাজের দিকে ধাবিত না হয়।

সুতরাং সচ্চরিত্রতা হলো এমন এক নৈতিকতা যা যুদ্ধের অবস্থায় শত্রুদের সাথেও প্রয়োগ করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন: "সুতরাং যে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ আক্রমণ করবে যেমন সে তোমাদের ওপর করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"

৭৫৯

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

“মুত্তাকীদের জন্য” [আল-বাকারা: ১৯৪]। তাকওয়া হলো একটি ফযীলত বা শ্রেষ্ঠগুণ; আর এই শ্রেষ্ঠগুণ মৃতদেহ বিকৃত করতে নিষেধ করে, যদিও শত্রুরা মুসলিমদের নিহতদের বিকৃতও করে থাকে। বুরাইদাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো বাহিনীর ওপর কোনো আমির বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার এবং তার সাথে থাকা মুসলিমদের সাথে কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন: "তোমরা আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমরা খিয়ানত করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, মৃতদেহ বিকৃত করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।"

ফযীলত বা শ্রেষ্ঠগুণ আমাদের বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণের আহ্বান জানায়, যদিও শত্রুরা আমাদের বন্দীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন যারা বন্দীদের অন্নদান করে। তিনি বলেন: "তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদের আহার দান করে।" [আল-ইনসান: ৮]। এখানে বন্দী বলতে দারুল হারব-এর সেই যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে, যাকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাস্ত করে পাকড়াও করা হয়েছে। এই পুণ্যবান ব্যক্তিরা তাদের আহার করানোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য, তাঁর সন্তুষ্টি এবং রহমত কামনা করেন। এভাবেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুসলিমদের আচরণ ফযীলতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তারা এর থেকে বিচ্যুত হয় না। তাই যুদ্ধ চলাকালীন মুসলিমরা নিরাপত্তা চুক্তিতে থাকা ব্যক্তিদের (মুস্তামিন) হত্যা করে না, যদিও শত্রুরা মুসলিম মুস্তামিনদের হত্যা করে। যুদ্ধ কেবল যোদ্ধাদের এবং যারা অস্ত্র ধারণ করে তাদের সাথেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" [আল-বাকারা: ১৯০]। সুতরাং যুদ্ধ কেবল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেই হবে।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়: ফযীলত বা শ্রেষ্ঠগুণ হলো সেই আদর্শিক কাঠামো যার অভ্যন্তরে মুসলিমদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড

আবর্তিত হয়। যা স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি শ্রেষ্ঠ সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখে।

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তিগুলোর অন্যতম হলো: সহনশীলতা (তাসামুহ):

ইসলাম জিম্মিদের (অমুসলিম নাগরিক) সাথে সহনশীলতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফলে তাদের এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকে স্বাধীন রাখা হয়েছে, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি করা হয়নি এবং তাদের কোনো নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...

৭৬০

পৃষ্ঠা 11

শরীয়াহ-ভিত্তিক রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার নীতিমালা সুদৃঢ় করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নাজরানের নাসারাদের (খ্রিস্টান) মধ্যে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তাতে আমরা দেখতে পাই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আকিদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। সেই চুক্তিনামার পাঠে এসেছে:

"নিশ্চয়ই তাদের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা ও তাঁর অঙ্গীকার রয়েছে। তাদের দ্বীন থেকে তাদের বিচ্যুত করা হবে না, তারা যে অবস্থায় ছিল তাতে কোনো পরিবর্তন আনা হবে না, তাদের কোনো অধিকারে এবং তাদের নিদর্শনসমূহে—অর্থাৎ ক্রুশ ও প্রতিকৃতিতে—কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। কোনো বিশপকে তার বিশপ পদ থেকে এবং কোনো পাদ্রিকে তার সন্ন্যাস জীবন থেকে বিচ্যুত করা হবে না।"

এই সন্ধিচুক্তি থেকে নাজরানবাসীদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সহনশীলতার মাত্রা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

অনুরূপভাবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদেরও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। ইয়ামেনে অবস্থানরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর নিকট তিনি লিখেছিলেন: "সাবধান! কোনো ইহুদিকে যেন তার ইহুদি ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা না হয়।" আমরা যদি উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এবং ইলিয়া (জেরুজালেম) বাসীদের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিটি লক্ষ্য করি, তবে দেখব যে, উমর (রা.) তাদের জানমাল, গির্জা এবং ক্রুশের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, এই গির্জাগুলোতে (মুসলিমদের পক্ষ থেকে) বসবাস করা হবে না, সেগুলো ধ্বংস করা হবে না এবং সেগুলোর কোনো অংশ কমানো হবে না। আরও ব্যাপক অর্থে: তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি করা হবে না এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাসের কারণে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

ইয়াদ ইবনে গানম (রা.) এবং শামের একটি শহরের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিপত্রে আমরা দেখতে পাই যে: তিনি তাদের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর বহাল রেখেছিলেন। তিনি তাদের জানমাল ও ইবাদতগাহের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন এবং নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, সেগুলো ধ্বংস করা হবে না এবং সেখানে বসবাস করা হবে না।

একইভাবে আমরা দামেস্কবাসীর সাথে সম্পাদিত সন্ধিতে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে দেখি: তিনি তাদের আকিদা-বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাদের ইবাদতগাহগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

আরও লক্ষ্য করুন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন, তখন চার্চ অফ দি হলি সেপালকারে (কানিজাতুল কিয়ামাহ) নামাজের সময় উপস্থিত হলে তিনি সেখানে নামাজ পড়তে অস্বীকার

করেন। এই আশঙ্কায় যে, পরবর্তীকালের মুসলিমরা এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে পারে এবং এর মাধ্যমে সেখানকার বাসিন্দাদের প্রতি অবিচার হতে পারে।

৭৬১

পৃষ্ঠা 12

পঞ্চদশ পাঠ
আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

আরও উল্লেখ্য: যখন তিনি ধুলোবালিতে প্রোথিত একটি কাঠামো দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে তা ইহুদিদের, তখন তিনি নিজের কাপড়ের একাংশ দিয়ে তা থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। ফলে তাঁর সেনাবাহিনীও তাঁর অনুসরণে একই কাজ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই কাঠামোটি থেকে ধুলোবালি দূর হয়ে গেল।

আমরা যা উল্লেখ করেছি তা কেবল উদাহরণস্বরূপ, যা মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ধর্মীয় সহনশীলতা এবং যুগ যুগ ধরে তাঁদের সেই আদর্শ অনুসরণের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি সেই সকল মৌলিক ভিত্তির অন্যতম যা মানবিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠনে অবদান রাখে।

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি হলো: দয়া (রহমত):

ইসলাম হলো দয়ার ধর্ম; আর সে কারণেই মুসলমানদের মধ্যে একে অপরকে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়ার বিধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো যারা ঈমান এনেছে এবং একে অপরকে ধৈর্য ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।" [সূরা আল-বালাদ: ১৭]। আর মুসলমানদের রসূল হলেন দয়ার রসূল। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত (দয়া) স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭]। ইসলাম যে দয়ার আহ্বান জানায়, তার সুফল কেবল মুসলিমরাই ভোগ করে না; বরং তা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কেই ছায়া দান করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "দয়ালু ব্যক্তিদের ওপর পরম দয়াময় (রহমান) দয়া করেন। তোমরা জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তবে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" তিনি আরও বলেন: "দুর্ভাগা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।"

বরং ইসলাম এটিও স্পষ্ট করেছে যে, পশুপাখির প্রতি সদয় আচরণেও রয়েছে মহান সওয়াব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "এক ব্যক্তি পথ চলার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। সে একটি কুয়া দেখতে পেয়ে তাতে নামল এবং পানি পান করে উঠে এল। তখন সে দেখল যে, একটি কুকুর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভিজে মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল, আমার মতো এই কুকুরটিরও প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। এরপর সে পুনরায় কুয়ায় নামল এবং তার চামড়ার মোজাটি পানি দিয়ে পূর্ণ করল। তারপর মোজাটি মুখে কামড়ে ধরে ওপরে উঠে এল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আল্লাহর রসূল! পশুপাখির সেবাতেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে?" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "প্রত্যেক প্রাণসম্পন্ন সত্তার সেবাতেই সওয়াব রয়েছে।"

৭৬২

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: "একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরছিল, তৃষ্ণায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। বনী ইসরাঈলের একজন ব্যভিচারী নারী তাকে দেখতে পেল, এরপর সে তার মোজা খুলে কুকুরটির জন্য পানি তুলে তাকে পান করাল। এর কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।" সুতরাং, যদি একটি কুকুরের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ফলে ব্যভিচারিণীদের পাপ ক্ষমা করা হয়, তবে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন যে নিশ্চিতভাবেই অলৌকিক কিছু ঘটাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং ইসলাম তাদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলেছে যাদের অন্তর পশুপাখির প্রতি নির্দয় এবং যারা তাদের কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করে। আমরা ইতিপূর্বেই স্পষ্ট করেছি যে, মানুষ—তার মর্যাদার বিশালতা সত্ত্বেও—একটি বোবা প্রাণীর সাথে অন্যায় আচরণের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, যেটিকে সে আটকে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যেন সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে।"

ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম এবং মানুষ ও প্রাণী—সবার সাথেই দয়ার ব্যাপকতম অর্থগুলো অনুসরণের আহ্বান জানায়, যেমনটি আমরা দেখলাম।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দয়া ও করুণার প্রয়োগ এক অনুপম আদর্শ স্থাপন করে। যুদ্ধের সময় নারীদের হত্যা করা যাবে না যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, একইভাবে শিশু ও বৃদ্ধদেরও হত্যা করা যাবে না। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

মক্কা বিজয়ের দিনে বিজয়ী হিসেবে প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়ার বহিঃপ্রকাশ কতই না চমৎকার ছিল! কুরাইশরা সারিবদ্ধভাবে মসজিদে সমবেত হয়েছিল এবং তারা অপেক্ষা করছিল তিনি তাদের সাথে কী আচরণ করেন। এরপর তিনি বললেন: "হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমাদের কী মনে হয় আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব?" তারা বলল: "উত্তম, আপনি একজন সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র।" তিনি বললেন: "আমি তোমাদের তাই বলছি যা ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের বলেছিলেন: 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।' যাও, তোমরা মুক্ত।"

মুসলিম ও অন্যদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি: শান্তি:

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি হলো শান্তি। ইসলাম যখন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মানবিক সম্পর্কের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে শান্তিকে নির্ধারণ করে, তখন এটি মুসলিমদের হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না—

...রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীতে, কেবল জনস্বার্থের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, এবং যখন মজলুমরা তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, অথবা যারা দ্বীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেছে তাদের ওপর যখন আক্রমণ করা হয়; এমতাবস্থায় দ্বীনের ফিতনা প্রতিরোধ করার জন্য হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে।

নিশ্চয়ই ইসলাম প্রতিটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অধিকার এবং স্বনির্ভর হওয়ার অধিকারকে সম্মান করে। একইভাবে আপন ভূখণ্ড রক্ষা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রদান করে; এখানে উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম নিরাপত্তা চায়, আগ্রাসন চায় না এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔদ্ধত্য চায় না। সে বান্দা ও তার রবের মাঝে শান্তি চায়; ফলে সে সর্বদা রবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সর্বদা ভীত ও সতর্ক থাকে। সে জাতিসমূহের মাঝে এবং একে অপরের মাঝে শান্তি চায়। সে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে শান্তি কামনা করে। ইসলামে হত্যার বিধান কেবল মুসলিম এবং তাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি দ্বীনি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সেখানে নিপীড়ন বন্ধ করার জন্যও এটি বৈধ; সুতরাং এটি দাওয়াত ও জীবনের আদর্শ রক্ষার জন্য একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, যাতে যে কেউ এতে আগ্রহী হলে সে তাকে বাধা প্রদানকারী বা ফিতনায় ফেলে দিতে পারে এমন কোনো শক্তির ভয় না পায়। সুতরাং যুদ্ধ কেবল অস্ত্রের মোকাবেলায় আবশ্যক, কুফরের মোকাবেলায় নয়— অর্থাৎ, হত্যা কেবল তাকেই করা হবে যে যুদ্ধ করে।

এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিকেই প্রাধান্য দেয় এবং কেবল অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়। এটি শান্তির ব্যাপারে ইসলামের মূল চিন্তাধারার একটি ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়, যা এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে: 'শান্তি সর্বদা বিদ্যমান, আর যুদ্ধ হলো কেবল প্রয়োজন'। সুতরাং হত্যা করা ইসলামের প্রকৃতি নয়, বরং এর প্রকৃতি হলো ক্ষমা ও উদারতা। তাই যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না কিন্তু প্রতিরোধও করল না এবং মুসলিমদের ওপর আগে আক্রমণ শুরু করল না, তাকে হত্যা করা বৈধ নয় এবং তার নিরাপত্তাকে আতঙ্কে রূপান্তর করাও জায়েজ নয়। ইসলাম এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, মুসলিমগণ তাই বাস্তবায়ন করেছেন। মুসলিমদের সাথে অন্যদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামে মূল ভিত্তি যে শান্তি, যুদ্ধ নয়— এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [আল-বাকারা: ১৯০]

আয়াতের তাৎপর্য: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিমদের আল্লাহর পথে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন যেন তারা তাঁর ইবাদত পালনে সক্ষম হয়। অতঃপর তিনি তাদেরকে যুদ্ধের সূচনা করতে কিংবা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। যুদ্ধ শুরুর ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন না করার অর্থ হলো অহেতুক কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা না করা। আর যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সীমা লঙ্ঘন না করার অর্থ হলো যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে হত্যা না করা; যেমন: নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তি, অথবা যারা মুসলিমদের নিকট শান্তির প্রস্তাব পেশ করেছে কিংবা যুদ্ধ থেকে বিরত রয়েছে।

আল্লাহ মুসলিমদের সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন; কারণ সীমা লঙ্ঘন করা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতটি এমন কিছু আইনি মূলনীতি ধারণ করে যা ইসলামি যুদ্ধনীতির মূল চেতনাকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. মুসলিমদের কর্তব্য হলো কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যারা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
২. শত্রু নয় এবং যারা যুদ্ধ করে সীমা লঙ্ঘন করেনি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করা বৈধ নয়।
৩. তাদের ওপর যে আক্রমণ করা হয়েছিল তার অবসান ঘটার সাথে সাথেই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য আবশ্যক।

সুতরাং এই আয়াতে যদিও যুদ্ধের স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে, তবে তা আত্মরক্ষার শর্তযুক্ত এবং অন্যের ওপর সীমা লঙ্ঘন না করার নির্দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট; কারণ সীমা লঙ্ঘন আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

কুরআন মাজিদ থেকে আরও একটি দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: **"হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে শান্তিতে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"** [আল-বাকারা: ২০৮]। এখানে 'শান্তি' (সিলম) বলতে সন্ধি বা আপস-মীমাংসাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতটি নির্দেশ করে যে, মানুষের মাঝে প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং পারস্পরিক সমঝোতা বজায় থাকা উচিত এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উচিত।

আয়াতটি থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে: মুমিনদের ঈমান তাদের ওপর এটি আবশ্যক করে যে তারা অন্যদের সাথে শান্তিতে বসবাস করবে। যারা তাদের ওপর চড়াও হয়নি তাদের ওপর তারা সীমা লঙ্ঘন করবে না এবং যারা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের সাথে তারা যুদ্ধ করবে না।

কুরআন মাজিদ থেকে আরও একটি দলিল হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী: **"সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের) কোনো পথ রাখেননি।"** [আন-নিসা: ৯০]। আয়াতের তাৎপর্য হলো: আল্লাহ তাআলা অনুমতি দেননি...

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ

মুসলমানদের জন্য সেই সব লোকদের পাকড়াও করা বা হত্যা করার ব্যাপারে যারা তাদের থেকে পৃথক হয়েছে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, বরং তাদের কাছে 'আস-সালাম' অর্থাৎ সন্ধি পেশ করেছে। এ আয়াতে সেই সব লোকদের ওপর আক্রমণ না করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছে; যেহেতু এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য এমন লোকদের ওপর কোনো পথ (আক্রমণের অবকাশ) রাখা হয়নি যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করেনি।

পবিত্র কুরআন থেকেও মহান আল্লাহর বাণী এই বিষয়ের প্রমাণ: "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম।" [আল-হাজ্জ: ৩৯]। এ আয়াতের নির্দেশনার দিকটি হলো, এতে সেই সব লোকদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাদের সাথে মুশরিকরা যুদ্ধ করে—মুশরিকদের নির্যাতনের কারণে, তাদের কুফরের কারণে নয়। আয়াতটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে যে, যে নির্যাতনের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে—যা মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়েছিল—তা মূলত তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ, তাদের ওপর শত্রুতা এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানে বাধা দেওয়ার মাঝে নিহিত। সুতরাং তারা নির্যাতিত হয়েছে, আর একজন নির্যাতিত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে আত্মরক্ষা করার। এ কারণেই আল্লাহ তাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন—অর্থাৎ, তাদের ওপর আপতিত হওয়া যে জুলুম বা নির্যাতন তারা প্রতিহত করতে চায়, সেটি ব্যতীত অন্য কিছু মুসলমানদের যুদ্ধের প্রতি প্ররোচিত করে না।

আর আমরা যদি পবিত্র সুন্নাহর দিকে লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাব যে এমন অনেক হাদিস রয়েছে যা এই ধারাকে সমর্থন করে, এবং যা মুসলমান ও অন্যদের মাঝে সম্পর্কের মূল ভিত্তি হিসেবে সন্ধি বা শান্তিকে নির্ধারণ করে, যুদ্ধকে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা

প্রার্থনা করো। কিন্তু যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে, তখন ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রেখো যে, জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নিচে।" আর তাঁর বাণী: "তোমরা হাবশীদের ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদের ছেড়ে রাখে এবং তুর্কিদের ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদের ছেড়ে রাখে।" সুতরাং এই হাদিস মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছে হাবশী এবং তুর্কিদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তাদের কারো ওপর আক্রমণ না করতে যতক্ষণ তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপায়ে শত্রুতা না করে। এর অর্থ এটাই যে, যে কেউ মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকবে, তার সাথে শান্তিপূর্ণ আচরণ করা এবং কোনো প্রকার কষ্ট দিয়ে তার ওপর চড়াও না হওয়া মুসলমানদের কর্তব্য।

মুসলমান ও অন্যদের মাঝে সম্পর্ক যে শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যুদ্ধের ওপর নয়—তার আরও একটি প্রমাণ হলো মুসলমানদের পরিচালিত যুদ্ধগুলোর কারণসমূহ। যে ব্যক্তি মুসলমানদের যুদ্ধসমূহ পর্যালোচনা করবে...

পৃষ্ঠা 17

রাসূল ﷺ লক্ষ্য করেন যে, এই যুদ্ধগুলো কেবল সংঘটিত কোনো আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষামূলক ছিল, অথবা এমন কোনো আক্রমণের পথে বাধা হিসেবে ছিল যা যুদ্ধের লক্ষণ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল। রাসূল ﷺ নাসারা (খ্রিস্টান) বা ইহুদিদের সাথে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হননি যতক্ষণ না তারা আচরণ ও স্বভাবের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা সম্মান, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়বিচার বর্জিত এবং শত্রুতা দ্বারা চিহ্নিত ছিল। ফলে একদিকে মুসলিম এবং অন্যদিকে ইহুদি ও নাসারাদের মাঝে যুদ্ধাবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থা অবশিষ্ট ছিল না।

এর কারণ ছিল এই যে, তারা মুসলিমদের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করেছিল এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার পথে বাধা প্রদান করেছিল। তারা ঐসব লোকদের ওপর চড়াও হতো যাদের অন্তরকে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন চালাত যা অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়াত।

এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম এবং তাদের মাঝে একটি যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান বলে গণ্য হয়। আর এরই ভিত্তিতে, দুই পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল, মুসলিমরা কেবল নিজের প্রাণ এবং আকীদার সুরক্ষায় তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দুই ভূখণ্ডের বিধান: দারুল ইসলাম ও দারুল হারব এবং এই বিভক্তির প্রভাব

ভূখণ্ড বিভক্তির প্রেক্ষাপটে বলা যায়: আরব উপদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইসলাম-শত্রুরা ইসলাম ও মুসলিমদের মূলোৎপাটন করতে এবং ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার এবং এর সফলতা ও বিজয় সুনিশ্চিত হওয়ার আগেই অঙ্কুরেই তা শেষ করে দিতে চেয়েছিল। এর ফলে কুরাইশদের নেতৃত্বে মক্কা এবং শত্রুদের অন্যান্য এলাকা 'দারুল হারব' (যুদ্ধরত দেশ) এ পরিণত হয় এবং মদিনা ও তার আশপাশের এলাকা 'দারুল ইসলাম' (ইসলামী রাষ্ট্র) এ রূপান্তরিত হয়। আবার একদল লোক মুসলিমদের সাথে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করে; ফলে তাদের এলাকা 'দারুল আহদ' (চুক্তিবদ্ধ দেশ) হিসেবে গণ্য হয়।

এই অর্থেই ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: কাফেররা হয় যুদ্ধরত (আহলুল হারব), নয়তো চুক্তিবদ্ধ (আহলুল আহদ)। আর চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় তিন প্রকার: যিম্মি, সন্ধিভুক্ত এবং নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। ফকীহগণ প্রতিটি প্রকারের জন্য পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেমন তারা বলেছেন: সন্ধি পরিচ্ছেদ, নিরাপত্তা পরিচ্ছেদ এবং যিম্মা চুক্তি পরিচ্ছেদ।

পৃষ্ঠা 18

পঞ্চদশ পাঠ

মূলত 'জিম্মা' এবং 'আহদ' (চুক্তি) শব্দ দুটি এই সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। একইভাবে 'সুলহ' (সন্ধি) শব্দটিও। কারণ 'জিম্মা' শব্দটি মূলত 'আহদ' এবং 'আকদ' (চুক্তি) এর পর্যায়ভুক্ত। তবে অনেক ফকিহদের পরিভাষায় 'আহলে জিম্মা' বলতে তাদের বোঝানো হয় যারা জজিয়া প্রদান করে। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিরাপত্তা বা জিম্মা। তারা মুসলিমদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে 'আহলে হুদনা' বা যুদ্ধবিরতি চুক্তিবদ্ধদের বিষয়টি ভিন্ন; কারণ তারা মুসলিমদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেছে যে তারা তাদের নিজ ভূখণ্ডেই অবস্থান করবে, চাই সেই সন্ধি কোনো অর্থের বিনিময়ে হোক বা না হোক। তাদের ওপর ইসলামের বিধান সেভাবে কার্যকর হয় না যেভাবে আহলে জিম্মাদের ওপর হয়। তবে তাদের ওপর আবশ্যক হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা। আর এদের বলা হয়: আহলে আহদ (চুক্তিবদ্ধ পক্ষ), আহলে সুলহ (সন্ধিকারী পক্ষ) এবং আহলে উদ (মৈত্রী পক্ষ)।

ইবনুল কাইয়্যিম-এর আলোচনা থেকে সাধারণভাবে আমরা এই নির্যাস গ্রহণ করতে পারি যে, ভূখণ্ডকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্ভব:

১. দারুল ইসলাম।
২. দারুল হারব।
৩. দারুল আহদ।

আমরা নিম্নে এগুলোর প্রত্যেকটির ওপর আলোকপাত করব:

১. দারুল ইসলাম:

কেউ কেউ দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, এটি এমন এক রাষ্ট্র যা মুসলিমদের কর্তৃত্ব ও শাসনের অধীনে পরিচালিত হয় এবং যেখানে শক্তি ও সামর্থ্য মুসলিমদের হাতে থাকে। এই ভূখণ্ডকে রক্ষা করা মুসলিমদের ওপর আবশ্যক। শত্রু যদি ভূখণ্ডে প্রবেশ না করে অথবা ইমাম যদি যুদ্ধের জন্য সাধারণ আহ্বান না জানান, তবে এর প্রতিরক্ষায় জিহাদ করা ফরজে কিফায়া। কিন্তু যদি শত্রু ভূখণ্ডে প্রবেশ করে অথবা ইমাম যুদ্ধের ডাক দেন, তবে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। আর দারুল ইসলামের অধিবাসী বা জনগণ হলো মুসলিমগণ।

পৃষ্ঠা 19

...এবং জিম্মি সম্প্রদায়; তারা হলো সেই সব লোক যারা দারুল ইসলামে বসবাসের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাদের নিজ ধর্মে অটল থাকার পাশাপাশি জিজয়া প্রদানের বিনিময়ে ইসলামের বিধান মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। রাষ্ট্র সংখ্যায় একাধিক হওয়া এবং শাসকদের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সমগ্র দারুল ইসলাম একটি মাত্র আবাসভূমির সমতুল্য; কারণ সেখানে ইসলামের বিধানই হলো প্রচলিত ও কার্যকর বিধান।

২. দারুল হারব:

ফকীহগণ দারুল হারবের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে দুটি মতের ওপর মতভেদ করেছেন:

প্রথম মত: এই মতানুসারে দারুল হারব হলো সেই ভূখণ্ড যেখানে মুসলিম শাসকের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই এবং তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে এমন কোনো চুক্তি নেই যার সাথে মুসলিমরা দায়বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ থাকে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় যা ব্যক্ত করেছেন এটি তারই অনুরূপ; তিনি বলেন: "এটি এমন এক আবাসভূমি যেখানে মুসলিমরা বসতি স্থাপন করেছে এবং সেখানে তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান জারি হয়েছে। আর যেখানে ইসলামের বিধিবিধান জারি হয়নি, তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না।"

সুতরাং এই মতাবলম্বীদের নিকট মূল বিবেচ্য বিষয় হলো: শক্তি ও কর্তৃত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভূখণ্ড যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমদের কর্তৃত্বের বাইরে থাকবে, তা দারুল হারব হিসেবেই গণ্য হবে; যেখান থেকে সাধারণত আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। দারুল হারবের অধিবাসীদের 'হারবি' বলা হয়। আর হারবি হলো সেই ব্যক্তি যার দেশ ও আমাদের মাঝে যুদ্ধ ও শত্রুতা বিদ্যমান এবং আমাদের ও তার জাতির মধ্যে কোনো শান্তি বা সৌহার্দ্যপূর্ণ চুক্তি নেই।

দ্বিতীয় মত: এই মতের অনুসারীরা মনে করেন যে, শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অমুসলিমদের হাতে থাকাই কোনো ভূখণ্ডকে দারুল হারব হিসেবে অভিহিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং কোনো ভূখণ্ড দারুল হারব হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের সমাবেশ ঘটা আবশ্যক, সেগুলো হলো:

১. সেখানে মুসলিম শাসকের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব না থাকা, যার ফলে তিনি শরয়ি বিধানসমূহ কার্যকর করতে পারেন না - অর্থাৎ সেখানে কুফরি বিধান প্রকাশ পাওয়া এবং তা বাস্তবায়িত হওয়া।

---

২. ভূখণ্ডটি ইসলামী ভূখণ্ডের সাথে সংলগ্ন হওয়া, যাতে সেখান থেকে দারুল ইসলামের উপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

সেখানে কোনো মুসলিম বা জিম্মি বসবাসরত না থাকা, যারা প্রাথমিক ইসলামী নিরাপত্তা (আমান)-এর অধীনে সেই ভূখণ্ডে অবস্থান করছিল, যে নিরাপত্তা মুসলিম প্রজাদের সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং যা ছিল শরীয়তের নিরাপত্তা; মুসলিমদের জন্য ইসলামের কারণে এবং জিম্মিদের জন্য জিম্মা চুক্তির কারণে।

৩. দারুল আহদ (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র):

দারুল আহদ: অর্থাৎ সেই অঞ্চল যা মুসলিমরা শক্তির মাধ্যমে জয় করেনি এবং যেখানকার অধিবাসীরা তাদের ভূমি থেকে প্রদেয় কিছুর বিনিময়ে—যা হলো খারাজ—মুসলিমদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছে, তবে তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হয় না; কারণ তারা দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থান করছে। কেননা মুসলিমরা যুদ্ধ করে এই ভূখণ্ড দখল করেনি এবং তারা জিম্মা চুক্তির ভিত্তিতে তাদের সাথে স্থায়ী কোনো সন্ধিও করেনি—যাতে সেখানে তাদের (মুসলিমদের) আইন প্রয়োগ করা যায়—বরং সেখানকার অধিবাসীরা মুসলিমদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের এই চুক্তিটি নির্ধারিত শর্তাবলি ও সুনির্দিষ্ট নিয়মের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে।

অন্য কথায়: চুক্তিবদ্ধ পক্ষ (আহলে আহদ) হলো এমন এক কওম যারা মুসলিমদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেছে যে, তারা তাদের নিজ দেশেই অবস্থান করবে; চাই সেই সন্ধি কোনো সম্পদের বিনিময়ে হোক বা সম্পদ ছাড়া। তাদের ওপর ইসলামের বিধানাবলি কার্যকর হবে না—যেমনটি জিম্মিদের ওপর কার্যকর হয়—তবে তাদের জন্য মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে—মুসলিম এবং অন্যদের মাঝে—সকল অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত করতে এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য 'দারুল আহদ' পরিভাষাটি একটি ভিত্তি হিসেবে যোগ্য হতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘ সনদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা মেনে নিয়েছে। কারণ এটি মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের একটি সামষ্টিক চুক্তির সমতুল্য।

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের জাতিসংঘ সনদের সাথে যুক্ত থাকা বর্তমান সময়ে অমুসলিম দেশগুলোকে 'দারুল আহদ' হিসেবে গণ্য করে।

৭৭০

পৃষ্ঠা 21

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
পঞ্চদশ পাঠ

দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব হিসেবে ভূখণ্ড বিভাজনের প্রভাব:

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যখন দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থান করে, তখন তাদের ওপর শারঈ বিধিবিধান কার্যকর হওয়ার বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। সে সকল বিধানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: অপরাধ দণ্ডবিধি, দারুল হারবে কিসাস (প্রতিশোধ), সুদ, দারুল হারবে ফাসেদ বা অবৈধ চুক্তি এবং নিরাপত্তা গ্রহণকারী (মুস্তামিন) ব্যক্তির ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা। আমরা নিচে প্রতিটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব:

অপরাধ দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে: যদি কোনো মুসলিম বা যিম্মি ব্যক্তি দারুল হারব বা সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রে এমন কোনো অপরাধ করে যা ‘হদ’ (সুনির্ধারিত দণ্ড) প্রযোজ্য করে, তবে তার ওপর কি ইসলামী বিধান কার্যকর হবে? ফকীহগণ এর উত্তরে দুটি মত প্রদান করেছেন:

প্রথম মত: ইমাম আবু হানিফা এই মত পোষণ করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ দারুল হারবে যে অপরাধ করে, তার ওপর ইসলামী অপরাধ দণ্ডবিধি কার্যকর হয় না। এর কারণ হলো, কর্তৃত্ব (উলায়াহ) না থাকার কারণে ইমাম দারুল হারবে হদ কায়েম করতে সক্ষম নন। হদ ওয়াজিব হওয়া সক্ষমতার ওপর শর্তযুক্ত, আর দারুল হারবে থাকা অবস্থায় ইমামের সেই সক্ষমতা নেই; সুতরাং তা ওয়াজিব হবে না। অন্যথায় তা ফলহীন হয়ে পড়বে; কারণ হদ কায়েমের উদ্দেশ্য হলো দণ্ড পুরোপুরি কার্যকর করা যেন অপরাধ দমনে প্রভাব পড়ে। আর এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এর ওপর কোনো সক্ষমতা নেই। যদি কোনো মুসলিম সেখানে এমন কোনো অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তবে তার ওপর দণ্ড কার্যকর করা হবে না;

কারণ তার সেই কাজটি মূলত হদ ওয়াজিব হওয়ার মতো ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো: শাস্তির ফয়সালা প্রদানের জন্য অপরাধ সংঘটনের সময় উক্ত স্থানের ওপর কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক। অথচ অপরাধ সংঘটনের স্থানের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্ব নেই। এর ফলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, যদি অপরাধ সংঘটনের পর সেই স্থানটি ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আসে, তবুও সেই অপরাধের ওপর শারঈ বিধান প্রয়োগ করা হবে না; কারণ অপরাধ সংঘটনের সময় সেখানে কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

পৃষ্ঠা 22

দ্বিতীয় মত: মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দারুল হারবে (যুদ্ধরত অমুসলিম রাষ্ট্রে) কোনো মুসলিম বা জিম্মি কর্তৃক সংঘটিত প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে শরীয়াহর বিধান প্রযোজ্য হবে। এর কারণ হলো, একজন মুসলিম যেখানেই থাকুক না কেন সে ইসলামের বিধান মেনে চলতে দায়বদ্ধ। আর ইসলামের অন্যতম বিধান হলো—যে ব্যক্তি দণ্ডবিধি লঙ্ঘনের কারণ ঘটাবে, তার ওপর হদ (নির্ধারিত দণ্ড) প্রয়োগ করা ওয়াজিব।

আমরা মনে করি যে, জমহুর ফকীহগণের মতটিই অগ্রগণ্য; কারণ একজন মুসলিম যেখানেই অবস্থান করুক না কেন সে সচ্চরিত্রের জন্য আদর্শ স্বরূপ। সুতরাং তার পক্ষে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীতে পরিণত হওয়া সমীচীন নয়। একারণে, অপরাধ সংঘটনের স্থানের দিকে লক্ষ্য না করে যেকোনো অপরাধের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তবে সে দারুল ইসলামে ফিরে আসার পর তার ওপর হদ কার্যকর করা হবে, যদি (সেখানে থাকাকালীন) হদ কার্যকর করলে সে হারবিদের (শত্রুপক্ষ) সাথে যোগ দিতে পারে এমন আশঙ্কা থাকে।

দারুল হারবে কিসাস:

যদি কোনো মুসলিম বা জিম্মি দারুল হারবে হত্যার অপরাধ করে, তবে কি তার থেকে কিসাস (প্রতিবিধান) নেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ফকীহগণ দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে না, যদিও তা ইচ্ছাকৃত হত্যা হয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব ছাড়া কিসাস আদায় করা অসম্ভব, আর দারুল হারবে সেই শক্তি অনুপস্থিত। এছাড়া, দারুল হারবে অবস্থান কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে একটি সন্দেহ তৈরি করে, আর সন্দেহের উপস্থিতিতে কিসাস কার্যকর হয় না। তবে ঘাতক দিয়াত (রক্তপণ) দিতে বাধ্য থাকবে—হত্যাটি ভুলবশত হোক বা ইচ্ছাকৃত। এই দিয়াত তার নিজস্ব সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে, তার 'আকিলা'র (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের) ওপর তা বর্তাবে না। তারা বলেছেন: তার ওপর দিয়াত ধার্য হবে যাতে একজন সংরক্ষিত ব্যক্তির রক্ত বৃথা না যায়। যেহেতু শারীরিক শাস্তি কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাই তার স্থলে আর্থিক দণ্ড স্থলাভিষিক্ত হবে। তবে এটি কোনো অবস্থাতেই তা'যীর (বিবেচনামূলক শাস্তি) প্রদানে বাধা হবে না।

দ্বিতীয় মত: এটিই জমহুর (অধিকাংশ) ফকিহদের অভিমত; তাঁরা মনে করেন যে, দারুল হারবে (যুদ্ধরত ভূখণ্ডে) কিসাস বা প্রতিবিধানের বিধানসমূহ মুসলিম ও জিম্মিদের ওপর একইভাবে প্রযোজ্য হবে, যেভাবে তা দারুল ইসলামে (ইসলামি রাষ্ট্রে) পূর্ণরূপে কার্যকর হয়।

সুদ এবং দারুল হারবে ফাসেদ (অসিদ্ধ) চুক্তি:

দারুল ইসলামে যেভাবে সুদের বিধান কার্যকর হয়, দারুল হারবেও কি তা একইভাবে কার্যকর হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ফকিহগণ দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: জমহুর ফকিহ এবং হানাফি মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ এই মত পোষণ করেন যে, সুদ সংক্রান্ত ইসলামের বিধানসমূহ দারুল হারবেও কার্যকর হবে—যেমনটি দারুল ইসলামে কার্যকর হয়। এর কারণ হলো: সুদের নিষিদ্ধতা উভয় চুক্তিকারীর ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত। মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর নিষিদ্ধতা তো স্পষ্ট; আর হারবিদের (শত্রুভাবাপন্ন অমুসলিম) ক্ষেত্রে কারণ হলো, কাফেররাও শরয়ি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করতে আদিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল" [আন-নিসা: ১৬১]। এই কারণেই জিম্মি এবং যে হারবি নিরাপত্তার সাথে আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে, তাদের সাথে এই প্রকারের লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ এই মত পোষণ করেন যে, যদি কোনো মুসলিম বা জিম্মি নিরাপত্তার সাথে দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং কোনো হারবির সাথে সুদি চুক্তি বা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্য কোনো ফাসেদ (অসিদ্ধ) চুক্তিতে লিপ্ত হয়, তবে তা বৈধ। ইমাম আবু হানিফার এই মতের কারণ হলো, সুদ গ্রহণ করা সম্পদ বিনষ্ট করার নামান্তর, আর হারবির সম্পদ বিনষ্ট করা বৈধ; যেহেতু হারবির সম্পদের কোনো নিরাপত্তা (শরয়ি অলঙ্ঘনীয়তা) নেই। হারবির সাথে এই লেনদেন বৈধ হওয়ার কারণ এটাই।

পক্ষান্তরে, দারুল হারবের সেই মুসলিমের ক্ষেত্রে—যিনি আমাদের নিকট হিজরত করে আসেননি—সুদ গ্রহণ করা সম্পদ বিনষ্ট করার নামান্তর। যে ব্যক্তি দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু হিজরত করেননি, তার সম্পদ বিনষ্ট করলে তা জিম্মাদারির (ক্ষতিপূরণ) আওতাভুক্ত নয়। এর প্রমাণ হলো, তার জীবনের নিরাপত্তা কিসাস বা দিয়তের মাধ্যমে নিশ্চিত নয়; আর সম্পদের নিরাপত্তা মূলত জীবনের নিরাপত্তার অনুগামী। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে জমহুর বা সংখ্যাধিক্য আলিমদের মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। আর একজন মুসলিম যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি ইসলামের বিধান পালনে আদিষ্ট।

পঞ্চদশ পাঠ
আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

মুস্তামিন (নিরাপত্তা লাভকারী অমুসলিম) কর্তৃক ইসলামের বিধানসমূহ মেনে চলার বিষয়টি নিয়ে আমরা বলি: ইমাম আবু হানিফা মনে করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সাময়িক সময়ের জন্য অবস্থান করে, সে যদি আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট—অর্থাৎ যা সমাজের সামষ্টিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত—এমন কোনো অপরাধ করে, তবে তার ওপর শরীয়তের বিধানসমূহ প্রয়োগ করা হবে না। তবে সে যদি কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্নকারী অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে তাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে।

আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে তার ওপর শাস্তি (হদ) কার্যকর না করার কারণ হলো, সে স্থায়ী বসবাসের জন্য দারুল ইসলামে প্রবেশ করেনি; বরং সে নিজের কোনো প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে এসেছে। আর নিরাপত্তা চুক্তি বা 'ইস্তামান' তাকে অপরাধ ও লেনদেন সংক্রান্ত শরীয়তের সকল বিধান মেনে চলতে বাধ্য করে না। বরং সে কেবল ঐসব বিষয় মেনে চলতে বাধ্য যা দারুল ইসলামে তার প্রবেশের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যা তার লক্ষ্য অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর তা হলো বান্দার অধিকার। সুতরাং তার জন্য ইনসাফ বজায় রাখা এবং কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার জান-মালের নিরাপত্তা এবং তাকে কষ্ট না দেওয়ার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব।

কিসাস (প্রতিশোধ) এবং অপবাদের হদ (হাদ্দুল কাজফ) বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। তাই এই দু'টি অপরাধের ক্ষেত্রে তাকে পাকড়াও করা হবে, যেভাবে জবরদখল ও সম্পদ বিনাশের মতো ব্যক্তির অধিকার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে পাকড়াও করা হয়। এর বাইরে ব্যক্তির হকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অপরাধের ক্ষেত্রে তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর হবে না, যেমন ব্যভিচার (জিনা)। আবু হানিফা (র.) মনে করেন যে, হদ বা নির্ধারিত শাস্তির ভিত্তি হলো শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব (বিলায়াহ)। আর মুসলিম শাসকের মুস্তামিনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই; যেহেতু সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করছে।

হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু ইউসুফ এবং জমহুর (অধিকাংশ) ফকিহগণের মত হলো: শরীয়তের বিধান দারুল ইসলামে বসবাসকারী সকলের ওপর প্রযোজ্য হবে; চাই তাদের বসবাস স্থায়ী হোক যেমন মুসলিম ও জিম্মি, অথবা সাময়িক হোক যেমন মুস্তামিন। এর যুক্তি হলো: মুস্তামিন আমাদের ভূখণ্ডে অবস্থানের সময়কালীন লেনদেন এবং প্রশাসনিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের বিধান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর এই কারণেই মদ্যপানের হদ ব্যতীত অন্যান্য সকল হদ বা শাস্তি তার ওপর কার্যকর করা হবে, যদি সে তার কারণ ঘটায়।

ইসলামে চুক্তিসমূহ

ইসলামে চুক্তিসমূহ সংক্রান্ত একটি ভূমিকা:

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় সাধারণ মানবিক আদর্শসমূহ থেকে গৃহীত হয়। যেমন: ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা, প্রতিশ্রুতি পালন এবং প্রয়োজন ও আবশ্যকতা দেখা দিলে সমপ্রতিদানমূলক আচরণ—যা নীচতা ও হীনতার কলুষতামুক্ত। এই নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত আরও রয়েছে সচ্চরিত্রতা, দয়া, তাকওয়া এবং মানবিক সহযোগিতা—যেমনটি আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি—কেননা মানুষ মানুষের ভাই; চাই সে তাকে পছন্দ করুক বা অপছন্দ। এ

জাতীয় বিষয়সমূহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত ও ঘোষিত হয়েছে।

তদ্রূপ এই নীতিমালা গৃহীত হয় এমন সহীহ ও শরীয়তসম্মত প্রথা থেকে, যা সত্য ও ঐশী দ্বীনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এছাড়াও মুসলিম ও অন্যদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ থেকেও এগুলো আহরিত হয়; যেমন নিরাপত্তা প্রদান, জিম্মি চুক্তি এবং সন্ধির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদিন, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং মুত্তাকী আমিরদের পক্ষ থেকে জারিকৃত অঙ্গীকারসমূহ।

মুআহাদা (চুক্তি), মিছাক (অঙ্গীকার), আহদ (প্রতিশ্রুতি) এবং আকদ (চুক্তি)-এর সংজ্ঞা নিরূপণ:

আরবি ভাষার মূলে মুআহাদা, মিছাক, আহদ এবং আকদ—সবগুলোই এক ও সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যকার যেকোনো সংযোগ বা বন্ধন। আর আমাদের ফকীহগণের নিকট 'মুআহাদা' হলো: দুই দলের মধ্যে তাদের অন্বেষিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। ইসলামি শরীয়তে 'আহদ' শব্দটির অর্থ মানবরচিত আন্তর্জাতিক আইনের 'চুক্তি' শব্দের চেয়েও অধিক ব্যাপক; কারণ এটি মূলত রূপ বা প্রক্রিয়া নির্বিশেষে দুই পক্ষের ইচ্ছার ঐক্যমত্য। আমাদের ফিকহ শাস্ত্রে 'আহদ'...

এটি হলো: এমন কোনো বিষয় যাতে দু'জন ব্যক্তি বা মানুষের দু'টি দল তাদের পারস্পরিক স্বার্থে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। যদি তারা একে সুদৃঢ় ও মজবুত করে যা একে রক্ষা করার এবং পূর্ণ করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের দাবি রাখে, তবে তাকে 'মিছাক' (দৃঢ় অঙ্গীকার) বলা হয়। আর যদি বিশেষভাবে শপথের মাধ্যমে একে সুদৃঢ় করা হয়, তবে তাকে 'ইয়ামিন' (শপথ) বলা হয়।

বর্তমান প্রচলিত প্রথা আমাদের এই ইঙ্গিত দেয় যে, আমরা যেন 'আহদ' (অঙ্গীকার)-এর ওপর মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার মাধ্যমে একে 'আকদ' (চুক্তি) থেকে পৃথক করি এবং 'আহদ' শব্দটিকে এমন সুদৃঢ় চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট করি যা জোরালোভাবে পূর্ণ করার সংকল্প করা হয়েছে; চাই তা লিখিতভাবে, শপথের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো পন্থায় সুদৃঢ় করা হোক না কেন। সুতরাং প্রতিটি সমঝোতাই একটি চুক্তি (আকদ), কিন্তু প্রতিটি চুক্তিই অঙ্গীকার (আহদ) নয়। পবিত্র কুরআনে বিবাহের চুক্তিকে 'মিছাকান গালিজা' (দৃঢ় অঙ্গীকার) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। [আল-আহযাব: ৭]

একইভাবে বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রথা আমাদের 'আহদ' ও 'মুআ৬াদা' (চুক্তি/সন্ধি)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। কেননা 'আহদ' শব্দটি 'মুআহাদা' অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থ বহন করে। প্রতিটি মুআহাদাই একটি আহদ, কিন্তু প্রতিটি আহদ মুআহাদা নয়। 'আহদ' হলো—যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি—দুটি পক্ষের মধ্যকার এমন প্রতিটি সমঝোতা যার প্রতি তারা পারস্পরিক স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। অথবা এটি হলো লিখিতভাবে, শপথের মাধ্যমে বা অন্য কোনো নিশ্চয়তার মাধ্যমে সুদৃঢ় করা এমন একটি চুক্তি যা উভয় পক্ষকে তা বাস্তবায়ন ও এর শর্তাবলি পালনের ক্ষেত্রে আস্থা প্রদান করে। এটি দু'জন ব্যক্তির মধ্যেও হতে পারে, যেমন কোনো মুসলিমের পক্ষ থেকে আশ্রয়প্রার্থী হারবী (শত্রু)-কে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার (আমান)। আবার এটি কোনো গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যেও হতে পারে, যেমন কোনো গোত্র বা তার প্রতিনিধিত্বকারী গোত্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এমন কাউকে সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রদান করা যে তাদের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে। আবার এটি দু'টি গোষ্ঠী বা দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যেও হতে পারে, যেমন সাময়িক সন্ধি চুক্তি (অর্থাৎ হুদনা বা যুদ্ধবিরতি) এবং স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী সন্ধি (অর্থাৎ জিম্মা চুক্তি)।

অন্যদিকে 'মুআহাদা' (সন্ধি/চুক্তি) বর্তমানে কেবল দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে হয় না। এর বিষয়বস্তু

নির্দিষ্ট আইনি বৈশিষ্ট্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পক্ষদ্বয় ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এর একটি বিশেষ ও সংকীর্ণ অর্থ রয়েছে।

এমতাবস্থায় বর্তমান ইসলামি ফিকহী পরিভাষায় 'মুয়াহাদাহ' বা চুক্তির সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, এটি হলো দারুল ইসলাম বা কোনো ইসলামি রাষ্ট্র এবং অন্য কোনো রাষ্ট্র অথবা নির্দিষ্ট কোনো অমুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি সমঝোতা, যা তাদের মধ্যকার আন্তর্জাতিক আইনি সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে।

পক্ষান্তরে সীমিত গুরুত্বসম্পন্ন আংশিক বা গৌণ বিষয়সমূহ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না, যতক্ষণ না সেগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এর উদাহরণ হলো: ইমাম বা শাসকের কোনো নির্দিষ্ট শহর বা পার্শ্ববর্তী কোনো জাতির সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করা, কিংবা যুদ্ধবন্দী বিনিময় চুক্তি এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

আর যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ, যুদ্ধের নিয়মাবলি, যুদ্ধের বৈধতা কিংবা শক্তি প্রয়োগের শর্তাবলি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রচলিত অর্থের বিচারে 'মুয়াহাদাহ' বা চুক্তির পর্যায়ভুক্ত।

চুক্তি ও অঙ্গীকারনামার গুরুত্ব এবং এগুলোর বৈধতা:
চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা জাতিসমূহ, দেশসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডে আস্থা ও প্রশান্তির সঞ্চার করে। এগুলো বিশ্বের উত্তেজনা নিরসনে কাজ করে এবং চুক্তির শর্ত ও ধারাগুলো বাস্তবায়নে অনেকটা নিশ্চয়তা প্রদান করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষের জন্য কল্যাণ, স্থিতিশীলতা ও স্বস্তি বয়ে আনে এমন স্বার্থ অর্জনে সহায়তা করে। চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের স্থলে শান্তি, উদ্বেগ ও ভয়ের স্থলে নিরাপত্তা এবং ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ সীমাহীন স্বাধীনতার নেয়ামত ভোগ করে; ফলে তারা জীবিকার প্রয়োজনে মনোনিবেশ করতে পারে, কৃষির পুনর্জাগরণ ঘটায়, বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়, আমদানি-রপ্তানির জন্য বাজার উন্মুক্ত করে, পণ্যের আদান-প্রদান নিশ্চিত করে এবং শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধন করে। এই উন্নয়নকে মানুষের কল্যাণ ও উপকারের দিকে ধাবিত করা হয়। ফলে চুক্তি পারস্পরিক সমঝোতা, হৃদ্যতা, অগ্রগতি, সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও সুখের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

পঞ্চদশ পাঠ

এজন্য মানুষ চুক্তিসমূহকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছে, এর প্রতি আগ্রহী হয়েছে এবং একে বিধিবদ্ধ করেছে। মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সামষ্টিক বিবাদসমূহ মীমাংসা করাকে এবং এর দ্বারা মহান মানবিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এমনকি সারা বিশ্বে ইসলামি দাওয়াত প্রচার করা কেবল চুক্তির ছায়াতলে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশেই সম্ভবপর হয়।

শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে শত্রুদের সাথে পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পছন্দের ভিত্তিতে নির্ধারিত শর্তাবলীর কাঠামোর মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বৈধতার মূলনীতির স্বপক্ষে অসংখ্য শরয়ি দলিল রয়েছে। সে সকল দলিলের মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীসমূহ অন্তর্ভুক্ত: “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের প্রতি সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে” [আত-তাওবা: ১]। মহান আল্লাহর বাণী: “তবে মসজিদুল হারামের নিকট যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তারা ব্যতীত। সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তিতে অটল থাকে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে অটল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন” [আত-তাওবা: ৭]। মহান আল্লাহর বাণী: “তবে তারা ব্যতীত যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে” [আন-নিসা: ৯০]। মহান আল্লাহর বাণী: “আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করো” [আল-আনফাল: ৬১]। মহান আল্লাহর বাণী: “যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; তবে এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে” [আল-আনফাল: ৭২]। মহান আল্লাহর বাণী: “তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, অতঃপর তারা তোমাদের চুক্তিতে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তবে তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন” [আত-তাওবা: ৪] ।

এসব কিছুই চুক্তির পবিত্রতা এবং তা পালনের আবশ্যকতা নির্দেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ও কাজ ভিত্তিক সুন্নাহ এই বিষয়গুলোকেই সুদৃঢ় করতে এসেছে। যেমন অস্থায়ী শান্তি—অস্ত্রবিরতি বা সন্ধির ক্ষেত্রে—আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে জুহাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ((সম্ভবত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের ওপর বিজয়ী হবে, তখন তারা তাদের নিজেদের জীবন ও সন্তানদের রক্ষা করতে সম্পদ দিয়ে তোমাদের সাথে সন্ধি করতে চাইবে। এমতাবস্থায় তোমরা সেই সন্ধির অতিরিক্ত কিছু তাদের থেকে গ্রহণ করো না, কারণ তা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।)) হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: ((সেই সত্তার শপথ, যাঁর আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তারা আমার কাছে এমন কোনো প্রস্তাব চাইবে না যাতে তারা আল্লাহর পবিত্র বিষয়সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করবে, তবে আমি অবশ্যই তাদের তা দান করব।))

স্থায়ী শান্তি অথবা সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে—যার দ্বারা অমুসলিমদের নিরাপত্তার চুক্তি (আকদুজ জিম্মাহ) উদ্দেশ্য—আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের (মুয়াহিদ) ওপর জুলুম করবে, অথবা তার অধিকার খর্ব করবে, অথবা তাকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেবে, কিংবা তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে; কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে মামলা লড়ব।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো আশ্রিত অমুসলিমকে (যিম্মি) কষ্ট দিল, আমি তার প্রতিপক্ষ হব। আর আমি যার প্রতিপক্ষ হব, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বিতর্ক করব।"

অনুরূপভাবে একজন মুসলিম ব্যক্তি, কোনো গোষ্ঠী, কোনো সেনাপতি বা কোনো শাসকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদের দূরবর্তী বা নিকটবর্তী, স্বাধীন বা

ক্রীতদাস যে কোনো ব্যক্তি যদি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিরাপত্তা দান করে, অথবা নিজের হাতের ইশারায় নিরাপত্তা দেয় আর সে তা গ্রহণ করে, তবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে; যতক্ষণ না সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে। অতঃপর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই, আর যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।"

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের এই সকল মূল পাঠ দিকনির্দেশনা প্রদান করে যে, ইসলামে চুক্তি বা সন্ধি সম্পাদন করা শরীয়তসম্মত। বরং এটি শান্তি নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা জোরদার করা, মানবাধিকার প্রদান এবং ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা ও তার প্রতি সম্মানের নিশ্চয়তা বিধানের একটি কার্যকর পদ্ধতি।

অঙ্গীকার পূর্ণ করা: ইসলামে চুক্তিগুলো কেবল কাগজের টুকরো নয়—যেমনটি বর্তমানকালের অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়—এবং এটি শত্রুকে প্রতারণা করার কোনো মাধ্যম নয়, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় নয়, দুর্বলের ওপর প্রবলের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ারও নয়, কিংবা এটি সত্য ও ন্যায়বিচার বহির্ভূত কোনো অন্যায্য সন্ধি নয় যা কেবল ততক্ষণ স্থায়ী হয় যতক্ষণ না দুর্বল পক্ষ শক্তি সঞ্চয় করে চুক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সবলদের শাসন থেকে রেহাই পেতে লড়াই শুরু করে। এগুলো কেবল প্রভাবশালীদের ক্ষমতা প্রদর্শনের কোনো চিত্র নয়, আর না এটি কেবল শান্তি ও ন্যায়বিচার সুশৃঙ্খল করার কোনো বাহ্যিক প্রক্রিয়া।

বরং ইসলামে চুক্তিগুলো যে কোনো ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, ধোঁকাবাজি, জবরদস্তি বা সস্তায় বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার, বাজার উন্মুক্ত করা কিংবা পণ্য ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় বা কাঁচামাল সংগ্রহের হীন উদ্দেশ্য থেকে সংরক্ষিত ও পবিত্র।

পঞ্চদশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (ইসলামি রাজনীতি)

পবিত্র কুরআন সেই সব চুক্তির প্রতি—যা সম্পাদন করা বৈধ—কেবল স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টিতে তাকায় না; বরং এটি কোনো শর্ত ছাড়াই—দুর্বলতা বা শক্তি নির্বিশেষে—চুক্তি পূর্ণ করার নিঃশর্ত আদেশ দিয়েছে। আর তা করা হয়েছে অত্যন্ত মজবুত স্তম্ভ ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে একটি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। মুসলিমরা শরীয়ত অনুযায়ী ন্যায়নিষ্ঠার সাথে চুক্তি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে; যাতে ইসলামের দাওয়াতের সেই সুউচ্চ লক্ষ্যসমূহ রক্ষা পায় অথবা এমন এক সুদৃঢ় শান্তিতে উপনীত হওয়া যায় যাতে কোনো গোপন শত্রুতা বিদ্যমান না থাকে। চুক্তি যতক্ষণ কার্যকর থাকে ততক্ষণ তা ভঙ্গ করা বৈধ নয়, তেমনিভাবে এর শর্তাবলি বা উপধারাগুলো লঙ্ঘন করাও জায়েজ নয়—যতক্ষণ না শত্রু পক্ষ তা ভঙ্গ করে। এটি কুরআনের বহু আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নিঃশর্ত আদেশের বাস্তবায়নস্বরূপ, যেমন তাঁর বাণী: "হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" (আল-মায়িদাহ: ১)। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর তোমরা যখন আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করো তখন তা পূর্ণ করো এবং শপথসমূহ সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের ওপর জামিন নিযুক্ত করেছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো।" (আন-নাহল: ৯১)। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (আল-ইসরা: ৩৪)। এবং তাঁর বাণী: "সুতরাং তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তা বজায় রাখো।" (আত-তাওবাহ: ৪)। "যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য (চুক্তিতে) অটল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য অটল থাকো।" (আত-তাওবাহ: ৭)।

অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঈমানের গুণের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং এটি একটি মৌলিক ও মহান নীতিমালা যা ভঙ্গ করা যায় না। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকদের কাজ, মুমিনদের নয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করে বলেন: "যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।" (আর-রা'দ: ২০)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর যারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী যখন তারা প্রতিশ্রুতি দেয়।" (আল-বাকারাহ: ১৭৭)।

মুসলিমদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তারা অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত তাদের মুসলিম ভাইদেরকে এমন কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য

করবে যাদের সাথে আমাদের সন্ধি বা চুক্তি রয়েছে। চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে নববী উপদেশসমূহ একমত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই, আর যার অঙ্গীকারের কোনো ঠিক নেই তার দ্বীন নেই।" তিনি আরও বলেছেন: "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য একটি করে নিশান বা ঝাণ্ডা থাকবে যা তার বিশ্বাসভঙ্গের মাত্রা অনুযায়ী উত্তোলন করা হবে। সাবধান! সাধারণ জনগণের আমিরের (নেতার) বিশ্বাসভঙ্গের চেয়ে বড় কোনো বিশ্বাসভঙ্গ নেই।" তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, খিয়ানত এবং চুক্তির খেলাফ করাকে নিফাকের বৈশিষ্ট্য ও মুনাফিকদের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে: যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, যখন চুক্তি করে তখন তা লঙ্ঘন করে এবং যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন অন্যায় ও সীমা লঙ্ঘন করে।"

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী যুগে সম্পাদিত মানবিক মৈত্রীচুক্তিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করেছেন। তিনি ‘হিলফুল ফুদুল’ নামক মানবিক মৈত্রীর ক্ষেত্রে এ কথা বলেছেন, যেটিতে তিনি যুবক থাকাবস্থায় মজলুমের সাহায্য এবং মক্কার নেতার সুরক্ষার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: “আমি আবদুল্লাহ বিন জুদআনের ঘরে এমন এক চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম, যার বিনিময়ে আমি দামী লাল উট পাওয়াও পছন্দ করতাম না। ইসলাম আসার পর যদি আমাকে এমন চুক্তির দিকে আহ্বান করা হতো, তবে অবশ্যই আমি তাতে সাড়া দিতাম।”

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী যুগের উত্তম মৈত্রীচুক্তিগুলো রক্ষার আবশ্যকতা নিশ্চিত করে বলেছেন: “তোমরা জাহিলিয়াতের মৈত্রীচুক্তিগুলো পূর্ণ করো, কারণ ইসলাম তা কেবল আরও শক্তিশালীই করে। আর ইসলামে নতুন করে কোনো (গোত্রীয়) মৈত্রীচুক্তি তৈরি করো না।” অর্থাৎ ইসলাম সত্য ও কল্যাণের সাহায্যে যেকোনো মৈত্রীচুক্তিকে সমর্থন করে—তার উৎস যাই হোক না কেন—এবং এটি গোত্রীয় লড়াই ও বর্বর আগ্রাসন প্রতিরোধ করে।

চুক্তিসমূহ বা মৈত্রীচুক্তির প্রকারভেদ:

সময়ের ব্যাপ্তি অনুযায়ী চুক্তিসমূহ: হয় এগুলো সাময়িক—যেমন নিরাপত্তা প্রদান (আমান) ও যুদ্ধবিরতি (হুদনাহ)—অথবা স্থায়ী, যেমন যিম্মি চুক্তি।

উদ্দেশ্য অনুযায়ী চুক্তিসমূহ: এগুলো ধর্মীয় প্রকৃতির, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক রাজনৈতিক, অথবা বাণিজ্যিক হতে পারে। এই উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: ঈমানের অঙ্গীকার, অথবা ইসলাম বা জিহাদের জন্য আনুগত্যের শপথ (বায়আত)।
দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ।
তৃতীয়ত: বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহ।

এও বলা যেতে পারে যে, চুক্তিসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব:
- রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ।
- অর্থনৈতিক চুক্তিসমূহ।

পৃষ্ঠা 32

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

পঞ্চদশ পাঠ

ইসলামের ধারণায় অর্থনৈতিক চুক্তিসমূহ:

এগুলো হলো সেই সব চুক্তি যা ইসলাম প্রচার, আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, যুদ্ধ সমাপ্ত করা অথবা শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত হয়; যাতে তারা যিয়ারত, আল্লাহর কালাম শ্রবণ, আলোচনা-পর্যালোচনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিদেশিদের এই জাতীয় কোনো প্রয়োজনে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারে।

রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ:

রাজনৈতিক চুক্তি চার প্রকার, যথা:
১- একই দেশে মুসলিম ও অন্যদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তি।
২- নিরাপত্তার অঙ্গীকারসমূহ।
৩- বৈদেশিক শান্তি চুক্তি, অথবা যাকে আমরা বলি: সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি।
৪- স্থায়ী শান্তি চুক্তি, অথবা যাকে আমরা বলি: জিম্মা চুক্তি।

এই প্রকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা নিম্নরূপ:

প্রথম প্রকার: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চুক্তি:

এই চুক্তিটি হলো সেই চুক্তি যা মুসলিম এবং অন্যদের মধ্যে জিম্মা চুক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়; যার উদ্দেশ্য হলো দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, যেখানে মুসলিমদের নিকট কোনো আর্থিক বিনিময় প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকে না।

এই চুক্তির বিষয়বস্তু হলো: অমুসলিমদের জান ও মালের নিরাপত্তা প্রদান এবং দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা ছাড়াই মুসলিম ও অন্যদের মধ্যে মৈত্রী, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করা। এর উদাহরণ হলো: হিজরতের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল মদীনা এবং লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী গোত্রসমূহ এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তি।

শরয়ি রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় স্থিতু হতে না হতেই মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি আউস ও খাজরাজ গোত্রের মাঝে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের ভিত্তিতে সমঝোতা গড়ে তোলেন। একইভাবে ইহুদিদের সাথেও চুক্তি করেন; যেখানে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এটিই ছিল মদিনার মুসলিম এবং ইহুদিদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সঠিক অর্থে সম্পাদিত প্রথম রাজনৈতিক চুক্তি। এতে একে অপরের ওপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ করা হয় এবং বহিরাগত শত্রু প্রতিহত করতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির অঙ্গীকার করা হয়। তারা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা জোটের ন্যায় চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন। এর মাধ্যমে মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অন্যদের সাথে অর্থাৎ ভিন্ন জাতি বা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সম্পর্ক বিন্যস্ত হয়। এটি শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমরা এই চুক্তির মধ্যে চক্রান্তকারী ইহুদিদের ব্যাপারে সতর্কতামূলক মনোভাবের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এছাড়া এতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয়তা, ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি, মুসলিমদের ঐক্যের ঘোষণা, তাদের পারস্পরিক সংহতি এবং জান-মাল ও অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের সমতা এবং ইহুদিদের সাথে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রেখে প্রত্যেকের স্বকীয়তা বজায় রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়।

এই চুক্তিতে ইহুদিরা আক্রান্ত হলে তাদের সাহায্য করার নীতি নির্ধারিত হয়। তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহর কোনো একটি দলের ওপর আক্রমণকে সমগ্র উম্মাহর ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালাকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে একমত হওয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদি ও মুসলিম উভয়ই স্বতন্ত্র জাতি, তবে তারা বহিরাগত শত্রু দমনে একটি সামরিক জোটের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেকের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। মুসলিম ও ইহুদিদের মাঝে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা, সদুপদেশ এবং যুদ্ধের পরিবর্তে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এই চুক্তিতে মজলুমকে সাহায্য করা এবং প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে এবং কুরাইশরা উভয় পক্ষের অভিন্ন শত্রু হিসেবে গণ্য হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ
পঞ্চদশ পাঠ

...মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ শান্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেকোনো সন্ধির আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য থাকবে। ইহুদিরা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি ভঙ্গ না করবে, ততক্ষণ চুক্তির মেয়াদ অব্যাহত থাকবে। মদিনা হবে একটি উন্মুক্ত শহর ও নিরাপদ পবিত্র স্থান (হারাম); এবং উভয় পক্ষেরই সেখানে বসবাস ও চলাচলের স্বাধীনতা থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার: নিরাপত্তা চুক্তি

আমি স্পষ্ট করেছি যে, রাজনৈতিক চুক্তিগুলো হয় স্থায়ী হয় নতুবা সাময়িক। আর এটি চুক্তির উভয় পক্ষ নির্ধারণ করে থাকে, চুক্তির বিষয়বস্তু নয়। সুতরাং নির্দিষ্ট মেয়াদের সাময়িক চুক্তি যদি অগণিত সংখ্যক লোকের সাথে হয়, তবে তা হলো নিরাপত্তা (আমানি); আর যদি তা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অগণিত লোকের সাথে হয়, তবে তা হলো যুদ্ধবিরতি (হুদনাহ)।

নিরাপত্তা (আমান) হলো এমন একটি চুক্তি যা হারবিদের (যুদ্ধরত পক্ষ) সাথে হত্যা ও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করার বিধান দেয়। এই নিরাপত্তা দুই ভাগে বিভক্ত: বিশেষ নিরাপত্তা ও সাধারণ নিরাপত্তা। বিশেষ নিরাপত্তা হলো যা একজন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট অল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হয়—যেমন দশ জন বা তার কম। এটিকে 'চুক্তি' (মুয়াহাদা) না বলে 'অঙ্গীকার' (আহদ) বলাই অধিক উত্তম। কারণ বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রসমূহ বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলোকেই 'মুয়াহাদা' বলা হয়, যেমনটি আমি শুরুতে পরিভাষা ও সংজ্ঞাসমূহ আলোচনার সময় স্পষ্ট করেছি। প্রত্যেক সজ্ঞান ও স্বাধীন মুসলিমের পক্ষ থেকেই এই বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা বৈধ। অর্থাৎ, এই বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা যে কোনো সজ্ঞান ও স্বাধীন মুসলিমের পক্ষ থেকে সঠিক হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মুসলিমদের জিম্মাহ (নিরাপত্তার অঙ্গীকার) এক ও অভিন্ন, তাদের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তিও তা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দেওয়া নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করবে, তার ওপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের লানত।" তিনি ﷺ আরও বলেন: "মুসলিমদের রক্ত (মূল্যমানের দিক থেকে) পরস্পর সমান, তারা অন্যদের বিরুদ্ধে একটি হাত স্বরূপ, এবং তাদের সাধারণ স্তরের ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে পারে।"

পক্ষান্তরে সাধারণ নিরাপত্তা হলো যা কোনো বড় ও অনির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা কোনো প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য দেওয়া হয়। এটি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ সম্পাদন করতে পারে না—যেমন যুদ্ধবিরতি ও জিম্মাহ চুক্তি। কারণ এটি এমন এক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, যা উলুল আমর (কর্তৃপক্ষ) ব্যতীত অন্যরা মূল্যায়ন করতে সক্ষম নয়।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
পঞ্চদশ পাঠ

নিরাপত্তা ব্যবস্থা (নিযামুল আমান) বর্তমানে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির জন্য এবং ইসলামী ভূখণ্ডে তার জান-মালের জন্য যে সকল প্রকার সুরক্ষা ও যত্নের বিষয়গুলো পরিচিত হয়েছে, তা মূলত শান্তি স্থাপন এবং অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে অনেক বিস্তৃত। নিরাপত্তার এই ধারণাটি শান্তিকে সুদৃঢ় করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ক্রুসেডের সময় খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল—যা ইসলামী উদারতারই ফলাফল ছিল। এটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। নিরাপত্তার বৈধতার মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: “আর মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৬] ।

ইমাম ইবনে কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন: এর উদ্দেশ্য হলো—যে ব্যক্তি যুদ্ধরত দেশ থেকে কোনো বার্তা পৌঁছাতে, ব্যবসা করতে, সন্ধি বা যুদ্ধবিরতির আবেদন করতে অথবা এই জাতীয় কোনো কারণে ইমাম বা তার প্রতিনিধির কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ইসলামী ভূখণ্ডে আগমন করে, তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে যতক্ষণ সে ইসলামী ভূখণ্ডে অবস্থান করবে, যতক্ষণ না সে তার নিজ আবাসে এবং নিরাপদ স্থানে ফিরে যায়।

মুশরিকরা সন্ধি ও অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত কামনা করত।

ইসলামে বার্তাবাহক ও রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তা প্রদান:
ইসলাম বার্তাবাহক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ট্রদূতদের জন্য সব ধরণের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, দায়মুক্তি এবং সম্মান নিশ্চিত করেছে;

যাতে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনতে পারে। এটি আল-কুরআনের অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, যেমনটি পূর্বে সূরা তওবার আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: “আর মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।” তেমনিভাবে এটি মৌখিক এবং ব্যবহারিক সুন্নাহ দ্বারাও প্রমাণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাইলামা কাজ্জাবের প্রেরিত দূতদের হত্যা করেননি বরং বলেছিলেন: “যদি আমি বার্তাবাহকদের হত্যা করতাম, তবে তোমাদের দুইজনকেই হত্যা করতাম।”

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: “সুন্নাত এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে—অর্থাৎ রীতি হলো—বার্তাবাহকদের হত্যা করা হবে না।” নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশদের প্রেরিত এক দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দূত হিসেবে এসেছিলেন (তাই তাকে পূর্বের নিয়মে ফেরত পাঠান)।

৭৮৫

পৃষ্ঠা 36

সিয়াসাহ শরইয়্যাহ (ইসলামি রাষ্ট্রনীতি)

পঞ্চদশ পাঠ

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দৃষ্টিভঙ্গি; তিনি বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না —অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘন করি না— এবং দূতদেরও আটক করি না —অর্থাৎ সংবাদ বাহকদের— বরং তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও, যদি তোমার অন্তরে এখন যা আছে তা থেকে যায় তবে ফিরে এসো।”

নিরাপত্তা (আমান) প্রদান এবং রাসুল ও দূতদের সুরক্ষার বৈধতার বিষয়ে ফকিহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কোনো প্রকার নিরাপত্তা চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। তারা শত্রুপক্ষের রাসুল ও দূতদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা বৈধ মনে করেননি; এমনকি যদি শত্রুরা তাদের কাছে থাকা মুসলিম বন্দিদের হত্যাও করে, তবুও তাদের দূতদের হত্যা করা যাবে না। কারণ জনৈক সাহাবীর বক্তব্য হলো: “বিশ্বাসঘাতকতা না করে অঙ্গীকার পূরণ করা, বিশ্বাসঘাতকতার বদলে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে উত্তম।”

তৃতীয় প্রকার: বৈদেশিক শান্তিচুক্তি:

অথবা যেটিকে সন্ধি চুক্তি বা যুদ্ধবিরতি বলা হয়: সাময়িক সন্ধি, যুদ্ধবিরতি বা পারস্পরিক সমঝোতা হলো যুদ্ধ সমাপ্ত করার এবং মুসলিম ও অন্যদের মাঝে অথবা দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপায়। এটি বৈধ হওয়ার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী: “আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করো।” [সূরা আল-আনফাল: ৬১]।

নবী ﷺ নবুওয়াতের যুগে একটি প্রসিদ্ধ সন্ধি করেছিলেন যা শান্তি চুক্তির ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়, আর তা হলো: হুদায়বিয়ার সন্ধি।

ওলামায়ে কেরাম যুদ্ধবিরতির বৈধতার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সাময়িক সন্ধি হলো হারবিদের (যাদের সাথে যুদ্ধ চলছে) সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার সমঝোতা—তা কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে হোক বা বিনিময় ছাড়াই হোক—চাই তারা তাদের নিজ ধর্মের ওপর বহাল থাকুক বা না থাকুক, এবং তারা ইসলামের শাসনের অধীনে না থেকে। অথবা এটি হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ কিছু শর্তে দুই নেতার মধ্যকার সন্ধি।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি করবেন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যাকে এই চুক্তির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, যদিও তা

সাধারণ ক্ষমতা অর্পণ হয়, যেমন কোনো অঞ্চলের গভর্নর; কারণ যুদ্ধবিরতির জন্য সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং জনস্বার্থ বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

শারয়ী রাজনীতি

পঞ্চদশ পাঠ

...সাধারণ বিষয়সমূহ এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এবং এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল বা প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা। আর সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে ইমাম ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এটি সম্ভব নয়।

সুতরাং যদি কোনো সাধারণ ব্যক্তি ইমামের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত যুদ্ধবিরতি চুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তা ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির ওপর অনধিকার চর্চা হিসেবে গণ্য হবে এবং জমহুর ফকীহগণের নিকট সেই চুক্তি বৈধ হবে না।

হুদায়বিয়ার সন্ধি কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? এবং এর কারণসমূহ কী ছিল?

হিজরি ষষ্ঠ সালের শেষের দিকে নবী ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ পবিত্র ঘরে উমরা পালন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মুশরিকরা তাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান করে। অতঃপর তারা তাদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তিতে সম্মত হন, যাতে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে মুসলিমদের জন্য কিছু কঠিন শর্ত ছিল। নবী ﷺ বলেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তারা আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের সম্মান রক্ষার্থে আমার কাছে যে পরিকল্পনাই কামনা করবে, আমি তাদের তা প্রদান করব।" সন্ধির একটি শর্ত ছিল: তোমাদের মধ্য থেকে —অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য থেকে— যে আমাদের নিকট আসবে আমরা তাকে তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেব না, আর আমাদের মধ্য থেকে যে তোমাদের নিকট যাবে তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে। তখন সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এটি লিখবেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্য থেকে যে তাদের নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূরে সরিয়ে দিন, আর তাদের মধ্য থেকে যে আমাদের নিকট আসবে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য কোনো পথ ও মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।"

উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই সন্ধির বিরোধিতা এবং এর অনেকগুলো শর্ত নিয়ে আপত্তি ছিল; এমনকি তিনি নবী ﷺ-এর নিকট সন্ধি সম্পর্কে অসম্মতি প্রকাশ করে বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "আমরা কি মুসলিম নই?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তারা কি মুশরিক নয়?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি (নবী ﷺ) বললেন: "আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আমি তাঁর আদেশের অবাধ্য হব না এবং তিনি আমাকে কখনই ধ্বংস করবেন না।"

মুসলিমগণ চুক্তির শর্তাবলী পূর্ণরূপে পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন; এমনকি আবু জানদাল বিন সুহাইল বিন আমর মুসলিম হয়ে মুসলিমদের নিকট চলে আসেন। তখন সুহাইল বিন আমর তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। নবী ﷺ বললেন: "আমরা তো এখনো চুক্তির কাজ শেষ করিনি।" অতঃপর নবী ﷺ তাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেন।

শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

ফারুক উমর—যেমনটি পূর্বে স্পষ্ট হয়েছে—বলেছিলেন: "আপনি কি সত্যিই আল্লাহর নবী নন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" উমর বললেন: "আমরা কি হকের ওপর এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের ওপর নয়?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" উমর বললেন: "তাহলে এখন কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা মেনে নেব?!"

নবী কুরাইশদের মধ্য থেকে আগত আরও একজন ব্যক্তিকে ফেরত দিয়েছিলেন যিনি মুসলিম হয়ে এসেছিলেন। চুক্তির বাস্তবায়ন স্বরূপ তারা তাকে ফিরিয়ে নিতে দুইজন লোক পাঠিয়েছিল। ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জিম্মাহ বা নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনকারী হলেন উলিল আমর (কর্তৃপক্ষ): ইমাম অথবা তার প্রতিনিধি। এটি একটি অপরিহার্য বিষয়; কারণ এটি এমন সব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের দাবি রাখে।

আর এটি ইমাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, যিনি মুসলিমদের সাধারণ স্বার্থ নিরূপণ করেন। বহিঃস্থ সন্ধির ক্ষেত্রে একদল ফকীহদের মতে এটি জায়েজ, যারা মনে করেন: মুসলিম ও অন্যদের মাঝে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো শান্তি, যুদ্ধ নয়। অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে স্থায়ী শান্তি চুক্তি করা জায়েজ—আমাদের ঐসব ভূখণ্ডে নয় যা তারা জবরদখল বা দখল করে রেখেছে—এমনভাবে যা শান্তি, নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের নিশ্চয়তা দেয়, যা যুক্তি, প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে অথবা পবিত্র কুরআনের ভাষায় প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

একইভাবে সদ্ভাব, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, বাণিজ্যিক লেনদেন বা আন্তর্জাতিক চুক্তির অন্য কোনো উদ্দেশ্যে শরীয়াহ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনে কোনো বাধা নেই, যার লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, এর ভিত্তি মজবুত করা এবং পারস্পরিক উপকার বিনিময় করা; যাতে চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তি ভঙ্গের ঘটনা ছাড়া আর কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, নবী কুরাইশদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদন করেছিলেন, যা বহিঃস্থ শান্তি চুক্তির একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

চতুর্থ প্রকার: স্থায়ী চুক্তিসমূহ:
বা একে যা বলা হয়: স্থায়ী সন্ধি, অথবা জিম্মাহ চুক্তি। যেখানে স্থায়ী চুক্তির ফলে মুসলিম ও অন্যদের মাঝে অথবা দারুল ইসলাম ও অন্যদের মাঝে যুদ্ধ স্থায়ীভাবে সমাপ্ত হয়।

শরয়ী রাজনীতি

এবং যুদ্ধের ভূখণ্ড; এটি দুটি উপায়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়: অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ উপায়টি হলো জিম্মাচুক্তি, আর বাহ্যিক উপায়টি হলো স্থায়ী শান্তিচুক্তি।

জিম্মাচুক্তি বা নিরাপত্তার অঙ্গীকার হলো আমাদের ভূখণ্ডে অমুসলিমদের বসবাসের স্বীকৃতি প্রদান এবং যেকোনো আক্রমণ থেকে তাদের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা প্রদানের একটি প্রতিশ্রুতি; এর বিনিময়ে তারা একটি সামান্য কর প্রদান করবে যা হলো 'জিজিয়া'। তবে শর্ত হলো তারা ইসলামের বিধানসমূহ মেনে চলবে এবং তাদের পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রকাশ করবে। ফলে জিম্মিরা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তারা অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং শান্তি বিনষ্ট করে।

সুন্নাহতে স্থায়ী শান্তির বহু উদাহরণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো নাজরানবাসীর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পাদিত সন্ধি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ:

সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলিম এবং রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। ফলে সে সময়ের চুক্তিগুলো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক সহায়তা বা সহযোগিতার জন্য ছিল না; বরং তা ছিল যুদ্ধবিরতি অথবা জিম্মাচুক্তির জন্য, যা যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শত্রুদের সামনে তিনটি বিষয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর সম্পাদিত হতো। সেই তিনটি বিষয় হলো: হয় ইসলাম গ্রহণ, নতুবা জিম্মাচুক্তি, অথবা যুদ্ধ। আমরা এখানে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সম্পাদিত দুটি চুক্তির উদাহরণ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব:

প্রথম চুক্তি: মিশরের সেই অধিবাসীদের জন্য আমর ইবনুল আস (রা.)-এর লিখিত পত্র, যারা খ্রিস্টধর্মে অটল থাকাকে বেছে নিয়েছিল। তাতে বর্ণিত হয়েছে: "তিনি তাদের জীবন, ধর্ম, সম্পদ, গির্জা, ক্রুশ এবং তাদের স্থল ও জলভাগের নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এগুলোর কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং কোনো কিছু হ্রাস করা হবে না। আর রোমানদের মধ্য থেকে যারা তাদের এই সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের জন্য তাই প্রাপ্য হবে যা মিশরীয়দের প্রাপ্য এবং তাদের ওপরও সেই দায়িত্ব অর্পিত হবে যা মিশরীয়দের ওপর অর্পিত। এটি তাদের জন্য যারা আমাদের শাসনাধীনে বসবাস করতে চায়। আর যারা তা অস্বীকার করে রোমানদের সাথে চলে যেতে পছন্দ করবে, তারা তাদের নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে।"

দ্বিতীয় প্রকার: এটি হলো ইলিয়া—অর্থাৎ কুদস বা জেরুজালেম—বাসীদের সাথে উমরের (রা.) সন্ধি। এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ সন্ধি এবং ইসলামি ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এতে বর্ণিত হয়েছে: "এটি সেই নিরাপত্তা যা আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মুমিনীন, ইলিয়া তথা জেরুজালেমবাসীদের দান করেছেন। তিনি তাদের জান ও মালের এবং তাদের গির্জা ও ক্রুশসমূহের নিরাপত্তা দান করেছেন। তাদের গির্জাগুলোতে অন্য কেউ বসবাস করবে না, সেগুলো ধ্বংস করা হবে না, গির্জা কিংবা তার চত্বর থেকে কোনো কিছু হ্রাস করা হবে না। তাদের ক্রুশসমূহ এবং তাদের কোনো সম্পদ থেকেও কিছু কমানো হবে না। তাদের ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি করা হবে না এবং তাদের কাউকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। ইলিয়ায় তাদের সাথে কোনো ইহুদি বসবাস করবে না।"

প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিগুলো অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। এমনকি উমর (রা.) 'চার্চ অফ দ্য হলি সেপালকার' বা কিয়ামাহ গির্জায় সালাত আদায় করতে সম্মত হননি এই ভয়ে যে, মুসলিমরা পাছে তাঁর অনুসরণ করে এবং বলে: 'এখানে উমর সালাত আদায় করেছেন'। ফলে গির্জার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা একটি অধিকারে পরিণত হতো এবং তা শেষ পর্যন্ত গির্জাটি দখলের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত।

এতে আরও রয়েছে: তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও চলাফেরার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাদের ওপর সামান্য পরিমাণ জিযিয়া প্রদানের ভার অর্পণ করেছেন।

রাশিদুন খিলাফতের যুগে আরও অনেক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা এই চুক্তির বিষয়বস্তুকেই সমর্থন করে। যেমন দামেস্কবাসীদের সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা.) সম্পাদিত চুক্তি, যাতে জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জান, মাল এবং গির্জার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

বাণিজ্য চুক্তিসমূহ:

আমরা বলি: অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের সাধারণ মূলনীতির সমর্থনে, মুক্ত বাণিজ্যের নীতিকে স্বীকৃতি দিতে এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করতে অমুসলিমদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন এবং বৈদেশিক লেনদেনের রূপরেখা প্রণয়ন শরয়িভাবে বৈধ। এটি সুন্নাহর 'তাকরিরি' বা মৌন সম্মতিরও অনুসারী; কেননা নবী (সা.) 'হিলফুল মুতায়্যাবীন' (সুগন্ধি মাখানোদের জোট) নামক চুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন...

শরয়ী রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

কুরাইশ গোত্রসমূহ কুসাই ইবনে কিলাবের মৃত্যুর পর—যিনি হাজীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন যা কুরাইশরা তাকে প্রদান করত—এই চুক্তির মূল বিষয় ছিল কুরাইশদের প্রতিটি গোত্রের মধ্যে হাজীদের সেবার জন্য পানি পান করানো (সিকায়াহ), আতিথেয়তা (রিফাদাহ), পতাকা বহন (লিওয়া) এবং সভা পরিচালনা (নাদওয়াহ) এর মতো দায়িত্বসমূহ বণ্টন করে দেওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জাহেলিয়াতের যুগে যে সকল চুক্তি ছিল, ইসলাম তাকে কেবল আরও শক্তিশালীই করেছে।"
অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন কল্যাণের ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, হাজীদের জন্য সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা এবং সত্যের সাহায্য করা। আরব ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বহু বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো ৯১৩ হিজরি সনে মাগরিবে বাদিসের আমির এবং ভেনিসবাসীদের মধ্যে হওয়া চুক্তি। এ চুক্তি ভেনিসবাসীদের বাদিসে অবতরণ করার, সেখানকার অধিবাসীদের সাথে ব্যবসা করার এবং তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা প্রদানের অনুমতি দিয়েছিল। ইসলামী কর্তৃপক্ষ বণিকদের সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করত।

পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল যেন মুসলিম ভূখণ্ড থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম বাইরে না যায়। এছাড়া মদ ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় এবং অন্যান্য অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করা হয়, তা মুসলিম হোক বা অমুসলিম। এ সকল বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী বিনিময় করা বৈধ ছিল, এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও; যেমন খাদ্যদ্রব্য, রসদ, পোশাক, কাপড়, খনিজ কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং যুদ্ধ বহির্ভূত কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী ইত্যাদি।

ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী চুক্তিসমূহের বিধানাবলি:

চুক্তি বিন্যাস: একটি চুক্তি বিন্যাস করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো পদক্ষেপ এবং গভীর ও নিবিড় পরামর্শের প্রয়োজন হয়। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষের অবস্থাও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, কারণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। চুক্তিটি একটি আইনের মতো হয়ে দাঁড়ায় যা উভয় পক্ষকে মেনে চলতে বাধ্য করে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। একইভাবে, একটি চুক্তি উভয় দেশের সাধারণ নাগরিকদের ওপরও প্রভাব ফেলে।

পঞ্চদশ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

নবুওয়াত যুগে চুক্তি বা চুক্তিনামাগুলো এমন সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, যা বর্তমান যুগে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের পর্যায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বর্তমান আলোচনাটি চুক্তির বিষয়াবলির নিম্নলিখিত দিকগুলো তুলে ধরছে:

ইসলামে চুক্তির বিষয়টি বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের চাহিদার মতো কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কাঠামোর অধীন ছিল না। কারণ, চুক্তির মূল ভিত্তি হলো পক্ষসমূহের স্বাধীন ইচ্ছা। তবে আধুনিককালের আনুষ্ঠানিক রীতিগুলো অনুসরণে শারঈ কোনো বাধা নেই; কেননা মূল বিবেচ্য বিষয় হলো চুক্তির বিষয়বস্তু। ফকীহগণ সেনাপতি কর্তৃক সম্পাদিত সন্ধি চুক্তির ক্ষেত্রে খলিফা বা ইমামের অনুমোদনের শর্তারোপ করেছেন, যদি উক্ত সেনাপতির এককভাবে চুক্তি সম্পাদনের চূড়ান্ত ক্ষমতা না থাকে। এমতাবস্থায় সেনাপতি কর্তৃক সম্পাদিত সন্ধির সংবাদ খলিফার নিকট পৌঁছানোর পর তিনি তা অনুমোদন করলে তবেই তা শারঈ চুক্তির মর্যাদা পাবে। যেমনটি সিরিয়া অভিযানে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ এবং অন্যান্য সেনাপতিদের সম্পাদিত সন্ধি চুক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছিল; তাঁরা সম্পাদিত চুক্তির সংবাদ আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব-এর নিকট প্রেরণ করতেন।

যদি খলিফা নিজেই চুক্তি সম্পাদন করেন—যেমনটি উমর বাইতুল মাকদিসের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির ক্ষেত্রে করেছিলেন—তবে তা সরাসরি কার্যকর হবে। কেননা খলিফা হলেন উম্মাহর প্রতিনিধি এবং চুক্তি সম্পাদন ও তা পেশ করার ক্ষেত্রে তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত। নবী কারীম সকল মৈত্রী ও চুক্তিনামা লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন যাতে সমঝোতা সাব্যস্ত করা এবং চুক্তির শর্তাবলি বাস্তবায়ন সহজ হয়। যেমনটি মদিনায় ইহুদিদের সাথে সম্পাদিত প্রথম রাজনৈতিক চুক্তি এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যা উভয় পক্ষের দূত ও প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।

চুক্তি সম্পাদন এবং শর্তাবলির বিষয়ে একমত হওয়ার পর কাজ সমাপ্ত হলেই শান্তির অবস্থা শুরু হয়ে যায়। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং সত্যায়ন বা অনুমোদনের অনুলিপি বিনিময়ের ওপর তা নির্ভরশীল নয়। নবী কারীম হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এবং সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; তিনি মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে চুক্তির সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষী হিসেবে রেখেছিলেন, আর এতে শারঈ কোনো বাধা নেই।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
পঞ্চদশ পাঠ

শরিয়তসম্মতভাবে চুক্তি দুই বা ততোধিক ভাষায় লেখা হতে পারে, যেমনটি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। ইসলামী চুক্তিগুলো সাধারণত নিম্নলিখিত তিনটি উপাদান সম্বলিত হতো:

১. **মুখবন্ধ বা ভূমিকা:** এটি সাধারণত শুরু হতো—যেমনটি আমরা এর নমুনাগুলোতে লক্ষ্য করেছি—বিসমিল্লাহর মাধ্যমে, যা হলো: "পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে"। এতে চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষের নাম এবং আলোচনায় তাদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের নাম উল্লেখ করা হতো। চুক্তির তারিখও এতে উল্লেখ করা হতো।

২. **মূল পাঠ:** এতে চুক্তির বিধানসমূহ এবং এর বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত; কোনো বিভাজন বা এর ধারাগুলোর ক্রমিক নম্বর প্রদান ছাড়াই, যেমনটি আধুনিক চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩. **উপসংহার:** এতে সাক্ষীদের নাম, তাদের স্বাক্ষর বা সিলমোহর উল্লেখ করা হতো। একইভাবে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের বা তাদের প্রতিনিধিদের নাম ও সিলমোহর উল্লেখ করা হতো। এটি শেষ করা হতো অঙ্গীকার পূরণে উৎসাহ প্রদানকারী এবং চুক্তিকে সম্মান করার ওপর গুরুত্বারোপকারী বাক্যের মাধ্যমে। সাধারণত চুক্তির আগে আলোচনার পর্যায় থাকে, এরপর লেখা ও সম্পাদনার পর্যায় শুরু হয়, অতঃপর স্বাক্ষর ও অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন হয়।

চুক্তি যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে আলোচনা খলিফা স্বয়ং বা তাঁর প্রতিনিধি পরিচালনা করতে পারেন; যেমন—শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত বিষয়। আর যদি চুক্তিটি কম গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে আমির, ওয়ালি বা সেনাপতি স্বয়ং অথবা এ কাজের জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি আলোচনা করতে পারেন।

কখনো কখনো অমুসলিম পক্ষ চুক্তির ধারা ও শর্তাবলী প্রস্তাব করে এবং মুসলিম ওয়ালি তা খলিফার কাছে—অর্থাৎ অনুমোদনের জন্য বা সংশোধনের জন্য—পাঠিয়ে দেন, অতঃপর চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। যেমনটি সুস শহরের নেতার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যা আবু মুসা আল-আশআরী অবরোধ করেছিলেন। তিনি আবু মুসা আল-আশআরীর কাছে নিরাপত্তার আবেদন করে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর আবু মুসা তা উমর-এর কাছে পাঠান। উমর তা কবুল করেন এবং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

পনেরোতম পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

চুক্তির শর্তাবলি:

মুসলিম এবং অন্যদের মধ্যে চুক্তি উভয় পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়; যাতে একটি বৈধ এবং সম্ভবপর উদ্দেশ্য হাসিল হয় যা অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের কাঙ্ক্ষিত মূলনীতি—তথা শান্তি—এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো, চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক, যা নিম্নরূপ:

১- চুক্তির যোগ্যতা: অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, স্বেচ্ছাধীন এবং মুসলিম হতে হবে। সুতরাং

অপরিণত অবুঝ শিশু, পাগল, মাতাল, নির্বোধ অথবা বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তি বা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তির (যদি অন্য শর্ত না থাকে) পক্ষ থেকে চুক্তি বৈধ হবে না। তবে শরীয়ত অনুযায়ী নারীর নিরাপত্তা প্রদান জায়েয, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে উম্মে হানি! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।" আর ইমাম মালিক, আহমাদ এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান-এর নিকট সমঝদার শিশুর নিরাপত্তা প্রদানও বৈধ, যা অন্যান্য ইমামদের নিকট নয়; এর দলিল হলো পূর্বোক্ত হাদীস: "তাদের (মুসলিমদের) মধ্যে সাধারণ স্তরের ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে পারে।"

চুক্তির বৈধতার জন্য আরও শর্ত হলো যে, চুক্তি সম্পাদনকারী যদি খলীফা বা ইমাম ব্যতীত অন্য কেউ হন, তবে তার প্রতিনিধিত্ব সঠিক হওয়া আবশ্যক। সুতরাং খলীফার পক্ষ থেকে দারুল ইসলামের হয়ে অন্য কোনো রাষ্ট্র বা অন্য কোনো জাতির সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য লিখিত বা মৌখিকভাবে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা জরুরি। মূলনীতি হলো, কোনো বড় গোষ্ঠী, জাতি বা প্রদেশের জন্য সাধারণ চুক্তি খলীফা বা তার নায়েবের পক্ষ থেকেই হওয়া উচিত। তবে খলীফা শত্রুর সাথে সন্ধি করার জন্য সেনাপতি বা গভর্নরকে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।

সাধারণ অভিভাবকত্বের অধিকারে এবং মুসলিম ও জিম্মি প্রজাদের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধের লক্ষে ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিরাপত্তার ওপর ইমামের নজরদারি করার অধিকার রয়েছে; কারণ ইসলামে ক্ষতি করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং এমন কোনো ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড বৈধ নয় যা জনস্বার্থের পরিপন্থী বা নিরাপত্তা প্রদানের সাধারণ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তখনই আবশ্যক, যখন তা সকল প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধন এবং ক্ষতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

শারঈ রাজনীতি
পঞ্চদশ পাঠ

ক্ষতি দূর করার জন্য ইমামের তদারকি দুই প্রকার: বিশেষ তদারকি এবং সাধারণ তদারকি।

বিশেষ তদারকি:
এটি তখন প্রকাশ পায় যখন কোনো ব্যক্তি তাকে প্রদান করা ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে; যেমন কোনো দুর্গের অধিবাসী বা কোনো অঞ্চলের লোকজনকে নিরাপত্তা দান করা, অথবা ইমাম নিরাপত্তা প্রদান করতে নিষেধ করার পর তা করা। এমতাবস্থায় ইমাম সেই নিরাপত্তা বহাল রাখা অথবা তা প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করার বিষয়ে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা রাখেন।

সাধারণ তদারকি:
এটি সাধারণ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে প্রদান করা প্রতিটি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়; বিশেষ করে নারী, দাস, শিশু এবং এই জাতীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে।

চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে আরও রয়েছে: পারস্পরিক সন্তুষ্টি অথবা দোষত্রুটিমুক্ত স্বাধীন ইচ্ছা।
যেকোনো দেওয়ানি চুক্তির মতো একটি চুক্তি সম্পাদিত ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। এটি সন্তুষ্টির যেকোনো ত্রুটি যেমন—জবরদস্তি, প্রতারণা এবং অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। সন্তুষ্টি, স্বাধীন পছন্দ এবং প্রতারণা ও ভুলভ্রান্তির অনুপস্থিতি ছাড়া স্থিতিশীল শান্তি অর্জিত হয় না। সুতরাং জবরদস্তি, জোর-জবরদস্তি, আধিপত্য বা প্রতারণার ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তি গণ্য হবে না এবং তা ধর্তব্যও হবে না; কারণ এটি চুক্তির অপরিহার্য চাহিদার পরিপন্থী।

চুক্তির স্পষ্টতা:
শর্ত হলো চুক্তিটি হতে হবে স্পষ্ট পাঠ্য সংবলিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যবিশিষ্ট, যা অধিকার ও বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্বসমূহকে এমন সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করবে যে তাতে কোনো অপব্যাখ্যা বা শব্দের মারপ্যাঁচের প্রয়োজন হবে না। সুতরাং এমন কোনো শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা যাবে না যাতে দ্ব্যর্থবোধকতা, প্রতারণা, জালিয়াতি, অস্পষ্টতা বা মারপ্যাঁচ থাকে।

পঞ্চদশ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

যেমনটা বর্তমানের রাজনীতিকরা করে থাকে; যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সালিশি বা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে চুক্তির ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে প্রায়শই চুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ নস্যাৎ হয়, বৈধ অধিকারসমূহ বিনষ্ট হয় এবং বিচারিক ধীরগতি ও তথাকথিত সভ্য রাষ্ট্রগুলোর অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ হয়।

পবিত্র কুরআন আমাদের শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো।" [আন-নিসা: ১০২]। তিনি আরও বলেছেন: "তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে একে অপরের মাঝে প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো না; অন্যথায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহর পা পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" [আন-নাহল: ৯৪]। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুক্তিগুলো ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট; যেমন মদীনার সনদ—অর্থাৎ হিজরতের পর মদীনায় গিয়ে ইয়াহুদীদের সাথে তিনি যে দলিল বা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ও এই জাতীয় অন্যান্য চুক্তিগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল।

এই পর্যালোচনাগুলো ভবিষ্যতে চুক্তি বাস্তবায়নের সময় যাবতীয় প্রতিকূলতা এড়ানোর লক্ষ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ছিল।

চুক্তির মেয়াদ:

ইসলামে সাধারণত চুক্তির বিষয়ে একমত হওয়ার সাথে সাথেই এর বাস্তবায়ন শুরু হয়। এটি লিখে রাখা, স্বাক্ষর করা, ঘোষণা করা বা অনুমোদনের কোনো বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না, যদি তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এর প্রমাণ হলো হুদায়বিয়ার সন্ধি বাস্তবায়ন এবং চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে মুসলমানদের কাছে যারা আশ্রয় নিতে এসেছিল তাদের ফেরত প্রদান—যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি চুক্তিতে এর কার্যকারিতা শুরুর জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়, তবে সেই তারিখ থেকেই তা কার্যকর হবে। আর শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তির সমাপ্তির বিষয়টি সাধারণত চুক্তিতেই উল্লেখ থাকে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার মাধ্যমে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "অতএব তাদের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা পূর্ণ করো।" [আত-তাওবাহ: ৪]

পঞ্চদশ পাঠ

চুক্তির মেয়াদের পরিমাণ এর প্রকারভেদে শুরু এবং সমাপ্তির দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিরাপত্তার মেয়াদের ক্ষেত্রে; অধিকাংশ ফকিহর (জমহুর) মতে, নিরাপত্তা প্রদানকারীর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব বা ইজাব সম্পর্কে যখন নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী (মুস্তামিন) অবগত হয়, তখন থেকেই নিরাপত্তা শুরু হয়। আর শাফেয়ীগণের মতে, এটি শুরু হয় কবুল বা গ্রহণের মাধ্যমে; এবং এটি সমাপ্ত হয় চুক্তিবদ্ধ মেয়াদের পরিসমাপ্তিতে।

নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মেয়াদের ব্যাপারে ফকিহগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। শাফেয়ী এবং মালেকীগণ বলেন: নিরাপত্তার মেয়াদ—যা মূলত যুদ্ধবিরতি—চার মাসের বেশি হবে না, যদি নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী কোনো রাষ্ট্রদূত বা রাজনৈতিক দূত না হন। তবে রাষ্ট্রদূত হলে তার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মেয়াদের সমাপ্তি ঘটবে; আর এটি মুসলমানদের সামর্থ্য ও শক্তি থাকার অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু মুসলমানরা যদি দুর্বল অবস্থায় থাকে, তবে ইমাম মেয়াদের পরিমাপ বিবেচনা করবেন। এমতাবস্থায় তার জন্য নিরাপত্তার মেয়াদ সন্ধির মেয়াদের ন্যায় দশ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা বৈধ। আর যদি সময় নির্ধারণ না করে সাধারণভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তবে তা চার মাস হিসেবে গণ্য হবে। আর এই সবকিছুই পুরুষদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তার জন্য মেয়াদের সীমাবদ্ধতা আরোপ করার প্রয়োজন নেই। যখন নিরাপত্তার মেয়াদ শেষ হবে, তখন নিরাপত্তা প্রার্থনাকারীকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। হানাফী, শিয়া ইমামিয়া এবং যায়দিয়াগণ বলেছেন: নিরাপত্তার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত পৌঁছাবে না; যাতে নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বা তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হিসেবে না দাঁড়াতে পারে। তাদের দলিল হলো জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা।

হাম্বলীগণ অন্যদের তুলনায় এ বিষয়ে অধিক প্রশস্ততা প্রদর্শন করেছেন। তারা প্রত্যেক নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী এবং রাজনৈতিক দূতের জন্য জিযিয়া ব্যতিরেকেই নিরাপত্তার চুক্তিকে বৈধ বলেছেন, চাই তা নিঃশর্তভাবে হোক বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হোক, এবং সেই মেয়াদ দীর্ঘ হোক বা স্বল্প হোক। তবে এটি যুদ্ধবিরতির (হুদনাহ) পরিপন্থী; কারণ যুদ্ধবিরতি নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যতীত বৈধ নয়।

সন্ধির (হুদনাহ) মেয়াদ:

ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সন্ধি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হতে হবে। চিরস্থায়ীভাবে নিঃশর্ত সন্ধি করা সঠিক নয়। বরং এটি একটি সাময়িক চুক্তি, যাতে জিহাদ স্থগিত হয়ে না যায়। একদল ফকিহর মতে, সন্ধির মেয়াদ দশ বছরের বেশি হওয়া বৈধ নয়, যেমনটি হুদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদ ছিল। তবে...

পঞ্চদশ পাঠ
শাফিয়ীগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধবিরতির সময়সীমা নির্ধারণ কেবল পুরুষদের জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে

সম্পদের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী চুক্তি করা জায়েজ। আর নারীদের সাথে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়াই যুদ্ধবিরতি করা বৈধ।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমাদ প্রয়োজন অনুযায়ী দশ বছরের অধিক সময়সীমা নির্ধারণ করাকে জায়েজ মনে করেন। কারণ তারা বলেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উল্লিখিত দশ বছর সময়সীমা কোনো সর্বনিম্ন সীমা নয়, বরং এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাপকতার আলোকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থা: "আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও তার দিকে ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।" দশ বছর সময়সীমা নির্ধারণ করে নবায়নযোগ্য সাময়িক চুক্তির ধারণার ভিত্তিতে উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব। আমরা বলতে পারি: প্রয়োজনে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হবে, যদি না এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নবায়ন না করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

জিম্মা চুক্তি বা জিম্মা অঙ্গীকারের মেয়াদের ব্যাপারে আমরা বলি: জিম্মা চুক্তি বা জিজিয়া হলো একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তি—অর্থাৎ, এই চুক্তিটি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এটি ইসলামের ভূখণ্ডে স্থায়ী বসবাসের জন্য অমুসলিমদের সাথে একটি চিরস্থায়ী শান্তি চুক্তি। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে উপনীত হওয়া। তিনি—সুবহানাহু—বলেছেন: "তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের ঐ সব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে না, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে।" [আত-তাওবা: ২৯]। এখানে বশ্যতা (সাগার) বলতে ইসলামি বিধানাবলী মেনে চলাকে বোঝানো হয়েছে। জিজিয়া প্রদানের উদ্দেশ্য—ঐকমত্যের ভিত্তিতে—হলো বশ্যতা স্বীকার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। সুতরাং জিম্মা চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, বরং এটি তার প্রকৃতিগতভাবেই একটি স্থায়ী অঙ্গীকার বা স্থায়ী সন্ধি, যা তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী কোনো কাজ না করা পর্যন্ত বা তার লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু না হওয়া পর্যন্ত ভঙ্গ হয় না; অথবা জিম্মিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে কিংবা ইসলামি বিধান মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়।

চুক্তিতে অন্যদের অন্তর্ভুক্তি:
বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইনের জগতে দুই ধরনের চুক্তি রয়েছে: বদ্ধ চুক্তি এবং উন্মুক্ত চুক্তি।

প্রথম প্রকার: এটি এমন এক চুক্তি যা পরবর্তীতে অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগদানের সুযোগ প্রদানকারী কোনো ধারা অন্তর্ভুক্ত করে না। ফলে অন্যদের যোগদানের জন্য মূল চুক্তিকারী পক্ষগুলোর সাথে আলোচনার প্রয়োজন হয়, যেমন ইউরোপীয় কমন মার্কেট চুক্তি।

আর দ্বিতীয় প্রকার: এটি হলো উন্মুক্ত চুক্তি; যা অন্যদের যোগদানের অনুমতি দানকারী ধারা অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: জাতিসংঘ সনদ। এই উভয় প্রকারই ইসলামে সুপরিচিত।

আবদ্ধ চুক্তিগুলো যেমন কোনো দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সাধারণ নিরাপত্তা প্রদান, অমুসলিমদের একটি গোষ্ঠীর সাথে জিম্মাহ চুক্তি যারা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এবং অস্থায়ী শান্তি চুক্তি বা যুদ্ধবিরতি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আবার কখনও তা উন্মুক্ত প্রকারের হতে পারে। হিজরি ষষ্ঠ সনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল উন্মুক্ত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এই সন্ধিতে যোগদানের অনুমতি দিয়ে একটি ধারা বর্ণিত হয়েছিল, আর তা হলো: "যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের সন্ধি ও চুক্তিতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, সে তাতে প্রবেশ করবে; আর যে ব্যক্তি কুরাইশদের সন্ধি ও চুক্তিতে প্রবেশ করতে পছন্দ করে, সে তাতে প্রবেশ করবে।" এটি একটি স্পষ্ট পাঠ যা অবশিষ্ট আরব গোত্রগুলোকে চুক্তি সম্পাদনকারী যেকোনো এক পক্ষে যোগদানের সুযোগ দেয়।

চুক্তির বিষয়বস্তু:

আন্তর্জাতিক আইনের ফকিহগণ শর্তারোপ করেন যে, চুক্তির বিষয়বস্তু হতে হবে সম্ভবপর এবং বৈধ। এর বৈধতা তখনই স্বীকৃত হয় যখন আইন তা অনুমতি দেয় এবং নৈতিক নীতিমালা একে সমর্থন করে। ইসলামের ফকিহগণ চুক্তির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ আরোপ করেছেন:

প্রথমত: চুক্তিটি ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলির সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া চলবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহর কিতাবে নেই এমন প্রতিটি শর্তই বাতিল।" এবং তাঁর বাণী: "মুসলিমরা তাদের শর্তাবলীতে অটল থাকবে, তবে এমন শর্ত ব্যতীত যা কোনো হালালকে হারাম করে দেয় অথবা হারামকে হালাল করে দেয়।" এবং তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যা আমাদের শরীয়ত অনুমোদিত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

পঞ্চদশ পাঠ
সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি)

অন্যতম একটি শর্ত হলো: ইসলামী স্বার্থ বা কল্যাণ (মাসলাহাত) অর্জন করা। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মুসলিম ও ইসলামের স্বার্থ থাকা শর্ত। তাই সন্ধি চুক্তিতে শরয়ি স্বার্থ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক; অন্যথায় চুক্তিটি বৈধ হবে না—যেমনটি আমাদের ফকিহগণ বলেছেন। আর যুদ্ধবিরতি—অর্থাৎ সাময়িক সন্ধি—চুক্তিতে শরয়ি স্বার্থ হলো: ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিনিময় করা, দারুল ইসলামের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, অথবা মুসলিমদের থেকে ক্ষতি দূর করা ইত্যাদি।

আরও শর্ত হলো: আমরা যেমনটি স্পষ্ট করেছি যে, চুক্তিটি উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে।

আরও শর্ত হলো: উভয় পক্ষের মাঝে সদিচ্ছা থাকা। কারণ ইসলামে চুক্তির বৈধতার জন্য সদিচ্ছার শর্তটি কাম্য, যেন প্রতারণা ও অসদুদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদিত হলে তা বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে তোমাদের মাঝে একে অপরকে প্রতারিত করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো না, অন্যথায় কোনো পা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা পিছলে যাবে।" [আন-নাহল: ৯৪]। এখানে 'দাখাল' বলতে এমন লুকায়িত দোষ বোঝানো হয়েছে যা কোনো জিনিসের ভেতরে প্রবেশ করে তাকে নষ্ট করে দেয়।

চুক্তির প্রভাবসমূহ:

চুক্তির ধরন ও মেয়াদ অনুযায়ী এর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শত্রু পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত নির্ধারিত সময়কাল ব্যাপী এটি কার্যকর থাকে। চুক্তির প্রভাব এর ধরন অনুযায়ী পৃথক হয়; যদি এটি বিশেষ নিরাপত্তা হয়, তবে এর প্রভাব কেবল আশ্রয়প্রার্থীর জীবন, সম্পদ, নাবালক সন্তান ও স্ত্রীর নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর যদি এটি কোনো অঞ্চল বা ভূখণ্ডের জন্য সাধারণ নিরাপত্তা হয়, তবে সেখানে অবস্থানরত সকলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি তা যুদ্ধবিরতি হয়, তবে তা কেবল যুদ্ধবিরতি চুক্তিকারীদের ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যদি তা জিম্মি চুক্তি হয়, তবে তা সকল জিম্মি ব্যক্তির ওপর কার্যকর হবে।

চুক্তির ফলে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবন, রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদ সংরক্ষিত হয়। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষ নিরাপত্তা, সৌহার্দ্য, শান্তি ও প্রশান্তির সাথে জীবনযাপন করে।

পৃষ্ঠা 51

ইসলামি শাসনব্যবস্থা
পঞ্চদশ পাঠ

উভয় পক্ষ সততার সাথে চুক্তির বিধান ও শর্তাবলি বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ থাকে; কারণ চুক্তির মাধ্যমে একটি আইনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য ও অধিকার সাব্যস্ত করে।

চুক্তি সমাপ্তি:

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে চুক্তির সমাপ্তি ঘটে:

উদাহরণস্বরূপ: চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া, চুক্তির শর্তাবলি লঙ্ঘন করা, এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের ওপর আক্রমণ হওয়া, শত্রুপক্ষ কর্তৃক কোনো গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং একইভাবে শত্রুপক্ষ কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ করা। যখন এই বিষয়গুলো পাওয়া যায়, তখন তার ফলস্বরূপ চুক্তির সমাপ্তি ঘটে।

৮০১

পৃষ্ঠা 52

""

পৃষ্ঠা 53

শরয়ী রাজনীতি
ষোড়শ পাঠ

ইসলামী ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ এবং যাচাই ও প্রমাণের মাধ্যমসমূহ

পাঠের বিষয়বস্তু

প্রথম শিরোনাম: বিচার বিভাগের সংজ্ঞা, এর শরয়ী ভিত্তি, ইতিহাস এবং এর স্তম্ভসমূহ — ৮০৫
দ্বিতীয় শিরোনাম: মামলা ও এর বিরোধপূর্ণ দিকসমূহ এবং প্রমাণের মাধ্যমসমূহ — ৮২৪
তৃতীয় শিরোনাম: ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় প্রমাণ ও যাচাইকরণের মাধ্যমসমূহ — ৮৪০

৮০৩

পৃষ্ঠা 54

""

পৃষ্ঠা 55

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ | ষোড়শ পাঠ

বিচারব্যবস্থার (ক্বাযা) সংজ্ঞা, এর বৈধতা, ইতিহাস ও রুকনসমূহ

বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থে ক্বাযা বা বিচার হলো: কোনো বিষয় সম্পন্ন করা, সমাপ্ত করা এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করা।

শরীয়তের পরিভাষায় বিচারব্যবস্থা হলো: বিবাদ মীমাংসা করা এবং কোন্দলের অবসান ঘটানো। শাফেয়ী আলেমগণ একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বিবাদমান পক্ষের মাঝে বিরোধের নিষ্পত্তি করা; অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান প্রকাশ করা। বিচারকার্যকে 'হুকুম' (মীমাংসা) বলা হয় কারণ এতে হিকমত বা প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যা কোনো বিষয়কে তার যথাযথ স্থানে স্থাপন করাকে আবশ্যক করে; কেননা এটি জালিমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখে।

বিচারব্যবস্থার বৈধতা ও গুরুত্ব:

বিচারব্যবস্থার বৈধতার মূল ভিত্তি হলো: কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ এবং ইজমা।

কুরআন থেকে দলিল: মহান আল্লাহর বাণী: "হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি; অতএব তুমি মানুষের মাঝে সত্যের সাথে বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" [সূরা

সাদ: ২৬]। মহান আল্লাহর বাণী: "আর আপনি তাদের মাঝে বিচার করুন তা দিয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৯]। মহান আল্লাহর বাণী: "তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করুন।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪২]। মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১০৫] এবং এ জাতীয় আরও আয়াতসমূহ।

সুন্নাহ থেকে দলিল: আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার। আর যখন তিনি ইজতিহাদ করেন এবং ভুল করেন, তখন তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার।" রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন: "যখন কোনো বিচারক বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য বসেন, তখন আল্লাহ তার নিকট দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন যারা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাওফীক দান করেন; যতক্ষণ তিনি ন্যায়বিচার করেন, ততক্ষণ তারা তার সাথে অবস্থান করেন—অর্থাৎ..."

ষোড়শ পাঠ

...অব্যাহতভাবে। (এবং যদি অন্যায় করা হয় তবে তা বিচ্যুতি এবং আমরা তা পরিত্যাগ করেছি)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন এবং মুয়ায (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কেও তাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আত্তাব বিন আসীদ ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিযুক্ত প্রথম বিচারক। যেহেতু খোলাফায়ে রাশেদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন; উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু মুসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বসরার বিচারক হিসেবে এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফার বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। আর উমর, আলী, মুয়ায, আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যান্যরা বিচারকার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুসলিমগণ বিচারক নিয়োগের বৈধতার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মানুষের মাঝে ইনসাফের সাথে বিচার করা সত্য প্রতিষ্ঠারই অংশ। যেহেতু মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয়, তাই এমন একজন বিচারক থাকা অপরিহার্য যিনি মাজলুমকে জালিমের হাত থেকে ইনসাফ পাইয়ে দেবেন।

বৈধতার ধরন:

মাযহাবের ইমামগণের ঐকমত্যে বিচারকার্য পরিচালনা করা একটি সুদৃঢ় ফরজে কিফায়া। সুতরাং ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) ওপর বিচারক নিয়োগ করা ওয়াজিব। এর ফরজিয়্যাতের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: “হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো...” (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)। আর এর কারণ হলো—যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে—মানুষের স্বভাব হচ্ছে একে অপরের প্রতি জুলুম করা এবং অন্যের পাওনা আটকে রাখা। খুব কম মানুষই আছে যারা নিজ থেকে ইনসাফ করে। যেহেতু ইমামের পক্ষে সাধারণত তাঁর রাষ্ট্রীয় কার্যের ব্যাপক ব্যস্ততার কারণে ব্যক্তিগতভাবে সকল বিবাদ মীমাংসা করা সম্ভব হয় না; তাই বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর বিচারকার্য ফরজে কিফায়া হওয়ার কারণ হলো এটি সৎ কাজের আদেশ অথবা অসৎ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত, যা উভয়ই ফরজে কিফায়া। বিচারব্যবস্থা দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি মুসলিমদের এমন এক জনস্বার্থ যা সংরক্ষণ করা ওয়াজিব; কারণ মানুষের এর প্রতি চরম মুখাপেক্ষিতা রয়েছে। এটি মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, তাই আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-গণ এই দায়িত্ব পালন করেছেন। ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: “দুজন ব্যক্তির মাঝে বিচারক হিসেবে বসা আমার কাছে সত্তর বছরের ইবাদতের

চেয়েও অধিক প্রিয়।”

৮০৬

পৃষ্ঠা 57

শারঈ রাজনীতি
ষোড়শ পাঠ

বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব:

নিশ্চয়ই বিষয়সমূহের গুরুত্ব তাদের উদ্দেশ্যের নিরিখে পরিমাপ করা হয়। আর বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জুলুমকে দমন করা। সুতরাং যেখানেই ন্যায়বিচার বিদ্যমান থাকে, সেখানে জুলুম বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর জুলুম হলো দুনিয়া ও আখেরাতে অন্ধকারস্বরূপ। এটি প্রাণের জন্য পীড়াদায়ক, অধিকার হরণকারী এবং সম্মানের হানি ঘটায়। মহান বা তুচ্ছ সব ব্যাপারেই এটি জঘন্য। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাবিরা গুনাহ তথা তাঁর সাথে শিরক করাকে জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই শিরক হলো এক মহা জুলুম।" [লুকমান: ১৩] জুলুমকে পরাভূত করার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অত্যধিক হওয়ায় এবং এ দুটি পরস্পর বিরোধী ও একত্রে অবস্থান করা অসম্ভব হওয়ায়, পবিত্র কুরআনের একই আয়াতে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে তা বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম-সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।" [আন-নাহল: ৯০] মানবজাতি বিভিন্ন যুগে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং একে তাদের শাসনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। যদিও তারা কর্মপন্থা ও ফলাফলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

যেহেতু ন্যায়বিচার একটি কার্যকর শক্তি যা জুলুমকে সমূলে উৎপাটন করে এবং তার চিহ্নসমূহ মুছে দেয়, তাই ন্যায়বিচারের সাথে জুলুমের সংঘাতের ফলে জুলুমের বিনাশ ঘটার বিষয়ে কুরআনী অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ চিত্রায়ণ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত করি, ফলে তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তোমরা যা বলছ তার জন্য তোমাদের ধ্বংস নিশ্চিত!" [আল-আম্বিয়া: ১৮] এখান থেকেই বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রকাশিত হয়, যা মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি অবলম্বন। এই লক্ষ্যের গুরুত্ব ও ভয়াবহতার কারণে এই অবলম্বনটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি এসেছে; যাতে এটি এমন কেউ ব্যবহার না করে যে এর সঠিক ব্যবহারে সক্ষম নয়, যার ফলে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তার পদস্খলন ঘটবে, অতঃপর সে জুলুম ও অপবাদের আবর্তে নিপতিত হবে।

ইসলামে বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস:

আমরা প্রথমদিকের ইসলামী যুগে বিচার ব্যবস্থা যে সকল পর্যায় অতিক্রম করেছে সেগুলো উল্লেখ করছি।

ষোড়শ পাঠ

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বিচার ব্যবস্থা:

যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে ইসলাম এলো, তখন তা ইনসাফের ঝাণ্ডা উত্তোলন করল এবং সমস্ত মানুষের মাঝে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত করল। শাসক ও শাসিতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, আমীর ও অতি সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই, এমনকি মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝেও কোনো বৈষম্য নেই। ইসলামের ইনসাফের সামনে সবাই সমান। ইসলাম মানুষের মাঝে সমতার নীতিকে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে এবং সর্বোত্তম পন্থায় সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী সকল পদ্ধতি ও শরীয়াহ বিধানের ভিত্তি হিসেবে ইসলাম ইনসাফকে গ্রহণ করেছে। যে সকল ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রয়োজন এবং যে সকল ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষার দাবি রাখে, ইসলাম সেই সকল ক্ষেত্রে এই ইনসাফকে বাস্তবায়ন করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইনসাফের মাধ্যমে মানুষের বিশেষ শিক্ষা সংরক্ষণ করার এবং মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও তাদের সামনে উদ্ভূত সকল সমস্যা ও বিরোধের মীমাংসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর আবশ্যক ছিল যে, তিনি এ বিষয়ে তাঁর সাধ্যমতো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন। ফলে তিনি মানুষের সামনে বিচার ও মামলা পরিচালনার মূলনীতি বর্ণনা করতে শুরু করলেন। একজন বিচারক তাঁর বিচারের ক্ষেত্রে কোন পথ অবলম্বন করবেন, মামলা পর্যালোচনার সময় এবং সে বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার সময় তাঁর জন্য কোন বিষয়গুলো মেনে চলা আবশ্যক এবং ইসলাম যা সমর্থন করে—তা তিনি স্পষ্ট করলেন। এক্ষেত্রে তিনি আসমানী হিদায়াত দ্বারা সুসংগঠিত তাঁর কর্মপদ্ধতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেন, যা মানুষকে জীবনের প্রতিটি স্তরে তাঁকে অনুসরণের আহ্বান জানায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচার ছিল অনুসরণের জন্য আবশ্যক একটি শারঈ বিধান, চাই সেই বিচার ওহী হিসেবে অবতীর্ণ কোনো শারঈ দলিলের প্রয়োগ হোক অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ইজতিহাদ হোক। কারণ, তিনি কোনো অবস্থাতেই ভুলের ওপর বহাল থাকেন না। ফলে তাঁর ইজতিহাদও অকাট্য ওহীর মর্যাদায় অভিষিক্ত, যাতে কোনো বিতর্ক বা সন্দেহ নেই; যেমনটি জমহুর উলামা ও ফকীহগণের মত হিসেবে স্থির হয়েছে। এটি গ্রহণ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে: "তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না। এটি তো কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।" [আন-নাজম: ৩-৪]

আর কিতাব বা সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত দলিলের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচার সেই দলিলের ওপর আমল অব্যাহত থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে। এর সাথে কখনও শারঈ বিধানের সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং এর অস্পষ্ট বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ যুক্ত থাকে। এখান থেকেই...

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচার যখন কোনো (কুরআন বা সুন্নাহর) দলিলের (নস) প্রয়োগ হিসেবে গণ্য হয়, তখন তা মেনে চলা ওয়াজিব। সামনে উপস্থিত কোনো সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে সেই দলিলের প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক বিচারকের জন্য দলিলের সত্যতা সাব্যস্ত হওয়ার পর তা থেকে বিচ্যুত হওয়া বৈধ নয়।

আর যেসব বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দলিল বর্ণিত হয়নি, সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ গবেষণার (ইজতিহাদ) ভিত্তিতে দেওয়া বিচার অনেক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ফাতেমা বিনতে কায়েসের ব্যাপারে তাঁর ফয়সালা, যিনি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি (স্বামী) তাঁকে চূড়ান্ত তালাক প্রদান করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য আবাসন ও খোরপোশের ব্যবস্থা করেননি। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে: "আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছেন, তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার জন্য কোনো আবাসন বা খোরপোশ বরাদ্দ করেননি।" আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন: "হে কায়েস বংশের কন্যা! আবাসন ও খোরপোশ কেবল তার জন্য, যার (তালাকের পর) ফিরে আসার সুযোগ থাকে।"

এর আরেকটি উদাহরণ হলো—পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ঘটলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানকে পিতা ও মাতার মধ্যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার এখতিয়ার প্রদানের বিষয়ে তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) ফয়সালা। একজন নারী তাঁর কাছে এসে বললেন: "আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছেন, অথচ সে আমাকে আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি পান করিয়ে উপকৃত করেছে।" তখন তিনি (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বললেন: "তোমরা এ বিষয়ে লটারি করো।" স্বামী বললেন: "আমার সন্তানের ব্যাপারে কে আমার সাথে বিতর্ক করবে?" তখন নবী ﷺ সন্তানকে বললেন: "এই তোমার পিতা এবং এই তোমার মাতা; তুমি যার হাত ইচ্ছা ধরো।" তখন সে তার মায়ের হাত ধরল এবং মা তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

নবী ﷺ-এর যুগের বিচারিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে আমরা বলব: হিজরতের পর নবী ﷺ যখন মদিনায় স্থিতু হলেন, তখন তিনি আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ—সকল ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তখন মুসলমানদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো বিচারক ছিলেন না। আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ওহীর বার্তাবাহক এবং শরিয়ত প্রবর্তনের পতাকাবাহী, আর সকল মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। অন্যদিকে বিচারিক ক্ষমতার কারণ ছিল এই যে, ন্যায়বিচারের পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ, সুশৃঙ্খল বিন্যাস এবং এমন এক প্রাজ্ঞ প্রায়োগিক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে সর্বকালের ও সর্বস্থানের মানুষ সঠিক পথের দিশা লাভ করবে। আর এই নেতৃত্ব মূলত আসমানী হিদায়াতের মাধ্যমেই তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা লাভ করে। তাই বিচারিক ক্ষমতা তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) হাতে থাকা আবশ্যক ছিল। তিনি এই বিচারিক ক্ষমতার সাথে সাথে সমসাময়িক কালে মানুষের মাঝে উদ্ভূত সকল সমস্যা ও মামলার বিচার এবং রায় প্রদানের কাজও নিজে পরিচালনা করতেন। আর এটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শুরুর দিকে...

৮০৯

ষষ্ঠদশ পাঠ: আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)

তখন পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা খুব একটা প্রসারিত হয়নি এবং মানুষের মাঝে বিচারিক বিধানসমূহ প্রয়োগে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল না; কারণ সেই সময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপিত মামলার সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। অতঃপর যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল এবং দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত হলো, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারিক বিধানের রূপরেখা স্পষ্ট করার পর এবং তা পালনে তাদের নির্দেশ দেওয়ার পর, দূর-দূরান্তের বিশাল ভূখণ্ডের শাসনকার্যে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত কিছু গভর্নরদের ওপর বিচারকার্য ন্যস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তখন সকল মানুষের মাঝে সমানভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো, সেখানে আমির ও সাধারণ প্রজা কিংবা মুসলিম ও জিম্মির মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না। ইসলামের ন্যায়বিচারের সামনে সবাই সমান ছিল, যা তিনি বিচার বিভাগে প্রণীত আদর্শ অনুযায়ী নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং বিচারকার্য ছিল গভর্নরের অন্যতম দায়িত্ব, যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার করা তার জন্য আবশ্যক ছিল।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচারিক ক্ষমতার বিধানে অন্তর্ভুক্ত নিয়ম, মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামলার ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিটি দাবির জন্য এমন প্রমাণের প্রয়োজন যা তার দাবিকারীর সত্যতা প্রমাণ করে; যদি তা প্রমাণহীন হয় তবে তা ভিত্তিহীন বলে গণ্য হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যদি মানুষকে তাদের দাবি অনুযায়ী সবকিছু দিয়ে দেওয়া হতো, তবে মানুষ অন্যের সম্পদ ও রক্তের ওপর দাবি তুলত। কিন্তু প্রমাণ উপস্থাপন করা দাবিদারের দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারীর দায়িত্ব হলো শপথ করা।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরোধ নিষ্পত্তির আগে উভয় পক্ষ বা বিবাদীর বক্তব্য শোনার আবশ্যকতাও স্পষ্ট করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করার সময় তাঁর প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী: "যখন তোমার সামনে দুই বিবাদী বসবে, তখন তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফয়সালা দেবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষের কথা শুনবে যেমনটি প্রথম পক্ষের কথা শুনেছ। এতে তোমার কাছে সঠিক বিচার স্পষ্ট হওয়া অধিকতর সম্ভব।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচার বিভাগীয় নীতিমালার মধ্যে ইহাও স্পষ্ট করেছেন যে, বিচারককে অবশ্যই উভয় বিবাদীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যাকে মুসলিমদের মাঝে বিচারের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সে যেন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত, ইঙ্গিত এবং বসার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখে।"

৮১০

পৃষ্ঠা 61

আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি)
ষোড়শ পাঠ

...এবং তার আসন))। এক বর্ণনায় রয়েছে: ((যাকে মানুষের মধ্যে বিচারকার্যের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়, সে যেন একজনের সামনে অন্যজনের তুলনায় তার কণ্ঠস্বর উঁচু না করে))। যেমন নবী ﷺ বিচারকদের সত্য অনুসন্ধান করার এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদ্রূপ নবী ﷺ স্পষ্ট করেছেন যে, বিচারকার্যে ন্যায়বিচার করা মহান আল্লাহর নিকট বিচারকের মর্যাদাকে সুউচ্চ করে। আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ((তোমরা কি জানো কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে কারা অগ্রগামী হবে? তারা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: তারা হচ্ছে ঐ সকল লোক, যাদেরকে যখন সত্য (অধিকার) দেওয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করে, আর যখন তাদের কাছে তা চাওয়া হয় তখন তারা তা প্রদান করে এবং যখন তারা মুসলিমদের জন্য ফয়সালা করে, তখন তারা নিজেদের জন্য যেভাবে ফয়সালা করত ঠিক সেভাবেই ফয়সালা করে))।

নবী ﷺ বিচারে জুলুম বা অবিচার করা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন: ((নিশ্চয়ই আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন যতক্ষণ না সে অন্যায় করে। যখন সে অন্যায় করে, তখন আল্লাহ তাকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দেন))। নবী ﷺ আরও বর্ণনা করেছেন যে, বিচারকার্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পদ, যা এমন ব্যক্তির পরিচালনা করা উচিত যে এর জন্য সর্বাধিক যোগ্য ও সক্ষম; কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন: ((যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করল, অতঃপর তাদের ওপর এমন কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল অথচ সে জানে যে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক যোগ্য; তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম জামায়াতের সাথে খেয়ানত করল))।

নবী ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকের ফয়সালা প্রদান করতেও সতর্ক করেছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ বলেছেন: ((কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা না করে))। তিনি আরও বলেছেন: ((বিচারক যেন তৃপ্ত ও পিপাসামুক্ত না হয়ে ফয়সালা না করে))। অনুরূপভাবে নবী ﷺ ঘুষ গ্রহণ করা থেকেও সতর্ক করেছেন; যেমনটি আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: ((রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচারকার্যে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন))।

নবী ﷺ আরও স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম কোনো মুসলিম বিচারককে আহলে কিতাবদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বাধা

দেয় না, যদি তারা তার কাছে বিচারপ্রার্থী হয় অথবা তার সামনে বিচার প্রার্থনা করে। নবী ﷺ তাঁর কাছে পেশকৃত তাদের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করেছেন। তদ্রূপ তিনি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সাথে পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য। সকল অবস্থাতেই নবী ﷺ বিচারকদেরকে তাদের মর্জিমতো আইন তৈরি করার সুযোগ দেননি, বরং তিনি তাদের বাধ্য করেছেন...

৮১১

পৃষ্ঠা 62

ষোড়শ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

আসমানি কানুন ও ইসলামের শরয়ি বিধান অনুযায়ী। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত পথ হলো প্রথমত আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। যদি তাতে কোনো এমন নস বা মূল পাঠ না পাওয়া যায় যা উদ্ভূত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে দ্বিতীয়ত সুন্নাহর আশ্রয় নেওয়া। আর যদি সুন্নাহতেও সেই বিষয়ের বিধান পাওয়া না যায়, তবে কিতাব ও সুন্নাহর নসের নির্দেশনার আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধান বের করার ওপর তারা নির্ভর করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রদর্শিত এই পদ্ধতির মাধ্যমেই ন্যায়বিচারের পথটি ইসলামী শরয়ি মূলনীতি এবং তার প্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

২. প্রথম খলিফা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে বিচারব্যবস্থা ও বিচারিক ক্ষমতা:

খলিফা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে বিচারিক ক্ষমতা সর্বোচ্চ শাসকের হাতেই ন্যস্ত ছিল, আর তিনি হলেন খলিফা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু), যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল। বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিও অনুরূপ ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের সাথে এর পার্থক্য কেবল এই দিক থেকে ছিল যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিচারকার্যের জন্য একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। ফলে বিচার বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর জন্য পূর্ণ সময় দেওয়ার বিষয়টি একটি দাপ্তরিক কর্মে পরিণত হয়, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল না। কেননা তখন বিচার বিভাগ ছিল শাসনের (বিলায়াত) পদের অধীনস্থ—যেমনটি ইতিপূর্বে স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মদিনার শাসনভার নয়, বরং কেবল বিচারকার্যের জন্য ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিচারিক দায়িত্ব অর্পণ করা সত্ত্বেও তিনি (আবু বকর) কখনো কখনো নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন; আর তা ছিল তখন, যখন কোনো বিবাদ বা মতবিরোধ তাঁর কাছে সরাসরি উত্থাপন করা হতো। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিজের বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর বিচারিক দায়িত্ব অর্পণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য রয়েছে; কেননা খলিফা হলেন সাধারণ নেতৃত্বের (বিলায়াত আম্মাহ) অধিকারী। সুতরাং তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে নিজে বিচার করার অধিকার তাঁর রয়েছে। কারণ বিচার বিভাগ হলো খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ দাপ্তরিক পদসমূহের অন্যতম। আর এটিই আমাদের সামনে সেই বর্ণনার ব্যাখ্যা প্রদান করে যে, ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক বছর এমনভাবে অবস্থান করেছিলেন যে বিচারপ্রার্থী হয়ে কোনো দুজন ব্যক্তিও তাঁর কাছে আসেনি। সম্ভবত বিবাদমান পক্ষদ্বয় আবু বকরের কাছেই বিচার নিয়ে যেতেন এবং ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এড়িয়ে চলতেন। এর কারণ ছিল বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে বিবাদমান পক্ষগুলোর অন্তরে ভয় এবং মানুষের মাঝে সকল বিষয়ে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কঠোরতা ও দৃঢ়তা প্রসিদ্ধ থাকা।

৮১২

ষোড়শ পাঠ

মদিনার বাইরের বিচারকার্যের ক্ষেত্রে: বিচারকার্য ছিল গভর্নরদের কাজের একটি অংশ এবং তাদের কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। তদানুযায়ী, এই প্রদেশগুলোর জন্য আবু বকরের নিযুক্ত গভর্নরগণই বাস্তব ক্ষেত্রে সেখানকার বিচারকও ছিলেন। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। যদিও এর পাশাপাশি আরও কিছু কারণ ছিল যার ফলে তিনি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে নির্বাহী ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পৃথক করার দিকে ধাবিত হননি, যেমনটি তাঁর পরে উমর করেছিলেন। এই কারণগুলোর মধ্যে একটি ছিল তাঁর খিলাফতের স্বল্প মেয়াদ; কেননা তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস কয়েক দিন দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর মূল মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল সেই ফিতনা দমনের দিকে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর কিছু গোত্র যার আগুন প্রজ্বলিত করেছিল। এর আরেকটি কারণ ছিল, তাঁর আমলে গভর্নরদের দায়িত্বের বোঝা এতোটা বেশি ছিল না যা তাদের বিচারকার্য পরিচালনা ও বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে ফয়সালা করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত।

বিচারকার্যে আবু বকরের পদ্ধতি:

আবু বকর বিচারকার্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন:

ক. ফয়সালার জন্য পেশকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই আল্লাহর কিতাবের শরণাপন্ন হওয়া; যদি তাতে কোনো অকাট্য বিধান (নস) পাওয়া যেত, তবে সে অনুযায়ী ফয়সালা করতেন।
খ. যদি আল্লাহর কিতাবে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোনো বিধান না পেতেন, তবে নবী ﷺ-এর সুন্নাহর আলোকে বিচার করতেন যদি তাতে বিধান পাওয়া যেত।
গ. যদি সুন্নাহতেও বিধান না পেতেন, তবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচার ফয়সালাসমূহের মধ্যে অনুরূপ কোনো ঘটনার সন্ধান করতেন এবং যদি ঘটনা দুটি সদৃশ হতো তবে রাসূলের ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করতেন।
ঘ. যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচার ফয়সালাসমূহের মাঝেও সমাধান করার মতো কিছু না পেতেন, তবে জনগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করতেন। অতঃপর তারা যদি কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতেন তবে সে অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। আর যদি বিবাদমান বিষয়ে তারা একমত হতে না পারতেন, তবে তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা খাটিয়ে ইজতিহাদ করতেন এবং সেই ইজতিহাদ অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করতেন।

---

৩. উমর ইবনুল খাত্তাব-এর যুগে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও বিচার ব্যবস্থা :

আবু বকরের ইন্তেকালের পর উমর ইবনুল খাত্তাব যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি বিচার ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং একে শক্তিশালী করেন। বিশেষত আল্লাহ যখন মুমিনদের জন্য সিরিয়া, পারস্য, ইরাক এবং মিশর বিজয় উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর শাসনামলে আরব উপদ্বীপের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে—যেমন: কুফা ও বসরা পর্যন্ত—ইসলামি ভূখণ্ডের বিস্তৃতি ঘটল, তখন এই বিশাল প্রসারের প্রেক্ষাপটে উমর-এর জন্য এটি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল যে, তিনি কোনো কোনো প্রদেশে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে গভর্নরের কর্মপরিধি থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করবেন; যাতে গভর্নর অন্যান্য বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন যা করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। যার শীর্ষে ছিল নিজ প্রদেশের সর্বত্র নিরাপত্তা ও প্রশান্তি নিশ্চিত করা, শত্রুদের হাত থেকে একে রক্ষা করা এবং তাদের গতিবিধি ও ষড়যন্ত্রের ওপর নজর রাখা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উমর কয়েকটি বৃহৎ প্রদেশে বিচার বিভাগকে গভর্নরের কাজ থেকে পৃথক করে দেন এবং একে একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুফা, বসরা ও মিশর প্রদেশে এটি বাস্তবায়ন করেন।

উমর বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সরাসরি নিজের অধীনস্থ করে নেন। তিনিই বিচারকদের নিয়োগ দিতেন এবং প্রদেশের গভর্নরের কাছে এই মর্মে পত্র লিখতেন যেন অমুক ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি বিচারকদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন এবং বিচারিক কোনো বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে তারা তাঁর সাথে পত্রবিনিময় করত। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করত: আমাদের কাছে এমন এমন ঘটনা এসেছে, এর বিধান কী? তিনি তাদের উত্তর দিতেন যে তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে এবং কোন কর্মপন্থা অনুসরণ করবে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি ছিলেন বিচারকদের সর্বোচ্চ প্রধান এবং তাদের বিচারিক নীতিমালার রচয়িতা, যা থেকে তারা বিচ্যুত হতো না এবং এর কোনো বিরোধিতা করত না। তা সত্ত্বেও, উমর তাঁর কোনো কোনো গভর্নরকে বিচারিক দায়িত্বেও বহাল রেখেছিলেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, তাদের পরিস্থিতি এমন ছিল যা শাসনকার্যের গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিচারিক কাজ সশরীরে আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ করে দিত; কারণ বিচারিক ব্যস্ততা তাদের প্রদেশের অন্যান্য বিষয়ের দেখাশোনা থেকে বিচ্যুত করত না।

আর মদীনায় উমরের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিচারকগণ ছিলেন: আলী বিন আবি তালিব, জায়েদ বিন সাবিত এবং সাইব বিন ইয়াজিদ। উমর তাকে (সাইবকে) ছোটখাটো মামলার ফয়সালার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইমাম তাবারানি বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইয়াজিদকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করার সময় বলেছিলেন: "এক বা দুই দিরহামের মামলাগুলো আমার থেকে ফিরিয়ে দাও।" অর্থাৎ: যে সকল মামলার আর্থিক পরিমাণ সামান্য। তা সত্ত্বেও খলিফা উমর মদীনায় বিচারক নিযুক্ত করা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে নিজেই বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। আবার অন্য সময় তিনি তাঁর মামলাগুলো জায়েদ বা আলীর নিকট প্রেরণ করতেন। কখনও কখনও তিনি কোনো বিষয়ের পর্যালোচনার জন্য তাঁদের দুজনকে নিজের সাথে শরিক করতেন, যে সকল বিষয়ে তিনি মনে করতেন যে এতে পরামর্শদাতার প্রয়োজন রয়েছে।

উমরের বিচার পদ্ধতি এবং তাঁর যুগে বিচারিক সংবিধান:

উমর তাঁর বিচারে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করতেন। যদি তিনি সে দুটিতে ফয়সালার জন্য কিছু না পেতেন, তবে আবু বকরের ফয়সালার দিকে লক্ষ্য করতেন। যদি তাতে কোনো সিদ্ধান্ত পেতেন তবে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। অন্যথায় তিনি এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের বিজ্ঞ ফকিহদের সাথে পরামর্শ করতেন। আর তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন তাঁর দুই বিচারক আলী বিন

আবি তালিব এবং জায়েদ বিন সাবিত। সারাখসির 'আল-মাবসুত' গ্রন্থে এসেছে যে, উমর নিজে ফকিহ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। এমনকি যখন তাঁর কাছে কোনো সমস্যা উত্থাপন করা হতো, তিনি বলতেন: "আমার কাছে আলীকে ডাকো এবং জায়েদকে ডাকো।" তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তারপর তাঁরা যা একমত হতেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। উমরের কাছে কোনো মামলা উত্থাপিত হলে হয়তো তিনি তা নিয়ে এক মাস চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর বিচারকার্যের জন্য একটি নীতিমালা বা সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন যা তাঁরা বিচার ও ফয়সালার ক্ষেত্রে অনুসরণ করতেন। আর এটি হলো সেই রীতি যা তিনি বিচার কার্যে নিজে অনুসরণ করতেন। তবে তিনি মনে করলেন যে, এটি এবং বিচার বিভাগীয় সংগঠন, বিচারের পদ্ধতি, রায় প্রদানের নিয়ম, মামলার শর্তাবলী যা পর্যালোচনার যোগ্য এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়গুলো একটি বিশেষ পত্রে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই পত্রটি বিচার ব্যবস্থায় আইনি কার্যবিধি বা 'ইলমুল মুরাফাত'-এর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি সেই পত্র যা তিনি আবু মুসা আল-আশ'আরী এবং অন্যান্য বিচারকদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আর সেই পত্রের মূল পাঠ হলো:

৮১৫

“পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা বিশ্বাসীদের নেতা উমর-এর পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দা আব্দুল্লাহ বিন কায়েসের প্রতি। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর:

নিশ্চয়ই বিচারকার্য পরিচালনা একটি সুনিশ্চিত ফরয এবং অনুসরণীয় সুন্নাত। সুতরাং যখন আপনার নিকট কোনো বিচার পেশ করা হয়, তখন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করুন। কারণ, কার্যকর করার ক্ষমতা নেই এমন ন্যায়সঙ্গত কথার কোনো সার্থকতা নেই। আপনার মজলিসে, আপনার চেহারার অভিব্যক্তিতে এবং আপনার বিচারে মানুষের মাঝে সমতা বজায় রাখুন; যাতে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি আপনার পক্ষপাতিত্বের লালসা না করে এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি আপনার ন্যায়বিচার থেকে নিরাশ না হয়। সাক্ষ্য বা প্রমাণের ভার দাবিদারের ওপর, আর অস্বীকারকারীর ওপর শপথ। মুসলমানদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি বৈধ, তবে এমন কোনো আপস নয় যা কোনো হারামকে হালাল করে অথবা কোনো হালালকে হারাম করে। যে ব্যক্তি কোনো হকের দাবি করে কিংবা প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে, তার জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিন যা সেখানে গিয়ে শেষ হয়। যদি সে তার প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে, তবে তার হক তাকে দিয়ে দিন; আর যদি সে তা করতে অক্ষম হয়, তবে আপনি তার বিরুদ্ধে মামলাটি নিষ্পত্তি করে দিন। কেননা এটি সংশয় নিরসনের জন্য অধিকতর কার্যকর। আজ আপনি কোনো রায় দিয়ে থাকলে এবং পরবর্তীতে নিজের রায় পুনর্বিবেচনা করে সঠিক পথের দিশা পেয়ে থাকলে, সত্যের দিকে ফিরে আসা থেকে আপনাকে যেন কোনো কিছুই বিরত না রাখে। কারণ সত্য চিরন্তন, কোনো কিছুই একে বাতিল করতে পারে না। আর বাতিলের ওপর অটল থাকার চেয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসা অনেক উত্তম। মুসলমানগণ একে অপরের নিকট ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।”

এটি উমর ইবনুল খাত্তাব-এর চিঠির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, যা বর্তমান সময় পর্যন্ত বিচারব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে গণ্য এবং আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

৪. উসমান (রা.)-এর যুগে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ও বিচারব্যবস্থা:

যখন উসমান ইবনে আফফান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৭ হিজরি সনে তাঁর আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) নেওয়া হয়, তখন তিনি বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর খিলাফতকালে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তার থেকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। উসমান (রা.) মদীনার বিচার বিভাগ থেকে আলী ইবনে আবু তালিব, যায়িদ ইবনে সাবিত এবং সায়িব ইবনে ইয়াযিদকে অব্যাহতি প্রদান করেন। তিনি নিজেই বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ও বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তিনি বিচার বিভাগীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিবাদমান পক্ষসমূহের শুনানি নিজেই গ্রহণ করতেন। তিনি পদচ্যুত সেই বিচারকগণ এবং অন্যান্য সাহাবীদের আলোচনার জন্য ডাকতেন যাতে তিনি যে রায় দেবেন সে বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

যদি তাঁদের রায় তাঁর রায়ের সাথে একমত হতো, তবে তিনি তা কার্যকর করতেন, আর যদি তাঁদের রায় তাঁর রায়ের সাথে না মিলত, তবে তিনি বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতেন।

ষষ্ঠদশ পাঠ

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

পরবর্তী বিষয়াবলি; আর এটিই প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা উসমান প্রদেশসমূহে বিচারব্যবস্থার বিষয়টি গভর্নরদের ওপরই ন্যস্ত করাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন।

৫. আলী (রা.)-এর যুগে বিচারব্যবস্থা:

আলী (রা.)-এর জ্ঞান ও এর প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও, যা তাঁর জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই দুআর বদৌলতে অর্জিত হয়েছিল: "হে আল্লাহ! তাকে বিচারকার্যের ইলম দান করুন", এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণের এই ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও যে, আলী (রা.) তাদের মধ্যে বিচারকার্যে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন; তবুও তাঁর খিলাফতকালে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সে সময়ে উদ্ভূত ফিতনাসমূহের কারণে বিচারব্যবস্থা তাঁর পক্ষ থেকে খুব বেশি যত্ন ও তদারকি পায়নি। আর এই পরিস্থিতিই আলী (রা.)-কে প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার যত্ন নেওয়া এবং বিশেষভাবে বিচারিক বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিমুখ করে রাখার কারণ ছিল। তা সত্ত্বেও, এই কঠিন পরিস্থিতি তাঁকে বিচারিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি নিজেই মানুষের মধ্যে বিচার ও ফয়সালা করার জন্য বসতেন, যেমনটি তিনি যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপরও এই দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন।

আলী (রা.) তাঁর খিলাফত লাভের পর প্রদেশসমূহে যে সকল গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, বিচারক নির্বাচনের বিষয়টি তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি উসমানের (রা.) আমলের অধিকাংশ গভর্নরকে পদচ্যুত করে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। উমর (রা.) যেভাবে করেছিলেন, আলী (রা.)-ও ঠিক সেভাবেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেছিলেন, যদিও তিনি বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা গভর্নরদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি তাদের (বিচারকদের) এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতেন যারা বিচারকার্যের জন্য উপযুক্ত ছিলেন, যাতে গভর্নররা নিজেরা মানুষের বিচারিক বিষয়ে ফয়সালা না করেন এবং মানুষের মধ্যে বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়।

৬. উমাইয়া যুগে বিচারব্যবস্থা:

উমাইয়া খিলাফতের যুগে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা, বিচারব্যবস্থার সংগঠন এবং বিচারক পদে আসীন করার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিদের নির্বাচনের দিক থেকে বিচারব্যবস্থা তার পূর্ববর্তী পর্যায়গুলো, বিশেষ করে উমরের (রা.) যুগের থেকে খুব একটা ভিন্ন ছিল না। এছাড়া বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা রাজনৈতিক ও নির্বাহী ক্ষমতা থেকে পৃথক ছিল এবং বিচারক তাঁর রায়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতেন...

ষোড়শ পাঠ: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
ইজতিহাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পদ্ধতি, যেমনটি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিচারকগণ অনুসরণ করতেন। সেই যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বা নিদর্শনসমূহ আমরা নিম্নোক্তভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি:

ক. বিচারব্যবস্থা রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। কেননা বিচারকগণ তাঁদের রায়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন এবং তাঁরা শাসক গোষ্ঠীর ঝোঁক বা প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। বরং তাঁদের নিরঙ্কুশ ইখতিয়ার ছিল এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত এমনকি গভর্নর ও কর (খরাজ) কর্মকর্তাদের ওপরও কার্যকর হতো।

খ. বিচারক তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী বিচার করতেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমা থেকে নিজেই রায় উদ্ঘাটন করতেন, কিংবা শরীয়তের নিয়ম ও মূলনীতি অনুযায়ী নিজস্ব বিচারিক প্রজ্ঞা (ইজতিহাদ) প্রয়োগ করতেন।

গ. বিচারকদের স্বাধীনতা বজায় থাকা সত্ত্বেও বিচারিক চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন খলিফা। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, খলিফা বিচারিক রায়সমূহ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত বিচারকদের পদচ্যুত করতেন।

ঘ. সেই যুগে বিচারিক রায়সমূহ লিপিবদ্ধকরণ: বিচারকদের জারিকৃত রায়সমূহ লিখে রাখার জন্য রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের তুলনায় সে সময় নানাবিধ সমস্যা ও বিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এমনটি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাদমান পক্ষগুলোর পক্ষ থেকে বিচারকদের রায় অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দিলে নথিপত্র বা রেজিস্টার ব্যবস্থার সূচনা হয়।

৭. আব্বাসীয় আমলের বিচারব্যবস্থা:
আব্বাসীয় আমলের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচারব্যবস্থা রাজনীতির প্রভাবে বিবর্তিত হয়। খলিফারা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচারকদের নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী রায় দিতে বাধ্য করতেন। এই কারণে বিচারকগণ জনগণের নিকট বিচারিক পদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই এই দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করতেন। তারা মূলত বিচারিক রায়ে খলিফাদের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা থেকেই এমনটি করতেন।

ষোড়শ পাঠ

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ (ইসলামী রাষ্ট্রনীতি)

চার মাযহাবের আবির্ভাবের কারণে এই যুগে ইজতিহাদের চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিচারকের (কাযী) জন্য এই মাযহাবগুলোর

কোনো একটি অনুযায়ী তাঁর রায় প্রদান করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে প্রদেশগুলোতে মাযহাবের ভিন্নতা অনুযায়ী বিচারকগণও ভিন্ন ভিন্ন হতেন। ইরাকে প্রচলিত মাযহাব ছিল আবু হানিফা নুমানের মাযহাব। শাম (সিরিয়া), মাগরিব (উত্তর আফ্রিকা) ও আন্দালুসে বিচারকগণ ইমাম মালিকের মাযহাব অনুযায়ী রায় প্রদান করতেন। আর মিশরে ইমাম শাফিঈর মাযহাব অনুযায়ী রায় প্রদান করা হতো। যদি কোনো দেশে প্রচলিত মাযহাবের বাইরে বিবাদীদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিত, তবে বিচারক তাঁর পরিবর্তে এমন কোনো বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করতেন যিনি বিবাদীদের মাযহাবী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। এই চার মাযহাব দীর্ঘকাল যাবত বিচারকার্য ও আইনি বিধিবিধানের উৎস হিসেবে টিকে ছিল। এ কারণে আব্বাসী যুগকে মাযহাবের ইমামদের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চার মাযহাব ছাড়াও অন্যান্য মাযহাবের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা ছিল। তখন বিচারক নিজ মাযহাবের অনুসরণ করতেন; যার মধ্যে ছিল ইয়ামেনে যায়দিয়্যাহ, পারস্য ও ইরাকে ইমামিয়্যাহ ও ইসনা আশারিয়্যাহ এবং অন্যান্য স্থানে সাবইয়্যাহ ইমামিয়্যাহ বা ইসমাইলিয়া। তবে মানুষের মধ্যে তাকলীদ বা অনুকরণ এবং বিচারক বা মুফতির অনুসরণকৃত মাযহাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা মূলত আবুল হাসান আল-আশআরীর আবির্ভাব এবং আহলুস সুন্নাহর মাযহাবে ফিরে আসার চিন্তাধারার সাথেই প্রকাশ পায়। আমাদের এটিও স্মরণে রাখা উচিত যে, এই যুগে আহলুস সুন্নাহর চার মাযহাব—হানাফী, মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী—ছিল আইনের উৎস। এবং সুন্নীগণ ব্যতীত অন্য কেউ বিচারকের পদ লাভ করতেন না। আব্বাসী আমলে বিচারকগণ প্রধান বিচারপতির (কাযীউল কুযাত) প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হতেন, যা বর্তমান সময়ের বিচার মন্ত্রীর পদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থান করতেন। ইমাম আবু হানিফার ছাত্র কাযী আবু ইউসুফ সর্বপ্রথম হারুন রশীদের আমলে এই উপাধিতে ভূষিত হন।

বিচারকের ক্ষমতা এতই বিস্তৃত হয়েছিল যে তিনি দেওয়ানী মামলা, ওয়াকফ এবং অভিভাবক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকি করতেন। প্রায়শই তাঁর সাথে চুক্তিপত্রের শর্তাবলী (আশ-শুরুত), জুলুম নিরসন (আল-মাযালিম), কিসাস (প্রতিশোধ), হিসবাহ (বাজার নিয়ন্ত্রণ), মুদ্রা তৈরির কারখানা (দারুজ জারব) এবং বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এর মতো বিষয়গুলোও যুক্ত করে দেওয়া হতো।

৮১৯

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

ষোড়শ পাঠ

ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল বিচারিক বিষয়ের জন্য একজন মাত্র বিচারক নিযুক্ত থাকতেন। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের বিস্তৃতির সাথে সাথে প্রতিটি প্রদেশে চার মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী বিচারক নিযুক্ত হতে থাকেন। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যকার বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করতেন।

প্রাথমিক যুগে বিচারকের বসার স্থান ছিল মসজিদে। পরবর্তীতে মুসলিমগণ অনুভব করলেন যে, এটি আল্লাহর ঘরের পবিত্রতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়; ফলে খলীফা আল-মুতাদিদ বিচারকদের মসজিদে বসতে নিষেধ করেন। কোনো কোনো সময় বিচারক নিজ গৃহেই জনগণের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। বাগদাদের প্রধান বিচারপতির একটি দপ্তর ছিল যা 'দীওয়ানে কাযীউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতির কার্যালয়) নামে পরিচিত ছিল। এই দপ্তরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন: কাতিব (লেখক), হাজিব (দ্বাররক্ষী), রায় উপস্থাপনকারী, বিচার বিভাগীয় কোষাগার রক্ষক এবং তার সহযোগীগণ।

এ যুগে বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে সাক্ষীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যদি সাক্ষী সততার জন্য পরিচিত হতেন এবং তার চরিত্রে কোনো ত্রুটি জানা না থাকত, তবে বিচারক তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। আর যদি তিনি সততার জন্য পরিচিত না হতেন, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না। আর যদি তিনি অজ্ঞাত হতেন, তবে তার প্রতিবেশীদের নিকট তার সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করা হতো। এর ফলে একদল সাক্ষীর উদ্ভব ঘটে যারা স্থায়ী সাক্ষী বা 'মুআদ্দিলূন' (সংশোধনকারী) অথবা 'মুযাক্কূন' (পবিত্রতা প্রত্যয়নকারী) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৮. আন্দালুসে বিচারিক কর্তৃত্ব ও বিচার ব্যবস্থা:

অন্যান্য ইসলামি ভূখণ্ডের ন্যায় আন্দালুসেও বিচার বিভাগের একটি স্বতন্ত্র ও উচ্চ মর্যাদা ছিল। আমীর বা খলীফা ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান, যেহেতু এই পদটি ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আন্দালুসে প্রধান বিচারপতিকে 'কাযীউল জামাআহ' বলা হতো; কারণ তিনি রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থান করতেন। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল যে, তাকে ফিকহ শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং তার সততা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে জনশ্রুতি থাকতে হবে। বিচারককে বিশুদ্ধ আরব বংশোদ্ভূত হওয়া শর্ত ছিল না; প্রায়শই মাওয়ালী ও বার্বারগণ এই পদে অধিষ্ঠিত হতেন, যেমন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-লাইসী বার্বার বংশোদ্ভূত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি সাধারণত আঞ্চলিক বিচারকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন যারা বিচারকার্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরিচিত ছিলেন, অথবা যারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৮২০

পৃষ্ঠা 71

ষোড়শ পাঠ

শরয়ী রাজনীতি

আন্দালুসে উমাইয়া রাষ্ট্রের রাজধানী কর্ডোভায় প্রধান বিচারপতি বসবাস করতেন। তিনি আমির বা খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে বিচারকগণ তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তারা ইমাম মালিকের মাযহাব অনুযায়ী এবং কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

শাসক ও গভর্নরগণ বিচারকদের বিচারিক রায়সমূহ কার্যকর করতেন। আন্দালুসের উমাইয়ারা তাদের বিচারকদের তাদের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের নীতি অনুসরণ করত। বিচারকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়াকফকৃত সম্পদের তদারকি করা, ফতোয়ার নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কর্ডোভার জামে মসজিদে অথবা খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির কর্তৃক আয-যাহরা শহরে প্রতিষ্ঠিত আয-যাহরা মসজিদে জুমার দিন ও দুই ঈদের নামাজের তদারকি করা। এছাড়া বৃষ্টির প্রার্থনার (ইসতিসকা) নামাজের তদারকি করাও ছিল তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে প্রায়ই বিচারককে 'নামাজের দায়িত্বশীল' বলা হতো। আবদুর রহমান আন-নাসির নামাজের জন্য একজন এবং বিচারের জন্য অন্য একজনকে আলাদাভাবে নিযুক্ত না করা পর্যন্ত বিষয়টি এভাবেই চলতে থাকে। আন্দালুসের বিচারকগণ প্রাচীন স্প্যানিশ ভাষা জানতেন এবং বিচারিক মজলিসে বিবাদমান পক্ষগুলোর সাথে সেই ভাষায় আলোচনা করতেন।

বিচারব্যবস্থার স্তম্ভসমূহ:

বিচারব্যবস্থা পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল, যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

প্রথম স্তম্ভ: হাকিম বা বিচারক। তিনি হলেন সেই বিচারক যাকে কর্তৃপক্ষ বা সরকার মামলা ও বিবাদ মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করেছে। এই দিক থেকে বিচারক (হাকিম) সালিশকারী (মুহাক্কাম) থেকে আলাদা; কেননা সালিশকারী হলেন তিনি যার বিষয়ে বিবাদমান পক্ষদ্বয় তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একমত হয়।

দ্বিতীয় স্তম্ভ: হুকুম বা রায়। এটি হলো বিরোধ নিষ্পত্তি এবং মামলা শেষ করার জন্য বিচারকের পক্ষ থেকে জারিকৃত সিদ্ধান্ত। এর

প্রকৃতি বাধ্যতামূলক, ফলে রায় ও ফতোয়ার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; কেননা ফতোয়া বাধ্যতামূলক নয়।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
ষোড়শ পাঠ

বিচার কার্য দুভাবে হতে পারে: হয় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর কোনো বিষয় বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে যেমন কোনো বিষয় কার্যকর করা বা কোনো কিছু প্রদান করা, আর একে বলা হয় 'বাধ্যতামূলক ফয়সালা'। অথবা বিচারক দাবিকারীকে এ কথা বলার মাধ্যমে বিবাদ রোধ করবেন যে: "প্রমাণ উপস্থাপনে তোমার অক্ষমতার কারণে তোমার প্রতিপক্ষের নিকট তোমার কোনো পাওনা নেই", আর একে বলা হয় 'বিবাদ ত্যাগের ফয়সালা'।

তৃতীয় রুকন: বিচার্য বিষয় (আল-মাহকুম বিহি)। বাধ্যতামূলক ফয়সালায় এটি হলো সেই বিষয় যা আদায়ের জন্য বিচারক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন। আর বিবাদ ত্যাগের ফয়সালায় বিচার্য বিষয় হলো দাবিকারীর বিবাদ বর্জন করা। সারকথা হলো, বিচার্য বিষয় হলো কোনো অধিকার, যা হয় আল্লাহর জন্য অথবা বান্দার জন্য অথবা উভয়ের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক।

চতুর্থ রুকন: যার বিরুদ্ধে বিচার করা হয়েছে (আল-মাহকুম আলাইহি)। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয় অথবা যার নিকট থেকে অধিকার উসুল করা হয়, চাই তিনি বিবাদী হোন বা না হোন।

পঞ্চম রুকন: যার পক্ষে বিচার করা হয়েছে (আল-মাহকুম লাহু)। তিনি হলেন নিজের কোনো অধিকারের দাবিকারী, চাই তা তার নিজস্ব পাওনা হোক যেমন ঋণ বা আর্থিক বাধ্যবাধকতা; অথবা তা একান্তভাবে আল্লাহর হক হোক যেমন শরয়ি দণ্ডবিধি (হুদুদ); অথবা তা উভয় অধিকারের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক হোক। যেখানে আল্লাহর অধিকার প্রবল হয়—হানাফি মাজহাব অনুযায়ী যেমন অপবাদের দণ্ড; অথবা যেখানে বান্দার অধিকার প্রবল হয়—যেমন কিসাসের অধিকার। যদি অধিকারটি কেবল আল্লাহর জন্য হয় অথবা যাতে আল্লাহর অধিকার প্রবল হয়, তবে যার পক্ষে বিচার করা হয়েছে তিনি হলেন স্বয়ং 'শার' (শরিয়ত)। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে মামলা করার শর্ত নেই, বরং বিচারকসহ প্রত্যেকেরই বিষয়টি উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে। একেই 'হিসবাহ মামলা' বলা হয়, যা বর্তমান যুগে 'পাবলিক প্রসিকিউশন' বা রাষ্ট্রীয় প্রসিকিউশন বিভাগ হিসেবে পরিচিত।

মামলা ও এর শর্তাবলী:

অভিধান অনুযায়ী মামলা (আদ-দাওয়াহ) হলো: এমন কথা যার মাধ্যমে মানুষ অন্যের ওপর কোনো অধিকার সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করে, অথবা এর অর্থ হলো প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন: "তাদের জন্য তা-ই রয়েছে যা তারা প্রার্থনা করবে।" [ইয়াসিন: ৫৭]। এর বহুবচন হলো 'দাওয়াবি' ও 'দাওয়াওয়ি'।

শরয়ি পরিভাষায় মামলা হলো: বিচারকের নিকট অন্যের ওপর নিজের কোনো প্রাপ্য অধিকারের সংবাদ প্রদান করা।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ
ষোড়শ পাঠ
মামলার রুকন: এর রুকন হলো কোনো ব্যক্তির এই কথা বলা: "অমুকের নিকট আমার পাওনা আছে", অথবা "অমুকের জিম্মায় আমার এতোটুকু পাওনা আছে", অথবা "আমি অমুকের হক (অধিকার) আদায় করে দিয়েছি", অথবা "সে আমাকে তার হক থেকে অব্যাহতি দিয়েছে" এবং এই জাতীয় কথা।

মামলার শর্তসমূহ:

প্রথম শর্ত: আকল (বিবেক-বুদ্ধি) বা তামীয (বোধশক্তি) সম্পন্ন হওয়া। শর্ত হলো, বাদী ও বিবাদী উভয়কে বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং পাগল ও অবুঝ শিশুর মামলা সহীহ নয়। ঠিক তেমনি তাদের বিরুদ্ধে করা মামলাও সহীহ হবে না। ফলে অন্যের দায়ের করা মামলার উত্তর দিতে তারা বাধ্য নয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও গ্রহণ করা হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: মামলাটি বিচারালয় বা আদালতের মজলিসে হতে হবে; কেননা এই মজলিস ব্যতীত অন্য কোথাও মামলা সহীহ হয় না।

তৃতীয় শর্ত: মামলার শুনানি, সাক্ষ্য গ্রহণ ও বিচারকালে বাদীর দাবিটি বিচারকের সামনে উপস্থিত কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হতে হবে। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা যাবে না; চাই সে সাক্ষ্য প্রদানের সময় অনুপস্থিত থাকুক বা তার পরে, এবং চাই সে বিচারকের মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকুক বা বিচারক যে শহরে অবস্থান করছেন সেই শহর থেকে। অন্যান্য মাযহাবে এই শর্তটি নেই।

চতুর্থ শর্ত: দাবিকৃত বিষয়টি (মুদ্দাআ বিহি) সুনির্ধারিত হওয়া। এটি নির্ধারণের পদ্ধতি হলো—যদি বস্তুটি অস্থাবর হয় তবে বিচারকের সামনে তার দিকে ইশারা করা, অথবা জমি, বাড়ি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতো সীমা নির্ধারণযোগ্য হলে তার সীমানা বর্ণনা করা, অথবা বিচারক বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে সরজমিনে তদন্ত করা যদি দাবিকৃত বিষয়টি (সীমানা দ্বারা) নির্ধারণযোগ্য না হয় যেমন জাঁতা; অথবা যদি দাবিকৃত বিষয়টি মুদ্রা, গম, যব বা এই জাতীয় কোনো ঋণ হয় তবে তার শ্রেণী, প্রকার, পরিমাণ ও গুণাগুণ বর্ণনা করা। কারণ এই বিষয়গুলো বর্ণনা করা ছাড়া ঋণ সুনির্ধারিত হয় না। দাবিকৃত বিষয়টি সুনির্ধারিত হওয়ার শর্তারোপের কারণ হলো—দাবিকৃত বিষয়টি না জানা পর্যন্ত বিবাদী বাদীর দাবির উত্তর দিতে বাধ্য নয়। অনুরূপভাবে সাক্ষীরাও অজ্ঞাত কোনো বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দিতে পারে না। তদুপরি বিচারকও মামলার কোনো রায় বা ফয়সালা দিতে সক্ষম হন না যতক্ষণ না দাবিকৃত বিষয়টি সুনির্ধারিত হয়।

পঞ্চম শর্ত: মামলার বিষয়বস্তু এমন একটি বিষয় হওয়া যা দ্বারা বিবাদীকে দায়বদ্ধ করা সম্ভব। অর্থাৎ দাবিটি আমাদের বর্তমান পরিভাষায় শরয়িভাবে বাধ্যতামূলক হওয়া। যদি বিবাদীকে কোনো কিছুর মাধ্যমে দায়বদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তবে মামলা গ্রহণ করা

হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি বিচারকের নিকট দাবি করল যে, সে কোনো একটি বিষয়ে এই বিবাদীর উকিল; অথবা কারো নিকট সদকা দাবি করল; কিংবা কোনো বাতিল চুক্তির বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের দাবি জানাল। এমতাবস্থায় বিবাদী যদি তা অস্বীকার করে তবে বিচারক তার এই দাবি শুনবেন না। কারণ ওকালতি একটি অ-আবশ্যিক (গাইর লাযিম) চুক্তি, ফলে সে তৎক্ষণাৎ ওকালতির দাবিদারকে বরখাস্ত করতে পারে।

ষষ্ঠ শর্ত: দাবিকৃত বিষয়টি এমন হতে হবে যা সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কারণ বাস্তবে বা অভ্যাসগতভাবে যা অসম্ভব এমন বিষয়ের দাবি একটি মিথ্যা দাবি হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার চেয়ে বয়সে বড় কারো সম্পর্কে বলে যে: 'এ আমার ছেলে', তবে তার এই দাবি শোনা হবে না; কারণ বয়সে ছোট ব্যক্তির সন্তান বড় হওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ যদি কেউ এমন কারো ব্যাপারে বলে যার বংশপরিচয় অন্যের নিকট সুপরিচিত: 'এ আমার ছেলে', তবে তার এই দাবি শোনা হবে না।

মামলা, এর বৈপরীত্য এবং প্রমাণের মাধ্যমসমূহ

বিচারিক মামলার প্রকারভেদ:

মামলা দুই প্রকার: সঠিক (সহিহ) এবং ত্রুটিপূর্ণ (ফাসিদ)।

সঠিক মামলা হলো সেটি যা সঠিক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ করেছে এবং যার সাথে এর উদ্দিষ্ট বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট হয়। আর তা হলো: বিচারকের সহকারীদের মাধ্যমে বিবাদীকে আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত করা, বাদীর দাবির উত্তর দেওয়ার জন্য তাকে তলব করা এবং দাবিকৃত বিষয়টি অস্বীকার করলে শপথ করানো। এমতাবস্থায় বাদীর অধিকার হয় সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে অথবা বিবাদীর শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

আর ত্রুটিপূর্ণ বা বাতিল মামলা হলো সেটি যাতে সঠিক হওয়ার কোনো শর্ত বিদ্যমান নেই। এর ওপর পূর্বোক্ত উদ্দিষ্ট বিধানসমূহ কার্যকর হয় না; যেমন মামলাটি এমন হওয়া যে...

অনুপস্থিত, অথবা যদি দাবিকৃত বস্তু অজ্ঞাত হয়; কারণ সাক্ষ্যের মাধ্যমে অজ্ঞাত বিষয় প্রমাণ করা অসম্ভব। ফলে সাক্ষীরা সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে না এবং বিচারকও প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) কিংবা শপথ বর্জন (নুকুল) কোনোটির মাধ্যমেই অজ্ঞাত বিষয়ে ফয়সালা করতে সক্ষম হন না।

বাদী ও বিবাদী কে?

যেহেতু মামলার বিষয়সমূহ বাদী ও বিবাদীকে চেনার ওপর নির্ভরশীল এবং এটি মামলা দায়েরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি—বিশেষ করে কার ওপর সাক্ষ্য-প্রমাণ বা শপথ ইত্যাদি প্রদানের বাধ্যবাধকতা বর্তাবে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে—তাই বাদী হিসেবে গুণান্বিত ব্যক্তি এবং বিবাদী হিসেবে গুণান্বিত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট করা অপরিহার্য।

তাদের পরিচয় নির্ধারণে বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে, তন্মধ্যে: বাদী হলেন সেই ব্যক্তি যাকে মামলা ত্যাগ করলে মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় না; কারণ তিনি হলেন তলবকারী। অথবা তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যার বক্তব্য প্রকাশ্য অবস্থার পরিপন্থী। আর বিবাদী হলেন সেই ব্যক্তি যাকে মামলা লড়তে বাধ্য করা হয়; কারণ তার কাছে দাবি করা হয়েছে। অথবা তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যার

বক্তব্য প্রকাশ্য অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ, আর প্রকাশ্য মূল অবস্থা হলো দায়মুক্ত থাকা।

বলা হয়েছে: বাদী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যের হাত থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতে চান অথবা অন্যের জিম্মায় কোনো অধিকার সাব্যস্ত করতে চান। আর বিবাদী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তা অস্বীকার করেন। আবার বলা হয়েছে: বিবাদী হলেন অস্বীকারকারী এবং অন্যজন হলেন বাদী।

মামলার বিধান:

অথবা মামলা দায়েরের পর বিবাদীর ওপর যা আবশ্যক হয়: মামলায় বিচারকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং বাদী যখন তার প্রতিপক্ষকে নিয়ে আদালতে আসেন, তখন বিচারক তাকে মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। যদি মামলাটি সঠিক হয়—অর্থাৎ উপস্থিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হয় এবং মামলার শর্তাবলি পূর্ণ করে—তবে তিনি তলব করেন...

ষোড়শ পাঠ

বিচারক বিবাদীর নিকট থেকে মামলার জবাব তলব করবেন; কারণ বিবাদের মূলোৎপাটন করা একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য। সুতরাং মামলার বিধান হলো—বিবাদীর ওপর 'না' অথবা 'হ্যাঁ' বলে জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এমনকি সে যদি নীরব থাকে, তবে তার নীরবতাকেও অস্বীকার বলে গণ্য করা হবে। এমতাবস্থায় বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হবে। যদি বিবাদী মামলার বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, তবে বিচারক তার বিরুদ্ধে রায় দেবেন; কারণ নিজের বিরুদ্ধে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সে অভিযুক্ত নয়। এমতাবস্থায় তাকে হকদারের পাওনা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে বিচারক বাদীর নিকট তার দাবি প্রমাণের জন্য সাক্ষী বা প্রমাণ তলব করবেন। যদি বাদী প্রমাণ উপস্থাপন করে, তবে বিচারক সে অনুযায়ী রায় দেবেন; কারণ প্রমাণের মাধ্যমে মিথ্যার চেয়ে সত্যের দিকটি প্রবল হয়। আর যদি বাদী প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয় এবং তার প্রতিপক্ষ বিবাদীর শপথ দাবি করে, তবে বিচারক তাকে শপথ করাবেন। এর দলিল হলো হাযরামী ও কিন্দি ব্যক্তির ঘটনায় বাদীর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে? সে বলল: না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তবে তোমার জন্য তার (বিবাদীর) শপথ রয়েছে।" অর্থাৎ বিবাদীর শপথ। যদি বাদী বলে: শহরেই আমার সাক্ষী উপস্থিত আছে, তবুও সে বিবাদীর শপথ দাবি করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তাকে শপথ করানো হবে না; কারণ বাদীর শপথ দাবি করার অধিকারটি প্রমাণ উপস্থাপনে অক্ষম হওয়ার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: তাকে শপথ করানো হবে; কারণ শপথ দাবি করা বাদীর অধিকার। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারীর ওপর হলো শপথ।"

অধিকার প্রমাণের পদ্ধতিসমূহ:

বিচারকার্যে যেসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হয় সেগুলো হলো: সাক্ষ্য প্রদান, শপথ, শপথ করতে অস্বীকৃতি জানানো, স্বীকৃতি অথবা শপথের সাথে সাক্ষ্য প্রদান, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক আলামত।

সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি হলো—এটি বাদীর সপক্ষে একটি দলিল; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রমাণ উপস্থাপন বাদীর দায়িত্ব।" এছাড়া বাদী যেহেতু একটি অপ্রকাশ্য বিষয়ের দাবি করছে, তাই সেটি প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে;

আর সাক্ষ্য বা প্রমাণের মাঝে সত্য প্রকাশের শক্তি থাকে। বাদীকে প্রমাণ বা সাক্ষ্য উপস্থাপনের দায়িত্ব দেওয়ার কারণ হলো তার দিকটি দুর্বল; কারণ তার দাবিটি মৌলিক অবস্থার বিপরীত, তাই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়...

সুদৃঢ় দলিল তথা 'বায়্যিনাহ'; কারণ বিবাদীর পক্ষটি শক্তিশালী; যেহেতু সে মূলনীতির (নির্দোষিতার) সাথে সংশ্লিষ্ট, আর তা হলো দায়মুক্তি; ফলে তার পক্ষ থেকে একটি দুর্বল দলিলের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে, আর তা হলো শপথ।

আর 'বায়্যিনাহ' বা প্রমাণ হলো: হয় দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য, অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য, অথবা একজন সাক্ষী ও একটি শপথ, অথবা চারজন পুরুষ, অথবা চারজন নারী।

আর শপথের বিষয়টি হলো: এটি বিবাদীর জন্য একটি প্রমাণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর কারণে: "আর শপথ বিবাদীর ওপর বর্তায়।" যদি বিবাদী শপথ করে, তবে বিচারক মামলার নিষ্পত্তি করে রায় প্রদান করেন এবং বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যকার বিবাদ সমাপ্ত হয়, যতক্ষণ না বাদী প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হয়। আর যদি সে (বিবাদী) শপথ থেকে বিরত থাকে, অর্থাৎ যদি বিবাদী শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কি শপথটি বাদীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সে শপথ করবে? নাকি বিবাদীর শুধুমাত্র শপথ থেকে বিরত থাকার কারণেই তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে? এ বিষয়ে ফকীহগণের দুটি অভিমত রয়েছে; যদি বিবাদী শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর কি শপথ করা প্রয়োজন? নাকি তার শপথ থেকে বিরত থাকার কারণেই বাদীর পক্ষে ফয়সালা হয়ে যাবে? এ বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন:

মালিকীগণ বলেছেন: কেবল আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শপথ থেকে বিরত থাকার পর তা বাদীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং যা পরিণতি লাভ করে। আর শাফেয়ীগণ বলেছেন: রক্তপাত ও হুদূদ (নির্ধারিত দণ্ড) ব্যতীত সকল হকের ক্ষেত্রে শপথ বাদীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বাদী যা দাবি করেছে সে অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া হবে; শুধুমাত্র বিবাদীর শপথ থেকে বিরত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে না। আর ইমাম আহমাদ যে মতটিকে সঠিক বলেছেন তা হলো, শপথ থেকে বিরত থাকাকে স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা হবে।

এর ভিত্তিতে: ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদের একটি অভিমত হলো, শপথ বাদীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। তবে হাম্বলী মাযহাবের নিকট মনোনীত মত হলো শপথ ফিরিয়ে না দেওয়া।

জমহুর উলামায়ে কেরাম যারা বিবাদীর শপথ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বাদীর ওপর শপথ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রবক্তা, তারা ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদীর ওপর শপথ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া বিবাদী যখন শপথ করতে অস্বীকার করে, তখন বাদীর সত্যতা প্রকাশ পায় এবং তার পক্ষটি শক্তিশালী হয়। ফলে তার হকের ক্ষেত্রে শপথ করা শরয়িভাবে বিধিবদ্ধ হয়, যেমনটি বিবাদীর শপথের পূর্বে তার জন্য ছিল এবং যেমনটি হয় যখন বাদীর পক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী থাকে। আর মহান আল্লাহ বলেন: "অথবা তারা ভয় পাবে যে, তাদের শপথের পর পুনরায় শপথ নেওয়া হবে" [সূরা আল-মায়িদাহ: ১০৮], অর্থাৎ: এর পরে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ (ইসলামী শাসননীতি)
ষোড়শ পাঠ

আবশ্যক (ওয়াজিব) শপথ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা; এটি নির্দেশ করে যে শপথ এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে স্থানান্তরিত হয়। জমহূর (অধিকাংশ) ফকীহগণের মতে, শুধুমাত্র 'নুকুল' (শপথ করতে অস্বীকার করা)-এর কারণে কোনো রায় প্রদান করা হবে না। কারণ নুকুল যেমন মিথ্যা শপথ পরিহারের জন্য হতে পারে, তেমনি সত্য শপথ করার ক্ষেত্রেও তাকওয়া বা পরহেজগারির কারণে হতে পারে। সুতরাং বিবাদীর (যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে) দ্বিধার কারণে বাদীর (দাবিদার) অনুকূলে রায় দেওয়া হবে না। কেননা বিবাদীর শপথ অস্বীকার করার মাধ্যমে বাদীর সত্যতা অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয় না। অতএব, প্রমাণ ছাড়া বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করা বৈধ নয়। তবে বাদী যদি শপথ করে, তবে তার শপথটি অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণের অনুপস্থিতিতে একটি দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী: বাদীর নিকট শপথ ফেরত দেওয়া হবে না। বরং শুধুমাত্র শপথ অস্বীকার বা 'নুকুল'-এর কারণেই বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে যে বিষয়ে দাবি করা হয়েছে, তা পালন করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

'নুকুল' বা শপথ অস্বীকার করা প্রকৃতভাবে হতে পারে, যেমন বিবাদীর এ কথা বলা: "আমি শপথ করব না"; অথবা আইনগতভাবে বা পরোক্ষভাবে হতে পারে, যেমন চুপ থাকা। বিবাদীকে একবারই শপথের প্রস্তাব দেওয়া হবে, তবে অধিক সতর্কতা অবলম্বন এবং ওজর পেশের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিচারকের উচিত তাকে তিনবার শপথের প্রস্তাব দেওয়া। এভাবে বলা যে: "আমি তোমাকে তিনবার শপথের প্রস্তাব দিচ্ছি; যদি তুমি শপথ করো (তবে তো হলোই), অন্যথায় তোমার প্রতিপক্ষ তোমার বিরুদ্ধে যা দাবি করেছে আমি সেই অনুযায়ী তোমার বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান করব।" তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন: "প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব, আর শপথ করা তার দায়িত্ব যে অস্বীকার করে।" এখানে অস্বীকারকারীদের ক্ষেত্রে শপথের বিধান রাখা হয়েছে, যেমন বাদীদের ক্ষেত্রে প্রমাণের বিধান রাখা হয়েছে।

হানাফীগণ আরও দলিল পেশ করেন যে, নুকুল বা শপথ অস্বীকার করা বিবাদীর পক্ষ থেকে দাবিকৃত বিষয়ের একটি মৌন স্বীকৃতি স্বরূপ। নতুবা সে নিজের উপর থেকে মামলার ক্ষতি এড়াতে এবং ওয়াজিব পালনার্থে অবশ্যই শপথ গ্রহণ করত; কারণ শপথ করা তার উপর ওয়াজিব ছিল। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আর শপথ করা তার উপর যে অস্বীকার করে।" এখানে 'আলা' (উপরে/জন্য) শব্দটি দ্বারা আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়া বুঝানো হয়েছে।

বিচারকের উচিত বিবাদীকে বলা: "আমি তোমার নিকট তিনবার শপথের প্রস্তাব দিচ্ছি; হয় তুমি শপথ করবে, নতুবা বাদী তোমার বিরুদ্ধে যা দাবি করেছে আমি সেই অনুযায়ী রায় দেব।" যদি তিনবার প্রস্তাব করার পরেও সে শপথ থেকে বিরত থাকে, তবে বিচারক শুধুমাত্র তার 'নুকুল' বা অস্বীকারের কারণে তার বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান করবেন।

শপথের পদ্ধতি এবং মামলায় এর প্রভাব:

শপথের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, চাই তা প্রত্যাখ্যাত শপথ (ইয়ামিন মারদুদা) হোক, সাক্ষীর সাথে হোক কিংবা বিবাদীর পক্ষ থেকে হোক। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, শপথ কেবল মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।” এবং তাঁর অন্য বাণীর কারণে: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরি করল।”

তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, অধিকার বা পাওনা সংক্রান্ত বিষয়ে যে শপথের মাধ্যমে দেনাদার দায়মুক্ত হয়, তা হলো আল্লাহর নামে শপথ।

শাফেয়ীগণ বলেন: সম্পদ নয় এবং যা দ্বারা সম্পদও উদ্দেশ্য নয় এমন বিষয়ে—যেমন বিবাহ, তালাক, লিআন (পারস্পরিক অভিশাপ), কিসাস (প্রতিশোধ), অছিয়ত ও ওকালত এবং জাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদের ক্ষেত্রে—শপথকে কঠোর বা জোরদার করা মুস্তাহাব, যদিও প্রতিপক্ষ তা দাবি না করে। তবে এর চেয়ে কম সম্পদের ক্ষেত্রে তা করা হবে না। আর শপথকে জোরদার করার পদ্ধতি হলো মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বৃদ্ধি করা। যেমন এভাবে বলা: “সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের পরিজ্ঞাতা, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবগত।” অথবা “সেই আল্লাহর কসম যিনি অন্বেষণকারী, বিজয়ী, সবকিছুর নাগালদানকারী, ধ্বংসকারী, যিনি অতি গোপন রহস্য সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত।”

হাম্বলীগণ বলেন: যে শপথের মাধ্যমে ঋণ বা দাবি থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় তা হলো আল্লাহর নামে শপথ, এমনকি শপথকারী যদি কাফিরও হয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন: “অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চেয়ে অধিকতর সত্য।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ১০৭] এবং মহান আল্লাহর বাণী: “তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে।” [সূরা আন-নূর: ৫৩]

কতিপয় মুফাসসির বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ করল, সে তার শপথকে যথাসাধ্য জোরদার করল।

হানাফীগণ বলেন: বিচারকের জন্য অবকাশ রয়েছে যে তিনি কোনো প্রকার কঠোরতা বা গুণাবলি যোগ করা ছাড়াই মুসলিমকে শপথ করাবেন, যেমন: আল্লাহর নামে বা আল্লাহর কসম। আবার তাঁর জন্য শপথকে জোরদার করারও অধিকার রয়েছে আল্লাহর গুণাবলি উল্লেখ করার মাধ্যমে। যেমন বিচারক বলবেন: বলুন, আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের পরিজ্ঞাতা, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু, যিনি গোপন বিষয় সম্পর্কে...

প্রকাশ্যভাবে যা জানা যায় তা হলো—অমুকের আমার ওপর কোনো পাওনা নেই, কিংবা সে যে সম্পদের দাবি করেছে তা আমার কাছে নেই, যা এই এই পরিমাণের; এবং এর কোনো অংশই তার প্রাপ্য নয়। শপথকারী চাইলে এই শব্দমালার সাথে আরও কিছু

যোগ করতে পারে অথবা এখান থেকে কিছু কমিয়ে বলতে পারে।

শপথ হতে হবে কোনো বিষয় সুনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করার ওপর অথবা না জানার ওপর। চার মাযহাবের ইমামগণের ঐকমত্য অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি তার নিজের কাজের ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে (দৃঢ়তার সাথে) শপথ করবে, চাই তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক; কারণ সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হওয়ার অবস্থায় সে বলবে: "আল্লাহর কসম, আমি এত দামে বিক্রি করেছি" অথবা "আমি এত দামে ক্রয় করেছি"। আর নেতিবাচক হওয়ার অবস্থায় বলবে: "আল্লাহর কসম, আমি এত দামে বিক্রি করিনি" এবং "আমি এত দামে ক্রয় করিনি"।।

একইভাবে, অন্যের কাজের ওপরও কোনো ব্যক্তি সুনিশ্চিতভাবে শপথ করবে যদি বিষয়টি ইতিবাচক হয়, যেমন—বিক্রি করা, নষ্ট করা বা জবরদখল করা। কারণ বাস্তব অবস্থা জানা এবং সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া সহজ। আর যদি বিষয়টি নেতিবাচক হয়, তবে সে নিজের 'না জানা'র ওপর শপথ করবে; অর্থাৎ সে জানে না যে বিষয়টি তেমন ছিল। কারণ অন্যের কাজ সম্পর্কে তার পূর্ণ জ্ঞান নেই। তখন সে বলবে: "আল্লাহর কসম, আমি জানি না যে সে এমনটি করেছে"।

শপথের ক্ষেত্রে বিচারকের (যিনি শপথ করাচ্ছেন) নিয়ত বা উদ্দেশ্যই ধর্তব্য হবে। লক্ষ্যণীয় যে, শপথের ক্ষেত্রে নিয়ত হবে সেই বিচারকের নিয়ত অনুযায়ী যিনি বিবাদমান পক্ষকে শপথ করাচ্ছেন। অর্থাৎ, যিনি প্রতিপক্ষকে শপথ পাঠ করাচ্ছেন। এর কারণ হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী: "শপথ হলো শপথ গ্রহণকারীর (যিনি শপথ করাচ্ছেন) নিয়ত অনুযায়ী।" এই হাদিসটিকে বিচারকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, কারণ শপথ করানোর বৈধ কর্তৃত্ব তারই। যদি শপথকারীর নিয়ত অনুযায়ী ধরা হতো, তবে শপথের উপকারিতা নষ্ট হয়ে যেত এবং মানুষের অধিকারগুলোও বিলুপ্ত হতো; কেননা তখন প্রত্যেকেই তার নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শপথ করত। বিচারক যখন শপথ করান, তখন শপথকারী যদি তার শপথে শব্দের বাহ্যিক অর্থের আড়ালে ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য করে (তাওরিয়া), অথবা অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়—অর্থাৎ বিচারকের নিয়তের বিপরীত কিছু মনে করে, কিংবা শপথকারী যদি তার শপথের পরপরই কোনো ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) যোগ করে যেমন—"ইনশাআল্লাহ" বলা, অথবা শব্দের সাথে এমন কোনো শর্ত জুড়ে দেয় যা বিচারক শুনতে পাননি (যেমন: "যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি"), তবে এই বিষয়গুলো তাকে "পাপিষ্ঠ শপথ" (মিথ্যা শপথ) থেকে রক্ষা করবে না। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো বা এই ব্যাখ্যাগুলো তার কোনো উপকারে আসবে না। কারণ আমরা যদি তেমনটা করি, তবে শপথের যে মূল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ শপথ করতে গিয়ে অন্তরে ভীতি সঞ্চার হওয়া—তা নষ্ট হয়ে যাবে।

আদ-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
ষোড়শ পাঠ

মামলায় শপথের প্রভাব প্রসঙ্গে: এর ফলে বিবাদ ও ঝগড়া সমাপ্ত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে হকের দাবি রহিত হয়, তবে তা চিরস্থায়ীভাবে নয়। বরং এটি কেবল প্রমাণ উপস্থাপনের সময় পর্যন্ত সাময়িকভাবে কার্যকর থাকে। তাই জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ফকীহগণের নিকট শপথ বিবাদীর দায়মুক্তি নিশ্চিত করে না।

দুইটি প্রমাণের বিরোধের সাথে সাথে দুইটি মামলার বিরোধ:

এ কারণে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, মালিকানার ক্ষেত্রে দুইটি সাক্ষ্য-প্রমাণের বিরোধের পাশাপাশি যখন দুইটি মামলার বিরোধ দেখা দেয়, তখন তিনটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। যথা: দখলহীন ব্যক্তি ও দখলদারের মধ্যে মামলার বিরোধ। এর অর্থ হলো, বিবাদ এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে হওয়া যেখানে একজন দাবিকৃত বস্তুর ওপর স্বীয় হাত রেখেছে (দখলে রেখেছে), আর অন্যজন তার ওপর হাত রাখেনি (দখলে রাখেনি)। যার দখলে বস্তুটি নেই তাকে আমরা ‘বহিরাগত’ বা ‘দখলহীন’ বলি। দখলহীন ব্যক্তি ও দখলদারের মধ্যে মামলার বিরোধ হওয়া একটি সম্ভাবনা।

অনুরূপভাবে, দুইজন দখলহীন ব্যক্তির মধ্যে মামলার বিরোধ। এর অর্থ হলো, দাবিকৃত বস্তুটি তৃতীয় কোনো পক্ষের হাতে রয়েছে, আর বিবাদী পক্ষদ্বয় তাদের হাত বা দখল সেই বস্তুর ওপর রাখেনি। এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকেই এমন মামলা নিয়ে আসে যা অপরের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। এটি দ্বিতীয় সম্ভাবনা।

তৃতীয় সম্ভাবনা হলো দুই জন দখলদারের মধ্যে মামলার বিরোধ। অর্থাৎ, বস্তুটি দুই ব্যক্তির হাতেই একত্রে রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেই দাবি করছে যে, বস্তুটি তার সাথীকে ছাড়াই এককভাবে তারই মালিকানাধীন।

আমরা এই তিনটি সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব:

প্রথম: দখলহীন ব্যক্তি ও দখলদারের মধ্যে মামলার বিরোধ:

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বস্তুর ওপর হাত রেখেছে এবং যে ব্যক্তি কোনো কিছুর ওপর হাত রাখেনি, তাদের দুইজনের মামলার বিরোধ। এই অবস্থায় ফকীহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

ষষ্ঠদশ পাঠ

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব নিম্নোক্ত বিস্তারিত বর্ণনার দিকে গিয়েছে:

১. যদি দাবিটি এমন কোনো বহিরাগত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয় যার দখলে সম্পদটি নেই এবং তা কোনো তারিখ উল্লেখ ছাড়াই করা হয়, তবে এই অবস্থায় দাবিদারের প্রমাণ গ্রহণ করাই অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য; একে 'বাইয়িনাতুল খারেজ' (বহিরাগত প্রমাণ) বলা হয়। কারণ নবী (সা.)-এর বাণী: "প্রমাণ পেশ করা দাবিদারের দায়িত্ব এবং শপথ করা বিবাদীর দায়িত্ব।" তিনি প্রমাণের বিষয়টি দাবিদারের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তাই দখলদারের (যার দখলে সম্পদটি আছে) প্রমাণের কারণে তা অগ্রাহ্য হবে না; কারণ দখলদার কোনো দাবি পেশ করছে না যার ফলে তার প্রমাণের প্রয়োজন হবে। এর দলিল হলো এই যে, দখলদারের গুণের সাথে দাবির সামঞ্জস্য না থাকার কারণে সে দাবিদার নয়; কেননা দাবিদার এমন ব্যক্তি যে তার নিজের আয়ত্তে নেই বরং অন্যের হাতে আছে এমন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়, আর এই গুণের অধিকারী ব্যক্তি হলো বহিরাগত (খারেজ), দখলদার নয়। কারণ দখলদার তার নিজের হাতে থাকা বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়, ফলে সে দাবিদার নয় বরং তার বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে। সুতরাং দখলদারের প্রমাণ তার জন্য দলিল হবে না, বরং তার প্রমাণ অনর্থক বলে গণ্য হবে এবং তা ধর্তব্য হবে না। এছাড়াও যেহেতু দাবিদারের প্রমাণ অধিক ফলপ্রসূ, তাই একে অগ্রাধিকার দেওয়া ওয়াজিব, যেমন জরাহ (দোষারোপ) এর প্রমাণকে তাদীল (সংশোধন) এর প্রমাণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আরও অনেক দলিল রয়েছে যে, দাবিদারের প্রমাণ এমন কিছু সাব্যস্ত করে যা বিদ্যমান ছিল না, আর অস্বীকারকারীর (দখলদার) প্রমাণ কেবল একটি প্রকাশ্য বিষয়কে সাব্যস্ত করে যা দখল দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তার প্রমাণ কোনো অতিরিক্ত ফায়দা দেয় না; অর্থাৎ তার প্রমাণ দখলের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বুঝায় না যা ইতোমধ্যে বিদ্যমান।

২. যদি উভয় প্রমাণই তারিখযুক্ত হয় এবং তাদের তারিখ একই হয়, তবে এই অবস্থায় বহিরাগত দাবিদারের পক্ষেই ফয়সালা করা হবে। অর্থাৎ অ-দখলদারের পক্ষে; কারণ তাদের কারো মালিকানার সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, যেহেতু তারিখদ্বয়ের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেওয়ায় তা বাতিল হয়ে গেছে। ফলে বিষয়টি প্রথম সুরতের ন্যায় সাধারণ মালিকানার দাবির মতোই বহাল থাকবে।

৩. যদি একটির তারিখ অপরটির চেয়ে অগ্রবর্তী হয়; অর্থাৎ যদি কোনো একটি দাবির তারিখ অন্যটির তুলনায় পূর্বের হয়, তবে এই অবস্থায় যার তারিখ অগ্রবর্তী তার পক্ষেই ফয়সালা করা হবে, সে যেই হোক না কেন। এটি ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং

মুহাম্মাদ (র.)-এর অভিমত; কারণ অগ্রবর্তী তারিখের প্রমাণটি এমন এক সময়ে মালিকানাকে প্রকাশ করেছে যখন কেউ তার সাথে বিরোধ করেনি। ফলে বিবাদের বিষয়ে তার হক সাব্যস্ত হবে, যদি না অপর পক্ষ মালিকানা হস্তান্তরের কোনো কারণ সাব্যস্ত করতে পারে।

---

৪. যদি তাদের একজন তার দাবির তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন তারিখ উল্লেখ না করে, তবে এই অবস্থায় অ-দখলদার বা الخارج (আল-খারিজি)-এর অনুকূলে রায় প্রদান করা হবে। অর্থাৎ: ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে তা দখলদারের অনুকূলে হবে না। কারণ, তারিখবিহীন নিরঙ্কুশ মালিকানা বিলম্ব ও অগ্রবর্তিতা—উভয় সম্ভাবনা রাখে। যদি তারিখযুক্ত প্রমাণের অধিকারী ব্যক্তির প্রমাণের সময়টি অগ্রবর্তী হতো, তবে দখলদারের অগ্রবর্তী মালিকানা লাভের সম্ভাবনাটি বাতিল হয়ে যেত। আর যখন কোনো বিষয়ে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন তার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সময়ের বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং নিরঙ্কুশ মালিকানার দাবিটি অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং অ-দখলদারের অনুকূলে ফয়সালা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন: তারিখযুক্ত প্রমাণের অধিকারীর অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। কারণ, তারিখযুক্ত প্রমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার মালিকানা প্রকাশ করে, যা নিরঙ্কুশ মালিকানা দাবিকারীর প্রমাণের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং নিরঙ্কুশ প্রমাণের ক্ষেত্রে বিরোধ থাকা বা না থাকার উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান, আর বিরোধ কখনও সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং তারিখযুক্ত প্রমাণের বিষয়টি বিরোধমুক্ত থেকে গেল, ফলে তার অনুকূলে রায় দেওয়া হবে। এটিই হানাফি ও হাম্বলিদের বিস্তারিত অভিমত।

মালিকি ও শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত হলো যে, এই একাধিক সুরতে দখলদারের (সাহিবুল ইয়াদ) প্রমাণকে প্রাধান্য দেওয়া হবে—অর্থাৎ দখলদার, যাকে ‘অভ্যন্তরীণ প্রমাণ’ (বাইয়িনাতুদ দাখিল) বলা হয়। তারা বলেছেন: কোনো শর্ত ছাড়াই তার প্রমাণকে অগ্রগণ্য করা হবে; চাই এই দাবিটি তারিখযুক্ত হোক বা তারিখবিহীন হোক, এবং তাদের একজনের দাবি অন্যজনের দাবির চেয়ে অগ্রবর্তী হোক বা না হোক। তারা বলেন: দখলদারের প্রমাণকে নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কারণ, প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান হয়েছে, ফলে উভয় প্রমাণ পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় দখলদারের প্রমাণটি তার দখলে থাকার কারণে অগ্রাধিকার পাবে; যেমন কিয়াসের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী হাদিসের একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং দখলদারের অনুকূলে বস্তুটির রায় দেওয়া হবে। তাছাড়া দখলদারের প্রমাণের মধ্যে একটি অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে, আর তা হলো দাবিকৃত বস্তুটি তার হাতে বিদ্যমান থাকা। আর দখলদারের দিকটি অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো ‘ইস্তিস্হাব’ বা মূল অবস্থার ওপর নির্ভর করা। কেননা মূল নীতি হলো যা যেমন ছিল তা সেভাবেই অবশিষ্ট থাকা। আর দখলদারের অনুকূলে রায় দেওয়াটি অগ্রগণ্য। সুতরাং যখন দুটি প্রমাণ পরস্পর সাংঘর্ষিক হবে, তখন দাবি কার্যকর করা অথবা দখলদারের অধীনে যা আছে তা বহাল রাখা ওয়াজিব হবে। আর কোনো বিবাদমান পক্ষেরই কোনো প্রমাণ না থাকলে যার দখলে আছে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এটি এই বিষয়টিকে সমর্থন করে যে...

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস: নবী (সা.)-এর নিকট দুইজন লোক একটি পশু বা উট নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। তাদের প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করল যে সেটি তার। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) যার হাতে (দখলে) বস্তুটি ছিল, তার পক্ষেই ফয়সালা প্রদান করেন।

দ্বিতীয়: সাধারণ মালিকানার ক্ষেত্রে দখলদার ব্যতীত অন্য দুই দাবিদারের দাবির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অবস্থা:

অর্থাৎ: কোনো জিনিস একজনের দখলে আছে, এমতাবস্থায় অন্য দুইজন ব্যক্তি এসে এর মালিকানা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, অথচ সেই জিনিসের ওপর তাদের কারো দখল নেই। এটিই হলো দখলদার ব্যতীত বাইরের দুই দাবিদারের দাবির মধ্যে সাধারণ মালিকানার বিরোধ। আমরা বলি: যখন দুইজন ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় যা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দখলে রয়েছে এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, আর দাবিদারদের প্রত্যেকেই তাতে নিজের অধিকার প্রমাণের জন্য সাক্ষী বা প্রমাণ পেশ করে—তবে এই বস্তুটির ফয়সালা কার পক্ষে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন।

শাফেঈগণ বলেন: অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে উভয় প্রমাণই অকার্যকর হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণে উভয়টিই বাতিল ও অকেজো হয়ে যাবে। চাই উভয় প্রমাণের তারিখ উল্লেখ না থাকুক, অথবা তারিখ অভিন্ন হোক, কিংবা একটির তারিখ উল্লেখ থাকুক আর অন্যটির না থাকুক। এটি তখন দুটি প্রমাণের মধ্যে বিরোধের মতো হয়ে যায় যেখানে কোনোটিকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো কোনো কারণ থাকে না। ফলে বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন কোনো প্রমাণই নেই। তখন এই বিষয়ের ফয়সালা সেভাবেই হবে যেভাবে কোনো প্রমাণ ছাড়াই কেবল দাবির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ শপথ করবে এবং বস্তুটি তাদের উভয়ের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়ার ফয়সালা করা হবে।

অনুরূপভাবে মালিকীগণ বলেছেন: উভয় প্রমাণ বাতিল হয়ে যাবে এবং ফয়সালা এমনভাবে হবে যেন কোনো প্রমাণ নেই। ফলে উভয় পক্ষ শপথ করবে এবং বস্তুটি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। তবে যদি একজন শপথ করে আর অন্যজন করতে অস্বীকার করে, তবে যে শপথ করেছে তার পক্ষেই ফয়সালা দেওয়া হবে।

হাম্বলী মাযহাবের অগ্রগণ্য মত হলো: উভয় প্রমাণই বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রমাণ না থাকার ন্যায় শপথ করার জন্য দুই দাবিদারের মধ্যে লটারি করা হবে। লটারিতে যার নাম আসবে সে শপথ করবে এবং বস্তুটি গ্রহণ করবে।

আর হানাফীগণের ক্ষেত্রে এই অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তারা বলেন: যদি দাবিদারগণ দখলদার বহির্ভূত হয় এবং সাধারণ মালিকানার ওপর কোনো প্রকার তারিখ উল্লেখ ছাড়াই উভয় প্রমাণ পেশ করা হয় অথবা যদি তাদের তারিখ অভিন্ন হয়, আর বস্তুটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দখলে থাকে—তবে এই অবস্থায় তা তাদের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করার ফয়সালা দেওয়া হবে।

উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর যতটা সম্ভব আমল করা, যাতে সেগুলোকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়; কারণ সামর্থ্য অনুযায়ী দলিলের ওপর আমল করা ওয়াজিব। এর সমর্থনে একটি বর্ণনা হলো: দুইজন লোক একটি উট নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বিবাদে লিপ্ত হলো এবং তাদের প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে এটি তার। তখন আল্লাহর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটি তাদের দুইজনের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টনের ফয়সালা দিলেন।

তারা আরও বলেছেন: যদি তাদের একজনের তারিখ অন্যজনের তুলনায় পূর্ববর্তী হয়, তবে পূর্ববর্তী তারিখধারী ব্যক্তিই অগ্রাধিকার পাবে; কারণ বিবাদমান উভয় পক্ষই দাবিকারীর সংজ্ঞায় পড়ে। ফলে বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের সাক্ষ্য শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। তবে তারিখের অগ্রবর্তিতার কারণে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে; কারণ এটি এমন এক সময়ে মালিকানা সাব্যস্ত করেছে যখন অন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা বাধাগ্রস্ত হয়নি। অতঃপর দখলদার ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হবে বিতর্কিত বস্তুটি যার পক্ষে ফয়সালা হয়েছে তার নিকট হস্তান্তর করতে, যতক্ষণ না অপরজন অন্য কোনো উপায়ে মালিকানা স্থানান্তরের বিষয়টি প্রমাণ করতে পারে।

তারা আরও বলেছেন: যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন তারিখ উল্লেখ না করে, তবে এমতাবস্থায় তাদের দুইজনের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ফয়সালা করা হবে, যেমনটি ইমাম আবু হানিফা অভিমত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারিখের কোনো বিবেচনা করা হবে না।

তৃতীয়ত: দখলদার ব্যক্তিদের মধ্যে নিরঙ্কুশ মালিকানার ক্ষেত্রে দুই দাবির বিরোধপূর্ণ অবস্থা:

অর্থাৎ: কোনো বস্তু একই সাথে দুইজন ব্যক্তির দখলে আছে এবং তাদের প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করেছে যে এটি সম্পূর্ণভাবে তার হক। এভাবে যখন উভয় প্রমাণ পরস্পর বিরোধী হয়, তখন আমরা বলব: যদি কোনো বাড়ি দুইজনের দখলে থাকে অর্থাৎ তাদের উভয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং তাদের প্রত্যেকেই এটি তার বলে দাবি করে এবং একক মালিকানার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করে।

এ বিষয়ে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী: উভয় প্রমাণই অকার্যকর হবে, অর্থাৎ পরস্পর বিরোধিতার কারণে উভয়ই খসে পড়বে ও বাতিল হয়ে যাবে; যেমন কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ না থাকলে দুটি দলিলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে উভয়টিই বাতিল হয়। ফলে বাড়িটি তাদের উভয়ের দখলেই থাকবে যেভাবে আগে ছিল, কারণ তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক হকদার নয়।

হাম্বলীগণ বলেছেন: যদি দুইজন ব্যক্তি তাদের দখলে থাকা কোনো বস্তু নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করে এবং উভয় প্রমাণ সমান ও পরস্পর বিরোধী হয়, তবে বস্তুটি তাদের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। কারণ আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: ((দুইজন লোক একটি উট নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বিবাদে লিপ্ত হলো। তাদের প্রত্যেকেই সাক্ষী পেশ করল। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটটি তাদের দুইজনের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করার ফয়সালা দিলেন।))

ষোড়শ পাঠ

হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে তাদের কর্মপন্থা হলো পূর্ববর্তী দুটি সম্ভাবনার ন্যায় বিস্তারিত বিবরণ। তারা বলেছেন:

যদি বিবাদমান দখলদার দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই প্রমাণ পেশ করে যে বস্তুটি তারিখ উল্লেখ ছাড়াই তার, তবে বস্তুটি তাদের উভয়ের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করার রায় প্রদান করা হবে। কিন্তু যদি তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রমাণের তারিখ উল্লেখ করে এবং তারিখ একই হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও—প্রথম অবস্থার ন্যায়—বস্তুটি তাদের উভয়ের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হবে। আর যদি একজনের তারিখ আগের হয়, তবে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের নিকট পূর্ববর্তী তারিখটিই অগ্রাধিকার পাবে। অন্যদিকে

মুহাম্মদ বলেছেন: দখলদারের ক্ষেত্রে তারিখের কোনো গুরুত্ব নেই, তাই বস্তুটি তাদের উভয়ের মধ্যে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হবে।

অনুরূপভাবে, যদি একজন তারিখ উল্লেখ করে এবং অন্যজন না করে, তবে আবু হানিফা ও মুহাম্মদের নিকট বস্তুটি তাদের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হবে এবং সময়ের কোনো গুরুত্ব থাকবে না; কারণ অন্যজনের প্রমাণের তারিখের আগে বা পরে হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এটি বিবেচনার যোগ্যতা হারায়।

আবু ইউসুফ বলেছেন: এটি তারিখ প্রদানকারীর প্রাপ্য হবে, অর্থাৎ যার তারিখ আগে অথবা যে ব্যক্তি তারিখ উল্লেখ করেছে সে ওই ব্যক্তির চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে যে তারিখ উল্লেখ করেনি।

এখানে প্রশ্ন জাগে: সাক্ষীর সংখ্যাধিক্য বা প্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণতার (আদালত) কারণে কি কোনো এক পক্ষের প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

আমরা বলব: উপরোক্ত অবস্থাগুলো এবং অন্যান্য প্রমাণের বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে জমহুর ফকীহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে: সাক্ষীর সংখ্যাধিক্য বা ন্যায়পরায়ণতার প্রসিদ্ধির কারণে কোনো একটি প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। কারণ শারঈ মানদণ্ডে উভয় পক্ষের প্রমাণই পূর্ণাঙ্গ দলিল, তাই সংখ্যা বৃদ্ধিতে তা শক্তিশালী হয় না। যেমনটি দিয়তের (রক্তপণ) ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, ব্যক্তিদের ভিন্নতায় এর পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না। ইমাম মালিক বলেছেন: ন্যায়পরায়ণতার আধিক্যের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রমাণের মাধ্যমসমূহ:

পারিপার্শ্বিক আলামত এবং প্রমাণে এর ভূমিকা:

পারিপার্শ্বিক আলামতের (ক্বারাইন) মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পন্ন করা শরীয়তের অন্যতম একটি মূলনীতি। এটি প্রমাণ বা স্বীকারোক্তির উপস্থিতিতে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রমাণের অন্য কোনো দলিল না থাকলেও প্রযোজ্য।

কখনো আলামত কোনো দাবি বা মামলা শ্রবণে বাধা সৃষ্টি করে; যেমন একজন দরিদ্র ও সচ্ছলতাহীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে একজন ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের দাবি করা। অথবা প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও কোনো সন্দেহের কারণে তা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে; যেমন সাক্ষীর সাথে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তার নিকটাত্মীয়তা থাকা, অথবা মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন কোনো স্বীকারোক্তি প্রদান করা। আবার কখনো দলিলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ অবস্থায় আলামতকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়; যেমন হাতের অবস্থান এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় যা আমরা জেনেছি। আবার কখনো আলামতকে একটি স্বতন্ত্র দলিল হিসেবে গণ্য করা হয় যদি তা ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ না থাকে; যেমন স্বামীর সাথে বসবাসরত স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভরণপোষণ না পাওয়ার দাবির ক্ষেত্রে মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবের রায় অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যান করা। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন: "যে ব্যক্তি শরীয়তের নিদর্শন ও আলামতগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করল, সে বহু বিধানকে অকেজো করে দিল এবং অনেক অধিকার নষ্ট করল।"

আলামতের (ক্বারিনাহ) সংজ্ঞা:

শাব্দিক অর্থে: এটি হলো এমন নিদর্শন যা কোনো কাঙ্ক্ষিত বস্তুর পথনির্দেশ করে।

পারিভাষিক অর্থে: এটি হলো এমন প্রতিটি প্রকাশ্য নিদর্শন যা কোনো গোপন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তার প্রমাণ বহন করে।

এই সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে, আলামতের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অপরিহার্য:

প্রথমত: এমন একটি পরিচিত প্রকাশ্য বিষয় বিদ্যমান থাকা যা নির্ভর করার ভিত্তি হওয়ার উপযুক্ত।

দ্বিতীয়ত: প্রকাশ্য বিষয় এবং গোপন বিষয়ের মধ্যে একটি প্রভাবশালী সম্পর্ক থাকা। এই সম্পর্কের শক্তির মাত্রা অনুযায়ী আলামত দুই ভাগে বিভক্ত: শক্তিশালী আলামত এবং দুর্বল আলামত। আলামত থেকে সুনির্দিষ্ট ফলাফল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ফকীহ এবং বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৮৩৭

পৃষ্ঠা ৪৪

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ
ষোড়শ পাঠ

ফিকহী আলামতসমূহের (قرائن) মধ্যে রয়েছে: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের আসবাবপত্রের মালিকানা নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে যা পুরুষদের ব্যবহারের উপযোগী, যেমন পাগড়ি ও তরবারি—তাকে পুরুষের মালিকানাধীন বিবেচনা করা। আর যা শুধুমাত্র নারীদের উপযোগী, যেমন অলংকারাদি—সেগুলোকে বাহ্যিক অবস্থা, প্রচলিত প্রথা এবং ন্যায়বিচারের নিরিখে নারীর জন্য নির্ধারিত করা।

বিচারিক আলামতসমূহের মধ্যে রয়েছে: কোনো বস্তু যার হাতে বা দখলে আছে তার অনুকূলে ফয়সালা প্রদান করা; কেননা বাহ্যিকভাবে কোনো বস্তুর ওপর হাত রাখা বা দখল থাকা মালিকানার আলামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যদি আলামতটি এমন অকাট্য হয় যা নিশ্চিত বিশ্বাসের (ইয়াকীন) পর্যায়ে পৌঁছায়—যেমন কাউকে যদি এমন অবস্থায় দেখা যায় যে সে হতভম্ব হয়ে আছে এবং রক্তে রঞ্জিত, আর তার পাশেই রক্তমাখা একটি ছুরি পড়ে আছে—তবে তাকেই হত্যাকারী হিসেবে বিচার করা হবে। এমতাবস্থায় বিচারিক ফয়সালার জন্য এটি এককভাবে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

তবে আলামত যদি অকাট্য না হয়, বরং তা প্রবল ধারণাপ্রসূত (জন্নী) হয়—যেমন প্রচলিত প্রথাগত আলামত অথবা মামলার ঘটনাবলি ও বিবাদমান পক্ষগুলোর আচার-আচরণ থেকে উদ্ভাবিত আলামত—তবে তা কোনো এক পক্ষের দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দলিল হিসেবে গণ্য হবে; যদি বিচারক তাতে সন্তুষ্ট হন এবং অন্য কোনো দলিল না থাকে, অথবা এর বিপরীতে আরও শক্তিশালী কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত না হয়।

জুমহুর (অধিকাংশ) ফকীহগণের মতে, হুদুদের (নির্ধারিত দণ্ডবিধি) ক্ষেত্রে এসব আলামতের ভিত্তিতে বিচার করা যাবে না; কারণ হুদুদ বা দণ্ডবিধি সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। একইভাবে রক্তপাত ও জীবনের সুরক্ষার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতাস্বরূপ কিসাসের ক্ষেত্রেও 'কাসামাহ' (বিশেষ শপথ) ব্যতীত এসব আলামতের মাধ্যমে ফয়সালা প্রদান করা যাবে না। তবে আর্থিক লেনদেন এবং ব্যক্তিগত বিষয়াবলির (আহওয়ালুশ শাখসিয়্যাহ) ক্ষেত্রে যখন অধিকার প্রমাণের জন্য কোনো স্পষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে না, তখন এসব আলামতের ভিত্তিতে বিচার করা যাবে।

তবে মালিকী মাযহাবের ইমামগণ ঘ্রাণের মাধ্যমে মদ পান করা সাব্যস্ত করেছেন এবং অবিবাহিত নারীর গর্ভধারণের মাধ্যমে ব্যভিচার (যিনা) সাব্যস্ত করেছেন। ইবনুল কায়্যিম গর্ভধারণের মাধ্যমে ব্যভিচার সাব্যস্ত করার বিষয়ে তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাম্বলীগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেছেন: যদি কোনো বিবাহিতা নারী গর্ভবতী হয় অথচ তার স্বামী তার

থেকে দূরে অবস্থান করে এবং নারীটি কোনো যৌক্তিক সন্দেহের দাবি না করে, তবে তাকে ব্যভিচারের দণ্ড প্রদান করা হবে। তবে স্বামীহীন বা অবিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গর্ভধারণের মাধ্যমে ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে না।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: অধিকাংশ ফকিহ — মালিক, আহমাদ ও আবু হানিফা — প্রকাশ্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি এবং সুনিশ্চিত জ্ঞানের নিকটবর্তী প্রবল ধারণার প্রতি লক্ষ্য করেছেন যাতে প্রত্যেককে তার উপযোগী বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট করা যায়। তারা দেখেছেন যে, কোনো দাবির পক্ষে এর চেয়েও অনেক কম শক্তিশালী বিষয় দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; যেমন: হাত (থাকা বা দখল), দায়মুক্তি, শপথ থেকে বিরত থাকা, ফিরিয়ে দেওয়া শপথ, একজন সাক্ষী ও শপথ এবং একজন পুরুষ ও দুইজন নারী। এর ফলে যে ধারণা অর্জিত হয় তা দাবির পক্ষে প্রাধান্য পায়। এটি সুবিদিত যে, এখানে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি থেকে অর্জিত ধারণা ঐসব বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত ধারণার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। এটি এমন একটি বিষয় যা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ সুবহানুহু বিদ্যমান সত্যের জন্য কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন নির্ধারণ করেছেন যা তার দিকে পথ দেখায় এবং তা স্পষ্ট করে। তিনি ঈমান ও নিফাকের জন্যও কিছু আলামত ও প্রমাণ নির্ধারণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণ বিচারিক বিধানের ক্ষেত্রে আলামতসমূহ বিবেচনা করেছেন; অর্থাৎ তারা বিধানের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলোকে বিধানের স্পষ্টকারক হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন তারা কুড়িয়ে পাওয়া মালের ক্ষেত্রে আলামতকে বিবেচনা করেছেন এবং দাবিদারের বর্ণনাকে তার সত্যতা ও মালিকানার নিদর্শন ও আলামত সাব্যস্ত করেছেন। সাহাবীগণ গর্ভাবস্থাকে ব্যভিচারের চিহ্ন ও প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এর মাধ্যমে নারীর ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করেছেন, যদিও সে স্বীকারোক্তি দেয়নি এবং চারজন সাক্ষীও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি। বরং তারা গর্ভাবস্থাকে সাক্ষ্যের চেয়েও অধিক সত্যনিষ্ঠ মনে করেছেন। তারা মদের গন্ধ ও বমিকে তা পানের নিদর্শন ও আলামত সাব্যস্ত করেছেন এবং একে স্বীকারোক্তি ও দুইজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভির নিম্নে পশম গজানোকে সাবালকত্বের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করেছেন এবং একে এর নিদর্শন বানিয়েছেন। তাই কুরাইজার যুদ্ধের দিন বন্দীদের মধ্যে যাদের মাঝে এই আলামত পাওয়া গিয়েছিল তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং যাদের মাঝে তা ছিল না তাদের জীবিত রাখা হয়েছিল। তদ্রূপ ঋতুস্রাব হওয়াকে জরায়ু গর্ভমুক্ত হওয়ার আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এভাবেই ইবনুল কাইয়্যিম আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন যে, সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই; যাতে মানুষের অধিকার নষ্ট না হয়।

ষোড়শ পাঠ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় প্রমাণ ও যাচাইকরণের মাধ্যমসমূহ

দাবির প্রমাণের মাধ্যম হতে পারে সাক্ষ্য প্রদান, আবার প্রমাণের অন্যান্য পদ্ধতির মধ্য থেকে অন্য কিছুও হতে পারে। বিচারকের কাছে যেমন দাবি এবং তার উত্তর অনুধাবন করা এবং বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা কাম্য, ঠিক তেমনি দাবির প্রমাণের মাধ্যমটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও তার জন্য আবশ্যক হলো খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান করা; বরং এই অবস্থায় বিচারকের জন্য সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও স্বচ্ছ চিন্তার বিষয়টি আরও জোরালোভাবে তাকিদপ্রাপ্ত হয়।

যেহেতু দাবির প্রমাণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়—তা লিখিত হোক যেমন দলিলপত্র, কিংবা মৌখিক—তাই আমি সাক্ষ্য শ্রবণ এবং সাক্ষ্য প্রদানের সময় সাক্ষীদের প্রতি বিচারকের কী করণীয়, সে বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন মনে করেছি। কেননা বিচারকের নিকট যখন সাক্ষী উপস্থিত হয়, তখন তাদের সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি দেওয়া বিচারকের জন্য মুস্তাহাব। আর এর আগে তাদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু সহীহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী থেকে প্রমাণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই তোমাদের পরে এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা খেয়ানত করবে এবং তাদের বিশ্বাস করা হবে না; তারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না।" অর্থাৎ: তাদের নিকট চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এই হাদিসটি সাক্ষ্য প্রদানে তাড়াহুড়া করার নিন্দনীয় হওয়ার প্রতি প্রমাণ বহন করে। এর কারণ হলো সাক্ষ্যের গুরুত্ব ও ঝুঁকি, এবং যাচনা করা ছাড়াই তা প্রদান করা মানুষের অন্তরে এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে একে হিফাজত করা অপরিহার্য ছিল। আর এটি ইমাম মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর সনদে জায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানি থেকে বর্ণিত হাদিসের পরিপন্থী নয় যে, নবী ﷺ বলেছেন: "আমি কি তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী সম্পর্কে সংবাদ দেব না? সেই ব্যক্তি যে তার কাছে সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই তা নিয়ে উপস্থিত হয়।"

উলামায়ে কেরাম বলেছেন: এই হাদিসটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার নিকট কোনো মানুষের হকের স্বপক্ষে সাক্ষ্য আছে, কিন্তু সেই মানুষটি জানে না যে এই ব্যক্তি তার সাক্ষী; এমতাবস্থায় সে নিজে এসে তাকে অবহিত করে যে সে তার পক্ষে একজন সাক্ষী।

বিচারক কর্তৃক সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি প্রদানের পদ্ধতির বিষয়ে বলা যায় যে, তা প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে হওয়া উচিত। যেমন তিনি তাঁদের বলবেন: "আপনারা কিসের সাক্ষ্য দেবেন?" অথবা তিনি বলবেন: "কারো নিকট কোনো সাক্ষ্য থাকলে সে চাইলে তা উল্লেখ করতে পারে।" তবে তিনি তাঁদের বলবেন না: "আপনারা সাক্ষ্য দিন"; কারণ এটি এমন একটি নির্দেশ যা বিবাদমান কোনো এক পক্ষের প্রতি বিচারকের পক্ষপাতের প্রমাণ দেয়। অথচ বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকের নিকট যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করা কাম্য।

যখন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান শুরু করবেন, তখন বিচারকের দায়িত্ব হলো তাকে এমন সব প্রশ্ন করা যার মাধ্যমে তিনি তাকে জেরা করতে চান এবং যা যথাযথভাবে সাক্ষ্য উপস্থাপনে কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে না: যাতে দাবির সাথে তার সামঞ্জস্য বজায় থাকে। উত্তম হলো সাক্ষীকে তার সাক্ষ্য সংক্রান্ত যা কিছু রয়েছে তা ব্যক্ত করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া, যাতে বিচারকের পক্ষ থেকে এমন কোনো হস্তক্ষেপ না ঘটে যার ফলে সাক্ষীর বক্তব্য সংশোধন হয়ে যায় অথবা সাক্ষ্যের কোনো ত্রুটি নিরসন কিংবা মুখ ফসকে বেরিয়ে

যাওয়া কথা সংশোধনের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এভাবে যখন তার বক্তব্য শেষ হবে, তখন দ্বিতীয় সাক্ষীকেও প্রথম সাক্ষীর ন্যায় প্রশ্ন করবেন; যাতে এর মাধ্যমে মিল ও অমিলের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা যায়।

যদি সাক্ষীদের বক্তব্যে বিচারকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে তিনি তাঁদের পৃথক করে দেবেন এবং প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করবেন। যেমন তিনি সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন: "কখন এই সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন?" "কোন স্থানে?" "তখন সেখানে কে উপস্থিত ছিলেন?" "সে সময় কী ঘটেছিল?" ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে সাক্ষ্যকে পৃথকভাবে যাচাই করা সম্ভব এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা যায়। যদি বিচারকের সম্মুখে সাক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয়, তবে তিনি তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে খোঁজ নেবেন।

আর যদি তাঁদের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়, তবে বিচারক তাঁদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করবেন এবং বাদী চাইলে অন্য সাক্ষী উপস্থিত করার কথা বলবেন।

সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিচারকের জন্য যা বাঞ্ছনীয় তা হলো, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। তিনি যেন সাক্ষীদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন না করেন, যেমন তাঁদের বলা: "আপনারা কেন সাক্ষ্য দিলেন?" অথবা "এটি কেমন সাক্ষ্য?" কিংবা এমন সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা যা তাঁদের জন্য দুঃসাধ্য হয় এবং তাঁদের বিব্রত ও সংকটে ফেলে দেয়, অথচ কোনো কিছু প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

৮৪১

ষোড়শ পাঠ: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

অনুরূপভাবে সাক্ষীকে ধমক দেওয়া বৈধ নয়, যেমন তার ওপর চিৎকার করা বা তাকে তিরস্কার করা। কারণ এটি তার কথাবার্তায় জড়তা ও তোতলামি সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং সাক্ষ্য প্রদানের প্রতি অনীহা তৈরি করতে পারে। আর এই সবকিছুই বিচারকের প্রতি বিমুখতা এবং সাক্ষ্য দানে অনীহার দিকে পরিচালিত করে, যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত অধিকার নষ্ট হয় এবং নানাবিধ অনিষ্ট বৃদ্ধি পায়।

কখনো সাক্ষী যা সাক্ষ্য দিতে চান তা মুখস্থ বলতে সক্ষম নাও হতে পারেন; সাক্ষ্যটি দীর্ঘ বা জটিল হওয়ার কারণে। এমতাবস্থায় উলামায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন যে, সাক্ষী তা লিখবেন অথবা তার জন্য তা লিখে দেওয়া হবে, অতঃপর তা তাকে পড়ে শুনানো হবে এবং তিনি লিখিত বিষয় অনুযায়ী সাক্ষ্য দেবেন। কারণ মুখস্থ করার বাধ্যবাধকতায় তার জন্য কষ্ট রয়েছে, আর সাক্ষ্য বর্জন করলে অধিকার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অসুবিধা দূর করার নিমিত্তে এটি বৈধ করা হয়েছে।

ফকিহগণ উল্লেখ করেছেন যে, সাক্ষ্য নিবন্ধনের সময় সাক্ষীদের স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করা আবশ্যক। তারা বলেছেন: বিচারকের উচিত সাক্ষীর নাম, তার পিতার নাম, দাদার নাম এবং জানা থাকলে উপনাম লিখে রাখা। একইভাবে তার গোত্র, পেশা এবং যে মহল্লায় তিনি বসবাস করেন তার নামও লিখতে হবে। যদি এসব তথ্যের মাধ্যমে তাকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করা সম্ভব না হয়—যেমন উল্লিখিত তথ্যে অন্য কারো সাথে মিলে যাওয়ার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে—তবে সন্দেহ দূর করার জন্য বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে হবে। অনুরূপভাবে ফকিহগণ বলেছেন: বিচারককে সাক্ষ্যদানের তারিখ নিশ্চিত করতে হবে, যেমন তিনি বলবেন: অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক তারিখে। অতঃপর এই নথিটি সংরক্ষণ করতে হবে; যাতে সাক্ষ্যে কোনো কিছু যোগ বা বিয়োগের মাধ্যমে জালিয়াতি করার সুযোগ না থাকে।

সাক্ষীদের স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করার বিষয়ে ফকিহগণ যা উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের কাছে ব্যক্তিগত পরিচয় প্রমাণের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে এবং ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে এর যে ভিত্তি রয়েছে তা নির্দেশ করে। এর গুরুত্বের কারণেই এমন সব উপায়-উপকরণ

পাওয়া গিয়েছে যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা করার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো, ইবনে কুদামা শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত পরিচয় শনাক্তকরণে স্বীকৃত। তিনি বলেছেন: বিচারক সাক্ষী সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য লিখে রাখবেন। যেমন তিনি লিখবেন যে, সাক্ষী কৃষ্ণবর্ণ নাকি শ্বেতবর্ণ, কিংবা তার ঠোঁট পাতলা নাকি মোটা; যাতে তাকে সঠিকভাবে চেনা যায় এবং এক নামের সাথে অন্য নামের বিভ্রান্তি না ঘটে।

৮৪২

পৃষ্ঠা 93

আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ
ষোড়শ পাঠ

প্রমাণের পন্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান (আল-ই'যার):

'ই'যার' এর উদ্দেশ্য হলো, যার বিরুদ্ধে কোনো দাবি বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার ওজর-আপত্তি ও অভিযোগ পেশ করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া।

মালিকী মাজহাবের আলিমগণের পরিভাষায় 'ই'যার' হলো—বিচারক কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অথবা যার বিরুদ্ধে হুকুম বা রায় কার্যকর হওয়া অবধারিত হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা: তার নিকট এমন কিছু আছে কি যা এই রায়কে বাতিল করতে পারে? বিচারক তাকে বলবেন: "তোমার কি আর কিছু বলার আছে?"

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হলো: যখন কোনো ব্যক্তির বা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় প্রদানের পরিস্থিতি তৈরি হয় অথবা যখন পূর্ণাঙ্গ প্রমাণাদি উপস্থিত থাকে, তখন বিচারকের কর্তব্য হলো তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এই সুযোগ (ই'যার) প্রদান করা এবং তাকে বলা: "প্রতিপক্ষ তোমার বিরুদ্ধে যে দলিল পেশ করেছে, তার বিপরীতে তোমার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে? এই সাক্ষ্যকে বাতিল বা প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো তোমার কাছে কি কিছু আছে?" ... ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে এমন অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, শাস্তির যোগ্য ব্যক্তির ওজর বা অজুহাত খণ্ডন করে দলিল প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। হুদহুদ পাখির ঘটনায় মহান আল্লাহ বলেন: "অবশ্যই আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেব অথবা তাকে জবাই করব, যদি না সে আমার কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে।" [আন-নামল: ২১]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করি না, যতক্ষণ না কোনো রাসূল প্রেরণ করি।" [আল-ইসরা: ১৫]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "যদি আমি এর আগে তাদের কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে তারা বলত—হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি কেন আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই আপনার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।" [ত্বহা: ১৩৪]। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি, যাতে রাসূলগণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো ওজর বা দলিল না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [আন-নিসা: ১৬৫]।

এই আয়াতগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, ইনসাফের অন্যতম মূলনীতি হলো—শাস্তির যোগ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি কার্যকর না করা যতক্ষণ না তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়, যাতে সে নিজের মুক্তির স্বপক্ষে কিছু পেশ করতে পারে। যদি সে তা করতে ব্যর্থ হয়, তবেই তার ওপর শাস্তি প্রয়োগের বৈধতা তৈরি হয়। তদ্রূপ, বিচারকার্যের ক্ষেত্রেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত রায় প্রদান করা সঠিক নয়; কারণ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে এটিও এক প্রকার দণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

পৃষ্ঠা 94

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ই'জার (আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান) এর ক্ষেত্র: ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ই'জার মূলত সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কেননা তারা বলেছেন: ই'জার মূলত ধারণা এবং সাক্ষীদের প্রতি অভিযোগের ভিত্তিতে হয়। আর এটিই নির্দেশ করে যে, ই'জারের ক্ষেত্র হলো সাক্ষ্যদান। সম্ভবত বাস্তব বাস্তবতার নিরিখে এমনটি বলা হয়েছে, কারণ সাক্ষ্যদানই হলো প্রমাণের সবচেয়ে প্রশস্ত পথ।

কিন্তু: আমরা যদি সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ই'জারের কারণটির (ইল্লাত) দিকে লক্ষ্য করি, তবে দেখব যে তা প্রমাণের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। কারণ সাক্ষ্যদানে যেমন জালিয়াতির সম্ভাবনা থাকে, তেমনি দলিলপত্র, আলামত এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রমাণের ক্ষেত্রেও জালিয়াতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই দণ্ডিত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে—যেমনটি কেউ কেউ মনে করেন—বিপক্ষ দল কর্তৃক উপস্থাপিত সকল শরয়ী দলিল এবং প্রমাণের উপায়ের বিরুদ্ধে তাকে ই'জারের সুযোগ প্রদান করা, এবং এ বিষয়ে তার গ্রহণযোগ্য আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে।

অতঃপর ওলামায়ে কেরাম এমন কিছু পরিস্থিতিকে এর ব্যতিক্রম গণ্য করেছেন যেখানে ই'জার কোনো উপকারে আসে না এবং যেখানে ই'জার প্রদান অনিষ্ট বৃদ্ধি ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম হতে পারে। সেই পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. যার বিরুদ্ধে ফাসাদ (ফিতনা-ফ্যাসাদ), জবরদখল বা সীমালঙ্ঘনের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদি সে প্রকাশ্য ফাসাদ সৃষ্টিকারী অথবা তাদের প্রতি যা নিসবত করা হয় সে বিষয়ে কুখ্যাত যিনদিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ তাদের ক্ষেত্রে ই'জার প্রদান কোনো কাঙ্ক্ষিত উপকার ছাড়াই ফাসাদ বিস্তারের পথ খুলে দেয়; তাই তাদের ই'জারের সুযোগ দেওয়া হবে না।

২. বিচারকের মজলিসে কোনো স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি ব্যক্ত করার কারণে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো বিচারক স্বয়ং উপস্থিত সাক্ষীদের সাথে শরীক ছিলেন। ফলে সাক্ষীদের বিষয়ে ই'জার প্রদানের আবশ্যিক অর্থ দাঁড়াবে বিচারকের নিজের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা।

৩. অনুরূপভাবে: শরয়ী কোনো কারণে অথবা স্বামী-স্ত্রীর একজন কর্তৃক অন্যজনের ক্ষতির কারণে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ব্যাপকভাবে (ইসতিফাযাহ) প্রচারিত হয়েছে। কারণ সাক্ষ্যের ব্যাপকতার ক্ষেত্রে ই'জার কোনো কাজে আসে না; কেননা সকল সাক্ষীর জেরা বা চরিত্র হনন করা সম্ভব নয়, তেমনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করার মতো কিছু উপস্থাপন করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৮৪৪

পৃষ্ঠা 95

ষোড়শ পাঠ

ই'যারের সময়:

সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হওয়া এবং বিষয়টি পূর্ণরূপে পর্যালোচনার আগে ই'যার (যুক্তি বা প্রমাণ খণ্ডানোর সুযোগ প্রদান) সম্ভব নয়; কারণ অসম্পূর্ণ কোনো বিষয়ে ই'যার প্রদান কোনো ফলপ্রসূ হয় না। আর ই'যারের সময়ের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে—যেমনটি মালিকী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন—

প্রথম মত: তা রায় প্রদানের আগে হবে। এর অর্থ হলো: বিচারক যখন মামলা ও এর প্রমাণাদি পর্যালোচনা করবেন, তখন যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার ইচ্ছা করবেন তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ (ই'যার) দেবেন। মালিকী মাযহাবে এই মতের ওপরই আমল বিদ্যমান।

দ্বিতীয় মত: ই'যার হবে বিচারের রায় প্রদানের পর।

প্রকাশ্যত প্রথম মতটিই সঠিক; কারণ ই'যারের উদ্দেশ্য হলো, যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হচ্ছে তার কাছে যদি এমন কিছু থাকে যা দ্বারা সে অন্য পক্ষের দলিল বাতিল করতে পারে, তবে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া। সুতরাং উভয় পক্ষের ক্ষতি নিরসনের লক্ষ্যে ই'যার নিকটতম পন্থায় হওয়াটাই শ্রেয়। আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী—যারা বলেন ই'যার রায় প্রদানের পরে হবে—এর ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি। কারণ রায় পরবর্তী ই'যার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের অধিকার ফিরে পাওয়ার সুযোগ নষ্ট করে দেয়। তদুপরি, রায়ের বিষয়বস্তুটি যদি হস্তান্তরযোগ্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে রায় পরবর্তী সময়ে তাতে হস্তক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তাই আমি মনে করি: সাক্ষ্য শ্রবণ করার পর এবং 'তাদীল' (সাক্ষীর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই) এর পূর্বে এটি হতে কোনো বাধা নেই। কারণ সাক্ষীর মধ্যে যদি 'জারহ' (ত্রুটি) থাকার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার কোনো ফায়দা নেই। আলেমদের নিকট 'জারহ' বা সাক্ষীর ত্রুটি বর্ণনা 'তাদীল' বা নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনার ওপর প্রাধান্য পায়। কেননা জারহ বাড়তি তথ্য প্রদান করে, যতক্ষণ না তাদীল সেই বাড়তি তথ্যের বিষয়টিকে নাকচ করে দেয়। যেমন: সাক্ষী যে ত্রুটির কারণে অভিযুক্ত ছিল তা থেকে সে তওবা করেছে; এমন ক্ষেত্রে 'তাদীল' বা নির্ভরযোগ্যতা অগ্রগণ্য হবে।

সারকথা হলো: উভয় পক্ষের কল্যাণ সাধনে ই'যারের সময়ের ক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত বা অগ্রগণ্য তা বিবেচনা করা উচিত।

ই'যারের ফলাফল ও এতে বিলম্বকরণ:

ই'যার কখনো বিবাদীর অধিকার হতে পারে মূল দাবি বাতিল করার জন্য, আবার কখনো বাদীর অধিকার হতে পারে বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন খণ্ডন করার জন্য; আবার কখনো এটি (পুনরায়) বিবাদীরও অধিকার হতে পারে।

৮৪৫

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ
ষোড়শ পাঠ

প্রতিবাদ বাতিল করার জন্য, ওজর পেশ করার সুযোগ প্রদান (ই'যার) কেবল বিবাদীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। যাকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেয়া হয় সে দুটি অবস্থার কোনো একটির বাইরে থাকে না:

প্রথম অবস্থা: তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দলিল বা সাক্ষ্যের বিপরীতে কোনো ওজর থাকার বিষয়টি অস্বীকার করা। এমতাবস্থায় ওজর নাকচ হওয়ার পরপরই বিচারক সরাসরি তার বিরুদ্ধে রায় দেবেন।

দ্বিতীয় অবস্থা: তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিষয়ের বিপরীতে ওজর দাবি করা। এ অবস্থায় ওজরের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত না-ও থাকতে পারে, তাই সে তা উপস্থাপনের জন্য সময় প্রার্থনা করতে পারে। আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর প্রেরিত পত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অনুপস্থিত সাক্ষী বা প্রমাণের দাবি করে, তার জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দাও।" অর্থাৎ এমন একটি মেয়াদ যা শেষ হবে। যদি সে তার প্রমাণ উপস্থাপন করে তবে তুমি তাকে তার হক বুঝিয়ে দাও, আর যদি সে তা করতে অক্ষম হয় তবে তার বিপক্ষে মামলা নিষ্পত্তি করো। কেননা এটিই ওজর পেশের সবচেয়ে বলিষ্ঠ পন্থা।

আর সময়সীমার মেয়াদের ব্যাপারে কথা হলো: মামলা, অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে এটি ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য ওলামায়ে কেরাম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সময়সীমা নির্ধারণ করা বিচারকের ইজতিহাদ বা সুবিবেচনার ওপর ন্যস্ত, যা তিনি বিবাদমান উভয় পক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের আলোকে করবেন। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই যা অতিক্রম করা যাবে না, বরং এটি ইজতিহাদ সাপেক্ষ।

রায় প্রদান:

শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনার পর এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিচারকের নিকট যা স্পষ্ট হয় সে অনুযায়ী শরয়ী বিধান প্রকাশ করা। আর এটি তখন হবে যখন মামলাটি আপস-মীমাংসা বা দাবি ত্যাগ কিংবা এজাতীয় কোনো কারণে শেষ না হয়। মামলায় রায় দেওয়ার জন্য বিচারকের তিনটি বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক:

প্রথমত: কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত অথবা এ দুই উৎস থেকে উদ্ভাবিত শরয়ী দলিল সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা।

দ্বিতীয়ত: এমন সব প্রমাণাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া যার মাধ্যমে বিরোধের সময় ফয়সালার পথ উন্মোচিত হয়।

তৃতীয়ত: বিধানের কারণ, শর্ত এবং প্রতিবন্ধকসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আর এটি ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা, বর্ণনা কিংবা অভ্যাসের মাধ্যমে জানা যায়। এই বিষয়টির জ্ঞান নির্দিষ্ট স্থানে বিধানের উপযোগিতা অথবা তার অনুপস্থিতি স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। যখন কেউ এসকল বিষয়ের কোনোটিতে ভুল করে, তখন সে বিধান প্রদানেও ভুল করে বসে।

আভিধানিক অর্থে 'হুকুম' বা বিধান বলতে বুঝায়: কোনো বিষয়ে এই ফয়সালা প্রদান করা যে, সেটি এমন অথবা সেটি এমন নয়। আর পরিভাষায় কোনো কোনো আলিম এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: এটি একটি মানসিক বিষয় যা কখনো কথার মাধ্যমে, কখনো কাজের মাধ্যমে আবার কখনো ইশারার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এর অর্থ হলো, হুকুম বা বিধান কথা, কাজ বা ইশারা থেকে ভিন্ন কিছু; বরং এই বিষয়গুলো কেবল বিধানের নির্দেশক মাত্র।

হুকুমের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন দিক থেকে হুকুমের অনেক প্রকার রয়েছে, তবে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দুটি প্রকার:

প্রথম প্রকার: বৈধতার বিধান: এটি হলো বিচার্য বিষয়ে কর্মকাণ্ডের বৈধতার ওপর প্রদত্ত বিধান। এই প্রকারটি বিভিন্ন চুক্তি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এটি বিধানের সর্বোচ্চ স্তর, কারণ এতে শর্তাবলি পরিপূর্ণ থাকে। শর্তগুলো হলো: মালিকের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, কর্মকাণ্ড পরিচালিত বিষয়ের ওপর দখল থাকা, সম্পাদনকারীর যোগ্যতা এবং কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি সঠিক হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: বাধ্যবাধকতার বিধান: এটি হলো কোনো ব্যক্তি থেকে সম্পাদিত কার্যের ওপর ভিত্তি করে তার ওপর বর্তানো পরিণতির ওপর প্রদত্ত বিধান। এই প্রকারের ক্ষেত্রে সম্পাদনকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া শর্ত নয়; বরং কেবল দুটি শর্তই যথেষ্ট: সম্পাদনকারীর যোগ্যতা এবং কার্যের পদ্ধতির সঠিকতা। মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও এই বিধান প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কারণ মালিকানা প্রমাণ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হতে পারে। তবে পরবর্তীতে যদি মালিকানা না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তবে প্রদত্ত বিধানটি বাতিল করা আবশ্যক।

ষোড়শ পাঠ

বিচারের (রায়ের) শর্তাবলি:

একটি রায় সঠিক এবং কার্যকরের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে ফকিহগণ কিছু শর্তারোপ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রথমত: এর আগে একটি সঠিক মামলা বা দাবি থাকতে হবে। মানুষের অধিকার (হুকুকুল ইবাদ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রায়ের সঠিকতার জন্য এটি শর্ত। কারণ, যার হক বা অধিকার রয়েছে তার দাবি ছাড়া মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে বিচার করা জায়েয নয়। তবে আল্লাহর হকের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম; তা এই শর্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। কেননা আল্লাহর হক আদায় করা শাসক এবং অন্য সকলের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত: শর্ত হলো রায়টি এমন শব্দের মাধ্যমে হতে হবে যা বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যকতা প্রকাশ করে। যেমন বিচারক বলবেন: "আমি রায় দিলাম" অথবা "আমি ফয়সালা করলাম" কিংবা "তোমার বিরুদ্ধে আমি বিচার কার্যকর করলাম" ইত্যাদি।

কিছু শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন যে, সেগুলো কি বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যকতা বুঝায় কি না? যেমন বিচারকের এই কথা বলা: "আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি অমুকের," অথবা তার এই কথা: "আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে" অথবা "আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছে" অথবা "আমি এটি জেনেছি" ইত্যাদি। হানাফি, মালিকি এবং শাফিঈ মাযহাবের কিছু ফকিহ এই মত পোষণ করেছেন যে, এই শব্দগুলো বাধ্যবাধকতা বুঝায় না, তাই এগুলো চূড়ান্ত রায় হিসেবে গণ্য হবে না। এ কারণেই হানাফি আলেমদের কেউ কেউ বলেছেন: বিচারককে তার রায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই বলতে হবে: "আমি রায় দিলাম" অথবা

"আমি ফয়সালা করলাম" অথবা "আমি তোমার বিরুদ্ধে বিচার কার্যকর করলাম।"

তবে কিছু হানাফি ফকিহ মনে করেন যে, পূর্বোল্লিখিত শব্দগুলোও সর্বসম্মত শব্দগুলোর মতোই রায় হিসেবে গণ্য হবে। তবে উত্তম হলো এটি স্পষ্ট করা যে, এই প্রমাণ কি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হয়েছে নাকি স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে? কারণ, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারকের রায় আর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দেওয়া রায়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং শক্তিশালী। আর তা হলো: নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক, যেমন- "আমি ফয়সালা করলাম" বা "আমি রায় দিলাম"। এর কারণ হলো, মতভেদপূর্ণ শব্দগুলো এমনভাবে বাধ্যবাধকতা বুঝায় না যা বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সব ধরণের সংশয় ও অস্পষ্টতা দূর করে। সুতরাং এমন শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম যা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করে, যেমন: "আমি ফয়সালা করলাম" অথবা "আমি রায় দিলাম" ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: রায় স্পষ্ট হওয়া শর্ত। সুতরাং রায়কৃত বিষয় সুনির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য এবং একইভাবে যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে ও যার বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে তাদেরও স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে কোনো প্রকার সম্ভাবনা বা অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়; কারণ রায় যদি অস্পষ্ট হয় বা তাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকে তবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না এবং ফলস্বরূপ তা বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে চূড়ান্ত হবে না।

চতুর্থত: রায় প্রদানের পূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির যুক্তি খণ্ডন করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ (ই'যার) প্রদান করা শর্ত। রায়ের শুদ্ধতার জন্য এটি একটি শর্ত যেমনটি মালেকী মাযহাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চমত: কাজীর রায় প্রদানের সময় বিচার মজলিসে উভয় পক্ষের উপস্থিত থাকা শর্ত, তবে যদি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায়ের কারণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এরপর সে অনুপস্থিত থাকে, তবে তার উপস্থিত থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান। যেমন: যদি সে দাবীকৃত বিষয়টি স্বীকার করে নেয় এবং এরপর রায় ঘোষণার পূর্বে অনুপস্থিত হয়ে যায়, তবে তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হবে। এই শর্তটি হানাফী আলেমদের মতানুযায়ী, যারা প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ব্যতীত রায় প্রদান না করার পক্ষে; কারণ তারা কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা তার পক্ষে ফয়সালা প্রদান করা থেকে নিষেধ করেছেন।

তবে এই শর্তটি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যখন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদানের সেই শর্তাবলি পূরণ হবে না, যা হানাফী ব্যতীত অন্যান্য ফকীহগণ (যারা এটি বৈধ বলেছেন) শর্ত হিসেবোরোপ করেছেন।

ষষ্ঠত: বিচার বিভাগীয় রায়টি শরীয়তের এমন দলীল অনুযায়ী হতে হবে যা সংশ্লিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর দাবি হলো, জারিকৃত রায় যেন কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা অথবা কিয়াসে জালীর (সুস্পষ্ট কিয়াস) পরিপন্থী না হয়—যা মূলত মূলের (আসল) সাথে শাখার (ফর') সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

এই শর্তটি রায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এতে ভুল হওয়া নিশ্চিতভাবে জুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

এই শর্তটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকের (কাজীর) নিকট রায়ের প্রেক্ষাপট জানা আবশ্যক, যেমন: বিবাদমান উভয় পক্ষের বক্তব্য

অনুধাবন করা এবং উপস্থাপিত ঘটনার অবস্থা অনুধাবন করা। যদি তিনি অস্পষ্টতার কারণে প্রেক্ষাপট বুঝতে না পারেন...

শরয়ী রাজনীতি
ষোড়শ পাঠ

কোনো ঘটনা ঘটলে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত তাকে পুনরায় সেটি পর্যালোচনা করতে হবে। যদি বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট থাকে এবং এর বিধান দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে—যেমন কোনো বিষয়ের মূল ভিত্তি যদি কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায়, অথবা যদি সন্দেহ হয় যে এটি কি অমুক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নাকি তমুক মূলনীতির? অথবা যদি দুটি মূলনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং কোনোটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব না হয়—তবে তিনি আলেমদের সাথে পরামর্শ করবেন। এরপরও যদি সমস্যা থেকে যায়, তবে সেক্ষেত্রে আপোষ-নিষ্পত্তি করাই উত্তম। আর এটি ঐসব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে আপোষ করা সম্ভব, যেমন তালাক।

বিচারের কারণসমূহ:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিচারের কারণগুলো জানা যেকোনো মামলার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয় যা রায় প্রদানকে অনিবার্য করে তোলে। তবে ফকীহগণ বিচারের কারণসমূহকে এর শর্তাবলির মধ্যে উল্লেখ করেননি। সম্ভবত এর গুরুত্বের কারণে এবং এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হওয়ায় একে বিচারের একটি মূলনীতি ও ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি রায় প্রদানের সময় বিচারকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

আর রায়ের বর্ণনা দেওয়ার সময় এর কারণগুলো উল্লেখ করে রায়কে সমর্থন করা অথবা যার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে তাকে বিষয়টি বিস্তারিত জানানোর বিষয়টি ফকীহগণ উত্তম বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী বলেন: আমি পছন্দ করি যে, বিচারক যখন কারো বিরুদ্ধে রায় দিতে চাইবেন, তখন তাকে বসিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন। তিনি তাকে বলবেন: "তুমি আমার কাছে অমুক বিষয়ে যুক্তি পেশ করেছিলে, আর তোমার বিরুদ্ধে অমুক প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে এবং তোমার প্রতিপক্ষ অমুক দাবি করেছে; তাই আমি অমুক কারণে তোমার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা সংগত মনে করছি।" এটি করা হলে দণ্ডিত ব্যক্তির মন শান্ত থাকবে, সন্দেহের অবকাশ দূর হবে এবং বিচারক যদি কোনো দলীলের বিষয়ে অসতর্ক থেকে থাকেন তবে তা স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। যদি তিনি এমন কিছু দেখতে পান যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তার ফিরে আসা (সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা) উচিত অথবা বিষয়টি তার কাছে জটিল মনে হয়, তবে বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখবেন। আর যদি তিনি তেমন কিছু দেখতে না পান, তবে তাকে জানিয়ে দেবেন যে এ বিষয়ে তার পক্ষে আর কিছু করার নেই এবং তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করেছেন সেটিও তাকে জানিয়ে দেবেন। যদি তিনি এমনটি না-ও করেন তবুও তার রায় কার্যকর হবে, তবে তিনি বিচারের সময় দণ্ডিত ব্যক্তিকে ওজর পেশ করার সুযোগ দান করা পরিহার করলেন।

আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ
ষোড়শ পাঠ

শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় ফকীহ থেকে এই সুস্পষ্ট বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, জরুরি অবস্থার কাজী—অর্থাৎ যিনি বিচারকার্যের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি পূরণ না করা সত্ত্বেও এই পদে আসীন হয়েছেন—তার জন্য তার সকল রায়ের ভিত্তি বর্ণনা করা আবশ্যক। তার কেবল এই কথাটুকু গ্রহণযোগ্য হবে না যে: "আমি অমুক দলিলের ভিত্তিতে এই রায় দিলাম", যতক্ষণ না তিনি তার দলিলের স্বরূপ বর্ণনা করেন। ফকীহগণের নিকট ইতিপূর্বে এটি উত্তম হিসেবে গণ্য হলেও বর্তমান যুগে বিচারিক কর্মকাণ্ডের তদারকি, সঠিক রায়ের সমর্থন এবং ভুল রায়ের সমালোচনার গুরুত্বের কারণে এটি অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া ইতিপূর্বে যেমনটি আলোচিত হয়েছে, এটি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনে প্রশান্তি আনয়ন এবং বাস্তব অবস্থার ওপর যথাযথ নজরদারির জন্য সহায়ক; যাতে তার ওজর বা অজুহাতগুলো স্পষ্ট হয় এবং বিচারকের প্রতি আনীত কোনো সন্দেহের অবকাশ দূরীভূত হয়।

এখানে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রায়ের কারণ বা যৌক্তিকতা বর্ণনা করা আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় রায়টি সঠিক হওয়ার জন্য একটি শর্ত। আর এটি উপেক্ষা করলে রায়টি বাতিল বা অকার্যকর হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

রায়ের প্রামাণিকতা ও কার্যকারিতা:

এটি সুবিদিত যে, কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনায় রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তার কারণসমূহ জানা এবং এর শর্তাবলি পূরণ করা অপরিহার্য, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি মামলার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়াও প্রয়োজন। এর অর্থ হলো, ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার্য বিষয়ে উপযুক্ত রায় নির্ধারণে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। আর এটি শুধুমাত্র বিচারকের গভীর দৃষ্টি ও ইজতিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব।

অন্যদিকে, রায়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তা যেন সত্য ও বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। সুতরাং যখন কোনো বিচারিক রায় তার কারণ ও যৌক্তিকতা সহকারে জারি করা হয় এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, তখন তা একটি অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং তা কার্যকর করা আবশ্যক হবে।

রায় বাতিলকরণ:

যখন কোনো রায় শরয়ি পন্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রদান করা হয় এবং তার বাহ্যিক দিকটি প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তবে তা যে ঘটনার প্রেক্ষিতে জারি করা হয়েছে তার জন্য অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় রায়টি মেনে নেওয়া এবং বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে এবং কোনো অবস্থাতেই তা বাতিল করা বৈধ হবে না।

আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ

ষষ্ঠদশ পাঠ

তবে বিচারিক রায় কখনো কখনো প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই শরয়ি মূলনীতিসমূহের পরিপন্থী হয়ে থাকে; এমতাবস্থায় বিচারিক রায় বাতিল করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যেসব ক্ষেত্রে বিচারিক রায় বাতিল করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রথমত: যখন কোনো রায় প্রদান করা হয় এবং তা কুরআন বা সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট দলিলের পরিপন্থী হয় অথবা ইজমার (সর্বসম্মত ঐকমত্য) পরিপন্থী হয়, তবে তা বাতিল করা আবশ্যক এবং তা বাস্তবায়ন করা হারাম। কারণ এহেন পরিস্থিতিতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী হওয়ার কারণে উক্ত রায়টি নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে জুলুম হিসেবে গণ্য হবে। আর যা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, তা মূলত আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে ফয়সালা করা হিসেবে গণ্য হবে, তাই তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা সেই অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।" [আল-মায়িদাহ: ৪৫]। সহীহাইন-এ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" এর ওপর ভিত্তি করে: বাতিল কেবল সেই রায়ই হবে যা সত্যের পরিপন্থী হিসেবে স্পষ্ট হবে এবং যা মতপার্থক্য বা ইজতিহাদের ক্ষেত্র নয়। কিন্তু যদি বিষয়টি ইজতিহাদের ক্ষেত্র হয়, তবে তা বাতিল করা হবে না; যেমন ইজতিহাদের মাধ্যমে একটি রায় প্রদান করা হলো, এরপর অন্য একটি ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন রায় সামনে এলো, এমতাবস্থায় পূর্বের রায়টি বাতিল হবে না, কারণ এর ওপর ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: যদি বিচারিক ফয়সালাটি রায়ের শুদ্ধতার জন্য শরয়ি অনুমোদিত ও স্বীকৃত মূলনীতিসমূহ ব্যতিরেকে পরিচালিত হয়। নির্ধারিত মূলনীতি ব্যতীত রায় প্রদানের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, তন্মধ্যে:

১. যা স্বয়ং রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন রায়ের কারণ ও শর্তাবলি পূর্ণ না হওয়া; যেমন মানুষের হকের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পূর্বেই যদি রায় দিয়ে দেওয়া হয়, তবে এই রায়টি বাতিল করা হবে। কারণ রায়ের শুদ্ধতার জন্য মামলা দায়ের হওয়া একটি শর্ত, যা এখানে অনুপস্থিত। অনুরূপভাবে, যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ (ই'যার) প্রদানের পূর্বে রায় দেওয়া হয়, তবে তা বাতিল হবে; কারণ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান রায়ের শুদ্ধতার একটি শর্ত এবং এটি না থাকা রায় বাতিলের একটি দলিল। একইভাবে যদি বিচারক সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই (তা'দীল) ও পবিত্রতা নিশ্চিত করার পূর্বেই রায় প্রদান করেন, তবে সেই রায় বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করা সাক্ষ্য গ্রহণ ও তা দলিল হিসেবে গণ্য করার অন্যতম শর্ত।

---

২. যখন কোনো মামলার রায় এমনভাবে প্রদান করা হয় যেখানে বিচারকের রায় দেওয়ার অধিকার নেই; কারণ তা বিচারকের

সাথে অথবা বিচারকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, যা অভিযোগ তোলা বা কুধারণা সৃষ্টির কারণ হতে পারে; যেমন—বিচারকের তার শত্রুর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা, অথবা নিজের জন্য, তার অংশীদারের জন্য, তার ঊর্ধ্বতন (যেমন: পিতামাতা) কিংবা তার অধস্তনদের (যেমন: সন্তানাদি) পক্ষে রায় প্রদান করা।

৩. এমন বিচারকদের পক্ষ থেকে জারিকৃত রায়সমূহ যাদের মধ্যে বিচারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলির ঘাটতি থাকার কারণে বিচারকের যোগ্যতা বিদ্যমান নেই; যেমন—অন্যায়কারী বিচারক। এর ব্যাখ্যা নিচে তুলে ধরা হলো:

অন্যায়কারী বিচারক: যদি বিচারক তার রায়সমূহে অন্যায়ের জন্য পরিচিত হন এবং তিনি তার ব্যক্তিজীবন ও আচরণে ন্যায়পরায়ণ না হন, তবে তার সমস্ত রায় বাতিল করে দেওয়া হবে; তিনি আলেম হন বা মূর্খ, তার জুলুম প্রকাশ্য হোক বা গোপন। কারণ তার পক্ষ থেকে সুবিচার সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া যায় না, এমনকি বাহ্যিকভাবে যা সঠিক মনে হয় সে ক্ষেত্রেও; কেননা তার অন্তরে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার থাকতে পারে।

মূর্খ বিচারক: পক্ষান্তরে মূর্খ বিচারক যদি ন্যায়পরায়ণ হন, তবে তার রায়সমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। তার মধ্যে যা সঠিক হবে তা কার্যকর ও বহাল রাখা হবে, আর যা স্পষ্ট ভুল হবে তা বাতিল করা হবে। কতিপয় আলেম বলেছেন: তার রায় বাতিল করা হবে এমনকি যদি সেটি এমন ভুল হয় যা নিয়ে মতভেদ আছে, যদি তিনি আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ না করেন। কারণ আলেমদের পরামর্শ ছাড়া তার রায় দেওয়া কেবল অনুমান ও আন্দাজপ্রসূত। এর অর্থ হলো: আলেমদের সাথে পরামর্শ করার বিষয়টি রায়ের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে, বিশেষ করে যখন বিচারকের মধ্যে ইলমি যোগ্যতার অভাব থাকে।

যদি রায়সমূহ যাচাই করা এবং বাতিলের উপযোগী রায়গুলো বাতিল করা সঠিক হয়, তবে কি বিচারকের জন্য তার পূর্বসূরিদের রায়ের ক্ষেত্রে এটি করা আবশ্যক?

ফকীহগণের বক্তব্য থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: বিচারকের জন্য তার পূর্ববর্তী বিচারকদের রায়সমূহ যাচাই করা আবশ্যক নয়, তবে যদি কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার কাছে অভিযোগ পেশ করে, তখন তিনি অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। যদি রায়টি শরীয়ত পরিপন্থী হয় অথবা বাতিলের যোগ্য হয় তবে তিনি তা বাতিল করবেন। আর যদি বিষয়টি ইজতিহাদ-সাপেক্ষ হয়, তবে তিনি তা বহাল রাখবেন এবং বাতিল করবেন না।

ষোড়শ পাঠ

তৃতীয়ত: রায় বাতিল করা হবে যদি দণ্ডিত ব্যক্তি রায়ের পর এমন কোনো সঠিক খণ্ডনমূলক প্রমাণ বা যুক্তি পেশ করতে পারে যা প্রথম রায়ের পর প্রকাশ পেয়েছে, যদিও প্রথম রায়টি তার শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ছিল। আর এটি সত্যের পথে ফিরে আসা ওয়াজিব হওয়ার কারণে। এর উদাহরণ হলো: যদি কেউ অন্যের দখলে থাকা একটি গৃহের ব্যাপারে দাবি করে যে, এটি সে তার পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং সে তা প্রমাণও করে; অতঃপর রায়ের পর যদি এমন কোনো কার্যকর দলিল প্রকাশ পায় যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাদীর পিতা উক্ত গৃহটি বর্তমান দখলকারের পিতার নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন, তবে এটি দখলকারের একটি আইনগত দাবিতে পরিণত হবে। আর যদি তা প্রমাণিত হয়, তবে প্রথম রায়টি বাতিল হয়ে যাবে এবং বাদীর দাবিটি নাকচ হয়ে যাবে।

সৌদি আরব সাম্রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা:

বিচার ব্যবস্থার অবস্থা ও এর পদ্ধতি:

সৌদি আরবের বিচার বিভাগীয় বিন্যাস আরব দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ব্যবস্থা যা ইসলামী শরীয়াহ থেকে উৎসারিত; বরং এই বিন্যাস তার অনেক দিক থেকেই সেই সকল মানবরচিত আইনের পূর্বেই প্রবর্তিত হয়েছে যা আরব দেশগুলোতে বিদেশী আইন থেকে গ্রহণের মাধ্যমে জারি করা হয়েছিল—যেখানে প্রথা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, শরীয়াহ ও আকিদার কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি। অপরদিকে সৌদি আরব অত্যন্ত দ্রুত বিচার বিভাগীয় আইন এবং মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত আইন জারি করতে অগ্রসর হয়েছে এবং তা ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করেছে যাতে এ ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আর শরয়ী বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে সৌদি রাষ্ট্রের পদ্ধতি সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় পরিষদের ৭ / ১ / ১৩৪৭ হিজরি তারিখের ৩ নং সিদ্ধান্ত জারি হয়েছে, যা ২৪ / ৩ / ১৩৪৭ হিজরি তারিখে উচ্চতর অনুমোদন লাভ করেছে। এর ভাষ্য নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ (ক): সকল আদালতে বিচারিক ধারা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী পরিচালিত হবে; কারণ তাঁর কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করা সহজ এবং তাঁর মাযহাবের লেখকগণ মাসআলার পরপরই তার দলিল উল্লেখ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

অনুচ্ছেদ (খ): যদি শরয়ী আদালতসমূহের কার্যক্রম উল্লিখিত মাযহাবের মুফতা-বিহি (ফতোয়া প্রদত্ত) মতের প্রয়োগের ওপর পরিচালিত হয় এবং বিচারকগণ এর কোনো একটি মাসআলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাঠিন্য এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী কিছু লক্ষ্য করেন, তবে অন্যান্য মাযহাব হতে জনস্বার্থের দাবি অনুযায়ী পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করা হবে এবং উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেই মাযহাব অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী রাজ্যে নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় পর্ষদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ: ইমাম আহমদের মাযহাব অনুযায়ী আদালতগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের ওপর নির্ভর করা হবে:
(শারহুল মুনতাহা) অর্থাৎ: মনসুর বিন ইউসুফ আল-বুহুতি রচিত (মুনতাহাল ইরাদাত) এবং এরপর (শারহুল ইকনা)।

আদালতের প্রকারভেদ:

শরয়ী আদালতসমূহ চার প্রকারের সমন্বয়ে গঠিত, সেগুলো হলো:

প্রথম প্রকার: উচ্চতর বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল। এটি এগারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে পাঁচজন তামীয আদালতের প্রধানের মর্যাদায় পূর্ণকালীন নিয়োজিত। উচ্চতর বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল আদালতসমূহের তত্ত্বাবধান এবং আইনমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়গুলোতে শরীয়তের সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে।

দ্বিতীয় প্রকার: তামীয আদালত। তামীয আদালত একজন প্রধান এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তামীয আদালত তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটির নেতৃত্বে থাকেন প্রধান অথবা তার কোনো একজন প্রতিনিধি।

৮৫৫

পৃষ্ঠা 106

শরয়ি রাজনীতি
অষ্টাদশ পাঠ

তৃতীয় প্রকার: সাধারণ আদালতসমূহ: এগুলো এক বা একাধিক বিচারক নিয়ে গঠিত হয়। বিচারমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এগুলোর গঠন, কার্যালয় নির্ধারণ এবং বিচারিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট করা হয়।

চতুর্থ প্রকার: আংশিক আদালতসমূহ: এগুলো এক বা একাধিক বিচারক দ্বারা গঠিত। বিচারমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এগুলোর গঠন, কার্যালয় নির্ধারণ এবং বিচারিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট করা হয়।

৮৫৬

পৃষ্ঠা 107

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ

সাধারণ গ্রন্থপঞ্জি তালিকা

সাধারণ গ্রন্থপঞ্জি তালিকা

৮৫৭

পৃষ্ঠা 108

""

আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ
সাধারণ গ্রন্থপঞ্জির তালিকা

১. (আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ) আবদুল আল আতওয়াহ, উচ্চতর বিচার বিভাগীয় ইনস্টিটিউট সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি।

২. (আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ ওয়াল ফিকহুল ইসলামি) আবদুর রহমান তাজ, দারুত তালিফ, মিশর, ১৯৫৩ খ্রি।

৩. (আন-নিযামুল কাদায়ি ফিল ফিকহিল ইসলামি) রাফাত উসমান, দারুল বায়ান, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রি।

৪. (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ) আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি, দারুল ফিকর, মিশর, ১৯৮৩ খ্রি।

৫. (আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফি আহদি উমর ইবনুল খাত্তাব) ফারুক মুহাম্মদ, দারু রাওয়াই মাজদালাউয়ি, ২০০৩ খ্রি।

৬. (আল-আমওয়াল) আবু উবায়েদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, দারুল ফিকর, ১৯৭৫ খ্রি।

৭. (আল-খারাজ) ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে খুনাইস আল-আনসারি, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১৯৭২ খ্রি।

৮. (রিয়াসাতুদ দাওলাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি) মুহাম্মদ রাফাত উসমান, দারুল কিতাব আল-জামিই, ১৯৯৮ খ্রি।

৯. (আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ মাসদারুন লিত-তাকনীন) আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-কাদি, দারুল কুতুব আল-জামিইয়াহ আল-হাদিসাহ, তানতা, ১৯৮৯ খ্রি।

সাধারণ তথ্যসূত্র তালিকা — আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ

১০. **(আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ)**

ইউসুফ আল-কারাদাভী, মাকতাবা ওয়াহবাহ, মিসর, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।

১১. **(ফিকহুয যাকাত)**
ইউসুফ আল-কারাদাভী, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

১২. **(ইসলামী ফিকহে রাষ্ট্রব্যবস্থা)**
মাহমুদ আস-সাবী, দারুল হিদায়াহ, মিসর, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৩. **(ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ)**
মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দীন আর-রাইস, দারুল মাআরিফ, মিসর, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ।

১৪. **(ইসলামে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা)**
নাসর ফরীদ ওয়াসিল, মাতবাআতুল আমানাহ, মিসর, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫. **(ইসলামে বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস)**
মাহমুদ মুহাম্মাদ আরনূস, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতুল আযহারিয়্যাহ, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।

৮৬০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ২০০৯ আল-মদিনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।